জাগো মা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়





সৌভাগ্যকুণ্ডের জল মাথায় নিয়ে প্রণাম। কামাখ্যা মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কামাখ্যা যাওয়ার পথে

'জাগো বাংলা' পুজো সংখ্যায় লেখার আমন্ত্রণ আবার এসে গেল। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। অনেক কুৎসার দরজা পেরিয়ে গ্রামবাংলার বুকে শেষ হল অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচন। মাত্র দু'বছর আগে মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, ভালবাসা ও দোয়ার স্পর্শে ৩৪ বছর পর নতুন সরকারের দায়িত্বভার আমাদের ওপর এসেছে। এর ঠিক ২ বছরের মাথায় পঞ্চায়েত ভোট হল। সারা বাংলা জানে এই নির্বাচন ছিল একেবারে 'মাটি'র রায়। এবং দেখা গেল, মানুষের জন্য কাজ করবার অধিকার কাদের হাতে থাকবে, তা জনগণ তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করে দিলেন।

কবে নির্বাচন হবে, আর কবে হবে না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে হতেই দীর্ঘ কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। তবুও 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর্ব শেষ হওয়াটা গণতান্ত্রিক কাঠামোর বড় অধ্যায়। একদিকে প্রচণ্ড গরমের দাবানল, অন্যদিকে মেঘের ভারী মুখ, এই দুই টানাপোড়েনের মধ্যে দাঁড়িয়েও বাংলার গ্রামের মানুষ ভোট দিলেন। অত্যন্ত সময়োচিতভাবে, স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে একটা নয়, তিনটে করে ব্যালট পেপারে নিজেদের রায় দিলেন। মানুষের এই সচেতনতা আমাদের আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আসলে কী। বস্তুত, গণতন্ত্রের গণ-উৎসব পালিত হয়েছে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই।

আমাদের রাজ্যের যেসব প্রচার মাধ্যম রয়েছে, তাদের ৩-৪টে-কে বাদ দিলে বাকিগুলি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারের বিরুদ্ধে ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা ও অপপ্রচার করে গিয়েছে। এরপরও আমরা অভিভূত এই কারণেই যে, মানুষের গণজাগরণ, গণসমর্থনই এই সব ভ্রান্তবিলাসীদের অপপ্রচার স্তব্ধ করে দিয়েছে। গ্রামের মানুষ প্রমাণ করেছেন, মাটির গন্ধ, মাটির প্রাণ, মাটিতে চলাফেরা, মাটির অধিকার আজকের বাংলায় কতটা সুরক্ষিত। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, বিচার করার ক্ষমতা তাঁরা রাখেন।

মানুষের এই আশীর্বাদ-দোয়া-সমর্থন আমাদের মা-মাটি-মানুষ সরকারকে নতুন করে পথ চলার আরও আরও প্রেরণা দিয়েছে। সাহস জাগিয়েছে নতুন করে আরও মানুষের কাজে আত্মনিয়োগ করার। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা-ধন্যবাদ দিয়েই নয়, বিশ্বকবির ভাষায় মানুষের উদ্দেশে বলি—

"প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে, মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ। ..... আরো আলো আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো।"

যতদিন পৃথিবীতে বাঁচব ততদিনই এই কর্মপ্রেরণা নিয়ে মানুষের ভালর জন্য চেষ্টা করে যাব। এটা আমার জীবনের প্রতিজ্ঞা। মানুষের পাশে থাকাটাই আমার জীবনের একমাত্র স্বার্থ। এই বাইরে আর কোনও স্বার্থ নেই। জীবনের অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এসেছি মানুষের স্বার্থে বহু বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। জীবনের প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দীর্ঘ সময় কেটে গেল শুধুমাত্র লড়তে লড়তে।

আর আজও সেই লড়াই থামেনি, চলছেই। বামফ্রন্ট রাজ্যের অর্থনীতির মেরুদণ্ডটা একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গিয়েছে। সেই প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব সম্পূর্ণ বিমাতৃসুলভ। বামফ্রন্ট সরকারের করে যাওয়া দেনা বাবদ সব অর্থ কেটে নিচ্ছে দিল্লি। উন্নয়নের টাকা দিয়ে

কেন্দ্রীয় ঋণ ও তার উপর সুদ শোধ করতে করতে রাজ্যে মানুষের কাজ করবার কোষাগার সম্পূর্ণ ঋণগ্রস্ত ও খালি। নুন থেকে পান্তা জোগাড় কী করে হবে, তা ভাবতে ভাবতেই দিন শেষ হয়ে যায়। এ যেন নিজে পাপ না করেও অন্যের পাপের বোঝা সামলানো। সকাল থেকে রাত কী ভয়ানক এক সংগ্রামের অধ্যায় তা একমাত্র তাঁরাই বোঝেন, যাঁরা এই পরিস্থিতিটাকে উপলব্ধি করতে পারেন।

তবে শুধু নিজেদের জীবন ও নিজের দলকে ভোগবিলাসে রাখার লক্ষ্যে যাঁরা মানুষের কাজকে গুরুত্ব দেন না, সরকারি ক্ষমতা ভোগের জন্য ব্যবহার করেন, তাঁদের কাছে ব্যাপারটা অবশ্যই আলাদা। অন্যদিকে আমাদের মতো যাঁরা মানুষের ভাল করাটাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে মানুষের স্বার্থ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও লক্ষ্য নেই। মানুষ কী করে খাদ্য পাবে, কাজ পাবে, ভাল থাকবে সেই ভাবনাটাই আমার একমাত্র কাজ।

বামফ্রন্টের পাপের ফলেই রাজ্যের এই ভয়ঙ্কর আর্থিক অনটন। তবু সামাজিক উন্নয়নের কাজে পদে পদে 'অর্থ নেই' ভাবতে খুব কষ্ট হয়। কষ্ট হয় যখন ভাবি কর্মচারীরা মাইনেটা পাবেন তো? চিন্তা হয় টিচারদের মাইনেটা যেন আটকে না যায়, ১০০ দিনের কাজটা যেন ঠিকমতো হয়। রাস্তাঘাটগুলো ঝকঝকে-চকচকে দেখতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু অর্থের জন্য মাঝে মাঝেই ঠোক্কর খেতে হয়।

টাকা নেই, কী করে হবে? এটা শুনতে আমার একদম ভাল লাগে না। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। তাই, এত প্রতিকূলতার মধ্যেও রাজ্যটাকে আমরা গড়ছি। বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে জেলাজুড়ে। বলা যেতে পারে এটা আমার জীবনে ফেলে আসা দিনগুলোর চেয়েও আরও ভয়ঙ্কর এক সংগ্রাম। জেদ আর কঠোর পরিশ্রমকে পাথেয় করে সমস্যার গভীরে ঢুকে সমাধানের বিকল্প রাস্তা খুঁজে বের করে উন্নয়ন সংগ্রাম করছি।



এ বড় কঠিন দায়িত্ব। সেই জন্যই আমি সারাক্ষণ কাজ করি। এই বাংলাকে ঘুরে দাঁড় করানোটাই আমার জেদ, 'বিশ্ব বাংলায়' প্রতিষ্ঠিত করাই আমার জীবনের স্বপ্ন। যত বাধা আসুক না কেন ভবিষ্যতের জন্য, নবীন প্রজন্মর জন্য এই কাজ আমার চলবে। জীবনে অনেক সংগ্রাম পেরিয়ে, সংগ্রামী জীবনটাকে যেমন জয় করতে পেরেছি, তেমনি এই উন্নয়নের সংগ্রামকেও জয় করে বাংলাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবই— এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মানুষের জন্য যত বেশি কাজ করতে হোক না কেন, তা করব নিজের সবটুকু দিয়ে। তবে কোনও ভিক্ষার দ্বারস্থ বা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট মাথা নত নয়। মানুষ ছাড়া আর কোনও অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত কখনও করিনি, করবও না। এই দু'-বছরের মধ্যেই বাংলা অনেক এগিয়ে গিয়েছে, আরও যাবে, বাংলাই সব বিষয়ে প্রথম হবে। এ আমার সঙ্কল্প। ভরসা রাখুন, আস্থা রাখুন।

"জাগো বাংলা
জাগো মা"

দুর্গোৎসব-সহ সব উৎসবের আঙিনায় সবার মঙ্গল কামনা করি। আমার 'মা-মাটি-মানুষ' ভাল থাকলেই আমি ভাল থাকি।

আপনাদের পরিবারে খুব ভাল কাটুক উৎসব। উৎসরিত হোক শুভ শক্তির আলোকময় আলোর ঝরনা। দূর হয়ে যাক অন্ধকার ও গ্লানি। শুরু হোক শিউলি সকালে নতুন পথ চলা, কাশফুল দুপুরে সৃষ্টির চিন্তাধারা ও শরৎ সন্ধ্যায়— সবার মিলনমেলা। ভাল থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

Always be positive
Think positive
Be cool and be good for good people.
শারদ শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে।
"জয় জয় জয় হে"

আপনাদের একান্ত অনুগত
মমতা

নিবন্ধ



গণতন্ত্রের সুরক্ষায় দেশের সেরা মডেল বাংলা

মুকুল রায়

দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই যে গণতন্ত্র শুধুমাত্র সুরক্ষিত নয়, একশো শতাংশ নিরাপদ তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল পঞ্চায়েত ভোটের মধ্য দিয়ে। কারণ, বাম জমানার হিংসাদীর্ণ পঞ্চায়েত ভোটের চেয়ে মনোনয়ন জমা, ভোটের দিনের মৃত্যু, পুনর্নির্বাচনসহ সমস্ত ক্ষেত্রেই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন অনেক বেশি সুস্থ-শান্তিপূর্ণ ও গণতন্ত্রের উৎসবে পরিণত হয়েছিল।



বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা উপেক্ষা করে কয়েক কোটি ভোটার বাংলার এই গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নিয়েছেন। রাজ্যের অধিকাংশ বুথে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। মানুষের রায় মাথা পেতে নিয়ে ইতিমধ্যে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে দায়িত্ব নিয়েছেন মা-মাটি-মানুষের প্রতিনিধিরা। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সরকারি কর্মসূচিকে সামনে রেখে বুথে বুথে নেমে পড়েছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। তাই গত লোকসভা ভোটের জয়ের ধারা বিধানসভা নির্বাচনে অব্যাহত ছিল। আবার বিধানসভা ভোটে মা-মাটি-মানুষের সাফল্যের যে স্রোত ছিল তা পঞ্চায়েতে আরও গতিবেগ নিয়ে ছুটেছে। ১২ পুরসভার ভোটেও তৃণমূলের জয়যাত্রা যে অব্যাহত থাকছে এখনই তা নিশ্চিত করে বলে দিতে পারি। মা-মাটি-মানুষের সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস এবং পঞ্চায়েত ভোটের সাফল্যর পরিসংখ্যান বলছে আসন্ন লোকসভা ভোটেও তৃণমূলের জয়জয়কার হবেই হবে।

সরকারি পরিসংখ্যান ও তথ্য বলছে, বাম জমানার চেয়ে মা-মাটি-মানুষের সরকারের পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা অনেক বেশি ভাল ছিল। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৭৫ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। এবারে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪২৮। বাম জমানার পঞ্চায়েত ভোটের তুলনায় প্রায় ৫৭ হাজার বেশি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল। যাঁরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছিলেন তাঁদের কাছে প্রশ্ন, সন্ত্রাস হলে এত বেশি মানুষ মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কীভাবে?" সবচেয়ে বড় কথা, পাঁচ বছর আগে সিপিএম হার্মাদদের সন্ত্রাস ও তাণ্ডব নিয়ে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও তৎকালীন রাজ্য নির্বাচন কমিশন তৃণমূল প্রার্থীদের জন্য কোনও নিরাপত্তা বা বিকল্প ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ এবার শুধু বিডিও অফিস নয়, এসডিও অফিসেও মনোনয়ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানেই বিরোধীরা নিরাপত্তা চেয়েছেন সেখানেই রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা করেছে। একথা স্বীকার করেছে দেশের একাধিক সংগঠন ও সংস্থাও।

১৯৯৮, ২০০৩ ও ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনে ভোট দিতে গিয়ে যথাক্রমে ৪৮, ৪০ ও ৩৫ জন মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু একজন ভোটারও এবার ভোট দিতে পারেননি বলে পুলিশে অভিযোগ আসেনি। এবারের পাঁচ দফা ভোটে ডিজির রিপোর্ট অনুযায়ী নির্বাচনের দিনগুলিতে মাত্র ন'জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বিরোধীদের দাবি মেনে 'ডেকে আনা' কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে। বোমা বাঁধতে গিয়ে কংগ্রেস ও সিপিএমের দু'জন করে মারা গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু নিয়েও তদন্তের কথা বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এখানেই শেষ নয়, ভোটের দিন যাঁরা মারা গিয়েছেন মানবিক কারণে তাঁদের পরিবারকে সাহায্য দেওয়ার কথা ভাবছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। এমন মানবিক সিদ্ধান্ত এর আগে দেশের কোনও রাজ্য সরকার নিয়েছে বলে প্রশাসনিক ইতিহাস অন্তত বলছে না।

এবারের পঞ্চায়েত ভোট যে অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে তার আরও প্রমাণ, বাম জমানায় ২০০৮ সালে ১৫৯টি বুথে পুনর্নির্বাচন হয়েছিল। এবারে মাত্র ৯৮টি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পেরেছেন সিপিএমের বসিয়ে যাওয়া রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। মনে রাখবেন, কমিশনার মীরা পাণ্ডে তৃণমূলের সরকারের লোক নয়। সিপিএম এঁদেরকে বসিয়েছিল। অথচ এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর বিরোধীদের হাতে ২২ জন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন। ভোটের ফল প্রকাশের পর এখনও মাঝে-মধ্যেই বিভিন্ন জেলায় পরাজিত সিপিএম সন্ত্রাস করছে, তৃণমূল নেতা-কর্মীদের খুন করছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় তো রাতের অন্ধকারে খুন করার পাশাপাশি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে পরিকল্পনামাফিক। কিন্তু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বিরোধীদের এই চক্রান্ত বানচাল করে দিয়েছেন। আমাদের নেত্রী সারাজীবন একটাই কথা বলেন, যার সঙ্গে মানুষ আছে তার কোনও ভয় নেই, চিন্তা নেই। আমাদের দলের প্রতিটি কর্মীও তাই মানুষকে সঙ্গে নিয়েই চলেন, মানুষের সঙ্গেই নানা কর্মসূচিতে অংশ নেন। পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএম-কংগ্রেস এবং মিডিয়ার একটা অংশ পরিকল্পনামাফিক তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার করেছে। কিন্তু মানুষ বিরোধীদের শত প্ররোচনা সত্ত্বেও ফাঁদে পা দেননি, দিকে দিকে জয়ী হয়েছেন মা-মাটি-মানুষের প্রতিনিধিরা।

বিরোধীরা যেখানে শক্তিশালী সেখানে রাজ্যের গোটা পাঁচেক 'পকেটে' পাঁচ দফার ভোটে গন্ডগোল করেছে। এগুলি হল, আমডাঙা, বসিরহাট, আউশগ্রাম, জামুড়িয়া ও বাসন্তীর ঝড়খালি। মুর্শিদাবাদে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাস্তায় দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েত ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মস্তানি করেছেন। ভোটের দিন সিপিএমের এক প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যানিংয়ে দাঁড়িয়ে সকাল থেকে সমানে উসকানি দিয়ে গিয়েছেন। ভোটের আগেই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিধানসভা ভোটে দমদমে গোহারা হওয়া এক



প্রাক্তন মন্ত্রী রাস্তা অবরোধের হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর ছাড়া রাজ্যের সর্বত্রই তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করেছেন, জেলা পরিষদ-সমিতি-গ্রাম পঞ্চায়েতে এককভাবে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিতেছে জোড়াফুল।

পঞ্চায়েত ভোটে মানুষের ঢালাও সমর্থন নিয়ে চলা তৃণমূল কংগ্রেসের এবছরের বিপুল সাফল্যর একটু তুলনামূলক পরিসংখ্যান বলা দরকার। তা হলে গতবার শাসক বামফ্রন্টের চেয়ে এবার তৃণমূল কংগ্রেস কত বেশি ভোট এবং আসন পেয়েছে তা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। ২০০৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম আসন পেয়েছিল ২১,৭৮০ আর এবছর পেয়েছে মাত্র ১৫,০২৩। পাঁচ বছর আগে বামেদের ভোটের হার ছিল ৫৪.০১ শতাংশ, সেখানে এবার পেয়েছে ৩২.৩৫ শতাংশ। উল্টোদিকে ২০০৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের প্রবল সন্ত্রাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৯,৩৮৯টি আসন, ভোটের শতাংশের হার ছিল ২৩.২৬। আর এবার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে পঞ্চায়েতে তৃণমূলের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩,৩৯৭ এবং শতাংশের হারে একা লড়াই করা জোড়া ফুলের ভোট বেড়ে হয়েছে ৫০.৩৮। গ্রাম পঞ্চায়েতের পর এবার আসি পঞ্চায়েত সমিতির ভোট প্রাপ্তির হিসাবে। পাঁচ বছর আগে পঞ্চায়েত সমিতিতে বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৪,৮৯৮ এবং শতাংশের হার ছিল ৫৫। সেবার রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতা সত্ত্বেও তৃণমূল পেয়েছিল ২০১৯, ভোটের শতাংশের হারে ২২.৯৩। কিন্তু এবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও বামফ্রন্ট মাত্র ২৫৬৫টি আসন পেয়েছে সমিতিতে। ভোট পেয়েছে মাত্র ৩১ শতাংশ। উল্টোদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এবছর প্রায় ৫৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ৪৮৯১ টি আসন পেয়েছে। জেলা পরিষদে ৮২৫টি আসনের মধ্যে সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিয়ে এককভাবে লড়াই করে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ৫৩০টি আসন পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

৩৪ বছরের লাল-সন্ত্রাস ও মানুষের রক্ত নিয়ে রাজনীতি করা হার্মাদবাহিনীর দল সিপিএমকে মানুষ যে আর চাইছেন না তার প্রমাণ এবারের পঞ্চায়েত ভোট। আসলে রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসতেই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েতে ৫০ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করেন। উল্টোদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাহীন বঞ্চনা উপেক্ষা করে বাম জমানার দু'লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা নিয়েও একের পর এক জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন জননেত্রী। তাই মাত্র দু'বছরে রাজ্য সরকারের কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ঘিরে নির্বাচনে গিয়েছিল মা-মাটি-মানুষের সরকার। সাধারণ মানুষ তৃণমূলের দায়বদ্ধতা ও 'কথা দিয়ে কাজ সম্পূর্ণ' করার মানসিকতা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন বলেই এবার পঞ্চায়েত ভোট গণতন্ত্রের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

নিবন্ধ



বাংলায় শিল্পের নবজাগরণ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়



মাত্র দু'বছরেই ৩৪ বছরের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় শিল্প ও কর্মসংস্থানের নবজাগরণের যুগ শুরু হয়েছে। দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত শিল্পপতি ও সংস্থা যেমন রাজ্যে বিনিয়োগ শুরু করেছে তেমনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেও জোয়ার এসেছে।



কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রোমোশন থেকে অ্যাসোচেম ও দেশের একাধিক বণিকসভা একবাক্যে স্বীকার করেছে, বাংলার শিল্পায়নে জোয়ার এসেছে। কর্মসংস্থানের অজস্র ক্ষেত্র চালু হওয়া বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে গত ২৬ মাসে। মা-মাটি-মানুষের সরকারের স্বচ্ছ ও এক জানালা নীতি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি শিল্পবন্ধু হয়েছে বলে স্বীকার করছেন ভারতের শীর্ষ শিল্পপতিরাও। হলদিয়ার বেঙ্গল লিডস বা মুম্বইয়ের শিল্পসম্মেলনের পর গোটা দেশেই এখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর স্বচ্ছ প্রশাসন এবং শিল্পবন্ধু-ভাবমূর্তি রাজ্যের শিল্পায়নে জোয়ার এনে দিয়েছে। কেন্দ্রের ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রোমোশন দফতরের রিপোর্ট, শুধুমাত্র ২০১৩ সালেই রাজ্যে লগ্নি হয়েছে ১৪০৭ কোটি টাকা। বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে অঙ্কের নিরিখে গত চার বছরে এটাই সর্বোচ্চ বিনিয়োগ। মনে রাখবেন, এই হিসাবটা ৩১ জুলাই হিসাবে এবং মূলত মাঝারি মাপের শিল্পে বিনিয়োগের হিসাব ধরা হয়েছে। আর্থিক বছরের হিসাবে এখনও আরও আট মাস বাকি। প্রায় ১২টি ভারী শিল্পে বিনিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শুরু হলে এ বছরেই বিনিয়োগের পরিমাণ এক ধাপে আরও কয়েক হাজার কোটি টাকা হয়ে যাবে। তিন বছরের মধ্যে সমস্ত প্রকল্প সম্পূর্ণ হবে। জেলায় জেলায় তৈরি হচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তি পার্ক। আইটি হাবে বিদেশের বহু সংস্থা বিনিয়োগে উৎসাহ দেখাচ্ছে। একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, শিল্পগুলি নির্মাণের কাজেও যেমন বিপুল পরিমাণ মানুষ অংশ নেবেন তেমনি উৎপাদন শুরু হলে আরও লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বলতে দ্বিধা নেই, এভাবেই অতিদ্রুত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মা-মাটি-মানুষের সরকার রেকর্ড গড়বে গোটা দেশেই।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একাংশ এবং একটি স্বার্থান্বেষী মহল অপপ্রচার করছে। কিন্তু কাজের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বারেবারে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় জমি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের কোনও সমস্যা নেই। যাঁরা প্রকৃত শিল্পায়নে আগ্রহী এবং সত্যিসত্যি বিনিয়োগ করতে চান, তাঁরা ডিপিআর জমা দেওয়ার পর অতি দ্রুত রাজ্য সরকার সমস্ত অনুমোদন দিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার 'ল্যান্ড ব্যাঙ্ক' তৈরি করে বিনিয়োগকারীদের অনেক জমি বণ্টন করেছে। তবে সরকারি জমি নিয়ে ফেলে রাখা চলবে না। যাঁরা জমি নিয়েছেন, তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিল্প গড়ে তুলতে হবেই, নতুবা জমি ফেরত নেওয়া হবে। আর মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েই রুগ্‌ণ ও বন্ধ কারখানার

জমি নিয়ে যে ঘোষণা করেছিলেন সেটাই সরকার অনুসরণ করে চলেছে। অর্থাৎ বন্ধ কারখানার জমিতে শিল্পই গড়তে হবে। বাম জমানায় বন্ধ কারখানার জমিতে আবাসন, শপিং মল থেকে শুরু করে নানা বিনোদনমূলক প্রকল্প হয়েছে। সিপিএম সরকারের সেই সর্বনাশা নীতিতে গরিব মানুষের কোনও উপকার হয়নি। শ্রমিকের পেটে লাথি মেরে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মুনাফা জোগাড় করার সুযোগ করে দিয়েছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

কিন্তু আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য, যে জমি পড়ে রয়েছে তাতে বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত করা। দেশের মধ্যে শিল্পে বাংলাকে প্রথম করাই মা-মাটি-মানুষের সরকারের অন্যতম টার্গেট। এবছরই ২৩টি শিল্প-কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে। আর উৎপাদন শুরু হলেই যে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে তা সকলেই অনুভব করছেন, বেকাররা চাকরি পাচ্ছেন, এর চেয়ে আনন্দের আর কী বা হতে পারে? পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে বিনিয়োগের জন্য শিল্প সংস্থাকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষি-নির্ভর শিল্প থেকে শুরু করে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার জন্য ইতিমধ্যে বহু প্রস্তাব এসেছে। দ্রুত সেগুলি খতিয়ে দেখে শিল্প-নিগম ও শিল্পমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। একটি তথ্য উল্লেখ করলে স্পষ্ট হবে, ১৯৯১ থেকে পরের দশ বছরে রাজ্যে শিল্প গড়ার জন্য ৪৭১০টি ইচ্ছাপত্র জমা পড়লেও বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৮২৩টি প্রকল্প। অথচ সেই সময় শিল্পধরার নাম করে মন্ত্রী ও সরকারি আমলারা বিদেশে গিয়েছেন। প্রায়দিনই 'মউ চুক্তি'র নাম করে সংবাদপত্রে অসংখ্য ছবি ছাপা হয়েছে সিপিএম নেতা-মন্ত্রীদের। কিন্তু সরকারি কোষাগার থেকে জনগণের রাজস্ব বাবদ জমা কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও একটাও শিল্প হয়নি, সৃষ্টি হয়নি কোনও কর্মসংস্থান। বস্তুত এই কারণে বাংলার বেকার সংখ্যা বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। উদাসীন থেকেছেন তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের খুনের রক্তে হাত রাঙিয়ে হার্মাদদের ভরসায় ক্ষমতায় আসা সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা।

বাম জমানায় শিল্পায়নের নীতি থেকে শুরু করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হত আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে। বেকারদের কর্মসংস্থান গুরুত্ব পেত না বলেই প্রায় এক কোটির বেশি নথিভুক্ত যুবক-যুবতী রেখেই জনরায়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে জনবিচ্ছিন্ন বামপন্থীরা। উন্নয়নের টাকায় হার্মাদদের অস্ত্র কিনে মানুষ খুনের জন্য প্রকল্প তৈরি করেছে বাম সরকার। উন্নয়ন তথা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ, দুই দিনাজপুর শিল্পায়নের তালিকায় পুরোপুরি ব্রাত্য ছিল বাম জমানায়। হলদিয়া শিল্পতালুকে নতুন আঙ্গিকে শিল্প-প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। একের পর এক বিনিয়োগ আসছে রাজ্যের নতুন শিল্পতালুকগুলিতে। এবছরেই বর্ধমানের চণ্ডীদুর্গা সিমেন্ট, হাওড়ার টেক্সম্যাকো ইউজিএল রেল, মেদিনীপুরের জ্যাপফা কমফেড কারখানায় উৎপাদন শুরু হবে। রাজ্যের সাহায্য নিয়ে শুরুর পথে চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদন সংস্থা কলকাতার ক্রিয়েটিভ লিমিটেড এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বণিক রাবার ইন্ডাস্ট্রি। উত্তর ২৪ পরগনার অঙ্কিত ইন্ডাস্ট্রি ও উইমপ্লাস্ট ছাড়াও হলদিয়ার ধনসিরি পেট্রোকেম কারখানায় বিপুল বিনিয়োগের পর উৎপাদন শুরুর অপেক্ষায় কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে।

মুম্বইয়ে বাংলার প্রথম ঐতিহাসিক শিল্পসম্মেলনে মুকেশ আম্বানি থেকে শুরু করে দেশের সমস্ত বৃহৎ শিল্পসংস্থার কর্ণধার এবং শীর্ষ আধিকারিকরা এসেছিলেন। প্রত্যেকেই স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করে গিয়েছেন,দেশের মধ্যে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের স্বচ্ছতা এবং আন্তরিক আহ্বানের জন্যই বাংলায় বিনিয়োগ করতে চান। বাংলাই সকলের কাছে এখন অন্যতম বিনিয়োগ ক্ষেত্র। তবে একটা কথা বলতেই হবে, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, কর্মসংস্থানমুখী অর্থাৎ বিনিয়োগের সঙ্গে বেশি সংখ্যায় নিয়োগের সম্পর্ক আছে এমন প্রস্তাব ও প্রকল্পে বেশি জোর দিতে। আর সরকার সেটাই করছে বলে রাজ্যে বেকারদের মুখে হাসি ফুটছে।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবার রাজ্যে উৎপাদিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সামগ্রী বিশ্বের বাজারে বিকোবে 'বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ড' নামে। মা-মাটি-মানুষের সরকারের উদ্যোগে বাংলার হস্ত-ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে দিতে এমনই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-নিগমগুলিকেও একটি হোল্ডিং কোম্পানি তথা এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জননেত্রী। নিগমগুলিকে নিয়ে একটি হোল্ডিং কোম্পানি তৈরি করা হবে। এই সংস্থার মধ্যে নিয়ে আসা হবে মঞ্জুষা, তন্তুশ্রী, মঞ্জুশ্রীর মতো নিগমগুলিকে। 'বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ড' হিসাবে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উৎপাদনে আমূল পরিবর্তনে বিশেষ পরামর্শদাতা বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সব ক'টি নিগমকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা হবে। নিগমগুলির তৈরি সামগ্রীগুলিকে আরও উন্নত করে বিশেষ ব্র্যান্ডের রূপ দিয়ে বাজারজাত করা হবে। দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেগুলি বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ড হিসাবেই এবার থেকে পরিচিত হবে। এতে করে একদিকে যেমন ক্ষুদ্রশিল্প আরও কর্মসংস্থানমুখী হবে তেমনি বাড়বে বিনিয়োগ।

বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ড তৈরির সিদ্ধান্তের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতি জেলায় একটি করে বৃহৎ কৃষি বাজার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবর্তনের সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্যের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে পিপিপি মডেলে এই বাজারগুলি তৈরি হবে। প্রতিটি বাজারের জন্য খরচ হবে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। মনে রাখবেন, 'বৃহৎ কৃষি বাজার যোজনা ২০১৩-এর অধীনে তৈরি এই বাজারগুলিতে শস্য সংগ্রহ, রাইস মিল, কোল্ড স্টোরেজ, প্যাকিং থেকে অন্যান্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকবে। এর জন্য রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার মডেল অনুসরণ করা হবে। বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগে শুধু উৎসাহ দেওয়া নয়, পরিকাঠামো তৈরি করে বিনিয়োগকারীদের কাছে 'শিল্পবন্ধু ইমেজ' তুলে ধরতে সফল হয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। আসলে, ৩৪ বছরে বাম শাসনে রাজ্যে প্রকৃত শিল্পায়ন না-হওয়ার মূল কারণ পরিকাঠামোকে ধ্বংস করে দেওয়া। উল্টোদিকে, কল-কারখানায় শ্রম আন্দোলনের নামে লালঝান্ডা টাঙিয়ে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল হার্মাদ-নির্ভর সিপিএমের শ্রমিক নেতারা। একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, শয়ে শয়ে শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করেছে অথচ নেতাদের গাড়ি-বাড়ি-বিলাসিতা দিনের পর দিন বেড়েছে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেই অকারণে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ করার পাশাপাশি শিল্পে পরিকাঠামো গড়ে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দিয়েছেন বিনিয়োগকারীদের কাছে। তাই বাংলায় শিল্পায়নের নবযুগ শুরু হয়েছে। শিল্পবন্ধু মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর হাত ধরেই।



সদ্যসমাপ্ত লোকসভায় ‘তৃণমূল’

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চদশ লোকসভা। স্বমহিমায় তৃণমূল কংগ্রেস। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সাংসদরা একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন বাগ্মিতা, যুক্তি-তর্ক, আলোচ্য



বিষয়সূচিতে যথার্থভাবে মনোনিবেশ এবং সর্বোপরি জনতার স্বার্থে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সদ্যসমাপ্ত লোকসভার বর্ষাকালীন অধিনেবসনে তৃণমূলের ভূমিকা বহুল প্রশংসিত হয়েছে।

এর পিছনে যাঁর অবদান সর্বাধিক, তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে দলনেত্রী বারবার আমাকে প্রতিটি আলোচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়ে দলের ভূমিকা কী হবে তা বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটা অকল্পনীয়।

রাজ্যসভার সাংসদরাও যথাযথভাবে তাঁদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। লোকসভায় খাদ্য সুরক্ষা বিলে রাজ্যের অধিকারকে বহাল রেখে এবং তাতে সংশোধনী যুক্ত করে আমরা বিলটিকে সমর্থন করেছি জনগণের উপকার হবে বলে। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ বিলে সারা ভারতবর্ষে আমরাই ভোটাভুটিতে সরকারকে বাধ্য করিয়েছি ও সংসদীয় ভাষায় ডিভিশন চেয়ে (বিভাজন) বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছি। তার কারণ এই বিলে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা

হয়নি। তৃণমূল চেয়েছিল জমির মালিকের কাছে একশত পারসেন্ট (১০০%) জমিই কিনতে হবে নিজ উদ্যোগে, যে উদ্যোগপতি ওই জমি ক্রয় করতে চাইবেন তাঁকেই। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে উদ্যোগপতিকে মোট জমির শতকরা কুড়ি ভাগ জমি রাজ্য সরকারকে অধিগ্রহণ করে দিতে হবে অর্থাৎ ৮০:২০ অনুপাতে। আমরা বলেছি রাজ্য সরকারের কাজ নয় প্রাইভেট কোম্পানির মালিকদের হয়ে জমির মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা বা দালালি করা। জমির মূল্যায়নও ঠিক করবে উদ্যোগপতি ও জমির মালিক উভয়ে বসে। কেনা-বেচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে পরিকাঠামোগত ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে রাজ্যে শিল্পস্থাপনে রাজ্য সরকার পরিপূর্ণ সহায়তা করবে।

বলপ্রয়োগে জমি অধিগ্রহণ, বহুফসলি জমি অধিগ্রহণ করে শিল্পস্থাপনেরও আমরা বিরোধী।

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারকেও যদি পথঘাট নির্মাণে, হাসপাতাল নির্মাণে, সেতু নির্মাণে জমির দরকার হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও আলোচনার মাধ্যমেই হবে, বলপ্রয়োগে নয়।

ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে চাকরি, বাসস্থান জমির পরিবর্তে জমি দিতে হবে।

এই বিলের উপর ভোটাভুটিতে আমরা ১৯টি ভোট পেয়েছিলাম, সরকার পক্ষে ছিল ২১৬টি। কিন্তু আমরা চিরকালের জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে রাখলাম লোকসভাতে।

লোকসভায় বলা হল, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন হয়েছিল বলেই ১৮৯৪ সালের ব্রিটিশ আমলের জমি অধিগ্রহণ আইনের বদল হল। আর এই বিলের ইতিহাসের সৃষ্টি দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখিত হয়ে ইতিহাস হয়ে থাকবে।

পেনশন বিলে আমরা বিরোধিতা করেছি, অবসর গ্রহণের পর অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরকারি কোষাগারে তাঁদের অর্থ গচ্ছিত রাখতে চান। সেই অর্থভাণ্ডারেও FDI আনা হচ্ছে। ভাবা যায় না।

দার্জিলিংয়ে অস্থিরতা সৃষ্টির পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত রয়েছে বলে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে। ৩সেপ্টেম্বর যেদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং জেলা সফর করছেন সেদিন কোন দুঃসাহসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডে নর্থ ব্লকে বসে দিল্লিতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন? আমাদের চাপে রাজ্যসভায় দুঃখপ্রকাশ করতে হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে।

টাকার অবমূল্যায়ন নিয়ে দল গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ জানিয়েছে, লোকসভার অভ্যন্তরে ওয়েলে নেমে সভাকে মুলতবি করিয়ে দিয়েছে। ডলার পিছু টাকার মূল্যহ্রাস সর্বকালীন রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। যার ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। দিকনির্দেশহীনতা, কল্পনাশক্তিহীনতায় কেন্দ্রীয় সরকার হাবুডুবু খাচ্ছে। অর্থনীতির এমন দুরবস্থা অতীতে কখনও হয়নি। আমরা লোকসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্থাপন করেছি।

রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই আমাদের ভূখণ্ডকে (একটি অংশ) বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার বিদেশমন্ত্রকের প্রচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হয়েছে। বিল আনতেই দেওয়া হয়নি। রাজ্যের অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা হলেই আমরা সেখানে প্রতিবাদ করবই করব।

দেশে আরও আঞ্চলিক দল আছে। আমরা ১৯জন সাংসদ নিয়ে লোকসভায় ষষ্ঠ বৃহত্তম দল। রাজ্যসভাতে আমাদের সাংসদ সংখ্যা ৯জন। কিন্তু মানুষ যখন উপলব্ধি করছেন, বিশ্বাস করছেন, কেন্দ্রে ইউপিএ '৩' সরকারও আসবে না। বিজেপিও আসবে না। এখন গুরুত্ব বাড়বে আঞ্চলিক দলগুলোর। নতুন শক্তি কেন্দ্রে দায়িত্ব নেবে। তৃণমূল কংগ্রেস অন্যতম নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে উঠছে।

লোকসভাতে আমরা জানিয়ে দিয়েছি জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো, জনবিরোধী নীতি গ্রহণ, রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ, বিদেশি পুঁজিকে সর্বক্ষেত্রে প্রবেশের ঢালাও অধিকার, এ সব চলবে না। রাজ্যসভাতেও তৃণমূলের ভূমিকা এবার সব দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিটি বিষয়ের আলোচনায় এঁরা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথমবার রাজ্যসভায় সদস্য হয়েও এই ভূমিকা প্রশংসনীয়।

তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত বিল (আরটিআই) আমরাই পাঠিয়েছি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে।

অপরদিকে লোকসভায় কংগ্রেস এবং বিজেপি একজোট হয়ে নানা বিষয়ে বোঝাপড়ার মাধ্যমে এক অস্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করছে। মাঝেমধ্যে বিজেপি ও বাম সাংসদরা সিপিএম -এর নেতৃত্বে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একজোট হয়ে লোকসভার বিভিন্ন সংশোধনীতে ভোট দিচ্ছেন। ভ্রমের সৃষ্টি হবে দেখলে। ঠিক মনে হয় যেন এটাই বামেদের মূল রাজনৈতিক চরিত্র। দিশাহারা সিপিএম লোকসভাতে প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। মাঝেমধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি করা ছাড়া এদের ভূমিকা হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ নেতিবাচক।

একটা সময় ছিল যখন সাংসদ হিসাবে চতুর্দশ লোকসভায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই সাংসদ ছিলেন।

লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব দিয়ে লোকসভা শুরু হলেই তৎপরতার তুঙ্গে থাকতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর উঠত 'জিরো আওয়ার', সেখানেও তিনি সমান সাবলীল। যে কোনও বিষয়ে, যে কোনও বিষয়ের বাজেট বিতর্কে আলোচনায় অংশ নিতে তিনি ছিলেন দক্ষ ও পারদর্শী। কিছুটা সময় হাতে পেলেই তৈরি করে ফেলতেন তীব্র ক্ষুরধার, যুক্তিপূর্ণ ক্ষুরধার বক্তব্য। আজকে আমরা ১৯+৯ লোকসভা ও রাজ্যসভার ২৮জন সাংসদ সেই সময়কার কথা এখনও স্মরণ করে উদ্বুদ্ধ হই।

লোকসভার বিতর্কের মান আগের মতো আর নেই। মাঝে মধ্যে কেউ কেউ ভাল বলে থাকেন। এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে নজির নয়। আমাদের দলের সাংসদদের ভূমিকা সেই তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল।

ভারতবর্ষের লোকসভাতে কতগুলি দল আছে তার একটি তালিকা এখানে উল্লেখ করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে বিভিন্ন দলের নাম, সেই দলের কতজন সাংসদ আছেন, দলনেতা-নেত্রীর নাম কী, তা সবই জানতে পারা যাবে।

১জন সাংসদ নিয়ে একটি দল আছে তার সংখ্যা ১৩টি। ২জন সাংসদ নিয়ে দল আছে এমন দলের সংখ্যা ৭টি। ৩, ৪, ৫ জন করে সাংসদ নিয়েও দল আছে। সংযুক্ত তালিকা দেখলেই সমস্ত চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমরা অপেক্ষায় থাকলাম ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের জন্য। ভারতবর্ষের নিজ রাজ্যে এবং রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করেও যে নেত্রীর নেতৃত্বে দেশ এগোতে পারে নিঃসন্দেহে সেই নাম মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৪র লোকসভা নির্বাচনের পর ভারতীয় রাজনীতিতে আসবে এক নিদারুণ পরিবর্তনের পরিবেশ।

আর সেই পরিবেশের পুরোধায় নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে যে দলগুলি বিরাজমান হবে, তার অন্যতম প্রধান পুরোধার স্থানে থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস।

লোকসভায় দলগত অবস্থান

মোট আসন— ৫৪৩, শূন্য আসন— ১, মনোনীত সদস্য— ২

	দলের নাম	আসন	দলনেতা
১.	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি)	২০৬	সুশীলকুমার সম্ভাইরাও শিন্ডে
২.	ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)	১১৬	সুষমা স্বরাজ
৩.	সমাজবাদী পার্টি (সপা)	২২	মুলায়ম সিং যাদব
৪.	বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা)	২১	দারা সিং চৌহান
৫.	সংযুক্ত জনতা দল (জেডি(ইউ))	২০	রামসুন্দর দাস
৬.	সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (এআইটিসি)	১৯	সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭.	দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (ডিএমকে)	১৮	টি আর বালু
৮.	ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী (সিপিআই(এম))	১৬	বাসুদেব আচারিয়া
৯.	বিজু জনতা দল (বিজেডি)	১৪	অর্জুন চরণ শেঠি
১০.	শিবসেনা (এসএস)	১১	অনন্ত জি গীতে
১১.	অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (এআইএডিএমকে)	৯	এম থাম্বিদুরাই
১২.	নির্দল	৯	—
১৩.	ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)	৯	শরদ পাওয়ার
১৪.	তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)	৬	নম নাগেশ্বর রাও
১৫.	রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি)	৫	—
১৬.	কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (সিপিআই)	৪	গুরুদাস দাশগুপ্ত
১৭.	রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)	৪	লালুপ্রসাদ যাদব
১৮.	শিরমণি অকালি দল (এসএডি)	৪	রতন সিং আজনলা
১৯.	জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স (জে অ্যান্ড কে এনসি)	৩	—
২০.	অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক (এআইএফবি)	২	নরহরি মাহাতো
২১.	ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল)	২	ই আহমেদ
২২.	ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)	২	—
২৩.	ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা (প্রজাতান্ত্রিক) (জেভিএম(পি))	২	বাবুলাল মারান্ডি
২৪.	রেভলিউশনারি সোসালিস্ট পার্টি (আরএসপি)	২	—
২৫.	তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস)	২	কে চন্দ্রশেখর রাও
২৬.	যুবজন শ্রমিক রিথু কংগ্রেস পার্টি (ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি)	২	ওয়াই এস জগন্মোহন রেড্ডি
২৭.	অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম)	১	আসাউদ্দিন ওয়াইসি
২৮.	অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)	১	বদরুদ্দিন আজমল
২৯.	অসম গণ পরিষদ (অগপ)	১	জোসেফ টোপ্পো
৩০.	বহুজন বিকাশ আগহাড়ি (বিভিএ)	১	যাদব বলিরাম সুকুর
৩১.	বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)	১	সানসুমা খুংগুর বিশমুথুরিয়ারি
৩২.	হরিয়ানা জনহিত কংগ্রেস (বিএল) (এইচজেসি)	১	কুলদীপ বিষ্ণই
৩৩.	জনতা দল (সেকুলার) (জেডি(এস))	১	—
৩৪.	কেরল কংগ্রেস (এম) (কেসি(এম))	১	জোসে কে মানি
৩৫.	মরুমালার্চি দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম	১	গণেশ মূর্তি এ
৩৬.	নাগাল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ)	১	সি এম চাং
৩৭.	সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এসডিএফ)	১	প্রেমদাস রাই
৩৮.	স্বভিমানী পক্ষ (এসডব্ল্যুপি)	১	রাজু শেট্টি
৩৯.	বিদুথালাই চিরুথাইগল কাটচি (ভিসিকে)	১	তিরুমাভালাভান থোল



মাওবাদী সমস্যার সমাধানে জননেত্রীর ফর্মুলাই মডেল

শুভেন্দু অধিকারী



মাওবাদী সমস্যার সমাধানে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথই দেশ তথা জাতির কাছে একমাত্র পথ। শুধুমাত্র আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, প্রতিবেশী নেপালও মাও সমস্যার সমাধানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ফর্মুলাকে এখন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কারণ, বিনা রক্তপাতে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিকে হাতিয়ার করে যেভাবে জননেত্রী জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছেন, তা গোটা বিশ্বে বিরল। তৃণমূলনেত্রীর এই আন্তরিক ও সাহসী পদক্ষেপকে শুধুমাত্র সমর্থন নয়, অনুকরণীয় পথ বলে জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকে মেনে নিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসকরাও। স্বভাবতই নেত্রীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সৈনিক হিসাবে এজন্য আমরা গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ।

একদিকে দারিদ্র, শোষণ, নিপীড়ন ও অন্যদিকে মানুষের যন্ত্রণাকে ব্যবহার করে অস্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে মাওবাদের নামে এক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে রাখার মরিয়া প্রয়াস চালিয়ে আসছিল কিছু বিপথগামী মানুষ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামোর কথা বলেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীও 'গরিবি হঠাও' স্লোগান দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তো হয়ইনি, উপরন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়েছে। 'গরিবি হঠাও' স্লোগান শুধুমাত্র ভোট বৈতরণী পার হওয়ার মুখরোচক স্লোগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে। ইউপিএ-১ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতবর্ষের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে অর্জুন সেনগুপ্ত ও তেণ্ডুলকর কমিশনকে সমীক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। দুই কমিশনেরই সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, ভারতের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের দৈনিক রোজগার মাত্র কুড়ি টাকা। আর দেশের পুঁজির ৯৮ শতাংশই মোট জনসংখ্যার মাত্র দু'ভাগ মানুষের হাতে রয়েছে। বস্তুত এই কারণে পিছিয়ে পড়া এলাকা যেখানে মূলত আদিবাসী-মূলবাসী বসবাস করেন, সেই এলাকাগুলিতে দারিদ্র ও ক্ষুধা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির বন্দুকবাজ মাওবাদ তত্ত্ব খাড়া করে ওই এলাকাগুলিকে তাদের বিচরণ ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে। যেমন, মহারাষ্ট্রের গড়চৌরলি, ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া, অন্ধ্রের করিমনগর, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, বোলাঙ্গির, কালাহান্ডি প্রভৃতি এলাকায় দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মাও নামে একদল মানুষ বছরের পর বছর অরাজকতা চালিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের তিন জেলা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর যুক্ত হয়েছিল।

প্রথম দিকে এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী, রক্তের রাজনীতি করা সংগঠনের নাম ছিল পিডব্লুজি, জনযুদ্ধ। পরবর্তীকালে নাম বদলে এরা সিপিআই-মাওবাদী হয়। গত কয়েক বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়েক হাজার মানুষ এদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। হাজার খানেক আধা-সামরিকবাহিনীর জওয়ান, শান্তিশৃঙ্খলা রাখতে গিয়ে এদের টার্গেটের বলি হয়েছেন। প্রাণহানি থেকে বাদ যাননি মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, সরকারি আমলা-কর্মী থেকে শুরু করে চিকিৎসক-নার্সও। এরা ভারতের সংবিধান মানে না, সংসদীয় ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন বন্ধ পালন করে। এখানেই শেষ নয়, এরা আমাদের দেশের শত্রু এমন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে আরও একটি নতুন রাষ্ট্র গড়তে চায়। এদের আসল উদ্দেশ্য, গোদাবরী থেকে গোমতী, রেড করিডর গড়ে তোলা। এই বিপজ্জনক শক্তিকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও কয়েকটি রাজ্য সরকারও নিজস্ব স্টাইলে মোকাবিলা করতে গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। একটা সময় অন্ধ্রের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডি মোকাবিলায় খানিকটা সফল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আমাদের রাজ্যের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ত্রিমুখী ফর্মুলাকে মাও-সমস্যার হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

মূলত, পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলার ২৩টি ব্লকে ভৌগোলিক অবস্থান, অনুন্নয়ন এবং দরিদ্রতাকে হাতিয়ার করে ধীরে ধীরে এক অশুভ শক্তি তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের ভুল নীতি, উদাসীনতা, আদিবাসী উন্নয়নের অর্থ নয়ছয় করা, যৌথবাহিনী ও পার্টির সশস্ত্র ক্যাডারদের দিয়ে ব্যাপক দমন-পীড়নের সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছিল। ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে লালগড়ের ছোটপেলিয়া-বড়পেলিয়া গ্রামে পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন গঙ্গামণি মুর্মু, চিন্তামণি মুর্মু, ফুলমণি প্রতিহারদের মতো নিরীহ মানুষরা। ৭৫ বছরের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে গ্রেফতারের ঘটনায় গোটা জঙ্গলমহলের বঞ্চিত মানুষের যন্ত্রণার আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। মানুষ শাসক সিপিএমের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই ক্ষোভকে দমানোর জন্য ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের মেজাজে তৎকালীন বাম সরকার পুলিশ-যৌথবাহিনী এবং সিপিএম ক্যাডারদের মাঠে নামিয়ে দেয়। সিপিএম সশস্ত্র গুন্ডাদের গুলিতে লালগড় ব্লকের জঙ্গলে তিনজন গ্রামবাসী মারা যান। সেদিন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ ও সিপিএমের চক্রান্ত উপেক্ষা করে কলকাতা থেকে ছুটে এসে ওই তিন নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সান্ত্বনা দিয়েছিলেন স্বজনহারাদের। বলেছিলেন, রাজ্যে পরিবর্তন ঘটলে যে কোনও মূল্যে জঙ্গলমহলে শান্তি ফেরাবেনই।

২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম-মাওবাদী গোপন আঁতাত প্রকাশ্যে চলে আসে। মাওবাদীরা ভোট বয়কটের ডাক

দেয়। রাজ্যের সর্বত্র বামেদের ভরাডুবি হলেও মাওদের সহায়তায় জঙ্গলমহলের তিন জেলায় সুবিধা পেয়ে যান সিপিএম প্রার্থীরা। ভোট বয়কটের সুযোগ নিয়ে বামপন্থীরা লোকসভায় জিতে মুখরক্ষা করলেও এলাকার জনজীবনে অশান্তির পরিস্থিতি আরও জটিলতর হয়ে ওঠে। তিন জেলায় ২০০র বেশি সশস্ত্র ক্যাডার শিবির তৈরি করে। রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা আধাসামরিক বাহিনী ও হার্মাদরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। পদবি মাহাতো হলেই তাকে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। সোরেন, হেমব্রম, টুডু, হাঁসদা, মাঝি পদবি থাকলেই হার্মাদদের হাতে সীমাহীন অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। পরপর তিন বছর তিন জেলায় মাও-মার্কস জটিল বোঝাপড়ার জেরে নিরীহ মানুষের প্রাণহানির সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছিল। শুধুমাত্র ২০০৯ সালে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় চারশো ছাড়িয়ে যায়। ২০১০ সালে প্রায় তিনশো এবং ২০১১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় শতাধিক মানুষের প্রাণ গিয়েছে। লালগড়-নেতাই গ্রামে গণহত্যার নারকীয় ঘটনার ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই নেত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলাম সেদিন। কয়েক ঘণ্টা পরেই হার্মাদদের বধ্যভূমিতে পৌঁছে স্বজনহারাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১০ সালের ২১ জুলাই কলকাতায় শহিদ দিবসের সমাবেশ থেকে জননেত্রী ঘোষণা করেছিলেন ৯ আগস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বর্ষপূর্তির কর্মসূচি হবে লালগড়ে। ওই সমাবেশ থেকেই লালগড়ের কর্মসূচির যাবতীয় দায়িত্ব সেদিন আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন নেত্রী। বলেছিলেন, "জঙ্গলমহলের সাধারণ গরিব, আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে, রক্তের রাজনীতি বন্ধ করতে তৃণমূল বদ্ধপরিকর। গোটা জঙ্গলমহলে একটাই কর্মসূচি থাকবে, তা হল, শান্তি ও উন্নয়ন।" প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লালগড় যাওয়ার পথে ভীমপুরে রাস্তা কেটে সিপিএম ক্যাডাররা নেত্রীর লালগড় সমাবেশের প্রস্তুতিতে সবরকমভাবে বাধা দিয়েছিল। ৩০ জুলাই, মোমবাতি জ্বালিয়ে লালগড় ভিডিও হলে ৯ আগস্ট সভার প্রস্তুতি বৈঠক সেরেছিলাম সেদিন। জঙ্গলমহলের তৃণমূল যুবকর্মীরা সেইসময়ে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নেত্রীর গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি সফল করতে।

সমাবেশের দিন লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের মাঠে সন্ত্রাসবিরোধী মঞ্চের ব্যানারে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক সমাবেশের কথা আজ আর কারও অজানা নয়। লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশে সেদিন নেত্রী বলেছিলেন, "অস্ত্রমুক্ত জঙ্গলমহলকে রক্তপাতহীন এক নতুন বিপ্লবের মহাতীর্থ করতে হবে। যার মূল স্লোগান হবে শান্তি ও উন্নয়ন। খুনের বদলা খুন, অস্ত্রের বিকল্প অস্ত্র, রক্তের বদলা রক্ত কখনওই কোনও সমস্যার সমাধানের পথ হতে পারে না।" জঙ্গলমহলের মানুষের কাছে সেদিন নেত্রীর আহ্বান ছিল, "২০০৯ সালে লোকসভা ভোটে আপনারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, ভোট বয়কট করেছিলেন। এবার ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজেদের মতামত জানান। পরিবর্তন আনুন বাংলায়। আমরা ক্ষমতায় এলে শুধুমাত্র উন্নয়ন দিয়ে, আপনাদের পাশে থেকে সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করব। অস্ত্রধারী হার্মাদবাহিনী, মুখে গামছা বাঁধা, খুনে মাওবাদীদের এই এলাকায় সংগঠিত হতে দেবেন না।" সেদিন নেত্রী আদিবাসীদের বলেছিলেন, "আপনাদের ভোট নিয়ে গিয়ে এতদিন রাজনীতি হয়েছে, কোনও উন্নয়ন হয়নি। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন। কথা দিচ্ছি, আমৃত্যু আপনাদের পাশে থাকব।" নেত্রী সেকথা যে অক্ষরে অক্ষরে রেখেছেন তার প্রমাণ এখন জঙ্গলমহলের প্রতিটি পরিবার অনুভব করছে। শুধুমাত্র জঙ্গলমহলে ঘন ঘন প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে এসে বৈঠক করা বা উন্নয়নের কাজ পর্যবেক্ষণ করা নয়, একের পর এক কর্মসূচি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাস্তবায়িত করছেন বাংলার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী।

লালগড়ের সেই সমাবেশের মঞ্চ থেকে নেত্রীর আহ্বান যে জঙ্গলমহলের মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ লোকসভা ভোটের চেয়ে বিধানসভা নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার। ভোট বয়কটের জেরে লোকসভা নির্বাচনে যেখানে ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছিল পরে তা বেড়ে বিধানসভা নির্বাচনে ৮৫ শতাংশ হয়। অধিকাংশ জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়যুক্ত হন। ২০১১ সালে ২০ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন জননেত্রী। যেমন কথা, তেমনই কাজ। প্রথমেই মহাকরণ, মহানগর ছাড়িয়ে ১২ জুলাই, ২০১১ জঙ্গলমহলের নয়াগ্রাম ও ঝাড়গ্রামে সভা করেন জননেত্রী। পরের দিন বাঁকুড়ার সারেঙ্গায় জনসমুদ্রে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন তিনি। প্রতিটি সভায় জঙ্গলমহলের যুবকদের পুলিশবাহিনীতে যোগদান করার আহ্বান জানান। দু'টাকা কেজি দরে চাল, আদিবাসী ও গরিব পরিবারকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি পানীয় জল-স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কার্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। এক ঝটকায় বদলে যেতে শুরু করে জঙ্গলমহলের মানুষের জীবনযাত্রা। মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়কদের পাঠিয়ে নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশও দেন তিনি। সবমিলিয়ে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসতে থাকে জঙ্গলমহলের অরণ্যে।

প্রথম দিকে ঝাড়গ্রামের রবীন্দ্র মিশ্র, সাত ধরার লালমোহন মাহাতো, দহিজুড়ির বাবু বসু অথবা পুরুলিয়ার বলরামপুরের অযোধ্যা পাহাড়ের জিতু সিং সর্দার, বাকু সিং সর্দার এবং অজিত সিং সর্দারের মতো প্রান্তিক মানুষদের খুন করে পরিবর্তনের সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বানচালের চেষ্টা হয়। কিন্তু, একদিকে পুলিশ প্রশাসন, যৌথবাহিনীকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং অন্যদিকে, রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি সাধারণ মানুষকে মাওবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিমুখী ফর্মুলা নয়াগ্রাম থেকে বেলপাহাড়ি, বারিকুল থেকে বলরামপুর পর্যন্ত এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। আসলে জঙ্গলমহলে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে চষে বেড়ানো নেত্রীর কর্মসূচি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার লাইনেই সম্পৃক্ত করা যায়—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,...

জঙ্গলমহলে গত ২৬ মাসে দু'টাকা কেজি দরে চাল, পাঁচ লক্ষ বিশেষ রেশন কার্ড, ১৫ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতীকে জুনিয়র কনস্টেবল ও এনভিএফে নিয়োগ, হাজারেরও বেশি সাঁওতালি ভাষার প্যারা-টিচার নিয়োগ ছাড়াও অলচিকি ভাষায় পঠন-পাঠন শুরুর কর্মসূচি গোটা দেশে নজির গড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ইতিমধ্যে কাজ শুরু হওয়া,



ঝাড়গ্রাম-লালগড় সংযোগকারী আমকোলা সেতু, রায়পুরে নতুন হাসপাতাল, নয়াগ্রামের ভরসাঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর উপর ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। জঙ্গলের অপরূপ সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন দিশা এনে দিয়েছে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি উদ্যোগ ও ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান আদিবাসী যুবক-যুবতীদের নতুন করে উৎসাহ জাগিয়েছে।

বাম জমানায় ঘুম থেকে উঠেই মানুষ সংবাদপত্রে পাতায় দেখতেন জঙ্গলমহলে মৃতদেহের ছবি। গত ২৬ মাসে সেখানে মাওদের হাতে খুনের সংখ্যা শূন্য। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাত তিনটে পর্যন্ত ভোট উৎসবে শামিল হয়েছিলেন আদিবাসী ভোটাররা। আজ আর জঙ্গলে যত্রতত্র মৃতদেহ পড়ে থাকে না, শোনা যায় না গুলির শব্দ, ভেসে আসে না আধা-সামরিকবাহিনীর বুটের আওয়াজ। সেখানে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শোনা যায় ঝুমুর গানের সুর, ছৌ নাচের ধ্বনি। হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন টুসু-বাধনা পরবে। প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডে পুলিশ সুপার খুন হন, ওড়িশায় বিজেডি বিধায়ক ঝিনা হিকাকাকে অপহরণ করে শুভশ্রী পণ্ডার মতো কুখ্যাত মাও নেত্রীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, ছত্তিশগড়ে বিদ্যাচরণ শুক্লার মতো জাতীয় নেতা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অথচ সেইসময়ে পশ্চিমবাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিমুখী ফর্মুলা শান্তির অমরাবতী ফিরিয়ে এনেছে বাংলার জঙ্গলমহলে। তিন দফা ফর্মুলা হল—(১) আধা সামরিকবাহিনী, যৌথবাহিনীকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত করে প্রকৃত খুনি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। (২) ব্যাপক উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়া। (৩) ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মসূচি, সভা সমিতির মধ্য দিয়ে ধ্বংসাত্মক পেশাদার অস্ত্রধারীদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা।

কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ত্রিমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে দেশকে মাও-মুক্ত করা। একইসঙ্গে জঙ্গমহলের চিরস্থায়ী শান্তিকে বজায় রাখতে আরও বেশি করে রাজ্যের দাবিমতো তিন জেলার উন্নয়ন প্রকল্পকে অর্থ বরাদ্দ করে জননেত্রীর গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপকে স্বাগত জানানোও কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক কর্তব্য। পরিশেষে, বাংলার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ও আমার নেত্রীর প্রতি শারদ অর্ঘ্য—

তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব,
মম সম্পদ খোয়ায়ে,
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে।



জয় মানে প্রতিজ্ঞা পালনের শপথ

সুব্রত বক্সি

বান এসেছে মরা গাঙে বাইতে হবে নাও .....

২০১১ সালের ১৩ মে বাংলার মানুষ জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিবর্তনের যে চাকায় বসিয়ে দিয়েছিলেন তা প্রতিনিয়ত দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। জননেত্রীও জনতার দাবি-চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পালাবদলের নানা ধাপ অতিক্রম করে পরিবর্তন করে চলেছেন।



মানুষ যে সেই পরিবর্তন ও পর্যায়ক্রমকে গ্রহণ করছে তার প্রমাণ এবার পঞ্চায়েত ভোটে একা লড়েই তৃণমূলের বিপুল জয়। কিন্তু জয় মানে আনন্দ বা উৎসব নয়, দায়বদ্ধতা ও প্রতিজ্ঞা পালনের শপথ।

বাংলার প্রায় পাঁচ কোটি ভোটার সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি ও প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয়তম নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করে ও আস্থা রেখেই সবাইকে পঞ্চায়েতে জিতিয়েছেন, দায়িত্ব দিয়েছেন। মানুষের স্বার্থে, বাংলার প্রয়োজনে মা-মাটি-মানুষের এই বিশ্বাস ও আস্থার মর্যাদা রাখতে গিয়ে বহু তৃণমূল কর্মী প্রাণ দিয়েছেন, শহিদ হয়েছেন। তাই একদিকে নেত্রীর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রাম এবং অন্যদিকে শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে আসা পরিবর্তনকে চোখের মণির মতো রক্ষা করার পাশাপাশি মানুষের অর্পিত দায়বদ্ধতা পূর্ণ করতেই হবে। নেত্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন, যাঁরা দলের এই দায়বদ্ধতা পূর্ণ করবেন না, শৃঙ্খলা মেনে চলবেন না সেই সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে তৃণমূল। স্বচ্ছতার সঙ্গে মা-মাটি-মানুষের সরকারের গৃহীত কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। মনে রাখবেন, নেত্রী সবসময় বলেন, মানুষ আগে, মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে দলের ইস্তাহার ও প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে।

দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বধর্ম, সর্বজাতি ও





সর্বমতাবলম্বী মানুষের সমর্থনের মধ্য দিয়ে ২০১১ সালের ১৩ মে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে। মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন জননেত্রী। বাংলার মানুষের স্বার্থ রাখতে গিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন নেত্রী। ছুটছেন পাহাড় থেকে জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, সর্বত্রই সরেজমিনে পৌঁছে তদারকি করছেন উন্নয়নের কর্মসূচির। মিনি-মহাকরণ সঙ্গে নিয়ে একের পর এক জেলায় গিয়ে সেখানকার সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে বিরল নজির তৈরি করেছেন জননেত্রী। এর আগে বাংলা তো দূরের কথা, দেশের কোনও মুখ্যমন্ত্রী এত ঘন ঘন জেলা সফরে গিয়ে গ্রামীণ মানুষের অভাব-অভিযোগ এমন গভীরভাবে খতিয়ে দেখেননি। স্বভাবতই মানুষের প্রত্যাশার পারদ প্রতিদিনই বাড়ছিল। কিন্তু রাজ্যে পরিবর্তন এলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পর্যন্ত গ্রামীণ প্রশাসনের সিংহভাগে ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল সিপিএম। ভারতীয় সংবিধানের পরিকাঠামো মেনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে তৃণমূলস্তরের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জোড়াফুলের প্রতিনিধিরা। জেলায় জেলায়, গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় তৃণমূলের প্রতীকে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে জয়ী হয়েছেন। মনে রাখতে হবে জনগণ কিন্তু প্রত্যেককে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসাবেই গুরুদায়িত্ব দিয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটির উল্লেখ করতেই হয়। তা হল—মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় মহিলাদের ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষেত্রে গোটা দেশে এটাও একটা নজির গড়লেন। আসলে নেত্রী উপলব্ধি করেছেন, যে মা শত প্রতিকূলতার মধ্যে একটা সংসার চালাতে পারেন, তিনি অনায়াসে একটি পঞ্চায়েত বা সমিতি অথবা জেলা পরিষদ চালাতে পারবেন। তাই পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য চালু থাকা ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণকে বাড়িয়ে একলাফে ৫০ শতাংশে নিয়ে গিয়েছেন। আসলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, বিশ্বের যে সমাজে নারীর অধিকার ও গুরুত্ব যত বেশি সেই সমাজ ততটাই এগিয়ে।

জননেত্রীর সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বেশ কয়েকমাস কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি তখন দেখেছি, দিনে ২৪ ঘণ্টা, বছরে ৩৬৫ দিনই মানুষের স্বার্থে, বাংলার মঙ্গলার্থে কাজ করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা করছে, বাম জমানার বিপুল ঋণ ও সুদের বোঝা বইতে হচ্ছে। তবু স্কুলশিক্ষক থেকে শুরু করে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীদের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মাসের প্রথম দিনই বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন জননেত্রী। এটাও একটা রেকর্ড। নেত্রীর কাজের পদ্ধতি ও কর্মসূচি ঘোষণার পাশাপাশি দ্রুত বাস্তবায়নের যে নজিরবিহীন সাফল্য তিনি একের পর এক করে দেখাচ্ছেন তা ভারতের অন্য রাজ্যগুলি অনুসরণ করছে। মুখ্যমন্ত্রীর চালু করা হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক ছাড়াও 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' গোটা দেশে সবাই অনুসরণ করছে।

নিবন্ধ



দায়িত্ব আরও বেড়েছে আমাদের

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন শেষ। প্রথমেই রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে আস্থা রেখে যে বিশাল সংখ্যক মানুষ ভোটে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে মা-মাটি-মানুষের সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন তাঁদের প্রাপ্য।



যে প্রতিকূলতা নিয়ে এবার ভোট করতে হয়েছে, তার পর ধন্যবাদ না জানানো অন্যায় হবে। ভোটের হারও অনেক রেকর্ডকে হারিয়ে দিয়েছে। কোনও কোনও এলাকায় পরের দিন ভোর পর্যন্তও ভোট হয়েছে। এটা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাও বটে। এবং এই আস্থা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। আমাদের যে বিশাল জয়, সেই কৃতিত্ব পুরোটাই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল নেত্রীর। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বর্তমান রাজ্য সরকারের উপর কতটা আস্থা, ভরসা ও প্রত্যাশা রাখে অষ্টম সাধারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলই তা প্রমাণ করে। এখন নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব হল — সেই সব আস্থা ও ভরসার ভিত্তিতে উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের প্রত্যাশাগুলি যথাসম্ভব এবং যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করার চেষ্টা করা। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে কাঁধে কাঁধ রেখে এগিয়ে যেতে হবে। নেত্রীর নির্দেশ মনে রাখতে হবে, জনগণের সেবা করার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। আমাদের দেখতে হবে, সরকারি পরিষেবা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়।

ভোটে বিশাল জয়ের পর দায়িত্ব আরও বেড়েছে। এবার কীভাবে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যের গ্রামবাংলার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে দিকেই নজর দিতে হবে। মোট ২৯টি বই প্রকাশ হচ্ছে। শপথের সময়ই এই বইগুলি জনপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই বইগুলির মাধ্যমে প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি কীভাবে পঞ্চায়েত চালাতে হবে, অনেকটা জানতে পারবেন। বিভিন্ন দফতরের কাজ করতে হয়। তাই প্রতিটি দফতর কীভাবে চলে বা কীভাবে পঞ্চায়েত এগিয়ে চলে, না জানলে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে অসুবিধা হবে। সেই লক্ষ্যেই এই ভাবনা। অষ্টম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ৫০ শতাংশই মহিলা। এই ক্ষেত্রেও আমরা নজির তৈরি করেছি। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই বিল আনা হয়েছিল। সে সময়ও অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সর্বমোট নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ৫০ শতাংশ তফসিলি জাতি, তফসিলি আদিবাসী ও সংখ্যালঘু-সহ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি। পঞ্চায়েতে মহিলা, তফসিলি জাতি, তফসিলি আদিবাসী ও সংখ্যালঘু-সহ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করতে এবং তা দূর করতে সহায়ক হবে বলেই মনে করি। আর দরকার সাধারণ মানুষের পরামর্শ। বিভিন্ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও জনমুখী, দায়বদ্ধ ও কার্যকর করে তুলতে জনসাধারণের সাহায্য দরকার।

সারা রাজ্যে মোট ১৭টি জেলা পরিষদ ও শিলিগুড়ি মহকুমায় মহকুমা পরিষদ, ৩৪১টি ব্লক তথা পঞ্চায়েত সমিতি ও ৩৩৪৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সাধারণভাবে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গড় জনসংখ্যা ২০ হাজার, পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার গড় জনসংখ্যা ১.৮ লক্ষ এবং জেলা পরিষদ এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একাধিক গ্রাম সংসদ থাকে, সেখানে গড় জনসংখ্যা কমবেশি ২০০০। গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখ্য দায়িত্বে থাকেন প্রধান, যিনি প্রশাসনিক প্রধান। এছাড়া রয়েছেন উপপ্রধান, সঞ্চালক, নির্বাচিত সাধারণ সদস্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী। গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে পাঁচটি উপসমিতি রয়েছে এবং সদস্যদের মধ্য থেকেই একজনকে সঞ্চালক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। উপসমিতিগুলি হল, অর্থ ও পরিকল্পনা, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, নারী-শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ, শিল্প ও পরিকাঠামো। এর মধ্যে প্রধান পদাধিকারবলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সঞ্চালক। নারী-শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির সঞ্চালক মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিরোধী সদস্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সদস্য। একইভাবে সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে দশটি স্থায়ী সমিতি রয়েছে। প্রতিটি স্থায়ী সমিতির প্রধানকে কর্মাধ্যক্ষ বলা হয়। প্রতিটি স্থায়ী সমিতিতেই বিরোধীরা থাকেন।

এখন প্রশ্ন, একটি উপসমিতিতে কতজন সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন? এই সংখ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ২০ হলে উপসমিতিতে দুই সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন, সদস্য সংখ্যা ২১ বা তার বেশি হলে উপসমিতিতে সদস্য থাকবেন তিনজন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক বা কর্মসহায়কের প্রধান দায়িত্ব বা কর্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে, (১) যে সমস্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি রূপায়ণ করবে, সেগুলির আর্থিক ও কারিগরি নির্দেশনামা মেনে প্রকল্পগুলির নকশা ও এস্টিমেট তৈরি করবেন। (২) যাবতীয় প্রকল্পের কাজ তদারকি করবেন, কাজের মেজারমেন্ট নেবেন, সময়ে সময়ে সব ধরনের পেমেন্ট প্রদানের জন্য বিলগুলি পরীক্ষা করে সুপারিশ-সহ নির্বাহী সহায়কের কাছে পেশ করবেন এবং কাজ শেষ হলে সমাপ্তি রিপোর্ট দেবেন ও প্রধানের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। (৩) প্রকল্প ও কর্মসূচি ধরে মাস্টার রোলগুলি সংগ্রহ করবেন ও সেগুলি পরীক্ষা করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জমা দেবেন।

প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে, (১) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রধান হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন



করবেন। (২) সব কর্মচারী ও কাজের জন্য যে সব সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মচারী গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে থাকবেন, তাঁদের প্রশাসনিক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। (৩) আইন অনুযায়ী ও রাজ্য সরকারের আদেশ বলে যে সমস্ত কাজ করতে হবে, সেই সমস্ত কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্পাদন করবেন। (৪) প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সঠিক থাকলে যে কোনও বৈধ পেমেন্টের জন্য চেকে সই করবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা যে সব কাজের জন্য প্রধানের উপর ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেবে, আইন মেনে তা সম্পাদন করবেন। (৫) বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনের সময় সহায়তা করবেন। (৬) পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক সংসদ, জেলা সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক উপসমিতির পদাধিকার বলে সদস্য হিসাবে এবং পদাধিকার বলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সঞ্চালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দায়িত্বের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও রূপায়ণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং কোনও উপসমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হলে সেই উপসমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।

এই প্রসঙ্গেই জানতে হবে, গ্রাম পঞ্চায়েতে দুই ধরনের সভা হয়—বিধিবদ্ধ ও অন্যান্য সভা। বিধিবদ্ধ সভা বলতে যে সব সভা করার কথা পঞ্চায়েত আইন ও বিধিতে বলা রয়েছে, সেগুলিকে বোঝায়। অন্যান্য সভার ক্ষেত্রে নানা সময়ে সরকারি আদেশনামার মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সচিবের সইয়ে সাত দিনের নোটিসে সভা ডাকা যাবে। তবে প্রধান বা উপপ্রধানের অপসারণের সভার নোটিসে সই করবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ। উপসমিতির সভাও প্রতি মাসে একটি করে করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনী ক্ষেত্রই হল এক একটি গ্রাম সংসদ। আর একটি পুরো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে হয় একটি গ্রাম সভা। গ্রাম সংসদ সভা সাধারণত বছরে দু'বার হয়, আর গ্রাম সভা সাধারণত ডিসেম্বর মাসে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের প্রধান উৎসগুলি কী? (১) গৃহ ও বাস্তু জমির উপর কর বাবদ আয় ছাড়াও উপবিধি তৈরি করে টোল, অভিকর ও ফি বাবদ, গৃহ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ফি বাবদ আয় রয়েছে। (২) ফেরিঘাট, খোঁয়াড় ও গ্রাম পঞ্চায়েতে ন্যস্ত সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত বাবদ, গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিতে বা ব্যক্তি মালিকানার জমিতে মোবাইল টাওয়ার স্থাপন বাবদ বার্ষিক লাইসেন্স ফি বা এককালীন ফি বাবদ আয়। (৩) কোনও ট্রাস্টি অথবা কোনও ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে দান বা এরকম কোনও সম্পত্তি থেকে পাওয়া আয়। (৪) জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য ফি বা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য ফি। (৫) গচ্ছিত জমার উপর সুদ বাবদ ও ঋণ বাবদ আয়। পয়লা সেপ্টেম্বর বা তার মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত জমি বা বাড়ি বা উভয়ের মালিকদের বা ব্যবহারকারীদের বিষয়-সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে পরের বছরের মোট প্রদেয় বার্ষিক করের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। তার পরের বছর ৩১ জানুয়ারি বা তার মধ্যে সংশোধিত ও চূড়ান্ত কর নির্ধারণ তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক গৃহীত ও প্রকাশিত হবে অন্তত দু'টি প্রকাশ্য স্থানে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্টারন্যাল অডিট ছাড়াও বার্ষিক ও সামাজিক নিরীক্ষা রয়েছে।

কী কী প্রকল্প রয়েছে, জানা দরকার। ইন্দিরা আবাস যোজনা ছাড়াও রয়েছে জনপ্রিয় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প। সতেরোটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন বা আনন্দধারা, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচি, নির্মল ভারত অভিযান, জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি। জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি বা এনএসএসপি-ও গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্প, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্প বা জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত। সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিতে সদস্য পিছু প্রতিদিন রাজ্য সরকার থেকে সহায়তা বাবদ প্রাপ্য হয় দশ টাকা। নির্মল ভারত অভিযানে নির্মল গ্রাম পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য শিশুশিক্ষা মিশন বা রাজ্য অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিলের সুযোগও নিতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

এই সব প্রকল্পের সুযোগ প্রত্যেকের হাতে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আমাদের দায়বদ্ধতাও মানুষের প্রতি। যত বাধা আসুক, আমরা সফল হবই।



সংখ্যালঘুদের অভিভাবিকা

ফিরহাদ হাকিম

আমরা চলি সমুখপানে
কে আমাদের বাঁধবে রে/
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে রে..।

বাম শাসনে যাঁরা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কাছে সবচেয়ে উপেক্ষিত ও অবহেলিত এবং অনাদৃত ছিলেন তাঁরাই পরিবর্তনের পর রাজ্যে প্রথম 'উন্নয়নের আলো' পেয়েছেন। স্বাধীনতার পর বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোত থেকে কার্যত সরিয়ে রেখে সরকারি প্রকল্প নিয়েছিল বাম সরকার।



কিন্তু জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম প্রশাসক যিনি শুধুমাত্র উন্নয়ন নয়, গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতে তুলে এনে একের পর এক অসংখ্য প্রকল্প ও পরিষেবা চালু করলেন। জননেত্রীর উপলব্ধি থেকেই, সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে প্রায় ৩০০ শতাংশ বরাদ্দ বেড়েছে। জেলায় জেলায় মাদ্রাসা ও হাই মাদ্রাসাকে উন্নীত করা হয়েছে। প্রায় ২৪ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীকে ৩৫০কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইমাম ও মোয়াজ্জেনদের যথাক্রমে ২,৫০০ এবং ১০০০ টাকা ভাতা চালু করেছেন। জননেত্রী উপলব্ধি করেছেন, রাজ্যের জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলিম, তাই বাম শাসনে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কোনওমতেই বাংলার উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। আর সেই কারণে, বাংলার হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টান-জৈন সবাইকে উন্নয়নের একই সমান্তরাল রেখায় নিয়ে আসতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন জননেত্রী। আর তাই গোটা দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র নেত্রী যিনি সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু নন, সামাজিক স্তরবিন্যাস মুছে দিয়ে এক জাতি-এক প্রাণ ও একতাকে অবলম্বন করে বাংলায় উন্নয়নযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশের মধ্যে প্রথম তিনিই 'নিজ ভূমি নিজ গৃহ' থেকে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের মতো সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক সরকারি প্রকল্প চালু করে ভারতের সেরা প্রশাসক হয়েছেন।

মুসলিম ও অনগ্রসর উন্নয়নের বিষয়টিতে যে জননেত্রী সবচেয়ে গুরুত্ব দেন তার প্রমাণ সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রককে মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, নতুন প্রকল্পের কাজের গতি নিয়ে তদারকি করছেন। শুধু শিক্ষা বা কর্মসংস্থান নয়, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের জন্য অজস্র নতুন শিক্ষাঙ্গন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাঙড়ে সংখ্যালঘুদের জন্য মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হচ্ছে। গত দু'বছরে চারটি জুনিয়র হাই থেকে হাই মাদ্রাসা, ১৭টি হাই মাদ্রাসা থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ৬টি আলিম থেকে ফাজিলে উন্নীত করেছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। সরকারি সাহায্য পায় না এমন মাদ্রাসাগুলিকে মূলস্রোতে নিয়ে আসতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে নেত্রীর মূল উদ্দেশ্য হল, এই মাদ্রাসাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। ইতিমধ্যে প্রায় ১,৫০০টির বেশি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫০টি মাদ্রাসার নতুন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জননেত্রীর নজিরবিহীন কর্মকাণ্ড খুব কাছ থেকে প্রতিদিন দেখার সৌভাগ্য হয়। তাই প্রতিদিনই দেখছি, বাংলার সংখ্যলঘুদের সমস্যা ও সঙ্কট নিরসনের জন্য প্রতি মুহূর্তে যিনি অনুভব করছেন সেই মমতাময়ী অভিভাবকের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম জমানায় সংখ্যালঘু সংরক্ষণ নিয়ে সিপিএম শুধুমাত্র ভোট নিয়েছে, রাজনীতি করেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি ছাড়া সংখ্যালঘুদের জন্য চাকরি ও পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদ সংরক্ষণ আইন, ২০১২ চালু করেছেন। নয়া আইনে সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে পিছিয়ে পড়া ওবিসি গোষ্ঠীভুক্ত মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। ৬০টি তফসিলি জাতি, ৪০টি তফসিলি উপজাতি, ৬৫টি শ্রেণি ওবিসি(ক) এবং ৭৮ শ্রেণি ওবিসি(খ) হিসাবে চিহ্নিত করেছে নয়া সরকার। ওবিসি শ্রেণির তালিকায় ৯৮টি সংখ্যালঘু শ্রেণি আছে যাদের মধ্যে ৮৬টিই হল মুসলিম সংখ্যালঘু। এখানেই শেষ নয়, প্রতি মাসে তফসিলি জাতি শংসাপত্র প্রদানের হার ৫০ হাজার থেকে বেড়ে ৬০ হাজার হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে যেখানে এই শংসাপত্র বিতরণের হার ছিল ৬,০০,২১০ সেটি ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ৭,০৬,৭১টি।

রাজ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জন্য রাজারহাটে কুড়ি একর জমি বরাদ্দ করেছিল। সরকারের তরফে ২৩৬ কোটি টাকার অনুদান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই, ৬২ কোটি টাকা অনুমোদন



করা হয়েছে। রাজারহাট-নিউটাউনে তৃতীয় হজ ভবন নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে ৫ একর জমিতে। ইতিমধ্যে, ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে গ্রামীণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় এমএসডিপি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ৭৫,১৭৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৬২,৫৬০টি ইউনিটের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। গত দুই বছরে এমএসডিপি প্রকল্পের ৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ২৪১টি ইউনিটের কাজ শুরু হয়েছে।

যেহেতু মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটা বড় সংখ্যক স্বনিযুক্তি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাই বৃত্তিমূলক কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত দু'বছরে মা-মাটি-মানুষের সরকারের উদ্যোগে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৬১ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এতে সরকারের খরচ হয়েছে ৪০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। আবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার জন্য, মুসলিম পরিবারের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের বিনা ব্যয়ে সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানমুখী প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুসলিম প্রধান এলাকায় ২৪টি আইটিআই এবং ৭টি পলিটেকনিক কলেজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এমএসডিপি প্রকল্পের পরিকাঠামোগত সহায়তায় এগুলি দেখাশোনা করা হবে। রাজ্য সরকারের প্রযুক্তি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এগুলি পরিচালনা করবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১১১টি হস্টেল তৈরি হচ্ছে।

> **কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য বন্ধ করা সত্ত্বেও জঙ্গলমহল, সুন্দরবন এবং চা বাগানের অনাহারে থাকা শ্রমিকদের জন্য বিপুল ভরতুকি দিয়ে সস্তায় চাল-গম দিয়ে চলেছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। বাম জমানার প্রশাসকদের উদাসীনতায় যাঁরা পিছিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য মাত্র দু'বছরে সম্পূর্ণ করেছে সরকার।**

সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম মারফত সংখ্যালঘুদের ২৭০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা শুধুমাত্র মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, গত দুই বছরে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৫১ জন সংখ্যালঘু ছাত্র-যুবককে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। গীতাঞ্জলি আবাসন প্রকল্পের অধীনে সংখ্যালঘুদের আবাসগৃহ নির্মাণে এখনও পর্যন্ত ২৯৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৮ হাজার ৫৬৫টি আবাসগৃহ তৈরি করে গৃহহীন মুসলিম পরিবারকে তুলে দেওয়া হয়েছে। গত দু'বছরে ৭৩৬টি কবরস্থান পাকা ও সৌন্দর্যায়িত করার জন্য ৪০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষায় শুধুমাত্র আর্থিক অনুদান বা উচ্চতর শিক্ষাক্রম উন্নীতকরণ নয়, কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ৮০ হাজার পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়েছে। ২০১২-১৩ সালে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮৭০ ছাত্র-ছাত্রীকে পোশাক ভাতা দেওয়া হয়েছে। ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১২ হাজার। মুখ্যমন্ত্রী যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীকে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষায় সমৃদ্ধ

করতে চাইছেন তার প্রমাণ ৪২৪টি মাদ্রাসায় ল্যাবরেটরি আধুনিকীকরণ খাতে বরাদ্দ করেছেন। এছাড়া সংখ্যালঘু প্রধান জেলাগুলিতে পাঠাগারের উন্নয়ন, রিডিং রুম, মহিলাদের কমনরুম, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার, মাদ্রাসার জন্য বিভিন্ন আসবাব ও উপকরণ এবং অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যালঘু ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহ দিতে এবং স্কুলছুটের হার কমাতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ২ জনকে সাইকেল তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ১৮টি জেলায় ১৮টি সংখ্যালঘু ভবন তৈরির কাজ চলছে। এর মধ্যে সাতটির কাজ সম্পূর্ণ। সবচেয়ে বড় কথা, সংখ্যালঘুদের স্ব-নিযুক্তির মাধ্যমে কিছু জিনিস তৈরি করে তা বাজারজাত করার জন্য ৪৩টি মার্কেটিং-হাব তৈরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১৬টির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। দ্রুত সম্পূর্ণ হলে কর্মসংস্থানে সুবিধা পাবেন মুসলিম সমাজের চাষি ও পাইকারি বিক্রেতারা।



বলতে লজ্জা হয়, বাম জমানার দু'জন মুখ্যমন্ত্রী যে জেলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা দেশের অনগ্রসর জেলার তালিকায় প্রথম দিকে ছিল। শিক্ষা ও সরকারি কর্মসংস্থানের নিরিখে দেশের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিয়ে অনগ্রসর ও সংখ্যালঘুদের গত দু'বছরে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ দিনের কাজে জঙ্গলমহল ও পাহাড়ে সাফল্য এনে দেশের মানচিত্রে রাজ্যকে গর্বিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতে করে একদিকে যেমন অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে অন্যদিকে তেমনি গ্রামীণ ও পর্যটনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, মহাকরণে বসে নয়, দু'বছরে প্রতিটি জেলায় একাধিকবার সশরীরে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলার অন্ত্যজ গ্রামের বাসিন্দারা সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন রাজ্যের অভিভাবক কে, তিনি কী চাইছেন, কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। স্বাধীনতার পর দেশের কোনও রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী যে অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের জন্য এমন দরদ দিয়ে কোনও প্রকল্প ও পরিষেবা হাতে তুলে দেননি তা আজ স্বীকার করছেন বহু প্রবীণ বামপন্থীও। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য বন্ধ করা সত্ত্বেও জঙ্গলমহল, সুন্দরবন এবং চা বাগানের অনাহারে থাকা শ্রমিকদের জন্য বিপুল ভরতুকি দিয়ে সস্তায় চাল-গম দিয়ে চলেছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। বাম জমানার প্রশাসকদের উদাসীনতায় যাঁরা পিছিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য মাত্র দু'বছরে সম্পূর্ণ করেছে সরকার।

তবে শুধুমাত্র অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষা পরিকাঠামো প্রকল্পের অধীনে ১১টি অনগ্রসর জেলায় ১০৫টি ছাত্রী আবাস, জঙ্গলমহলের তিন জেলায় ২৩টি নতুন স্কুলবাড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় ৬টি নতুন স্কুলবাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের ১১টি অনগ্রসর জেলায় ১১টি নতুন স্কুলবাড়ি ও ১১টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। সবচেয়ে বড় কথা, নির্মাণে স্বচ্ছতা ও গতি আনতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ১৫৬টি প্রকল্প [এর মধ্যে ৭২টি পিডব্লু (সি পি) ও ৮৪টি এইচআরবিসি-কে দিয়ে নির্মাণ শুরু করিয়েছে রাজ্য সরকার]।

বাম জমানায় সিপিএমের মদতে মাওবাদীদের তাণ্ডবে ক্ষত-বিক্ষত জঙ্গলমহলের তিন জেলায় (পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৭টি, বাঁকুড়ায় ৯টি, পুরুলিয়ায় ৮টি) ছাত্রীদের জন্য ৩৪টি হস্টেল নির্মাণ শুরু করেছে রাজ্য। ৫টি হস্টেল তৈরির কাজ সম্পূর্ণ। ২০১৩ এর মধ্যেই বাকিগুলি সম্পূর্ণ হবে। গত দু'বছরে শুধুমাত্র জঙ্গলমহলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে ৪১,১১১টি বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। জঙ্গলমহলের স্কুলগুলি মসৃণভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত ৮৮৪ জন অলচিকি-সাঁওতালি ভাষার পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩৩৫ জন, বাঁকুড়ায় ২৬৫ জন, পুরুলিয়ায় ২৮৪ জন আদিবাসী পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন।

কৃষি শ্রমিকদের অভাব দূর করতে এবং নিরবচ্ছিন্ন কৃষিকাজে ব্যয় কমানোর জন্য কৃষকদের ভরতুকিতে কৃষি সংশ্লিষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। কৃষকদের বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে ৬৬,০৪২ জন কৃষককে ভাতা দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের জন্য কিষান-মান্ডি থেকে শুরু করে নানা সহায়ক সরঞ্জাম বিলি হয়েছে, এমনকী পোলট্রি চাষের জন্য মুরগির বাচ্চাও বিলি করেছে রাজ্য সরকার। নানা স্বনির্ভর প্রকল্পে লক্ষাধিক মহিলাকে আর্থিক সাহায্য ও সরঞ্জাম দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

নিবন্ধ



দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার

অরূপ বিশ্বাস

একসময় কেউই এভারেস্টের শীর্ষে ওঠার ভাবনাই মাথায় আনেনি। নেপালি শেরপা তেনজিং নোরগে আর নিউজিল্যান্ডের এডমন্ড হিলারি স্বপ্ন সফল করে দেখিয়েছিলেন। এই বছর সেই এভারেস্ট জয়ের ৬০ বছর।



শেরপা হিসাবে তেনজিং নোরগের কৃতিত্বকে সাফল্যের মাপকাঠিতে কোনওমতেই অস্বীকার করা যায় না। নোরগের বংশধর যে প্রথম এভারেস্ট আরোহণের কৃতিত্বের দাবিদার হিসাবে যৌথভাবে হিলারি ও তেনজিংকে সমভাবে দেখার যে দাবি করেছেন, তাকেও অন্যায় বলা যাবে না। হতে পারে, এভারেস্টে উঠতে গেলে হিলারি স্টেপ পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে নোরগে স্টেপও কেন থাকবে না?

এভারেস্টের সঙ্গে বাঙালির নামও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাধানাথ শিকদার যবে এভারেস্টের উচ্চতা মেপেছিলেন, তার পর থেকেই পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা কিছুটা কমছে। যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েই ভেবেছিলাম, কেন বাঙালিরা পারবে না। কেন উচ্চতম শৃঙ্গে বাংলার পতাকা উড়বে না? ছোটবেলা থেকেই পর্বতাভিযানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতাম। মুখ্যমন্ত্রী প্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা ছিলই। তাঁর আশীর্বাদকে পাথেয় করেই স্বপ্ন-ভাবনা সফল করতে লেগে পড়েছি।

সফলতা এসেছে। দফতরের কর্মীদের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা আর কাজের প্রতি নিষ্ঠায় সব সম্ভব হয়। সেটাই মেনে চলছি। এভারেস্টের উচ্চতা ৮৮৪৮ মিটার (২৯,০২৮ ফুট)। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে প্রথম এই শৃঙ্গ জয় করেন। পরবর্তী ৬০ বছরে বাংলা থেকে মোট ছ'জন এই শৃঙ্গ জয় করেছেন। ২০০৪ সালে সামরিক বাহিনীর সত্যব্রত দাম প্রথম বাঙালি হিসাবে সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ওঠেন। নৌবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সত্যব্রত দাম। ২০০৫ সালে প্রথম মহিলা হিসাবে এভারেস্ট জয় করেন শিপ্রা মজুমদার। তিনিও সামরিক বাহিনী, সেনার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ২০১০ সালে বসন্ত সিংহরায় ও দেবাশিস বিশ্বাস অসামরিক বাঙালি হিসাবে প্রথম সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পদার্পণের নজির গড়েন। ২০১১ সালের ২১ মে সাফল্য আসে দীপঙ্কর ঘোষ ও রাজীব ভট্টাচার্যের। উল্লেখযোগ্যভাবে একদিন আগেই জনপ্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শপথ নিয়েছিল মা-মাটি-মানুষের সরকার।

কিন্তু, আমি গর্বিত। কারণ, চলতি বছরেই আমাদের রাজ্যের চারজন এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয় করেন। গত ৫৯ বছরে সাধারণ বাঙালি হিসাবে যতজন এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখেন, মাত্র এক বছরেই সেই সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলেছি। বলতে আপত্তি নেই, বাম জমানায় মাত্র দু'জন অসামরিক বাঙালি সর্বোচ্চ শৃঙ্গের শীর্ষে পৌঁছন, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছেন মোট ছ'জন। আমরা গর্বিত শ্যামপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উজ্জ্বল রায়, ছন্দা গায়েন, টুসি দাস ও দেবাশিস নন্দীর জন্য। আসলে যাঁরা পর্বতাভিযানে অংশ নেন, তাঁরাই জানেন কী কষ্টসাধ্য! কতটা পরিশ্রম করতে হয়। সারা সময়ের মেহনত ঝুলে থাকে ওই দীর্ঘক্ষণ লড়াইতে। একটা সুতোয় ঝুলে থাকে জীবনের ভাগ্য। ওঁদের কাছেই শুনেছি, এভারেস্টের বর্তমান পরিস্থিতি। অন্তত সাত-আটটি মৃতদেহ ঘিরে রয়েছে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের চারধার। এমনকী একটি মরদেহ এমনভাবে পড়ে রয়েছে যে সেটি টপকেই পা রাখতে হবে 'হিলারি স্টেপ'এ। বেস ক্যাম্পে কালোবাজারে নাকি বিক্রি হয় অক্সিজেন সিলিন্ডার। এমনও হয়!

এভারেস্ট জয়ী চার বাঙালিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ওঁদের স্যুট পিস, মিষ্টি ও ফুল দিয়েছেন। সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন ও যুবকল্যাণ দফতরের পতাকা তুলে ধরেছেন গর্বের বাংলার গর্বিত প্রতিনিধিরা। অভিনন্দন বা ধন্যবাদ দিয়ে ওঁদের বিন্দুমাত্র ছোট করতে চাই না। ২০১২-১৩ সালে ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে মাউন্ট পাপশুড়া, মাউন্ট মনিরাং ও কুলু-মাকালু শৃঙ্গ অভিযানে তিনটি অভিযাত্রী দলকে উৎসাহ দেওয়া হয়। পুরো অর্থ-সাহায্যই করেছে যুবকল্যাণ দফতর। আর যাঁরা নানাভাবে কোনও উঁচু অভিযানে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের সবমিলিয়ে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এমন কোনও পর্বতশৃঙ্গ নেই, যেখানে বাঙালির পা পড়েনি। সান্দাকফু থেকে শুরু করে কালিন্দী, থালেয়সাগর, দেওতিব্বা, ভাগীরথী-২, গ্যাংস্টং, প্লুটেড, পোলোগঙ্খা, কামেট। কী নেই! আমরা গর্বিত। ছন্দা-টুসিরাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য ও অন্যান্য সহায়তা না পেলে যে এই জয় এত সহজ হত না, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন প্রত্যেকে। এটাই আমাদের পাওনা।

এই সাহসীদের মতো আরও হাজারো সাহসী বাঙালি এগিয়ে আসুন দুর্গম-গিরি অভিযানে। বাংলায় সাহসের অভাব নেই। অভাব যা ছিল, তা সরকারি আনুকূল্যের আর বেসরকারি সাহায্যের। সেটাই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বদলে দিতে চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি মাত্র। আগামী প্রজন্মের মধ্যে যদি অসাধ্য-সাধনের ইচ্ছাকে একটু উসকে দিতে পারি, তাহলেই অনেকটা এগনো সম্ভব। এই প্রসঙ্গেই স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করতে হবে। তাঁকে আদর্শ করে এগোলেই উদ্বুদ্ধ হবে বাঙালি। আমাদের নেত্রীও একথাই বলেন। মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর যুবকল্যাণে বাজেট বরাদ্দ কয়েকগুণ বেড়েছে। গত আর্থিক বছরে পর্বতারোহণ ও রোমাঞ্চক ক্রীড়া খাতে মোট খরচের পরিমাণ ছিল ৯৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। এবার শুধু এই



এভারেস্টে শৃঙ্গজয়ী বঙ্গললনা ছন্দা গায়েন

খাতেই বাজেট বরাদ্দ দু'গুণ বেড়ে হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা। দফতরের বাজেট বাম জমানায় ছিল মাত্র ২০ কোটি, এবার ছ'গুণ, ১২০ কোটি টাকা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশনকে নতুনভাবে গঠন করা হয়েছে। কমিটির উপদেষ্টা হয়েছেন সদ্য এভারেস্ট জয়ী উজ্জ্বল রায়। কমিটির চেয়ারপার্সন মুখ্যমন্ত্রী। কার্যনির্বাহী সভাপতি দফতরের মন্ত্রী হিসাবে আমি। সদস্যদের মধ্যে আটজনই এভারেস্ট জয়ী। যাঁরা দক্ষ, তাঁদের প্রতিনিধিত্বই আমরা চেয়েছি। পাশাপাশি প্রোজেক্ট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্যও আলাদা কমিটি তৈরি হয়েছে। সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের 'আর্টিফিসিয়াল রক ওয়াল'টির আমূল সংস্কার করা হয়েছে। বোল্ডার ক্লাইম্বিংয়ের জন্য শুরু হয়েছে একটি বোল্ডার। ৫৫ লক্ষ টাকায় নতুন অত্যাধুনিক সরঞ্জাম কেনা হচ্ছে। আগে এই সব সরঞ্জামের অভাব ছিল। বারবার পর্বতাভিযানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, অন্য দেশের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম জরুরি। স্বামী বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আগে লাইব্রেরিও ছিল না। সেটি তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে নবনির্মিত সুসজ্জিত অফিস। কনফারেন্স রুমের আমূল সংস্কার করে ১০০ আসনের অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হল হয়েছে। জিমন্যাসিয়াম ও আরও নানা সংস্কার হয়েছে।

এ বছর থেকেই রাধানাথ শিকদার ও তেনজিং নোরগের নামে পুরস্কার চালু হয়েছে। পুরস্কারমূল্য এক লক্ষ টাকা। এবার এই পুরস্কার বিজয়ী আট এভারেস্ট জয়ী। পাঁচ অক্টোবর ঐতিহাসিক টাউন হলে সম্মানিত তাঁরা। সাধারণ মানুষের মধ্যে রোমাঞ্চক অভিযানকে উৎসাহ দিতে বেশ কয়েকটি ক্লাবকে বাছা হয়েছে। যাঁরা এই অভিযান নিয়মিতভাবে করে আসছেন। তাঁদের নাম নথিভুক্তকরণ করা হয়েছে। বলতে খারাপ লাগে, আগে এই সব ক্লাবদের অর্থ-সাহায্য তো দূরের কথা, ভাল ব্যবহারও করা হত না। মোট ৬২টি ক্লাব এই নথিভুক্তিকরণে অংশ নিয়েছে। ধন্যবাদ প্রত্যেককে। স্বামীজির জন্মের সার্ধশতবর্ষকে মাথায় রেখে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমণের পথ ধরে তিন সদস্যের এক সাইকেল অভিযাত্রী দল প্রায় সাড়ে ন'হাজার কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করেছেন। ওঁরাও আমাদের অংশ। স্বামীজির চিন্তাভাবনাই ছড়িয়ে দিতে হবে। সবার প্রচেষ্টা চাই। ঘুমিয়ে থাকা এই বাঙালি খুব অচিরেই জেগে উঠবে। কোনও দুর্গমতা আর অন্তরায় হবে না আমাদের। অমানিশার বেড়া ভাঙতে শুরু করেছে। আমরা জিতবই।

ফেডারেল ফ্রন্টের ডাক এক সময়োচিত পদক্ষেপ

সৌগত রায়





তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে বা পরে একটি ফেডারেল ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন। এই ফেডারেল ফ্রন্টে যে আঞ্চলিক দলগুলির বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা নেই, তারা থাকবে। আমার মতে এই ডাক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, তার কারণ এরকম একটি ফ্রন্ট রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলি তুলে ধরতে পারবে ও রাজ্যগুলির ন্যায়বিচারের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

খুবই লক্ষণীয় যে এই ফেডারেল ফ্রন্টের ডাক মমতা সেইদিনই দিয়েছেন, যেদিন বিজেপিতে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের প্রশ্নে নীতীশ কুমার এনডিএ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এটা স্পষ্ট যে নরেন্দ্র মোদি একজন এমন ব্যক্তিত্ব যিনি রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটান। বিজেপি ও আরএসএসের কর্মীরা যেমন তাঁর উত্তরণে খুশি হবেন, এনডিএ-র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমর্থকের সংখ্যা কমবে। জেডি (ইউ)-এর এনডিএ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তা প্রমাণ করেছে। এর ফলে বিজেপির নিজস্ব আসন বাড়লেও এনডিএর আসন সেই অনুপাতে বাড়বে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ২০১৪-র পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্তর খুঁজতে হবে। এখনও পর্যন্ত আমাদের আশ্রয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠীর করা সমীক্ষা বা ওপিনিয়ন পোল-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমীক্ষা করেছে 'ইন্ডিয়া টুডে' গোষ্ঠী। তাদের হিসাবমতো আগামী নির্বাচনে ইউপিএ পাবে ১৩০-১৩৫ আসনের কাছাকাছি, এনডিএ পাবে ১৭০-১৭৫ আসনের কাছাকাছি। এবং থার্ড ফ্রন্ট পাবে ২৬০টির কাছাকাছি। এই থার্ড ফ্রন্টে থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস, জেডি (ইউ), বিজেডি, এআইএডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, বিএসপি এবং তেলুগু দেশম। পরে ওয়াইএসআর কংগ্রেসও এতে যোগ দিতে পারে, একইভাবে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি (টিআরএস) এই ফ্রন্টে যোগ দিতে আগ্রহী।

এই সমীক্ষা কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য, কেননা কংগ্রেসের অবস্থা খারাপ। ২০০৯তে তারা ২০৬টি আসন পেয়েছিল, যার মধ্যে অন্ধ্রেই ছিল ৩৩টি আসন। এবার অনেক লোকের মতে অন্ধ্রে তারা ৫টি আসন পাবে। একইভাবে উত্তরপ্রদেশে তাদের আসন ২২ থেকে কমে ৫টিতে দাঁড়াবে। একমাত্র কর্নাটকে কংগ্রেসের আসন বাড়তে পারে। একইভাবে বলা যায় যে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গুজরাতে নিশ্চয়, ইউপি ও বিহারে বিজেপির আসন বাড়তে পারে, কর্নাটকে আসন কমবে। এককভাবে বিজেপির আসন ১২০ থেকে বেড়ে ১৫০ বা ১৫৫ হতে পারে। বর্তমানে কংগ্রেসের সঙ্গে ইউপিএতে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) ছাড়া আর কেউ নেই, বিজেপির সঙ্গেও শিবসেনা ও অকালি দল ছাড়া অন্য কোনও জোটসঙ্গী নেই। তৃতীয় ফ্রন্ট বেশি আসন পেলে কংগ্রেস ও বিজেপির বর্তমান জোটসঙ্গীরা তৃতীয় ফ্রন্টে যোগদান করতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেস, জনতা দল (ইউ), বিজু জনতা দল, এআইএডিএমকে প্রতিটি দল নিজের রাজ্যে এককভাবে ক্ষমতায় আছে এবং যথেষ্ট আসন পাওয়ার জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজবাদী পার্টিও উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় আছে, বিএসপি তার প্রধান বিরোধী দল। কিন্তু উভয়েই বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না, উপরোক্ত সবক'টি দলই লোকসভা নির্বাচনে ভাল করবে বলে সমীক্ষকদের ধারণা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস তো লোকসভায় ৩২টি আসন পেতে পারে। যদি ইউপিএ ও এনডিএ-র বাইরের আঞ্চলিক দলগুলি ২৩০টা আসন পায়, তারা কংগ্রেস ও বিজেপিকে বাদ দিয়ে সরকার গড়তে পারে ও চালাতে পারে। ঠিক যেমন নরসিংহ রাওয়ের সরকার ২৩২টি আসন নিয়ে পাঁচ বছর সরকার চালিয়েছিল। এক্ষেত্রে কংগ্রেস বা বিজেপি আলাদাভাবে তাঁকে ফেলতে পারবে না। আবার কংগ্রেস এবং বিজেপির পক্ষে এক হয়ে তাকে ফেলা রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব হবে।





যেটা দরকার হবে, সেটা হল এই ফেডারেল ফ্রন্টের একটি অভিন্ন কর্মসূচি তৈরি করা—যার সবচেয়ে জরুরি বক্তব্য থাকবে যে কেন্দ্র এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। যা রাজ্যের মানুষের অসুবিধা হবে যেমন রেলের ভাড়া বা পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি তা রাজ্যগুলির সঙ্গে একমত হয়ে করতে হবে। দেশের গরিব মানুষের স্বার্থে কিছু ন্যূনতম পদক্ষেপ নেওয়া হবে—বিশেষভাবে সংখ্যালঘু, তফসিলি ও আদিবাসী মানুষের ক্ষেত্রে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক — পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করার জন্য একটি নতুন কমিশন গঠন করা হবে ইত্যাদি।

অনেকে বলেন যে এই ধরনের ফেডারেল ফ্রন্টের পক্ষে নেতা নির্বাচন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তার কারণ অধিকাংশ আঞ্চলিক দলের নেতারাই নিজের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে আসতে চাইবেন না। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের সময় নেতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ও জ্যোতি বসু না করার পর, অনেক বুঝিয়ে দেবগৌড়াকে রাজি করানো হয়। তবে নেতা এমন একজনকে করা দরকার যিনি বিবদমান ইগোকে সামলে নিতে পারবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্য আঞ্চলিক দলগুলিকে এখন থেকেই পারস্পরিক আলোচনা শুরু করতে হবে যাতে নির্বাচনের পর অভিন্ন কর্মসূচি ও নেতা নির্বাচনে বেশি টানাপোড়েন না হয়।

তবে অবস্থা প্রতিদিন পাল্টাচ্ছে ও পাল্টাবে। কংগ্রেস এখনও চেষ্টা করছে খাদ্য নিরাপত্তা আইন ও ভূমি অধিগ্রহণের নতুন আইন নিয়ে গরিব মানুষকে কাছে টানতে। নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নের স্লোগান শহরের যুবাশ্রেণিকে নতুন করে টানছে। সব আঞ্চলিক দলগুলিই নিজ নিজ রাজ্যে নতুন জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করছে। তাছাড়া বিভিন্ন ঘটনাও রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টে দিচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে মুজফফরনগরের দাঙ্গা জাঠ ও মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা সমীকরণ ভেঙে দিয়েছে—যার ফলে রাষ্ট্রীয় লোকদল ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও বিজেপি লাভ করবে। তেলেঙ্গানার নতুন রাজ্য গঠনের পর কারা সেখানে সুবিধা পাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়—বামফ্রন্টের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে ভাল নয় কেরলে কতটা ভাল করতে পারবে তা দেখার।

এছাড়া নভেম্বরে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও দিল্লিতে নির্বাচন হবে। এই রাজ্যগুলিতে লড়াই মূলত কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে। যে দল এই বিধানসভা নির্বাচনে ভাল করবে, তারা লোকসভা নির্বাচনে কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় থাকবে, যদিও ২০০৪-এ এই নির্বাচনগুলিতে ভাল করার পর বিজেপি 'ইন্ডিয়া শাইনিং' স্লোগান দিয়ে লোকসভায় হেরে গিয়েছিল।

গতকাল টাইমস নাও—সিভোটার সার্ভে বেরিয়েছে। সেটা বলছে যে বিজেপি মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে আবার জিতবে আর রাজস্থান কংগ্রেসের থেকে ছিনিয়ে নেবে। দিল্লি ত্রিশঙ্কু হবে। আম আদমি পার্টির হাতে তুরুপের তাস থাকবে। মোদির পক্ষে ভাল খবর, রাহুলের পক্ষে খারাপ।

দেওয়ালের লিখন এখনও স্পষ্ট নয়। তাও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ফ্রন্টের ডাক দিয়েছেন তা সময়োপযোগী— এবং এই লক্ষ্যেই আমাদের এগোতে হবে।



প্রসঙ্গ থিয়েটার

ব্রাত্য বসু



১

রুশ সাহেব লিয়েবেদফ কলকাতায় এসে কলোনির কামিনাদের দিয়ে যে দু'টি কলোনি 'থেটার' উপহার দিলেন সতেরোশো পঁচানব্বই'তে — তার প্রথমটির নামেও রয়েছে ওই কলকাত্তাইয়া কলোনিয়াল অনুপ্রাস 'কাল্পনিক সংবদল'।

এ কথাও কাকতালীয় নয়, ওই যে দু'টি নাটক অভিনীত হল এজরা স্ট্রিট বা পঁচিশ নম্বর ডোমতলাতে, সেই দু'টিই আদতে অ্যাডাপটেশন। প্রথমটির রচয়িতা জনৈক জোড়্রেল, নাটকটির নাম : 'দ্য ডিসগাইজ' এবং দ্বিতীয়টি শ্রুতকীর্তি মলিয়ের, নাটকের নাম : 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর'। অর্থাৎ এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য — ওই ঔপনিবেশিক থিয়েটার, যে বাচ্চাটির ভূত এবং বর্তমান দুইই আমরা এখনও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, তার প্রথম দু'টো নাটকই ছিল অ্যাডাপটেশন।

২

লিয়েবেদফ নিঃসন্দেহে কমার্শিয়াল ছিলেন। থিয়েটারকে তিনি শিল্প বা আমোদ হিসেবে শুধু দেখেননি, থিয়েটারের নিজস্ব

নগদবিদায়ের বা দিন-আনি-দিন-খাইয়ের গপ্পোটা ভালই বুঝতেন। বুঝতেন বলেই লিয়েবেদফ পরবর্তীকালে তাঁর লেখা হিন্দুস্থানি ব্যাকরণ বইয়ের ভূমিকায় জানাচ্ছেন যে, তিনি খেয়াল করেছিলেন 'এ দেশিয়েরা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা, সে যতই বিশুদ্ধভাবে পরিবেশিত হোক না কেন — অনুকরণ, ভাঁড়ামি আর হাসিতামাশা বেশি পছন্দ করে, সেই জন্যই আমি চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দু'খানি নাটকই নির্বাচন করেছিলাম।' অর্থাৎ একদিকে রগড়, আমোদ তথা তামাশাপূর্ণ অ্যাডাপটেশনের পথ অন্যদিকে সিরিয়াস বশীকরণ — এই পথই খোলা রেখেছিলেন এই রুশ নাট্যবাবসায়ী — দুই খদ্দেরকেই চেয়েছিলেন তিনি। সাহেবও আসুক, নেটিভও আসুক। বাংলার প্রথম ডিরেক্টরের চাওয়ার এই বিশেষ প্যাটার্ন কী অদ্ভুতভাবেই না পরবর্তী রূপান্তর চর্চায় বাংলা থিয়েটারকে নানা খাঁজেখোঁজে উল্টেপাল্টে দিল, তা এক রহস্য।

লিয়েবেদফের পর বাংলা নাটক প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে (মৌলিক নাটক ছাড়া) প্রধানত হয় অনুবাদ, নয়তো বঙ্গীকরণের পথ বেছে নিয়েছিল। বঙ্কিম যেখানে স্কট বঙ্গীকরণের ('দুর্গেশনন্দিনী') পাশাপাশি শেক্সপিয়রের রূপান্তর ঘটাচ্ছিলেন ('কপালকুণ্ডলা')। বাংলা নাটক সেখানে হয় সরাসরি অনুবাদ — ভবভূতি বা কালিদাস বা 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এর বঙ্গীকরণ — 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' বা 'চারুমুখচিত্তহরা' ('রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট') ইত্যাদি থিয়েটারে কনসার্ট বাজাচ্ছিল। এই দুই বঙ্গীকরণের ভিসা-দাতা হরচন্দ্র ঘোষ।

৩

অনুবাদের কুটুম অ্যাডাপটেশনের বাংলা তা হলে কী হবে? রূপান্তর? বঙ্গীকরণ? স্থানীকরণ? জোড়রেল-এর নাটকটার ঘটনা ছিল স্পেনে, লিয়েবেদফ তাকে পাল্টে করলেন কলকাতা আর লখনউ। এটা তা হলে খানিকটা বঙ্গীকরণ আর খানিকটা ভারতীয়করণ। যদি লিয়েবেদফ পুরো নাট্যবস্তু কলকাতা শহরে আঁটিয়ে নিতেন, আমরা বলতাম এ হল বঙ্গীকরণ তথা স্থানীকরণ। আর যদি তিনি জোড়রেলের বা মলিয়ের-এর নাটক দু'টিকে ওড়িয়া ভাষায় করে, ভুবনেশ্বরে ঘটনাটা পাল্টে নিতেন আমরা বলতাম বিলিতি বা ফরাসি নাটকের ওড়িয়াকরণ। আবার কেউ যদি 'ম্যাকবেথ'-কে অন্য পটভূমিকায় আনা প্রেক্ষিতে অন্য চরিত্রচিত্রণে এমনকী, অন্য শিল্পে বদলে নেন, তা প্রথমত রূপান্তর, এবং সেটা যদি অন্য কোনও ভাষায় অভিনীত হয় তবে হয়ে ওঠে, ধারা যাক 'মকবুল' — ম্যাকবেথ-এর হিন্দকরণ। 'দর্পণ' যেমন পুব বাংলায় হ্যামলেট-এর এক বাঙাল বঙ্গীকরণ। ঋতুপর্ণ ঘোষ যেমন বাংলা নাটক 'আজকের সাজাহান'-কে রূপান্তর করেন 'লাস্ট লিয়ার'-এ নাটকের রূপ রূপান্তরিত হয় চলচ্চিত্রে, ইংরেজি ভাষায় করা হয় — কিন্তু দু'টোর বিষয়বস্তু বঙ্গীকৃত-ই থাকে, কারণ দু'টোরই ঘটনাস্থল কলকাতা। অন্যদিকে রামগোপাল ভার্মা যখন রমেশ সিপ্পির 'শোলে'-কে নতুন সময়ে, নতুন বয়ানে হাজির করেন, ওই একই হিন্দি ভাষায়, তা হয়ে ওঠে 'রিমেক'। একই গল্প, একই ভাষা, এমনকী, মাঝেমাঝে একই সংলাপ (ফারহান আখতারের 'ডন' স্মর্তব্য) — শুধু সম্পূর্ণ নতুন উপস্থাপনা। অর্থাৎ রিমেক মানেই খানিকটা লোকালাইজেশন, কিন্তু লোকালাইজেশন মানেই রিমেক নয়। আরও খোলসা করে বলতে গেলে লিয়েবেদফ বঙ্গীকরণ করেছিলেন, ঋতুপর্ণ করেছেন রূপান্তর আর রামগোপাল ভার্মা করলেন পুনর্নির্মাণ। তিনটের কোনওটাই অনুবাদ না হলেও তার জ্ঞাতি-গুষ্ঠী তো খানিকটা বটেই। তত্ত্ব দিতে হলে আরও ওইসব বিনির্মাণ-অবিনির্মাণ নানান কুটুম এদের মাঝে আসতে পারে, তবে তা এই তিন জ্ঞাতিভাইয়ের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করবে। এই তিনভাই হল লোকালাইজেশন, অ্যাডাপটেশন এবং রি-কনস্ট্রাকশন। ধরুন, যদি কেউ তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসকে বাংলার পটভূমিকায় ফেলে নতুন ত্রিকোণ সম্পর্কের উন্মোচন ঘটিয়ে নাটক করেন, আমরা তবে বলব, তিনি শুধু রূপান্তর করেছেন তাই নয়, তিনি স্থানীকরণও করেছেন। শুধু অন্য শিল্পে ট্রান্সফার নয়, তাকে লোকালাইজড করেছেন। অর্থাৎ আমরা বিষয়টা দেখতে চাইছি এইভাবে —

অনুবাদ (Translation)
আত্তীকরণ (Adaptation)
স্থানীকরণ (Localisation) রূপান্তরন (Transformation) পুনর্নির্মাণ (Remake)

৪

লিয়েবেদফের পর বাংলা নাটক প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে (মৌলিক নাটক ছাড়া) প্রধানত হয় অনুবাদ, নয়তো বঙ্গীকরণের পথ বেছে নিয়েছিল। বঙ্কিম যেখানে স্কট বঙ্গীকরণের ('দুর্গেশনন্দিনী') পাশাপাশি শেক্সপিয়রের রূপান্তর ঘটাচ্ছিলেন ('কপালকুণ্ডলা')। বাংলা নাটক সেখানে হয় সরাসরি অনুবাদ — ভবভূতি বা কালিদাস বা 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এর বঙ্গীকরণ — 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' বা 'চারুমুখচিত্তহরা' ('রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট') ইত্যাদি থিয়েটারে

কনসার্ট বাজাচ্ছিল। এই দুই বঙ্গীকরণের ভিসা-দাতা হরচন্দ্র ঘোষ। বাংলা উপন্যাসের প্রায় দশ বছর পরে (হরচন্দ্র-র লেখা দু'টি ১৮৫৩ এবং ১৮৬৪ এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখা ১৮৬৪-তেই) বঙ্গীকৃত হল এবং গোড়াতেই ভাবনার এই অভিনবত্বে বাংলা নাটককে তা দু'গোল মেরে দিল। একদল, নাটুকে রামনারায়ণ থেকে দীনবন্ধু থেকে মাইকেল মৌলিক বাংলা নাটক লিখতে চাইছেন। অন্যদিকে হরচন্দ্ররা বেকন বা হিউম বাংলায় অনুবাদ করলেও নাটক লিখতে বসে কোনও 'আইভান হো'-কে রূপান্তরের কথা ভাবতে পারছেন না। তার কারণে বোদহয় লিয়েবেদফের ওই প্রাগুক্ত ভূমিকায় যে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে, তাতে পাওয়া যেতে পারে। পরে যখন গিরীশচন্দ্র সরাসরি শেক্সপিয়র অনুবাদ করছেন ছাড় (যেমন 'নূরজাহান'-এ 'হ্যামলেট' বা 'সাজাহান'-এ কিং লিয়ার) তখনও কেউ রূপান্তরের কথা ভাবছেন না। ডিকেন্স বা স্কট সরাসরি অধরা থাকছে। অথচ টেমপেস্ট-এর প্রথম বঙ্গানুবাদ হয়ে গিয়েছে সেই ফোর্ট উইলিয়াম আমলে — জনৈক ছাত্র মংকটন বাংলায় নামিয়ে দিয়েছেন ১৮০৯-এ। 'দুর্গেশনন্দিনী' যে বছর প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে, সেই '৬৪-তে বারোটি নতুন বাংলা নাটক অভিনীত হচ্ছে বঙ্গদেশে — তার মধ্যে দশটি মৌলিক — একটি ওই হরচন্দ্র-র 'চারুমুখচিত্তহরা', অন্যটি সরাসরি অনুবাদ — নিমাইচাঁদ শীলের 'কাদম্বরী'।

৫

গুরুদেব অবশ্য অ্যাডাপটেশন-এর ধার কোনওদিন ধারেননি। সম্ভবত বিষয় নিয়ে তাঁকে কোনওদিন পীড়িত হতে হয়নি বলে। 'মালিনী'-র পর তিনি যে বারোটি বচ্ছর কোনও নাটক লেখেননি, তার কারণ বিষয় নয়, নাট্যাদর্শ। কিন্তু তিনি যে হাতড়াচ্ছিলেন ওরই মাঝে, তার প্রমাণ 'মালিনী'-র ছ'বছর পরে লেখা বিখ্যাত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ। আরও ছ'বছর পরে ১৯০৮ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধরনটাই বদলে গেল। হ্যাঁ, ওই ধরনটাই — ফলে 'শারদোৎসব' থেকে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত নানা উপাদান — বৌদ্ধ কাহিনি থেকে রূপকথা — তাঁর নাটকে এসেছে মঞ্চসজ্জার বিবরণ ব্র্যাকেটে ক্রমশ তাঁর নাটকে নিরাভরণ হয়েছে, কিন্তু ওই অ্যাডাপটেশনের ঝামেলিতে তিনি কোনওদিন ঢোকেননি। অনেকে অবশ্য 'ডাকঘর'-এ মেতারলিঙ্ক-এর প্রভাব দেখতে পান, তবে তা ওই প্রভাবই, যা হয়তো মেতারলিঙ্কের ওপর রবীন্দ্রনাথেরই বেশি আছে। রবীন্দ্রনাথ, তিনি আসলে খুঁজছিলেন কমিউনিকেশনের একটি নতুন 'নাট্যাদর্শ' — তাঁর মতো সৃজনশীল চিন্তকের পক্ষে যা সবচেয়ে স্বাভাবিক। ফলে আমার বিবেচনায়, ১৯০৮ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনায় যে নতুন ধরনের টেক্সট জন্ম নিল — তা শুধুমাত্র কোনও নাট্যকারের রূপক-সাংকেতিক-প্রতীক কণ্টকিত শব্দগুচ্ছের ঝনঝনানিতে আটকে থাকা পিএইচডি-র সমারূঢ়তা নয়, বরং তা একজন নাট্য-নির্দেশকের নতুনভাবে কমিউনিকেশনের নতুন টেক্সট, রবীন্দ্রনাথই তাবৎ পৃথিবীতে পৃথিবীতে সেই প্রথম আভাঁ গার্দ নাট্য-পরিচালক — যাঁর কমিউনিকেশন ও টেক্সট ভাবনাকে যদি আঁতিপাঁতি করে খোঁজা যায়, তা হলে দেখব ওই কলোনির বাচ্চার জামাকাপড় খুলে নিয়ে যে নতুন আলখাল্লা তিনি পরালেন — পরবর্তীকালে মেয়ারহোল্ড থেকে ব্রেশট, গ্রোটস্কি থেকে শেখনার বা বাদল সরকার সবার নাট্যভাবনা তথা সংযোগ-ভাবনা কোনও না কোনওভাবে সন্নিধি খুঁজে পাবে। একজন সত্যিকারের মৌলিক চিন্তক, যিনি তাঁর চিন্তা, পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে কমিউনিকেট করাতে চান এবং তার জন্য একটি বিশেষ প্যাটার্ন যিনি স্থিরীকৃত করতে চান, তিনি অ্যাডাপটেশনের বঙ্গজ গোলকধাঁধায় ঢুকবেন কেন — যেখানে 'সাহেব কইছে পুঙ্গির ভাই'-এর দল বসে আছে, ওই বুঝি পো-র গল্প ঝেড়ে তিনি 'নিশীথে' নামিয়ে দিলেন, বা স্ট্রিন্ডবার্গ-কে হাতয়ালি মেরে 'রক্তকরবী'। ফলে তাঁর নাটকের সর্ষের মধ্যে যে ভূত আমরা খুঁজি, তা সৃজনের একটি বিশেষ রসায়ন — তিনি অনেক বেশি চিন্তক, অনেক বেশি নাট্য পরিচালক, যতটা না তিনি নাটককার। নাটকগুলির শিল্পগুণ কতখানি তা অবশ্য ওই সমারূঢ়তায় আচ্ছন্ন ছায়াপিণ্ডদের উপর ছেড়ে রাখাই ভাল।

৬

শিশিরকুমার ভাদুড়ী যদিও তা পারতেন। স্থানীকরণের উপযুক্ত টেক্সট পড়ার কোনও অভাব বা অসুবিধা তাঁর ছিল না। কিন্তু ওই যে নগদবিদায়ের গল্প। ফলে তিনি বেছে নিলেন রূপান্তরের পথ, বঙ্কিম বা শরৎচন্দ্রের আখ্যান নির্ভর উপন্যাসগুলিকে তিনি প্রসেনিয়ামের ফ্রেমে আঁটিয়ে নিতে শুরু করলেন, যেখানে একটি টানা গল্পো থাকবে এবং অভিনয়ের জোরদার প্যাঁচপয়জার দেখানোর পরিসর থাকবে। বরং শিশিরকুমারের অসমাপ্ত কাজ পরবর্তীকালে অনেকটাই সম্পন্ন করলেন, ওই নগদবিদায়ের ছক্কাপাঞ্জার বোর্ডে থেকেও, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অনেক বছর বাদে তাঁর স্থানীকরণে আইরিশ শন ওকেমি থেকে জার্মান ডুরেনমার্ট বা মার্কিন লিলিয়ান হেলম্যান (কে নয়?) বাংলার বোর্ডে এলেন। শিশিরকুমার যে ভিত প্রস্তুত করেছিলেন, লিয়েবেদফের দেওয়া ওই সিদ্ধান্তর হাতুড়ির কারণে তিনি যা করতে পারেননি, সেই কাজই যেন সম্পন্ন করলেন সৌমিত্র। ওই মৃতবৎ বৃহৎ কলোসাস-সুলভ রোমক সাম্রাজ্যের 'লাস্ট অফ দি মাহিক্যানস' — তিনিই, যিনি এখন মাহেশ এলকুঞ্চওয়ার-এর স্থানীকরণে রত। এই বিশ্বায়ন, এই আমরা-ওরা, এই উত্তর-ঔপনিবেশিকতা উত্তর-আধুনিকতা, এই নাশকতা ইত্যাদি গর্জনশীল শব্দে ক্যাঁচড়া, সিরিয়াল-সিনেমা-শুটিংয়ের দৈনন্দিন উপার্জন ও সহ্যক্ষমতা বাড়ানো ইত্যাদি গোলকধাঁধাকে মেনে নিয়ে তিনি যেন ব্রেশট-এর সেই গ্যালিলিও, বন্দি অবস্থাতেও লুকিয়ে যিনি লিখে চলেছেন 'ডিসকোর্সি'।

৭

প্রয়াত বিশিষ্ট সমালোচক ধরণী ঘোষ, একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, স্বাধীনতার পর এই যে এত অ্যাডাপটেশন এবং স্থানীকরণ শুরু হয়েছিল এ বাংলার থিয়েটারে, তার কারণ নাকি গ্র্যান্ড হোটেলের নিচে ফরেন বুক পাবলিশার্স-এর দোকানটি। সেখানে সস্তায়, প্রায় ফোকটে, প্রচুর বিদিশি নাটক আসত, আর এখানকার নাটককাররা সেখান থেকে ঝপাঝপ স্থানীকরণ করে নিতেন। অনেকটা এখন যেমন বাংলা চলচ্চিত্রে তামিল ছবির সিডি থেকে বাংলা ছবির দুর্মুখ-গুরমুখরা বা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাই বাংলা ছবি বানাচ্ছেন। কিন্তু এ কথা অন্তত উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র বা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে খাটে না। উৎপল কিন্তু অ্যাডাপটেশন করেছেন — শ'-এর 'মিসেস ওয়ারেনস প্রফেশনস' থেকে 'মধুচক্র' বা ইয়ান পিটারসনের জার্মান নাটক 'উনসেরে স্ট্রাসে' থেকে 'ব্যারিকেড' বা মার্কিন নাটককারদ্বয় কফম্যান ও হার্ট-এর 'দ্য ম্যান হু কেম টু ডিনার' থেকে 'ভি-আই-পি'। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই নাটকগুলির থেকে তাঁর 'মানুষের অধিকারে' বা 'টিনের তলোয়ার' অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মনোজ মিত্রর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও তাৎপর্যবহ। তাঁর দল 'সুন্দরম' গোড়ার দিকে সম্ভবত ওই গ্র্যান্ড হোটেল বাহিত অ্যাডাপটেশন কিছু



ব্রাত্য বসু'র 'ব্যোমতেশ' নাটকের দৃশ্য।

কিছু মঞ্চস্থ করত। প্রধানত পার্থপ্রতিম চৌধুরি, তিনিই পরিচালক, যেমন 'রূপান্তর' করেছিলেন (হিচককের 'ডায়াল এম ফর মার্ডার' থেকে 'কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু') তেমনই মার্কিন এডওয়ার্ড অলবির 'হু ইজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ' থেকে স্থানীকরণ 'মলাটের রং মুহূর্ত'-ও তাতে ছিল। কিন্তু পার্থপ্রতিম পুরোপুরি চলচ্চিত্রে চলে যাওয়ার পর মনোজ মিত্রর 'সুন্দরম' আর একটিও অ্যাডাপটেশন কখনও করেনি। সম্ভবত এটাই সেই মৌলিকতার অন্বেষণ, যখন ওই বাচ্চাটি দেড়শো বছরের মেয়াদ পার করে নতুন জামা গায়ে দেওয়ার কথা ভাবল। মধুসূদন-দীনবন্ধু-গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলালরা যে নিজস্ব কণ্ঠের খোঁজ করেছিলেন, তা ছিল সামাজিক পরাধীনতার সঙ্গে শিল্পের স্বাধীনতার টাসল, অন্যদিকে উৎপল-বাদল-মনোজ-মোহিতদের অন্বেষণ ছিল সামাজিক-রাজনৈতিক-আত্মিক ইত্যাকার সমস্ত পরাধীনতার সঙ্গে শিল্পের স্বাধীনতার টাসল। প্রথম গোষ্ঠীর চর্চার মধ্যে জাতীয়তাবাদ নামক আশাবাদ নিহিত ছিল, সেই সূত্রেই যাবতীয় অ্যাডাপটেশনের আগমন। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর চর্চার মধ্যেও আন্তর্জাতিকতা নামক আশাবাদ নিহিত ছিল — সেই সূত্রেই যাবতীয় অ্যাডাপটেশনের আগমন, আর এই দুই গুচ্ছের সেতুবন্ধন করছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যাঁর মধ্যে ওই জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ — দু'টি পৃথক ফলিত দর্শন সমন্বয় খুঁজেছে। গত শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর পার করে প্রথম আশাবাদটি সলিলসমাধি যখন পেল, পরের পঞ্চাশটি বছর দ্বিতীয় আশাবাদটিকে আঁকড়ে ধরল এবং গত শতাব্দীর শেষে এসে তারও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল। এই নতুন শতাব্দীতে তাই ওই অ্যাডপটেশন আর পুরনো কোনও খোলসে আটকে থাকতে চাইছে না। সমস্তরকমের ধ্বংসকার্য সমাপ্তি হওয়ার পর, সে নতুন জামা আবার খুঁজছে, ওই 'নিরাশা' বা 'আশা' নামক হাস্যকর শব্দপুঞ্জের মধ্যে আটকে না থেকে স্বাভাবিক কোনও কণ্ঠের চর্চা করতে চাইছে। এখন নাটকের ওই দু'গোল ফেরত দেওয়ার পালা — রেফারি নির্দিষ্ট জায়গায় — সবে হালকা গা ঘামানো চলছে।

বাদল সরকার এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। দু'জনেই দু'রকম করে অ-পূর্ব আত্মীকরণকারী। 'মৃত্যুসংবাদ' বা 'তখন বিকেল' যদি শুধু পাঠ করা যায়, বোঝা যায় না কে পাস বাড়াচ্ছে আর কে-ই বা গোল দিচ্ছে। মাঝেমাঝে মনে হবে সিংগ বা আরবুজভ-ই যেন মোহিতের ওই নাটক দু'টিকে অবলম্বন করে 'প্লে বয় অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড' বা 'ওল্ড ওয়ার্ল্ড' লিখেছেন। বা, বাদল সরকারের লেখা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কমেডিগুলি। 'বল্লভপুরের রূপকথা' বা 'রাম-শ্যাম-যদু' দু'টি রূপান্তর, চলচ্চিত্র থেকে স্থানীকরণ। কিন্তু লিখনশৈলী, প্রসাদগুণ আর রসে চোবানো সংলাপ পড়লে এবং উৎসব যদি জানাও থাকে — কে বলবে, আদৌ এর কোনও সোর্স ছিল। 'থিয়েটার বুলেটিন' পত্রিকায় এক সময় জনৈক রহস্যময় রফিকুল ইসলাম এবং 'জপেনদা জপেন যা'-তে স্বয়ং উৎপল দত্ত এই দু'জনের তৎকালীন ধরনকে আক্রমণ করেছিলেন, সাহিত্যের সঙ্গে থিয়েটারের এক ধরনের সাময়িক ডিভোর্সের তখনই সূত্রপাত — কিন্তু উৎপল নাটক বলতে যা ভাবতেন, এঁরা তা ভাবতেন না। আবার এঁরা নাটক বলতে যা ভাবতেন, উৎপলের পক্ষে ভাবা তা কঠিন ছিল। যাই হোক ওই সময়ই 'থিয়েটার বুলেটিন'-এর এক সংখ্যায় বলা হয়েছিল বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি 'উই গট রিদম' শীর্ষক বিদেশি নাটকের বঙ্গীকরণ, যা পরে অবশ্য আর কেউ কখনও বলেননি। দু'টি নাটক পাঠ করলে তা অবশ্য মনে হয় না। জীবনানন্দ যদি 'বোধ'-এ আক্রান্ত হয়ে 'আট বছর

আগের একদিন' দেখতে পারেন, কিয়র্কেগার্দ-নিৎশে-হাইডেগার জনপ্রিয় হওয়ার অতদিন আগে, বেচারা বাংলা নাটকের তা হলে দোষ কোথায়? যাই হোক বাদল সরকার পরবর্তীতে বার্নার্ড শ' ভেঙে 'আন্দ্রেক্লিস ও সিংহ' করেছেন, কিন্তু তাঁর থার্ড থিয়েটার দর্শনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আত্মীকরণ ব্রেশটের 'দ্য ককেশিয়ান চক সার্কল' অবলম্বনে 'গণ্ডী' — সম্ভবত বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ ব্রেশট-স্থানীকরণ। অন্যদিকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ইন্দিরা পার্থসারথির 'আওরেঙজেব' যেভাবে আড়ষ্ট অনুবাদের শাঁস ছাড়িয়ে সহৃদয় সম্বাদী করে তুলেছেন তা-ও স্মর্তব্য। স্মর্তব্য, গত শতাব্দীতে বাংলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাট্যদলের উল্লেখযোগ্য আত্মীকরণের কাজ, তার মধ্যে বিভাস চক্রবর্তীর কথা প্রথমেই মনে পড়ে। ব্রেশট অবলম্বনে 'পাঁচু ও মাসি', 'নজির বিচার' তো বটেই, সরাসরি অনুবাদ 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' বা গিরীশ করনাড়ের 'অগ্নিজল' বা দারিও পো-র দুই বঙ্গীকরণ — 'হচ্ছেটা কী' এবং 'মৃত্যু না হত্যা'। 'মাধব-মালঞ্চী কইন্যা'-কেও রূপান্তরই বলা যেতে পারে, কারণ ময়মনসিংহগীতিকা এখানে রূপ পাচ্ছে নাট্যের। অশোক মুখোপাধ্যায় তাঁর গুরু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই সার্থক উত্তরসূরি। অজিতেশ যেমন শেখভ থেকে ব্রেশট থেকে পিরানদেল্লো সবই আত্মসাৎ করেছিলেন, অশোক মুখোপাধ্যায়ও তেমনই অ্যারিস্টোফেনিস থেকে ওয়েসকার বা অনুবাদে অগাস্ট উইলসনের 'ফেন্সেস' থেকে বেড়া-তে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'সায়ক'-এর তত্ত্বাবধানে চন্দন সেন-কৃত তলস্তয়ের 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' বা শ্নেদ্রিন-প্রাণিত 'দুই হুজুরের গপ্পো'-র কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে রমাপ্রসাদ বণিকের নির্দেশনায় উগো বেত্তির 'রাণীকাহিনী' বা টেনেসি উইলিয়ামসের 'ইচ্ছেগাড়ি'-র কথা। প্রয়াত অসিত মুখোপাধ্যায়ের শেখভ বা মিলারের 'ভস্ম' (নব্যেন্দু সেন কৃত) এবং 'নীলাম নীলাম'-ও মনে পড়ে। মনে পড়ে 'বহুরূপী'-র 'মিঃ কাকাতুয়া' বা 'আগুনের পাখি'-র কথা। সর্বোপরি 'নান্দীকার' তথা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। তাঁর চর্চায় পিরানদেল্লো ('নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র') ব্রেশট ('শঙ্খপুরের সুকইন্যা', 'খড়ির গণ্ডী') আর্থার মিলার ('ফেরিওয়ালার মৃত্যু', 'গোত্রহীন') পিটার টার্সন ('ফুটবল') ভ্লাদলেন দোজরেৎসেভ ('শেষ সাক্ষাৎকার') ইত্যাদি স্থানীকরণ, এবং রূপান্তর 'মাননীয় বিচারকমণ্ডলী' (কুরোশওয়ার 'রশোমন' অবলম্বনে) বা অনুবাদ (সফোইক্লস-এর 'আন্তিগোনে') প্রভৃতি কাজ মনে রেখে দেওয়ার মতো।



উৎপল দত্ত'র 'টিনের তলোয়ার' নাটকের দৃশ্য।

৮

এই শতাব্দীতে এসে, এ বাংলার নতুন প্রজন্মের নাটকার, পরিচালকরা অনুবাদে আর আস্থাশীল ততটা নন, বরং রূপান্তর তথা স্থানীকরণে তাঁরা আগ্রহী বেশি। কৌশিক সেন করেন 'মাল্যবান' রূপান্তর আবার 'ময়দানব' (ইবসেনের স্থানীকরণ) সুমন মুখোপাধ্যায় করেন 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (রূপান্তর) 'মেফিস্টো' (অনুবাদ), বা 'আগুনমুখো' স্থানীকরণ। অর্পিতা ঘোষ করেন 'পশুখামার' (রূপান্তর)', 'একটি রাজনৈতিক হত্যা' (অনুবাদ)। বা 'টোকোলশ' (রূপান্তর)। মণীশ মিত্র করেন 'রায়ট' (রূপান্তর) বা 'শেষ রূপকথা' (রূপান্তর) বা 'সীমার' (রূপান্তর)। কিশোর সেনগুপ্ত করেন 'চিলেকোঠার সেপাই' (রূপান্তর) 'খোয়াবনামা' (রূপান্তর) বা 'অশ্বচরিত' (রূপান্তর)। বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় করেন 'আঁধারে একেলা' (স্থানীকরণ)। এরকম নানা ধরন, নানা খাঁজখোঁজ — সময় এসেছে কলোনির ওই বাচ্চার পুনর্জন্ম নেওয়ার।

বাংলা শব্দের কী আশ্চর্য বিচারবোধ। এখানে কবিতার সঙ্গে মেলে টবিতা, গানের সঙ্গে ফান, ছবির সঙ্গে টবি, কিন্তু কী অবশ্যম্ভাবীভাবে নাটকের সঙ্গে ফাটক। এ মানে ভাবাই যায় না! ফলে ঐতিহাসিকভাবে নিজের প্রতি নির্মোহ থেকেই এ তথ্য জানাতে হবে যে, ভারতবর্ষে কোনও শিল্পমাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা একটি নাটকের পুনর্নির্মাণ ঘটেছিল এই বাংলাতেই যখন উৎপল দত্তের 'মানুষের অধিকারে' থেকে তৈরি হয়েছিল '১৭ই জুলাই'। রামগোপাল ভার্মা বা ফারহান আখতার চলচ্চিত্রে 'আগ' বা 'ডন' করার অনেক আগেই। 'মানুষের অধিকারে' ছিল মার্কিনদেশের আলাবামা প্রদেশের সাদা-কালো দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা একটি নাটক। এই শতাব্দীর গোড়ায়, গুজরাত-কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর, 'মানুষের অধিকারে'-র বর্ণ বিভাজনকে পালটে, সাম্প্রদায়িক বিভাজন অবলম্বনে ২০০৪-এ করা হয়েছিল '১৭ই জুলাই'। বাংলা ভাষার প্রথম রিমেক। সেই সঙ্গে এ কথাও জানালে খুব খারাপ হবে না যে, রিমেক-এর আরেক কুটুম 'বিনির্মাণ' বাংলা নাটকে শেক্সপিয়র-চর্চায় নতুনভাবে এল — যখন হ্যামলেটের গল্পের নির্যাস আত্মসাৎ করে ২০০৬-এ তৈরি হল 'হেমলাট — দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা'। ডেনমার্কের প্রিন্স নেমে এলেন তৃতীয় বিশ্বে, পাজামা আর শার্ট আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল পরে। কিন্তু ওই যে বললাম, বাংলা শব্দের তথা বাঙালির কী আশ্চর্য বিচারবোধ! তাই আমরা 'ফাটকবন্দি' হয়ে আপাতত দেখছি আর ভাবছি কলোনির ওই বাচ্চার কীভাবে, কোন কোন পদ্ধতিতে পুনর্জন্ম হতে পারে! আর তার জ্ঞাতি-কুটুমরাই বা কীরকম চেহারা নিতে যাচ্ছে!

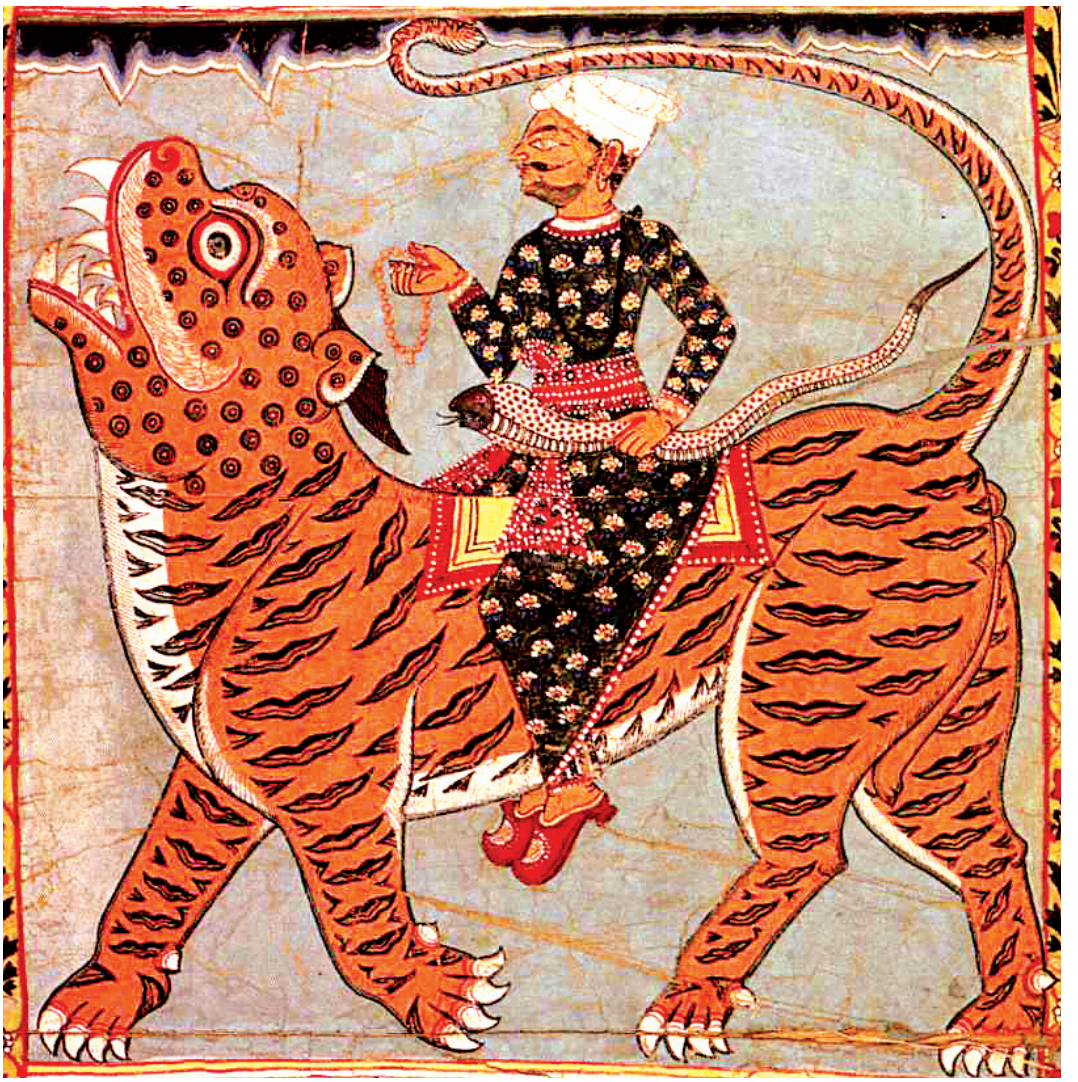

উত্থান-শক্তি রাজা ও কর্মচারী

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকে গর্ভবতী শকুন্তলাকে নিয়ে কণ্ব-শিষ্য শাঙ্গরব আর শারদ্বত সদ্য মহারাজ দুষ্মন্তের রাজপুরীতে এসে পৌঁছেছেন।

এখনও রাজার সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়নি, কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে রাজার অন্তঃপুরাধ্যক্ষের কাছে নিবেদন জানিয়েছেন। মহারাজ দুষ্মন্ত তখন সবেই ন্যায়-অন্যায়ের বিচারাসন ছেড়ে অন্তঃপুরে বিশ্রাম করার জন্য পা বাড়িয়েছেন। রাজার অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, যাকে সেকালের দিনে কঞ্চুকী বলত, সেই কঞ্চুকী তখন ভীষণরকমের মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে আরম্ভ করল। এই কঞ্চুকী মানুষটারও অনেক বয়েস হয়ে গেছে। সেই কোন কালে যুবক বয়সে একটি বেত হাতে নিয়ে এই রাজবাড়ির অন্তঃপুরের কাজে লেগেছিল, এখন সে বুড়ো হয়ে গেছে। সে নিজের সঙ্গেই মজা করে বলে—যে বেতগাছা হাতে ধরে এককালে আমি বাইরের লোকগুলোর অন্তঃপুরচরী চোখগুলি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতাম, সেই বেতগাছাই এখন আমার বুড়ো বয়সে হাঁটা-চলার অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে—কালে গতে বহুতিথে মম সৈব জাতা/প্রস্থান-বিক্লব-গতে-রবলম্বনার্থা।

বৃদ্ধ কঞ্চুকী রাজাকে দেখে বহুকালের কর্মী হিসাবে স্নেহ এবং কর্তব্যের দোটানায় পড়েছে। রাজা সারাদিন বিচারাসনে বসে কত ধৈর্য নিয়ে কত মানুষের বিবাদ-মীমাংসা করেছেন—বৃদ্ধ কঞ্চুকী তা জানে বলেই কণ্ব-শিষ্যদের আকস্মিক আগমনের কথা রাজাকে জানাতে তার কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সে ভাবছে যে, এতদূর থেকে দু'টি ব্রহ্মচারী যুবক একটি গর্ভবতী রমণী এবং এক বৃদ্ধা তাপসীকে নিয়ে রাজার কাছে এসেছে, নিশ্চয়ই প্রয়োজনের তাগিদে। অতএব যতই পরিশ্রান্ত হয়ে থাকুন রাজা, তাঁকে এই সংবাদ জানাতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তেই সে অসাধারণ একটি বাক্য উচ্চারণ করছে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় মানুষের সম্বন্ধে রাজার সচেতনতা নিয়ে। সে বলছে—কণ্ব-শিষ্যদের আগমন-সংবাদ রাজার কাছে তো জানাতেই হবে, তা তিনি যতই ক্লান্ত থাকুন। কেননা রাজারা যে কারণে রাজা হন, সেই সাধারণ মানুষের দায়িত্ব যাঁরা নেন, তাঁদের বিশ্রাম করার কোনও জায়গা থাকে না—অথবা অবিশ্রামো'য়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ। কঞ্চুকীর সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগে 'লোকতন্ত্র' কথাটা খুব অবহিত হয়ে লক্ষ্য করতে বলি। আমি এমন আহম্মক নই যে, 'লোকতন্ত্র' বলতে আমি আজকের দিনের সাংসদীয় রাজনীতির 'লোকতন্ত্র' বা 'প্রজাতন্ত্র' বোঝাতে চাইব। আমি শুধু বলি—শব্দটি সম্বন্ধে অবহিত থাকুন। সেকালের রাজতন্ত্রকে যেখানে স্বৈরাচারের সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র বলে চিহ্নিত করেন এখনকার প্রগতিমানী পণ্ডিতেরা, তাঁদের উদ্দেশে জানাই স্বৈরাচার শুধু রাজতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নয়, আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক দলও এমন স্বৈরাচারিতায় ভোগে যে, রাজতন্ত্রের দুর্ভোগগুলি সেখানে নিতান্তই লঘু বলে গণ্য হতে পারে। বরঞ্চ উল্টো দিক থেকে বলতে চাই যে, নীতিগত আদর্শে যদি রাজতন্ত্রের দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখা যাবে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেও, যখন কালিদাস জন্মেছিলেন বলে প্রচলিত লোক বিশ্বাস, তখনও এই শব্দটির প্রয়োগ আমাদের চমৎকৃত করে—অবিশ্রামো'য়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ —লোকতন্ত্রের দায়িত্ব যাঁদের স্কন্ধে ন্যস্ত তাঁদের নিজস্ব বলে কিছু নেই, এমনকী নিজের বিশ্রামের সময়ও তাঁর নিজের নয়। এর কারণ কী? না, রাজা তাঁর শাসন চালানোর জন্য মানুষের কাছ থেকে কর নেন, উৎপন্ন দ্রব্যের একের ছয় ভাগ 'ট্যাকস্' জমা পড়ে তাঁর রাজকোষে।

রাজার অবিশ্রান্ত প্রজাপালনের দায়িত্ব আসে এই করগ্রহণের দায় থেকেই। কঞ্চুকী মনে করেন—যে রাজা লোক-প্রদত্ত রাজ করে রাজবৃত্তি নির্বাহ করছেন, তাঁর এটাই ধর্ম যে, অসময় হলেও নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অতিক্রম করে তাঁকে প্রজার কথা শুনতে হবে যষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এষঃ। কেন শুনতে হবে? না, লোকতন্ত্রের অধিকারী রাজাকে অবিশ্রান্তভাবেই লোকের হিতাহিত নিয়ে ভাবতে হবে। সাধারণ একটি উপমা এসেছে এখানে। কঞ্চুকী বলছেন—সেই কবে কখন সূর্যদেব তাঁর সাত-ঘোড়ার রথে চেপে পৃথিবীকে তাপ দিয়ে বেরিয়েছিলেন, আজও তাঁর চলার পথে বিশ্রাম জোটেনি একবারও। সমীরণ গন্ধবহ কবে কখন এই প্রাণের গতি জীইয়ে রেখে বইতে শুরু করেছিল, আজও সেই গতি অবিরাম চলছে। সেই কবে শেষনাগ এই পৃথিবীর সুস্থিতি কল্পে আপন নির্দিষ্ট অক্ষরেখায় এই পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করেছিলেন, আজও তার বিশ্রাম জোটেনি, অতএব রাজাই বা বিশ্রাম পাবেন কী করে, তাঁকেও মানুষের কথা শুনতে হবে— ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ত-তুরঙ্গ এব/রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।

সারাদিনের রাজকর্ম, বিচার-ব্যবসায় সেরে দুষ্মন্ত কেবলই বিশ্রাম-গৃহে এসে বসেছেন। বহুকালের অনুচর কঞ্চুকী রাজাকে এই এক্ষুনিই নির্জনে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করতে দেখে মায়া বোধ করছে—এখুনি তাঁকে খবর দিতে হবে। কঞ্চুকী বলছে—সমস্তদিন রাজ্যের প্রজাদের নিজের সন্তানের মতো পরিচালনা করে এই কেবলই একটু বিশ্রাম করছেন রাজা। যেন যূথপতি গজরাজ সারাদিন তার যূথস্থিত হাতিদের চালনা করে দিনের শেষে নিভৃত পার্বত্য গুহায় শ্রান্তি অপনোদন করছে— প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা। নিষেবতে শ্রান্তমনা বিবিক্তম্। কঞ্চুকী আর সময় নষ্ট করল না, মায়া বাড়াল না রাজার উপর। সে খবর দিল রাজাকে—মহারাজ! হিমালয়ের উপত্যকাবাসী তপস্বীরা কুলপতি কণ্বের কাছ থেকে বিশেষ সংবাদ নিয়ে এসেছে। তাঁদের সঙ্গে স্ত্রীলোকও আছে। তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। কী বলব তাঁদের?

রাজার যতই ক্লান্তি থাকুক, তাঁর লেশমাত্র প্রকট না করে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে নির্দেশ দিয়ে বললেন—মহর্ষি কাশ্যপের সংবাদ নিয়ে আসছে যখন, তখন এখনই আমাদের উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, যাতে তিনি প্রয়োজনীয় উপচারে আশ্রমবাসী তপস্বীদের সৎকার করতে পারেন। আর আমিও যাচ্ছি সেইখানে, যেখানে বসে বিনীত বেশে তপস্বীদের দর্শন করা যায়। রাজা দুষ্মন্ত সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলেন বিশ্রামের কোমল আসন থেকে এবং চললেন অগ্নিশরণ-গৃহে—ঋষি-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত স্থান। যেতে-যেতে রাজার মনে এক ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে—সে যন্ত্রণা বাইরে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু অতিরিক্ত কর্তব্য ক্লান্ত মানুষের এই যন্ত্রণা হয়। এমনকী ক্বচিৎ কখনও আমাদের মতো মানুষেরও হয়। এমন মুহূর্ত আসে, যখন খুব ব্যস্ত আছি, নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, তখন কিছু স্বজন, গুরুজন বা প্রিয়জন ফোন করলেন। এমন অবস্থায় প্রায়ই আমরা স্বাগত ভাষণে বলে উঠি—উঃ! কে আবার এইসময় ফোন করে। ফোন করার সময় পায় না এরা! তারপর ফোন ধরার পর যখন দেখলাম—অতি প্রিয়জন কেউ ফোন করছেন, তখন

নিজেকেই ধিক্কার দিই অন্তর্নিহিত পাপবোধে। তবু এই সঙ্কট আমাদের জীবনে বারবার আসে কর্তব্য-কর্মের তর-তম বিচারে। রাজা দুষ্মন্তকেও আমরা এই সঙ্কটের দ্বৈরথে কষ্ট পেতে দেখছি।

রাজা বিশ্রাম ত্যাগ করে অগ্নিশরণ-গৃহের দিকে যেতে যেতে নিজের রাজকর্ম সম্পাদনের যন্ত্রণায় জ্বলতে-জ্বলতে স্বগতোক্তি করছেন—প্রত্যেক মানুষই কত সুখে আছে। তারা যা চায়, সেগুলি পেলেই কত সুখী হয়ে যায় তারা। আর রাজা! রাজার সমস্ত চরিতার্থতার শেষেই বোধহয় কষ্ট আছে—সর্বে প্রার্থিতম অর্থম্ অধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে জন্তুঃ। রাজ্ঞাং তু চরিতার্থতা দুঃখোত্তরৈব।

রাজা দুষ্মন্ত নিজের রাজদণ্ড ধারণের কর্তব্য এবং কষ্ট সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে অসামান্য এক উপমার অঙ্গুলিসংকেতে বললেন—ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি আমাদের উদ্বেগ শান্ত করে মাত্র, কিন্তু যা আছে বা যা পেয়েছি তার রক্ষণাবেক্ষণ করাটাই সবচেয়ে কষ্টকর। রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ ছাতা হাতে করে বেরোয় বটে এবং তাতে রোদ-বৃষ্টির যন্ত্রণা কিছু কমে বটে, কিন্তু হাতা সামলে চলাটা এত কষ্টকর যে, রোদ-বৃষ্টির কষ্টই বেশি, নাকি ছাতা সামলানোর কষ্টই বেশি, সেটা বোঝা দায় হয়ে ওঠে—নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়/রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্।

মহাকবি কালিদাস দুষ্মন্তের রাজবৃত্তি সম্বন্ধে যতটুকু লিখেছেন, তেমনটি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন কি না, সেটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। হয়তো রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ অথবা রাজনীতি বিষয়ক নির্দিষ্ট প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে কালিদাস রাজাদের যে নীতিগত আদর্শের রূপ দেখেছেন, সেই ভাবনা থেকেই তিনি রাজবৃত্তির অপরিসীম ক্লেশ সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন মহারাজ দুষ্মন্তের জবানিতে। এমনকী রাজার যারা পুরাতন ভৃত্য, সহচর তারাও রাজার পরিশ্রম এবং আত্মসুখের জলাঞ্জলি দেখে মনে-মনে কষ্ট পায়, আবার তাঁর আদর্শ-গৌরবে সুখও পায়। রাজা যা প্রতিনিয়ত করে থাকেন, সেই বিষয়ে যারা গান বাঁধত, সেইসব সূত্র, মগধ, বৈতালিক মহারাজ দুষ্মন্ত সম্বন্ধে বলেছে—নিজের সুখের বিষয়ে রাজার কোনও সন্ধান নেই, কিন্তু জনগণের জন্য তাঁর কষ্ট এবং পরিশ্রম চলতেই থাকে—স্বসুখ-নিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহোতোঃ। অথবা এটা ভেবে দুঃখ বা মায়া করার মতোও কিছু ঘটেনি, রাজাদের তো এমনটা করতেই হবে—বৃত্তিরেবংবিধৈব—নইলে আর রাজা হয়েছেন কেন!

বৈতালিক কালিদাসের উপমায়—রাজা অনেকটা সেই পুষ্ট গাছের মতো, সে নিজের মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্যের খরতাপ সহ্য করে, কিন্তু বৃক্ষতলে আশ্রিত জনকে ছায়া দিয়ে তার তাপ দূর করে দেয়—শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতাণাম্। কালিদাস কৌটিল্যের মতো রাজার সারাদিনের কর্মসূচি বিস্তারিত লেখেননি বটে, কিন্তু তিনটে মৌলিক বিষয়ে যে রাজাকে নির্বিশেষে ব্যস্ত রাখে, সেটা তিনি বৈতালিকের স্তুতি-দ্বারেই প্রকাশ করেছেন। প্রথম কাজ, যারা বিপথে যাচ্ছে, অন্যায়-অসভ্যতা করছে, তাদের দণ্ডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা। দ্বিতীয় কাজ—মানুষের নানা বিবাদ-বিতণ্ডার মীমাংসা করা। আর তৃতীয় কাজ—প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিজেকে নিযুক্ত করা—নিয়ময়সি কুমার্গ-প্রস্তিতানাত্তদণ্ডঃ/প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।

বৈতালিকের স্তুতি-গীতি শুনে মহারাজ দুষ্মন্তের ক্লান্ত-শ্রান্ত মনে একটু শান্তির আভাস লাগল। বস্তুত সারাদিন-রাত যে পরিশ্রম করে, তার কাজের 'অ্যাপ্রিসিয়েশন' ছাড়া, তার শান্তির কোনও উপায় নেই। রাজার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মানুষের বিপন্নতা, মানুষের সুরক্ষা-ভাবনা নিয়ে রাজার দায়বদ্ধতা নিয়ে কবি কালিদাস যে চিত্রটুকু প্রকাশ করেছেন—এটাই সেকালের রাজবৃত্তির নীতিগত আদর্শ। আদর্শ থেকে চ্যুত হওয়াটাও মনুষ্যধর্মের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু এই বিচ্যুতি, বিশেষত রাজার স্বচ্ছন্দচারিতা অথবা স্বসুখ-সন্ধানের অভিলাষ সে-কালের সমাজ-বীক্ষক শাস্ত্রকারদের চোখে ক্ষমার্হ ছিল না। ওই যে প্রথমে কঞ্চুকী রাজার পরিশ্রমে সহানুভূতি জানিয়েও সেই চরম দায়বদ্ধতার কথা বলেছিল—রাজা যেহেতু প্রজাদের কাছে রাজকর গ্রহণ করেছেন, অতএব তাঁকে সব পরিশ্রমই করতে হবে, তাঁর পরিশ্রম-বিনোদনেরও সময় নেই—ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এষঃ।

এই কথাটা যে কালিদাসের কবিত্বের বিলাসমাত্র নয়, তার জন্য মনু, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অন্যান্য প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্র থেকে বহুল প্রমাণ উদ্ধার করা যায়। আমাদের গণতন্ত্রে যেমন করনীতির মধ্যে সরকারি সুরক্ষার সার্বিক দায়বদ্ধতা আছে, 'পাবলিক-মানি'-র সঠিক উপযোগ নিয়ে যে নীতিগত সচেতনতা আছে, সেটা কিন্তু সেকালের রাজতন্ত্রেও যথেষ্ট ছিল এবং হয়তো বা নৈতিক ভাবনাটা আধুনিক গণতান্ত্রিক নেতাদের চেয়েও বেশি ছিল। মহাভারত এক জায়গায় বলেছে—যে রাজা প্রজাদের কাছ থেকে শস্য-সম্পদের ছয়ভাগের একভাগ রাজকর হিসাবে নিয়ে সেটা যদি নিজের ভোগেই লাগান এবং সঠিকভাবে প্রজাদের সার্বিক এবং সমীচীন সুরক্ষায় মন না দেন, তবে সেই রাজা রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চোর—

বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য বলিং সমুপযোজয়েৎ।
ন রক্ষতি প্রজাঃ সম্যগ্ যঃ স পার্থিবতস্করঃ।।

বস্তুত সে-কালের দিনে প্রজাদের জন্য রাজার নৈতিক দায়িত্ব এমন একটা মাত্রায় পৌঁছেছিল যে, রাজ্যের মধ্যে যদি দৈব-দুর্যোগ ঘটত, অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি যদি প্রজাদের জীবন-জীবিকা ধ্বংস করত, যদি দুর্বলের উপর সবলের পীড়ন বেড়ে উঠত, তবে সেই সমস্ত অনর্থের দায় ছিল রাজার। মহাভারতের রাজধর্মবোদ্ধা ভীষ্মের বক্তব্য ছিল—জীবিকার মাধ্যমে প্রজাদের রোগ, মৃত্যু এবং ভয়—এসমস্ত কিছুর কারণ হলেন রাজা। মহাভারতে রাজভাবের এই দায়বদ্ধতা যে কতখানি, তা কিন্তু কালিদাসের নাটক থেকেও বোঝা যায়। অগ্নিশরণ-গৃহের অতিথিশালায় তখনও অপেক্ষা করছেন শকুন্তলা, আর্যা গৌতমী এবং মহর্ষি কণ্বের দুই শিষ্য, শাঙ্গরব এবং শারদ্বত। রাজা দুষ্মন্ত তখনও সেখানে পৌঁছননি এবং জানেনও না ভাল করে যে, কারা এসেছেন তাঁর কাছে, কেনই বা এসেছেন। অগ্নিশরণ-গৃহে যেতে যেতে তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছে—কেন মহর্ষি কণ্ব শিষ্যদের পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে। রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে প্রতিহারী, সেই বেত্রবতীর কাছেই রাজার আকুল প্রশ্ন—কণ্বমুনির আশ্রমের ব্রতচারী তপস্বীদের তপস্যায় কেউ কি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, নাকি তপোবনের জীবজন্তুদের উপর বাইরের কোনও উপদ্রব নেমে এসেছে? এমন তো হয়নি যে, আমার কোনও অন্যায় আচরণে তপোবনের লতা-বৃক্ষে ঠিকমতো ফল ধরছে না—আহোস্বিৎ প্রসবো সমাপচরিতে বিষ্টম্ভিতো বীরুধাম? এই সমস্ত তর্কে, দুশ্চিন্তায় আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

লক্ষণীয়, তপোবনের লতা-বৃক্ষে ফুল-ফলের প্রসব বন্ধ হচ্ছে কি না, পশুদের উপর কেউ অসদাচরণ করছে কি না—এগুলিও যদি রাজার নৈতিক দায় বলে গণ্য হয়, তবে সেই দায়বদ্ধতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল প্রাচীন কালে। যিনি ভারতবর্ষীয় রাজশাস্ত্রের সবচেয়ে সার্থক রূপকার, সেই কৌটিল্য যখন সারা দিনমান ধরে রাজার ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করেছেন, সেখানে রাজার অবকাশ বলতে কিছু দেখছি না। দিনের প্রথমভাগে যে রাজপুত্র হস্তিবিদ্যা, রথবিদ্যা এবং অস্ত্রশাস্ত্রের কৌশল আয়ত্ত করার জন্য পরিশ্রম করবেন, দিনের শেষভাগে সেই রাজপুত্রকে রামায়ণ, মহাভারত, আখ্যায়িকার পাঠ

নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ-গ্রন্থ পড়তে হত। উদাহরণ বলতে পণ্ডিতেরা বলেছেন 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'। অর্থাৎ আমাদের দেশের বিভিন্ন শাস্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন তত্ত্বাংশ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত গল্প। উদাহরণ শব্দের আর এক অর্থ 'ন্যায়োপন্যাসবিষয়ক মীমাংসা শাস্ত্র'। অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার করার পর ন্যায়ের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যে যৌক্তিকতায়, সেই যুক্তিগুলি ভাল করে মনে রাখা।

আমাদের কাছে দ্বিতীয় অর্থটাই বেশি ভাল লাগে। কেননা আজকের দিনের আইনের গ্রন্থগুলিতে যে অনন্ত 'কেস-স্টাডি' থাকে, যেগুলি আইন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় বারবার উদ্ধৃতও করা হয়, এগুলি অনেকটা তার কাছাকাছি। তবে কিনা উদাহরণগুলি আসে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ঘটনা থেকে। আমি বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্যদের দেখেছি—সমস্যা উপস্থিত হলে প্রায় অনুরূপ ক্ষেত্রে চৈতন্য কী করেছিলেন, বুদ্ধ কী বলেছিলেন—এমন উদাহরণ টেনে আচার্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর দৈনন্দিন সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহাভারত-রামায়ণ এবং পুরাণ থেকে উদাহরণ টানা হতই। বাণভট্টের কাদম্বরীতে রানি বিলাসবতী মহাকাল-মন্দিরে মহাভারতের পাঠ শুনেছিলেন। সেখানে অপুত্রক পিতামাতার শুভলোক-প্রাপ্তি হয় না শুনে নিজের পুত্রহীনতার দুঃখ স্মরণ করছেন—এও যেমন দেখেছি, তেমনই হালের গাথা সপ্তশতীতে নিজের প্রতি দেওরের দূষিত আসক্ত মন দেখে বউদি তাকে রামানুরক্ত লক্ষ্মণের চরিত্র উদাহরণ দিচ্ছে, এও দেখেছি। আমাদের ধারণা, তৎকালীন রাজাদের কাছেও বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত উদাহরণগুলি তাঁদের ন্যায়-অন্যায় বিচারে সাহায্য করত বলেই উদাহরণ ব্যাপারটা তাঁদের শুনে-বুঝে খেয়াল করতে হত।

আমরা রাজাদের দায়বদ্ধতার কথা বলছিলাম। কৌটিল্য বলেছেন—দিনটাকে আটভাগে ভাগ করে নিয়ে তার প্রথমভাগে রাজা গত-রাত্রির সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং গত-দিনের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে সব শুনবেন। দ্বিতীয়ভাগে তিনি পুর-জনপদবাসীদের কাজকর্ম পরিদর্শন করবেন। দিবসের তৃতীয়ভাগে স্নান, ভোজন এবং বেদ অধ্যয়ন। চতুর্থভাগে সংগৃহীত ধনের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং রাজতন্ত্রে নিযুক্ত বিভাগীয় অধ্যক্ষদের বিশেষ বিশেষ কাজে নিযুক্ত করবেন। দিনের পঞ্চমভাগে সামনে অনুপস্থিত মন্ত্রিবর্গের পত্রযোগে মন্ত্রণা করবেন এবং গুপ্তচরের সঙ্গে গোপন বিষয়ে আলোচনা করার সময় যে-সব বিষয়ে বেশি নজর দেওয়ার প্রয়োজন, সেই-সেই বিষয়ে অবহিত করবেন। দিনের ষষ্ঠভাগ রাজার নিজের—তিনি ইচ্ছেমতো বিহার-আহার মন্ত্রণা সবই করতে পারেন। দিনের সপ্তমভাগে হাতি-ঘোড়া-রথ এবং অস্ত্রশস্ত্রের পর্যবেক্ষণ করবেন রাজা। আর দিনের অষ্টমভাগে রাজা বসবেন সেনাপতির সঙ্গে। যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করতে গেলে আরও কী কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেই বিষয়ে তাঁর আলোচনা করবেন রাজা।

ক্লান্ত দিনমান শেষ করেও রাজার কোনও বিশ্রাম নেই। সন্ধ্যার আহ্নিককৃত্য সেরেই তাঁর রাত্রের কাজ আরম্ভ। রাতের আটভাগের মধ্যে স্নান-ভোজন, গীত-বাদ্যের শ্রবণ-সুখ কিছু নির্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু সেখানেও রাত্রির প্রথমভাগে গূঢ় পুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবাদ যা পেলেন, তারপর সে-বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁদের ইতিকর্তব্যতার নির্দেশ দেবেন রাতের সপ্তমভাগে। এরই মাঝখানে তাঁর রাতের ঘুম এবং সে-ব্যাপারে কোনও সময়ের নির্দেশ নেই, অর্থাৎ ঘুম হলে হল, না হলে না হল।

তার মানে এখনকার প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা, শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধিত্ব করছেন বলেই করদাতা জনসাধারণের সুরক্ষা এবং অধিকার-রক্ষার জন্য যেভাবে অহর্নিশ অবিশ্রান্ত চিন্তা করেন—অন্তত নীতিগতভাবে, ঠিক সেইভাবেই রাজতন্ত্রী রাজাকেও প্রজা সাধারণের জন্য অবিশ্রান্ত ভাবনা করতে হত—অন্তত নীতিগতভাবে তাই।

সবসময়েই যে এই অতন্ত্র, অনলস, অবিশ্রান্ত কর্মতৎপতার ভাবনা আমাদের রাজনীতি-বিশারদেরা এর একটা পারিভাষিক নাম দিয়েছেন। কৌটিল্যের ভাষায় এটাকে বলে উত্থান, অর্থাৎ সবসময়েই যেন এই আমি উঠেই দাঁড়িয়ে আছি কাজের জন্য—এইরকম একটি ever-alertness, ever-readiness, সরল অনুবাদে সতত উদ্যোগ। রাজার বিশেষণ হিসাবে কথাটা 'নিত্যোত্থিত' 'সততোত্থায়ী', 'অভ্যুত্থিত' —এইভাবে ব্যবহার হয়। কৌটিল্য বলেছেন—'উত্থান' ব্যাপারটাই হল রাজার ব্রত—রাজ্ঞো হি ব্রতম্ উত্থানম্—রাজকর্ম বা রাজ্যানুশাসনের ব্যবহার-নির্ণয়ই তাঁর ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞ কর্ম। প্রতিনিয়ত যিনি কর্মে উদ্যুক্ত হয়ে রাজকর্মের অনুশাসন দেন, সেই উত্থান-স্বভাবটাই তাঁর সমস্ত সমৃদ্ধি ঘটাবে, আর তা নইলে তাঁর রাজ্যের নেমে আসবে বিপর্যয়, কৌটিল্যের পরিভাষায় অনর্থ।

রাজ্ঞো হি ব্রতমুত্থানম্ যজ্ঞঃ কার্যানুশাসনম্।
তস্মান্নিত্যোত্থিতো রাজা কুর্যাদর্থানুশাসনম্।
অর্থস্য মূলমুত্থানম্ অনর্থস্তদ্‌বিপর্যয়ঃ।।

কৌটিল্যের মত হল—নিত্যোত্থিত রাজা যে কোনও অবস্থায় সবরকম জরুরি কাজের কথা শুনবেন এবং কোনও কাজই অননুষ্ঠিত অবস্থায় ফেলে রাখবেন না বা সময় অতিক্রান্ত হতে দেবেন না, কেননা অকৃত অবস্থায় কাজ ফেলে রাখলে, পরে সে কাজ কষ্টসাধ্য হয়, এমনকী কখনও কখনও সে-কাজ অসাধ্যও হয়ে পড়ে—

সর্বমাত্যয়িকং কার্যং শৃনুয়ান্নাতিপাতয়েৎ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যমতিক্রান্তম্ অসাধ্যং বা'পি জায়তে।।

একজন আদর্শ রাজাকে কৌটিল্য কেন এমন সতত 'উত্থায়ী' হতে বলেছেন, তার একটা বড় কারণ হল তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা। প্রজার সুখেই রাজার সুখ, তাঁর নিজের সুখ বলে কিছু নেই অথবা প্রজার হিতেই রাজার হিত, তাঁর নিজের হিত বলে কিছু নেই—এমন একটা নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকেই যে রাজাকে সদা-সর্বদা এক উদ্যোগী এবং উত্থায়ী পুরুষ হিসাবে দেখতে চেয়েছেন কৌটিল্য, এমন কিন্তু নয়। কৌটিল্য বলেছেন—রাজা যদি আপন তৎপরতায় সবসময় প্রস্তুত এমন একটা ভাব নিয়ে কাজ করেন, তবে তাঁর রাজ্যশাসনে রাজতন্ত্রে নিযুক্ত কর্মচারী রাজভৃত্যেরাও স্ব-স্ব-কর্মে তৎপর হবেন। আর তিনি যদি রাজকর্মে অবসন্ন এবং প্রমাদযুক্ত হন, তবে তাঁর ভৃত্যরাও ঠিক একইরকম হবে এবং রাজার ঈপ্সিত এবং আরব্ধ কর্মনাশ করে ছাড়বে—কৌটিল্য আরও কথ্য শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন—তাহলে রাজার আরব্ধ অভীষ্ট কাজটুকু রাজকর্মচারীরাই খেয়ে ফেলবে—কর্মানি-চাস্য ভক্ষয়ন্তি।

আমাদের গণতন্ত্রের অবস্থা আরও অনেক বিভ্রান্ত। এখানে পার্টি যদি সরকারে আসে, তবে সরকার কাজ চায়, পার্টির কর্ম-কর্তারাও কাজ চান, আর পার্টি যদি সরকার পরিচালনা না করে, তবে অনুসারী কর্মচারীরাও কাজ করতে চান না।

কিন্তু সব কর্মচারীই তো আর এক পার্টির নন, ফলে কখনও কাজে মন দিলাম কখনও দিলাম না, কখনও অন্যেরা মন দিল, আমরা মন দিলাম না—এমন গণতান্ত্রিক তথা দলতান্ত্রিক আলস্য বণ্টনের প্রক্রিয়ায় আস্তে আস্তে এক বিভ্রান্ত কর্মবাদ প্রসারিত হয়। তাতে সাধারণ মানুষ, যাঁরা রাজকর দিয়ে গণতান্ত্রিক কল্যাণের ব্যবস্থা করেন, তাঁরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হন। তাঁরা সরকার-রাজের বলি হয়ে যান।



My Memories of Puja

(Amar Puja-r ek dojon Goppo)

Derek O'Brien



1. Since I was born, this is the second time I will not be in Kolkata for the pujas. Previously, I may have missed one or at most two days of this annual festival, due to work engagements, but had mad it a point to spend the pujas mostly in Kolkata. This year, I will be spending the pujas with some '*probashi bangali bandhus*' (including my wife) in New York and Long Island. As a matter of fact, in USA and most other western countries, pujas are generally organized over the weekends, to facilitate maximum participation, and not on the exact puja days. So that's why, I'm feeling a pinch in the middle of my heart, but again looking for a new experience.
2. One of my earliest sweet memories of puja was that of holding the hand of a girl I loved, for the first time. I was in class VII/VIII (aged about 13/14) and she was my first love. I got a change to hold her hand while going to the '*bhashan*' atop a matador. While I'm really tempted to share the girl's name, keeping in mind that Anandabazar is read by nearly 50 lakh people, what I would only say is that her name began with the letter 'N'.
3. In the early-1980's, a paint company used to give out awards for excellence in various fields of arts like, music, drama, painting, literature etc., which was followed by a heartly lunch. In one such lunch, which took place at the Calcutta Club, one of the winners

was the late poet Subhas Mukhopadhyay. There, he suggested to us that since we're giving away honours for people from the arts fields, why not honour the people who organize the puja—in his words "*Pujo-r je shrishti hoi—take shamman janano*". So it was left to my colleague Sumit Roy and me to create the first 'Sharad Shamman' awards, for this paint company. In fact, the catch line for this awards were even provided by the poet Subhas Mukhopadhyay—"*Suddho shuchi–shustho ruchi*".

4. By the late-1980's, when this '*Sharad Samman*' has become quite popular, I felt I was extremely lucky as through this venture, I could meet various stalwarts and the best brains of Calcutta, say for example the painters—like Ganesh Pyne, Paritosh Sen, Manu Parekh and actors like Rudraprasad Sengupta etc. Frankly, before this exercise, the young upstart in me would have tempted to ask–"Who's Ganesh Pyne?" but now I would be rather give my left arm to have a Ganesh Pyne tempera.
5. My earliest association of food during the pujas goes back to the pre-egg roll days! The favourite with the mass at that time was the Moghlai Parota. But my favourite was the vegetable chop from Kalyani Hotel near the Ballygunge railway station. Deep red inside (because of the use of beetroot), it was a puja must-eat for me, from the little money we used to keep aside for refreshments from the '*para-r puja chanda*'.
6. In 2003, I cherished the first experience of seeing the pujas accompanying the most respected politician of our state. What struck me most was her tremendous energy as the whole entourage covered more that 8/9 pujas in one hour! By the end of these exhausting (for me) tours, I felt that I needed another holiday to recuperate from the superfast pandal hopping experience.
7. It was only during the Pujas, during my school days, we somehow obtained the license of staying away from home till late night. With the '*dadas*' of the para we would go on nearly all-night treks from Jodhpur Park to Park Circus. After walking for such distances we would nearly always suffer from blisters and corns, but sincerely, nobody cared for those title hindrances.
8. Maddox Square has always been a happening place during the pujas, even during when I was in school! During the pujas, at least two-there visits to Maddox Square were always on the rosters, for the obvious reasons and also something beyond that! I used to love the '*balloon phatano*" by rifles or handguns in the stalls lining the park. There used to be friendly bettering on that, with the person losing the challenge bearing the cost. Frankly, I did lose some amounts at certain times.
9. With the pujas closely following the monsoon season in Bengal, nearly every year the people from various parts of rural Bengal faces devastating floods and destructions with rob them of their homes, leave alone money for celebrations! I still remember the first time we organized a flood-relief committee from the '*para* puja committee' itself and made a contribution by using a part of the 'Chada' that was collected and collecting and donating garments and sarees.
10. Starting from my earliest memories about puja, I must say that it has evolved with time. One of the major pointers to that fact is the coming of age of 'theme pujas' which stated mostly around south Calcutta and the southern suburbs to attract pandle-hoppers. Nowadays, apart from some really traditional big pujas in the northern parts of the city, Nearly all the pujas are organized after being based on a theme. While some of these themes appear astounding the aesthetic senses of the main funtion are kept unchanged, some of them tinker with the whole concept of the puja itself!
11. Another thing I will miss this puja is the '*bhog*'. Several of my friends are residents of big building complexe around the city and I really look forward to their invitations throughout the pujas. The different types the '*bhogs*' on offer in the 'apartment pujas' really appeal my taste buds and I do have certain favourites in this category also!
12. Right from a very young age, I distinctly remember the 'para functions' centered on the pujas. Some of them were held right within the puja days, some of them were integrated as a part of the '*Bijoya Sammilanis*'. Whatever the occasion or the day, those functions sometimes gave me chance of comparing them, which obviously I loved to do most.
13. Maha-Ashtami—, somebody who has lived and was born and brought up mostly in this city, how he can forget the excitement of this particular day. To me what struck most was invariably the '*sandhi-puja*' in the evening and the boisterous '*dhunuchi-naach*' performances accompanied with it. Never a dance myself, I'm always marveled by the skill portrayed by the '*dhunuchi-dancers*'; both the young and the not-so-young.
14. One of the main sources of our entertainment during my school days was the '*pujar gaan-er* album', that were released just before the pujas. Every artist of that time was very particular about this, and there contributions were always noteworthy. Even today, some of the perennial Bengali favourite songs from the 1960s and 70s, that we get to hear were actually released to celebrate the pujas.



কতটা পথ পেরলে তবে ‘পথিক’ বলা যায়

শাঁওলি মিত্র



দেখতে দেখতে কত উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এত বছর পার হয়ে গেল। ‘পঞ্চম বৈদিক’ যে এতদিন টিকে থাকবে সে-কথা ভাবিনি কখনও। কেবলই ভেবেছি এবারে তুলে দিলেই হয়।

যখনই ঠিক করে কাজটা করতে পারিনি, তখনই এই সব কথা মনে হয়েছে। তবু যে টিকে গিয়েছে, তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাথিদের জেদের বশে। কীসের জন্যে জানি না, ‘টিকে’ থাকার প্রতি আমার আগ্রহ নেই বললেই চলে। আর যে প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের কাজ করতে হয়, তাতে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। তবুও, দেখতে দেখতে ৩০ বছর পার হয়ে গেল!

সে যে আজ হল কত ‘কাল তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল...’। শুরুর শুরু থাকে কখনও-সখনও। সেই শুরুর কাহিনি দিয়েই শুরু করা যাক।

থিয়েটার ছেড়ে বসে আছি। অন্য নানা কাজকর্ম করছি। সময়টা ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩। কখনও ইচ্ছে করেনি, একটি সংগঠন তৈরি করে থিয়েটার করতে নেমে পড়ি। সংগঠন-

পরিচালন এবং নির্দেশক হিসাবে নিজেকে নিতান্ত অপটু বলে আমার বিশ্বাস। আগ্রহও হয় না এই কাজে। তবু যে করতে হল তার জন্য দায়ী 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর অস্বাভাবিক সাফল্য। আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি এইরকম একটা কাণ্ড এই নাটকটিকে নিয়ে হতে পারে। অভিনয় করতে ইচ্ছে করছিল। কী করা যায়, কী করা যায়—এমনটা ভাবতে ভাবতে ইরাবতী কর্‌বের বই পড়ে মুগ্ধ হওয়া, এবং নাটকটি বা লেখা। এ-সম্পর্কে আমি বোধহয় একাধিক বার লিখেছি। 'পঞ্চম বৈদিক' তৈরি করবার প্রশ্ন তখনও হয়নি।

কাছাকাছি চেনাশোনা অল্পবয়সিদের নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে দু'জন আমার কাছে আবৃত্তি শিখতে আসত। অনিমেষ বিশ্বাস, আর রাখি পাল। রাখির পরীক্ষা এবং বাড়ির বিপদের জন্যে সে কিছু পরে যোগ দিয়েছিল। আমার মূল সাহায্যকারীদের মধ্যে ছিল অনিমেষ আর রাণু। রাণুর ভাল নাম নীলিনা বোস। শম্ভু মিত্র-র একান্ত ভক্ত হিসেবে পরিচিত নিমাই বোসের মেয়ে। রাণুর তখন বারো ক্লাসের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই কাজে। কাজটার ব্যাপারে আমি বিশেষ করে খুব গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইছিলাম,—তার মূল কারণ আত্মবিশ্বাসের অভাব। সাপ হবে না ব্যাঙ হবে কিছুই জানি না। ভরসা জোগাচ্ছিল কেবল ওইটুকু,—যাঁদের শুনিয়েছি সকলেরই নাটকটি ভাল লেগেছিল। যেকোনও বয়সের যেকোনও অবস্থার লোকের। মাত্র সেইটুকু সম্বল।

সেই সময়ে আবৃত্তি সংস্থা 'সারথি' আমাকে দিয়ে সমবেত আবৃত্তি তৈরি করবার একটা কাজ করিয়েছিল। ভাব-অনুযায়ী একটি পাঠ তৈরি করে তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে মঞ্চে তোলবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি। তার সঙ্গে যুক্ত অনিমেষ আর ভাগনি লুনা। সে খুব ভালবাসত আমাকে। প্রায়ই আমার কাছে এসে থাকত। 'সারথি'-র কর্ণধার পার্থ মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলাম তারা এই কাজে যুক্ত হতে রাজি আছে কি না। তারা এক বাক্যে রাজি। তাদের মধ্যে দু'জন, বিদিত এবং হীরেন পাশা খেলার দৃশ্যে হাসির জন্যে যুক্ত হয়েছিল। তারা আবার গাইতে পারত না। গানের জন্য তাদেরই প্রধান একটি মেয়ে সরমা দায়িত্ব নিতে এল। সরমা আবার আবৃত্তি করত না, গান গাইত। সেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে নেতৃত্ব দিত। ইতিমধ্যে রানিদি যুক্ত হয়েছেন। রানি মিত্র ওরফে তৃপ্তি মিত্র। তিনি তাঁর আত্মীয় রুণুকে নিয়ে এলেন। সে গাইত, একটু বাজাতেও পারত। সরমা-পার্থরাই নিয়ে এসেছিল বাঁশির রবীন মজুমদারকে, যিনি আজও অবধি 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর সঙ্গে যুক্ত। বছর দুই হল তিনি নিঃশব্দে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

ক্রমে ক্রমে কেমন করে যেন অনেক সাহায্যকারী উপস্থিত হল। এলেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মন। কালীপ্রসাদ ঘোষ আলোর কাজ করে দিতে রাজি হলেন। কাজ বেশ পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে নান্দীকারের সুব্রত পালও যুক্ত হলেন। তিনি সাংগঠনিক কাজের অনেকটা দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে স্মারক পুস্তিকা বের করবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এতে কয়েকটি ভাল লেখা বেরিয়েছিল। এই বছরেই কালীদাস সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে যে বক্তৃতাটি শম্ভু মিত্র দিয়েছিলেন, অনুরোধ করায় সেই থেকেই 'সম্পৃক্তি' লেখাটি তৈরি হয়। আর একটি ভাল লেখা ছিল,—বিজয় তেণ্ডুলকর মহাশয়ের 'আ স্টোরি রিটোল্ড'। সেই ব্রোশিওরের জন্যে বিজ্ঞাপন তোলার কাজটাও প্রাথমিকভাবে আমাকেই করতে হয়েছিল।

শৈল্পিক কাজে সব চেয়ে বেশি সহযোগিতা যাঁর কাছে পেয়েছিলাম, তিনি আমার গানের গুরু ধীরেন দাস মহাশয়। এই নাটকে প্রথম যে দিশি অর্কেস্ট্রাটা বাজে, সে-সংগীত তাঁরই রচনা। অনেকগুলি গানের সুর তাঁর দেওয়া। তিনি প্রাথমিকভাবে ওই অর্কেস্ট্রাতে হাঁড়ির বাজনা যুক্ত করেছিলেন। সেটা তখন খুব



'অচলায়তন' নাটকের দৃশ্য।

নতুন ছিল। তাঁরই বিশেষ বন্ধু তাঁর অনুরোধে মাদল এবং হাঁড়ি বাজাবার জন্য জুড়িতে অংশ নিয়েছিলেন। পরে তিনি রাজি হলেন না, এবং এমন লোক পাওয়া গেল না যিনি হাঁড়িতে উপযুক্ত আওয়াজ তুলতে পারেন। ফলে বাধ্য হয়েই হাঁড়ি-বাজনা বাদ দিতে হল। তবে ব্যক্তিগতভাবে ওই বাজনার অংশগুলো আমার খুব পছন্দের ছিল। তার আগের বছরে যখন প্রথম লেখা শুরু করি তখনই আমার মাথায় 'ব্রাহ্মণবেশী বীর পাণ্ডব অর্জুন' গানটি এসেছিল। তখন ভাবা হয়েছিল প্রথম অঙ্কের স্বয়ম্বর সভায় গাওয়া হবে। মাস্টারমশাই লেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই গানের সুর করেছিলেন। আর সে-সুর যে আমার কী ভাল লেগেছিল! তখন আমার নিয়মিত গানের চর্চা। তারপর তো অনেকদিন কাজটাতে হাতই দেওয়া হয়নি। পরের বছর যখন নাটক তৈরি হচ্ছে, তখন মাস্টারমশাইকে বলছি, 'আপনি এই গানটার খুব ভাল সুর করেছিলেন!' মাস্টারমশাই বলছেন, 'আমার তো মনে নেই।' আমার পরদাগুলো একটু-একটু মনে ছিল, আর মনে ছিল বিভাস রাগের উপরে ভিত্তি করে সুর। এখন যেমন এসব কাজে এই রেকর্ড করে রাখার রেওয়াজটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে, সেই পঁচিশ বছর আগে সেটা ছিল না। তার জন্য পরে আমাকে খুব ভুগতে হয়েছে। সে-কথা পরে। ওই গানটি অবশ্য দ্বিতীয় অঙ্কে চলে যায়। তবলা-তরঙ্গ এবং মন্দিরা-তরঙ্গর ব্যবহারও অত্যন্ত নতুন ছিল। পুরো ভাবনাটাই মাস্টারমশাইয়ের। ওই প্রথম বাঁশিতে একটা সুর বাজে। তবলা একটা ছোট্ট রোলিং হয়। আর তার পরেই তবলা-তরঙ্গ বেজে ওঠে 'সা-জ্ঞা-পা, সজ্ঞপ, সা-জ্ঞা-পা, র্সা-পা। ওই সময় থেকেই দর্শকের অন্তরে একটা দুলুনি তৈরি হত। এখনও তাই হয়। মাস্টারমশাইয়েরই এক বন্ধু, বিমলবাবু, আমার রেওয়াজের সঙ্গে তবলা বাজাতে আসতেন। তিনিও ঢুকে পড়লেন জুড়ির দলে। তবলা-তরঙ্গটা অবশ্য তখন বাজাত অনিমেষ। দুর্যোধন-দুঃশাসনের হাসি বোধহয় সেই হাসত। সে তার পাড়া থেকে জুটিয়ে এনেছিল তুষারকে। সে শকুনির হাসি হাসত, এখনও ওই হাসিটা তুষারই হাসে। সে আজও 'নাথবতী অনাথবৎ' তথা পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে যুক্ত। সব মিলিয়ে 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর জন্য আমি আমার গুরুজি ধীরেন দাস মহাশয়ের কাছে একান্তভাবে ঋণী। তিনি সব সময়ে পাশে থেকে সাহায্য না করলে, সাহস না জোগালে এ-নাটক হয়তো ঠিক এই রূপ পেত না। শম্ভু মিত্র-র সাহায্যের পরে যদি কারও নাম করতে হয়, তা হলে মাস্টারমশাই। তারপরে আর সবাই।

আমাদের রাণু 'অপর্ণা হাউস'-এর মালিককে বলে সেখানে নবনির্মিত ফ্ল্যাটে আমাদের মহলার বন্দোবস্ত করে। সেই কে ডি পাল মহাশয় আমাদের যে কী সাহায্য করেছিলেন বলবার নয়। তাঁকে তো প্রথমে রাণু বলেওনি কী নাটক, কী হবে আদতে। অবশ্য তখন কী আমরাই জানি কী হতে চলেছে? রাণু তাঁকে বলেছিল, 'শাঁওলিদি নাটক করবে। আর জেঠু তাতে যুক্ত থাকবে। আর কোনও কথা কিন্তু জিজ্ঞাসা করবেন না!' রাণুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই সে-শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। শুধু কি তাই? দামি কাচের বাসন, হিটার ইত্যাদিও এসে গেল। নিমাই বোস, রাণুর বাবা, ম্যাগি সরবরাহ করতেন। তিনি নেসলসে বড় চাকরি করতেন। গ্লাস্টাসও এসে গেল। কাপ-ডিশ সবই দিয়েছিলেন কে ডি পাল। সারা দিন ধরে মহলা হলে সেই সব খাওয়া হত। সে বিপুল আয়োজন। উনি সাহায্য না করলে, বা রানু না থাকলে 'নাথবতী'-র ভবিষ্যৎ কী হত তাও জানি না। ঢুকেই হলটা এত বড় ছিল, প্রায় শিশির মঞ্চের সমান। কেবল গভীরতা একটু কম। সেই জন্যে নাচের পা গোনা সময়ের হিসাব ঠিকঠাক করায় এত সাহায্য হয়েছিল। নাট্যপ্রক্রিয়াতে 'টাইমিং' ব্যাপারটা তো ভীষণ জরুরি! এপ্রিল থেকে মহলা শুরু হয়েছিল আমার নিজের বাড়িতে। সে একটা ৮ ফুট বাই ৮ ফুটের ঘর। সিলিং নিচু। হাত তুললেই ছাদে ঠেকে যায়। তার মধ্যে বইয়ের আলমারি, টেলিভিশন সেট, হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা। একটা সোফা-কাম-বেড। তারই মধ্যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা। তাইতেই রাণু একেবারে উঠে পড়ে লাগল মহলার জায়গা খুঁজতে। অপর্ণা হাউসে জায়গা পাবার পরে বউবাজারের কাঠের দোকানে গিয়ে সেট করতে দিয়ে এলাম। নিজের সামান্য সঞ্চয় থেকে কস্টিউম, গয়না, মঞ্চ-নির্মাণের খরচ। খুঁজে খুঁজে ঠিক রঙের ঠিক ধরনের শাড়ি অথবা ঠিক ঠিক গয়না বেছে বেছে কিনতে কম হাঙ্গামা হয়নি! মহলার খরচ লাগছে না তাই! তারই মধ্যে বিজ্ঞাপন জোগাড় শুরু হল। পার্থ বা বিদিতের মোটরবাইকের পিছনে চড়ে তখন কত যে ঘুরেছি। বাবার অপর একজন ভক্ত ছিলেন দেবীবাবু। তিনি স্পনসর জোগাড় করতে সাহায্য করলেন। তিনি শিপিং কর্পোরেশনে বড় কাজ করতেন। পরে আমার সম্পর্কে তাঁর এত স্নেহ হয়েছিল, যে আমাকে 'মেয়ে' বলে ডাকতেন। তাঁর মধ্যস্থতায় ন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পানি টিকিট-হোর্ডিং-ব্যানার ইত্যাদির দায়িত্ব নিলেন। তরফদারদের রোল্যান্ড রোডের তখনকার বিশাল সিঁড়িওয়ালা বাড়িতে গিয়ে ছবি তোলা হল। তার মধ্যে একটি ছবি খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। পায়েল খুলতে গিয়ে হাঁটুর উপরে রেখে থেমে যাওয়া। সেইটাই বিজ্ঞাপনে ব্যবহার হত।

'নাথবতী অনাথবৎ' লেটারিংটি করে দিয়েছিলেন স্বয়ং খালেদ চৌধুরি। মঞ্চ পরিকল্পনা তো তখন তিনি করতেনও না। আর ওইরকম ছোট ছোট জিনিসের ব্যবহার আমার ভাবনাটাতে ছিল বলে মঞ্চের কথা কাউকেই বলা হয়নি। তবে ফোল্ডারের ডিজাইনের সময় খালেদকাকাকে আমার কিছু ভঙ্গি দেখিয়েছিলাম। খালেদকাকা ওই পায়েল খোলার ভঙ্গিটাই পছন্দ করে এঁকে দিয়েছিলেন। প্রথম ফোল্ডারে তা-ই ছিল। পরে খালেদকাকাই বলেন, ছবিটা অনেক বেশি এফেক্টিভ হচ্ছে, ওটাই ব্যবহার কর।

আমার নাচের অংশগুলোর জন্য শরণ নিয়েছিলাম ওড়িশি নৃত্যশিল্পী অরুন্ধতী রায়ের। বস্তুত নাটকটি যখন একটু লিখেছি, তখন মনে হয়েছিল মনে যে সব ছবি আসছে তার স্পষ্টতা পেতে গেলে আমাকে একটু নাচ শিখতে হবে। তখন অরুন্ধতীর বাড়িতে গিয়ে তালিম নিয়েছি, প্রচুর ক্ল্যাসিকাল নাচের অনুষ্ঠান দেখেছি। পরে যখন লম্বা একটা ছেদের পরে আবার লিখতে বসেছি, তখন দেখেছি সেই অন্তর্বর্তী কাজটা আমাকে খুব সাহায্য করেছে। লেখা হয়ে যাবার পরে অরুন্ধতীকে শুনিয়েছি নাটক। তারপরে ওঁর সাহায্য নিয়েছি। যেমন গানের বেলায় কিছু কিছু গানে নিজেকে সুর দিতে হয়েছে, বা আপনা থেকে সুরসহই গানটি ভেসে উঠেছে, সেইরকম নাচের বেলাতেও যে হয়নি তা নয়। কিন্তু অরুন্ধতীর সাহায্য যে এ ক্ষেত্রে আমার বড় একটা প্রাপ্তি। এ কথা অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই।

এর মধ্যে লুনা, আমার ভাগনি, অলঙ্কার পছন্দের কাজে আমাকে সাহায্য করতে শুরু করেছে। আমার পায়ে আঁকা নিয়ে লুনার কত গবেষণা। যে পায়েলটি এখনও ব্যবহার করা হয় সেটি লুনার সঙ্গে গিয়েই কেনা। লুনা ভাল আঁকতে পারত। তাই ও এসব ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে। এরই মধ্যে মায়ের পালিতা কন্যা মেরিনা 'প্রম্পটিং'-এর দায়িত্ব নিয়েছে। মেরি বহু

বছর মাকে ব্যাকস্টেজে সাহায্য করেছে। এ কাজে ও ভীষণ পটু ছিল। ও আর রানিদির ছিল আমাকে ভেতরে সাহায্য করবার দায়িত্ব।

আর একজন যে লেখার পর্ব থেকে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে, সে হল প্রতিমা। প্রতিমা আমার হেল্পিং হ্যান্ড ছিল। সে নিজে পড়তে পারত না, কিন্তু আমার যা কিছু লেখার ব্যাপারে তার বিষম আগ্রহ ছিল বরাবর। একটু লেখা হলেই সেই অংশটা ওকে শোনাতে হবে। সে যখন দেখল, কাজটা খাটুনির সে সংসারের সব দায়িত্ব নিয়ে নিল। আমাকে কিচ্ছুটি ভাবতে হত না। কী করে আমার জন্যে লেখার সময় করে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে ও সচেষ্ট থাকত সব সময়ে। লেখা শুনে প্রতিক্রিয়া জানাত, উপদেশ দিত। অনেক সময়ে সেগুলো যথেষ্ট মূল্যবান হয়ে কাজে লেগেছে। প্রতিমার স্বাভাবিক কিছু বোধ ছিল, কিছু বুদ্ধি ছিল। অনুভূতি ছিল। অনেক পড়াশোনা জানা মানুষের চাইতে ওর পরামর্শ আমাকে অনেক বেশি সাহায্য করেছে।

যেদিন নাটকটি শেষ করি সেদিন বিদ্যুৎ নেই। পুরো মহল্লা অন্ধকারে ডুবে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে লম্ফর আলোয় শেষ করছি। বাড়িতে প্রতিমা আর আমি। প্রতিমা যেন দমবন্ধ করে বসে আছে কখন শেষ হবে লেখাটা। শেষ হতেই কাছে এসে শোনবার আশায় বসল। তখন সে আমি ঠিক কথা বলবার অবস্থায় নেই, সে কথা ও বুঝতে পেরেছিল। তাই চুপ করে বসেছিল। আমিও চুপ। একটু স্বস্থ হয়ে ওকেই শোনালাম নাথবতী সেই অনাথবৎ-এর কথা। খুব শক্ত মেয়ে প্রতিমার চোখ দিয়ে সেদিন জল পড়েছিল। চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল, 'এটা ফেলে রাখবেন না। এটা করুন!' তখন তো সত্যিই করবার কথা ভাবাটাও বাতুলতা। কেউ নেই আশেপাশে। কে সাহায্য করবে? কারা গান গাইবে? লিখে তো ফেলেছি। কিন্তু করব কী করে?—পরের দিন সকালে বাবা শুনে, চোখ মুছে বললে, 'এটা কর!' তারপরের দিন সকালে মাকে শোনালাম। মা নরম ছিল। সহজে কান্না পেত। মা তো ভয়ানক কান্নাকাটি করতে শুরু করলে। তারপরে বললে, 'এটা ফেলে রাখিস না মা। এটা কর!' এই করে সেকাজের শুরু। একে একে মাস্টারমশাই, অরুন্ধতী, আমার ছাত্র অনিমেষ, লুনা, রাণু...। হাতে স্ক্রিপ্ট কপি করে দেওয়ার থেকে শুরু করে কত কাজ দিয়েছে রানিদি, লুনা।

একটু তৈরি হওয়ার পরে মা-ও আসতে লাগল মহলায়। অপর্ণা হাউসে তখন সিঁড়ি ভেঙে ছ'তলায় উঠতে হত। তাইতে মায়ের সেখানে নিয়মিত যেতে কষ্ট হত। কিন্তু মঞ্চ-মহলাগুলোতে যেত। অভিনয় নিয়ে, মেক-আপ নিয়ে কত পরামর্শ দিত। অভিনয়ের দিন আমাকে সাহায্য করে বাকি মেয়েদের মেক-আপ করে দিয়েছিল মা-ই। শুধু একদিন নয়। তারপরে বেশ কিছুদিন। যতদিন না ওরা নিজেরা করে নিতে শিখেছে। মেক-আপের অনেক জিনিসপত্তর দিয়েছিল আমাদের।

আর বাবার কথা কী লিখব? বাবা আমাকে লেখার সময়ে যখনই আটকে গিয়েছি পাল্টা প্রশ্ন করেছে, 'তুই কী বলতে চাইছিস আমাকে বল্!' তখন তো একটা যুক্তি দিতে হয়েছেই। আর আমার ভেতরটায় ক্রমশ স্বচ্ছতা এসেছে। তবু দু'একটা জায়গা নিয়ে বাবা সন্তুষ্ট ছিল না। ১) দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু। ২) দ্রৌপদী যেখানে কীচকের হাতে অপমানিত হওয়ার পরে রাত্তিরের অন্ধকারে ভীমের কাছে যাচ্ছে। পুরো নাটকটাই সমস্তটা লেখা হয়ে যাওয়ার পরে আমি বার কয়েক লিখেছি। আর ওই দুটি জায়গা যে কতবার লিখেছি তার কোনও সীমাসংখ্যা নেই। প্রথম যেদিন বাবার কাছে একটু মহলা দিয়ে বুঝে নিতে গিয়েছি, একটু বলবার পরে বাবা কিঞ্চিত অসন্তুষ্ট মুখে চুপ করে রইল। তারপরে বলল, 'তুই বড় ভাল লিখেছিস রে!' বাকি যেটা বলল না, সেটা 'নিজের লেখাটাকে নষ্ট করছিস?' বহুদিন পর্যন্ত বাবা মহলায় বসে থেকে অভিনয়ে সাহায্য করে দিয়েছে। বাবা কদাচিৎ দেখাত। বেশিরভাগ সময়ে অবস্থাটা, হয় নিজে বিশ্লেষণ করত, নইলে আমাকে বিশ্লেষণ করতে বলত। তারপরে সেই যুক্তি অনুযায়ী অভিনয় আদায় করে নিত। ভাল করে বাবার কাছে অভিনয়ের পাঠ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি তখন। অত বছর পরে। তারপরে 'আলো'। 'গান'-এর সুর শুনে পরামর্শ দেওয়া।

১১, ১২ আর ১৪ অগাস্ট ছিল এ-নাটকের প্রথম তিনটি অভিনয়। প্রথম দু'দিন শিশিরমঞ্চে। তৃতীয় অভিনয় রবিবার সকালে অ্যাকাডেমিতে। কী কারণে জানি না প্রথম থেকেই এ-নাটক নিয়ে দর্শকদের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ হয়েছিল। একেই বোধহয় দৈবজ্ঞরা বলেন, 'গ্রহ'। প্রথম দিন কাউন্টার খুলতেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেল। তিন দিনের বেলাতেই! নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই দু'-দুটি অভিনয় বুক করে নিল দুটি সংগঠন। তারা রবীন্দ্রসদনে করাবে। দর্শক-প্রতিক্রিয়া খুব ভাল হল। দু-একটা ছাড়া বেশিরভাগ কাগজে বেশ ভাল লিখল। বেশ ধন্যি ধন্যি ভাব। বাবা জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন মনে হচ্ছে?' বললুম বিশেষ কিছু নয়। মনে হচ্ছে, 'এসব অনিত্য।' বাবা বোধ করি খুশি হয়েছিল। মা আহ্লাদে আটখানা হয়ে একটি সিল্কের শাড়ি কিনে দিলে ঠিক কস্টিউমের নকশার মতো। বললে, 'এটা পরে করবি!' আমি বলি, মাথা খারাপ? এত দামি শাড়ি পরে মঞ্চে গড়াগড়ি যাই আর কী!'—

এর মধ্যে একটাই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল, যারা এতদিন মহলা দিয়ে জুড়িতে অংশ নিল, রোজ মহলা দিইয়ে যাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে দিয়েছিলাম তারা কেউ যোগাযোগ করছিল না। এরা কেউ থিয়েটারের লোক নয় তো, এত মহলা যে দিতে হয়, এদের কোনও ধারণা ছিল না। নানা অনুযোগ তাই শোনা যাচ্ছিল। ভাবছিলাম, বড়ই ক্লান্ত বোধহয়। যোগাযোগ ছিল রানু, রাখি, বিজয়লক্ষ্মী, রানিদি, লুনা এদের সঙ্গে। কিন্তু বাকিরা?

সবাই যখন বেশ খুশি তখনই অপ্রত্যাশিত আঘাতের মুখোমুখি হতে হল। দিনটা কি ২২ আগস্টই ছিল? না। বোধহয় ২১। সারথির এক সদস্যর বাড়িতে আমাদের দু'একজনের দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ হল। যাওয়া গেল। সেখানে রাণু, রাখি, আমি, কালীপ্রসাদ ঘোষ আমন্ত্রিত। গিয়ে দেখি আমার আবৃত্তির ছাত্র অনিমেষ, রানিদির ভাসুরপো রুণু—তারাও রয়েছে। শোনা গেল, তাদের কিছু 'বক্তব্য' রয়েছে। কী এমন বক্তব্য? বক্তব্য নয়, অভিযোগ! অভিযোগ নানা। তার মধ্যে শম্ভু মিত্রর নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে কিছু কড়া নিয়ম জারি করেছিলেন, বিশেষত অভিনয়ের দিনগুলোর জন্য, তাই নিয়েও। যেমন যারা নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত নয়, তারা কেউ উইংস-এর ধারে দাঁড়াবে না; যাদের টিকিট নেই তারা অডিটোরিয়মে যথেচ্ছ ঢুকে পড়তে পারবে না; সাজঘরে যাদের প্রয়োজন নেই, তারা ভিড় বাড়াবে না। এইরকম কিছু সাধারণ নিয়ম, যা থিয়েটার করতে গেলে মানতেই হয়। সারথির প্রয়োজনমতো 'কমপ্লিমেন্টরি' টিকিট কেন দেওয়া হয়নি? অভিযোগ তাই নিয়েও। বিজ্ঞাপনদাতাদের টিকিট দিয়ে যা আসন পড়ে ছিল তা যে কাউন্টার খোলা মাত্র ভর্তি হয়ে যাবে তা আমাদের জানা ছিল না। আর টিকিট বিক্রি হয়ে গেলে যে-কোনও নাটকের পক্ষে সেটা শুভ। নিজেদের লোক তো পরেই দেখতে পারে,—আমাদের কাছে আবার এই প্রতিক্রিয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। অপর পক্ষের মনে হচ্ছিল শাঁওলি মিত্রর ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়, বাবা-মা-কাকা-কাকিমা—এঁরা কী করে টিকিট পেলেন? আরও অভিযোগ ছিল, 'ডিমোক্র্যাটিক রাইট' নিয়ে প্রশ্ন! একটা কথা পুনরায় মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন,—প্রযোজনার খরচ কিন্তু আমার ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকেই ব্যয় করা হয়েছিল। সে অর্থ সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের উপার্জনের সঞ্চয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের অভিযোগ যেটা ফুটে বেরিয়ে এসেছিল তা হল,—প্রেস কেন শাঁওলি মিত্র-শম্ভু মিত্রকে নিয়েই লেখালেখি করল? আর কারও নাম কেন উল্লেখ করল না? খালি কি শাঁওলি মিত্র একাই সবটা করেছে? অন্য সবাই কি কিছু কম খেটেছিল? এমনকী, আবহ পরিকল্পনার উল্লেখ পর্যন্ত কেউ করেনি কেন? ভাবটা হল,—সবাই সবটা করে দিল, আর লাভের গুড়টা অন্য লোকে নিয়ে গেল। এই নিয়েই ক্রোধ।—ফোল্ডার বা ব্রোশিওরে সবারই নাম ছিল, সেগুলো স্বভাবতই প্রেসকে দেওয়া হয়েছিল,—কেন তাঁরা উল্লেখ করেননি তা তাঁরাই বলতে পারতেন।


'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকের দৃশ্য

চুপ করে সমস্ত অভিযোগ শোনা ছাড়া আমার আর কোনও কাজ ছিল না। প্রশ্নবাণ শুনে অল্পবয়সি রাণুদের তো চোখে জল আসার উপক্রম। কালীপ্রসাদ ঘোষ সকলের সামনেই বললেন, 'কী উত্তর দেবে?' প্রযোজক হিসাবে শম্ভু মিত্রর নাম ছিল। এখনও তাই-ই থাকে। ওইটুকু স্বীকৃতিরই অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। আমি বললাম, 'প্রযোজককে গিয়ে জানাই। দেখি তিনি কী বলেন!' ততক্ষণে আমার মন একরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। কিন্তু তখন তা কাউকে বলবার প্রয়োজনবোধ করিনি। এর পর খাওয়া-দাওয়া, গৃহস্থের আয়োজনের প্রশংসা ইত্যাকার লৌকিকতা সেরে বেরিয়ে আসছি। তখন প্রশ্ন হল, 'এর পরে কবে রিহার্সাল?' সেপ্টেম্বরে দু'টি আমন্ত্রিত অভিনয় ধার্য হয়ে গিয়েছিল। একটি ৮ তারিখে, একটি ২৫ তারিখে। আমি ৪ তারিখ নাগাদ সবাইকে খোঁজ নিতে বলে চলে এলাম। তারপরে একেবারে নতুন জুড়ির দল তৈরির চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলাম। এবং হলও! বাঁশির রবীন মজুমদার আর অনিমেষের পরিচিত তুষার রয়ে গেল। রাণু-রাখি-বিজয়লক্ষ্মী রয়ে গেল।

'পঞ্চম বৈদিক'-এর যাত্রারম্ভ

একে-ওকে বলে নতুন অনেকে এল। অরুন্ধতীর সাহায্যে এল তড়িৎ ভট্টাচার্য। তড়িৎ তখন ওড়িশি নাচের সঙ্গে গাইবার জন্য প্রথম নম্বরের গায়ক ছিল। অসম্ভব ভাল হারমোনিয়াম বাজাতে পারে। গলার আওয়াজটিও তখন ভীষণ ভাল। কিন্তু 'মিউজিক' তো কিচ্ছু রেকর্ড করা ছিল না। ফলে পুরো মিউজিকটা মুখে মুখে শুনিয়ে তড়িৎকে তোলানো। তারপরে গানের সুর তোলানো নতুনদের। তবলাতরঙ্গ-র লোক তৈরি, গুবিযন্ত্র বাজাতে শেখানো। মন্দিরা বাজাতে শেখানো। কতরকম কাজ। মাস্টারমশাইয়েদের কাছে গিয়ে দেখা গেল, তাঁরাও খুব শীতল। নীহারবাবু, যিনি মাদল আর হাঁড়ি বাজাতেন এবং বিমলবাবু, যিনি তবলা বাজাতেন, তাঁরা জানিয়েই দিলেন, তাঁরা আর করবেন না। আমার গুরুজিও বললেন তাঁর পক্ষে যুক্ত থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সবটাই নতুন করে ভাবা। তড়িতের সূত্রে এল অপু, অরূপ মান্না। খোল আর ঢোল বাজাতে। রতন বসু রায় এসেছিল আগেই। কিন্তু সে তখন অংশগ্রহণ করেনি। সে তবলা ধরল। রতন তবলাটা খুবই ভাল বাজাত। পার্থ ও বিনীতা বলে দু'জন ছেলেমেয়ে সুব্রত পালের সূত্রে এল। দু'জনেই গান গাইতে পারে।

এইরকম অবস্থায় এত মাসের খাটুনি বেবাক বিসর্জন দিয়ে তৈরি হল নতুন জুড়ি। ৪ তারিখে পুরনোরা যোগাযোগ করলে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। আমার মনে হয়েছিল এতটাই ক্ষত যখন ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়েছে, তখন সেটা নিয়ে কাজ করতে গেলে তা প্রযোজনার ক্ষতি করবে। তার চেয়ে ওদের যুক্ত না থাকাই ভাল। ফলে ওই দুটি অভিনয় 'শাঁওলি মিত্র-র দল' হিসাবে মঞ্চস্থ হল। ওই সেপ্টেম্বরের শেষেই নতুন সংস্থার রেজিস্ট্রেশন করতে হল, কারণ আরও অভিনয়ের আমন্ত্রণ প্রায় প্রত্যহই বাড়ছে। তাই একটা সংস্থার একান্ত প্রয়োজন। সেই সংস্থার নাম হল 'পঞ্চম বৈদিক'। নামটি শম্ভু মিত্র-র দেওয়া। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রইলেন,—শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, দুর্গা মিত্র, শংকর মিত্র, আমি, নিমাই বোস আর সুব্রত পাল। আমাকে 'সভাপতি' করা হল। আর সম্পাদক হলেন নিমাই বোস।—এই বেদনার মধ্যে 'পঞ্চম বৈদিক'-এর জন্ম।

দীর্ঘ ২৫ বছর পরে স্মৃতিচারণে অল্পবিস্তর ত্রুটি থেকে যেতে পারে। তবে মোটামুটি এর জন্মকাহিনিটি এইরকম। এর আরও অনেক খুঁটিনাটি ছিল। বাহুল্যবোধে সেসব বর্জিত হল। অ-সাধারণ এই শুরুর কাহিনি। তারপরেও নিত্য কত ঝড়ঝাপটা! এই পঁচিশ বছর ধরে! সেটা অবশ্য 'সাধারণ' এবং 'স্বাভাবিক'।

জন্মদিন

কবে পঞ্চম বৈদিক-এর জন্মদিন? যেদিন 'নাথবতী অনাথবৎ' প্রথম অভিনীত হয়? অর্থাৎ ১১ আগস্ট? নাকি, যেদিন খাতায়-কলমে 'পঞ্চম বৈদিক' নামটির রেজিস্টারি হল? আমি জানি না। আমার কখনও আগ্রহ হয়নি এসব নিয়ে ভাববার। আমরা কখনও জন্মদিনের উৎসব পালন করিনি। কখনও কখনও ১১ আগস্ট নিজেদের মধ্যে আনন্দ করেছি। মনে হত, এখনও হয়, যদি কিছু অর্থবহ কাজ করতে পারি তো সেই ঢের। আর এখন যারা মূলত, পঞ্চম বৈদিক-এর কাজকর্ম করছে, তারা কেউই ১১ আগস্ট ১৯৮৩-তে আমাদের সঙ্গে ছিল না। ফলে ১১ আগস্ট নিয়ে তাদের কোনও আবেগ না-থাকাই স্বাভাবিক। তাই...!



পঞ্চম বৈদিক-এর হাল ধরেছেন অর্পিতা ঘোষ।

এর মধ্যে ১৯৯৮-তে 'অগ্নিমন্থ' মঞ্চস্থ করল। তার নিজেরই নাটক। থিয়েটার থেকে দূরে থাকলেও সাধ্যমতো সাহায্য করেছিলাম। যেমন এখনও করে চলেছি অর্পিতাদের। সবসময়েই মনে হয় কেউ যদি কিছু কাজ করতে চায়, আর আমার দ্বারা যদি কোনও সাহায্য হয়, না হয় করলামই সাহায্য!

'নাথবতী অনাথবৎ' করবার পরে যে কোনও কারণেই হোক মানুষজনের ভাল লেগে গেল। আর তার তাই প্রচুর অভিনয় হতে লাগল। তখন সবাইকেই অর্থ দেওয়া হত। ইচ্ছে ছিল করলে এই পেশাদারিত্ব বজায় রেখেই করব। পারিনি। অন্য অনেকের ইচ্ছে অনুযায়ী ক্রমে পদ্ধতি বদলাতে হয়েছে। আজও সেই দুয়ারে দুয়ারে অভিনয়ের মঞ্চ ভাড়া নেওয়ার জন্য ভিক্ষা করতে হচ্ছে। কারও কাছেই এটা খুব অস্বাভাবিক লাগে না। কারণ এইটাই প্রচলিত পন্থা। তবে বলাই বাহুল্য আমার খুব ভাল লাগে না সেটা।

যখন 'নাথবতী'-র প্রচুর অভিনয় প্রচুর সম্মান,—সেই ১৯৮৪ সালেই ঘটল ভোপালের গ্যাস-দুর্ঘটনা। তখন আমরা কেবল এটাকে একটা 'ভয়াবহ দুর্ঘটনা' বলেই মনে করেছিলাম। এর পিছনের কাহিনি জানা ছিল না। শম্ভু মিত্র সবসময়েই আর্তদের জন্যে কিছু করে এসেছেন। তিনি বললেন, আমাদের কিছু করা উচিত। 'এশিয়ান পেইন্টস'-এর সাহায্য নিয়ে আমরা এক সন্ধ্যায় প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা তুলে মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকাভিনয়ের সঙ্গে ছিল শম্ভু মিত্র-র 'রাজা অয়দিপাউস' পাঠ। আমার খুব অল্পবয়স থেকেই নাট্যশিক্ষার একটি কেন্দ্র গড়ার আগ্রহ ছিল। সেই মতো একটি শিক্ষাকেন্দ্র চালু হল। তার নাম দেওয়া হল 'পঞ্চমবেদ চর্যাশ্রম'। সেখানে মাইনে নিয়েই ছেলেমেয়েদের শেখানো হত। শিক্ষকদেরও যাতায়াতের খরচবাবদ কিছু দেওয়া হত। পুরো খরচটা মূলত 'নাথবতী অনাথবৎ' থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়েই চালানো হত। সেই আশ্রমে তৃপ্তি মিত্র মেক-আপ এবং অভিনয়ের ক্লাস নিতেন। আবৃত্তি, স্বরচর্চা এসব দেখানো আমার কাজ ছিল। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা নাটক ও নাট্যইতিহাস পড়াতেন। তিন রকমের গান শেখানো হত। তড়িৎ শেখাতেন উচ্চাঙ্গসঙ্গীত। নান্দীকারের পুরনো সদস্য পরিতোষ পাল তখন যুক্ত হয়েছেন এই সংস্থায়। তিনি পল্লিসংগীত শেখাতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন অর্ঘ্য সেন। নাচের শিক্ষক ছিলেন অরুন্ধতী রায়। মূকাভিনয় শেখাতেন সিরাজুল ইসলাম। আলোর বিষয়ে বলতেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। তিনিও তখন যুক্ত হয়েছেন 'পঞ্চম বৈদিক' সংস্থায়।

এছাড়া আমরা বিজ্ঞান বিষয়েও পড়াশোনার বন্দোবস্ত করেছিলাম। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের ফলেই তো সভ্যতার রকমটা বদলে গিয়েছে। সেই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা খুব জরুরি বলে আমাদের মনে হত। ক্লাস নিতেন অধ্যাপক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাঝে মাঝে বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ক্লাস নিতেন। তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানের লোক ছিলেন।

সে-বছর শম্ভু মিত্র নিজে 'রক্তকরবী' পড়িয়েছিলেন। সে আমাদের খুব বড় প্রাপ্তি ছিল। এর মধ্যে আমাদের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। 'অপর্ণা হাউস' থেকে আমাদের সরে আসতে হয়েছে। আইপিইআর সংস্থার ভাড়া করা ফ্ল্যাট সার্কাস অ্যাভিনিউতে। বিজলি মল্লিক ছিল তার একজন প্রধান কর্মকর্তা। এই সংস্থার হয়ে বেশ কিছু বার বাবা আগে অভিনয় করে টাকা তুলে দিয়েছেন। বহুরূপী থেকে 'দশচক্র' 'অয়দিপাউস' তো হয়েই ছিল মনে আছে। আমরাও করেছিলাম 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর অভিনয়। সংস্থাটি মানসিকভাবে পঙ্গুদের নিয়েও কাজ করত। কাজ করত শিশুশ্রমিক নিয়ে। গরিব বাচ্চাদের স্কুল চালাত। সন্ধেবেলায় তাদের ওখানে কোনও কাজ হত না। বিজলি ব্রেবোর্নে আমার সঙ্গে পড়েছিল। ওকে বললাম আমার স্থানাভাবের কথা। ওরা রাজি হওয়ায় ওখানেই চলতে লাগল আমাদের কর্মকাণ্ড।

'দশচক্র' ১৯৮৫

'দশচক্র'-র কর্মকাণ্ড আমাদের পক্ষে সশ্রদ্ধায় স্মরণীয় এক কর্মযজ্ঞ। আমার পক্ষে তো বটেই। ওই সময়ে আমি অনেক কাজ শিখেছি, যা আগে শিখিনি। শিখব বলে হয়তো তেমন করে ভাবিওনি। পরে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে বলেই বোধহয় অমন একটা সুযোগ এল সামনে।

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে এক বীভৎস ঘূর্ণিঝড়ে প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। তারই জন্যে টাকা তুলতে এবারে 'দশচক্র' মঞ্চস্থ করবার কথা। 'দশচক্র'-তে অভিনয় করবার মতো ছেলেমেয়ে নেই আমাদের সংগঠনে। শম্ভু মিত্র তখন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়— এঁদের সঙ্গে কথা বললেন। যুক্ত হল সংস্তব, থিয়েট্রন এবং নান্দীকার। পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে এই তিনটি দলের মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হল নতুনভাবে 'দশচক্র' নাট্যের নির্মাণ। ইতিমধ্যে আইপিইআর জানাল তাদের ফ্ল্যাটে আর তারা করতে দিতে পারবে না মহলা। এদিকে 'দশচক্র'-র কাজ শুরু হতে চলেছে। আবার অপর্ণা হাউসের কাছে দরবার করা হল। কিন্তু তখন তাদের আর দেওয়ার উপায় ছিল না। তবু তারা পাশের একটা চাতাল ব্যবহার করতে দিল। সেই চাতালেই মালপত্র নিয়ে ওঠা হল।

এর মধ্যে অর্ঘ্য সেন খবর আনলেন, তাঁর এক ছাত্রীর বাড়ির নতুন ফ্ল্যাট হয়েছে। তারা এখনও সেখানে বসবাস শুরু করেনি। শম্ভু মিত্রর নামে তাঁরা খুবই আগ্রহী। লোয়ার সার্কুলার রোডে এক্সাইডের মোড়ের কাছে বাড়ি। আমরা দেখে এলাম। কাজ করতে শুরু করবার পরে জানতে পারলাম এটি আমাদের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর শ্যালিকা মঞ্জুলা রায় এবং ভায়রা ভাই জয়ন্ত রায়ের বাড়ি। কী

কাণ্ড!— তাঁরাও খুব যত্ন করে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন আমাদের।

যেহেতু তাঁরা শম্ভু মিত্রর নামেই উৎসাহিত হয়েছিলেন সে বাড়িতে আমরা একদিনও 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর মহলা দিইনি। সে মহলা দেওয়া হত কে ডি পাল মহাশয়ের অনুগ্রহে নির্মীয়মাণ মন্দিরের চাতালে। খুব অসুবিধা হয়েছে কিন্তু তখন আমাদের আর উপায় নেই। শুধু আমাদের নয়, ওঁদেরও খুবই অসুবিধা হত। কিন্তু বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না কোনওমতেই। তার মধ্যে মহলার চাপ, অভিনয়ের চাপ। ১৯৮৫-র সেপ্টেম্বরে 'দশচক্র' মঞ্চস্থ হল। দু'রাত ধরে সেই বর্ষার শেষের অসুবিধা নিয়ে লোকে টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়ালেন। জনপ্রতি চারটি করে টিকিট দিয়েও সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে রবীন্দ্র সদনের ছ'টি অভিনয়ের টিকিট সব শেষে হয়ে গেল! বিজয়লক্ষ্মী বর্মন শম্ভু মিত্রর স্ত্রী হৈমর ভূমিকায় করলেন। দ্বিজেন করলেন করুণাকিরণ, আমাদের নতুন বছরের চর্যাশ্রমের ক্লাসে ভর্তি হওয়া কয়েকজনকে ডাকা হল। তার মধ্যে শ্যামল চক্রবর্তী করলেন ধ্রুব। কালীপ্রসাদ ঘোষ অমলেন্দু গুহ। নান্দীকারের পরিমল রায় করলেন রাধানাথ। শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়—সমরেশ। শম্ভু মিত্রর শ্বশুরের ভূমিকায় বহুরূপীতে যিনি করতেন, সেই সুনীল সরকার এসে করলেন। তিনি তখন আর বহুরূপীতে যুক্ত নন। কুন্তল বলে আমাদের চর্যাশ্রমের একটি ছেলে করল কেষ্ট। পাঠভবনের একটি ছেলে এসে ডাঃ গুহর ছেলের ভূমিকায় করল। আর আমি তাঁর মেয়ে।

অল্পস্বল্প ত্রুটি হলেও হয়ে গেল অভিনয়। এক লক্ষ পাঁচ হাজার, সম্পূর্ণ টিকিট বিক্রির টাকা দিয়ে দেওয়া হল প্রফেসর সুশীল মুখোপাধ্যায়ের হাতে ত্রাণ তহবিলে দিয়ে দেওয়ার জন্যে। কী কারণে জানি না বাংলাদেশের হাই কমিশন আসতে রাজি হননি। এই ব্যাপারটা আমার খুব জানা নেই। সেবার মহলার ব্যবস্থাপনা, শম্ভু মিত্রর সহকারী হিসাবে প্রযোজনার মঞ্চব্যবস্থা, কস্টিউম এবং মহলায় সম্পূর্ণ সুবিধা-অসুবিধা, আবহ পরিকল্পনায় সাহায্য করা—এসব দায়িত্ব ছিল আমার। অর্ঘ্য সেন, তড়িৎ আর আমি সুরে গলা মিলিয়েছিলাম।

যৌথকাজে যেমন হয়,—নানান সুঘটনা, দুর্ঘটনা, অবাঞ্ছিত আবার অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটে থাকে, সেই রকম করেই সমাধা হল এ-কর্মযজ্ঞ। তবে বেশিরভাগটাই খুব ভাল অভিজ্ঞতা। মনে আছে শেষ অভিনয়ের দিন সকলের কী মন খারাপ। 'ব্যস! কাল থেকে আর আসব না রিহার্সালে!' ওইটাই আমার প্রাপ্তি। কারণ দেখাশোনার সব কাজের দায়িত্ব ছিল আমারই ঘাড়ে।

নান্দীকারের জ্যোতি নিয়েছিলেন আলোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব এবং নান্দীকারেরই সোমনাথ নিয়েছিলেন শিফটিং-এর দায়িত্ব। দু'টোই খুব সক্ষমভাবে সম্পন্ন করবার কাজ। ত্রুটি হলেই মুশকিল। সবার আগ্রহে, এবং দর্শকের একান্ত আকাঙ্ক্ষায় শম্ভু মিত্র রাজি ছিলেন আরও দশটি অভিনয় মঞ্চস্থ করতে। সম্ভবত ডেমোক্র্যাসির আইন রক্ষার্থে, কর্তৃপক্ষ দশটি দিন ধার্য করতে চাননি এই অভিনয়ের জন্য। তাই সেই 'দশচক্র'ই নির্দেশক এবং অভিনেতা হিসাবে শম্ভু মিত্রর শেষ মঞ্চাবতরণ হয়ে রইল। যদিও তার পরে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন তিনি। এবং অনেকদিন পর্যন্ত বেশ সক্ষম ছিলেন। সেবারে, এমনকী দূরদর্শন থেকে প্রস্তাব আসাতে, ওটা তুলে রাখতে দিতেও রাজি হয়েছিলেন তিনি! যা পূর্বে কখনও চাননি। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে, তাঁরা আর এগোলেন না। সেই একটা দুঃখ রয়ে গিয়েছে আমার মনে। সে-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার মতো লোকও আর পাশে কেউ নেই।

রাজা ১৯৮৭

১৯৮৬-তে শুরু হয়ে গেল 'রাজা'র প্রস্তুতি। '৮৭-র মার্চে মঞ্চস্থ হল রবীন্দ্রনাটক 'রাজা'। সে নাটককে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদাসহ উপস্থিত করতে পারিনি। তার জন্যে মনে একটা লজ্জা রয়ে গিয়েছে।

এর পরে বেশ কিছুদিন আমরা নতুন প্রযোজনা কিছু করতে পারিনি। ১৯৮৭ থেকেই মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন খুব। তখনও 'রাজা' ঘষা-মাজার চেষ্টা চলছিল। নতুন হাত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি।

'রাজা'র প্রস্তুতির সময়ে আমরা কোনওক্রমে সতীশ মুখার্জি রোডে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছি। ছোট ছোট ঘর, অন্ধকার-অন্ধকার। উঠোন পেরিয়ে স্যাঁতসেঁতে বাথরুম। মহলার চেঁচামেচি হলেই পাড়ার লোকের ধমকানি। এমনি করেই চলল। ইতিমধ্যে বাবা গোলপার্কের ফ্ল্যাটটা পাওয়াতে 'রাজা'র মহলা সেখানকার বড় ঘরটিতেই দেওয়া হতে লাগল।

১৯৮৭-র পুজোয় আহিরীপুকুর ছেড়ে, বলা যায় আমার প্রিয় পার্ক সার্কাস পাড়া ছেড়ে আমরা উঠে এলুম বকুল বাগানে। সেখানে বিজয়লক্ষ্মী বর্মনেরও ফ্ল্যাট কেনা হচ্ছিল। সতীশ মুখার্জি রোডে তাড়া খেয়ে বিজয়লক্ষ্মীর ফাঁকা ফ্ল্যাটে পঞ্চম বৈদিকের আস্তানা হল।

১৯৮৯-এর মে মাস পর্যন্ত মাকে নিয়ে ছাড়া অন্য কিচ্ছু ভাববার অবসরটি ছিল না। তবে অভিনয় চলছিল। চলছিল 'চর্যাশ্রম'-এর ক্লাস। তখন আর অনেকদিনই মোহিত চট্টোপাধ্যায় আসেন না। সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করায় তিনি কিছুটা পড়াতেন। সিরাজুল ইসলাম তখন মেক-আপ এবং মূকাভিনয় দুটোরই ক্লাস করাতেন। তখন বিজয়লক্ষ্মী তিন বছরের কোর্স শেষ করে স্বর, উচ্চারণ, পাঠ ইত্যাদির ক্লাস নিতে শুরু করেছেন। মাঝে মাঝে অতিথি অধ্যাপক আসতেন। মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি থাকায় আমি আগের মতো অত দায়িত্ব নিতে পারতাম না। একদিন আন্দাজ পেলাম চর্যাশ্রমের কাঠামোয় ঘুণ ধরেছে। কেউই নিয়মিত নয়। একটু চেষ্টা করলাম টেনে তোলবার। কিন্তু ক্ষতি তখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে। কিছু করা গেল না। শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হল চর্যাশ্রম। তত দিনে মা চলে গেলেন। সে সময়টা আমার ব্যক্তিগত জীবনের নিতান্ত দুঃসময়।

অবশ্য তারই মধ্যে দূরদর্শনের জন্য পঞ্চম বৈদিক থেকে তৈরি হচ্ছিল টেলিফিল্ম 'সুভা'। রবীন্দ্রনাথের সেই বোবা মেয়ের গল্প। নানা বিপত্তি কাটিয়ে 'সুভা' পুরোপুরি শেষ হল মায়ের মৃত্যুর পরে। আর 'রাজা' বন্ধ করে দিতে হল। বুঝতে পারছিলাম ভাল করতে পারছি না আমরা।

কথা অমৃতসমান ১৯৯০

ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে 'মহাভারত'-এর নারীচরিত্র নিয়ে একটি সিরিয়াল লিখেছিলাম তেরোটি পর্বে। তাঁর ইচ্ছে ছিল এটি দূরদর্শনে করেন। সেটা ১৯৮৫ সাল। কী কারণে আর মনে নেই, সেটা আর হয়নি। ওইরকম পড়েছিল। '৮৮-র শেষের দিকে যখন মায়ের অবস্থা কিঞ্চিত ভাল, তখন ডাঃ বারীন রায়, ডাঃ অমিত রায়ের উৎসাহে তাঁদের ওয়াটারলু স্ট্রিটের বাড়িতে এক ছুটির দিনে সেই পাঁচ ঘণ্টার বস্তুটি সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পড়া হল। অনেক প্রখ্যাত মানুষ যেমন উপস্থিত ছিলেন, অনেক সাধারণ মানুষও। সকলেরই খুব ইচ্ছে হল আমি যেমন করে হোক এটি মঞ্চস্থ করি। মায়ের মৃত্যুর পরে নিজেকে সামলাতে কিছু সময় লেগেছিল। সেটি মঞ্চের উপযোগী করে তোলবার কাজে হাত দিলাম। ১৯৯০-এর জানুয়ারি মাসে সেটি মঞ্চস্থ হল। আবারও 'মহাভারত' এবং আবারও 'কথকতা' বলে বেশ কিছু সমালোচনা হয়েছিল। তবু এ-কাল পর্যন্ত নাটকটি যে কোনও কারণেই হোক টিকে গিয়েছে। কিছু

মানুষ এমন আছেন, যাঁদের কাছে 'কথা অমৃতসমান' খুব প্রিয়। এই নাটকটির কথা উঠলেই আমার গৌরকিশোর ঘোষের কথা খুব মনে পড়ে। এই প্রযোজনাটি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল।

আমরা জানতাম, আবারও 'মহাভারত' নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করলে একটা কথা হয়তো উঠবে। আর সেই সময় পিটার ব্রুকও তাঁর মহাভারত করেছেন। টেলিভিশনে নিয়মিত মহাভারত দেখানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে মানুষের যেন মনে হচ্ছিল বড়ই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হবেও বা। কিন্তু এ-নাটকে যে বলবার কথাটি ছিল, সেটি আমাদের খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল। তাই 'কথা অমৃতসমান'।

এর পর বাদল সরকারের 'ত্রিংশ শতাব্দী' মঞ্চস্থ হয়েছে। চর্যাশ্রমে যারা শিখতে এসেছিল, এবং ইস্কুল উঠে যাওয়া সত্ত্বেও থেকে গিয়েছিল, তাদের নিয়ে। পরিচালনা করেছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। বস্তুত দু'বার এরকম প্রচেষ্টা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত কোনওবারই তেমন দাগ কাটেনি।

এর মধ্যে পঞ্চম বৈদিক-এর বকুলবাগনের আস্তানাও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হল। বিজয়লক্ষ্মী বর্মনদের এবারে ফ্ল্যাটে উঠে আসবার সময় হয়ে এল। সেটা বোধহয় ১৯৯১-এর কোনও সময়। এদিকে তৃপ্তি মিত্র-র ফ্ল্যাটটিও ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ এসেছে সে-ফ্ল্যাটের মালিকের কাছ থেকে। তাঁর বিয়াল্লিশ বছরের সংসারের অত জিনিসপত্র। সেটা যদিও আমার ব্যক্তিগত সমস্যা, তবু পঞ্চম বৈদিক-এর কাজকর্ম সেই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল বৈকি। মনে হচ্ছিল জায়গার জন্যেই তুলে না দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

এমন সময়ে ডেকে পাঠিয়ে দেখা করতে চাইলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি তখন তথ্যমন্ত্রী। তৃপ্তি মিত্রকে তিনি খুব সম্মান করতেন। তৃপ্তি মিত্রর কাজ করবার জন্যে তিনি পার্ক সার্কাস বাজারের ওপরে একটা জায়গা দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। মনে পড়ে, সেই মে-মাসের ১ তারিখে তিনি গোলপার্কের বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলেন তৃপ্তি মিত্রকে। তখন বলেছিলেন, 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন। জায়গা ঠিক করা হয়েছে তো!' সেই জায়গাটাই পঞ্চম বৈদিকের কাজ করবার জন্য দিতে চাইলেন তিনি। তিনি শুনেছিলেন নাসিরুদ্দিন রোডের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে, এবং তাতে তৃপ্তির জিনিসপত্র রাখার সমস্যা ঘনিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, 'তৃপ্তিদির জিনিসপত্র দিয়ে যদি একটা মেমোরিয়াম কিছু করা যায়, তা হলে সেখানে আপনারা কাজ করলে তাঁর স্মৃতির প্রতি সত্যিকারের সম্মান জানানো হবে।' সেইভাবে পার্ক সার্কাসে আমাদের মহলা শুরু হল। অবশ্যই পুরসভাকে দেয় ভাড়ার পরিবর্তে। আমি নানা কারণে একবার পিছিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। বিপদ তো এক রকমের হয় না! ঈর্ষার নানা মুখ হয়, কুৎসারও। তখন তথ্য-সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেছিলেন, 'কী আশ্চর্য! সরকার তো আপনাকে দান করছে না। আপনি তো কর্পোরেশনকে ভাড়া দিয়ে নিচ্ছেন।' তাই শেষাবধি জায়গাটা নেওয়া। আর তাই জন্যেই মায়ের জিনিসপত্রগুলো বেঁচে গেল। না হলে সত্যিই হয়তো সবই বিক্রি করে দিতে হত। আর আবারও প্রভূত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত।

এই সময়ে একবার দিল্লিতে গিয়ে এই স্মরণ তৈরি করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা পাওয়া গেল। রঘুনাথ গোস্বামী বহু পরিশ্রমে সমস্তটার একটা মার্জিত সুন্দর চেহারা দিলেন। ১৯৯৩ সালে 'তৃপ্তি মিত্র স্মরণ' খুলে দেওয়া হল। আমরা ওখানেই কাজ করতে শুরু করলাম। এর মধ্যে আবারও সার্জারির জন্যে আমার নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়া। দ্বিতীয়বারে 'ত্রিংশ শতাব্দী'র প্রযোজনা। এবারে 'রঙরূপ'-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে।

নাথবতী অনাথবৎ—হিন্দিতে ১৯৯১

'নাথবতী অনাথবৎ'-এর শুরু থেকেই অনেকের মনে হচ্ছিল এ-নাটক হিন্দিতে অনুবাদ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় করা উচিত। সেই উৎসাহে ১৯৮৫ সাল থেকেই আমি কৃষ্ণকুমারজির কাছে হিন্দি শিখতে শুরু করি। প্রাথমিকভাবে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় এই নাটকটির অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৯১-এর মার্চে দিল্লিতে হিন্দি ভাষায় এর প্রথম দুটি অভিনয় হয়। তারপরে বহুবার দিল্লিতে, মুম্বইতে, লখনউতে এই হিন্দি অভিনয় হয়। একবার নান্দীকারের উৎসবেও হয়েছিল। ১৯৯২-তে দূরদর্শনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এটি রেকর্ড করেছিল। যদিও তার সম্পাদনা আমার ভাল লাগেনি।

মনে আছে ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে ঘটে গিয়েছে বাবরি মসজিদ ভাঙার ইতিহাস। সেই সঙ্গে কলকাতায় পর্যন্ত দাঙ্গার সূত্রপাত। হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন নিয়ে মুখর এমনকী আমাদের পরিচিত মধ্যবিত্ত জনসাধারণ, যাঁদের এর পূর্বে কখনও 'কমিউনাল' বলে মনে হয়নি। সেই সময়ে আমরা একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম পঞ্চম বৈদিকের তরফ থেকে। তাতে কিছু কবিতা, কিছু তৎকালীন খবর, কিছু মন্তব্য নিয়ে একটি সংকলন উপস্থাপিত হয়েছিল। দুটি রবীন্দ্রনাথের গান নিবেদিত হয়েছিল,—'কেন চেয়ে আছ গো মা' এবং 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গান দুটি গেয়েছিলেন গৌতম হালদার। শম্ভু মিত্র আবৃত্তি করেছিলেন। তারপরে 'ডাকঘর' পাঠ। আকাদেমিতে এবং রবীন্দ্রসদনে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়েছিল। দর্শক-শ্রোতার কাছে খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল এই উপস্থাপনা।

১৯৯৪-এ শম্ভু মিত্র পঞ্চম বৈদিক-এর প্রয়াসে শেষবারের মতো পড়লেন 'চাঁদবণিকের পালা'। বড় হরফে ছাপিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল সেই স্ক্রিপ্টটি। তাঁর চোখের দৃষ্টি তখন খুবই ক্ষীণ। তার আগেই শ্রুতি কোম্পানি রেকর্ড করেছে তাঁর এ-নাটকের পাঠ। পরের বছর 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর এক যুগ পালিত হল।

এর মধ্যে বোঝা গেল, শম্ভু মিত্র-র চোখ দুটি প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। তাঁকে একা একটা বাড়িতে রাখা বিপদের। তাই বকুলবাগানের ফ্ল্যাট বিক্রি করে আমরা চলে এলাম জ্যোতিষ রায় রোডের এই বাড়িতে। আমার বাবা এবং আমার প্রায়ান্ধ কাকাকে নিয়ে। সেটা ১৯৯৩।

বিতত বিতংস ১৯৯৬

এবারে ১৯৯৬-এর গোড়ায় নানান সহকর্মীদের হারিয়ে, অনেক তিক্ততার পথ পেরিয়ে নতুন প্রযোজনা তৈরি হল,—একদা চর্যাশ্রমের ছাত্র, তারপরে পঞ্চিম বৈদিক-এর সদস্য সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়ের নাটক 'বিতত বিতংস'। সে-প্রযোজনাটি লোকের ভাল লেগে গেল। সম্ভবত, পরিবেশ দূষণ নিয়ে এর পূর্বে নাটক হয়নি। অন্তত জানা নেই আমাদের। এ-নাটক মোটামুটি ভালই চলছিল। সেই সময়ে যুক্ত হয়েছিলেন গৌরীশঙ্কর পাণ্ডা এবং বাবু দত্তরায়। বাবু এখনও 'রাজনৈতিক হত্যা?'-র অভিনয়ে যুক্ত।

১৯৯৭-এর মে মাসে শম্ভু মিত্র চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে আমার এবং পঞ্চম বৈদিক-এর সে এক অসহায় সময়। আমি কিছুদিন ধরেই মনে করছিলাম, থিয়েটার যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। শম্ভু মিত্রকে জানিয়েওছিলাম সেই কথা। নানা কারণে আমার আর ভাল লাগছিল না। সে কারণগুলো সবিস্তারে লিখেছিলাম আমার 'মুকুরে মুখ না মুখোশ' প্রবন্ধটিতে। ১৯৯৮-এর মার্চ মাসের পরে আমি অভিনয় করা বন্ধ করে দিলুম। কিন্তু সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়,

দেবকমল মণ্ডল এবং স্বপন আঢ্য—মূলত এই তিনজনের উৎসাহের ঠেলাতে পঞ্চম বৈদিক গুটিয়ে ফেলা গেল না। তাদের প্রতি দুর্বলতায় আমিও সভাপতির পদটি ছাড়তে পারলাম না। এখন অবশ্য মনে হয় সেই দুর্বলতাজনিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি খুব ঠিক কাজ করিনি। দু'বছর থিয়েটার থেকে দূরে দূরে থেকেছি।

এর মধ্যে ১৯৯৮-তে 'অগ্নিমন্থ' মঞ্চস্থ করল। তার নিজেরই নাটক। থিয়েটার থেকে দূরে থাকলেও সাধ্যমতো সাহায্য করেছিলাম। যেমন এখনও করে চলেছি অর্পিতাদের। সবসময়েই মনে হয় কেউ যদি কিছু কাজ করতে চায়, আর আমার দ্বারা যদি কোনও সাহায্য হয়, না হয় করলামই সাহায্য!

২০০০ সালে পঞ্চম বৈদিক ঠিক করল পুনরায় চর্যাশ্রম খোলা হবে। এবারে এক বছরের কোর্স। আমাকে ক্লাস নিতে হবে। আবার শুরু হল শিক্ষা পদ্ধতি। সেই বছরেই ছাত্রী হিসাবে অর্পিতা, সুপর্ণা এবং এমন অনেকে এল, যারা বললে তারা সত্যিই থিয়েটারটা করতে চায়। সেই বছর মে মাসে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হল আমাদের নাট্যতর্পণ। এই নাট্যতর্পণের সূত্রেই আবার আমাকে ফিরতে হল থিয়েটারে। আমরা জায়গা পেলাম রানিকুঠির শ্রীঅরবিন্দ কালচারাল ইনস্টিটিউটে। একেবারেই একটা স্কুলের অডিটোরিয়াম। সেই জায়গাটা তখন পেয়েছিলাম বলেই সেখানে নতুন করে আমার মঞ্চে ফেরা। সেখানে অভিনীত হয়েছে 'নাথবতী অনাথবৎ', 'কথা অমৃতসমান', 'বিতত বিতংস', 'অগ্নিমন্থ'। সে-বছরই অভিনীত হল নতুন নাটক,—'সুজনব্রতীর সীমান্ত'। ওই জায়গাটা একেবারে নিজেদের জায়গার মতো করেই পেয়েছিলাম আমরা। তাই নতুন ভাবে নতুন একরকম সংস্কৃতির প্রবর্তনায় মন দিয়েছিলাম। সেখানে নাটক শুরু হওয়ার আগে 'বেল্' বাজত না। ঘণ্টা বাজিয়ে একজন এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরে ভেতরে চলে আসত। সেখানে প্রতি রবিবার অনুষ্ঠান হত। নাটক ছাড়াও নানারকম পাঠের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম আমরা। হয়েছিল 'রাজা', 'রক্তকরবী'-র পাঠ। 'তাহার নামটি রঞ্জনা', তৃপ্তি মিত্রর গল্প অবলম্বনে 'অব্যক্ত'—ইত্যাদি নানাবিধ মহলাও সেখানেই হত। প্রত্যহ নিজেরা ঝাঁট দিয়ে, পরিষ্কার করে মঞ্চটি মুছে নিয়ে সেট সাজিয়ে শুরু হত আমাদের কাজ। সেখানে আমাদের অনুগ্রাহক সদস্যরা আসতেন। অনুষ্ঠানের পরে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা হত। আমরা সেই মঞ্চটিরও নামও দিয়েছিলাম, 'অন্তরঙ্গ নাটমঞ্চ'। সেটি বাতানুকূল করে দিল কর্তৃপক্ষ। আমরা চেয়ার কিনলাম। আলোর সরঞ্জাম কেনা হল। মনে হচ্ছিল, কর্তৃপক্ষ ও পঞ্চম বৈদিক-এর যুগ্ম প্রয়াসে সত্যিই হয়তো একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু অকস্মাৎই আঘাত এল আবারও।

পুতুল খেলা ২০০২

এর মধ্যে ইবসেনের 'পুতুল খেলা' করেছি আমরা ২০০২-এ, খুব একটা দুর্নাম হয়নি তার। তবু আঘাত এল বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে। ২০০৪-এ পুরোপুরি উৎপাটিত হলাম আমরা। স্বপ্ন ভেঙে খান-খান। তখন নতুন নাটক 'রাজনৈতিক হত্যা?'-র প্রস্তুতি সবে শুরু হয়েছে। আবারও কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার মুখে। কিন্তু কোনও এক ফেরে আবার একজন জেদি জন্ম নিল পঞ্চম বৈদিককে বাঁচানোর জন্যে। সে হল অর্পিতা ঘোষ। কী যে তার এবং তার সাথিদের দায় পড়েছিল জানি না। তারা শুরু করল বাচ্চাদের নিয়ে কাজ। সেটা অবশ্য কিছু আগেই শুরু হয়েছিল। 'হ য ব র ল' মঞ্চস্থ হয়েছিল ওই নাটমঞ্চেই। তীর্থঙ্কর চন্দের একটি নাটিকাও সেখানে নিরীক্ষামূলকভাবে উপস্থিত করা হয়েছিল অর্পিতারই নির্দেশনায়। 'অন্তর্গত আগুন'। এমনই করে নিজের আগ্রহে সে থিয়েটারের কাজ শিখে নিচ্ছিল। 'আলো', 'শব্দ', 'নাট্যলিপি-প্রস্তুতি', 'সম্পাদনা'—সবরকম।

রাজনৈতিক হত্যা? ও চণ্ডালি—২০০৪ ও ২০০৫

দু'মাসের মধ্যে ঠিক হল বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন। যেখানে নানা বিপত্তি সত্ত্বেও অভিনীত হল 'রাজনৈতিক হত্যা?' কিন্তু সে জায়গাটিও টিকল না। আবার তাড়া খাওয়া। এবারে সুমন মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় সূত্র-র সঙ্গে একত্রে নেওয়া হল, উত্তম মঞ্চ। সেটা ২০০৫-এর গোড়া। কথা ছিল রবিবার তিনটে এবং ছ'টায় যদি দুটো দল নিয়মিত অভিনয় করে, তা হলে হয়তো টিকে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তৃতীয় সূত্র পিছিয়ে গেল। সমস্ত দায়িত্ব পড়ল পঞ্চম বৈদিকের ঘাড়ে। আমরা কথা দিয়েছিলাম এক বছর অভিনয় করব। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও আমরা সে কথা রেখেছিলাম।

২০০৫-এই হল রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' গদ্যনাটিকা অবলম্বনে আমাদের নতুন নাটক 'চণ্ডালি'। উত্তম মঞ্চেই মঞ্চস্থ হল সে নাটক। এই কাজটি করে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। আরও ভাল লাগত ঠিক পরিকল্পনামাফিক যদি প্রতিটি অভিনয় উপস্থাপিত করা যেত।

আবার উত্তম মঞ্চ থেকে সরে আসতে হল। ফিরে আসতে হল আকাদেমিতে। রবিবার সকালগুলো পাওয়া গেল। এর পূর্বে যখন রবিবার সকালে করেছি, আমাদের দর্শকের কোনও অভাব হয়নি। কিন্তু দেখা গেল বদলে গেছে কাল। এ-কালে রবিবার সকালে নাটক দেখতে আসবার লোক পাওয়া যায় না। আকাদেমিও সব দিক থেকে দীনতর হয়েছে। আর শুধু সেখানেই বিপদ নয়। এক-একটি মঞ্চের হিসাবে এক একরকম। যে হিসাবে একটি মঞ্চে একটি কল্পনা রূপায়িত হল, অন্য একটি মঞ্চে গিয়ে সে-ছবি সম্পূর্ণত প্রকাশ করা যাবে,—এমনটা সম্ভব হয় না। 'চণ্ডালি'র ক্ষেত্রে সেই সমস্যা খুব বড় করে দেখা দিয়েছিল।

তবে নতুন প্রজন্ম ছাড়তে রাজি নয় কাজকর্ম। এরা স্থির করে নিয়েছে শম্ভু মিত্র-র জন্মদিনটিতে এরা নতুন একটি নাটক করবার চেষ্টা করবেই। সেই পিতৃপ্রতিম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের প্রতি সে-ই তাদের শ্রদ্ধানিবেদন। এখন যারা পঞ্চম বৈদিকে কাজ করে চলেছে, তাদের বেশিরভাগের কিন্তু কোনও পরিচয় ঘটেনি তাঁর সঙ্গে। তারা আর পাঁচজন থিয়েটারকর্মীর মতোই শুনেছে তাঁর কথা। হয়তো আমার সুবাদে একটু বেশি শুনেছে। আর পড়েছে তাঁর বই।

পশুখামার, টোকোলশ ২০০৬ ও ২০০৭

এইভাবেই ২০০৬-এ হয়েছে 'পশুখামার',—জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' অবলম্বনে। ২০০৭-এ হয়েছে 'টোকোলশ'। টোকোলশ অবশ্য ২২ আগস্টের আগেই মঞ্চস্থ হয়েছিল, একটি নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত হওয়ার সুবাদে। সেবার শম্ভু মিত্র-র অন্যতম প্রিয় নাটক 'কথা অমৃতসমান' মঞ্চস্থ করা হয়েছিল।

এর মধ্যে এ-রাজ্যে ঘনিয়ে এসেছে সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের মতো ঘটনার কালো ছায়া। আমরা প্রতিবাদ না করে পারিনি। তাপসী মালিকের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নন্দীগ্রামে পুলিশ ও শাসকদলের যুগপৎ বীভৎসতা আমাদের স্থির থাকতে দেয়নি। তাই 'পশুখামার' যদিও আগেই উপস্থাপিত হয়েছিল, এই প্রতিবাদে সে যেন দর্শকের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল। কেউ এই প্রাসঙ্গিকতার প্রশংসা করলেন। কেউ বা বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখালেন। নানারকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল, হতে হচ্ছে। আমন্ত্রিত অভিনয়ের সংখ্যা প্রায় নেই। ফলে আবারও তীব্র অর্থাভাবের মুখোমুখি আমরা।

তবু ২০০৭-এ অভিনীত হল রোনাল্ড সেগালের উপন্যাসে

নাট্যরূপ 'টোকোলশ'। সাদা মানুষের দ্বারা কালো মানুষের উচ্ছেদের গল্প। জমি অধিগ্রহণ। সবটাই অর্পিতার দায়িত্বে।

২০০৮-এর ১৪ মার্চ সরাসরি পথে নেমে নাটক হল আমাদের। 'নন্দীগ্রাম হত্যাকাণ্ডের' এক বছর পূর্তিতে অত্যাচারিত মানুষের স্মরণ করে। কলকাতার পাঁচটা জায়গায়, রাস্তার মোড়ে এ-নাটক সেদিন অভিনীত হয়েছিল। অর্পিতারই লেখা এই নাটকটি, 'সহজ প্রশ্নের বর্ণমালা', অর্পিতারই নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত হয়। অংশ নিয়েছিল 'পঞ্চম বৈদিক' ও 'কসবা অর্ঘ্য'-র ছেলেমেয়েরা।

এ-বছর ২২ আগস্ট আমাদের যে-নতুন নাটকটি মঞ্চস্থ হতে চলেছে, সেটিও অর্পিতারই লেখা। এ-নাটকটি পৃথিবী জোড়া হিংসার বিরুদ্ধে কথা বলে। সমাজের বা রাজনীতির ক্রমাগত এই যে সভ্যতার কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপরীত পথে হাঁটা, তাতে আমরা এই পৃথিবীর নাগরিক হিসাবে শঙ্কিত, বেদনার্ত। সেই বেদনা থেকেই উৎসারিত আমাদের এই কথা।

আমাদের রাজ্যের, আমাদের দেশের এই পরিস্থিতিতে, যেখানে হিংসাত্মক হত্যাকাণ্ড যেন নিঃশ্বাস নেওয়ার মতোই সহজ করে দেওয়ার প্রয়াস চলেছে, সেই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে পঞ্চম বৈদিক-এর পঁচিশ বছর পূর্তিতে কোনও উৎসবের আয়োজন করতে আমাদের ইচ্ছে হয়নি। সভ্যতার এই সঙ্কটকালে মানুষের দুর্বার লড়াইয়ে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করবার মনোভাব থেকেই এই ২০০৮-এর আগস্টের নতুন প্রযোজনা।

অর্পিতা কাজটি হাতে তুলে নিয়েছে বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব খুশি। কারণ আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি নতুন প্রজন্ম যদি উৎসাহিত হয়ে হাল ধরার কাজে এগিয়ে না আসে, তা হলে কোনও কাজেরই শেষ পর্যন্ত কোনও অর্থ থাকে না। ও, বা ওর পরেও যদি কেউ মশাল হাতে এগিয়ে চলতে চায়, তার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ ভালবাসা জড়িয়ে থাকবে। তা হলে পঞ্চম বৈদিকের পঁচিশ বছর ধরে টিকে যাওয়ার কোনও একরকম অর্থ থাকবে। আর যদি তা পঞ্চম বৈদিক না-ও হয়, যদি হাল ধরবার কাজটি তুলে নেয় আর কেউ, অন্য কোথাও,—কেবল অর্থবহ, সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন থিয়েটারকে ভালবেসে, তা হলেও ভাল লাগবে আমার। কারণ এখনও বিশ্বাস না করে পারি না যে, নাট্যমাধ্যম আমাদের অনুভবকে, মানুষের মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দেওয়ার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাটাতন। থিয়েটার মানুষের প্রতি সরাসরি মানুষের শ্রদ্ধা-ভালবাসা-মমতা জীবনের মাধ্যম। জীবন্ত হয়ে, জীবন্ত মানুষের সামনে, সে তুলে ধরে তার সমস্ত অনুভব। আজন্ম থিয়েটারের সঙ্গে সংলগ্ন থেকে আমার তাই মনে হয়। সেইজন্যেই বার বারই মনে হয় ঠিক পথটি বের করে নিতে না পারলে থিয়েটারের মুক্তি নেই। অনুপযুক্ত জায়গা ভাড়া করে করে, আর ভাড়া খেটে খেটে আমাদের স্ফূরণ হবে না, যে-স্ফূরণ একান্ত কাম্য!

আজকে যে সামাজিক প্রেক্ষিতে আমরা দাঁড়িয়ে, যে বিষাক্ত পরিবেশে আমাদের নিয়ত নিঃশ্বাস নেওয়া তাতে মনে হয়,—আগামিকালের থিয়েটারকর্মীদের ভেবে নিতে হবে কেমন করে তাঁরা থিয়েটার করবেন! কোন পথে এগোলে মনে হবে, যে-কাজটি করতে চাইছি তা করতে পারছি! কী করে এমন কাজ করব যাতে মানুষের গভীর সমস্যা, দেশের তথা সভ্যতার পতনের গভীরতার কারণের ইঙ্গিতটি নাট্যশিল্প তুলে ধরতে পারবে! সেই গূঢ় অন্বেষণা কেমন করে দর্শকের সামনে তুলে ধরব আমরা? কেমন করে তৈরি হবে নতুন দর্শক যারা বুঝবে 'শিল্প' মানে ঝাঁ-চকচকে নাচাগানা নয়? কারণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তো তাদের বলে দিচ্ছে যে ওটাই শিল্প! শুধু আঙ্গিক নয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষায় থাকবে মানুষের সেই

আজকে যে সামাজিক প্রেক্ষিতে আমরা দাঁড়িয়ে, যে বিষাক্ত পরিবেশে আমাদের নিয়ত নিঃশ্বাস নেওয়া তাতে মনে হয়, আগামিকালের থিয়েটারকর্মীদের ভেবে নিতে হবে কেমন করে তাঁরা থিয়েটার করবেন! কোন পথে এগোলে মনে হবে, যে-কাজটি করতে চাইছি তা করতে পারছি! কী করে এমন কাজ করব যাতে মানুষের গভীর সমস্যা, দেশের তথা সভ্যতার পতনের গভীরতার কারণের ইঙ্গিতটি নাট্যশিল্প তুলে ধরতে পারবে!

উত্তরণের কথার উচ্চারণ, যে-মানুষ মনুষ্য সভ্যতার কেন্দ্রে বিরাজ করে। কিন্তু কোথায় কেমন করে উচ্চারিত হবে তা? সেই মঞ্চ কোথায় যেখানে কল্পনার মাত্রা বিস্তার পাবে?

কোনও বিখ্যাত কবি বুঝি বলেছিলেন, যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁরাই কবি নন, কেউ কেউ কবি! তেমনই যে-কোনও নাটক মঞ্চায়িত হলেই তো তার শিল্পে উত্তরণ হয় না! দৈবাৎ কোনও কোনও নাটক সেই উত্তরণের আশীর্বাদের চুম্বনের ছোঁয়া পায়! এ বাতাবরণে কেমন করে সেই পথের দিশা পাব আমরা?—আশা করতে ইচ্ছে হয় শত প্রতিকূলতার মধ্যে নতুন প্রজন্ম খুঁজে বের করে নেবে সেই পথ! শিল্পকলাই যে বহন করে মনুষ্যত্বের পরিচয়!

কতটা পথ পেরোলে তবে পথিক বলা যায়?/কতটা পথ পেরোলে পাখি জিরোবে তার ডানা?/কতটা অপচয়ের পরে মানুষ চেনা যায়?/ প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা!

আরও পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। পঞ্চম বৈদিক প্রায় প্রত্যেকবার নতুন প্রযোজনা মঞ্চস্থ করেছে। তার মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দুটি রবীন্দ্র প্রযোজনা—'ঘরে বাইরে' এবং 'অচলায়তন'। এই সময়ে এই উপস্থাপনার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা ও গতি-প্রকৃতির প্রেক্ষিতে এই দুটি নাটকেরই কথা খুব আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাই আশা করি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পঞ্চম বৈদিক নাট্যশিল্পে-আঙ্গিকে ও বিষয়ে নতুন ধারা সংযোজন করবে—যে সংগঠনের হাল ধরেছে অর্পিতা। সেই যাত্রাপথে শুভকামনা রইলই! তাদের এবারের নতুন প্রযোজনা 'অস্তমিত মধ্যাহ্ন' অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠুক দর্শকের কাছে।

সিপিএমের স্বরূপ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র অতীত ও বর্তমান একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা



পূর্ণেন্দু বসু

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনে প্রধান ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি ছিল সিপিআই(এম) বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। সাড়ে তিন দশক ধরে রাজ্যের প্রধান শাসকদল হিসাবে সিপিএমকে দেখেছে মানুষ।



এই দলটিকে যাঁরা 'বামপন্থী' বা সংগ্রামী মানুষের দল বলে মনে করতেন, সেই দলটি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্রমশই যেভাবে জনবিরোধী হয়ে উঠল তাও তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। ৩৪ বছর ধরে শাসকের আসনে বসে সিপিএম মানুষের জন্য প্রকৃত জনমুখী বিকল্প কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি, বরং তাদের অপশাসনে মানুষ ক্রমশই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, একটা সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের পক্ষে বড় ধরনের জনসমর্থন ছিল। মানুষের মনে হয়েছিল সিপিএম-শাসনে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। তার মধ্যেই সিপিএম নেতৃত্ব সর্বস্তরে জাঁকিয়ে বসেছে এবং অর্থবল-পেশিবল কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার যাবতীয় কলাকৌশল আয়ত্ত করেছে।

এই রাজ্যে সিপিএমের অত্যাচার-দমন-পীড়ন মানুষকে ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ করেছে। একটা সময় এসে সিপিএমের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছে মানুষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানের আগে পর্যন্ত সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস নেতৃত্ব, মানুষকে দিশা দেখাতে পারেনি। কংগ্রেস-সিপিএম ভাই-ভাই—এটাই ছিল বাস্তব চিত্র। সিপিএম-বিরোধী সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অত্যাচারী সিপিএমের শাসনের অবসান ঘটালেন।

সিপিএমের অধঃপতন একদিনে হয়নি। এই দলটির জন্ম ও বেড়ে ওঠার মধ্যেই নিহিত ছিল তার অধঃপতনের সমস্ত সম্ভাবনার বীজ। আজকের সিপিএমকে বুঝতে গেলে তার অতীতটাকেও যথাযথভাবে বুঝতে হবে।

সিপিএম কতটা মার্কসবাদী, কতটা বিপ্লবী—সে বিষয়ে বহু তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যায়ে বামফ্রন্টের অপশাসন এবং সিপিএম নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রেক্ষাপটে আলোচনা কম হয়নি। সিপিএমের শিল্পনীতি, কৃষিনীতি-সহ উন্নয়ন নীতির সমালোচনা হয়েছে ব্যাপকভাবে। সিপিএমের দলতন্ত্র, সিপিএমের হার্মাদবাহিনী নিয়েও আলোচনার শেষ নেই। সিপিএম-শাসনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা সকলে জানেন। কিন্তু এই দলটি শুরু থেকেই যে ক্ষমতালোলুপ ও চরম সুবিধাবাদী ছিল আজকের প্রজন্ম সে-সম্পর্কে কম ওয়াকিবহাল। সে-বিষয়েই একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এই নিবন্ধে উপস্থিত করা হচ্ছে। এই আলোচনায় তাত্ত্বিক বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ থাকবে ন। বাস্তব কাজের মাধ্যমে সিপিএমের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হবে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা

১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে একটি সম্মেলন (কংগ্রেস)-এর মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। সিপিআই ভেঙে নতুন দল গড়ে উঠল। সদ্যগঠিত নতুন দলের নেতারা নানা বিপ্লবী বুলির মাধ্যমে নতুন দল গঠনের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দিকটিকে আড়াল করে রাখলেন। শুরু থেকেই নেতারা দ্বিচারিতার আশ্রয় নিলেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত আলাপ-আলোচনা-বিতর্ক প্রথম থেকেই চেপে রাখা হত। ফলে দলের মধ্যে সব সময়ই নানা উপদল গড়ে উঠত। একে অন্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন নেতারা। কে—টাকাকড়ির সঠিক হিসাব দেয়নি, কে—প্রথম থেকেই পুলিশের চর ছিল—অথবা কে কখন সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করেছে—ইত্যাদি-ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিরোধ লেগেই থাকত। নেতারা সব সময় অপেক্ষা করে থাকতেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের নেতারা কী বলছেন, তার উপর। ফলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। গোষ্ঠী কোন্দলের ফলে সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকেও কমিউনিস্ট আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

কংগ্রেস দলের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক হবে, স্বাধীনতার স্বরূপ কী, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হবে কোন পথে, কাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট হবে— ইত্যাদি প্রশ্নে সব সময় বিতর্ক থাকত। কিন্তু সর্বদা মতাদর্শগত সংগ্রামকে গুরুত্ব না দিয়ে চেপে রাখা হত। ফলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে গোষ্ঠীগত সাংগঠনিক লড়াই অনেক বেশি গুরুত্ব পেত।

সিপিআই ভেঙে সিপিএম গড়ে ওঠার পিছনেও মতাদর্শগত বিরোধ প্রধান ছিল না। সাংগঠনিক বিরোধই ছিল প্রাধান্যে। সিপিআই-এর ডাকসাইটে নেতা ডাঙ্গের তিনটি চিঠি ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা থেকে খুঁজে বের করেন দ্বিজেন নন্দী (সাংবাদিক)। এই চিঠিগুলিতে ডাঙ্গে সাহেব ও অপর নেতা নলিনী গুপ্ত 'আর কোনও অন্যায় কাজ করবেন না' বলে সরকারকে মুচলেকা দিতে তৈরি—এটা জানান। ১৯২৪ সালের চিঠি—সামনে আসে ১৯৬৪ সালে।

এর আগে ১৯৬২-র চিন-ভারত সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে নানা মত গড়ে ওঠে। কোনও মীমাংসা হয় না। ডাঙ্গেপন্থী ও ডাঙ্গে-বিরোধী—দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় দল। ডাঙ্গে-বিরোধী গোষ্ঠীর অনেকে এই সময় গ্রেফতার হন। সেই সুযোগে ডাঙ্গেপন্থী উপদলটি পার্টির সব কিছু কব্জা করে নেয়। ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ আর পার্টির সেক্রেটারি থাকলেন না। তাঁর জায়গা নিলেন রাজেশ্বর রাও।

ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে ডাঙ্গেপন্থীরা নেহরু সরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। যাঁরা সিপিএম তৈরি করলেন এবং কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচিত হলেন, সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে সেই বি টি রণদিভে, নাম্বুদিরিপাদ, জ্যোতি বসু, পি রামমূর্তিদের সঙ্গে ডাঙ্গেপন্থীদের কোনও পার্থক্য ছিল না।

১৯৬২-র শেষদিকে যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, ১৯৬৩-র শেষদিকে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৯৬৪ সালের ১১ এপ্রিল, সিপিআই-এর জাতীয় কাউন্সিলের ৩২ জন সদস্য ডাঙ্গের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি তুলে তাঁকে কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করার ক্ষেত্রে আপত্তি তুলে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

১৪ এপ্রিল ১৯৬৪, এই ৩২ জন কাউন্সিল সদস্য পার্টি সদস্যদের কাছে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেন, যাতে ছিল প্রধানত বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়। আর ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ার বিরোধিতা।

১৯৬৪ সালের ৪ জুলাই, দুই উপদলের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে এক সভায় মিলিত হন। ডাঙ্গেপন্থীদের তরফে প্রতিনিধি ছিলেন রাজেশ্বর রাও, গঙ্গাধর অধিকারী ও ভূপেশ গুপ্ত। অন্য উপদলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হরকিষেণ সিং সুরজিৎ, জ্যোতি বসু এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত। সেখানে প্রমোদ দাশগুপ্ত মীমাংসা সূত্র হিসাবে বলেন—তাঁরা ডাঙ্গেকে পার্টির চেয়ারম্যান মানতে পারেন, যদি ইএমএস-কে জেনারেল সেক্রেটারি করা হয়।

প্রস্তাব থেকে এটা স্পষ্ট যে, দলের সেক্রেটারিয়েট সাংগঠনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল বিরোধের মূল বিষয়। ডাঙ্গেপন্থীরা প্রস্তাবটি না মানায় মীমাংসা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এঁরাই পরে সিপিআই(এম) গঠন করেন।

সিপিআই(এম) গড়ে উঠল মতাদর্শগত প্রশ্নকে আড়ালে রেখে। কর্মীদের একটা বড় অংশ কংগ্রেস-সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো একটা দল চাইছিলেন। সারা দেশজুড়ে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। সিপিএমের চতুর নেতারা বুঝেছিলেন, কংগ্রেস সরকার বিরোধী মানুষের মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে, গণ-আন্দোলনের জোয়ারকে সামনে রেখে, ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নিজেদের শক্তিকে সংহত করতে হবে। এক্ষেত্রে সিপিআই-এর সঙ্গে সদ্যগঠিত সিপিআই(এম)-এর কোনও মৌলিক পার্থক্য ছিল না।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে ডাঙ্গেপন্থীরা নেহরু সরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। যাঁরা সিপিএম তৈরি করলেন এবং কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচিত হলেন, সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে সেই বি টি রণদিভে, নাম্বুদিরিপাদ, জ্যোতি বসু, পি রামমূর্তিদের সঙ্গে ডাঙ্গেপন্থীদের কোনও পার্থক্য ছিল না। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল ডাঙ্গের পরিবর্তে নিজেদের কর্তৃত্বে একটি বড় দল গঠন করা। সিপিআইকে দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী দল বলে নিজেদের বিপ্লবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। তাই তাঁরা বক্তৃতায় জঙ্গিরূপ ধারণ করে কর্মীদের মন জয় করার উদ্যোগ নিলেন। গরম গরম কথা বলে কর্মীদের উত্তেজিত করতে থাকলেন। বিপ্লবের স্বপ্ন বুকে নিয়ে কর্মীরা সিপিআই(এম)-এর পতাকা তুলে ধরলেন। বেশিরভাগ কর্মীই নেতাদের দ্বিচারিতা ধরতে পারলেন না।

ছয়ের দশকে দেশজোড়া সঙ্কট দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মানুষের এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গে উত্তাল গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। শাসক পার্টি কংগ্রেসের মধ্যেও নানা উপদল মাথা চাড়া দেয়। জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র-পার্টি ব্যাপক জনগণের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৯৬৩ সালের প্রথমদিকে উত্তরপ্রদেশের দুটি এবং গুজরাতের একটি লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি কেন্দ্রেই কংগ্রেস পরাজিত হয়। ১৯৬৫ সালে এরই মধ্যে পাক-ভারত যুদ্ধ পরিস্থিতিকে আরও সঙ্কটময় করে তোলে। শাসকদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা অন্যদিকে দুঃসহ অবস্থার জন্য জনসাধারণ মারমুখী হয়ে উঠছিলেন। ফলে সার্বিক অস্থিরতা ক্রমশই নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যাচ্ছিল।

উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। উত্তরপ্রদেশে একটানা ৬২ দিন সরকারি কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন। প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। এই কর্মচারীদের সমর্থনে মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারীরা একদিনের ধর্মঘট করেন।

ধর্মঘট, বিক্ষোভ, হরতাল, পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়ে ওঠে রোজকার ঘটনা।

পশ্চিমবঙ্গে সেই সময় রেশনিং ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল। কংগ্রেস সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতির ব্যর্থতা এর জন্য দায়ী। চারদিকে কালোবাজারি ব্যাপক আকার নেয়। নিদারুণ খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিক ছাঁটাই ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-শিক্ষক-মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে শামিল হন। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আন্দোলন জঙ্গিরূপ ধারণ করে। পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ছাত্ররা। বসিরহাটের স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় নুরুল ইসলাম নামে এক ছাত্র। নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় আনন্দ হাইত নামে অপর এক ছাত্র। নদিয়া জেলা উত্তাল হয়ে ওঠে জঙ্গি আন্দোলনে। ১০ মার্চ, 'বাংলা বন্ধ' ডাকা হয়।

১৯৬৪-র শেষ এবং ১৯৬৫-র গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের বেশিরভাগ নেতা জেলে ছিলেন। যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ আত্মগোপন করে আন্দোলনকে জঙ্গিরূপ দিতে সক্ষম হন। শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী জোয়ারকে রোধ করা কঠিন

হয়ে পড়ছে দেখে কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা ১৯৬৬-র মে মাসে সবাইকে মুক্তি দেয়। বন্দি থাকার কারণে জেলমুক্ত নেতাদের ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাস্তার লড়াইকে শান্ত করে নেতারা বেশ কিছুদিন পরে দু'দিনের বাংলা বন্‌ধ ডেকে দেন। কংগ্রেস সরকার বন্‌ধের দু'দিন প্রায় নিশ্চুপ থাকে। সরকার যা পারছিল না সেই উত্তাল পরিবেশকে শান্ত করে দিতে সক্ষম হলেন জেলমুক্ত সিপিএম নেতারা। ধীরে ধীরে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল। জনগণকে আহ্বান জানানো হল '৬৭-র ভোটের জন্য প্রস্তুত হতে। বিপ্লব মাথায় উঠল। নির্বাচনী জোট গড়ে নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করাই হয়ে দাঁড়াল দুই কমিউনিস্ট পার্টির মূল কর্মসূচি। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে সিপিএম নেতারা নিজেদের বিপ্লবী সাজাতে চাইলেও ভোটের পথকেই তাঁরা একমাত্র করে তুললেন। পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই এবং সিপিআই(এম) দু'টি পৃথক জোট গঠন করে নির্বাচনে নেমে পড়ল। একটি জোট পিইউএলএফ (জনগণের ঐক্যবদ্ধ বামফ্রন্ট) ও অন্যটি ছিল ইউএলএফ (ঐক্যবদ্ধ বামফ্রন্ট)। নির্বাচনের পর দেখা গেল এককভাবে কোনও জোট সরকার গড়তে পারছে না। তখন দু'টি জোট এক হয়ে যায়। আরও কয়েকটি দল তাতে যোগ দিয়ে মোট ১৪ পার্টির যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসকে হঠিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কেরলেও সিপিএম, সিপিআই যুক্তফ্রন্ট গঠন করে কেরলে মন্ত্রিসভা দখল করে।

> ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে 'লাল টুপি', 'লাল রুমাল' পরিহিত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয় সিপিআই(এম)। ১৯৬৯ সালে ৯৩,৮৮৮ জন 'স্বেচ্ছাসেবক'-এর বাহিনী তৈরি হয়। '৭০ সালে আরও ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য কমিটি। এদের হাতে কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও জুগিয়ে দেওয়া হয়।

কোথায় গেল নীতি, কোথায় গেল আদর্শ, ক্ষমতার লোভে সিপিএম নেতারা সিপিআই-এর সঙ্গে একযোগে সরকার গড়লেন। '৬৬ সাল পর্যন্ত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি থাকা অজয় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা কংগ্রেস'-এর সঙ্গে জোট করতেও সিপিএম নেতাদের নীতিতে বাঁধল না। অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন। জ্যোতি বসু হলেন তাঁর ডেপুটি।

এখানে বলা দরকার যে, সিপিএম গঠন-পর্বেই অনেকে নানা মতাদর্শগত প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই সব প্রশ্নের কোনও মীমাংসা না করেই দল গণ-আন্দোলনকে স্তিমিত করে ভোটের লড়াইয়ে নেমে পড়ায় দলের মধ্যেই বিদ্রোহ দানা বাঁধছিল। '৬৭ সালের মে মাসের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়িতে সেই বিদ্রোহ ফেটে পড়ল।

১৯৬৭ থেকে '৭৭

১৯৬৪-তে পার্টি কর্মসূচি গ্রহণ করার আগে সিপিএম নেতৃত্ব বিভিন্ন রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রশ্নে আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ বন্ধ করে দল গঠন করেন। ফলে দলের মধ্যে নানা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে যুক্তফ্রন্ট সরকার দমন-পীড়নের আশ্রয় নেয়। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে মহিলাদের একটি জমায়েতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ন'জন মহিলা ও দু'জন শিশু নিহত হয়। জ্যোতিবাবু তখন পুলিশমন্ত্রী। এই ঘটনায় তথাকথিত বিপ্লবী পার্টির নেতারা সরকার থেকে পদত্যাগ তো করলেনই না, উপরন্তু নানা বিপ্লবী বুলির আড়ালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করার আহ্বান জানালেন। জমির জন্য আন্দোলনের পথ ত্যাগ করে সরকারের উপর ভরসা রাখার কথা বলা হল।

নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে শত্রুতার আচরণ শুরু করলেন সিপিএম নেতারা। নকশালবাড়ির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তিকালে নতুন দল সিপিআই(এমএল) গড়ে ওঠে ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সিপিআই-কে দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী বলে যে নেতারা সিপিএম গঠন করেছিলেন, সেই সিপিএমে যোগদানকারী একটি অংশই পরে সিপিএমকে নয়া শোধনবাদী আখ্যা দিয়ে সিপিআই(এমএল) গঠন করেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সাতটি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে একটি।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট প্রায় ন'মাস মন্ত্রিত্বে থাকার পর বাংলা কংগ্রেস ভেঙে ১৮ জন এমএলএ-কে নিয়ে প্রফুল্ল ঘোষ বেরিয়ে যান। তৎকালীন রাজ্যপাল, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেস সমর্থিত নতুন মন্ত্রিসভাকে অনুমোদন দেন। তিন মাসের মধ্যে সেই মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

এই সময় থেকেই সিপিএম নেতারা মন্ত্রিত্বে থাকার স্বাদ পেতে শুরু করেন। এমনকী, কেন্দ্রে অকংগ্রেসি বিকল্প সরকার গড়ার চিন্তা এই সময় থেকেই শুরু হয়। এক কথায় গণ-আন্দোলনের পথ পরিহার করে সিপিএম নেতারা সংসদীয় সংগ্রামকে প্রধান হাতিয়ার করে ফেললেন এই সময় থেকেই।

শ্রমিকদের পক্ষে মালিকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই এবং জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের লড়াইকে কেন্দ্র করে সিপিএম নেতারা যে-সব বড় বড় বিপ্লবী কথা বলতেন, সরকারে যাওয়ার পর সেই নেতারাই উল্টো সুর গাইতে শুরু করলেন। তৎকালীন পার্টি মুখপত্রে বা বিভিন্ন সংবাদপত্রে

নেতাদের বিবৃতিগুলি দেখলেই এই সত্য ধরা পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গে আবার বিধানসভা নির্বাচন হয় ১৯৬৯ সালে। আবারও যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ে ওঠে। এই সরকার চলেছিল ১৩ মাস।

১৯৬৯-এ কংগ্রেস দলের উচ্চতম মহলে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একদিকে ছিলেন নেহরু-কন্যা ইন্দিরা গান্ধী, অন্যদিকে যাঁরা ছিলেন তাঁদের 'সিন্ডিকেট' বলা হত। ১৯৬৯-এ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য চরমে ওঠে। সিন্ডিকেট মনোনীত প্রার্থী ছিলেন সঞ্জীব রেড্ডি আর ইন্দিরা গান্ধীর প্রার্থী ছিলেন ভি ভি গিরি। সিপিএম এই সময় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে গিরিকে সমর্থন করে। গিরির জয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা একদিনের ছুটি ঘোষণা করে।

১৩ মাস যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা চলেছিল, সেখানে একের পর এক শরিকি সঙ্ঘর্ষ লক্ষ করা গিয়েছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 'অসভ্য সরকার', 'বর্বর সরকার' বলে আখ্যায়িত করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এই সময়েই বড় আকারে শুরু হয় রাজনীতির অপরাধীকরণ। গুন্ডা-বদমাইশরা বিভিন্ন দলের ছাত্রছায়ায় আশ্রয় নেয়। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে 'লাল টুপি', 'লাল রুমাল' পরিহিত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয় সিপিআই(এম)। ১৯৬৯ সালে ৯৩,৮৮৮ জন 'স্বেচ্ছাসেবক'-এর বাহিনী তৈরি হয়। '৭০ সালে আরও ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য কমিটি। এদের হাতে কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও জুগিয়ে দেওয়া হয়। মানুষকে বোঝানো হয় এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হচ্ছে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি। আসলে এই বাহিনীই শেষ পর্যন্ত সিপিএমের 'অ্যাকশন স্কোয়াড'-এ পরিণত হয়। পরবর্তীকালে এরই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে 'হার্মাদবাহিনী'।

১৯৭১-এ পশ্চিমবঙ্গে আবার বিধানসভা নির্বাচন হয়। সিপিএম ১১১টি আসন পায়। কংগ্রেস পায় ১০৫টি আসন। বাংলা কংগ্রেস-সহ অন্যদের সমর্থনে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। উল্লেখ্য যে, কংগ্রেস সেই সময় সিপিআই-এর সমর্থন পেয়েছিল।

নতুন মন্ত্রিসভার পতন হয়েছিল তিন মাসের মধ্যেই। শুরু হয় রাষ্ট্রপতির শাসন। ২৯ জুন, ১৯৭১-এ রাষ্ট্রপতি শাসনের ঘোষণার পরে পশ্চিমবঙ্গে কার্যপরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় কেন্দ্রের দফতরহীন মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উপরে।

এই পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চরম মাত্রা লাভ করে। নকশালপন্থীরা সেই সন্ত্রাসের বলি হন সবথেকে বেশি। ১৯৭২ সালে আবার সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ওঠে সেই সময়। সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার সময়কালে সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। জয়প্রকাশের নেতৃত্বে গুজরাত-বিহার প্রভৃতি রাজ্যে বড় ধরনের আন্দোলন চলছিল আগে থেকেই। জরুরি অবস্থায় বিরোধী নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে প্রথিতযশা সাংবাদিকরা পর্যন্ত গ্রেফতার হন। পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থা-বিরোধী সংগ্রামে সিপিএম নেতাদের প্রায় কোথাও দেখা যায়নি। কর্মীরা অনেকেই 'মিসা'-য় গ্রেফতার হন। নেতারা যে-যার আত্মগোপন করে, বোঝাপড়া করে আড়ালে চলে যান।

'৭৪ সালের উল্লেখযোগ্য রেল ধর্মঘটে সিপিএম-নেতৃত্বের সুবিধাবাদী চরিত্র অনেকখানি ধরা পড়ে। জরুরি অবস্থার ১৮ মাসে সিপিএমের স্বরূপ প্রকাশ হয় আরও বেশি করে।

ইতিমধ্যে নানা ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে ১৯৭৭ সালে নির্বাচন ঘোষিত হয়। এই সময়ে বিচারব্যবস্থার ভূমিকা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ছিল। নানা দল মিলে জনতা পার্টি গড়ে ওঠে। সিপিআই জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করে। সিপিএম 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—গোছের অবস্থান নেয়। দুই পার্টির দূরত্ব বেড়ে যায় অনেকটাই।

লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হন। এক জোটে জনসঙ্ঘ থাকলেও সিপিএম জনতা পার্টি পরিচালিত সরকারকে সমর্থন করে।

১৯৭৭-এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সিপিএম নেতারা শীতঘুম থেকে জেগে উঠে এ রাজ্যে জনতা পার্টির মূল নেতা রাজ্যের এক সময়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সঙ্গে আসন বণ্টনের আলোচনা শুরু করে দেন। সেদিন প্রফুল্ল সেন, জ্যোতিবাবুদের দাবিমতো আসন ছেড়ে দিলে হয়তো এ রাজ্যের পরবর্তী ৩৪ বছরের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

যাই হোক, ১৯৭৭-এর জুনে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শুরু হয়। তারপর থেকে টানা ৩৪ বছর প্রধান শাসক পার্টি হিসাবে সিপিএম প্রমাণ করেছে, ১৯৬৪ সালে এই দল যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, তা মূলগতভাবে প্রতারণামূলক। কর্মসূচিতে যা লেখা ছিল সিপিএম নেতারা করেছেন ঠিক তার বিপরীতটা।

'৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের ভয় ছিল যে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরলে বামফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেবেন। শাসকরা সরকার ভেঙে দিতে পারেন এই আশঙ্কা নেতারা জনমানসে ছড়িয়ে দেন। '৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সুযোগ নিয়ে সিপিএম নেতারা গ্রামের মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেন। ধীরে ধীরে গ্রামে শক্তিবৃদ্ধি হয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসে সিপিএম। ভূমি সংস্কারের নামে খাসজমি বিলিবণ্টন, বর্গাদার চিহ্নিত করা, গ্রামের শিক্ষকদের দলে এনে তাঁদের প্রাধান্য তৈরি করা—ইত্যাদি 'পাইয়ে দেওয়ার' পথ ধরে সিপিএম তার অগ্রগতির রাস্তা মসৃণ করতে থাকে।

অন্যদিকে একচেটিয়া পুঁজিপতি, বহুজাতিক কর্পোরেশন সম্পর্কে কর্মসূচিতে যাই লেখা থাক না কেন, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে যা কিছু মূল্যায়ন থাক না কেন—সবক্ষেত্রেই চতুর সিপিএম নেতারা বোঝাপড়া করে চলার পথ গ্রহণ করেছেন। বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতেও কসুর করেননি। ময়দানে বাজপেয়ীর হাত ধরা জ্যোতি বসুর ছবির কথা মনে করলেই এর সত্যতা বোঝা যায়।

১৯৭৭ পরবর্তী সিপিএম

১৯৭৭ পরবর্তী সিপিএম ক্রমশই পুরোপুরি একটা সংসদীয় দলে পরিণত হয়। প্রথম বছর দশেক রাজ্যের মানুষকে বোকা বানিয়ে অসম্পূর্ণ কিছু সংস্কারের কাজ করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিসংস্কার।

পশ্চিমবঙ্গে **ভূমি সংস্কার** নিয়ে সিপিএমের ঢক্কানিনাদ বহুদিন ধরে চলেছে। এই দল দাবি করে, তারা ঐতিহাসিক ভূমিসংস্কার করেছে। তারা গ্রাম সমাজের অমূল পরিবর্তন এনে গ্রামীণ দরিদ্র

ও ভূমিহীন কৃষকের স্বার্থে বিপুল কাজ করেছে।

উল্লেখযোগ্য হল, ১৯৭২-এ রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন গৃহীত হয়। জমির মালিকানার উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৭.৫ একর। বর্গাদাররা এই আইনে পুরুষানুক্রমে জমিতে চাষ করার অধিকার পেয়েছিল। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে ৩.৫ লক্ষ বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল।

বামফ্রন্ট আমলে জমি বিলি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু যে সত্যটিকে আড়াল করা হয়েছে তা হল, সরকারে ন্যস্ত জমির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিলি হয়নি। এই বিশাল পরিমাণ অবণ্টিত জমি অসৎ উপায়ে, কিছু ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে চক্রান্ত করে ভোগ করছিল। বহু জমির হদিশ পাওয়া যায়নি। জমি বিলির কাজ মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হয়।

বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কারের দ্বিতীয় দিকটি হল **বর্গাদারদের** নাম নথিভুক্ত করা। ১৯৮১ সালে ২০ লক্ষ বর্গাদার ছিলেন। তার মধ্যে পাঁচ লক্ষ বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়নি। সিপিএম যতই বর্গাদার নথিভুক্ত করার কথা বলুক না কেন, ভূমিহীনদের জমির মালিকানা দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন, ১৯৪০ সালে বাংলার ভূমি রাজস্ব কমিশনের প্রধান স্যর ফ্রান্সিস ফ্লাউড। সিপিএমের কোনও মৌলিক অবদান এক্ষেত্রে নেই।

মনে রাখা দরকার যে, বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৫ সালে জমির মালিকানা উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি করতে চেয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য বিল পাঠিয়েছিল। যে বিল গৃহীত হয়নি।

কংগ্রেস **পঞ্চায়েতি রাজের** প্রবর্তন করে। এ কথা সিপিএম নেতারা প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। সবটাই যেন তাঁদের কৃতিত্ব। পঞ্চায়েতগুলি যে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হবে এমন ধারণা পঞ্চায়েত সদস্যদের ছিল না। সিপিএমের বিভিন্ন স্তরের পার্টি কমিটিগুলিই পঞ্চায়েতের কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিত। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করত পঞ্চায়েতগুলি।

গ্রামোন্নয়ন এবং গ্রামীণ গরিবদের সাহায্যার্থে কোটি কোটি টাকা পঞ্চায়েতগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে পায়। গ্রামের সবচাইতে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা সিপিএমের ছত্রছায়ায় সেই টাকা আত্মসাৎ করার খেলায় নামে। পঞ্চায়েতগুলি আসলে জনগণের পঞ্চায়েত ছিল না। সেগুলো হয়ে ওঠে ঘুঘুর বাসা।

কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি ও গুন্ডা-মাস্তানরা সিপিএমের আশ্রয়ে পুলিশের সাহায্যে পঞ্চায়েত দখল করেছে। তারাই ছিল সিপিএম নেতাদের শক্তির উৎস। বিধানসভা-লোকসভা নির্বাচনে এরাই জালিয়াতি করে নেতাদের নির্বাচনে জয়ী করত।

পঞ্চায়েতে নিজেদের কব্জা দৃঢ় করার জন্য ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত সংশোধনী আইন পাস করা হয়। গ্রামোন্নয়ন সমিতির নামের পার্টি কমিটি দ্বারা অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করেছিল সিপিএম।

কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্রে কোনও মৌলিক কাজ করতে পারেনি সিপিএম। একচেটিয়া দেশ-বিদেশি কোম্পানিগুলির স্বার্থ দেখাতেই নেতা-মন্ত্রীরা মনোনিবেশ করেছিলেন। এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।

৩৪ বছরের অপশাসনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বাণিজ্যিকিরণ হয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মাধ্যমে। বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

মিথ্যা, দ্বিচারিতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সিপিএম এগিয়েছে। কর্মীরা বহুকাল আগেই বিপ্লবের কথা ভুলে গিয়েছে। ৩৪ বছরের শাসনকালে বামফ্রন্ট সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে। সিপিএম-দল হিসাবে হয়েছে একটা আধা-ফ্যাসিবাদী দল।

আট দশকের মাঝামাঝি থেকে সিপিএমের জনসমর্থন কমতে থাকে। মানুষের মোহভঙ্গ শুরু হয়। সিপিএম নেতারা যে কাজটিকে সবথেকে জোর দিয়ে সংগঠত করেন সেটা হল শক্তিশালী ভোট-জালিয়াতি ব্যবস্থা। জোর করে মানুষের জোট পার্টি-নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। পার্টির স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ক্রমাগত সশস্ত্র হার্মাদবাহিনীতে পরিণত হয়। মানুষকে ভয় দেখিয়ে মুখ বুজে থাকার ব্যবস্থা করত এরা। এক সময় যাদের লাল টুপি-লাল রুমাল পরিয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখানো হত —সেই কর্মীরাই পার্টির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে হার্মাদবাহিনী হয়ে ওঠে।

যে দল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলত, সেই দল ক্রমশই একটি প্রতিক্রিয়াশীল দলে পরিণত হয়। হাজার হাজার বিরোধী কর্মী এদের আমলে খুন হন। বহু মানুষ ঘরছাড়া হন। রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস চালিয়ে বহু গণহত্যা সংগঠিত করেন সিপিএম নেতারা।

১৯৬৭ থেকে প্রথম পর্বে সরকারি ক্ষমতায় গিয়ে সিপিএম চেষ্টা করেছিল প্রশাসন ও পুলিশকে ব্যবহার করে এলাকায় এলাকায় প্রভাব বাড়াতে। '৭৭ পরবর্তী সময়ে গোটা পুলিশ-প্রশাসনকেই পার্টির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। সর্বত্র দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস করা হয়। দলের নেতারা যতই নিজেদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করেছেন, ততই দলীয় আদর্শ-শৃঙ্খলা-মানুষের প্রতি দায়বোধ হ্রাস পেয়েছে। সরকার ও দল জনবিরোধী হয়ে উঠেছে। শেষপর্যন্ত দলের কর্মসূচি পর্যন্ত বদলাতে হয়েছে।

মিথ্যা, দ্বিচারিতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সিপিএম এগিয়েছে। কর্মীরা বহুকাল আগেই বিপ্লবের কথা ভুলে গিয়েছে। ৩৪ বছরের শাসনকালে বামফ্রন্ট সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে। সিপিএম-দল হিসাবে হয়েছে একটা আধা-ফ্যাসিবাদী দল।

সিপিএম নেতারা দলকে পাইয়ে দেওয়া ও করে খাওয়ার দলে পরিণত করেছেন। গোটা সমাজে সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই বামফ্রন্ট জমানায় মরিচঝাঁপির গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে। ঘটেছে বিজন সেতুতে আনন্দমার্গীদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা। নানুরে গরিব খেতমজুর হত্যা থেকে শুরু করে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাইসহ বহু ঘটনার সাক্ষী মানুষ। এরাই সাঁইবাড়ির ঘটনা ঘটিয়েছিল।

নীতিগত স্বচ্ছতা না থাকার কারণে জনস্বার্থে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা সিপিএম করতে পারেনি। মুখে কিছুকাল বিশ্বায়নের

সাংস্কৃতিক দিক থেকে লেখক-শিল্পী-কলাকুশলী, খেলোয়াড়সহ সর্বক্ষেত্রে একদল স্তাবক গড়ে তোলার পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল একশ্রেণির সুবিধাবাদী শক্তি।

বিরোধিতা করে কার্যত বিশ্বায়ন নীতিকেই সিপিএম মেনে নিয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে কর্মী সংকোচন, স্থায়ী কাজে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ, উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ, কৃষিক্ষেত্রে চুক্তিচাষ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রবর্তন, বহুফসলি কৃষিজমি দখল করে কারখানা তৈরির ব্যবস্থা, প্রোমোটারিরাজ-সহ কন্ট্রাক্টররাজ—এঁরাই তৈরি করেছেন। প্রথম পর্যায়ে কম্পিউটারের বিরোধিতা, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া ইত্যাদি ভ্রান্তনীতির মাশুল দিতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। ধর্মঘট-বন্‌ধ ইত্যাদিকে সরকারি উৎসবে পরিণত করেছিল সিপিএম।

রাজ্যের গণসংগঠনগুলিকে কব্জা করে গণদাবির আন্দোলনকে পরিকল্পিতভাবে বিপথগামী করেছে সিপিএম। সিটু, এসএফআই, কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এবিটিএ প্রভৃতির মাধ্যমে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে লাগাতারভাবে। নানা সুবিধা দিয়ে গণসংগটনের সদস্য বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে কিছু কথা বললেও পরবর্তিকালে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পাশেই থাকতে চেয়েছে সিপিএম।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে লেখক-শিল্পী-কলাকুশলী, খেলোয়াড়সহ সর্বক্ষেত্রে একদল স্তাবক গড়ে তোলার পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল একশ্রেণির সুবিধাবাদী শক্তি।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন গদিতে বসে তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট ঋণ ছিল ১,২০০ কোটি টাকা। ৩০ বছরে এই ঋণ হয়েছিল। বামফ্রন্ট তার ৩৪ বছরে সেই ঋণকে ২ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে দিয়ে রাজ্যকে একেবারে দেউলিয়া করে ছেড়েছে। ভ্রান্ত আর্থিক নীতির কারণেই এই বেহাল অবস্থা।

সিপিএমের পরিকল্পনা ছিল প্রশাসনে, পুলিসে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-স্কুলে, বিভিন্ন সরকারি সংস্থায়—সর্বত্র পার্টির লোককে নিয়োগ করা। ফলে প্রশাসনের একটা বড় অংশ সিপিএমের পার্টি সদস্য বা সমর্থকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। আজও তার প্রভাব রয়েছে সর্বত্র।

সিপিএম-নেতাদের আর এক বড় কীর্তি হল ঘর-বাড়ি-ফ্ল্যাট-জমি-ব্যবসায় পাড়ায় পাড়ায় সিন্ডিকেট গড়ে তোলা। ইট-বালি-পাথর-রড-সিমেন্ট—এমনকী, ঠিকা শ্রমিক পর্যন্ত জোগান দেবে সিন্ডিকেটের দাদারা। পিছনে থাকবে নেতাদের আশীর্বাদ। গোটা রাজ্যটাকে অধঃপাতে পাঠানোর জন্য এর থেকে ভাল ব্যবস্থা কোথাও হয় না। এ সবের মাধ্যমে অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে অর্থনীতি বহির্ভূত শক্তির রমরমা হয়েছে এ রাজ্যে।

এছাড়া সর্বত্র তোলাবাজির বহুমুখী ব্যবস্থা করেছিলেন সিপিএমের নেতারা। পার্টি ও পার্টি নেতাদের বিপুল সম্পদ দেখলে অবাক হতে হয়। সর্বহারার রাজনীতির কথা বলে সবকিছু হাতানোর রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে সিপিএম।

দল হিসাবে সিপিএম প্রথম থেকেই একদলীয় প্রাধান্যে বিশ্বাসী ছিল। মুখে ফ্রন্ট বা জোটের কথা বললেও দলীয় আধিপত্য বিস্তারেই দলের লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল। '৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে প্রথম দশ বছরের মধ্যে সিপিএম রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে সংগঠিত-বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়নি অনেকদিন। কংগ্রেসে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রনেতা হিসাবে প্রথম থেকেই তিনি সিপিএমের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই শুরু করেন। এজন্য তাঁকে কম লাঞ্ছনা-অপমান-অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। তিনি যেমন নিজেকে সিপিএম-বিরোধী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সিপিএমও প্রথম থেকেই মমতাকে তাদের প্রধান শত্র হিসাবে মনে করত। সিপিএম এবং বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের হাতে বহুবার নিগৃহীতা হয়েছেন তিনি। জীবনঘাতী হামলাও হয়েছে তাঁর উপর।

লোকসভা নির্বাচনে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে মমতা পরাস্ত করেন। ক্রমশই তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলে মমতা এগিয়ে যান। সিপিএম নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে লাগাতার মিথ্যা কুৎসা ও অত্যাচার চালিয়েও তাঁর মাথা নোয়াতে পারেননি।

মমতা শেষ পর্যন্ত আর কংগ্রেসে থাকতে পারেননি। ১৯৯৮ সালে তিনি গড়ে তোলেন তৃণমূল কংগ্রেস দল। বহু লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট অপশাসনের সমাপ্তি ঘটে। নিজের যোগ্যতায় এবং দলের কর্মী ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় আজ তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, তিনি নতুনভাবে পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তুলছেন। তাঁর ইতিবাচক মনোভাব প্রশংসার যোগ্য।

এদিকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েও সিপিএম নেতারা নিত্যনতুন চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। অপপ্রচার ও মিথ্যাকে হাতিয়ার করে মা-মাটি-মানুষের সরকারকে হেয় করার চেষ্টা করছেন। বিরোধী দল হিসাবে সংসদীয় গণতন্ত্রে যে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের কথা—সিপিএম নেতারা পদে পদে তার অন্যথা করছেন। চরিত্রগত দিক থেকে সিপিএম একটুও পাল্টায়নি।

এই দলটি রাজনৈতিক দিক থেকে চরম সুবিধাবাদী। দ্বিচারিতা এই দলের আদর্শ। নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে না এই দল। দুর্নীতিপরায়ণ ও ক্ষমতার লোভ এই পার্টির জন্মলগ্ন থেকেই। মানুষকে এরা বোকা ভাবে। নিজেদের মনে করে সবজান্তা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধার ধারে না এই দল। ক্ষমতাকেই এরা সব কিছু মনে করেন। নিজেদের সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করে সেই ধারণাকে ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র।

মানুষ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। আগামীতে জনমানস থেকেও এরা বিচ্ছিন্ন হবেন। নতুন সময়কে এরা বুঝতে পারছেন না। ভবিষ্যতেও এদের কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন হওয়া প্রায় অসম্ভব। মানুষকে যারা মূল্য দেয় না, মানুষও তাদের উপেক্ষা করবে—এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

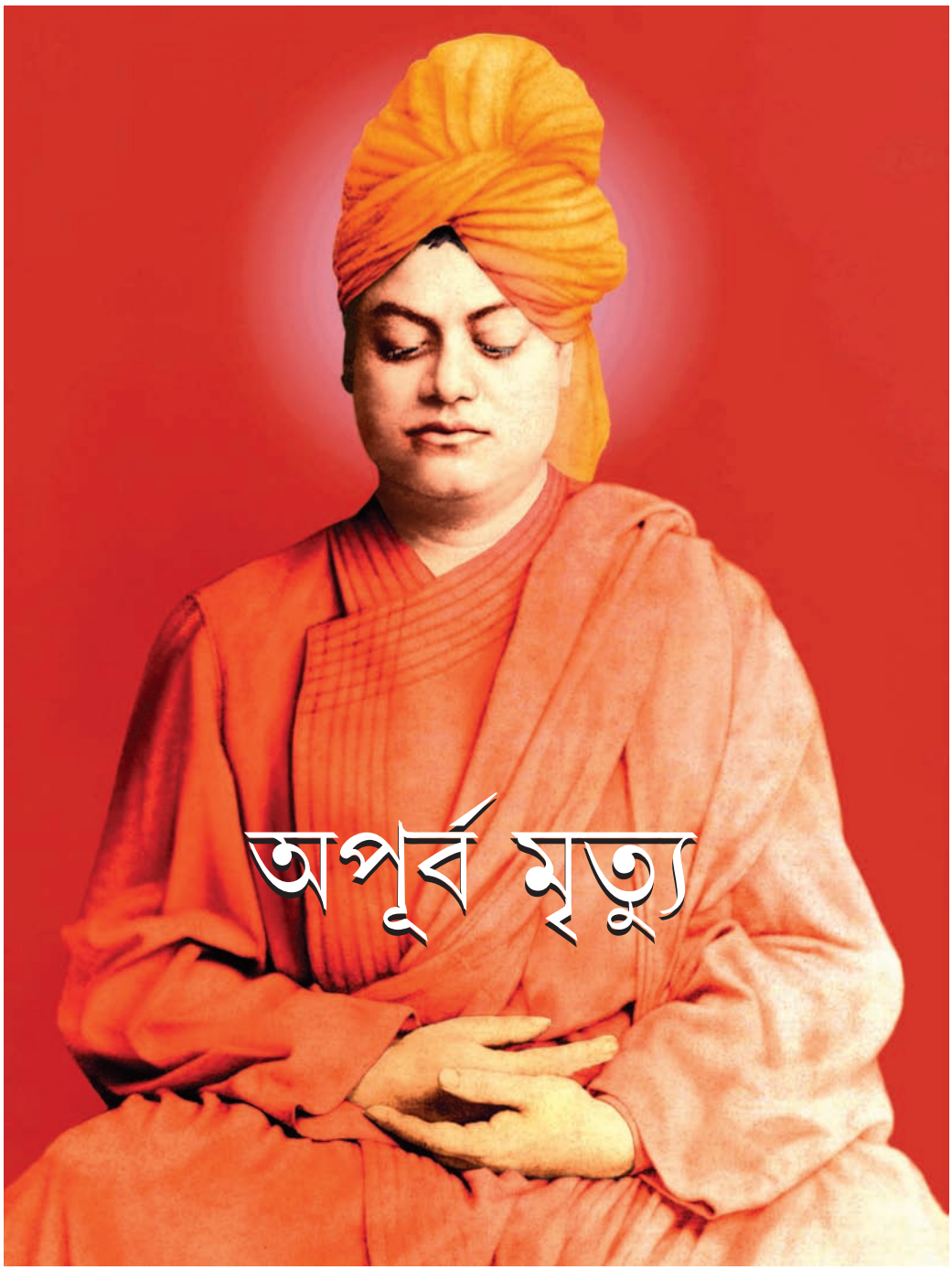

অপূর্ব মৃত্যু

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়



কাঁদছেন স্বামী বিবেকানন্দ।
এ-কান্না দুঃখের নয়।
এ-কান্না আনন্দের নয়।
এ-কান্না সত্যদর্শনের।

বিখ্যাত ফরাসি নৃত্যশিল্পী, স্বামীজির একান্ত ভক্ত, শ্রীমতী কালভে জিজ্ঞেস করলেন, স্বামীজি, আপনার চোখে জল! কেন? কে দুঃখ দিল আপনাকে?

আমি এবার দেশে ফিরতে চাই। সংক্ষেপে উত্তর দিলেন স্বামীজি। তিনি একই সঙ্গে কাঁদছেন এবং হাসছেন।

—এখুনি দেশে ফিরবেন? কেন স্বামীজি? আমরা কি আপনাকে ভালবাসি না? বললেন শ্রীমতী কালভে।

—আমি দেশে ফিরতে চাই মরবার জন্যে।

—মৃত্যু! আপনি এরই মধ্যে মৃত্যুর কথা ভাবছেন? আপনার বয়েস তো এখনও চল্লিশ হয়নি।

—আমার বয়েস চল্লিশ পেরবে না। আমার মৃত্যুদিন ৪ঠা জুলাই।

১৯০২-এর ২১ জুন : পরমভক্ত ও বন্ধু সিস্টার ক্রিশ্চিনকে শেষ চিঠি লিখলেন স্বামীজি—

আমার কথাটি ফুরলো
নটে গাছটি মুড়লো।

I see the cloud lifting, vanishing, the cloud of my bad Karma. And the sun of my good Karma rises—shining, beautiful, and powerful. My boat is nearing, the calm harbour from which it is never more to be driven out. Shiva, O Shiva, carry my boat to the other shore.

১৯০২-এর ২ জুলাই : বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। কী খাওয়ালেন সন্ন্যাসী তাঁর পরমা শিষ্যাকে?

সামান্য গরম দুধ আর কাঁটালের বীচি সিদ্ধ।

খাওয়া শেষ হলে নিবেদিতার হাত ধুয়ে মুছে দিলেন স্বামীজি নিজেই!

—এ কী করলেন আপনি! নিবেদিতা বিস্মিত।

—যিশু তো শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন, বললেন বিবেকানন্দ। তাঁর চোখে মৃদু হাসি।

—সে তো জীবনের একেবারে শেষকালে!

বিবেকানন্দ এবার হাসতে-হাসতে বললেন, ইউ সিলি গার্ল।

৪ জুলাই ১৯০২

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল বিবেকানন্দের।
তাকালেন ক্যালেন্ডারের দিকে।
আজই তো সেই দিন!
৪ জুলাই, শুক্রবার, ১৯০২।

বিবেকানন্দ অনেকদিন ধরেই অসুস্থ। ক্রমেই খারাপ হচ্ছে তাঁর শরীর। তিনি ভুগছেন ডায়াবেটিসে। তাঁর লিভার ঠিকভাবে



কাজ করছে না। সমস্ত শরীরে জ্বালা। বদহজম লেগেই আছে। একটি চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন তিনি ডায়াবেটিসের কারণে। দেখা দিয়েছে কিডনির গোলযোগ। পেটে জল জমেছে। একবার হ্যার্ট-অ্যাটাক হয়ে গেছে। হার্টের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য! আজ ৪ জুলাই ১৯০২, বিবেকানন্দের শরীরে কোনও রোগ লক্ষণ নেই।

যে-জীর্ণ শরীরকে তিনি বাসি কাপড়ের মতো ছেড়ে যেতে চান, সেই শরীর আজ ঝলমল করছে।

বিবেকানন্দ জানেন, পৃথিবীতে আজই তাঁর শেষ দিন।

আজই তাঁকে যেতে হবে।

ভোরবেলা তিনি মন্দিরে গেলেন।

এই তাঁর শেষ ভোরের উপাসনা। ধ্যানমগ্ন উপাসনায় কাটালেন অন্যদিনের থেকে অনেক বেশি সময়।

আজ সকাল থেকেই তাঁর মনে গুন গুন করছে গান।

মনে কোনও অশান্তি নেই। শান্ত, স্নিগ্ধ হয়ে আছে তাঁর অন্তর।

এই বিবেকানন্দই ১৮৯৭-এর ২৮ এপ্রিল লিখেছিলেন—'আমার চুল গোছা গোছা পাকতে শুরু করেছে। আমার মুখের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে। আমার দেহের মাংস কমে যাওয়াতে বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। রোজ রোজ ভীষণ রোগা হয়ে যাচ্ছি। তার কারণ আমাকে শুধু মাংস খেয়ে থাকতে হচ্ছে। রুটি খাওয়া বন্ধ। ভাত খাওয়া বন্ধ। আলু খাওয়া বন্ধ। এমনকী কফিতেও এতটুকু চিনি নেই। আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি। সেই দাড়ি পেকে সাদা হচ্ছে। হে সাদা দাড়ি, তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পার! তোমার জয়-জয়কার।'

এই চিঠিটি যখন লেখেন বিবেকানন্দ তখন মাত্র চৌতিরিশ!

জীবনের শেষদিনে ভোরবেলার উপাসনার পর গুরুভাইদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে করতে সামান্য ফল আর গরম দুধ খেলেন বিবেকানন্দ।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ প্রেমানন্দকে ডাকলেন তিনি। বললেন, আমার পুজোর আসন পেতে ঘরের চারদিকের দরজা বন্ধ করে দে। আমি ধ্যানে বসব। দরজা বন্ধ করে কোনওদিনই ধ্যান করেন না স্বামীজি। জীবনের শেষ সকালে ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকলেন তিন ঘণ্টা!

'He shut the windows and bolted the doors, contrary to his habit, and meditated for three hours', লিখেছেন স্বামী নিখিলানন্দ।

তাঁর ধ্যান ভাঙল বেলা এগারোটায়। তিনি প্রথমে ঠাকুরের বিছানা ঝাড়লেন। তারপর গান গাইতে-গাইতে বেরিয়ে এলেন তিনি। কী অপূর্ব তাঁর কণ্ঠে এই গান—

মা কি আমার কালো।
কালোরূপ এলোকেশী
হৃদিপদ্ম করে আলো।

তরুণ সন্ন্যাসীর রূপের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গুরুভাইয়েরা। গান শেষ হলে বিবেকানন্দ প্রায় চুপি চুপি, নিজের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে হঠাৎ ইংরেজিতে বললেন—

If there was another Vivekananda, then he would have understood what this Vivekananda has done.

চুপি চুপি হলেও গুরুভাইয়েরা শুনতে পেলেন স্বামী বিবেকানন্দের এই অভিমানী উক্তি।

উপাসনার পর সকালের জলযোগ। আজ সকলের সঙ্গে চা খেলেন স্বামীজি। খবর এল জেলেদের জালে ধরা পড়েছে গঙ্গার ইলিশ। স্বামীজির উৎসাহে কেনা হল সেই ইলিশ। ইলিশের দাম



নিয়ে স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে কৌতুক করলেন বিবেকানন্দ। এক বাঙাল শিষ্য ব্রজেন্দ্রকে বললেন, তোরা নতুন ইলিশ পেলে না কি পুজো করিস! তা হলে কর কীভাবে কী দিয়ে পুজো করতে হয়।

বেলা এগারোটার মধ্যেই দুপুরের খাওয়া সারতে বসলেন বিবেকানন্দ। নিজের ঘরে অন্যদিনের মতো একলা খেলেন না। খেতে বসলেন সকলের সঙ্গে।

স্বামীজির ইচ্ছায় রান্না হয়েছে ইলিশের নানারকম পদ। গুরুভাইদের সঙ্গে মহানন্দে ইলিশ ভক্ষণে বসলেন তিনি। তিনি

জানেন আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ তাঁকে পার হতে হবে। ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলার তাঁর আর প্রয়োজন নেই।

'একাদশী করে খিদেটা খুব বেড়েছে। ঘটিবাটিগুলোও খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে', বললেন বিবেকানন্দ। পেট ভরে খেলেন ইলিশের ঝোল, ইলিশের অম্বল, ইলিশ ভাজা।

দুপুরে মিনিট পনেরো বিছানায় গড়িয়ে নিলেন স্বামীজি। তারপরই উঠে পড়ে প্রেমানন্দকে বললেন, সন্ন্যাসীর দিবানিদ্রা পাপ। চলো, একটু লেখাপড়া করা যাক।

দুপুর একটা থেকে চারটে বিবেকানন্দ লাইব্রেরি ঘরে ব্রহ্মচারীদের পড়ালেন পাণিনির ব্যাকরণ। খটমটে, রসবিহীন বিষয়। কিন্তু জীবনের শেষ বিকেলে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্লাসেও নিয়ে এলেন হালকা হাস্যরস।

ব্যাকরণের ক্লাস শেষ হতেই এক কাপ গরম দুধ খেয়ে বিবেকানন্দ বেলুড় বাজার পর্যন্ত দু-মাইল পথ হাঁটলেন।

এতটা হাঁটা তাঁর শরীর ইদানীং নিতে পারে না। হাঁফ ধরে যায় তাঁর। কিন্তু ৪ জুলাইয়ের গল্প অন্যরকম। আজ তিনি অক্লেশে হাঁটলেন। বিকেল পাঁচটায় মঠে ফিরলেন স্বামীজি। সেখানে আমগাছের তলায় একটি বেঞ্চি পাতা। গঙ্গার ধারে মনোরম আড্ডার জায়গা। তামাক খেতে খেতে আড্ডায় বসলেন বিবেকানন্দ।

আড্ডা দিতে দিতে ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল। গুরুভাইদের সঙ্গে স্বামীজির শেষ আড্ডা। সন্ধে সাড়ে ছ'টা হবে। সন্ন্যাসীরা ক'জন মিলে চা খাচ্ছেন। স্বামীজি তাঁদের সঙ্গে চা খেলেন।

সন্ধে ঠিক সাতটা। সন্ধ্যারতি শুরু হল। বিবেকানন্দ জানেন আর দেরি করা চলবে না। শরীরটাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করার পরমলগ্ন এগিয়ে আসছে।

তিনি শিষ্য বাঙাল ব্রজেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ব্রজেন্দ্রকে বললেন, আমাকে দু-ছড়া মালা দিয়ে তুই বাইরে বসে জপ কর। আমি না ডাকলে আসবি না।

বিবেকানন্দ কাউকে দেখাতে চান না, কীভাবে তিনি স্বইচ্ছায় ত্যাগ করতে চলেছেন শরীর।

তিনি জপে বসলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে মুখ করে। স্বামীজি জানেন আজকের ধ্যানই তাঁর জীবনের শেষ ধ্যান। তাঁর দেহমধ্যে মূলাধার পদ্মে তিনটি বেষ্টনে অধোমুখে বিরাজিত পরমাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী।

সেই কুণ্ডলিনী জাগ্রত করবেন তিনি।

পরমাশক্তিকে বেষ্টনমুক্ত করে করবেন ঊর্ধ্বমুখ। বেষ্টনমুক্ত কুণ্ডলিনীকে মেরুদণ্ড দিয়ে আরোহী করাবেন স্বামীজি। এবং শেষপর্যন্ত প্রবিষ্ট করাবেন মস্তিষ্কে। এরপর ফেরার পথ বন্ধ।

জাগ্রত পরমাশক্তি যা ঘটাবার তাই-ই ঘটাবে অনিবার্যভাবে স্বামীজির মস্তিষ্কে।

জাগ্রত কুণ্ডলিনীই খুলে দেবে স্বামীজির মহাপ্রস্থানের পথ। এ-কথা সন্দেহাতীতভাবে জানেন তিনি।

রাত সাতটা পঁয়তাল্লিশ। স্বামীজি ঘটিয়ে দিয়েছেন যা চেয়েছিলেন।

ব্রজেন্দ্রকে ডাকলেন তিনি। বললেন, জানলা খুলে দে। গরম



লাগছে।

স্বামীজি কী ঘটালেন তাঁর মস্তিষ্কে, তাঁর শরীরের মধ্যে?

'He had gone away in a voluntary fit of Kundalini Shakti', লিখেছেন রোমাঁ রোলাঁ।

মেঝেতে বিছানা পাতা। সেখানে শুয়ে পড়লেন স্বামীজি। হাতে তাঁর জপের মালা। তিনি জপ করছেন। ব্রজেন্দ্র বাতাস করছেন স্বামীজিকে। তিনি বললেন, আর বাতাস করিসনি। একটু পা টিপে দে।

রাত ন'টা—বাঁ পাশ ফিরলেন স্বামীজি।

তাঁর ডান হাতটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

কুণ্ডলিনীর শেষ ছোবল বিবেকানন্দের মস্তিষ্কে। বুঝতে পারলেন তরুণ সন্ন্যাসী। তিনি শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। চিত হয়ে শুলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একবার। গভীর সেই শ্বাস। চোখের তারা দু'টি স্থির হয়ে গেল ভুরুর মাঝখানে। মাথাটা ঈষৎ নড়ে উঠল।

এক অপূর্ব মৃত্যু। ঠোঁট আর নাকের কোণে দেখা দিল রক্তের ফোঁটা।

দিব্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর সমস্ত মুখ আর শরীর! তাঁর ঠোঁট হাসছে!

তরুণ সন্ন্যাসী বলেছিলেন, আমার বয়েস চল্লিশ পেরোবে না। বয়েস ঠিক ঊনচল্লিশ বছর, পাঁচ মাস, চব্বিশ দিন।



সার্ধশতবর্ষে দ্বিজেন্দ্র প্রণাম

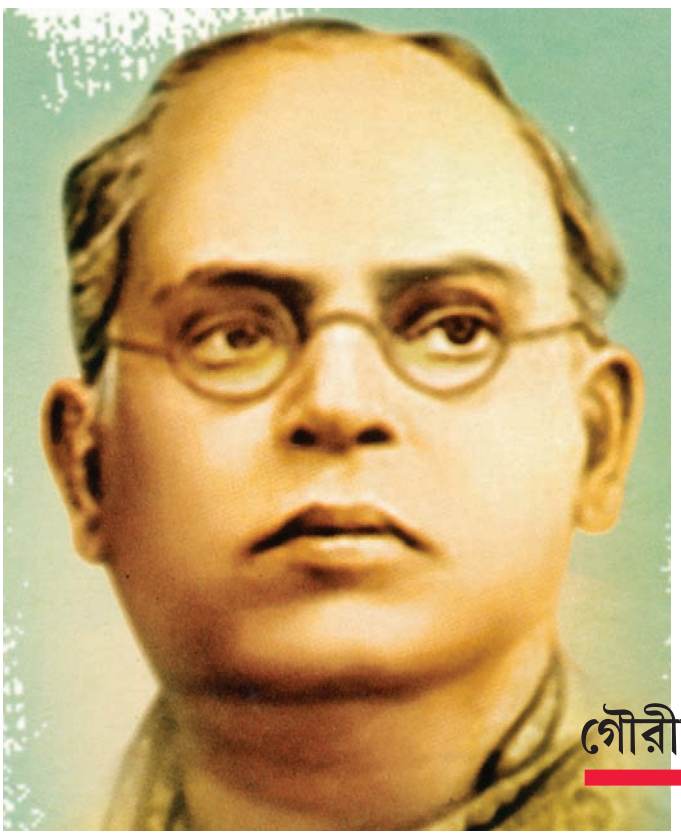

গৌরীশঙ্কর দত্ত

বাংলা ভাষার উন্মেষ থেকে যাঁদের উজ্জ্বল অবদানে বঙ্গীয় সারস্বত পরম্পরা আজও ভাস্বর, কবি-নাট্যকার-গীতিকার-সুরকার-দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, তাঁদের অন্যতম অগ্রপথিক হিসাবে বাঙালি হৃদয়ে তাঁর চিরন্তন স্থান স্বীয় অধিকারেই অর্জন করে নিয়েছেন।

১৯ জুলাই ১৮৬৩ তে কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম হতে ১৭ মে ১৯১৩ তে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের স্বল্প আয়ুষ্কাল তাঁর। পরশাসনে শৃঙ্খলিত বঙ্গভূমিতে ঘটেছিল তাঁর জন্ম ও মৃত্যু। বৈদেশিক শাসনের অভিশাপের লজ্জা সহ্য করার অসম্মানটাকে ছুড়ে ফেলার সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষাই হয়ে উঠল সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের ১৮৮২-১৯১৩ এই ৩২ বছরব্যাপী সাহিত্যজীবনের মূলমন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মতোই দ্বিজেন্দ্রলালের গান-কবিতা-নাটক হয়ে উঠল বাঙালির নবজাগরণের প্রাণসঙ্গীত দেশমুক্তির মন্ত্র। দ্বিজেন্দ্র-আবির্ভাবের দেড়শো বছর বাদে আর এক কৃষ্ণনাগরিক সারস্বত পুরুষ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের অনুরণনে তাই বলতেই হয়—"আজ ভাবি ইংরেজের শাসনদণ্ডের নিকট সসম্ভ্রমে নতিস্বীকার করে দ্বিজেন্দ্রলাল যদি তাঁর কণ্ঠকে নীরব রাখতেন তো আমাদের পরাধীনতার রাত্রি হয়তো আরও দীর্ঘায়িত হত।" একথাও তো সত্যি, যদি জার্মান বা রুশ সাহিত্যিকেরা সেদিন নীরব না রইতেন, হিটলার-স্তালিনের অভিশাপ এত দীর্ঘস্থায়ী হত না অথবা বিগত ৩৪ বছরের আসুরিক অমানিশা কি গ্রাস করতে পারত বাংলাকে, যদি না রাজউচ্ছিষ্টের লোভ পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে না রাখতে পারত আমাদেরই তথাকথিত সারস্বত সমাজের অংশবিশেষকে? তাই দ্বিজেন্দ্রলালরা আজও



মা-মাটি-মানুষের চারণকবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মের সার্ধশতবর্ষে তাঁর উদ্দেশে তাই শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে মা-মাটি-মানুষের অগ্রগতি ও সার্থকতা, যে-পথে অনেক অনেক দিন বাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এখন এগিয়ে চলেছে সকল দেশের রানি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি আমাদেরই এই বাংলা।

প্রাসঙ্গিক, আজও প্রণম্য।

মানুষ মাটিতে জন্মেই প্রথম দেখে তার মাকে। তাই মা-মাটি আর মানুষ অচ্ছেদ্য ও অভিন্ন। জন্মভূমির মাটিকে নিজের মা না ভেবে নিলে মানুষ তাকে ভালবাসতে পারে না নিজের করে, এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাই মা-মাটি-মানুষের এই চারণকবি সেদিন লিখলেন, "জননী তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি/হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;/ জননী, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ;/ জগৎপালিরি! জগদ্ধারিণী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ!/" রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া দেশকে অবলম্বন করে এত উচ্চতর ভাবালোক সৃষ্টি আর কোনও কবির রচনায় প্রতিভাত হয়নি। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের গান শুধু বীররসের উদ্দীপক হয়ে চিত্ত আলোড়নে বন্দি না থেকে হয়ে উঠল মাতৃপূজার বোধনমন্ত্র, দেশমাতৃকার আরাধনার বেদ।

ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' শুধু আনন্দমঠ নামক সুখপাঠ্য উপন্যাসে বন্দি না রয়ে হয়ে উঠেছিল যেমন জাতির মুক্তির লড়াইয়ের বীজমন্ত্র, বিদেশি শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ জাতির মনে তেমনই দ্বিজেন্দ্রলাল বইয়ে দিলেন মা-মাটির আহ্বান—"ধনধান্য পুষ্প ভরা/আমাদের এই বসুন্ধরা,/ তাহার মাঝে আছে দেশ এক/ সকল দেশের সেরা।/...এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।/ সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।।/" যা জাতির ঘুমন্ত মনে দিল জাগরণের জাদুমন্ত্র। প্রাণে প্রাণে উদ্বেল হল মুক্তিসাধনার ব্রত। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারা জন্মলাভ করিয়াছে-দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশে' তাহা প্রবাহিত হইয়া পরিপুষ্ট করিয়াছে।" যারা শৃঙ্খলিত, যারা পরাধীন, যারা ক্রীতদাস, তাদের মনে বাঁধন ছেঁড়ার মাভৈঃ মন্ত্র শোনানোর জন্যই তো দেশে দেশে কবিরা চলছেন যুগে যুগে রুদ্রবীণা বাজিয়ে। পরাধীন স্বদেশবাসীর উদ্দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের রুদ্রবীণায় সেদিন পরপর বেজে উঠল- 'বঙ্গ আমার জননী আমার /ধাত্রী আমার, আমার দেশ/ কেন গো মা তোর মলিন বসন,/ কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ,/...আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ;/ দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ—/ ওই গান শুনে বাঙালি প্রথম বুঝল যে ওই গানের কবিত্বটাই বড় নয়, তার চেয়ে বড় ওর সুর। কোনও সুর হৃদয়কে এভাবে জাগিয়ে-তাতিয়ে-মাতিয়ে দিতে পারে, তা তারা আগে কখনও শোনেনি বা দেখেওনি। ওই পাগল করা সুরের ডাক সেদিন পরশাসনে ত্রস্ত স্বদেশবাসীর হৃদয়তন্ত্রীতে সঞ্চারিত করল নতুন আশা-উদ্দীপনা। গত ৩৪ বছরের হার্মাদশাসনের দুঃসহ কালে আমরা উপলব্ধি করেছি ছদ্মবেশী সুবিধাবাদীরা শাসকের স্বার্থে মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রশ্ন তুলে মানুষের সহজাত অধিকারের প্রশ্নটিকে ঘোলাটে করে দেয়, পরাধীন দেশও ছিল না এই ধরনের ভণ্ডদের থেকে মুক্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল এদের কশাঘাত করেই সৃষ্টি করেছেন, 'নন্দলাল'-কে "নন্দলাল ত একদা করিল ভীষণ পণ—/স্বদেশের তরে, যা করেই হোক রাখিবেই সে জীবন।/...নন্দর ভাই কলেরায় মরে, তাহারে দেখিবে কেবা।/ সকলে বলিল, 'যাও না নন্দ কর না ভায়ের সেবা' !/ নন্দ বলিল, 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দি—/না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি?/ বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক'/ সকলে তখন বলিল-হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে ঠিক।/" আমাদের চারপাশে কি আজও নন্দলালেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে না?

দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস করতেন "অতিদম্ভী অত্যাচারীর পেতেই হবে সাজা।" তা সে দম্ভী স্বদেশিই হোক আর বিদেশিই হোক। তাঁর লেখনীতে তাই এল, "ওরে ও ভাই চাষী; ওরে ও ভাই তাঁতি;/ পড়িস না নুয়ে; জানিস এ সব ফাঁকি;/ তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে,/ কর্বে তোদের উপর রক্তবর্ণ-আঁখি?/ দ্বিজেন্দ্রলাল দেশকে-মাটিকে মা ভেবে শুধু পুজোই করেননি সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষকে ভালবেসে বার বার ডাক দিয়ে বলেছেন 'মানুষ' হতে। দিয়ে গেলেন অমোঘ আহ্বান, "কিসের শোক করিস ভাই-আবার তোরা মানুষ হ।/ গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই-আবার তোরা মানুষ হ।।/ দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক আর এক কৃষ্ণনাগরিক সারস্বত প্রতিভা প্রমথ চৌধুরি যথার্থই লিখেছেন, "তিনি স্বজাতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি দেশের দৈন্য দূর করতে হয়, তার জন্য আমাদের মনে ও চরিত্রে যোগ্য হতে হবে, সক্ষম হতে হবে, সবল হতে হবে। আমার বিশ্বাস, তাঁর দেশপ্রীতির চরম বাণী এই যে 'আবার তোরা মানুষ হ'।"

মা-মাটি-মানুষের চারণকবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মের সার্ধশতবর্ষে তাঁর উদ্দেশে তাই শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে মা-মাটি-মানুষের অগ্রগতি ও সার্থকতা, যে-পথে অনেক অনেক দিন বাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এখন এগিয়ে চলেছে সকল দেশের রানি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি আমাদেরই এই বাংলা।



বাঘের সার্কাস

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ডাক বাংলোর পাশের ময়দানে সার্কাস এসে গেছে। চন্দ্রাণী ইন্টারন্যাশনাল। প্রত্যেক বছর আসে। পেছন দিকেই জঙ্গল। জঙ্গলটার নাম রানির জঙ্গল। কোনও এক রাজার রানিকে চোখ বেঁধে এই জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। কী সব বদমাইশ! গুলি করা উচিত।

ঠিক হয়েছিল। যেমন কর্ম তেমন ফল। সেই রানি হয়ে গেল সাঙঘাতিক ডাকাত। ডান হাত হল মোহন সর্দার। রানির মুখ কালো মুখোশে ঢাকা। পুরুষের পোশাক। কালো তেজি ঘোড়া। সেই ঘোড়া যখন পাথরের রাস্তা দিয়ে তীব্র বেগে ছুটত ঘোড়ার পা দিয়ে খাঁই খাই করে আগুন ছিটকোত। আমার দাদুর কাছে শুনেছি। দাদু শুনেছিলেন তাঁর দাদুর কাছে। তাঁরা মিথ্যে কথা বলবেন কেন? জঙ্গলের সামনের পথ দিয়ে রাজার খাজনা গাড়ি যেত। লোহার চাকা লাগানো, কামান ফিট করা। ডাকাতরা সব গাছের ডালে বড় বড় জাল নিয়ে বসে থাকত। জালে বড় বড় হুক লাগানো। ঝপ ঝপ করে হুক লাগানো জাল পড়তে লাগল। রাজার সিপাইরা চেল্লাচ্ছে, বাবারে, মারে, বাঁচাও, বাঁচাও। কে বাঁচাবে! টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে জাল জড়ানো অবস্থায় দিঘির

জলে। তিনটে পেল্লায় কুমির ছিল সেখানে। রানি তাদের নাম রেখেছিল সোম, বুধ, শুক্কুর। এই সময় রাজা এক মস্ত ভুল করলেন। রানির কাছে ক্ষমা চাইতে এলেন। রানি কম ধুরন্ধর! যেখানে সার্কাস বসেছে, সেইখানে বিরাট তাঁবু লাগিয়ে রাজার সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন। নাচ,গান, খানাপিনা —রাজার বডিগার্ডরা খুব খেয়েছে। রানি অনেকদিন পরে রাজার পাশে বসে খুব খাইয়েছে। রাজার চোখ বুজে আসছে। রাজা ঘুমিয়ে পড়ল। সব রেডি করাই ছিল। কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে রাজাকে বস্তায় পুরে অনেক অনেক দূরের একটা জঙ্গলে চালান করে দেওয়া হল। সেখানে কী নেই! কেঁদো বাঘ, ধেড়ে হাতি, অজগর, রামায়ণের আমলের এক ডজন রাক্ষস। একেই বলে বদলাবদলি। তারপর রানি কালো মুখোশ পরে যুদ্ধের পোশাকে কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। সঙ্গে আরও একশো দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার। গভীর রাত। শেয়াল ডাকছে। হাতিরা মট মট করে গাছের ডাল ভাঙছে। রানি অতর্কিতে রাজবাড়ি আক্রমণ করলেন। আধঘণ্টার মধ্যে দখল। রানি হলেন রাজা। কত ভাল ভাল কাজ করলেন। রানি জঙ্গলে যে বাড়িটায় থাকতেন ভেঙেচুরে পড়ে আছে। ভিতরে বাঘ, বাঘ গন্ধ। হাড়গোড়, মাথার খুলি। সেই রানির নামে রানিবাঁধ, ধর্মশালা, বিদ্যালয়, কত কী?

আমি আর আমার ভীষণ বন্ধু অনিল সাইকেলে চেপে তাঁবু দেখে এলুম। বিউটিফুল! সবাই এসে গেছে, বাঘমামা, ভাল্লুক কাকু, হাতি দাদা, মিস্টার ক্লাউন, আকাশে ঝোলা দিদিমণিরা। ম্যানেজার কাকুর সঙ্গে আমাদের দু'জনের খুব ভাব। কেন ভাব হবে না! ম্যানেজার কাকু ঝিঙে-পোস্ত, লাউচিংড়ি, কচুর লতি, ধোঁকা খেতে ভালবাসেন। আমার মায়ের রান্না যে একবার খেয়েছে সে জীবনে ভুলতে পারবে? আমার বাবার বন্ধু খ্রিস্টান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্কটল্যান্ডের বাড়িটাই বিক্রি করে দিলেন! চার্চের পাশে দারুণ একটা বাংলো তৈরি করে আছেন। মায়ের হাতের সোনা মুগের ডাল, পোস্তর বড়ার লোভে। এই একমাস সার্কাস থাকবে, আমি রোজ দিয়ে আসব। বাপরে কী মোটা! হাসতে হাসতে বলেন, "ওই হাতিটা পালিয়ে গেলে এই হাতিটাকে দিয়ে কাজ চালানো যাবে।" চমৎকার মানুষ। আমি খুব ভালবাসি। যখন এখান থেকে চলে যান, আমি তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদি। কোথায় না কোথায় চলে যাবেন। কে আমাকে দেশ-বিদেশের গল্প বলবে! আমি বলেছিলুম, "কাকু! আমাকে তোমার সার্কাসে নাও না, আমি একসঙ্গে দশ-বারোটা ডিগবাজি খেতে পারি।"

কাকু বলল, "আর দু-তিন বছর পরে, আরও কিছু টাকা জমলে আমি তোর কাছে ফিরে আসব। তখন তোতে আর আমাতে মিলে বই লিখব। কত কী লেখার আছে রে!" প্রত্যেকবার কাকু আমাদের দু'জনকে আর আমাদের দুই মাকে কিছু না কিছু দেবেনই। কিচ্ছু করার নেই। যেমন বড় শরীর সেইরকম বড় দিল। ভয় লাগে বাবা, কেউ যেন ভেবে না বসে আমার, কি অনিলের লোভ আছে। আমরা কিচ্ছু চাই না। বেড়াতে চাই। দেশ-বিদেশে যাব। মানুষ দেখব, বাজার দেখব, রাত্তিরবেলা আলো ঝলমলে শহর দেখব। কারও সঙ্গে ভাব হবে, তার বাড়িতে যাব। পাহাড়, ঝরনা, নদী। কিছুদিনের জন্যে হারিয়ে যাব।

কাকু পানামা গিয়েছিলেন, দুটো সিল্কের শার্ট এনেছেন। সে কী বাহার! আমরা দু'জনেই একমত! জীবন থাকতে পরা যাবে না। তোলা থাকবে। সার্কাস নিয়ে মাইসোর গিয়েছিলেন। দু'খানা পাগল করা শাড়ি। তাঁবু কমপ্লিট। তার-টার সব ঝুলে গেছে। মেয়েগুলো কী ঝগড়াই করতে পারে! ভাষা তো বোঝাই যায় না। হাঁউমাউখাঁউ। সব ক'টা স্প্রিং-এর মতো লাফাচ্ছে। ওদের মায়েরা ওদের কী খাইয়ে বড় করেছে? জানি না বাবা!

কাকু এবার বিরাট একটা পাইথন এনেছে আমাজনের জঙ্গল থেকে। কী সুন্দর দেখতে! কিন্তু সাপ! ওই, দূর থেকে দেখতে হবে। তাও গাটা কেমন ঘিন ঘিন করে। তলতলে, থলথলে। আস্ত একটা ছাগল গিলে খেয়ে ঘুমোতে চলে যাবে। শিকারকে স্রেফ পেঁচিয়ে ধরবে, দম বন্ধ হয়ে পগারপার। মেয়েটার নাম রুমকি। কোন দেশের কে জানে? সুন্দর দেখতে। অনিল বললে, আমাদের বোন হতে পারত! পেয়ারা, জামরুল, বিলিতি আমড়া কত কত খাওয়াতুম! রুমকি পাইথনটাকে গায়ে জড়িয়ে বসে আছে।

ম্যানেজার কাকু বললে, "ওদের দু'জনের মধ্যে খুব ভালবাসা। রুমকিই দেখাবে পাইথনের খেলা। এবারের বিশেষ আকর্ষণ!"

দু'জন ক্লাউন সেজেগুজে রেডি। দুটো গাড়ি নিয়ে প্রচার বেরোবে এখুনি। হালকা লাল রঙের পাতলা কাগজে ছাপা হ্যান্ডবিল বিলি করবে। আজ বেলা তিনটের সময় উদ্বোধন। একটু টেনশন তো হবেই। এতগুলো জন্তু। মানুষ! উদ্বোধন শো'তে বড় বড় গম্ভীর গম্ভীর সব লোক আসবেন। সাঙঘাতিক দেমাক। একজনকে আমরা দু'জনেই সহ্য করতে পারি না। নাম রেখেছি সবজান্তা হালদার। টাকা হলে মানুষের জ্ঞান বাড়ে। তাই হয়েছে মনে হয়। কারও খারাপ হোক-এমন চিন্তা করতে নেই। জানি, তবু করি। অনিল দারুণ দারুণ কথা বলে, আমি কী রকম যেন, বোদা মার্কা, ভেঁদো মার্কা। অনিল বলে, "চিন্তা ধুলোর মতো, না চাইলেও আসবে।" তাই ভাবি—জঙ্গলের বাঘে না খাক, ওই 'হাম বড়া' লোকটাকে সার্কাসের বাঘেও তো খেতে পারে!

খানিক ইংরিজি বাজনা বাজল। একগাদা গ্যাস বেলুন একসঙ্গে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হল। শীতের দুপুর রোদ গাছের মাথায় চড়েছে। পিলপিল করে সব আসছে। ছেলে, মেয়ে নিয়ে। কত রঙের সোয়েটার। মেয়েদের শীত করে না। পুলিশের বড়কর্তা এসেছেন, সঙ্গে এক গাদা ছোট কর্তা। আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এসেছেন। ম্যানেজার কাকু বিলিতি ড্রেস দিয়েছেন। বড়দের সংবর্ধনা জানাচ্ছেন। কুমকুম দিদি প্রত্যেককে একটা করে লাল গোলাপ দিচ্ছেন। ছুটন্ত কালো ঘোড়ার পিঠে কুমকুমদি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাহাদুর মেয়ে বটে।

শুরু হয়ে গেল। ফার্স্ট শো। হাতিদের নমস্কার। শুঁড়ের ডগায় দুলছে ফুলের মালা। প্রথম দৃশ্যেই মাত। ম্যানেজার কাকুর দু'পাশে আমরা দু'জন। আমাদের বাঁধা জায়গা। বাঘের খেলা দেখান সুলতান কাকু। টাইট সাদা পোশাক। সরু ছুঁচলো গোঁফ। চোখ দুটো সাঙঘাতিক। তাকালেই মনে হবে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে। কোন দেশের মানুষ! আবলুস কাঠের মতো গায়ের রং। ম্যানেজার কাকুর কানে কানে কী বললেন। তিনি উঠে তাঁর অফিস তাঁবুর দিকে চলে গেলেন। এদিকে মেয়েরা ট্র্যাপিজের খেলা শুরু করেছে। এই সময়টায় বুকের ভিতরটা কেমন গুড় গুড় করে। নিচে মোটা জাল পাতা থাকলেও ওই উঁচু থেকে আচমকা পড়ে গেলে একটা শক তো লাগবেই। তোদের কী দরকার বাবা এত বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার। ঘরের মেয়ে ঘরে যা না! সংসারের কাজে মাকে সাহায্য কর।

আমাদেরও ডাক পড়ল। কাকুর পাহাড়ের মতো শরীরটা যেন ভেঙে পড়েছে। সুলতান কাকু একটা টুলে গম্ভীর মুখে বসে



আছেন। কাছে ডেকে ফিসফিস করে বললেন, "সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাঘটা খাঁচা থেকে পালিয়ে গেছে। এ তো বলা যাবে না। আতঙ্ক ছড়াবে। পুলিশের বড় কর্তা বসে আছেন, আমাকে অ্যারেস্ট করে লক আপে। কাল সকালে সদরে চালান। আবার না বললেও বিপদ, মানুষ সাবধান হতে পারবে না। আজ আবার হাটবার। আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।"

আমি বললুম, "একদম নার্ভাস হবেন না। আমরা আছি।"

কাকু বললেন, "তোরা কী করবি, আর আমরাই বা কী করব! সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেলেও নরম, নরম মানুষ খেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। এতক্ষণে শুরু করে দিয়েছে কি না কে জানে? এর পিছনে ষড়যন্ত্র আছে। সুলতানকে আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

সুলতান লাল চোখে তাকিয়ে বললে, "আমাকে ফাঁসাতে চাইছ?"

"তোমাকে ফাঁসাব কী? আমি নিজেই তো ফেঁসে বসে আছি। পুলিশ তো ডাকতে হবে না, সামনের সারিতে সব বসে আছে।"

অনিল বললে, "বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে। তখন কী হবে ভেবে দেখেছেন? আমরা বাঘ বশীকরণের মন্ত্র জানি। সেই মন্ত্র পড়লে বাঘ পোষা কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে চলে আসবে।"

ম্যানেজার কাকু রাগের গলায় বললেন, "তা পড়ছ না কেন? চুপ করে বসে আছ?"

"উত্তর দিক কোনটা? সেই দিকে মুখ করে বসে পড়তে হবে।" ম্যানেজার বললেন, "ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই শিখিয়েছিলেন, পুব দিকে, যেদিকে সূর্য ওঠে সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালে—ডান দিকটা দক্ষিণ, বাঁ দিকটা উত্তর।"

সুলতান কাকু বললেন, "যে দিকে মুখ করে বসে আছ সেই দিকটাই উত্তর।"

"তাহলে মন্ত্রটা পড়ি—একটু গঙ্গাজল হাতে নিতে পারলে ভাল হত। যাকগে, যা নেই, তা নেই।"

আমরা কোরাসে মন্ত্র শুরু করলুম,

ওঁ দম্ দম্ দম্

এত জোরে দম্ দম্ বলেছি সবাই চমকে উঠেছে। যেন বোমা ফাটল। কী করব! ওইটাই তো বীজমন্ত্র,

ওঁ দম্ দম্ দম্
চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়
শার্দূলবাহন দক্ষিণরায়
ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি হস্তে
দক্ষিণরায় নমোহস্তুতে।।
ওঁ দম্ দম্ দম্।

ম্যানেজারকাকু বললেন, "রেজাল্ট! কতক্ষণ পরে আসবে?"

সুলতানকাকু বললেন, "আসবে কি, এসে বসে আছে। বসে নেই শুয়ে আছে। আপনার ক্যাম্পখাটের তলায় শুয়ে আপনারই নতুন ডার্বি জুতো চিবোচ্ছে। আমি তখনই বলেছিলুম একেবারে কাঁচা চামড়ার জুতো। পরে বেরলে বাঘে তাড়া করবে। ঠিক তাই হল।"

ম্যানেজারকাকু বললেন, "চুপ কর, আমার প্রশ্ন হল, বাঘ কী করে কুকুর হয়ে গেল?"

'ট্রেনিং-এর গুণে স্যর।'

হঠাৎ অনিলের খেয়াল হল, ফিস ফিস করে বললে, "দু'হাত দূরে বাঘ, বসে আছিস কি রে?"

দৌড় দৌড়। সে কী স্পিড! অনেক রাতে মনে হল, ম্যানেজারকাকুকে খেয়ে ফেলেনি তো! সকালে গিয়ে দেখলুম, না খায়নি। তিনি ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন, খুব মন দিয়ে।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



উনত্রিশে জুন এবং সন্তোষ

বুদ্ধদেব গুহ

এটা কী গাছ জানিস?

গাছ গাছই। অত নামধাম জেনে দরকার কী?

—তবু, এত বড় গাছটা মাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মদৈত্যর মতো, তার নামটাও জানতে ইচ্ছে করে না?

—গাছের নাম জানলে কি পেট ভরবে আমার? ওই সব বিলাসিতা আপনাদের মতো বাবুদেরই মানায়। গাছ গাছই, পাখি পাখিই, এর চেয়ে বেশি জানার দরকার কী?

—তুই সত্যি সত্যিই একটা গণ্ডমূর্খ সন্তোষ। নিজের নামটাও সই করতে পারিস না।

নিজের পেটের ডানদিকে হাতটা ঠেকিয়েই বলল, এই মরেছে! আবার ব্যথাটা চাগার দিল গো। বেশ ছিলাম ক'টা দিন।

—তুই তো সিউড়িতে গেছিলি।

—সিউড়িতে তো যাইনি। কী য্যান জায়গার নাম? সিয়ান নাকি যউনো।

পল্টুবাবুটি কে?

সি কি? আপনারে তো দেশ থিকি বার করে দিবে। পিসিডেন্টের নামটি পর্যন্ত জানোনি?

—কিসের পিসিডেন্ট?

—আরে! ভারতের রাষ্টপতি। দিল্লিতে থাকে গো। রাইসিনা পাহাড়ে। মদনবাবুর বাড়িতে টিভিতে দেখেছিলাম।

—কী দেখেছিলি?

—সে মেলা লোক-ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে সব হাতে প্ল্যাকাড নিয়ে পল্টুবাবুর বাড়ির দিকে যাচ্ছিল যে গো। তবে পিসিডেন্টের বাড়ি বলে কথা। যাব বললিই কি যাওয়া যায়? পুলিশে আইটকে দিল।

—তুই বড় আজেবাজে কথা বলিস। হচ্ছিল তোর পেট ব্যথার কথা — সিয়ানের হাসপাতালে গেছিলি - তা দিলি সব গোলমাল করে।

—আঃ আঃ, বাবুগো ইবারে মরেই যাব।

তা সিয়ানে ডাক্তার কী বলল?

—বলল, সিউড়ি যেতে। সেথায় গিয়ে বড় ডাক্তার দেকাতে, পেটের ছবি তুলতে আরও কী সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে—সে সব অনেক টাকার ব্যাপার বাবু। সিউড়ি যাতায়াতের বাস ভাড়াই জোটাতে প্রাণ যায় তার উপর আবার অতসব হ্যাপা।

—তা টেস্ট না করালে চিকিৎসাটা হবে কী করে। ডাক্তার যদি বুঝতেই না পারে আসলে কী হয়েছে তবে চিকিৎসাটা করবে কী করে।

—তার আমি কী করব।

—তাহলে পেটে হাত দিয়ে শুয়ে থাক। আর কী করবি।

—তোমার কাছ থেঙ্গে তো বারেবার চাওয়া যায় না। গতবারও দিছিলে এক কাঁড়ি টাকা। চিঠিও নিকে দেছিলে ডাক্তারকে—তা সিউড়ি যাওয়া আসাই সার হল। ডাক্তার বললে পঁচিশ হাজার খরচ আছে। পেট অপারেশন করতে হবে। তা অত টাকা তো তুমি দিলে না। আমিই বা পাই কোত্থেকে। পেটের মদ্দি যা আছে তা থাক—। শুধু ব্যথাটা উঠলে আর সহ্য করতে পারি না। মনে হয় বাসের নিচে লাফিয়ে পড়ি। কিন্তু বৌটার কী হবে? আর ছোট ছেলেটার? ছোটটার যে মাত্র আট-ন'বছর বয়স।

—বড়টা কি এখনও তোর শালার কাছে ছুতোরের কাজ শিখছে? আসে তো মাঝেমধ্যে?

—তা আসে।

—রোজগার কেমন করে?

—এখনও তো মামার জোগানদার। অ্যাপেনটিসি করতেছে। নিজে একা কাজ করতে শুরু করেনি এখনও। কবে পারবে তা তো জানি না। তবে মামার বাড়িতেই থাকে, দু'বেলা খেতেও পায়। তার পেটটা ভরে এইটাই শান্তি।

—পেটের ব্যথা নিয়ে সাইকেলটা টেনে নিয়ে যেতে তোর কষ্ট হলে আমাকে দে। আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

—না। একটু পরেই বিশ্বভারতীর গেটের বাইরে গিয়ে সাইকেলে চড়ে বসব।

—আজ আমার ওখানে খাবি না?

—না। বাপিদা যে বলল, আজকে আমার ভাতের চাল নেয়নি। আপনি নাকি বলেননি। কাল থেকে নেবে বলেছে।

আমি চুপ করে রইলাম। কথাটায় যাদের মন ছোট হয় তারা সবাই ছোটলোক। সে গরিবই হোক কী বড়লোক। নইলে মালিকের পয়সাতে খাওয়াবে একটি গরিব মানুষকে, তাও একবেলা, তাতেও এত কার্পণ্য?

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিশ্বভারতীর কম্পাউন্ড থেকে বেরোতে বেরোতে সন্তোষকে বললাম, গাছটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখ। এই গাছও না চিনলে তোকে শান্তিনিকেতনে থাকতে দেবে না।

—কে?

—বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ।

—ফুঃ। ছাড়ুন তো ওনাদের কথা! এত বছর ধরে নদীর প্রায় ওপরেই মাটির ঘর বানিয়ে আছি—প্রতি বছরই ঘর পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়, তাছাড়া এবারে যা বৃষ্টি—তা এতদিন পরে ওরা জরিপ করে বার করলেন যে ওই জমিও, মানে খোয়াইও ওঁদেরই সম্পত্তি। আমাদের তাড়িয়ে দেবেন বলছেন।

—গাছটার নাম ছাতিম। ওই গাছের নিচেই রবিঠাকুরের দাদু পাল্কি থামিয়েছিলেন এক গরমের দুপুরে। সেই গাছের জন্যেই শান্তিনিকেতনের জন্ম। বুঝলি!

—বুঝলাম না, তবে জানতি পেলাম।

—গাছ চিনতে হয় গাছের পাতা দেখে।

—অ। আর মানুষ কী করে চিনতে হয়? মানুষ চেনার ওরকম কোনও সোজা উপায় আছে?

—আমি হেসে বললাম, না। তবে মানুষের রকম মাত্র দুই।

—কী রকম?

—ভাল মানুষ আর খারাপ মানুষ।

—বাঃ। এই কথাটি বেশ বলেছেন বাবু।

(২)

বাইরে বেরিয়ে আমি বললাম, কাল ভোরে আসবি তো?

—আসব বই কী। বাপিদা তো আগেই দরজা খুলে রাখে। আপনার পা টেপা শুরু করে দেব। বাপিদা চা দেবে আপনাকে পরে। আপনার চা খাওয়ার পরে আমরাও চা খাব।

—কাল চায়ের সঙ্গে কী খাবি?

—ওই।

—ওই মানে কী?

—ওই মানে মুড়ি। বাপিদা তো চায়ের সঙ্গে ওই দেয়।

—না। কাল জিলিপি আর সিঙাড়া খাস।

—কেন?

—কালকে আমার জন্মদিন।

—তাই? তাহলে আপনার জন্যে তাল নিয়ে আসব দুটি। বাপিদাকে বলব তালের বড়া ভেজে দেবে।

—তুইও খাবি তো?

—খাব বই কী। আপনি তো উপলক্ষ। ইকানে খাইদ্য খাদকের বড়ই অভাব। একটা উপলক্ষ হলেই ভাল মন্দ কিছু খাওয়া যায়।

কাল তো আবার মাসের চোদ্দো তারিখ। তাহলে আপনার জন্মদিন চোদ্দোই আষাঢ়?

—হ্যাঁ। তাই তো জানি। ইংরেজিতে ঊনত্রিশে জুন।

—বড় বড় বাবুদের জন্মদিনে যে অনেক মানুষ আসে, খাওয়া-দাওয়া, ফুলমালার পাহাড় জমে যায়, তা আপনার জন্মদিনে ওইসব কিছু হবেনি?

—না। আমার জন্মদিনে বাপি, তার বৌ আলো, বাচ্চা মেয়েটা আর তুই-ই খাবি আমার সঙ্গে। কী খাবি তাই বল।

—সকালে তো বললেন জিলিপি-সিঙাড়া খাব। আবার কী খাব?

—মাংস খাবি?

—মাংস। কত বছর হয়ে গেছে চোখেই দেখিনি। তিন বছর আগে আমার বড়শালার বড় মেয়ের বিয়েতে খাইয়েছিল। আহা! স্বাদ এখনও লেগে আছে মুখে। ডুমো ডুমো করে আলু কেটে ভাল করে ঝাল ঝাল করে রেঁধেছিল মিনু বউদি। আধসের চালের ভাত আমি একাই খেয়েছিলাম।

—কাল তোর জন্যে কতখানি চাল নেবে তা বাপিকে বলে দিস আগে থেকে।

—বাপি রান্নাটা খুব ভাল করে। এখন মাংসর কেজি কত করে?

—ঠিক জানি না। কলকাতাতে আমি তো বাজারে যাই না। এখানে

এলেই বরং যাই মাঝে মাঝে। শ্যামবাটির বাজার থেকে ছোট মাছ কিনি, কখনও-সখনও মাছের মুড়ো, —মুড়িঘণ্ট খাবার জন্যে। ওল কচু। কচুর শাক। এই সব যা কলকাতাতে খেতে পাই না।

আমরা তো মাত্র এই ক'জন লোক খাব। কত মাংস আনবি?

—যত বলবেন। কোথা থেকে আনব? উৎপলের দোকান থেকে?

তারপরই বলল, আমি আনব কেন? বাপিদা আনবে না?

—না। তুই-ই আনবি।

তারপর বললাম, বাপি খুবই কাজের ছেলে। কিন্তু হলে কী হয়?

—কী হয়?

—চোর। এই দেশের অফিসার, কেরানি, যারাই কাজের লোক তারা অধিকাংশই চোর।

—চোর?

—হ্যাঁ। মন্ত্রী সান্ত্রীরাও চোর। কেউ কোটি কোটি টাকা চুরি করে মন্ত্রীদের মতো আর কেউ বাপির মতো দশ-কুড়ি টাকা। গুণী অথচ চোর নয়, এমন মানুষ খুব কমই খুঁজে পাবি এখানে। চোরেদের রাজত্ব না থাকলে এ দেশ সোনার দেশ হয়ে যেতে পারত।

—আমি তাইলে যাই বাবু। বৌটা বসে থাকবে না খেয়ে। ছোট ছেলেটার আবার মীরগি রোগ। বাড়ি থেকে বাইরে গেলেই ভয় হয়। পথে ঘাটে কখন যে তাকে মীরগিতে পায়। চিন্তা হয়।

—তাহলে আমি এগোলাম।

—হেঁটেই যাবেন, একটা রিকশা নিয়ে নেন না কেন?

কলকাতাতে গাড়ি চড়ে চড়েই তো শরীরটার সর্বনাশ হয়েছে! এখানে এলেই যা হাঁটাহাঁটি হয়। তুই এগো। আমিও যাই।

(৩)

সন্তোষটা বড়ই গরিব। আমাদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে শহরে মানুষেরা গরিবির কিছু জানি না। 'গরিবি হঠাও' কথাটা রাজা রানির বৈভবে দিন কাটানো এ দেশীয় অনেক নেতার মুখে ভোট বাগাবার মন্ত্র হিসেবে উচ্চারিত হতে শুনি—মোটরকেড নিয়ে তাদের ভেঁপু বাজানো যাতায়াত শুনতে পাই— ভন্ডামির পরম পরাকাষ্ঠা দেখি চতুর্দিকে কিন্তু এ দেশের গরিবদের কথা নির্বাচনের আগে ছাড়া কোনও নেতাই বিশেষ ভাবেন না। গুণীজ্ঞানীরা তাঁদের খেতাব, পুরস্কার ইত্যাদি বাগাবার জন্যে নিরন্তর হরকৎ করে যান, চোখের সামনে দেখতে পাই। সব নেতারাই বলেন যে 'আইন আইনের পথে চলবে'। কিন্তু আইন যে কোন পথে চলছে তা আমরা প্রতিদিনই নানা মিডিয়াতে চোখ রাখলেই দেখতে পাই। ওঁরা বোধহয় বন্দেমাতরম্-এর প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্রর সেই উক্তির কথা জানেন না। অনেকেই পড়েনওনি। আজকালকার নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে পড়াশোনার বিশেষ সম্পর্ক নেই। অতি সামান্যজনই যা পড়া করেছেন অথবা করেন। ডিগ্রি আর শিক্ষা এক কথা নয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমবাবু লিখেছিলেন, "আইন! সে তো তামাশামাত্র। বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।" বঙ্কিমবাবুর সময়ে এই বাক্যটি যতখানি সত্যি ছিল, আজকের দিনে তা তার চেয়েই বেশি সত্যি। তবু সেই সময়ে ডাক্তার বা অধ্যাপকেরা অন্যরকম ছিলেন। আজকে যেদিকে দু'চোখ যায় সবদিকেই একই ছবি। দেশ ও কাল নিয়ে যত কম ভাবা যায় ততই ভাল বোধহয়।

রাতে বাপি কলাইয়ের ডাল, ঝিঙে পোস্ত এবং নারকোলের বড়া রেঁধেছিল। রাতে কলকাতাতে সাধারণত একটা স্যুপ আর দুটি টোস্ট খাই। এইরকম খাওয়াতে অভ্যস্ত নই। খাওয়ার পরিমাণও বেশি হয়ে গেছে। তাই ঘুম আসছিল না। বাগানের দিকে চেয়ে জানলার সামনে বসে আছি। অমরকণ্টকের পথের অচানকমারের জঙ্গল থেকে লি বাঁশের চারা এনে লাগিয়েছিলাম বাগানের দেওয়াল ঘেঁষে। কয়েক বছরের মধ্যেই গাছগুলো বেড়ে যেন একটি ঝাড়ের আকার ধারণ করেছে। বাতাবি লেবু ও গন্ধরাজ লেবুর ফুলের গন্ধ ভাসছে হাওয়াতে। ব্যাঙ ডাকছে অবিরাম। রাতে আরও বৃষ্টি হবে। বসন্তিগাছের ডালে ডালে জোনাকির ঝাঁক। ভারি সুন্দর এক আবহ যা শুধু আমার দেশেই সম্ভব। মহাবিষ্ট হয়ে বসে আছি। যতই বয়স বাড়ছে ততই গাছপাতা ও পাখপাখালির প্রতি





ভালবাসাটা গভীরতর হচ্ছে। এলোমেলো হাওয়াতে বৃষ্টির গন্ধ আকুল করছে।

এমন সময়ে হঠাৎই সন্তোষের বাড়ির কথা মনে হল। আরও বৃষ্টি হলে ওর মাটির বাড়ি ধসে যেতে পারে। ভাবনাটা মনে আসতেই আবেশ ছিঁড়ে গেল। গত বছর ওর বাড়ি মেরামতের জন্যে কিছু টাকা দিয়েছিলাম। এই বর্ষাতে এবং শীতেও চাটাই উপরে শোয়। বৌকে নিয়ে তাই সোনাঝুরি কাঠের একটি খাট ওকে বানিয়ে দিয়েছিলাম। সোনাঝুরির ফুলের শোভা দেখি আমরা কিন্তু সোনাঝুরি কাঠও যে খুব কাজের জানা ছিল না। সন্তোষের পেটের ব্যথার চিকিৎসার জন্যে যতটুকু পারি করেছিলাম। কিন্তু তাতে তার ব্যামোর নিরসন হয়নি। যতটুকু করেছিলাম তার জন্যে কোও শ্লাঘা নেই আমার বরং লজ্জা আছে আরও কিছু করতে পারিনি বলে। সবসময়েই লজ্জিত থাকি। সন্তোষের দায় আমার একার নয় যে তা আমি জানি। তবুও আমি যতটুকু করতে পারি ততটুকু করি এবং আরও করতে চাই।

(৪)

একসময়ে ভোর হল। আজ আমার জন্মদিন। মোবাইলে আমার মেয়ে ফোন করে আমাকে বলল, "মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস বাবা।" স্ত্রী চলে গেছেন প্রায় দু'বছর—তিনি আর কোনওদিন জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবেন না।

একদিন বাড়িতে ডিমের ঝোল রান্না করেছিল বাপি। সন্তোষ সকালে একটু বাগানের কাজ করে খেয়ে চলে যায়। একদিন সুবর্ণরেখাতে গেছিলাম। বাড়ি ফিরছি, পথে সন্তোষের সঙ্গে দেখা। সাইকেলের হ্যান্ডেলে পলিথিনের প্যাকেটে একটা রান্না করা ডিম আর একটু ডিমের ঝোল নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে শুনলাম যে ওর ছোট ছেলে ডিম খেতে খুব ভালবাসে। তাই সন্তোষ নিজের ভাগের ডিমটি না খেয়ে ওটা বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে ছোট ছেলের জন্যে। গরিব বাবা ছেলেকে ডিম কিনে দিতে না পারার দুঃখটা নিজের ভাগের ডিমটি নিয়ে গিয়ে তাকে খাওয়াবে।

সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ অথচ আজ সন্তোষ এল না। কী ব্যাপার! ও তো জানে আজ আমার জন্মদিন। সকালে সিঙাড়া জিলিপি খাবে তারপরে দুপুরে মাংস ভাত। কোনওদিন এত দেরি করে না। আজ কী হল তার?

বাপি চা করেছিল। বিস্কিট দিয়েই চা খেলাম। সন্তোষ না আসতে সিঙাড়া জিলিপি আর আনলাম না। বাপি পরোটা আর ঝাল ঝাল আলুর চচ্চড়ি করে দিল আমার জন্যে। বেলা দশটা নাগাদ সন্তোষ এল। একেবারে পাথর।

বললাম, কী রে? কেমন আক্কেল তোর?

কচুর শাক তুলতে দেরি হয়ে গেল বাবু।

তারপর বলল, ছেলেটা বাড়ির লাগোয়া ডোবাতে ছিপ দিয়ে আপনার জন্মদিনের জন্যে পুঁটিমাছ ধরছিল। আমি গেছি কচুর শাক তুলতে, বৌ গেছে গাঙ্গুলি বাড়িতে কাজে আর ছেলেটা মীরগির অ্যাটাকে জলের মধ্যে পড়ে গেছিল। আমি যখন শাক নিয়ে ফিরলাম, দেখি ডোবার তলায় পড়ে আছে। জল খেয়ে পেট ঢোল।

তারপরই একটা আর্ত চিৎকারের সঙ্গে বলল, আপনাকে পুঁটি মাছ খাওয়াতে পারলাম না বাবু।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত





জাম্বুবান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দুপুরে জামতলায় বসে তারা যখন ভাত খাচ্ছে তখন নিতাই বলল, ব্যায়াম করলে লোকের তাগড়াই চেহারা হয়। তা আমরা যে সারাদিন গতর খাটাচ্ছি আমাদের শরীর দড়কচা মার্কা কেন বল তো?

কথাটা ভাববার মতো।

নিতাই বলল, আসলে কি জানিস, এই সাদা ভাত খেয়ে পেটটাই যা ভরে, শরীরে সারবস্তু যায় না। মাছে মাংসে খেলে, দুধ ছানা পথ্যি পেলে তবে শরীরের পোষ্টাই হয়। আমাদের শ্যামাপদ যে শরীর বাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে কি এমনি নাকি? সকালে আধসের ভেজা ছোলা, আধসের দুধ, দুপুরে মাছ ভাত, রাতে মাংস-রুটি।

নেপু অবশ্য খাওয়া নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। তার ভরপেট হলেই হল। এই আজ যেমন ভাতের পাতে ডাল আছে, ঘ্যাঁট আছে, কুঁচো মাছও জুটেছে একটু। এসব না হলেও তার চলে। ভাতের সঙ্গে নুন আর লঙ্কা দিয়েও তার দিব্যি হয়ে যায়। তাতে পোষ্টাই হয় কি না কে জানে। তবে খেটেপিটে তো আছে।

মথুরাপুর বেশ দূরের জায়গা। তার গাঁ সাতপোঁতা থেকে রোজ যাতায়াত করা যায় না। অবশ্য সাতপোঁতাতেও তেমন সুবিধের কিছু নেই।

বাবা কবেই মরে গেছে, মাও বছর দুই হল গত, বাড়িঘর দখল করে আছে তার দুই দাদা। গোপাল আর নারান। বাড়ি বলতে দু'খানা কুঁড়ে ঘর আর কাঠা দশেক জায়গা। মাথা গোঁজাই মুশকিল। একটা বারান্দা চ্যাটাই দিয়ে একটু ঘিরে নিয়ে নেপু তক্তপোষে শোয়। শুতে হয় বলে শোয়া। বাড়ি বলে মনে হয় না। মনও নেই। আজকাল তাই বিশ্বেসবাবুকে বলে সে কাজের জায়গাতেই থাকে। শাটারিং-এর তক্তা মাটিতে পেতে দিব্যি শোওয়া যায়।

এই মথুরাপুর জায়গাটা তার বেশ পছন্দ হয়েছে। ঠিক গাঁ নয়। একটু গঞ্জমতো। বিশালাক্ষী নদী আছে। তেমন দোরের নদী না হলেও তাতে নৌকো চলে, জেলেরা মাছও ধরে। তবে বিশ হাতের বেশি চওড়া হবে না। চোত বোশেখে শুকিয়ে একদম নালা হয়ে যায়। তা হোক, তবু নদী তো। বেশ একটা জমাট বাজার আছে। বড়সড় পুরনো কালীমন্দির আছে। চৌধুরিবাবুরা তার সেবাইত, বর্ধিষ্ণু জায়গা, টাকা থাকলে এখানেই কাঠা খানেক জমি কিনে একটা ঘর তুলে থেকে যেত নেপু।

বিশ্বনাথবাবু এখন চা খাচ্ছেন। সঙ্গে বিস্কুট। এই সময়ে রোজই খান। বেশ ফর্সা সাদা কাপ-ডিশ। ওরকম কাপ ডিশে একটু চা খেতে পারলে হত। চেয়ারে বসে, আয়েস করে।

পাশেই বিষ্টু। কাজ থামিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, এই যে একটা শুকনোমতো হাওয়া দিচ্ছে টের পাচ্ছিস?

হ্যাঁ, তা দিচ্ছে বোধহয়।

বিকেলে ঝড় হবে। হাওয়া আমি খুব চিনি।

তা চেনে বিষ্টু। গাছের পাতা কোনদিকে উল্টোলে ঝড় হয় তা জানে।

মিক্সার মেশিনের শব্দ হচ্ছে ঘরঘর করে। আজ চারটে খুঁটির ঢালাই। জোগালিরা ভারি ব্যস্ত। পাথর কুচির স্তূপ উবে যাচ্ছে দেখ না দেখ। বালি আর সিমেন্টের বস্তা চোখের পলকে খালি হয়ে যাচ্ছে। মেশিনের কী খাঁই রে বাবা! আর সামনে কাণ্ডখানাও হচ্ছে জব্বর। বাড়িখানা উঠছেও পেল্লায়। তাতে চৌধুরি পরিবারের লোকেরা সব থাকবে। এ পর্যন্ত দশ বারোখানা বাড়ি হতে দেখল নেপু। সবই বড় বড় কাজ। বিশ্বনাথবাবু ছোটমোটো কাজ হাতেই নেন না।

নেপু বিড়ি খায় না। প্লাস্টিকের ময়লা বোতল থেকে একটু জল খেল। গরম জল। এই কাঠফাটা রোদে কি আর জল ঠান্ডা থাকে?

নেপু একটু লেখাপড়া জানে। ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছে। বাংলা ইংরিজি পড়তে পারে। অঙ্কের মাথাও সাফ। তাই বিশ্বাসবাবু তাকে রোজকার হিসেবপত্র রাখারও একটা দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। তাতে নেপুর একটু গুমোর হয় বটে, কিন্তু অন্যেরা ব্যাপারটা খুব ভাল চোখে দেখে না। তবে নেপু চুপচাপ থাকে, খাড়াখাড়িও নেই কারও সঙ্গে। সে সার বুঝেছে, দুনিয়ায় সদ্ভাব বজায় রেখে বেঁচে থাকতে গেলে মাথা খাটাতে হয়। শুধু দু' নৌকো তো নয়, অনেক নৌকায় পা রেখে চলা চাই। কাজকর্মও শিখেছে মন্দ নয়। ছোটখাটো পাকা বাড়ি তৈরির বরাত পেলে চোখ বুজে কাজ তুলে দিতে পারে। তবে সবই একটু রয়ে সয়ে করা ভাল। হুটোপাটি করতে গেলেই যত গন্ডগোল।

সাতপোঁতায় থাকতে সে নগেন চোরের শাগরেদ হয়েছিল একবার। ভেবেছিল, চুরি আর এমন কী অধর্মের কাজ! দুনিয়ায় চোর নয় কে? আর নগেনও তার কাজ দেখে দশ মুখে সুখ্যাতি করত। তোর তো পাকা হাত রে! লেগে থাকলে তোর পয়সা খায় কে? সেই শুনে নেপু এমন গরম হয়ে গেল যে, "মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার" অবস্থা। বিরিঞ্চিবাবুর বাড়িতে মেয়ের বিয়ে। আহাম্মকের মতো হানা দিয়ে বসেছিল শেষ রাতে। ধরা পড়ে বেইজ্জতের এক শেষ। পুলিশে ধরে নিয়ে খুব ডলাই মলাই করেছিল। মাসখানেক হাজতবাসও করতে হল। ভিন গাঁ ছিল বলে রক্ষে। সেই থেকে চুরিতে ইস্তফা দিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বিশ্বাসবাবুর কারবারে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। সে বেশ লম্বা চওড়া ছেলে, খাটিয়ে পিটিয়ে আছে। সেই দেখেই বিশ্বাসবাবু কাজে নিয়েছিলেন। তা খাটুনিও আছে বটে। শরীরের রসকষ সব নিংড়ে দিতে হয়। ইট বওয়া, বালি সিমেন্ট মেশানো, ভারা বাঁধা, শাটারিং লাগানো, ঢালাই, কাজের অন্ত নেই।

বড় মিস্তিরি ইরফান মিয়া এসে বলল, ওরে, তোরা একটু হাত চালিয়ে কাজ কর তো। বেলাবেলি সেরে ফেলতে হবে। আকাশে একটা পাজি মেঘ দেখা যাচ্ছে। ঝড়জল হওয়ার কথা।

যে যার কাজ ভালই বোঝে। পুরনো লোক সব। ইশারায় কাজ হয়ে যায়।

তবে বে-আন্দাজি ঝড়টা একটু আগেভাগেই এসে পড়ল। তিনটে তখনও বাজেনি, হঠাৎ মাঠঘাট ধুলোয় ঢেকে হালুম বাঘার মতো পাগলা বাতাস এসে চারদিকটা তছনছ করে দিল একবোরে। সদ্য গাঁথা একটা কাঁচা দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। কাঠের খুঁটি উপড়ে পড়ল। গাছ ভেঙে পড়ল মিক্সার মেশিনের উপর, ছাদ ঢালাইয়ের জন্য শাটারিং লাগানো হয়েছিল, এক থাবায় তক্তাগুলো উড়িয়ে নিয়ে কোথায় গিয়ে ফেলল কে জানে। হ্যাঁ ঝড়ের মতো ঝড় বটে! দশ বারোজন মিস্তিরি বিশুবাবুদের বারান্দায় উঠে পড়ল বটে। কিন্তু বৃষ্টির হ্যাঁচলা থেকে মাথা বাঁচানো গেল না।

ঘণ্টাখানেক বাদে ঝড় থামল বটে, কিন্তু বৃষ্টিটা এল ঝেপে। আরও ঘণ্টা দুই ধরে দেদার জল ঢেলে চারদিক একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ল।

ইরফান মিয়া বাবু মানুষ। বৈঠকখানায় বাবুদের কাছে বসে ছিল। বেরিয়ে এসে বলল, আজ আর কাজ হবে না। তোরা বাড়ি যায়। যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কাল তাড়াতাড়ি এসে সব সারতে হবে।

।। দুই।।

বুড়ো চোর ধনেশ ঢাকী আজকাল বাতে ভোগে। চোখে ছানি আসছে, হাত কাঁপে, তার উপর হাঁফানি। তা বলে ঘরে বসে থাকলে তো পেট চলবে না। তা একদিন এসে বেচুকে বলল, তোকে তো এইটুকুন বয়স থেকে দেখে আসছি, কোলে পিঠেও করেছি। তা বাবা খোঁজখবর থাকলে একটু দিস। আজকাল তো আর বড় কাজ সামলাতে পারব না। ছোটখাটো কেস হলে পেরে যাব।

শশব্যস্ত উঠে ধনেশের পায়ের ধুলো নিয়ে বেচু বলল, তা তো বটেই ধনাখুড়ো, আপনাদের হাতেই একরকম মানুষ হয়েছি। তা খুড়ো বিশুবাবুর বাড়িতে যদি আজ রাতে একটু পায়ের ধুলো দেন তাহলে মনে হয় পাঁচ-সাত হাজার টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিশুবাবু কাল মিস্তিরিদের দেবেন বলে টাকাটা তুলে রেখেছেন। শিয়রের কাছে কাঠের আলমারিতে রাখা আছে। চাবি টেবিলের ওপরের টানায়।

ধনেশ ভারী খুশি হয়ে আশীর্বাদ করে বলল, বেঁচে থাক বাবা। বড্ড টানাটানি যাচ্ছে ক'দিন।

এই যে ধনেশ ঢাকীর মতো পোড়খাওয়া পাকা লোকও এসে

তার কাছে সুলুক সন্ধান চাইছে এতেই প্রমাণ হয় ধনেশ যে, বেচারামের কদর বাড়ছে। সে ভারী শ্রদ্ধার সঙ্গে হাত কচলে ঢাকীকে বলল, মরা হাতি লাখ টাকা। বুড়ো হলে কী হয়, আপনার বুড়ো হাড়েও অনেক ভেলকি দেখাতে পারেন। ফুরসত মতো কয়েকটা হস্তলাঘব প্রক্রিয়া একটু শিখিয়ে দেবেন তো খুড়ো।

ধনেশ ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বলল, সে আর বেশি কথা কী! বয়স হলে তো বিদ্যে মরে না। দেব'খন শিখিয়ে।

আসল কথা হল, ধনেশের ছোট মেয়ে শিউলির উপর অনেক দিন ধরেই বেচুর নজর। শিউলি এই সবে ষোলো ছাড়িয়ে সতেরোয় পড়েছে। ভারী জেল্লাদার তার চেহারা। যেমন মুখের মিষ্টি ডৌল, তেমনি ছিপছিপে শরীর। গায়ের রংখানাও ফর্সা। এক কথায় কুসুমপুরে অমন সুন্দরী আর নেই। সেটা শিউলিও ভালই জানে। ধনেশের আরও দুটি মেয়ে আছে। বড় জনের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজ জনের জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু সকলেরই নজর শিউলির উপর। এমনকী জাত খুইয়েও অনেকে শিউলিকে ঘরে নিতে চায়। বসাকবাড়ির গিন্নিমা তো বলেই রেখেছেন, আমার নবীনের সঙ্গে ওকে ভারী মানাবে। উঁচু অসমবর্ণে তো দোষ নেই। হিদাঁরাম ঘোষের বড় ছেলে যদুপতি তাঁর শালার জন্য শিউলিকে দেখে রেখেছেন। শালার তিনটে ট্রাক, একটা ট্রাক্টর, সুতরাং কমপিটিশন খুব। বেচু মোটে কক্কেই পাচ্ছে না। শিউলির দোষ হল, সে ছেলেছোকরাদের দিকে মোটেই তাকায় না। পাত্তাও দেয় না। অহংকার খুব। বেচুকে সে একরকম চেনেই না। ধনেশকে হাত করতে পারলে বেচারামের একটু হিল্লে হতে পারে। বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে বড় কাজ হচ্ছে। বিশ্বাসবাবুর মতো মস্ত ঠিকাদারকে বরাত দেওয়া হয়েছে। সব খবরই তার নখদর্পণে। কাল মিস্তিরিদের হপ্তা দেওয়া হবে। ধনেশ যদি কাজটা তুলতে পারে তাহলে কাল সকালেই গিয়ে পেন্নাম ঠুকে প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলবে বেচারাম।

।। তিন।।

শখ করে একটা আলোওয়ালা হাতঘড়ি কিনেছিল নেপু। অন্ধকারেও বেশ দেখতে পাওয়া যায়। বড্ড পেয়ারের ঘড়ি। আজকাল এইসব ঝিকঝাক জিনিস ভারী সস্তায় বিকোয়। তা নেপু টাকা দিয়ে করেই বা কী। মাস গেলে তার হপ্তা যোগ করে প্রায় চোদ্দো পনেরো হাজার টাকা বেতন দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ সে হিসেব রাখে। তার উপর সাইটে থাকে বলে চৌকিদারি বাবদও কিছু পায়। বলতে নেই, আরও দুই ঠিকাদারবাবুও তাকে টোপ দিয়ে রেখেছেন।

রাতে ঘড়িটা হাতে দিয়ে থাকে সে। সন্ধেবেলা একটু ঘুমিয়ে নিয়ে রাতের দিকে পাহারা দিতে হয়। ঝিমুনি অবশ্য আসে। তবে তার ঘুম বড্ড সজাগ। তার উপর ঝড় বাদলার পর আজ একটু ঠান্ডা পড়ায় ভাত পেটে একটু গাঢ় ঘুমই এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা ঘপাৎ গোছের শব্দ হল কোথাও কাছেপিঠে। পুকুরে বড় মাছের ঘাই মারার শব্দের মতো। সেই সঙ্গে চাপা একটা আর্তনাদও, 'বাপ রে'!

নেপু উঠে পড়ল। আজ দুপুরেই ইট ভেজানোর জন্য একটা বড় গর্ত করা হয়েছিল। সেইটে বৃষ্টির তোড়ে জলে আর কাদায় একবোরে মাখামাখি। টর্চ জ্বেলে নেপু দেখল, কোমর অবধি তাতে গেঁথে গিয়ে একজন বুড়ো রোগা মানুষ আঁকপাকু করছে।

কী হল কর্তা?

পড়ে গেছি বাপু, মাজাটা গেছে।

তা এত রাতে এখানে কী মনে করে? এ তো যাতায়াতের রাস্তা নয়।

সে অনেক কথা বাপু। চোখে কি আর রাস্তাঘাট ঠিকমতো ঠাহর হয়। বৃষ্টির জলে সব লেপেপুঁছে গেছে। দু' চোখেই ছানি।

নেপু সন্দিহান চোখে লোকটাকে দেখল। তারপর চাপা গলায় বলল, এ বয়সে কি ওসব কাজে নামা উচিত কর্তা? রাত আড়াইটে বাজে।

লোকটা জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে একটু খিঁচিয়ে উঠে বলল, হাতি খন্দে পড়লে সকলেরই হিতোপোদেশের চুলকুনি ওঠে।

নেপু দুই জোরালো হাতে বুড়োর বগলের নিচে ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে আনল। বলল, এবার বাড়ি যান।

লোকটা পা ছড়িয়ে মাটিতে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে থেকেই বলল, কী ভাবে যাব?

কেন, হেঁটে।

হাঁটতে পারলে কি বসে আছি বাপু? কোমরের নিচে থেকে যে মোটে সাড়ই নেই।

তাহলে?

বুড়ো মাথা নেড়ে বলে, হাঁটবার সাধ্য নেই বাপু। বাড়িও বেশ দূরে।

কত দূরে?

তা হাটখোলা ছাড়িয়ে আরও বেশ অনেকটা। ভ্যানগাড়ি হলেও বরং হত। কিন্তু—

কী যে সব উটকো ঝামেলা এসে জোটে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু নেপু করেই বা কী, ভেজা শরীরে সারারাত পড়ে থাকলে বুড়ো মানুষ নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে বসবে। দুনিয়ায় পাপপুণ্যি বলেও তো ব্যাপার আছে।

সে একটু বিরক্ত হল বটে, কিন্তু দ্বিধা করল না। বলল, ঠিক আছে, পৌঁছে দিচ্ছি। তবে আর এমন কাজ করবেন না কর্তা।

কাঁধে ভাঁজ করা চাদরের মতো বুড়োকে চাপিয়ে নিল সে। ওজনটা খুব একটা বেশি নয়। তবে রাস্তা ভাল নয়, জলে কাদায় ভারী পিছল, হড়হড়ে। কাজেই যথাসাধ্য ঘাসে পা রেখে বুড়োকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল সে। দেরি করা চলবে না। ফিরে এসে বাকি রাত পাহারা দিতে হবে।

বুড়োর বাড়িঘরের অবস্থা তেমন খারাপ নয়। টিনের চালওয়ালা পাকা বাড়ি। বেশ অনেকটা জমিও আছে। বড় উঠোনের ওপাশে ব্যারাকবাড়ির মতো আরও ঘর। একসময়ে বোধহয় রোজগারপাতি ভালই ছিল।

সাড়া পেয়ে লণ্ঠন আর টর্চ হাতে প্রথমে এক বয়স্কা মহিলা, তার পিছনে দু'টি অল্পবয়সি মেয়ে বেরিয়ে এল ঘুমচোখে।

এ কী! কী হয়েছে?

যা হয়েছে সংক্ষেপে বলল নেপু।

দু'জনের মধ্যে একটা মেয়ে এত ভাল দেখতে যে, চোখ ফেরানো যায় না। সে-ই বেশ রোখাচোখা। বাপের দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে বলল, এত রাতে বেরিয়েছিলে কেন?

বুড়ো আতান্তরে পড়ে বলে, ঘরে বড্ড গুমোট হচ্ছিল। ঘুম আসছিল না। তাই—

আর মিথ্যে কথা বোলো না তো বাবা। তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। সঙ্গে এই জাম্বুবানটিকে কোত্থেকে জোটালে? নতুন শাগরেদ নাকি?

ভারী রাগ হল নেপুর। বলল, আমি ঠিকাদার বিশ্বাসবাবুর মিস্তিরি। বিশু চৌধুরিদের বাড়ির ইমারত তৈরি করছি। লোকের ভাল করতে গেলেই দেখি আজকাল বদনাম হয়।



বুড়ো মিনমিন করে বলল, আচ্ছা, ওকে বকাইস কেন? কত দূর থেকে ঘাড়ে করে বয়ে এনে দিয়ে গেল।

ঘাড়ের গামছায় মুখের ঘাম মুছে নেপু বলল, আসি তাহলে বুড়োকর্তা!

রাগের চোটে নেপু বড় বড় তেজী পা ফেলে লহমায় নিজের ডেরায় ফিরে এল। সে নাকি জাম্বুবান! সে নাকি চোরের শাগরেদ!

মাথা এত গরম হয়ে গেল যে, সারা রাত আর দু'চোখের পাতা একই করতে পারল না। পরদিনই অবশ্য ঘটনাটা ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। দুনিয়ায় কত কী ঘটে!

দুটো দিন বড্ড খাটুনি গেল। দম ফেলার ফুরসত ছিল না।

পরদিন বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি। মিস্তিরিরা যে যার বাড়ি গেছে। নেপু একা সাইটে পড়ে আছে। তার যাওয়ার জায়গা নেই। তা ছাড়া ডিউটিও তো আছে। পাহারা দেবে কে? চারদিকে লোহার রড, সিমেন্ট, বালি, বাঁশ, তক্তা, ইট, ভাবছিল আজ নিজেই একটু ভাল মন্দ রেঁধে খাবে। সকালে উঠে সে এক কোঁচড় মুড়ি নিয়ে ঢালাই হওয়া ছাদে বসে আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখছিল। মুড়ির লোভে কাকেরা চলে আসছে কাছাকাছি। নেপু তাদেরও খাওয়াচ্ছিল। কুসুমপুরে আজ অনেকগুলি বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে। কোনও মণ্ডপে গিয়ে একটু পেসাদ পেলেও হত। কিন্তু কেউ তো ডাকেনি। তাই নেপর বড্ড লজ্জা করে। তার থেকে বরং একটু মাছ কিনে এনে ঝোল রেঁধে খাবে।

ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে কে যেন উঠে আসছিল। কাটা ঘুড়ি ধরতেই আসছে বোধহয় কেউ। বাচ্চাগুলো তো লগি হাতে সকাল থেকেই দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

পিছন থেকে একটা মেয়ে-গলা বলে উঠল, এই যে! শোনো!

পট করে ফিরে তাকিয়ে নেপু হাঁ। সেই সুন্দর মেয়েটা না? সুন্দর হলে কী হবে, যা জেদ! আজ পরনে লালপেড়ে সাদা খোলের শাড়ি, কপালে চন্দনের টিপ, এলো চুল। মুগ্ধ হওয়ার মতো চেহারা।

মুখের মুড়িটা গিলে সে কোঁচড় ধরে উঠে দাঁড়াল, কী ব্যাপার?

তোমার নাম বুঝি নেপাল নস্কর?

হ্যাঁ।

মা তোমাকে একবারটি যেতে বলেছে, আজ দুপুরে।

নেপু অবাক হয়ে বলে, আমাকে? কেন বলো তো!

তা আমাকে বলেনি। শুধু বলেছে, নেপুকে দুপুরে আসতে বলিস। আজ এখানে দুটো প্রসাদ পাবে।

প্রসাদ! তোমাদের বাড়িতে বিশ্বকর্মা পুজো বুঝি?

হ্যাঁ। যাবে তো?

ভারী লজ্জা আর অস্বস্তি হল নেপুর। বলল, তা আমাকে কেন নেমন্তন্ন করা হচ্ছে শুনি! আমি সামান্য মিস্তিরি মানুষ। তার উপর জাম্বুবান।

মেয়েটা ভ্রুকুটি করে বলল, জাম্বুবানই তো! জাম্বুবান ছাড়া কেউ দেড়মণি একটা লোককে জলকাদা ভেঙে অতদূর বয়ে নিতে পারে? এসো কিন্তু!

আমি যে রান্না করব বলে ঠিক করেছিলাম!

না এলে মজা বোঝাব। মনে রেখো! আমি আজ মাংস রান্না করছি। মনে থাকে যেন।

তা গেল নেপু! একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন...

নেপু কুসুমপুরে চার কাঠা জমি কিনে ফেলেছে। কারণে অকারণে সে আজকাল একা একাই হেসে ফেলছে। আর শিউলি? সে আজকাল জাম্বুবানটাকে বড্ড লজ্জা পায়।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

দুখুমিঞা আমার ঠাকুরদা

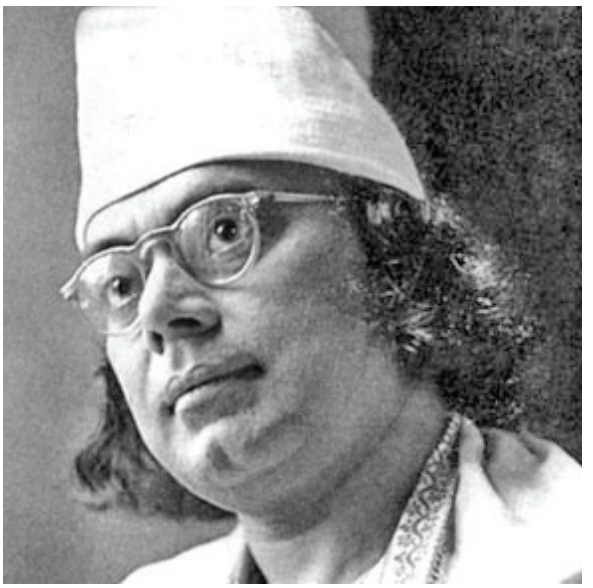

অনিন্দিতা কাজী



কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পাঠ্যবইয়ের পাতায়। নার্সারিতে ‘ভোর হল দোর খোল’ থেকে ‘লিচুচোর’, ‘খুকি ও কাঠবেড়ালি’ — পরে একটু বড় হয়ে ‘দেখব এবার জগৎটাকে’, ‘সাম্যবাদী’, ‘আমার কৈফিয়ৎ’, ‘বিদ্রোহী’ কবিতাগুলোর মধ্যে দিয়ে চিনতে শিখলাম কাজী নজরুল ইসলামকে।

উপলব্ধি করলাম, কী বিশাল, বিরাট এক প্রতিভার ছত্রছায়ায় আমার জন্ম হয়েছে, কেন লোকেরা তাঁকে এত ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তেমন এক মানুষের বংশধর আমি, এটা ভেবে যেমন গর্ববোধ করতাম, তেমনি দাদুর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর ভালবাসা, সান্নিধ্য, আশীর্বাদ পেলাম না, এই যন্ত্রণাটা, আফসোসটা রয়েই গেল। দাদুকে পেয়েছি আমার বয়ঃসন্ধির যন্ত্রণায়, যৌবনের স্পর্ধায়, উন্মীলনে আর উজ্জীবনে। জীবনের ধাপে ধাপে তাঁর লেখা কবিতা, গান-সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে, মায়ের কাছে শোনা নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে চেনার চেষ্টা করলাম এক অভিমানী দুখুমিঞাকে।

আমার বাবা স্বর্গত কাজী অনিরুদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হয় আমার মা কল্যাণী কাজী (পাল)-এর। বিয়ের পর আমার মা স্বাভাবিক অবস্থায় পাননি আমার দাদুকে। যাঁর গানে, কবিতায় বিপ্লবীদের রক্ত গরম হয়ে উঠত, তাঁদের উদ্বুদ্ধ করত, সেই মানুষটিকে প্রথম দেখায় নিস্তেজ, নিরুত্তাপ বসে থাকতে দেখে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কখনও একটুকরো কাগজ নিয়ে মায়ের দিকে বিস্ময়কর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সেটিকে ছিঁড়ে ফেলতেন, আবার কখনও জানালার গরাদ

ধরে দূর নীলিমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হত কীসের ক্ষোভ, কীসের দুঃখে তিনি এত উদাস, নিস্পৃহ!

দাদুকে আড়ালে-আবডালে অনেকেই বলতেন উন্মাদ-পাগল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নজরুলকে — "দেখ উন্মাদ, তোর জীবনে, শেলির মতো, কিটসের মতো ট্র্যাজেডি আছে"... আমাদের পরিবারে, দাদুর জীবনে একবার নয়, বারবার নানাভাবে আঘাত এসেছে। সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে দাদু নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই আঘাত সারানোর উপায় কেউ খুঁজে পায়নি। অনেক সময় চোখের ভাষায় কিছু বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কিছুতেই বাকশক্তির সঙ্গে সেগুলির সংযোগ ঘটাতে পারেনি। এই ফারাকটাই দাদুর জীবনের সব অঙ্ক পাল্টে দিয়েছিল। এখন যখন সেটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, গভীর যন্ত্রণায় দু'চোখ ঝাপসা হয়ে যায় এই মানুষটার অসহায়তার কথা ভেবে।

> "তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না।/কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না —/ নিশ্চল, নিশ্চুপ — আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধ বিধুর ধূপ।।"

আমার দাদু কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে বাবা, জেঠু বাড়ির সব ছেলেরই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রতি এক অদ্ভুত টান ছিল। দাদু তো মা কালীর আরাধনাই করতেন। একবার পাইকপাড়ায় থাকার সময় হঠাৎ চারিদিকে হুলস্থূল কাণ্ড। দাদুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্বেগ ও চিন্তায় বাড়ির সকলে তাঁকে পাগলের মতো খুঁজছে। ঠাকুমা আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হঠাৎ কেউ খবর দিল, দাদু হাঁটতে হাঁটতে (পাইকপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি — এই দূরত্ব!!) দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি চলে গিয়েছেন। সবাই স্তম্ভিত! তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হল কিন্তু চিন্তাশক্তি আর বলার মধ্যে কোনও যোগসূত্র পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ চুপ করে গেলেন। যে মানুষটা একরকম গম্ভীর ও নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি যে আগে কত হাসি-ঠাট্টা করতেন তা মায়ের মুখে না শুনলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। মায়ের শোনা ঠাকুমার কাছ থেকে। আড্ডার আসর থেকে দাদু প্রায়ই তাঁর ধবধবে পাঞ্জাবি চায়ের দাগে ভরিয়ে আনতেন। আড্ডার আসরে রোজই ভাঁড়ের পর ভাঁড় চা আসত। যখন বাড়ি যাওয়ার সময় হত, তখন ভাঁড়ের তলানিতে পড়ে থাকা চা-টুকু দাদু ও তাঁর কবি বন্ধুরা একে অপরের গায়ে ছেটাতেন। চা ছুড়েই বলে উঠতেন — "দে গরুর গা ধুইয়ে..."

ছেলেরা ছিল দাদুর প্রাণ। ফুটবল খেলা খুব ভালবাসতেন দাদু। ফুটবলের আসর জমলেই তিনি ছুটে যেতেন ময়দানে। কখনও জেঠু (কাজী সব্যসাচী) কখনও বাবাকে সঙ্গে নিয়ে চিৎকার করে গ্যালারি মাথায় তুলতেন। এছাড়া বাড়ির সকলকে তিনি ব্রিজ খেলা শিখিয়েছিলেন। পরিবারের সাথে অবসর সময় কাটাতেন দাবা আর ব্রিজ খেলায়।

যে মানুষটির উপর সবথেকে বেশি নির্ভরশীল ছিলেন দাদু। তিনি আমার ঠাকুমা, প্রমীলা ইসলাম। নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেলেও তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ছিল অপরিসীম। সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ বিছানায় শুয়ে দেখাশোনা করার পাশাপাশি দাদুর খেয়াল তিনি ছাড়া কেউ রাখতে পারতেন না। ছোট বাচ্চাদের মতো দেখাশোনা করতে হত দাদুর। গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত, অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাদুকে পাহারা দিতেন ঠাকুমা। দাদু একনাগাড়ে ঘুমোতেন না। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে এদিক-ওদিক ঘেরাফেরা করতেন। ঠাকুমা হাঁক দিলেই দাদু আবার এসে শুয়ে পড়তেন। ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর দাদুকে পাইকপাড়ার আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয় জেঠুর বাড়ি। কিন্তু দাদু ওই বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি। বোধহয় ভাবছিলেন — "আমার সঙ্গে চিরদিন যে থাকত, সে কোথায় গেল?" তাঁর দু'চোখ তাঁকে খুঁজেছিল অবিরত। বারবার পিছন ফিরে শূন্য চৌকির উপরে কাকে যেন খুঁজছিল, তাঁর সুখ-দুঃখের সাথিকে কিন্তু চোখের জল ছাড়া আর কোনও ভাষা তাঁর ছিল না তখন। বোঝাতে পারেননি তাঁর যন্ত্রণা হয়তো!

তারপর? আজও এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে স্তব্ধ আর লুপ্ত এক আগ্নেয়গিরি। আমি দেখি — চোখের জলে আমার বুক ভাসে— আর দেখি ঘুমিয়ে আছে নীরব হয়ে আমার গানের বুলবুলি। মাঝে মাঝে মনে হয়, দাদু যদি জীবিত থাকতেন, সুস্থ হয়ে উঠতেন আবার? তাঁকে ঘিরে এত উৎসব, অনুষ্ঠান, আড়ম্বর দেখে বলতেন, "এত মালা-টালা দিয়ে এত জবরজং করে আমায় সাজিয়েছ কেন?" হাসিমুখে গলা থেকে ফুলের মালাগুলি খুলে ফেলতেন। চোখে-মুখে চেহারায় সেই তেজ ও উজ্জ্বলতা। সেই ভরাট প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বরে গেয়ে উঠতেন — "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল" বা "মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না"... ব্যস্ত হয়ে পড়তেন তাঁর অনুরাগীদের অটোগ্রাফ দিতে বা কাগজ-পেন্সিল দিয়ে নতুন কোনও গান বা কবিতা লিখতে বসতেন — তবে বড় ভাল হত, কিন্তু এসব তো আর হওয়ার নয় — এসব ধারণার অতীত। তবু তাঁকে ঘিরে, তাঁকে নিয়ে এত কাজ করতে গিয়ে বারে বারে সামনে চলে আসে অভিমানী দুখুমিঞা। যিনি সারাজীবন নানা প্রতিকূলতা পেরিয়েও সৃষ্টিকে তাঁর মূলধন করেছিলেন। অনেক যন্ত্রণা, অনেক অভিমানে তিনি লেখেন, "আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম পেতে এসেছিলাম, প্রেম দিতে এসেছিলাম, সেই প্রেম পেলাম না বলে এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে বিদায় নিলাম।"

যেখানে যে লোকেই থাকুন তিনি, তাঁর এই সর্বকনিষ্ঠ পৌত্রীর উপর তাঁর স্নেহের ছায়া, আশীর্বাদ আছে, থাকবে তা উপলব্ধি করি প্রতিনিয়ত। পরিণত বয়সে এসে দাদুর গান ও কবিতা পাঠ করতে গিয়ে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করি আমার রক্তে মিশে থাকা অভিমানী এই সংগ্রামীকে। দুখু মিঞাকে। আজ দাদুকে নিয়ে যেভাবে ভাবনা-চিন্তা করছেন তাঁরই এক অনুরাগিণী, তাঁকে যে যোগ্য সম্মান দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, অলক্ষে থেকে আশীর্বাদের হাতও রয়েছে তাঁর মাথায়। আমি জানি আজ তাঁকে নিয়ে কাজ করার যে মহান ব্রত নিয়েছেন তাঁর অনুরাগিণী, তাতে আমার দাদু, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক, বিদ্রোহী, প্রেমিক সকলের কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অসামান্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সবার হৃদয়ের মণিকোঠায় অম্লান থাকবেন। নতুন করে চিনবে তাঁকে সকলে। দুখুমিঞার এই অভিমান খণ্ডন হবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস —

"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না। /কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না —/ নিশ্চল, নিশ্চুপ — আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধ বিধুর ধূপ।।"

বর্ণময় চিত্র

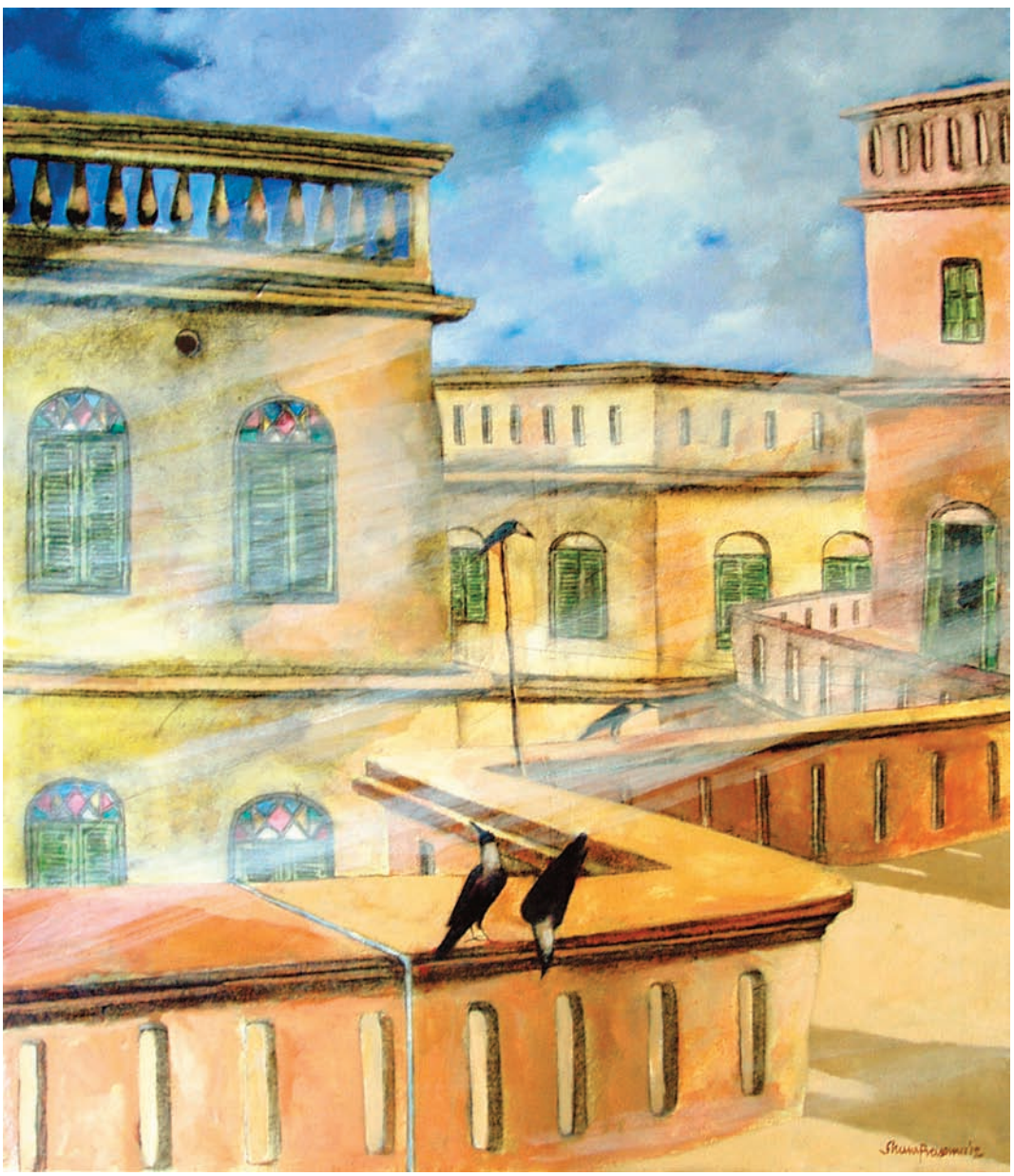

শিল্পী : শুভাপ্রসন্ন



রামকেলিতে মহাপ্রভুর পদার্পণ

সুখেন্দুশেখর রায়

(এক)

একদা গৌড়নগরীর পশ্চিমপ্রান্তে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী ভাগীরথীর দক্ষিণাঞ্চলে নৌবন্দর অবস্থিত ছিল। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠী- সওদাগরের সতত আগমনে মুখরিত হইত গৌড়ের বাণিজ্য-বিপণন কেন্দ্র। রাজপ্রাসাদের চতুষ্পার্শ্ব বাইশগজি প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল।

এক্ষণে প্রাসাদের অভ্যন্তরে 'হাবেলি খাস'-এর উজির মহম্মদের সহিত শতরঞ্জ (চতুরঙ্গ) ক্রীড়ায় মগ্ন গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেন শাহ। উজির স্বেচ্ছায় উপর্যুপরি পরাজিত হইতেছেন। অন্যথায় সুলতান রুষ্ট হন এই আশঙ্কায়। অতঃপর সুলতানের ক্রীড়ারস নিবৃত্ত হইলে স্বগতোক্তির ন্যায় উচ্চারণ করিলেন, সকল সংগ্রামে আমি বিজয়ী হই। তথাপি হিন্দু প্রজাগণ আমাকে অদ্যপি উদারচিত্তে গ্রহণ করে নাই। তাই যখন প্রবাসে রণাঙ্গনে নিয়োজিত থাকি তখন সর্বদা গৌড়নগরীর প্রাসাদ, তোষাখানা, হারেম ও ধনরত্নের সুরক্ষার দুশ্চিন্তায় ভীষণ উদ্বেগ বোধ করি।' উজির সুলতানকে বিন্দুমাত্র উদ্বেলিত না হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হুসেন শাহকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি বলিলেন, 'যাহাদের প্রতি হিন্দুসমাজের প্রগাঢ় ভক্তি ও অকুণ্ঠ আনুগত্য রহিয়াছে এমন দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আপনি মন্ত্রিসভায় অধিষ্ঠিত করিলে আপনার দুশ্চিন্তা ও সমস্যার দ্রুত উপশম ঘটিবে।' উজিরের নিকট সুলতান বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের পূর্ণ পরিচয় জানিতে পারিলেন। তাঁহারা হইলেন কুমারদেব গোস্বামীর দুই পুত্র অমর ও সন্তোষ। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ রূপেশ্বর একদা কর্ণাট প্রদেশের কোনও এক রাজ্যের রাজা ছিলেন। কুমারদেব মালদহে মহানন্দা নদীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মাধাইপুর পল্লিনিবাসী হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কারের বিদুষী কন্যা রেবতীদেবীকে বিবাহ করেন। রেবতীদেবীর পুত্রগণের মধ্যে অমর ও সন্তোষ তাঁহাদের অসামান্য পাণ্ডিত্য, মধুর স্বভাব ও উপচিকির্ষার গুণাবলি সমন্বয়ে প্রথম যৌবনেই হিন্দুসমাজে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিলেন। মাতুলালয় মাধাইপুরে তাঁহাদের বয়োঃবৃদ্ধি ঘটে।

অতঃপর সুলতানের নির্দেশক্রমে উজির অমর ও সন্তোষকে রাজদরবারে উপস্থিত করিলে প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পশ্চাতে হুসেন শাহ বলিলেন, "তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞান, জনসংযোগ ও জনহিতকর কার্যাবলি সম্পর্কে আমি অবহিত হইয়াছি। তাই তোমাদের ন্যায় এহেন গুণবান, উদারচিত্ত ও জনপ্রিয় যুবককে আমি রাজ্যপ্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।' বিস্মিত ভ্রাতৃদ্বয় সুলতানের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিতে থাকিলে হুসেন শাহ তাঁহাদের মনোভাব উপলব্ধি করিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'তোমরা নির্দ্বিধায় এবং নিঃশঙ্কচিত্তে এই প্রস্তাব গ্রহণ করো। কারণ তোমরা নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছ যে ইতিপূর্বে আমার রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন যথাক্রমে গোপীনাথ বসু ও পুরন্দর খাঁ। নগরপালের দায়িত্ব পালন করিতেছেন কেশব খাঁ। আমার রাজবৈদ্য মুকুন্দ কবিরাজ তথা অন্যতম কূটনীতিজ্ঞ কেশব ছেত্রী হইতেছেন সেনাধ্যক্ষ। সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত গুণিজনের প্রতি অটুট আস্থা ও প্রবল নৈকট্য বিদ্যমান ইহার অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।' নিরুপায় ভ্রাতৃদ্বয় বলিলেন, 'আপনি গৌড়াধিপতি। রাজা হইলেন দেবতার প্রতিনিধিসদৃশ। সুতরাং রাজাজ্ঞা অমান্য করিবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমাদের নাই। কিন্তু ভাবিতেছিলাম, অন্তত যদি একবার পিতৃসকাশে গমন করিয়া সকল বিবরণ জ্ঞাপনান্তে তাঁহার আদেশ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত ইহতাম।' সুতলান বলিলেন, 'আমিও তোমাদের পিতৃতুল্য। আমি নিশ্চিত যে তিনিও এই শুভ সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাবস্তি প্রীত হইবেন।' অতঃপর সুলতান রাজদরবারে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, আগামীকল্য রামকেলি নগরে অমর ও সন্তোষের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী যথাসময়ে অমরনাথ গোস্বামী ও সন্তোষনাথ গোস্বামী যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। গৌড়রাজ্যের দরবারি সংজ্ঞায় প্রথমজন অর্থাৎ অমরনাথ 'দবীর খাস' এবং দ্বিতীয়জন অর্থাৎ সন্তোষনাথ 'সাকর মল্লিক' পরিচয়ে অভিহিত হইলেন। সুলতানের আনুকূল্যে রামকেলি নগর ও তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূমির মালিক হইলেন দবীর খাস ও সাকর মল্লিক।

(দুই)

গৌড় রাজপ্রাসাদের অদূরে কামকেলি নগরের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত বিশালাকার সরোবরের পশ্চিমতীরে 'বড়া মকান' এবং পূর্বতীরে 'গিরজা বাড়ি'-তে বসবাস আরম্ভ করিলেন প্রধানমন্ত্রী অমরনাথ ও অর্থমন্ত্রী সন্তোষনাথ। কিন্তু তাঁহাদের মনে সুখ নাই। যদিও সমগ্র হিন্দুসমাজ অমর ও সন্তোষের উচ্চপদে আসীন হইবার সংবদে উল্লসিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁদের পরমারাধ্য ধর্মপ্রাণ পিতৃদেব প্রিয় পুত্রদ্বয় সুলতানের অধীনস্থ রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে প্রবল মনোঃকষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন। পিতৃদেবের এহেন যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে উভয় ভ্রাতাই ব্যাকুলচিত্তে অহরহ ভাবিতেন কী প্রকারে রাজবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ইত্যবসরে সংবাদ আসিল, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য নামক এক সাধু ব্যক্তি হরিনাম সংকীর্তন, নগর পরিক্রমা এবং ধর্মোপদেশের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত ও উজ্জীবিত করিতেছেন। তাঁহার নেতৃত্বে বৈষ্ণব সমাজ তো বটেই, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুগণও ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। সুলতান হুসেন শাহ কর্তৃক নবদ্বীপে নিযুক্ত কাজির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া অসংখ্য নরনারী প্রতিনিয়ত শ্রীচৈতন্যদেবের সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ করিতেছেন। অমর সন্তোষকে বলিলেন, 'সুসময় সমাগত। আর বিলম্ব নহে। অবিলম্বে পত্র প্রেরণ করো। মহাপ্রভুকে রামকেলিতে আগমনের

আমন্ত্রণ জানাও।

মাসাধিককাল অতিক্রান্ত হইল। এখনও পর্যন্ত নবদ্বীপ হইতে কোনও উত্তর হস্তগত হয় নাই। একদিন ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় সন্তোষনাথ অমরনাথকে বলিলেন, 'পূর্ব রজনীতে আমি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। তেজোঃদীপ্ত দিব্যকান্তি এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, পার্থিব বিষয়ে মনোনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন ধাম যাত্রা করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিতে স্থিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্মসাহিত্য রচনা করো এবং ব্রজভূমির অবলুপ্ত হর্ম্যরাজি উদ্ধার ও সংস্কার সাধনে ব্রতী হও। পার্থিব জগৎ হইতে পাপমুক্ত হইয়া জন্মান্তরে উত্তরণ ঘটাইবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। জানিবে, ইহাই আমার নির্দেশ। এই বাণী উচ্চারণ করিয়া উক্ত মহাপুরুষ অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিঃপুঞ্জে বিলীন হইলেন। আমি নিদ্রোত্থিত হইয়া স্বপ্নভঙ্গের অবসাদে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম।' অমরনাথ ভ্রাতার নিকট এই অদ্ভুত স্বপ্নের বিবরণ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'তুমি যে দিব্যপুরুষের দর্শন পাইয়াছ তিনিই শ্রীচৈতন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কলিযুগের অবতার। ইহার গূঢ় অর্থ হইল যে, তিনি অচিরেই সাক্ষাৎ দর্শনলাভের সুযোগ প্রদান করিবেন।' অতঃপর স্বপ্নদর্শনের অনির্বচনীয় আনন্দে বিগলিত হইয়া উভয় ভ্রাতা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন-'তস্মৈ গুরুদেবো নমঃ।

রামকেলি নগরে দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের উদ্যোগে বৃন্দাবনের অনুরূপ 'গুপ্ত বৃন্দাবন' নির্মিত হইয়াছে। গুপ্ত বৃন্দাবনের অন্যতম আকর্ষণ শ্রীমদনমোহন ও শ্রীরাধিকার অপরূপ যুগলমূর্তি যারা নবনির্মিত মন্দিরগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দির সংলগ্ন বিশালাকার দিঘি-শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। এতদ্ব্যতীত কদম্ব বৃক্ষরাজি শোভিত 'কদম্ব কানন'-এ পরিবেষ্টিত হইয়াছে গুপ্ত বৃন্দাবনের দেবালয়, জলাশয়, অতিথিগৃহ ইত্যাদি। রাজকার্য পরিচালনার অবসরে অমরনাথ ও সন্তোষনাথ নিত্য রাধেশ্যামের অর্চনায় অংশগ্রহণ করেন। কদম্ব কাননে ভ্রমণকালে তাঁহারা বিভিন্ন প্রসঙ্গে মতামত বিনিময় করেন। একদিন কদম্বকাননে সন্তোষ অমরকে বলিলেন, 'আমার হৃদয়ে সম্প্রতি প্রভূত যন্ত্রণার উদ্রেক হইতেছে। স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছি। কিন্তু যতক্ষণ সাক্ষাৎ দর্শনা না হইতেছে ততক্ষণ আমার চিত্ত শান্ত হইবে না। রাজকার্যেও যথাযথরূপে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না।' অমর উত্তরে বলিলেন, 'মদনমোহনের ইচ্ছানুসারে জগৎসংসারে সর্ববিধ কার্য সম্পাদিত হয়। আমাদের সকলের জীবন সেই অনন্ত শক্তির প্রতি সমর্পিত। সুতরাং প্রভুর কৃপালাভ তখনই সম্ভব হইবে যখন তিনি স্বয়ং তাহা স্থির করিবেন।' কথোপকথনকালে সহসা ভৃত্য আগমনপূর্বক অমরনাথকে বলিল, 'মহানুভব। আপনার উদ্দেশে নবদ্বীপ হইতে প্রেরিত পত্র আসিয়াছে।' দ্রুত পত্র হস্তগত করিয়া অমর পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশ তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সন্তোষের কৌতূহল নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'শ্রীচৈতন্যদেব অতীব অর্থবহ এই পত্রে লিখিয়াছেন যে, যদি কোনও নারী পতি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের কর্মে নিযুক্ত থাকে তাহলে তাহার এমন কোনও আচরণ উচিত নহে যাহাতে পতির হৃদয়ে পত্নীর সম্বন্ধে পরপুরুষের প্রেমিকরূপে গণ্য করিবার ভ্রম উৎপন্ন হয়। সেই নারী যেমন কর্মেই ব্যাপৃত থাকুক না কেন, তাহার হৃদয়ে যেন সদাসর্বদা স্বীয় পতিদেবতার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়।' পত্রপাঠ সমাপন করিয়া অমরনাথ অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, 'আহা! কতিপয়মাত্র ছত্রে কী সুন্দর উপমার মাধ্যমে আমাদের প্রতি মহাপ্রভুর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ প্রেরিত হইয়াছে।' সন্তোষনাথ অশ্রুসজল নেত্রে বলিলেন, 'ইহার অর্থ হইল মহাপ্রভু আমাদের আবেদনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি অনতিবিলম্বে দর্শন প্রদান করিবেন।'

(তিন)

৯২৩ বঙ্গাব্দের প্রাক-জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্ত দিবস। 'হাবস খানের ঘাটে সারিবদ্ধ বজরা নোঙর করিবামাত্র গৌড় নগরীর সর্বত্র বার্তা রটিয়া গেল নবদ্বীপ হইতে বিপুল সংখ্যক ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে শ্রীচৈতন্যদেব আগমন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর রামকেলিতে পদার্পণের সংবাদে আবালবৃদ্ধবনিতা হরিবোল ধ্বনিতে গগন পবন বিদীর্ণ করিয়া নদীপ্রান্তে ধাবিত হইল। অতঃপর বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন উচ্চস্থানে আগমন করিয়া তমালবৃক্ষতলে মহাপ্রভু কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণস্পর্শকল্পে অগণিত পুরবাসীর গুপ্ত বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ ঘটিতে থাকিল। প্রত্যুষে লক্ষকণ্ঠে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুলতান হুসেন শাহ প্রাসাদশীর্ষে আরোহণপূর্বক চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অগণন জনসমাগম প্রত্যক্ষ করিলেন বটে, কিন্তু ইহার হেতু উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। অতঃপর অমাত্যত্রয় আবদুল্লাহ, মহম্মদ এবং রফিকউদ্দিনকে তলব করিয়া রামকেলিতে এইরূপ জনসমাবেশের কারণ জানাইতে বলিলেন। উহারা প্রত্যেকে নিবেদন করিল, 'শাহেনশাহ। রামকেলি নগরে জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসীর সহসা আগমন ঘটিয়াছে। তাঁহার নৌবহরে সহস্রাধিক নরনারীও গৌড়রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে? কোনও পূর্ব অনুমতি ছিল না। আমদের নিকট অগ্রিম সংবাদ আসে নাই। দবীর খাস ও সাকর মল্লিক পূর্বাগ্রে সংবাদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না তাহাও আমরা অবগত নহি।' সন্ন্যাসীর বিস্তারিত বিবরণ সুলতান জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে সেনাধ্যক্ষ কেশব ছেত্রী যাহা বলিলেন তাহা যেন বহুযুগ অন্তে বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণনাসদৃশ, যথা-

"জিনিয়া কনককান্তি প্রশান্ত শরীর
আজানুলম্বিত বাহু, নাভি সুগভীর।
সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ আর কমল নয়ান
কোটী চন্দ্র সে মুখের নহেক সমান।
অরুণ কমল যেন চরণ যুগল
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্মল।"

সুলতান প্রমাদ গণনা করিলেন। কারণ, এমন দিব্যকান্তময় সন্ন্যাসীর জনমোহিনী কর্ষণ প্রজাকুলকে উদ্বেলিত করিয়া শাসনকার্যে বিঘ্ন ঘটাইতে সক্ষম। উপরন্তু তাঁহার স্মরণ হইল যে, একদা রাজজ্যোতিষী ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ ভবিষ্যতে নৃপতি হইতে পারেন।' সুলতান তৎক্ষণাৎ অমাত্যবর্গ, সেনাধ্যক্ষ ও নগরপালকে সন্ন্যাসীর যাবতীয় গতিবিধি সম্পর্কে সদাসর্বদা সংবাদ গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর দবীর খাসের তলব হইল। তাঁহাকে সুলতান বলিলেন, 'নবদ্বীপ হইতে অদ্য যে সন্ন্যাসী রামকেলিতে পদার্পণ করিয়াছেন গৌড়জন তাঁহাকে অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ লাভ করিয়াছি। তুমি তো ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ। তোমারও কি তদ্রূপ মনোভাব?' দবীর খাস নিঃশঙ্কচিত্তে বলিলেন, 'আপনি মহানুভবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন তিনি দেবতারই অঙ্গস্বরূপ। তিনিই সকল আরাধনার পরমস্থল। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁহার কৃপায় আপনিও এই বৃহৎ বঙ্গসমাজের অধীশ্বর



হইয়াছেন...।' -'হুম্। তোমার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার উপলব্ধি হইতেছে যে, আমি গৌড়াধিপতিমাত্র। কিন্তু ওই সন্ন্যাসী হইতেছেন রাজাধিরাজ। নতুবা প্রজাসকল সন্ন্যাসীর সন্দর্শনে ব্যাকুল চিত্তে যেরূপ রামকেলি নগর অভিমুখে ধাবিত হইতেছে তাহা অকল্পনীয়। গৃহকর্ম, রাজকর্ম, কোনও বিষয়ে তাহাদের মনোনিবেশ পরিলক্ষিত হইতেছে না। আমার জীবনে ইহা এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। যাহা হউক, গৌড়রাজ্যে অবস্থানকালে সন্ন্যাসীর যেন বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়, তাহা সুনিশ্চিত করিবার দায়িত্ব আমি তোমাকে অর্পণ করিলাম।' হুসেন শাহ প্রাসাদপুরীর খাসমহলের উদ্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইলে দবীর খাস হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেন যে, সুলতান যাহা এইমাত্র বলিলেন উহা সত্য নহে। ইতিমধ্যে সুলতানের অন্তর ও বাহ্যিক চরিত্র সম্বন্ধে দবীর খাস সম্যক ধারণা লব্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সুলতানের বক্তব্যকে সন্দিগ্ধ চিত্তের বিরাগপ্রসূত মনোভাবের সুমিষ্ট বহিঃপ্রকাশ রূপে গণ্য করা শ্রেয়। অমরনাথ অতঃপর চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে সন্তোষনাথের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অস্তগামী রবির রক্তিমচ্ছটায় ভাগীরথীবক্ষ রঞ্জিত হইয়াছে। মৃদুমন্দ সমীরণের স্পর্শে অঙ্গে সুখ অনুভূত হইতেছে। সমাগত সায়াহ্নের দ্রুত পদচারণে উদ্বুদ্ধ হইয়া রামকেলির তমালবৃক্ষতলে উপবিষ্ট মহাপ্রভুর আরতি ও ভজনায় মত্ত ভক্তজন গাহিতেছেন—

"ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ
ভজ গৌরাঙ্গের নাম হে..."

(চার)

রাত্রি ক্রমশ গভীর হইল। নিত্যানন্দ, হরিদাস স্বামী ও পণ্ডিতবর্গের সান্নিধ্যে মহাপ্রভু শ্রীভাগবতের মহিমা ব্যাখ্যায় আত্মস্থ রহিয়াছেন। ইত্যবসরে অমরনাথ, সন্তোষনাথ ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীবল্লভ ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক মদনমোহন মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকালান্তে শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ ও হরিদাসস্বামীর সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিবামাত্র অমর ও সন্তোষ দন্তে তৃণমূল ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর চরণযুগল স্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরত অবস্থায় নিবেদন করিলেন, 'হে, ধর্মাধিরাজ, আমরা প্রকৃত অর্থে পতিত হইয়াছি। আপনার শ্রীচরণে স্থান না হইলে ইহজীবন ব্যর্থ হইবে। মরণকালেও শান্তি পাইব না। আপনি আমাদের উদ্ধার করুন।' দুই ভ্রাতাকে মহাপ্রভু নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা যে আমার জন্মজন্মান্তরের সখা। তোমাদের সহিত সাক্ষাৎকল্পেই আমার রামকেলিতে আগমন। হয়তো অবগত আছ যে, চতুর্দশ বৎসরব্যাপী বনবাসকালে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও মাতা সীতাদেবী রামকেলি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বঙ্গে গঙ্গাসাগরের ন্যায় রামকেলিও এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। তোমাদের সহিত আমার এই মধুর মিলনলগ্ন পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট ছিল। আইস, আমরা সম্মিলিতভাবে এবার বৃন্দাবনধাম যাত্রা করি। গোপাল গদাধরের লীলাভূমি সংস্কার করিয়া আমরা পুনরায় নগর পত্তন করিব। কলিযুগে কৃষ্ণদর্শনে সমগ্র মানবসমাজকে দীক্ষিত করিতে হইবে। নতুবা সমূহ বিপদ আসন্ন। তোমাদের সম্পর্কে শ্রবণ করিয়াছি যে, শাস্ত্র ও ধর্মাচরণে তোমাদের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। অতএব, আগামী পরশ্ব আমরা সমবেতভাবে বৃন্দাবন যাত্রা করিব।' মহাপ্রভুর মধুর বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী গাহিয়া উঠিলেন—

"যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া
পতিতপাবন নাম কীসের লাগিয়া..."

অমরনাথ বলিলেন, 'প্রভু আমি বঙ্গের সুলতান আলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেন শাহের দবীর খাস এবং সন্তোষ হইতেছে সাকর মল্লিক। ততক্ষণে গৌড় রাজপ্রাসাদে আশাবরী রাগে ধ্বনিত হইল প্রভাত সংগীত- 'ভলি কিনি ভোর ভঁয়ে, আয়ে মোর অঙ্গনা...।' দবীর খাস একসময়ে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে সুলতানকে বলিলেন, 'আগামীকল্য শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাত্রা



রাত্রি দ্বিপ্রহর। গুমটি ফটকের একাংশ উন্মুক্ত হইল। সকলের অজ্ঞাতসারে সনাতন গোস্বামী কারগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কারাগারের বিপরীতমুখী সঘন আম্রকানন অতিক্রম করিয়া সনাতন হাবসী খানের ঘাটের অপরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দশ অশ্বারোহী সশস্ত্র সঙ্গীগণ তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন। অনতিবিলম্বে সনাতন গৌড়রাজ্য চিরকালের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশে অশ্বদল ধাবিত করিলেন।

করিবেন। গৌড় নগরী পরিত্যাগের প্রাক্কালে অদ্য সায়াহ্নে রামকেলি নাট্যশালায় নৃত্যগীতাদি সহযোগে মহাপ্রভুর বিদায় সংবর্ধনা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে। আমি রামকেলি নগরবাসীর পক্ষ হইতে উক্ত সমারোহে আপনাকে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত সর্বিবন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। মহাপ্রভুও আমার প্রস্তাবে সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন।' প্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেন, 'তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। অতএব রাজযৌতুক অথবা কোনও উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং তোমার এই মহতী আয়োজন সবিশেষ প্রশংসনীয়। আমি অবশ্যই যাইব। তুমি অবিলম্বে নাট্যশালায় গমন করিয়া আয়োজন ও প্রস্তুতি স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করো। অর্থ যাহা প্রয়োজন তাহা সাকর মল্লিকের নিকট হইতে অকপটে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না।' সুলতানের অতঃপর স্বগতোক্তি—'আল্লাহ! সহসা আগত আপদের বিদায়কাল আসন্ন। এতদ্ব্যতীত সুখকর সংবাদ আর কী হইতে পারে।'

রামকেলি নাট্যশালার অর্ধচক্রাকার মঞ্চ অভিনব রূপশৈলীতে সজ্জিত হইয়াছে। সন্নিকটে সুলতানের উপবেশনস্থল নির্দিষ্ট করিয়া অস্থায়ী তখত্ নির্মিত হইয়াছে। বিপরীতস্থানে ভক্তবৃন্দ সহকারে চৈতন্যদেবের কুশাসনের প্রতি সকলের সাতিশয় আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর সুবিধার্থে সুবৃহৎ উন্মুক্ত পরিসরে চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত সুদৃশ্য মণ্ডপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথাসময়ে মহাপ্রভু সুলতান, পাত্র -অমাত্য, পুর নরনারী আসন গ্রহণ করিলে অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। মূলমঞ্চে মৃদঙ্গ, করতাল, বংশী ও অন্যান্য নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে সহশিল্পীবৃন্দ সুরমূর্ছনার আবহ সৃষ্টি করিল। রামকেলির সমীপবর্তী ভট্টাবাটির সংগীতসাধক মাধবাচার্যের শিষ্যা অসামান্য সুন্দরী গায়িকা মুক্তাবাঈ মধুরকণ্ঠে পরিবেশন করিল গীতগোবিন্দের অভিসার সংগীত—

"রতিসুখ সারে গতমিভাসারে মদনমোহন বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্বমান মনুসর ত্বং হৃদয়সম।
ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীন পয়োধর পরিসর মর্দন চঞ্চলকর যুগশালী।"

সংগীতের মর্মার্থ মুক্তাবাঈ নিবেদন করিলেন—'হে রাধে। তোমার হৃদয়েশ্বর মদনমোহন বেশে রতিসুখ নিবৃত্ত করিতে অভিসারে আগমন করিয়াছেন। তুমি বিলম্ব করিও না। তোমার পীনোন্নত স্তনদ্বয় মর্দন করিবার নিমিত্ত তিনি যমুনা তীরবর্তী বনানীতে অপেক্ষামাণ।' কৃষ্ণভক্তিতে আপ্লুত শ্রোতৃমণ্ডলী হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদের অনুরোধে মুক্তাবাঈ কণ্ঠে গীতগোবিন্দের অপরূপ শ্লোক উচ্চারিত ইহল—

"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্।
দেহি পদবল্লব মুদারম।
জ্বলতি ময়ি দারুণ মদনকদনালম্।
হরতু তদু পাহিত বিকারম।।

মর্মার্থ—'মদনজ্বালায় পীড়িত মাধব অভিমানিনী রাধার পদযুগল স্বীয় মস্তকে স্থিত করিবার অনুরোধ জানাইলেন। কারণ নিদারুণ কামোদ্রেকে মাধবের অঙ্গ দগ্ধ হইতেছিল। কামযন্ত্রণা হইতে মুক্তির উদ্দেশ্যেই এহেন নিবেদন। উচ্ছ্বসিত সুলতান হুসেন শাহ তাঁহার পাত্র-অমাত্যদের প্রতি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, 'মারহাবা! মারহাবা!' মুক্তাবাঈকে সুলতান মোতিহার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে গায়িকা বলিল, 'জাঁহাপনা। আমি দেবায়ত্ত দেবদাসী। আমার কোনও কিছুর প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক ভট্টাবাটি মহল্লার দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গকে নিরুদ্বেগ ধর্মসাধনার নিমিত্ত নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন তাহলে তাঁহাদের প্রভূত উপকার হইবে।' সুলতান প্রীত হইয়া উজিরকে ব্রাহ্মণদিগের কল্যাণার্থে এক সহস্র বিঘা ভূমি দানের ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ প্রদান করিলেন। ফলত ভট্টবাটির ব্রাহ্মণকুল বংশানুক্রমে 'হাজারি ব্রাহ্মণ' রূপে পরিচিত হইলেন।

মধ্যনিশীথের প্রাক্কালে অনুষ্ঠান সমাপনান্তে সকলে অনির্বচনীয় আনন্দ সহকারে গৃহে গমন করিল। রূপ ও সনাতন মদনমোহন বিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডায়মান শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমল স্পর্শ করিয়া অশ্রুসজল নেত্রে বিদায় আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন।

রামকেলি হতে মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের কতিপয় দিবসান্তে রূপ গোস্বামী সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 'হে, গৌড়াধিপতি। মহাপ্রভুর পবিত্র সান্নিধ্যে আমার হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব জন্মিয়াছে। সাকর মল্লিকের দায়িত্বভার বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি প্রদান করেন তাহা হইলে সকল দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বৃন্দাবন ধামে মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করি এবং অবশিষ্ট জীবন হরিসাধনায় উৎসর্গ করি।' সুলতান উপলব্ধি করিলেন যে, সাকর মল্লিকের চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য সম্পাদনে যাহার এমন অনীহা জন্মিয়াছে এহেন অনাসক্ত কর্মচারীকে অব্যাহতি দেওয়াই শ্রেয়। অতঃপর সুলতানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রূপ গোস্বামী সপ্তাহান্তে রামকেলি নগর চিরতরে পরিত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে তিনি জানিতে পারিলেন যে, মহাপ্রভু সনাতনের পূর্ব অনুরোধক্রমে বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত রাখিয়া নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। রূপ গোস্বামী যথাসময়ে নীলাচলে আগমণ করিলে মহাপ্রভুর নির্দেশে অবশেষে তিনি বৃন্দাবন ধামে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমির সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। সুলতান হুসেন শাহের অন্তরে দবীর খাস সম্পর্কে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। কারণ, অনুচরবৃন্দ প্রতিনিয়ত : সংবাদ প্রদান করিতেছে যে দবীর খাস সম্পূর্ণ সুস্থ ও নীরোগ হওয়া সত্ত্বেও কোনও অজ্ঞাতকারণবশত স্বগৃহে অন্তরীণ থাকিয়া রাজকার্য হইতে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বিষয়টি স্বয়ং তদন্ত করিবার অভিপ্রায়ে সুলতান অকস্মাৎ রামকেলির বড়া মকানে পদার্পণ করিলেন। সনাতনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, দবীর খাস একান্ত চিত্তে ভাগবত পাঠ করিতেছেন এবং তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অনর্গল বারিধারা নির্গত হইতেছে। বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ সুলতান হুসেন শাহ সনাতনকে বলিলেন, 'তুমি রাজধর্ম ভঙ্গ করিয়াছ। আমাকে অসুস্থতার সংবাদ প্রেরণ করিয়া শুধু মিথ্যাচার করিয়াছ তাহাই নহে। উপরন্তু রাজকর্ম সম্পাদনে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকিবার কারণেও তোমাকে যথোপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।' ভাগবত পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়া সনাতন গাত্রোত্থান করিলেন। সুলতানকে বলিলেন, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আমি সর্বদা কৃষ্ণভজনায় মত্ত থাকিয়া রাজকার্য সম্পাদনে চরম অবহেলা করিয়াছি। বর্তমানে শ্রীমদনমোহনের আরাধনা ব্যতীত আমার কোনও কিছুতেই আসক্তি অথবা মোহ নাই। এক্ষণে আপনি শাস্তিপ্রদান করিলে আমি তাহা নতমস্তকে গ্রহণ করিব। আপনি আমার অন্নদাতা প্রভু। আপনার নিকট সত্য গোপন রাখিয়া আমি অবশ্যই গর্হিত অপরাধ করিয়াছি।' উত্তর শ্রবণ করিয়া সুলতান অধিক ক্রোধান্বিত হইয়া উজিরকে নির্দেশ প্রদান করিলেন, দবীর খাসকে অবিলম্বে কারাগারে নিক্ষেপ করো। আমি উৎকল হইতে বিদ্রোহ দমন করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার বিচার হইবে। ততদিন দাবীর খাস কারাগারে বন্দি থাকিবে।

রাজপ্রাসাদের পূর্ব-দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত গুমটি ফটকের অভ্যন্তরে এক গম্বুজবিশিষ্ট সুবৃহৎ সৌধে বন্দি জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করিলেন সনাতন গোস্বামী। সহসা একদিন কারারক্ষী হাবু শেখের মাধ্যমে বৃন্দাবন হইতে প্রেরিত রূপ গোস্বামীর গোপন বার্তাসম্বলিত পত্র পাইয়া সনাতন সাতিশয় উৎফুল্ল বোধ করিলেন। রূপ লিখিয়াছেন, 'তোমার বন্দিদশার সংবাদে নিদারুণ কষ্টবোধ করিতেছি। যদি এই বার্তা তোমার হস্তগত হয় তাহলে জানিবে রামকেলি নগরের প্রধান শ্রেষ্ঠী চরণদাসের নিকট আমি গৌড়রাজ্য পরিত্যাগের পূর্বে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে গচ্ছিত স্বর্ণমুদ্রা সদ্ব্যবহার করিয়া কোনওক্রমে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করো। সুলতানের উৎকল হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই বৃন্দাবনে আমার আশ্রমে আগমন কর। তোমার নিরাপদ মুক্তি কামনা করো। মহাপ্রভুর কৃপায় তুমি অবশ্যই কৃতকার্য হইবে।' সনাতন পত্রপাঠ করিয়া হব্বু শেখকে বলিলেন, "আমি তোমাকে সপ্তসহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব। অবশিষ্ট তিনসহস্র মুদ্রা আমার পাথেয় তথা অশ্বারোহী সঙ্গীদের ভোজন ও অতিথিশালার ব্যয়ভার ইত্যাদি কারণে প্রয়োজন হইবে। তুমি অদ্য নিশীথেই আমার ব্যবস্থা কর যাহাতে নিশাবসানের পূর্বে আমি গৌড়রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিতে পারি।' এই গর্হিত কর্ম করিলে সুলতানের আদেশে শিরচ্ছেদ হইতে পারে এই আশঙ্কায় হাবিবু শেখ প্রথমে সনাতনের প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। কিন্তু অর্থের প্রলোভন ও সনাতনের যুক্তির নিকট সে পরাস্ত হইল। সনাতন বলিলেন, 'সুলতান উৎকল হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে আমার অন্তর্ধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিবে যে, শ্রাবণ পূর্ণিমার পুণ্য প্রভাতে রক্ষীদের উপস্থিতিতে শিকলবদ্ধ অবস্থায় নদীতে অবগাহনকালে দবীর খাসের সলিল সমাধি ঘটিয়াছে। অনন্তলিলা ভাগীরথীর বক্ষে বহুক্ষণ সন্ধান করিয়াও স্রোতস্বিনীর গর্ভ হইতে তাঁহার মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।'

রাত্রি দ্বিপ্রহর। গুমটি ফটকের একাংশ উন্মুক্ত হইল। সকলের অজ্ঞাতসারে সনাতন গোস্বামী কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কারাগারের বিপরীতমুখী সঘন আম্রকানন অতিক্রম করিয়া সনাতন হাবসী খানের ঘাটের অপরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দশ অশ্বারোহী সশস্ত্র সঙ্গীগণ তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন। অনতিবিলম্বে সনাতন গৌড়রাজ্য চিরকালের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশে অশ্বদল ধাবিত করিলেন। শ্রাবণ পূর্ণিমা সমাগত। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরান্তরে অপসৃয়মাণে অশ্বারূঢ় বাহিনীর ক্ষুরধ্বনিত ক্রমশ বিলীন হইয়া গেল। শত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। মহাপ্রভুর পুণ্য পদচিহ্নসমৃদ্ধ প্রস্তরখণ্ড রামকেলির মদনমোহন মন্দিরে রাধামাধবের যুগল মূর্তির পাদদেশে অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। ভক্তবৃন্দ ওই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। নানাদেশ হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত অসংখ্য নরনারী প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির পুণ্য প্রভাতে রূপ-সনাতনের গুপ্ত বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর রামকেলিতে শুভপদার্পণ তিথি স্মরণে সপ্তাহব্যাপী উৎসবে মত্ত হন। অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন, নগর পরিক্রমা ও 'হরিবোল' ধ্বনিতে মুখরিত হয়নি স্তব্ধ নদীপ্রান্তর। বিলুপ্ত গৌড়নগরীর কালবিধ্বস্ত হর্ম্যরাজির বন্দরে বন্দরে প্রতিধ্বনিত হয়—

"সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই
আজও পড়ে মনে মোর
পড়ে যে কেবলই মনে...।"

১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
কৃতজ্ঞতা :
২) বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত। ৩) দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'চৈতন্য এন্ড হিজ এজ' (১৯২২) ৪) এম টি কেনেডি গ্রন্থিত 'দি চৈতন্য মুভমেন্ট' (১৯২৫) ৫) কৃষ্ণকমল সরকার রচিত 'গৌড় পাণ্ডুয়ার কাহিনী ও কিংবদন্তী' (১৯৯৯)

শেষোক্ত পঙ্‌ক্তিত্রয় দিলীপকুমার রায়ের স্বকণ্ঠে গীত, রচিত ও সুরারোপিত সংগীত হইতে গৃহীত।



নিরাপদ সঞ্চয় প্রকল্প

একটি অসাধারণ সরকারি প্রয়াস

অভিরূপ সরকার



সম্প্রতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্য নিয়ে যে সরকারি সঞ্চয় প্রকল্পটির কথা ঘোষণা করেছেন এবং যার নাম তিনি রেখেছেন সেফ সেভিংস স্কিম বা নিরাপদ সঞ্চয় প্রকল্প, তার মতো প্রকল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন সারা ভারতেও আগে কখনও ছিল না।

একমাত্র কেরলে একটা সঞ্চয় প্রকল্প গত পঁচিশ বছর ধরে চালু আছে যার সঙ্গে চেহারায় না হলেও নীতিগতভাবে বর্তমান প্রকল্পটির কিছু মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সব দিক বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে, প্রকল্পটি সত্যিই অনন্য। প্রকল্পটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে জানা দরকার, এইরকম একটা প্রকল্পের প্রয়োজন হল কেন?

২০১২ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট বলছে, যেখানে উন্নত দেশগুলিতে নব্বই শতাংশেরও বেশি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, সেখানে আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র পঁয়ত্রিশ শতাংশের। অনুপাতটা বলাই বাহুল্য, গ্রামে আরও কম। বস্তুত, সারা ভারতের চল্লিশ শতাংশ এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ষাট শতাংশ গ্রামবাসীর কাছে এখনও ব্যাঙ্ক পরিষেবা পৌঁছতেই পারেনি। আবার পৌঁছলেই বা সকলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলছেন এমনও নয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব আছে। ফলে ব্যাঙ্কের যে দুটো প্রধান কাজ, ধার দেওয়া এবং টাকা জমা রাখা, দুটোর কোনওটার সুবিধাই গ্রামের মানুষ পাচ্ছেন না।

গ্রামে ব্যাঙ্ক না থাকার বা কম থাকার মাশুল গুনতে হচ্ছে মূলত গরিব মানুষকে। গরিব মানুষ শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি থাকেন, নিকটবর্তী শহরে বা গঞ্জে যেখানে ব্যাঙ্ক আছে সেখানে তাঁদের যাওয়া-আসাও সব সময় হয়ে ওঠে না। তাই গ্রামে ব্যাঙ্ক না থাকলে তাঁরা মহাজনের কাছ থেকে ধার নিতে বাধ্য হন। উল্টোদিকে সামান্য কিছু টাকাপয়সা জমলে তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না কোথায় টাকাটা জমা রাখবেন। গ্রামে ব্যাঙ্কহীনতার সুযোগ নিয়ে সম্প্রতি আমাদের দেশে দু'ধরনের ভুঁইফোঁড় সংস্থা গজিয়ে উঠেছিল। একদল গজিয়ে উঠেছিল দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশে। অন্য দল পূর্ব ভারতে।

দক্ষিণ ভারতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সংস্থাগুলোর নাম এমএফআই বা মাইক্রো-ফাইনান্স ইনস্টিটিউশন্স। মাইক্রো-ফাইনান্স সংস্থাগুলো অতি চড়া সুদে গরিব মানুষকে টাকা ধার দিচ্ছিল এবং তারপর তাদের সকলে না হলেও অনেকেই লাঠিসোটা নিয়ে, ভয় দেখিয়ে, বলা যেতে পারে, গলায় পা দিয়ে অসহায় মানুষগুলোর কাছ থেকে টাকা আদায় করছিল। তা সত্ত্বেও যাঁরা টাকা শোধ করতে পারছিলেন না, তাঁদের পুরনো

ধারগুলোকেই নতুন ধার হিসাবে দেখানো হচ্ছিল, ব্যাঙ্কিং-এর ভাষায় যার নাম এভারগ্রিনিং। তাই কাগজে-কলমে মাইক্রো-ক্রেডিট সংস্থাগুলো থেকে টাকা ধার করে ফেরত না দেওয়ার অনুপাত খুব সামান্য হলেও এই সাফল্য থেকে উল্লাসের কিছু নেই। কারণ এর আড়ালে খানিকটা কারচুপি আর অনেকটা গরিব মানুষের দুঃখ-কষ্ট লুকিয়ে আছে। ২০১০ সালের অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার প্রথমে অর্ডিন্যান্স ও পরে আইন করে মাইক্রো ফাইনান্স সংস্থাগুলির কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে দেয়। আরও পরে, ২০১১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে প্রকাশিত মালেগম রিপোর্ট এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের মাইক্রো-ফাইনান্স বিল ক্ষুদ্র ঋণের সংস্থাগুলোকে ক্রেতা সুরক্ষার দিকটায় নজর রাখতে খানিকটা বাধ্য করেছে। আসল সমস্যাটা, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক না থাকার সমস্যাটা কিন্তু রয়েই গেল।

দক্ষিণ ভারতে ভুঁইফোঁড় এমএফআই-রা গজিয়ে উঠেছিল তেমনি পূর্ব ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে গজিয়ে উঠেছিল এমন সব সংস্থা যারা অবাস্তব সুদের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে থেকে টাকা জমা নিয়ে স্রেফ মেরে দিচ্ছিল। ওই চড়া সুদে টাকা ফেরত দেওয়ার উপায় বা অভিপ্রায় তাদের কোনওকালেই ছিল না। গরিব মানুষ মূলত গ্রামের মানুষ, যাঁরা এইসব সংস্থায় টাকা রাখছিলেন তাঁরা হয় সেকথা বুঝতে পারেননি অথবা মূলত বুঝতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী এই সংস্থাগুলোর নাম দিয়েছেন চিটিং ফান্ড। শেষ পর্যন্ত যখন এদের আসল চেহারাটা মানুষের সামনে এল ততদিনে এই চিটিং ফান্ডরা সাধারণ মানুষের অনেক টাকা আত্মসাৎ করে ফেলেছে। এখানেও আসল সমস্যাটা কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের অভাব।

বস্তুত, একদিকে ব্যাঙ্কগুলো যেমন গ্রামের গরিব মানুষদের কাছে পৌঁছতে পারছে না তেমনি অন্যদিকে সরকারি ঋণ কমানোর ব্যাপারে কেন্দ্রের অনর্থক বাড়াবাড়ির ফলে ডাকঘরের স্বল্পসঞ্চয়ে কেন্দ্র আর তেমন উৎসাহ দিচ্ছে না। ব্যাঙ্কের দুটো কাজ টাকা জমা নেওয়া এবং টাকা ধার দেওয়া-দুটোই যে মার খাচ্ছে আগেই বলেছি। ডাকঘরও চিঠি বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে, কিছুদিন আগে অব্দি টাকা জমা নেওয়ার কাজটা করে আসছিল। কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ডাকঘরের এই কাজটা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা না পৌঁছনোর ফলে এবং স্বল্পসঞ্চয়ে উৎসাহ কমিয়ে দেওয়ার কারণে, টাকা জমা নেওয়ার কাজটা চলে যাচ্ছে চিটিং ফান্ডগুলোর দখলে, আর টাকা ধার দেওয়ার ছুতোয় মাইক্রো ফাইনান্স নাম দিয়ে কিছু সংস্থা মহাজনী কারবার চালাচ্ছে। এর ফলে দুটো বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এক সরাসরি মারা পড়ছে গ্রামের গরিব মানুষ। হয় ঠগ জোচ্চরদের হাতে টাকা জমা রাখার ফলে তাঁদের সর্বস্ব খোয়া যাচ্ছে, না হয় মহাজনের টাকা শোধ করতে গিয়ে তাঁরা ধনে-প্রাণে মারা পড়ছেন। দুই, যে বিপুল পরিমাণ টাকা দেশের আর্থিক উন্নতিতে কাজে লাগতে পারত সেটা দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে কিছু বিলাস-ব্যসনে খরচ হয়ে যাচ্ছে আর বাকিটা অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনও ব্যবসায় খাটানো হচ্ছে। এখানে দুটো প্রশ্ন উঠছে— এক, কেন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছতে পারছে না? দুই, পৌঁছতে পারলেই কি চিটিং ফান্ডের দৌরাত্ম্য ঠেকানো যেত?

কেউ কেউ বলবেন, চিটিং ফান্ডগুলো যেখানে বিপুল পরিমাণ কমিশন ও সুদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সেখানে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা বা রাখানোর জন্য চেষ্টা করার উৎসাহ মানুষের থাকবে কেন? অর্থাৎ একটা মত হল, চিঠি ফান্ডগুলো যেখানে রমরমিয়ে ব্যবসা করছে সেখানে ব্যাঙ্কের উপস্থিতি থাকা না-থাকা সমান।

গ্রামে ব্যাঙ্কদের ব্যবসা তেমন করে না পৌঁছনোর মূল কারণ, বেশ কিছুদিন যাবৎ উদারীকরণ নীতির অঙ্গ হিসাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় মুনাফাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। বছরের শেষে যে ব্যাঙ্ক যত বেশি লাভ রাখতে পারছে তার তত কদর। এতে নিন্দের কিছু নেই, ব্যাঙ্কদের অকর্মণ্য মেদ ঝরিয়ে ফেলার জন্য কিছুটা লাভ- লোকসানের দিকে নজর দেওয়া অবশ্যই দরকার ছিল। সমস্যা হল, লাভের দিকে নজর রাখতে গিয়ে ব্যাঙ্কগুলি তাদের সামাজিক দায়-দায়িত্বগুলো প্রায় ভুলতে বসেছে। প্রত্যন্ত গ্রামে শাখা খুললে যেহেতু তেমন লাভ নেই তাই গ্রামীণ শাখা বিস্তারে তেমন উৎসাহ ব্যাঙ্কদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। হাল আমলে অবশ্য দূরের গ্রামে শাখা না খুলেও কেমন করে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু ভাবনা-চিন্তা করেছে। বিজনেস করেসপন্ডেন্ট নামক একটি প্রকল্প তৈরি হয়েছে যেখানে ব্যাঙ্কের কোনও প্রতিনিধি একটি হস্তচালিত যন্ত্র এবং কিছু নগদ টাকা নিয়ে দূরবর্তী গ্রামগুলোতে নিয়মিত পৌঁছবেন এবং তাঁর সহায়তায় গ্রামের মানুষরা টাকা তোলা ও টাকা জমা রাখার কাজ সম্পন্ন করবেন। প্রকল্পটি খুব বেশি দূর এগোয়নি। এর একটা কারণ ব্যাঙ্কগুলির দিক থেকে উদ্যোগের অভাব। কিন্তু এছাড়া আরও একটা কারণ আছে। শোনা যাচ্ছে, বিজনেস করেসপন্ডেন্ট বলে ব্যাঙ্কগুলো যাদের নিয়োগ করেছিল তাদের অনেকেই ছিল একই সঙ্গে চিটিং ফান্ডের এজেন্ট। তাই ব্যাঙ্কের প্রকল্প সফল করার ব্যাপারে তাদের তেমন একটা উৎসাহ ছিল না।

এখানেই দ্বিতীয় প্রশ্নটা অনিবার্যভাবে চলে আসছে। প্রশ্নটা উৎসাহ সংক্রান্ত। কেউ কেউ বলবেন, চিটিং ফান্ডগুলো যেখানে বিপুল পরিমাণ কমিশন ও সুদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সেখানে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা বা রাখানোর জন্য চেষ্টা করার উৎসাহ মানুষের থাকবে কেন? অর্থাৎ একটা মত হল, চিঠি ফান্ডগুলো যেখানে

> ছিদ্রান্বেষীরা বলবেন, ব্যাঙ্কগুলির মতোই যদি সুদ দেওয়া হয় তাহলে মানুষ ব্যাঙ্ক ছেড়ে নতুন প্রকল্পে টাকা রাখবে কেন? এর দুটো উত্তর আছে। মানুষ এখন নিরাপত্তা সম্পর্কে আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। ডাকঘরের অল্প সুদেও এখন বহু মানুষ টাকা রাখছেন। কাজেই ব্যাঙ্কের সুদ, যা ডাকঘরের সুদের থেকে বেশি, তাতে তাদের টাকা রাখতে আপত্তি হবে কেন?

রমরমিয়ে ব্যবসা করছে সেখানে ব্যাঙ্কের উপস্থিতি থাকা না থাকা সমান। এই মত মেনে নিলে চিট ফান্ডগুলোর হাত থেকে সাধারণ মানুষের বাঁচানোর জন্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকাটা বড় হয়ে দেখা দেবে। খবরে প্রকাশ, চিনে ২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৪০০ চিট ফান্ড মালিককে গ্রেফতার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর না হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে অতটা না হোক খানিকটা কঠোর আইন অবশ্যই দরকার। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল, শুধুমাত্র যদি কড়া আইন তৈরি হয়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কগুলোর পর্যাপ্ত অনুপ্রবেশ না ঘটে, তাহলে একটা শূন্যতা থেকেই যাবে, যে শূন্যতার সুযোগ নিয়ে আইনের ফাঁক দিয়ে গলে ভুঁইফোঁড় সংস্থাগুলো আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

এবার ডাকঘরের স্বল্পসঞ্চয় নিয়ে দু'-চার কথা। কয়েক বছর আওে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল পরিমাণ স্বল্পসঞ্চয় জমা হত। এখন হয় না। নিশ্চয় এই হ্রাসপ্রাপ্ত স্বল্পসঞ্চয়ের একটা বড় অংশ চিট ফান্ডগুলোর কাছে জমা পড়েছে। কিন্তু এর পিছনে যে শুধুমাত্র চিট ফান্ডগুলোর প্রলোভন রয়েছে তা নয়, কেন্দ্রীয় সরকার রীতিমতো পরিকল্পনা করে স্বল্পসঞ্চয়ের প্রকল্পগুলোকে অনাকর্ষক করে তুলেছে, এটাও একটা কারণ। স্বল্প সঞ্চয় আসলে জনসাধারণের কাছ থেকে নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ। সরকার এই ঋণ আর নিতে চায় না। তারা মনে করছে সরকারি ঋণ বাড়তে থাকলে বাজারে বেসরকারি ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণের জোগান কমে যাবে ফলে বেড়ে যাবে সুদের হার। সুদের হার বেড়ে গেলে বেসরকারি পুঁজিপতিদের মুনাফা কমে যাবে, ধস নামবে শেয়ার বাজারে। কেন্দ্রীয় সরকার এইসব চায় না, তারা ভাবছে, সব থেকে আগে বেসরকারি পুঁজিপতিদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। বেসরকারি কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলে করসংগ্রহ নিজের থেকেই বেড়ে যাবে। তখন জনসাধারণের কাছ থেকে ধার করারও আর দরকার পড়বে না। অর্থাৎ উদার ব্যাঙ্কনীতির মতো এখানেও আমরা অতি দক্ষিণ চিন্তার একটা প্রলম্বিত ছায়া দেখতে পাচ্ছি। যে চিন্তা আমাদের বিশ্বাস করতে বলছে, সব সমস্যা বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিলে, নিজের থেকেই সমাধান হয়ে যাবে। আর গরিবদের জন্যেও আলাদা করে ভাবার কিছু নেই, বাজারই উদ্ধার করবে তাদের। কঠিন বাস্তব কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর নবঘোষিত প্রকল্পটিকে দেখা যেতে পারে। এটি একটি রাজ্য সরকারি প্রকল্প। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে সরকারি এজেন্টদের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। আমাদের রাজ্যে প্রায় তিরিশ হাজার কমিশন ভিত্তিক সরকারি এজেন্ট আছেন। এঁরা একসময় গ্রামের মানুষের কাছে ডাকঘরের ক্ষুদ্রসঞ্চয় প্রকল্পগুলো পৌঁছে দিতেন। ধীরে ধীরে ডাকঘরের কাজ কমে আসার ফলে এই এজেন্টরা বেকার হয়ে যাচ্ছিলেন। সরকার এঁদের কাজে লাগাবে। এজেন্টরা গ্রামের মানুষের কাছে গিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার উপকারিতা বোঝাবেন। তাঁদের সঙ্গে করে ব্যাঙ্কে নিয়ে আসবেন, তাঁদের হয়ে ফর্ম-টর্মগুলো ভরে দেবেন, কেওয়াইসি-র প্রয়োজন মেটাতে তাঁদের সাহায্য করবেন। যে টাকাটা গ্রামের মানুষ ব্যাঙ্কে জমা রাখবেন সেটা চলে যাবে একশো ভাগ সরকারি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন বিত্ত নিগমের কাছে। জমাকর্তাকে সুদ দেওয়ার দায়িত্ব নিগমের। জমা টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্বও নিগমের। অর্থাৎ, জনসাধারণের টাকা সরকার গচ্ছিত রাখছে, সরকারই আবার সেই টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। এই প্রকল্পে অন্তত ব্যাঙ্কের হারে সুদ দেওয়া হবে। এত কিছু করার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে চিটিং ফান্ডগুলোর হাত থেকে বাঁচানো।

ছিদ্রান্বেষীরা বলবেন, ব্যাঙ্কগুলির মতোই যদি সুদ দেওয়া হয় তাহলে মানুষ ব্যাঙ্ক ছেড়ে নতুন প্রকল্পে টাকা রাখবে কেন? এর দুটো উত্তর আছে। মানুষ এখন নিরাপত্তা সম্পর্কে আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। ডাকঘরের অল্প সুদেও এখন বহু মানুষ টাকা রাখছেন। কাজেই ব্যাঙ্কের সুদ, যা ডাকঘরের সুদের থেকে বেশি, তাতে তাদের টাকা রাখতে আপত্তি হবে কেন? দ্বিতীয়ত, ডাকঘরে মানুষ টাকা রাখছেন কারণ সব জায়গায় ব্যাঙ্ক নেই। এইসব জায়গাগুলোতেই নতুন প্রকল্পের এজেন্টরা পৌঁছবেন। যাঁরা ডাকঘরে টাকা রাখছিলেন তাঁদের বলা হবে, আপনারা বিত্ত নিগমের কাছে টাকা রাখুন। এতে যেমন সরকারি নিরাপত্তা থাকবে তেমনি সুদও ডাকঘরের থেকে বেশি পাবেন।

যে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা উন্নয়ন নিগম পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে লাগাবে। এর ফলে নিগমেরও টাকা তোলার খরচ কমবে। সব মিলিয়ে নিরাপদ সঞ্চয় প্রকল্পটি সরকারের একটি অসাধারণ প্রচেষ্টা। বলা দরকার, মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা এবং উৎসাহ ছাড়া এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করা সম্ভব হত না।



সাম্প্রতিককালের রাজ্য-রাজনীতির আলোয়

প্রশাসক মমতা

অমিয় চৌধুরি

অনেকদিন পরে আবার অশান্ত দার্জিলিং পাহাড় নিয়ে লিখতে বসেছি। তার আগে একটা ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে শুরু করা যাক। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চড়াই-উতরাই রাজনীতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করলে এর অনন্যতা ধরা পড়বে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইটা ছিল বহুমুখী এবং প্রায় একক।



২০১১ সালের মে মাস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেপালি ভাই-বোনের আবদার রক্ষা এবং তাদের উন্নতিকল্পে বারবার পাহাড় ছুটে গিয়েছেন।

কংগ্রেসের প্রাদেশিক রাজনীতিকারীদের সঙ্গে একদা ঘর করেও মমতা কখনও আপসের রাজনীতি করেননি। সেই বিগত ১৯৯০ সালের পর থেকেই মমতা প্রায় একক লড়াই চালিয়েছিলেন বঙ্গীয় সিপিএমের বিরুদ্ধে। অতি সুসংবদ্ধ প্রায় আধা ফ্যাসিস্ট একটা স্টালিনবাদী দল এই সময়ের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি কখনও বা আধা মস্তান দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে শারীরিকভাবে মমতাকে অকেজো করে দিতে উদ্যত হয়েছে। ওদের অর্থাৎ সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ওদের নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করেছে সর্বত্র। নির্বাচনী কৃৎ-কৌশল ৩৪ বছর ওদের ক্ষমতায় রেখে দিয়েছিল একটানা। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের অলিখিত বোঝাপড়া চলছিল সেই ৮০ দশকের শেষ দিক থেকে। নথিপত্র দিয়ে এটা প্রমাণ করা শক্ত যদিও। তবে প্রমাণ রয়ে গিয়েছে ওদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে। অতএব রাজ্য কংগ্রেস আর কী করবে। সুতরাং পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই লক্ষ্য ছিল। এমতাবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একই সঙ্গে সিপিএম আর কংগ্রেসের লড়াইয়ের জমি প্রস্তুত করতে হয়েছিল প্রায় এককভাবে। এইখানেই মমতা আপস বিরোধী এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর নেতাদের থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। ২০০১ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে বিধানসভা নির্বাচনে, সেইভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস প্রায় কিছুই করতে পারেননি। কেননা এই জোট কংগ্রেসের স্থানীয় অর্থাৎ রাজ্য নেতৃত্বের মনঃপূত ছিল না। কিন্তু জোটবদ্ধ রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা মমতা পরবর্তীকালে অস্বীকার করতে পারেননি। যেমনই হোক না, দলীয় যূথবদ্ধতা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম নামক লেভিয়েথান'-কে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না। মমতা একথা অস্বীকার না করে ২০০৬ সালের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-কাণ্ডে, ছোট রাজনৈতিক দল এবং আরও প্রায় ১৬টি সংগঠনকে একত্রিত করেছিলেন। পরোক্ষ সমর্থন দিচ্ছিল সুশীল সমাজের একটা বড় অংশ। ২০১১ সালের ২০ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এলেন। মন্ত্রী পরিষদে কংগ্রেসের



পাঁচজনকে মন্ত্রিত্বে স্থান দিলেন। প্রথম থেকেই কংগ্রেস প্রশাসনিক এবং দলীয় স্তরেও একটা অস্বস্তিতে ছিল। ওদের ধারণা ছিল, কংগ্রেসের ভোট ট্রান্সফারের দৌলতেই মমতার এত বাড়-বাড়ন্ত। গবেষকের চোখ এবং মনন কিন্তু সহজেই বুঝে যায় কংগ্রেস মমতার তৃণমূলের সঙ্গে না এলে পশ্চিমবঙ্গে ওদের স্থান বিজেপি অধিকার নেবে। ২০১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে লড়ে ওরা পায় মাত্র ১০ শতাংশ ভোট। আর তৃণমূলের সঙ্গে জোট করলে ওদের প্রাপ্ত ভোট ১৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছ'জন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়ে এবং নিজে রেল দফতরের দায়িত্বে এসে প্রভূত কাজ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রতিপদে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করে গিয়েছেন। মমতা তো ধূর্ত সিপিএমের মতো প্রথম কংগ্রেস নেতৃত্বে ইউপিএ সমর্থন করেননি। অর্থাৎ সিপিএম ক্ষমতায় থাকার লভ্যাংশ চেটেপুটে নিয়েছিল, কিন্তু কোনও দায়-দায়িত্বের অংশভাগ হয়নি। মমতা কিন্তু বেশ কিছুদিন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার দায়ও বহন করেছিলেন। শেষে তিনি অপারগ হয়ে দরিদ্র মানুষের রুজি-রোজগারের কথা মাথায় রেখে 'খুচরো' পণ্যে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেন। রাজ্য কংগ্রেসও তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের উপর অনাস্থা দেখিয়ে তাদের মন্ত্রীদের তুলে নেয়। এর পরই কংগ্রেস সর্বস্তরে তৃণমূল এবং তার মূল নেত্রীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ শানিয়ে গিয়েছে। কথাবার্তায়, বক্তৃতায় এবং টেলিভিশনের টক শোতে ক্রমাগত অকথা -কুকথায় কালযাপন করছে। কেননা ওদের তো আর কিছু করার নেই। একমাত্র হেরে যাওয়া টুকরো হয়ে যাওয়া সিপিএমকে পরোক্ষে মদত দেওয়া ছাড়া। বাবু কালচারে ১২৮ বছরের কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে বেঁচে আছে—তার বেড়ে ওঠা বাবু ছানাপোনাদের মধ্য দিয়ে। সারাদিনে তাদের যথেষ্ট কাজকর্ম না থাকায় দিবানিদ্রা শেষে আড়মোড়া ভেঙে, নিত্যনতুন পাঞ্জাবি বা অন্য পোশাক গায়ে চাপিয়ে সান্ধ্য টেলিভিশন বাসরে বসে ব্যক্তিস্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর তৃণমূল কংগ্রেসের গুষ্ঠির তুষ্টি করে ছাড়েন। কর্পোরেট গোষ্ঠীর টেলিভিশন চ্যানেল দু'টি-তিনটির দৈনিক খদ্দেরই এঁরা। আর সঙ্গীসাথি সিপিএম, কখনও বা তাদের শাগরেদ দু-একজন অন্য দলের অর্ধনেতা।

কংগ্রেস তৃণমূলের হাত ছেড়ে দিয়ে সেই পুরনো খেলা শুরু করেছে যা তারা করেছে ১৯৮২ সাল থেকে ২০০৯ সালের সংসদীয় নির্বাচনের আগে পর্যন্ত। এখন আবার কংগ্রেস সিপিএমকে রণনীতির সঙ্গী হিসাবে পেয়েছে। অর্থাৎ ২০১১ সালের পরে সিপিএম খোলস পরে শীতকালীন ঘুমে চলে গিয়েছিল। তৃণমূল আর কংগ্রেস-দ্বৈরথে আবার তাদের ঘুম ভাঙছে। এই কাজে স্থানীয় কংগ্রেসকে মদত দিচ্ছে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। কখনও সরাসরি বিরোধিতা, কখনও বা ভাতে মারার উদ্যোগ আয়োজন। আর আট মাস পরে ২০১৪ সংসদীয় নির্বাচন। কংগ্রেস এই খেলাটা খেলে যাওয়ার ঢঙেই ছিল। সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদি সামনে এসে পড়ায় কেন্দ্রীয় বিজেপি পার্টির ছন্নছাড়া ভাবটা কেটে গেলে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসকে তখন অন্য খেলা খেলতে হবে। চাই কী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একবার সোনিয়া-মনমোহনের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠতেই পারেন। তবে সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের মুখ ম্যালেরিয়ার ওষুধ খাওয়া কিঞ্চিৎ তিক্ত হয়ে হঠার সম্ভাবনা থাকছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই চরম সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াবে।

মমতা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই বুঝতে পারলেন বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে দু' লক্ষ ছয় হাজার কোটি টাকা ঋণ রেখে প্রায় দেউলিয়া করে গিয়েছে রাজ্যটিকে।

কংগ্রেস সরকার এখন তেমন 'ভারত নির্মাণ' নাম করে হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে দেশের সব প্রিন্ট এবং ভিস্যুয়াল মিডিয়াতে, যাতে মানুষের মন ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। অসংখ্য দুর্নীতি করে গিয়েছে গত ন'বছর ধরে। ঋণের দায়ে সমস্ত দেশটাকে ছন্নছাড়া, তছনছ করার কাজটি করেছে। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের কিনারায় এনে ফেলেছে। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। রফতানি অবস্থা ভয়াবহ। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যের অবনয়নের রেকর্ড। এই বিষকুম্ভ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে নেতৃত্বের বদল দরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দূরে ঠেলে দিয়ে ইউপিএ সরকার এক প্রকার দুর্বোধ্য কাজ করেছে। উদার নীতির চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে একটা সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করা যেত। হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই চেয়েছিলেন। কেননা, সাধারণ দরিদ্র এবং গ্রামীণ মানুষের নাড়ির স্পন্দন বোধহয় মমতার মতো কেউ বোঝেনি। মমতা নিজেকে 'সাবালটার্ন' দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভারতকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। আর অন্যান্য দল, এমনকী মার্কসিস্ট দলগুলো যারা নিজেদের গরিবের বন্ধু বলে সমাজকে দেখায়, তার চশমা এখন সম্পূর্ণই 'এলিটিস্ট। কংগ্রেস এটা বুঝেও বুঝতে চায়নি। নিশ্চয়ই তাদের আর্থ-সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা আছে।

মমতা এবং তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন কংগ্রেসের নেতৃত্ব ২য় ইউপিএ সরকারের ২য় বৃহত্তম শরিক হিসাবে ছিলেন, আশা করেছিলেন আর্থিকভাবে বেহাল পশ্চিমবঙ্গকে নিশ্চিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। কেননা তখন পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী হিসাবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি একটা প্রীতি মিশ্রিত নির্ভরতা ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে মমতা আট হাজার কোটি টাকার একটা আর্থিক প্যাকেজ দাবি করেছিলেন। ইচ্ছে করলে কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবিকে মেনে নিতে পারত। কিন্তু দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের গয়ংগচ্ছ মনোভাব। এটা অবশ্যই নিন্দনীয়। বিশেষ করে জেডিইউ-এর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপিকে পরিত্যাগ করার পর আগামী ২০১৪-র সংসদীয় নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে নীতীশকে ভবিষ্যৎ শরিক হিসাবে বিহারের জন্য ১২ কোটি হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার। মমতার বেলায় পশ্চিমবঙ্গের দিকে চোখ বুজে থাকা হল। ভীষণ আর্থিক অনটন সত্ত্বেও বামফ্রন্টের ঋণের বোঝা বইতে পশ্চিম সরকারকে প্রতি মাসে ২৫ হাজার কোটি টাকার সুদ গুনতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আপাতত এই ঋণ শোধের জন্য অন্তত তিন বছরের জন্য স্থগিতের আদেশ দিক। মমতা তাও পেলেন না। ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর এখন তো মমতা প্রায় শত্রুর স্থানে। এত বড় ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়েও নতুন মুখ্যমন্ত্রী গত দু'বছর চার মাস ধরে যে উন্নয়নের কাজ করেছেন এবং উন্নয়নের প্রক্রিয়া চালু রেখেছেন—তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

গ্রামোন্নয়ন হোক, সেচ ব্যবস্থা হোক, স্বাস্থ্য এমনকী নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রেও অবিরত কাজ করে চলেছেন মমতা। এখন যে কোনও নিন্দুকও যদি গ্রামেগঞ্জে ঘোরেন তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিরত জেলায় জেলায়, গ্রামান্তরে ঘোরাঘুরি করার ফল হিসাবে রাজ্যের উন্নয়নের ম্যাপটা অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। বিগত ২০১৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে পূর্বতন সিপিএম সরকার মনমতো রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, অযথা তৃণমূল সরকারের সর্বব্যাপারে এক ইগোর লড়াই চালালেন। হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে ছুটলেন। তখন তিনি রাজনৈতিক সমর্থন পেয়ে গেলেন বামফ্রন্ট, কংগ্রেস আর হারাধনের 'রইল মাত্র এক'—বিজেপির সাহায্যে কৃতার্থ হলেন। নির্বাচন চুকে গেল। প্রায় সর্বক্ষেত্রে তৃণমূল জয়ী। কংগ্রেস আর সিপিএম অল্প কিছু আসন পেল। রাজ্য নির্বাচন কমিশন বললেন, ভোটের প্রক্রিয়া মিশ্র। এই ব্যাপারে তিনি সরকারের যথেষ্ট সাহায্য আর সহযোগিতা পেয়েছেন। আর কংগ্রেস সিপিএমের গোঁ ধরে বলল, এই জয় তৃণমূলের নয়। এ জয় সন্ত্রাসের জয়। নির্বাচন কমিশনার সুষ্ঠু আর সমদর্শিতার প্রমাণ রাখতে পারেননি। এতদিন কোথায় ছিল কংগ্রেস। সিপিএমের বীভৎস সন্ত্রাসে গ্রামেগঞ্জে মানুষ যখন মৃত্যুভয়ে ভীত। কংগ্রেস নামক ১২৮ বছরের অভিজ্ঞ বৃদ্ধ তখন 'স্পিকটি নট'। যা হোক প্রচণ্ড রাজনৈতিক সদ্দিচ্ছা, জল-ঝড়ে-রোদে সর্বক্ষেত্রে অবিরত মমতার এই যে ছোটাছুটি সে শুধু মানুষের সঙ্গে মেশা এবং তাদের প্রতি ভালবাসায়। রাজনীতির ভোট প্রক্রিয়ায় দু'বছর, আড়াই বছর বড়ই কম। সুশাসন আর উন্নয়নই যখন লক্ষ্য। এর মধ্যেই প্রশাসক হিসাবে মমতা অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। আর সত্যিকারের কাজ করতে গেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামান্য কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটতেই পারে। তবু মমতা যা করেছেন এবং ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন তা অনস্বীকার্য।

প্রসঙ্গত, সেই কথা দিয়ে এবং ব্যক্তি অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক রাজ্য ও রাজনীতির কিছু ঝলক দেখে নেওয়া গেল। দার্জিলিং এবং গোর্খা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এবং প্রশাসনের ভূমিকা এসেই পড়ে। সেটা করতে গিয়ে এই সামান্য লেখাটি একটু বিস্তারিত হয়ে গেল। 'স্টেট পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া' যেখানে থাকবে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে রাজনীতির ধরন এবং চলনই মূল, সেই জাতীয় বই ভারতবর্ষে কমই লেখা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে অজস্র কাজ হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহেন্দ্র প্রসাদ, হিমাংশু রায় আর গোয়ালিচর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ পি এস চৌহান দুই খণ্ডে ভারতের ২৮টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে একটা বইয়ের সম্পাদনা করছেন। 'প্রাইমাস' বইটা ছাপছে। প্রথম খণ্ড ছাপা হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডরও ছাপার কাজ প্রায় শেষের দিকে। এই খণ্ডের শেষের দিকে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর উপর লেখার দায়িত্ব ছিল বর্তমান এই প্রবন্ধের লেখক-এর উপর। রাজ্যে রাজনীতির পট পরিবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ৩০ হাজার শব্দের লেখাটা পাঠানো হয়েছিল। সম্প্রতি আবার গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের শুরু এবং তাকে সাময়িকভাবে নির্মূল করায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া পদক্ষেপকে একটু আলোচনা করার জন্য সম্পাদক মহেন্দ্রপ্রসাদ ছাপা শুরু হওয়ার পরই, লেখাটা বর্তমান প্রেক্ষিতে দার্জিলিং-এ গোর্খা আন্দোলনকে নতুন করে, পুনরুল্লেখ করতে অনুরোধ করেন। সম্পাদক ত্রয়ী জঙ্গলমহল এবং গোর্খা আন্দোলনকে মুখ্য প্রশাসক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মুখোমুখি দাঁড়ায়ে কোমলে কঠোর সমাধান করতে এগিয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করে লেখেন। ওঁদের কথায়, মমতার এই সার্থক প্রচেষ্টা যে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীদের মমতার প্রতি 'ছদ্ম অভিভাবক সুলভ' কটুকাটব্য মন্তব্যকে দূর করতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারত পর্যবেক্ষণকারী বিদেশি মানুষজনের প্রশংসাও অর্জন করে নিয়েছে। ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যে মমতার রাজনৈতিক পদক্ষেপ জঙ্গলমহলের মাওবাদীদের হিংসাশ্রয়ী সংগ্রামকে প্রতিহত করে। কিছু কিছু মাও-নেতাকে এবং জঙ্গলমহলে তাদের সমর্থনকারী

আদিবাসীদের জাতীয় রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছেন মমতা। আজ পর্যন্ত কোনও বড় নেতা বা মুখ্যমন্ত্রী, উন্নয়নকামী সদিচ্ছা নিয়ে এতবার জঙ্গলমহলে ছুটে যাননি। মমতা এবং তাঁর উচ্চকোটির আমলাকুল কিন্তু জঙ্গলমহল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত অর্থাৎ পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত উন্নয়নের বাস্তব রূপরেখা তৈরি করেছেন। জঙ্গলমহল আজ শান্ত। বনাঞ্চলির অধিবাসীরা এখন নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের উপায় খুঁজে পেয়েছে। বনবাসীরাও এখন হিংসার কবল থেকে অনেকটাই মুক্ত। অর্থাৎ এতদিন পরে তারা বুঝতে পেরেছে দেশে সরকার নামক একটি সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র, অবহেলিত এবং নিরন্ন মানুষেরও অস্তিত্বের প্রত্যয় থাকতে পারে। মমতা এখানেই সার্থক রাজনীতিক এবং প্রশাসক।

অপরদিকে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নামক একটি 'এ্যলবাট্রাস' অথচ সিন্ধুসারসকে ঘাড়ে নিয়ে রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করতে হয় মমতাকে। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন-এর শুরু সেই ১৯৮০ দশকে থেকে। গোর্খালিগের নেতা সুভাস ঘিসিংয়ের হঠাৎ বাসনা হয়েছিল গোর্খাল্যান্ড নামক একটা সার্বভৌমিক রাষ্ট্র তিনি চান। এই ব্যাপারে প্রথমে বৈদেশিক দু-একটা রাষ্ট্র এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছেও চিঠিচাপাটি চালান। এটা অসম্ভব বুঝে পরে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গোর্খাল্যান্ড নামক একটি রাজ্য গঠন করার পরিকল্পনা করেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল গোর্খা জাতি সত্তাকে জাগিয়ে তোলা। আন্দোলন পর্বে তিনি দার্জিলিং-এর গোর্খাদের অস্মিতার লড়াই-এ শামিল করতে পেরেছিলেন। বামফ্রন্টের নেতৃত্ব থাকা বড় শরিক সিপিএম ভেবেছিল গায়ের জোর এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলন দমাবে। কিন্তু তা হয়নি। এই আন্দোলন ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। সেই অর্থে সব দেশের এবং বিশেষ করে বাঙালি ট্যুরিস্টদের কাছে তাঁদের প্রিয় শৈলশহর দার্জিলিং অগম্য হয়ে ওঠে. ক্রমশ দার্জিলিং হিলসের অর্থনীতির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। নেপাল বা চিনের কাছ থেকে পরোক্ষ সাহায্য পেয়েও সেই ধাক্কা ঘিসিং সামলাতে পারেননি। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং গোর্খা লিগ, এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দার্জিলিং পাহাড়ে আপেক্ষিক শান্তি ফেরে। গঠিত হয় দার্জিলিং গোর্খা হিলস কাউন্সিল। সর্বময় কর্তৃত্ব আসে সুবাস ঘিসিংয়ের কব্জায়। মনে হয় সিপিএম গোর্খা লিগকে খুঁচিয়ে আর ঘা বাড়াতে চায়নি। এই অর্ধ স্বশাসিত ডিজিএইচসি দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের কাছ থেকে এবং সাহায্য হিসাবে কেন্দ্রর থেকে অজস্র টাকা পেয়েছে। কিন্তু সবই চলেছে সুভাস ঘিসিং-এর মর্জিমাফিক। কোনও নির্বাচন নেই। গ্রামীণস্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কোনও লক্ষণ নেই। নেপালের রাজার মতো মিনিরাজা নেপালি ঘিসিং গোর্খা লিগ ধারণ করে যা খুশি তাই করেছেন। নিজে আত্মসাৎ করেছেন এবং সঙ্গীসাথি এই যেমন বিমল গুরুং এবং অন্যান্য কাউন্সিলরও কিছু ভাগবাঁটোয়ারা পেয়েই খুশি থাকেন। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকে ঘিসিংয়ের সঙ্গীসাথিরা ঘিসিংকে আর সহ্য করতে পারছিল না। ঘিসিং আন্দোলন বিমুখ এক সুখী মানুষ। কিন্তু বিমল গুরুংরা আরও ক্ষমতা পেতে উৎসুক হয়ে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করেন। ঘিসিং তো গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের আশা প্রায় ত্যাগই করে দিয়েছিলেন। সহকর্মীদের চাপের কাছে মাথা নুইয়ে নতুন করে গোর্খা আন্দোলন চালু করে দার্জিলিং হিলসকে ডিজিএইচসিকে সংবিধানের ষষ্ঠ শিডিউলের আওতায় আনতে দিল্লি যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর এককালের সহকর্মী বিমল গুরুং, রোশন গিরি, হরকা বাহাদুর ছেত্রীরা ঘিসিং-এর উপর আস্থা হারান। দার্জিলিং-এ আবার প্রচণ্ড অশান্তির আগুন জ্বেলে দেন গোর্খাল্যান্ড দাবি সামনে রেখে। ঘিসিং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সমতলে অর্থাৎ শিলিগুড়ি এসে ঘিসিং সাহেবের দার্জিলিং পাহাড়ে ওঠার পথ বন্ধ করে দেন। এ সব ২০০৭ সালের কথা। দার্জিলিং-এ নেতা হয়ে ওঠেন বিমল গুরুং এবং তাঁর সহকারী রোশন গিরি। গঠন করেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। আবার তাঁদের দাবি গোর্খাল্যান্ড স্টেট। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ২০০৯ সালে ওরা মনে করেছিল গোর্খাল্যান্ড-এর দাবি বিজেপি সমর্থন করবে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ২০০৭ সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত পাহাড়ে স্থানীয় স্তরে কোনওরকম নির্বাচন বিমল গুরুংরা করতে দেননি। তাঁরা বারবার দিল্লি ছুটেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেলমন্ত্রী এবং তৃণমূল, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ। তবে প্রথম থেকেই মমতা এই অযৌক্তিক গোর্খাল্যান্ড দাবি পূরণ করে বাংলাকে ভাগ করার পক্ষে ছিলেন না। সর্বত্র এবং বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের নেপালি গোর্খাদের বুঝিয়েছেন পশ্চিমবাংলা থেকে বেরিয়ে নিয়ে গোর্খাল্যান্ড স্বতন্ত্র রাজ্য হতে পারে না। তাই নানারকম যুক্তি সাজিয়ে গোর্খা-নেতাদের আলোচনার দ্বারা একটা সমাধানে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারকেও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ গঠন করান এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে। এ চুক্তিটা দার্জিলিং গোর্খা হিলস কাউন্সিলের থেকে অনেকটা ভিন্ন। নেতৃত্বের অস্মিতা বজায় রাখার জন্য গোর্খা নেতাদের দাবি এই গোর্খাল্যান্ড এই শব্দটা চুক্তিতে স্বীকার করে নেন। এই স্বীকৃতিতে সিপিএমের হারানো জমি উদ্ধারের একটা পথ খোলা হল। সিপিএম দাবি করল ডিজিএইচসি-র চেয়ে এই চুক্তি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ক্ষতিকারক। কেননা গোর্খাল্যান্ড থেকেই ভবিষ্যতে গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের পত্তন হয়ে যাবে। দার্জিলিংয়ের মতো মনোরম একটা শৈলশহর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাবে। খুব সূক্ষ্মভাবে দেখলে এটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভবিষ্যতে এই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে একটু খুঁচিয়ে দেওয়া যে, তাদের আসল দাবির পক্ষে জিটিএ চুক্তির স্বাক্ষর গোর্খাল্যান্ড স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের প্রথম ধাপ। বিমল গুরুংরা ঠিক এই সুরটা ধরে ফেলেই সামনের দিকে এগোন। চুক্তি স্বাক্ষর করার দিনের ঠারেঠোরে এই কথা বলারও চেষ্টা হয়েছে। আর চুক্তির স্বাক্ষরকারী বিমল গুরুং নন। তাঁর দলের সচিব রোশন গিরি। ১৯৮৮ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি কিন্তু সই করেছিলেন সুবাস ঘিসিং।

বিচ্ছিন্নতাকারী গোর্খা রাজনীতির কোনও ক্ষেত্রেই কিন্তু সিপিএম বা বামফ্রন্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই একত্রীকরণের রাজনীতিতে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করেনি।

২০১১ সালের মে মাস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেপালি ভাই-বোনের আবদার রক্ষা এবং তাদের উন্নতিকল্পে বারবার পাহাড় ছুটে গিয়েছেন। পাহাড়ে সর্ববিধ উন্নয়নকল্পে বারবার দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং কালিম্পঙেও ছুটে গিয়েছেন। পর্যটন শিল্পের বান ডাকিয়েছেন। নতুন নতুন ট্যুরিস্ট বাংলো পত্তন করেছেন। বর্ষায় ঝড়ে ভেঙে পড়া সেতু পুনর্নির্মাণ করেছেন। আর দফায় দফায় জিটিএর বিমল গুরুং-সহ নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে সভা করেছেন। জিটিএকে কীভাবে আরও কার্যকরী করা যায়, পাহাড়গুলোকে কীভাবে সমস্যামুক্ত করা যায় তার রূপরেখা তৈরি করেছেন। পাহাড়ে দরিদ্র খেটে



খাওয়া মানুষদের জন্য খাদ্য, পানীয়, সড়ক, বিজলি অর্থাৎ এক কথায় তাদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে মমতা যখন অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, বিমল গুরুংরা তখন অন্য পথে হাঁটা শুরু করেছেন। দার্জিলিং-এ শেষ প্রশাসনিক বৈঠকে শুনতে হচ্ছে বিমলদের শেখানো বুলি—আমরা স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্য চাই। বিমল গুরুং তখন মঞ্চে। সামনের জনতার উদ্দেশে তাঁকে একটা কথাও বলতে শোনা যায়নি। মমতা এখন অনুত্তেজিত গলায় বলেছেন—আমরা প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা, উন্নয়নের কথা বলছি। এখানে রাজনীতির কথা নয়। কেননা সেই ক্ষেত্রে আমিও যথেষ্ট 'রাফ অ্যান্ড টাফ' হতে পারি।

মমতার এই ধমকানিটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা। প্রশাসন, হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট কোনও কথার তোয়াক্কা না করে গুরুং জনবিরোধী, আইন বিরোধী বন্ধ, হরতাল ইত্যাদি করতে পাহাড়ের মানুষকে বাধ্য করছেন। এই সব দেখেশুনেই মমতা 'লেপচা উন্নয়ন পরিষদ' গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। পাহাড়ে নেপালিরা যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও লেপচা, লিম্বু, তামাং, ভুটিয়াদের অস্তিত্ব দার্জিলিং পাহাড় অগ্রাহ্য করতে পারে না। আসলে পাহাড়ে লেপচা সম্প্রদায়ই তো ভূমিপুত্র। ১৮৩৫ সালে সিকিমের চোগিয়ালরাজ, বছরে ছ'হাজার টাকার খাজনায় ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছিল। তার কিছুদিন পর থেকেই বহু নেপালি সিকিম থেকে বিতাড়িত হয়। ব্রিটিশ কোম্পানি তার চা-বাগান এবং তার সঙ্গে যুক্ত কিছু শিল্পের জন্য সস্তা শ্রমিকের সন্ধানে বহু নেপালিকে দার্জিলিং পাহাড়ে স্থান দিতে শুরু করে। এই অর্থে নেপালি সম্প্রদায় সে পাহাড়েই হোক আর সমতলে, বিদেশিই বটে। ভারতবর্ষের মতো সমন্বয়কারী এবং সহিষ্ণু দেশে তাই সব জাতিধর্মের মানুষের স্থান হয়। বিমল গুরুংদের বাড়াবাড়ির জন্য পাহাড়ের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ বিরক্ত। সাধারণ নেপালি পরিবার যাদের রুজি-রোজগারে টান পড়ছে, তারা ভয়ে কিছু না বললেও, জনমুক্তি মোর্চার বিরোধী হয়ে উঠছে।

সমতলে ওদের তেমন সমর্থক নেই। এই সব দেখেশুনেই বিমল গুরুংরা সুর নরম করে বন্ধ—সে যে কোনও ধরনেরই হোক আপাতত পুজোর মরশুম শেষ না হওয়া অবধি স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। ওরা বলছে, অক্টোবরের ২০ তারিখের পর ওরা আবার বন্ধ রাজনীতিতে ফিরে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর নরম-গরম সুর ওদের থমকে দিয়েছে। অস্ত্র ব্যবহার না করে, অহিংস পদ্ধতিতে মমতার এই চমকানি কিছুটা হলেও কর্যকর হয়েছে। শেষে আর একটা প্রশ্নেও গুরুংরা পিছু হটছেন। সুবাস ঘিসিং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পাওয়া অঢেল টাকায় নবাবি করেছেন উন্নয়নমূলক কোনও কাজ না করে। কিন্তু গুরুং, রোশনরা এত টাকা পাচ্ছেন কোথা থেকে। পাহাড়ের সাধারণ লোকের তুলনায় ওঁদের জীবনযাত্রার মান চমকে দেওয়ার মতো। ওঁরা ধনী থেকে ধনীতর হচ্ছেন আর সাধারণ মানুষকে ওঁদের হুকুম বরদারি করে দারিদ্রের অন্ধকারে কাল কাটাতে হচ্ছে। এই দেখেশুনে গোর্খা জনমুক্তির ভিতরেও তলে তলে এক অন্য সুর শোনা যাচ্ছে। অপরদিকে সুবাস ঘিসিংয়ের তাঁর ক্ষয়ে যাওয়া গোর্খা জাতি লিবারেশন ফ্রন্টও তলে তলে শক্তি সঞ্চয় করছে। এই সবই কিন্তু একদিন বিমল গুরুংদের বিপক্ষে কাজ করবে। একজন প্রশাসক হিসাবে মমতাকে সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে। আর তৃণমূল কংগ্রেসকে পাহাড়ে যতটা সম্ভব পাখা মেলতে হবে, সংহত হতে হবে। কোনও মানুষই আর দ্বিতীয়বার বাংলা ভাগ দেখতে রাজি নয়।



সকল রকমে কাঙাল করেছ...

মাত্র পঁয়তাল্লিশেই চলে গিয়েছেন রজনীকান্ত সেন। ১৩১৭-র সে শরতে কালো হয়ে গিয়েছিল বাংলার আকাশ। তাঁর গান শিরোধার্য করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আগামী বছর তাঁর সার্ধশত জন্মবর্ষের সূচনা। লিখছেন

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

যন্ত্রণা আর ধারাবাহিক কষ্ট যাপনই কি অনিবার্য সঙ্গী মহৎ প্রতিভাধরদের? বিশ্বজুড়ে তাঁদের জেগে থাকার পাশ-বরাবর ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এমন ইঙ্গিতও। আমাদের মধুসূদন থেকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে ইঙ্গিতকে অমোঘ করে তোলেন। আরও আগে কবিকঙ্কণের বিপর্যয়গ্রস্ত অবস্থাও বা ভুলি কী করে! হেমচন্দ্র শেষ জীবনে অন্ধ, নজরুল স্থবির। কিন্তু রজনীকান্ত সেন? তাঁর কালো হয়ে আসা জীবনপথ জুড়ে এত তীব্র দহন, এমন গভীর অসহায়তা, এত কষ্ট জমাট হয়ে আছে যা আজও আমাদের অস্থির করে তোলে। জীবনের শেষ দু'বছর রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশায় তাঁর পাগলের মতো ছোটাছুটি—অ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিও, কবিরাজি, দৈব ওষধি, সন্ন্যাসী-সঙ্গ, দৈবশরণ, ফের অ্যালোপ্যাথে ফিরে আসা পুরনো সাহিত্যের পাপভ্রষ্ট পুরুষের অসহায় আর্তনাদের মতো। কণ্ঠের যে সপ্তসুর মূর্ছনা তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল, সে-সুর হঠাৎ এমন স্তব্ধ হয়ে যাবে, চলন-ক্ষম শরীর নিয়েও তিনি আর গান গাইতে পারবেন না—এমনটা কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিলেন?

অথচ, কী আশ্চর্য তাঁর প্রতিক্রিয়া—"তবু যা হোক, যে লোকটা 'লেখা' আবিষ্কার করেছিল, তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। নইলে আমার দশা কি হ'ত? এই ইশারা বোঝে না, আর রেগে মেগে মারতে যাই আর কি! 'লেখা' টা যেমন Perfect তেমন কিছু হতে পারে না, কারণ ইশারাকে infinite না করলে infi-

nite কি করে বুঝাতে? কিন্তু লেখাতে অসীমকে সসীমের মধ্যে এনে ফেলা গেছে।" রজনীকান্তের এ মন্তব্য লেখা হচ্ছে সাদা কাগজে উড পেন্সিল দিয়ে। ১৩১৬-র ২ ফাল্গুন যখন তিনি একথা লিখছেন, তখন হাসপাতালে। তিনদিন আগে ২৮ মাঘ তাঁর গলায় অস্ত্রোপচার হয়েছে। 'ট্র্যাকিউটমি' নামে সেই অস্ত্রোপচারে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ছিদ্র করে দেওয়া হল। এই অপারেশনে তাঁর প্রাণ বাঁচল বটে কিন্তু বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল চিরতরে।

রজনীকান্ত জানতেন তাঁর ল্যারিংসে ক্যানসার। জানতেন বাক্‌শক্তি ফিরে আসা অসম্ভব। তবু কী নির্লিপ্ত তাঁর অনুভব! এরপর আরও সাত মাস তাঁর যাপন নির্দিষ্ট থাকবে মেডিক্যাল কলেজের ১২ নম্বর কটেজে। আর কথা বলতে পারবেন না কোনওদিন, আসবে না সুরও। হাসপাতালের রোজনামচায় লিখছেন—'মনে রেখো, আর বুঝি পাড়ি দিতে পারলাম না। আজকার রাত্রি একটু আশঙ্কা লাগছে। আমাকে নেবে নেবে লাগে। এই সুখের হাট ভেঙে দিলাম রে ভাই।....ভগবান, আমার তো শারীরিক কষ্ট। আমার আত্মা তো কষ্টমুক্ত। দেহ মুক্ত হলেই আত্মা কষ্টমুক্ত হবে। তবে আত্মাকে দেহমুক্ত কর দয়াল, আর দেহ চাই না।...'

রজনীকান্ত-র জীবনীকার নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত হাসপাতালের যে রোজনামচা সাজিয়ে দিয়েছেন, সেখানে ছড়িয়ে আছেন ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ এক ভক্ত রজনীকান্ত। যিনি বারবার বলেন, 'বিশ্বাস হারালে তো একেবারেই সংসার শূন্য হয়, কোনও আশ্রয়, কোনও অবলম্বন থাকে না। যা আভাস পাওয়া গিয়েছে, তা যদি ভগবৎ-প্রেরিত পূর্বাভাস হয়, তবে আমাকে কেউ রাখতে পারবে না।'

শৈশব বড় আনন্দে কেটেছিল রজনীকান্তের। ১২৭২-এর ১২ শ্রাবণ (২৬ জুলাই ১৮১৫) তাঁর জন্ম। বাবা গুরুপ্রসাদ এবং জ্যাঠা গোবিন্দনাথ আইন ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁদের দান-ধ্যানও ছিল অপরিসীম। গুরুপ্রসাদের যেমন ছিল গানের গলা, তেমন কবিতার হাত। পদাবলি কীর্তন গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে যেতেন তিনি। বালক রজনী মোহিত হয়ে বাবাকে দেখতেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের ভাঙাবাড়ি গ্রামে। মাতুলালয় ছিল সিরাজগঞ্জেরই বাগবাটি গ্রামে। মামা পঞ্চানন সেনও কবিতা রচনা করতেন। আর মা মনোমোহিনীদেবী ছিলেন বাংলা কাব্যের নিবিড় পাঠক। হেমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন মনোমোহিনী। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পাঠ রজনীকান্ত পেয়েছিলেন মায়ের কাছেই। রামায়ণ, মহাভারত, সীতার বনবাস, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী প্রায় মুখে মুখে বলে যেতে পারতেন তিনি। মা-র কাছে এসবের পাঠ নেওয়ার পাশাপাশি আশ্চর্য স্মৃতিশক্তিও পেয়েছিলেন বালক রজনীকান্ত। তাঁর ছাত্রজীবন শুরু হয় বোয়ালিয়া জেলা স্কুলে, পরে রাজশাহি কলেজিয়েট স্কুল। তখন থেকেই তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে কবিতা লেখেন। লেখেন ব্যঙ্গ কবিতাও। আর তাঁর নিত্যসঙ্গী একটি বাঁশি। সেখানে নিজেই সুর তোলেন। কখনও কণ্ঠ ছেড়ে ধরেন গান। অসম্ভব স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় পড়াশোনায় বেশি সময় ব্যয় না করেও তিনি ক্লাসে সকলের সেরা ছিলেন। পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যায় তাঁর আকর্ষণ ছিল। আর ছিল অভিনয় প্রীতি।



রজনীকান্ত জানতেন তাঁর ল্যারিংসে ক্যানসার। জানতেন বাক্‌শক্তি ফিরে আসা অসম্ভব। তবু কী নির্লিপ্ত তাঁর অনুভব! এরপর আরও সাত মাস তাঁর যাপন নির্দিষ্ট থাকবে মেডিক্যাল কলেজের ১২ নম্বর কটেজে। আর কথা বলতে পারবেন না কোনওদিন, আসবে না সুরও।

এমন সাজানো শৈশব বিপর্যয়ের মুখে পড়ল হঠাৎই, ১২৮৪ (১৮৭৮) বঙ্গাব্দে। রজনীকান্ত তখন বছর বারোর কিশোর। ওই বছর হঠাৎই মৃত্যু হল জ্যাঠতুতো দাদা বরদাগোবিন্দের। জ্যাঠা-বাবা অবসরের পর গোবিন্দনাথের প্রথম দুই পুত্র বরদাগোবিন্দ এবং কালীকুমারই ছিলেন সেন পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ। আইন ব্যবসায় তাঁরাও সফল ছিলেন। কিন্তু একদিন কলেরায় বরদাগোবিন্দ আকস্মিক চলে গেলেন। দাদার অকাল মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন কালীকুমার। হঠাৎই কালো হয়ে গেল রজনীকান্তের মাথার উপরের আকাশটা। কালীকুমারের কাছেই রজনী পড়াশোনা করতেন। কালীকুমারই তাঁকে হাতেকলমে কাব্য রচনা লিখিয়েছিলেন। কাব্যগুরুর প্রয়াণে আঁধার নামল কিশোর রজনীর বুকে। কয়েক মাসের মধ্যে প্লীহা রোগে মৃত্যু হল বরদাগোবিন্দর ছেলে কালীপদর। আর রজনীকান্তের সহোদর জানকীকান্তও প্রয়াত হলেন কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগে। মৃত্যু মিছিলে ভাঙাবাড়ির সেনবাড়ির জৌলুস কুঁকড়ে গেল কয়েক মাসের মধ্যেই। একদিকে দারিদ্র, অন্যদিকে শোক পেরিয়ে পেরিয়ে তবু রজনীকান্ত জেগে থাকলেন। শোক ভেঙে তৈরি করলেন সুর। চলতে লাগল কাব্যচর্চা।

প্রথম কৈশোরেই এতগুলো মৃত্যু কি তাঁকে আরও বেশি ঈশ্বর-বিশ্বাসী করে তুলল? মনের ভার কাটাতে রজনীকান্ত তখন ব্যঙ্গ কবিতাও লিখছেন। কবিতাগুলির লক্ষ্য শিক্ষকরা। রাজশাহি কলেজিয়েট স্কুলে তখন প্রধান শিক্ষক কালীকুমার দাস। ব্যাকরণে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও তিনি ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন না। রজনীকান্ত একটি সংস্কৃত কবিতায় লিখেছেন—

'ব্যাকরণে মহাবিদ্যা 'ব্যা-ব্যা-করণতৎপর।
কস্মিংশ্চিদ্ যদি বা কালে ক্রিয়তেহসৌ সভাপতিঃ।
সমারোহং সমালোক্য 'চরকিমাতং' প্রজায়তে।'

অর্থাৎ, ব্যাকরণে মহাবিদ্যা তিনি, কেবল 'ব্যা ব্যা' করা স্বভাব। কোনও সভায় তিনি সভাপতি হলে জনসমাগম দেখলে তাঁর 'চরকিমাত' (ভয়) হয়।

কিংবা, রাজশাহি কলেজের অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড সাহেবের কেরানি বিনোদবিহারী সেন ইংরেজি জানতেন না, তবু সব সময় তাঁর মুখে ইংরেজি বোল দেখে রজনীকান্ত লিখেছেন—

'বিদ্যারম্ভা বুদ্ধিরম্ভা ইংলিশঃ সর্বদা মুখে।'

১২৯১-এ কলকাতায় সিটি কলেজ থেকে এফএ পাস করেন রজনীকান্ত। ১২৯৫-এ বিএ। ১২৯২ মৃত্যু হল পিতা গুরুপ্রসাদের। আবার

শোক। গ্রামে ফিরে গেলেন রজনী। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে বিএল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজশাহিতে ওকালতি শুরু করেন তিনি। ১২৯৭-এর ভাদ্র মাসে সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশ পায় 'আশালতা' নামে একটি পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন কুঞ্জবিহারী দে। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রজনীকান্তের 'আশা' নামে একটি কবিতা ছিল। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, তাঁর 'কান্তকবি রজনীকান্ত' বইয়ে।

কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে—

'এখনো বল গো একবার!
নরকের ইতিহাস,
দুষ্কৃতির চিরদাস,
মলিন পঙ্কিল এই জীবন আমার—
আমারও কি আশা আছে বল একবার।'...

১৩০৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রাজশাহি থেকে প্রকাশিত 'উৎসাহ' নামে আর একটি মাসিক পত্রে তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশের কথা জানাচ্ছেন প্রমথনাথ বিশী মহাশয়, কান্তকবি রচনাসম্ভারের ভূমিকায়।

ততদিনে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে রজনীকান্তের। ১২৯০-র ৪ জ্যৈষ্ঠ তাঁর বিবাহ হয় মানিকগঞ্জের তারকনাথ সেনের কন্যা হিরন্ময়ীদেবীর সঙ্গে। কবিতা লেখার সূচনা হয়েছিল কবে, তা আর জানা যায় না। কারণ তিনি কবিতা লিখে চট করে প্রকাশ করতে চাইতেন না। ওকালতি করতেন বটে, তাতে তাঁর সুবিপুল আগ্রহ ছিল না। গান আর কবিতাই ছিল প্রাণ। এ সম্পর্কে কুমার শরৎকুমার রায়কে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালোবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম, আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল। সুতরাং আইনের ব্যবসায় আমাকে সাময়িক উদারন্ন দিয়াছে, কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য অর্থ দেয় নাই।' হাসপাতাল থেকে এ চিঠি লিখছেন রজনীকান্ত, মৃত্যুর কিছুদিন আগে। কুমার শরৎকুমার, মহারাজা মণীন্দ্রনাথ নন্দী তাঁকে নানাভাবে অর্থসাহায্য করেছেন। শরৎকুমারকেই তিনি তাঁর 'অমৃত' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। 'অমৃত' রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র আদর্শে লেখা। হাসপাতালে শুয়ে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। তাঁর প্রথম বই 'বাণী' প্রকাশিত হয় ১৯০২-এ। দ্বিতীয় বই 'কল্যাণী' বছর তিনেকের মাথায়। রজনীকান্তের সাহিত্যসৃষ্টি তেমন বিপুল নয়। সবই পদ্যে। 'বাণী', 'কল্যাণী' ছাড়া তাঁর অন্য গ্রন্থগুলি হল, 'অমৃত' (১৯১০), 'আনন্দময়ী' (১৯১০), 'বিশ্রাম' (১৯১০) 'অভয়া' (১৯১০) 'সদ্ভাব-কুসুম' (১৯১৩) এবং শেষদান (১৯২৭)। 'অমৃত' পরবর্তী গ্রন্থগুলি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত।



রজনীকান্ত সেদিন সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, তাঁর 'অমৃত' রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র আদলেই লেখা। এ কাজ করে তিনি নিজে গর্ববোধ করেন। কোন সমালোচক কী বলল, তাঁর যায় আসে না। এমন গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তাঁরও বুকে। তিনি গান বাঁধলেন—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।'

—তাঁর গানে জেগে উঠল বিপ্লবী মন, সাধারণ মানুষও প্রভাবিত হল কথা-সুরের দ্যোতনায়। ইতিমধ্যে খবর এল পূর্ববঙ্গে নিষিদ্ধ হতে চলেছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বন্দেমাতরম গাওয়া। কান্ত কবি লিখলেন—

'মা বলে ভাই ডাকলে মাকে, ধরবে টিপে গলা,
তবে কি ভাই বাংলা হতে উঠবে রে 'মা' বলা?'

দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলতে দ্বিধাহীন ছিল তাঁর কণ্ঠ ও কলম—

'আর, কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা, প্রেমেরই গঙ্গা ব'ক,
মায়েরই রাজ্যে, মায়েরই কার্যে, ফুটেছে আজ যে চোখ।'

অথচ ইতিহাস বলবে, এমন উদ্দীপ্ত উচ্চারণের পাশে গভীর হৃদয় মন্থনের নিবিড় যাপন কথা। তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ চলে গেল অকালে। শোক ভুলতে তৈরি হল গান, যা বেদনার্ত আচ্ছন্ন করে দেয় শ্রোতাকে—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।'

এই অনুভবই সম্ভবত আরও গভীর গতি পেয়ে তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারে—

'আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছ,
গর্ব করিতে চুর।'-এর মতো গান।
যেখানে যুক্ত হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের অনুষঙ্গ।

বাবা গুরুপ্রসাদ ছিলেন বৈষ্ণবভক্ত। জ্যাঠা শক্তির সাধক। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে আধ্যাত্মিক পরিবেশে বড় হয়েছেন রজনীকান্ত। আর জীবনের শেষ পর্বে নিজেকে কার্যত সঁপে দিয়েছিলেন ঈশ্বরের পায়ে। পুত্র যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে শেষ শয্যায়, অশীতিপর মা ছুটে গিয়েছেন তারকেশ্বরে হত্যে দিতে। ছেলে ভেবেছে, এবার বুঝি একটা উপায় হবে। ঈশ্বর দেখবেন। আর চরম মুহূর্ত উপস্থিত জেনে ভেবেছেন পরমেশ্বরের কাছে যাচ্ছেন, সেখানেই শান্তি।

মৃত্যুর তিন মাস আগে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১২ নম্বর কটেজে। সেদিন ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শরীর কেমন আছে? উত্তরে সেই কাগজ পেন্সিলে রজনীকান্ত লিখলেন— "আমি যখন বুঝলাম যে, এই উৎকট ব্যথা Penal code নয়, এ কেবল আগুনে ফেলে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্চে, আমাকে কোলে নেবে বলে, তখন বুঝলাম প্রেম। তারপর সব সইচি। একবার দেখতে বড় সাধ ছিল, (রবীন্দ্রনাথকে) নইলে

হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হত—সে দেখা আমার হল। এখন বলুন, 'শিবা মে পন্থানঃ সন্তু'!"

বড় হৃদয় বিদারক সে সাক্ষাৎপর্ব। বাকশক্তি নেই সুকণ্ঠীর। তাঁর সামনে বিশ্বকবি। এসেছেন সুজন সাক্ষাতে। রজনীকান্ত জানালেন—

"আর একবার যদি দয়াল কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রানী' আপনার কাছে একবার অভিনয় করে দেখাতেম। আমি রাজার অভিনয় করেছি। অমন কাব্য, অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পাট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে। আমার মাথা যেমন ছিল, তেমনি আছে—... 'কণিকা'র আদর্শে 'অমৃত' লিখেছি। লিখে ধন্য হয়েছি।" রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসেছেন রজনীকান্তের কাছে, অথচ তাঁকে গান শোনাতে পারবেন না কান্তকবি? ইঙ্গিতে তিনি কন্যা শান্তিবালা ও পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথকে গান শোনাতে বলেন। গান শুরু হল—

'বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙে না, হায়,
অবোধ জীবনপথযাত্রি।....'

এগানে কি রজনীকান্ত মিলিয়ে দিতে চাইছিলেন ব্যক্তি আমিকে?

ফিরে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। বিষাদ নিয়ে। সেই বিকেলেই রজনীকান্ত রচনা করলেন 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে চুর' গানটি। এবং বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের কাছে তা পাঠিয়ে দেওয়া হল। পক্ষকাল পরে এল রবীন্দ্রনাথের উত্তর—'সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনওমতে বন্দি করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম।... ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন আজ আপনার জীবনসংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষাসংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।'

রবীন্দ্রনাথের এ চিঠি লেখা হচ্ছে ১৬ আষাঢ়, ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। এরপর রজনীকান্ত জীবিত ছিলেন কমবেশি দু'মাস। ২৮ ভাদ্র যখন চলে যাচ্ছেন সব অভিমান, গ্লানি আর স্বরহীন কণ্ঠ নিয়ে, কলকাতায় তখন রাত নেমেছে। ক্রমশ গভীর হবে রাত। কলকাতার বাতাস ভারী হয়ে ছড়াতে থাকবে আনুভূমিক অনুভবে। জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'অমৃত' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে রজনীকান্ত জানিয়েছিলেন, 'কণিকা'-র আদর্শে 'অমৃত' লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র কথা আমরা জানি। ধরুন, তাঁর 'সত্যের আবিষ্কার' কবিতাটি—

'কহিলেন বসুন্ধরা, দিনের আলোকে
আমি ছাড়া আর কিছু পড়িত না চোখে,
রাত্রে আমি লুপ্ত যবে শূন্যে দিল দেখা
অনন্ত এ জগতের জ্যোতির্ময়ী লেখা।'

রজনীকান্ত 'অমৃত'-র 'উপযুক্ত মাত্রা' কবিতায় লিখছেন—

"বায়ু কহে, 'দীপ, তব আমিই সম্বল,'
দীপ বলে, 'যতক্ষণ না হও প্রবল।'
বৃষ্টি বলে, 'শস্য, আমি তোমার সহায়',
শস্য বলে, 'অতিরিক্ত হ'লে প্রাণ যায়।"

'ক্রোধ ও লোভ' কবিতায় রজনীকান্ত লিখেছেন—

"ক্রোধ বলে, 'লোভ ভাই, তুমি বড় খল,
তোমার কুহকে পড়ি নিষ্ঠুরের দল,
পরের মাথায় করি লগুড় প্রহার,...

লোভ কহে, 'যা' বলিলে করি তা স্বীকার,
কিন্তু তুমি পূর্ণরূপে স্কন্ধে চাপ যার,
সে শুধু অন্যের মারি ক্ষান্ত নাহি হয়,
নিজের মাথায় শেষে প্রহরে নিশ্চয়।"

'কণিকা'-র 'যথার্থ আপন' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান
বাঁশের মাচাটি তার পুষ্পক বিমান।
ভুলেও মাটির পানে তাকায় না তাই,
চন্দ্র সূর্য তারকারে করে ভাই ভাই।...'

রজনীকান্ত সেদিন সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, তাঁর 'অমৃত' রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র আদলেই লেখা। এ কাজ করে তিনি নিজে গর্ববোধ করেন। কোন সমালোচক কী বলল, তাঁর যায় আসে না। এমন গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

বন্ধুদের অনুরোধে আত্মজীবনী 'আমার জীবন' রচনায় হাত দিয়েছিলেন রজনীকান্ত, মৃত্যুর এক মাস আগে। অসমাপ্ত সেই আত্মজীবনীর 'নিবেদন' অংশে লিখেছিলেন— 'ডায়েরি না থাকায়, আমার জীবনীর অনেক স্থানে অসম্পূর্ণতা, অঙ্গহীনতা ও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যাহার সন বা তারিখ না পাইলে পাঠকগণের মনে কোনও অভাববোধের সঞ্চার হইতে পারে। এ জীবনে কোনও পানিপথের যুদ্ধ বা চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের মতো বিশিষ্ট ঘটনার সমাবেশ হয় নাই, যাহাতে জনমণ্ডলী স্তম্ভিত ও চকিত হইয়া মুগ্ধচিত্তে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিতে পারে। অথবা কোনও জীবনীসংগ্রাহক কোনও আখ্যানাংশ বিশেষের সময় বা স্থান নির্ধারণের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যগ্র বা উৎসুক হইতে পারেন।' মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১২ নম্বর কটেজ থেকে লেখা এই 'নিবেদন' কি এক অভিমানী কবিকে চিনিয়ে দেয় না? সমসময়ে বিপুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি যিনি ক্রমশ দারিদ্রে ডুবে গিয়েছেন। যাঁকে শেষ পর্যন্ত হাত পাততে হয়েছে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও চিকিৎসার জন্য! আক্ষরিক অর্থেও হতে হয়েছে সকল রকমে কাঙাল।

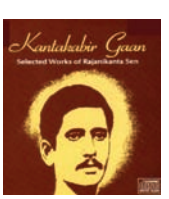



মশাল হাতে সিংহপুরুষ

ছেলেটির পোশাক-আশাক দেখে এতটুকু বোঝার উপায় নেই। এমন সাদামাটা। পরনে আটহাতি ধুতি। ধুতির কষি আলগা করে বাঁধা। গায়ে হাফহাতা ফতুয়া। নগ্ন দুটি পা। লিখছেন

জহর মুখোপাধ্যায়

খর্বাকৃতি ছেলেটির দেহের তুলনায় মাথাটি বড়। প্রশস্ত ললাট। শরীরে কোথাও মেদের ওঠানামা নেই। আর গায়ের রং না বললেও চলে। অভাব-অনটনে এতই দীর্ণ-শ্রীছাদহীন। দুর্দশাগ্রস্ত সংসারে আটপ্রহর টানাপোড়েনে জর্জরিত মানুষের আখ্যানে ভরা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ এক যুবক। তখনও পণ্ডিত অথবা বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হননি। বেশ কিছুদিন আগে, ১৮২৮ নভেম্বর। পাঁজি-পুঁথি দেখে ঠাকুরদাস কালীকান্ত আনন্দরাম বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। ভিটেমাটি পেছনে রেখে জরাজীর্ণ অতীত থেকে ভবিষ্যতের পানে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন। পথে যানবাহন তো দূরের কথা। ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভরা। আরণ্যকের বিচিত্র শব্দে হৃৎপিণ্ডে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। মানুষজনের ঠিকানা তেমন একটা নেই। ঢিমেতালে বয়ে চলা অলস-অকর্মণ্য এক জীবনপ্রবাহের পাশ দিয়ে কলকাতা সবেমাত্র আড়মোড়া ভাঙছে।

পিতৃবন্ধু ভাগবতচরণ সিংহের বাড়িতে মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেও স্বাধীন দৃঢ়চেতা ঠাকুরদাস অন্নবস্ত্রের সন্ধানে কাজকর্মের চেষ্টা করলেন। ভাগবত অবশ্য তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর ছেলে জগৎদুর্লভ ও মেয়ে রাইমণি ভাগ্যান্বেষী এই অতিথি দু'জনকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় গ্রহণ করলেন। বড়বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী রায়দুর্লভের একমাত্র বোন রাইমণি অল্প বয়েস থেকেই বিধবা। অকালপ্রয়াত স্বামীর স্মৃতিভারে জর্জরিত হয়ে অনেকটা যেন ভগ্ন হৃদয়ে টেনে হেঁচড়ে নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বয়ে নিয়ে চলেছেন। বালক বিদ্যাসাগরকে কাছে পেয়ে সন্তানবৎ স্নেহবাৎসল্য উজাড় করে দিয়ে প্রায় শূন্যঘর সংসারে অনেকটা যেন আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেলেন। জীবনযাপনে নিভু তাপ উসকে উঠল।

গ্রাম্য পাঠশালার গণ্ডি পার হয়ে উচ্চশিক্ষার দরজার সামনে এসে ঈশ্বরের কপালে ভাঁজ পড়ল, ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটা গ্রহণ করবে কী ভাবে! চোখের সামনে দেখছে, ইংরেজি — না সংস্কৃত? জীবন দরিয়ায় ঢেউ তুলে হাতের নাগলে কূল খুঁজে পাওয়ার নিশান হবে কোন শিক্ষা? উপনিবেশিক শক্তি যে ভাবে জাল বিস্তার করে চলেছে, শেষ কোথায়? দেশটাকে নতুন নতুন ভাবনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। ১৮২৩ সালে এলফিন স্টোন ইংরেজি ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। সেই ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিজ্ঞান এবং অগ্রগতির পথ ধরে ইউরোপ দেশটাই বদলে যেতে শুরু করেছে। উন্নত ধরনের শিক্ষা এবং বোধবুদ্ধির আলোকে পুরো দেশটাই দিন বদলের আস্বাদন পেয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। মানুষের চিন্তাভাবনা জীবনযাপনে নব দিগন্তের দরজা খুলে গিয়েছে চারদিকে। ঠিক একইভাবে এখানেও মিশনারি সম্প্রদায়, আলেকজান্ডার ডাফ ও পরোপকারী ডেভিড হেয়ারের মতো হিতৈষী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার সলতে পাকানো শুরু হল। পাশাপাশি প্রাচ্যশিক্ষার জ্বলন্ত বাতিটাকে



গ্রাম্য পাঠশালার গণ্ডি পার হয়ে উচ্চশিক্ষার দরজার সামনে এসে ঈশ্বরের কপালে ভাঁজ পড়ল, ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটা গ্রহণ করবে কী ভাবে! চোখের সামনে দেখছে, ইংরেজি — না সংস্কৃত? জীবন দরিয়ায় ঢেউ তুলে হাতের নাগলে কূল খুঁজে পাওয়ার নিশান হবে কোন শিক্ষা? উপনিবেশিক শক্তি যে ভাবে জাল বিস্তার করে চলেছে, শেষ কোথায়? দেশটাকে নতুন নতুন ভাবনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। ১৮২৩ সালে এলফিন স্টোন ইংরেজি ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন।

সাগরপারের ঝড়-ঝাপ্টা থেকে দু'হাতের আড়াল দিয়ে অনির্বাণ রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি গলদঘর্ম শুরু করলেন। ১৮২৪। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির এক উন্মুক্ত পরিবেশের দরজা খুলে যায়। কিন্তু ১৮১৭ সালে আর এক ইংরেজ মানবহিতৈষী ডেভিড হেয়ারের ডাক শুনে অসংখ্য মানুষ এগিয়ে এলেন। বলতে গেলে সেই সময়ের সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা এক ইংরেজ সাহেবের মুখে শিক্ষা সংস্কৃতির আবাহন শুনতে পেল। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই প্রচেষ্টায় একটি বিদ্যাভারতীর অঙ্গন হিন্দু কলেজ তৈরি হল। জ্ঞান এবং বোধবুদ্ধির নতুন সূতিকাগার থেকে তৈরি হল এক ঝাঁক চকচকে ঝকমকে তরুণ দল। এই কলেজের শিক্ষক বিদ্রোহী ইউরোপীয়ান ভারতবন্ধু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরিজিও তাঁর তরুণ ছাত্রদলের হাতে তুলে দিলেন শিক্ষার মশাল। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অন্দরমহলের আনাচে-কানাচে জমাট হয়ে থাকা অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার এবং জাতি-বিদ্বেষের অন্ধকার সেই মশালের তীব্র আলোয় ছিঁড়ে-ফেড়ে তছনচ হতে লাগল। হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিবাদ শুরু হল। ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই ছাত্র দলের নতুন পরিচয় হল ইয়ংবেঙ্গল। বাঙালির রক্তে নতুন সময়ের পদধ্বনি শোনা গেল। জীর্ন দুয়ারের সামনে এসে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। ওদের পরিচয় হল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সনাতনপন্থী। ধর্মযুদ্ধে সেই খোলা ময়দানে উঁকি দিল অনেক কুশীলব। যাঁদের পুরোভাগে ভগীরথের মতো পথ দেখিয়ে চললেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তাঁর গর্বিত ধর্মসভার ডালপালা বিস্তার হতে লাগল কলকাতার প্রাচীনপন্থী বলে তথাকথিত ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে।

কিন্তু আপামর মানুষের জন্য কী ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে, এই প্রশ্নটাও যে লক্ষ টাকার চেয়ে দামি হয়ে উঠল সেদিন। সাগরপার হয়ে ইউরোপের আলো অথবা তাঁর বিপরীত মেরুতে সনাতন প্রাচ্য শিক্ষা — এই দুয়ের ঠোকাঠুকিতে সংঘাতের পরিধি বাড়তে বাড়তে প্রায় ১৮২২ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত প্রায় গড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র ঘটনায় সেই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়ে গেল। লর্ড মেকলের এক মূল্যবান বিবরণী গ্রহণ করে সেই বিতর্কে জল ঢেলে দিল সরকার নিজেই। মেকলের সেই বিবরণীতে লেখা ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীদের কাছে ইউরোপীয় সাহিত্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো বয়ে নিয়ে যাওয়া। অতএব মতামত স্বীকৃত হল ইংরেজি শিক্ষার অনুকূলে। বালক বিদ্যাসাগরের চোখের সামনে দিয়ে ভাষা শিক্ষায় বাদ-প্রতিবাদের স্মরণীয় একসময় চলে গিয়েছে। ঔপনিবেশিক সেই সর্বগ্রাসী রাজদণ্ড থেকে বিদ্যাসাগরও বেরিয়ে আসতে পারেননি সেদিন।

কিন্তু তখনকার দিনে যে নব্য তরুণ দল হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। মানুষের ভাল-মন্দ হিতাহিতের কথা ভেবে দেশের এবং জাতির সামনে প্রাশ্চাত্য রীতিনীতির সুবাস ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সে ভাবে তাদের হতাশ করেই ঈশ্বরের পাঠ্যব্যবস্থা শুরু হল। ঠাকুরদাস মনে মনে ঠিক করলেন ছেলেকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেবেন। অতীতে যেমন ভারতীয় মুনি-ঋষিদের কাছ থেকে নিঃসৃত ভারত আত্মার ধ্বনি শোনা গিয়েছিল একইভাবে সংস্কৃত শিক্ষায় টোল এবং

চতুঃষ্পাঠীতে ঠাকুরদাসের পিতা রামজয় তর্কভূষণও শিক্ষকতা করেছেন। অভাব অনটনের বাধায় ঠাকুরদাস নিজে রামজয়ের পতাকা কাঁধে নিয়ে বেশি দূর যেতে পারেননি। তাই ছেলের মধ্যে নিজেরই অবচেতন মনের অপূর্ণ সাধ পূরণ করার তাগিদে ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করার মনস্থির করলেন। দারিদ্র যাঁর নিত্যসঙ্গী, পেটের খিদে যাঁকে কঠোর জীবনযুদ্ধে আরও বড় রণাঙ্গনে তৈরি করে রসদ জোগাতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে ল কমিটির পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিলেন। এই পরীক্ষায় পাস করলে তিনি যে কোনও আদালতে হিন্দু ল অফিসার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন।

১৮২৯-এর জুন। ঈশ্বরের বয়েস মাত্র নয়। মুখে চোখে তখনও সহজাত সারল্য। বাবা ঠাকুরদাসের হাত ধরে সেই সব পেয়েছির দেশের এক যাত্রী সংস্কৃত কলেজের ভুবনে এসে দাঁড়াল। একই বাড়ির দুই অংশে হিন্দু এবং সংস্কৃত কলেজ। নামে আলাদা হলেও শিক্ষার দুটি ধারা, দুটি দিকে যেন বয়ে চলেছে। প্রাচ্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা। পূর্ব পশ্চিম। ধরিত্রীর দুই পাড়ে দুই দিগন্ত হলেও দিলমণির হৃদয় হতে যে এক। শুধু মানুষের সামনে মানুষের হাতে গড়া বিভাজন। শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণিগত বৈষম্য হলেও পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের ভাবনায় একই ছাদের তলায় অভিন্ন এক শিক্ষা ব্যবস্থার ছবি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। শুরু হল এক অন্বেষার দৌড়।

সংস্কৃত কলেজে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছেলেমেয়েরই যাতায়াত ছিল। মানুষের অপর একটা অংশ অনেকটা যেন আবর্জনার মতো অবহেলিত। দূরে ঠেলে দেওয়ার এমন ভেদাভেদ। শুধুমাত্র ক্ষমতার অলিন্দে বসে হম্বিতম্বি। নৈবিদ্যের উপরে আতা অথবা কলার টুকরোর মতো দৃশ্যমান এক শ্রেণির মানুষের বিশ্বাস ছিল যে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের ছেলেরাই শাস্ত্রপাঠের যোগ্যতা অর্জন করবে। দেবতার দেউলে যাতায়াত করবে। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মে যোগদান করবে। সমাজের চোখে হবে হিরো। আর বাকি যারা সব ফাঁকি তারা। তারা পাবে জিরো। বলতে গেলে শাস্ত্র বিমুখ হয়ে থাকবে।

শিক্ষায় উন্মুক্ত আলো ভেদাভেদের প্রাচীর ছড়িয়ে দিয়ে আপন করে সবাইকে নেওয়ার মতো উদার মনোভাব দেখাতে সেদিনও পারেনি। মুসলমান ও খ্রিস্টান ছাত্রদের সামনে উচ্চশিক্ষা বলতে যা বোঝায়— সেই কলেজের দরজা এক প্রকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র হিন্দু এবং বনেদী ঘরের ছেলেদের সামনে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রবেশাধিকারের দরজা একেবারে অবারিত করে দিয়েছিলেন। বিচারের বাণী যেখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদে। দুটি কলেজ একই বাড়ির দুটি ভাগ হলেও একটা লোহার রেলিং মাঝখান থেকে সামাজিক বিভাজনে কলঙ্ক টেনে দিয়েছে। এমন কী দুই কলেজের মধ্যে শ্রেণিগত বৈষম্যের কথা বলে চলেছে ওই বিভেদরেখা। নরনারায়ণের প্রাণের দেবতার সামনে যাঁরা সঙ্কীর্ণ জাতিভেদের লক্ষ্মণরেখা দেখিয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দরজা কঠিন হাতে বন্ধ করে দিতে চাইছে তাদের কথা ভেবে বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন। বলতে গেলে এর প্রভাব পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে তিনি প্রথমেই বর্ণবৈষম্যের কঠিন বিভেদরেখা দৃঢ় হাতে মুছে দিয়েছিলেন।

শিক্ষা জীবনে সংস্কৃত কলেজের তোরণদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে সামাজিক রূপরেখাটিকে বিদ্যাসাগর বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। লেখাপড়ায় অসামান্য মেধার দ্যুতি বহন করে অনেক পুরস্কার এবং বৃত্তি ব্যবহারে এক নতুন মাইল ফলক তৈরি করেছিলেন। খুব সহজ এবং সাবলীল পদ্ধতিতে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বর্ণ পরিচয়ের আলো। শুধুমাত্র অক্ষর শব্দ এবং ভাষার মধ্যে যাদুকাঠি ছুঁয়ে বাঙালির জীবনে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। যেখানে দেশজুড়ে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রচণ্ড আলোড়ন, মুখের ভাষা ইংরেজি, চলনে-বলনে রাজকীয় ভাষা তার অনুকরণে সেই পথ বেয়ে সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ইংরেজিতেও ভাল ফল করেছিলেন। ১৮৩৫ সাল। এক অঘটন। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে কলেজ থেকে ইংরেজি শিক্ষার বিদায়। ঈশ্বরচন্দ্র খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এ যেন জল না চাইতেই জলদের আমন্ত্রণ। ঔপনিবেশিক শাসকদের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে ইংরেজি ভাষার উপরে কোপ। যার শীল যার নোড়া যদি তারই ভাঙে দাঁতের গোড়া। অনেকটা সেইরকম অবস্থা। সাহেবরা পৃথিবীজুড়ে চষে বেড়াচ্ছে যেখানে নিত্যনতুন উদ্ভাবনের আলোয় গোটা দুনিয়াকে ঢেকে ফেলেছে, সেখানে রাজভাষার পশ্চাৎ অপসরণ। পঠন-পাঠনের তালিকা থেকে ইংরেজি উঠে গেলে যেমন হয়। ঈশ্বরের ইংরেজি শিক্ষা বেশি দূর গড়াতে পারল না। কিন্তু সমুদ্রের বহমান স্রোতের দিকে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে দেখলেন। বাংলা ভাষার প্রচার এবং প্রসার কতটুকু। সীমাহীন যাঁর পরিধি। অমান্য তাঁকে করবে কে? বেশ কয়েকজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। ইংরেজি শিক্ষা পুনশ্চ প্রবর্তনের জন্য জোরালো দাবি জানালেন। বয়েসে ঈশ্বর তখনও তারুণ্যের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারেননি। জীবনের চতুর্দশ পর্ব সবে মাত্র উন্মোচিত করেছেন। চেহারাও এমন কিছু নয়। ছিরি ছাঁদহীন। সংসারে টানাপোড়েন উত্থানে-পতনে জর্জরিত তার উপর অনিশ্চিত ভবিষত্যের ভাবনায় বেসামাল মানুষের আখ্যানে ভরা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ এক যুবক। তখনও পণ্ডিত অথবা বিদ্যাসাগর উপাধিত ভূষিত হননি। এমনকী অর্থ রোজগারের পথ সুগম হয়নি। চাকরির বাজার চিরদিনই মন্দা। তা হলেও সংসারের দায়দায়িত্ব হুড়মুড়িয়ে পড়ল এসে ওই চোদ্দো বছরের কাঁধে। সেকালের বাল্যবিবাহের রীতি অনুযায়ী দীনময়ী দেবীর সঙ্গে ছাদনাতলায় বাঁধা পড়লেন। যশোরের ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ী। পাত্রীর বয়েস মাত্র আট। পাত্র চোদ্দো। তা হলেও সেই পুতুল খেলার দিনগুলি থেকে সংসার অভিমুখে যাত্রা। ওই একরত্তি বয়েসে দাম্পত্য জীবনের কঠিন রসায়ন বোঝা একবিন্দুও সম্ভব নয়। সেদিনের ক্ষীরপাই ছিল একেবারে গণ্ডগ্রাম। ঢিলেঢালা জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানো কিছু মানুষ। তা হলেও জীবন ধারণের তাগিদে গ্রাম উজিয়ে কিছু মানুষ কাপড়ের ব্যবসা করতে আসত। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কাছেও এর ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতাকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় এত অপরিণত বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগ্রহ ছিল না। বরং নিজের ঘরবাঁধার স্বপ্ন থেকে অনেক দূরে এক বিপরীত মেরুতে কত অজস্র অসংখ্য অনাথ আর্ত অসহায় মানুষ ভিড় করে আছে। তাদের পাশে দীনবন্ধুর মতো দাঁড়িয়ে সহানুভূতির প্রলেপ মাখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাধ সাধলেন জন্মদাতা পিতা। ঠাকুরদাসের একান্ত আগ্রহ এবং ইচ্ছায় ছোট্ট একটি কন্যার কোমল দুটি হাতে হৃদয় দেবার দেনা দেখতে অভিভূত। কিন্তু ঘর সংসার ব্যক্তিগত স্বার্থের চৌকাঠ পার হয়ে যে বিশ্বসংসার, যেখানে নরনারায়ণের প্রাণের দেবতা অবহেলিত বিদ্যাসাগরের কোমল দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল।

ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য অলঙ্কার। বেদান্ত স্মৃতি ন্যায় জ্যোতিষ ও

ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের পাশাপাশি পানিনীর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। শুধুমাত্র কোনও বিদেশি ভাষায় অসাধারণ বাগ্মীতার উদ্ভাষ সেই বয়সের ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সংস্কৃত কলেজে ছাত্রাবস্থায় নজর কেড়েছিলেন অনেকেরই। পঠন-পাঠন থেকে শুরু করে নিজস্ব গুণে আর পাঁচজনের মাথা ছাড়িয়ে দৃষ্টি মেলেছিলেন আকাশের দিকে। শিক্ষক পণ্ডিতদের কাছেও অপার স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। কোনও পণ্ডিতের অসুস্থতাজনিত বা অন্য কারণে কলেজে অনুপস্থিত অবস্থায় ঈশ্বরই ছাত্রদের পড়াতেন। এমনকী আচার-আচরণেও বদলে যেতেন। সেই মুহূর্তে ছাত্র এবং শিক্ষকের অসম ব্যবধান এক লহমায় মুছে দিয়ে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন সকলের কাছেই। অনমনীয় জেদ, কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যাবসায় যাঁর মূলমন্ত্র। নিজেকে উন্মোচিত করার লক্ষ্যে শুরু করেছিলেন ধৈর্য এবং অন্বেষার এক লম্বা দৌড়। ফলে বারো বছরের পাঠ্যক্রম ন' বছরেই আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। অসাধারণ মেধা এবং অন্বেষার তীব্র লড়াই দেখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ওয়াইজ মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরকে অধ্যাপকের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। আর তাতেই হাসিমুখে দুর্ভাগ্যকে কুপোকাত করার রসদ দু'হাতে ভরে নিয়েছিলেন। জীবের প্রধান অবলম্বন জীবিকা। সেদিন বিদ্যাসাগরেরও প্রথম জীবিকা যাত্রা। ১৮৩৯-এর এপ্রিল। দারুণ অগ্নিবাণে জর্জরিত শহর। রাইমণির আশ্রয় থেকে নগ্ন পায়ে সংস্কৃত কলেজে এসে উঠলেন। এখানেও ভাগ্যেও মরচে পড়া দরজাটাকে একটুখানি ফাঁক করার চেষ্টা করলেন। হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় অবলীলায় পার হয়ে গেলেন। বহু প্রতীক্ষিত জজ পণ্ডিতের চাকরি এখন একেবারে হাতের নাগালেই। কৃতবিদ্য সন্তানের সৌভাগ্য সূর্যের উদয়ে বাবা ঠাকুরদাসেরও মনের আনাচে-কানাচে আনন্দে ভরে গিয়েছে। চাকরির বাজার চিরদিনই যে মন্দা এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়। এখানে জজ পণ্ডিতের কাজের নমুনা একটু দেওয়া দরকার। সেই সময়ে এই একটি জায়গায় বাঙালি পণ্ডিতকে শ্বেতাঙ্গরা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা সহকারে বিবেচনা করতেন। পূজার থালায় নৈবিদ্যের মাথায় আতা অথবা কলার টুকরো যেমন থাকে তেমনি সাহেব বিচারকদের মাথার উপরে থেকে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্মের হিতাহিত জ্ঞানের মতামত ব্যক্ত করতেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা। ইউরোপীয় জজদের হিন্দু আইনের ধারা-উপধারা সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া ছিল জজ পণ্ডিতদের কাজ। সেকালে এই কাজে সাম্মানিক ছিল যথাযোগ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের জজ পণ্ডিতের কাজে ঈশ্বরকেই যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে মনোনীত করা হল। সেই প্রথম সৌভাগ্যের ঝিকিমিকি দেখতে পেলেন। পড়াশুনো এবং জ্ঞান আহরণ ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গী। প্রচণ্ড অভাব অনটনের মধ্যেও বীণাপাণির আঁচল ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই গতিপথ স্থির করে রেখেছিলেন। বিশেষ করে বাবার কাছ থেকে সম্মতি না পেয়ে জজ পণ্ডিতের মতো উচ্চপদে আদালতে চাকরি পেয়েও অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করলেন। এখানে বলা আবশ্যক বিদ্যাচর্চায় সীমহীন জ্ঞানসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে যিনি বিদ্যাসাগর অলঙ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন বাঙালির হৃদয়ে, স্থায়ী আসন পেতে মহাকাল প্রহরীর সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছেন জোরকদমে, সেই উপাধি সর্বপ্রথম এই হিন্দু ল কমিটির সার্টিফিকেটে তাঁর নামের সঙ্গে কোহিনুরের মতো শিরোপা হয়েছিল। এমনকী তাঁর হৃদয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বারুদ যেভাবে ঠেসে ঠেসে ভর্তি করে পাঠিয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তা তারই স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণে শেতাঙ্গ রাজশক্তিও মাথা নত করে কুর্নিশ করেছিলেন। অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছিল সেই জন্মভিটের দিকে। বীরসিংহের সিংহপুরুষের জন্মকথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন অনেকেই। সেই প্রথম। ১৯২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। মহাকালের রথে চড়ে এক সিংহপুরুষের আবির্ভাব। সময়ের পাশে পাশে দিন গুনে গুনে মানবশিশু যেমন এক পা এক পা করে সামনে রাস্তা দেখতে পায়, পরমায়ুর সেই পথ বেয়ে যাত্রা শুরু ঈশ্বরের। গল্পে প্রচলিত আছে একজন জ্যোতিষী শিশুর ললাট লিখন পড়ে বলেছিলেন যে তিনি আগামী দিনে এক মহাপুরুষ হবেন, কিন্তু এঁড়ে বাছুরের মতো একরোখা কর্তব্য বোধে অনমনীয় জেদি হবেন। শিশুটিকে দেখে ঠাকুরদাসের পিতা রামজয় তর্কভূষণের চোখ দুটি থেকে অঝরে অপত্য ধারা ঝরে পড়তে দেখে প্রতিবেশী একজন কৌতুক করে বললেন, এ যে দেখছি আমার ঈশ্বর এসেছেন। সময়ের কাঁটা ঘুরে গিয়ে একদিন সত্যি সত্যি অসংখ্য দীন-দুঃখী, দরিদ্র, অনাথ মানুষের ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। জীবনযুদ্ধে সীমাহীন কষ্ট, দুঃখ এবং খিদের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে নেমে ঈশ্বরও সেদিন বীরসিংহ গ্রাম থেকে যাত্রা করেছিলেন তিলোত্তমার দিকে।

১৮৪১ সংস্কৃত শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করে ভাল করে চেয়ে দেখলেন চারদিকে। দেশ-জাতি এবং সমাজের চেহারা দেখে কপালে ভাঁজ পড়ল ঈশ্বরের। ঔপনিবেশিক শাসনে নিষ্পেষিত মানুষ। তাদের সঙ্গে নীরবে ক্রন্দনরত ভারত-আত্মা। অসংখ্য অজস্র মানুষের প্রাণের দেবতা হাহাকারে বিদ্ধ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি নিজের ঘর সংসারেও দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের লড়াইয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ঈশ্বরের যে একটা চাকরির প্রয়োজন বুঝতে পারলেন। বয়েস মাত্র একুশ। সামনে লম্বা পথ। সেই পথে এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। তাঁর দুটি চোখে সীমাহীন আকাশ। সমস্ত বাধা ঠেলে সেই আকাশে মাথা বাড়িয়ে দেওয়ার খোয়াব অনেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আর সকলের মাথায় ছাড়িয়ে উঠতে উঠতে অনেক উচ্চতায় উঠে গিয়েছেন যেখানে এক কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে, 'বল বীর উন্নত মম শির'। কলকাতায় এসেও ঠাকুরদাসের পিতৃবন্ধু ভাগবত চরণের ডেরায় উঠলেন। ভাগবতের একমাত্র বিধবা মেয়ে রাইমণির স্নেহযত্নে লালিত হলেও ঈশ্বরের কঠোর পরিশ্রম - সরকার বাহাদুরের ল্যাম্পপোস্টের আলো চুরি করে পড়াশুনো সর্বোপরি জীবন পদ্মের প্রস্ফুটিত কুঁড়িটিকে মেলে দেওয়ার অত্যন্ত স্পৃহা খুব কাছে থেকে দেখে ওরা আপ্লুত হয়েছিলেন।

১৮৪০-এর ১১ সেপ্টেম্বর। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন মারা গেলেন। অকস্মাৎ যেন ইন্দ্রপতন। মৃত্যু যে কোনও মানুষের কাছে সতত দুঃখের, তা হলেও সময় বিশেষে সুখের বাতাসও বয়ে আনে। চাকরির বাজারে সেদিনও প্রচণ্ড আকাল। তাঁর ওই শূন্যপদে দাবি জানিয়ে যে সব প্রার্থী আবেদন-নিবেদন করেছেন তার মধ্যে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মাও ছিলেন। একে তো ঔপনিবেশিক শাসকদের বিমাতৃসুলভ আচরণ তার উপর জীবন ও জীবিকার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। চাকরির বাজারে একটুও যে সুপবন নেই বিদ্যাসাগরের আবেদন-নিবেদন থেকে অনুমেয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ওয়াইজকে ঈশ্বর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সরাসরি লিখেছিলেন, 'আমি এই কলেজেই অধ্যাপনা করেছি। এমনকি প্রয়াত পণ্ডিত মহাশয়ের অনুপস্থিতির সময়ে যথারীতি কোমলমতি ছাত্রদেরও পঠনপাঠনে উদার দৃষ্টিতে সহায়তা করেছি। এখন ওই শূন্য পদে আমার দাবী সর্বাগ্রে বিবেচনীয়।'

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভিড়ে প্রয়াত পণ্ডিত হরিপ্রসাদ তর্ক পঞ্চানন্দের পুত্রদ্বয়ও ছিলেন। কর্মরত পিতার অবর্তমানে সংসারের পালে একটু হাওয়া নেই। এমনকী পরিবারের সকলের মুখ থেকে সব আনন্দ শুষে নিয়ে গিয়েছেন প্রয়াত পিতা। অতএব শুকনো মুখের ভিড়ে তর্ক পঞ্চানন্দের পুত্রদ্বয়ও করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। কিন্তু কর্মপ্রার্থীদের ভিড়ে যোগ্যতায় কম বেশি হলেও কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় এত কষ্টের মধ্যেও জীবন প্রদীপের আলো দু'হাতে আড়াল করে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ প্রায় সকলের। তা হলেও অসংখ্য তারার ভিড়ে ঠিক যেমন শুকতারা তেমনি মেধা কিংবা পারদর্শিতায় ঈশ্বরের ধারে কাছে কেউ নয়। একটা চাঁদ গোটা আকাশে আলোর ডিঙি বেয়ে প্লাবন তোলে। অফুরন্ত পরিশ্রম অনন্ত নিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ঈশ্বরের সাথে পেরে না উঠলেও হার মানা হার মাথায় নিয়েও ওরা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে নারাজ। কিছুক্ষণের মধ্যে কী এক মতলব হল। সম্মুখ সমরে অধোবদনে মুখ ঢাকলেও ছলচাতুরির সাহায্যে উঠে দাঁড়াবার শেষ চেষ্টা একবার করেও ব্যর্থ হল।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৪০। শরৎকাল। সে দিন সকাল থেকেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ওয়াইজের ঘরের সামনে ছাত্রদের ভিড়। মাথায় উপরে মুষ্টিবদ্ধ হাত সজোরে ছুড়ে দিয়ে কোরাস কণ্ঠে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে প্রতিবাদীরা। সকলেই প্রায় উত্তেজিত। হতাশায় ব্যর্থতায় টালমাটাল মানুষগুলো। সকলেরই প্রায় চোখেমুখের চেহারা কেমন বদলে গিয়েছে। উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর। তোতাপাখির মতো ওদের একটাই বুলি। প্রয়াত অধ্যাপকের শূন্যপদে তস্য সুযোগ্য পুত্র তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করিলে অনায়াসে আমরা কৃতার্থ হইতে পারিব। কারণ উক্ত পণ্ডিতের অবর্তমানে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ মহাশয় উদার এবং স্নেহভরা দৃষ্টিতে আমাদের শিক্ষাদান করতেন। সুতরাং তিনিই যে যথোপযুক্ত ব্যক্তি আমাদের সন্দেহ নেই।

এ ঘটনায় হতবাক ঈশ্বর। সেই ছোটবেলা থেকেই লোভ, শঠতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির উপরে উঠে সহজ সরল পথ ধরে চলতে শিখেছিলেন। শৈশবেই মানসিক গঠনে উৎকর্ষ থেকে ব্যতিক্রম হয়ে উঠেছিলেন। সকালবেলা থেকে সম্পূর্ণ দিনের পূর্বাভাষ দেখার মতো আর্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং ভালবাসায় হৃদয়ে আলো জ্বেলে রেখেছিলেন। সেই সময়ে দেশজুড়ে অলস অকর্মণ্য অশিক্ষায় আচ্ছন্ন মানুষের চোখে আঁধার যেভাবে নেমে এসেছিল সাংস্কৃতিক নৈতিক এমনকী নব চেতনার এভাবে দেশ ও জাতি ছিল জীর্ণ সংস্কারে আবদ্ধ ও গতিহীন। ঢিলেঢালাভাবে বয়ে চলা এক জীবন স্রোত। অথচ দেশের শাসকেরা পাশ্চাত্য প্রভাবে উন্নয়নের শরিক হয়েও গোঁড়া হিন্দু সমাজের কাছে বিপর্যস্ত। তা হলেও সেই অন্ধকার দিনে অনেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সামনে দিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগরও। বাঙালির জাতিসত্তার সঙ্কটমোচনের উদ্দেশ্যে মশাল হাতে দৌড় শুরু করলেন লক্ষ্যস্থানের দিকে। পশ্চিমের জ্ঞানভাণ্ডারের বন্ধ দুয়ার খুলে দিলেন বাঙালি জাতি সত্তার সামনে। দেশের সাংস্কৃতিক প্রযুক্তির যোগাযোগ যাতে রুদ্ধ না হয়ে যায় তার জন্যে চেতনার পথনির্দেশ করলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে পড়ুয়া অবস্থায় বিদ্যাসাগর যে কয়েকজন ইংরেজ কর্তাব্যক্তির শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন জি টি মার্শাল। খর্বাকৃতি এই ছাত্রটিকে দেখে প্রথম দর্শনেই একটা ঝাঁঝালো ঘ্রাণ পেয়েছিলেন। ছেলেটির হৃদয়ে গোপন কুঠুরিতে স্বজাতি এবং স্বদেশপ্রেমের বারুদ লুকিয়ে রয়েছে বুঝতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে বাংলার ভিজে মাটির জল হাওয়ায় সাধারণ বাঙালিদের মনে রাজ রোষে উত্তাপ খুব কম দেখা যায়।

ঈশ্বরের কথাবার্তায় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোচনা ও সমালোচনা শোনা যায়। সাহেবদের কর্মসংস্কৃতির সবটুকুই যে ভাল নয় তাহার সব কিছু খারাপও নয়। বিশেষ করে ঈশ্বরের মুখে পশ্চিম দেশের ঝকঝকে জীবনযাত্রার প্রশংসা শুনে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সমীহ জেগে উঠেছিল। বড় মাপের মানুষদের ছোটবেলা থেকেই যে গড়ে উঠতে দেখা যায় সেই চিরন্তন বাক্য সাহেবরাও জানতেন। কিন্তু সম্প্রতি যাকে কেন্দ্র করে এই কলেজের আবহাওয়া তেতে উঠেছে সেই মার্শাল সাহেবও এক সময়ে হন্তদন্ত হয়ে অধ্যক্ষের ঘরে এসে ঢুকলেন। সুষ্ঠুভাবে কলেজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে জরুরি মিটিংয়ে বসলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে গরম বাতাস ঢুকে পড়েছে। কর্তৃপক্ষের কপালে ভাঁজ পড়েছে। মুখে উদ্বিগ্নতার রেখাগুলি বিশ্রীভাবে ফুটে উটেছে। ঘরের বাইরে তখনও চিৎকার চেঁচামেচি হই-হট্টগোল— ঝড় বয়ে চলেছে। মিটিং ছেড়ে ঝটতি বাইরে আসতেই অধ্যক্ষ ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন। আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন হয় স্বয়ং মার্শালকে হাতের সামনে পেয়ে ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ছাত্রেরা। কিন্তু তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিক্ষোভের দাবানল কিছুটা শান্ত করে অধ্যক্ষের ঘরের দিকে পুনশ্চ যেতে যেতে মার্শাল থমকে গেলেন হঠাৎ। একটু দূরে দৃষ্টির নাগালের মধ্যেই একটি কিশোর। শান্ত-সৌম্য। কিন্তু তার আশেপাশে রাগী ছেলেদের জটলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকী কলেজের পরিবেশ অগ্নিগর্ভ করে তোলার



ইউরোপীয় জজদের হিন্দু আইনের ধারা-উপধারা সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া ছিল জজ পণ্ডিতদের কাজ। সেকালে এই কাজে সাম্মানিক ছিল যথাযোগ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের জজ পণ্ডিতের কাজে ঈশ্বরকেই যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে মনোনীত করা হল। সেই প্রথম সৌভাগ্যের ঝিকিমিকি দেখতে পেলেন। পড়াশুনো এবং জ্ঞান আহরণ ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গী। প্রচণ্ড অভাব অনটনের মধ্যেও বীণাপাণির আঁচল ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই গতিপথ স্থির করে রেখেছিলেন।

তাগিদে ওদের অন্যায় প্রতিবাদের বহর দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। খর্বাকায় কিশোরটির চেহারা এবং মুখচোখের মধ্যে প্রান্তজনের ভাষা এমনভাবে সোচ্চার যে অর্থাভাবে ক্লিষ্ট, সংসারে মরুপথ ধরে একাকী ভ্রমণরত। চেহারা এবং পোশাকে যশ, অর্থ প্রতিষ্ঠার বিপরীত মেরুর এক কিশোরকে দেখে মার্শালের মতো সেনাবাহিনীর দুর্মদ ক্যাপ্টেনও তাঁর অসাধারণত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন। কিন্তু তারাপ্রসাদ একপাল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রকে জুটিয়ে এনে বিপথে চালনা করে যেভাবে কেল্লাফতে করতে চাইছে, শুধু গর্হিত নয়, দৃষ্টিকটুও। তবু সমগ্র ঘটনাটি দীর্ঘক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করে একসময়ে নিরবে সরে গেল ছেলেটি। ভাবল, কেন যে মেঘ উড়ে এল হৃদয় আকাশে, ভাগ্যের কাছেও নালিশ জানাতে পারল না। শুধু মনে মনে বললেন, বিদায় কলকাতা। তোমাকে বিদায়। আমি যদি আর এখানে ফিরে না আসি, তোমাদের বিদ্যাসাগরকে আর পাবে না। দুঃখিনী বঙ্গজননী কেন যে চেয়ে আছে তাঁর মুখ পানে। অন্তর থেকে তিনি কখনও 'অলবিদা' বলতে পারবেন না জেনেও ক্ষোভে অভিমানে উত্তাল হয়ে বেনারস সংস্কৃত কলেজে চাকরির আবেদন করলেন। পেছনে পড়ে রইল অন্নপূর্ণা কলকাতা। সেদিনের সেই কিশোর অনেক কথা বলে চলেছেন একা একা। তাঁর প্রাণের বীণায় বেজে চলেছে এলোমেলো সুর। ঈশ্বর কেন দুয়ারে দুয়ারে? এ ভিখারি দশা কেন তার? পেটের অন্তরালে যে দাবানল জ্বলছে তারই আলোয় খুঁজে চলেছে নিজেকে। চাকরির আবেদনপত্রে সরাসরি লিখেছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে সব শাখার সঙ্গেই তিনি সম্যক পরিচিত তদুপরি অধ্যাপনায় স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু শত শত গরিব দুঃখী অসহায় নিরন্ন মানুষের ঈশ্বর ঈশ্বরচন্দ্র ধাত্রী তিলত্তোমার মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে না থেকে অন্তর পানে দৃষ্টি ফেরালেন। বাইরে থেকে ঘরে ফিরলেন। মায়ের কাছে সোনার ছেলে। মৌন মনে সোচ্চার হলেন।

১৮৪১-এর ডিসেম্বর। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরিস্তাদার বা বাংলার হেডপণ্ডিত হিসাবে কার্যক্রম শুরু করলেন। মাত্র চল্লিশ বছর আগে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮০০ সাল। মার্কুইস অফ ওয়েলসলির বদান্যতায় এই কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মেধার দ্যুতি প্রস্ফুটিত হতে থাকে। ইউরোপীয় ভাবধারায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে কলকাতা শহরকে সাহেবরা মুড়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেশ কিছু বেসামরিক তরুণ-তাজা সরকারি কর্মচারীদের প্রাচ্যভাষায় লেখাপড়া শিক্ষার জন্যে মার্কুইস কলেজটির দ্বারোদঘাটন করেছিলেন। কলকাতার সেদিন ছেলেবেলা। জলাজঙ্গলে পরিপূর্ণ। মানুষের বসতি অথবা জীবনযাপনে হাঁসফাঁস বলতে ছিল না। ইটের পরে ইট সাজিয়ে পিঞ্জর গড়ে তোলার এমন তীব্র রেষারেষি ছিল না। খুব সহজ সাধারণ বসতি বেশিরভাগই কাঁচা বাড়ি ঘর। তারই মধ্যে এই কলেজটি আভিজাত্যে এবং উচ্চতায় অনেকের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। এমনকী সাহেবদের অনুকরণে বেশ কিছু বঙ্গসন্তান ও লেখাপড়ায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে এখান থেকে এক দল শিক্ষিত প্রতিভাবান লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাংলা সাহিত্য বাগিচায় নিত্যনতুন ফুল ফুটিয়ে গন্ধে বিভোর করে রেখে গিয়েছেন। পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং কথাবার্তায় আচার-আচরণে পশ্চিমের খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলক টাটকা বাতাস এসে অনেক বঙ্গসন্তানকেও ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত করেছিল। আবার এই বঙ্গসন্তানেরাই অনেক তরুণ ইউরোপীয় অফিসারদের ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির মতো অমূল্য দর্শন এবং ঐশ্বর্যের ভাঁড়ার দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে কলকাতার ছেলেবেলাই শুধু নয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও গভীর সম্পর্ক ছিল। এই কলেজে হেড পণ্ডিত পদের জন্যে বিদ্যাসাগরের নাম সুপারিশ করেছিলেন স্বয়ং জি টি মার্শাল। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিজে এই পদের জন্য সরকারের কাছে কোনওদিন আবেদন করেননি। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মনস্বিতা নির্ভীক সাহসিকতা, অকান্ত পরিশ্রম এবং একাগ্রতা, সর্বোপরি কুসংস্কারমুক্ত এক গুণের পরিচয় পেয়েছিলেন ক্ষমতার অলিন্দে বসে থাকা কর্তাব্যক্তিরা। কিন্তু বিদ্যাসাগর এখানে বেশিদিন স্থায়ী হতে পারলেন না। পদ্মপাতায় জল যেমন টালমাটাল। এখান থেকে তিনি একদিন পদত্যাগ করলেন। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ঈশ্বরের মনোবিহঙ্গ উড়াল দিল আর কোনখানে। স্মৃতির পাখির পিঠে চড়ে আবার ফিরে গেলেন অতীতে। সংস্কৃত কলেজে ফেলে আসা কৈশোরের দিনগুলি যে ঘুরেফিরে সামনে এসে দাঁড়াবে হয়তো বিদ্যাসাগর নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন। ১৮৪৬-এর এপ্রিল। মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনে। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হলেন। নতুন পদ। পুরানো বাড়ি। মাইনেপত্তর খুব একটা বেশি না হলেও অভাবের সংসারে সেটাই বা কম কিসে? নিজের পেটে ভাতের বাইরে যে অসংখ্য প্রান্তবর্তী মানুষ ভিড় করে আছে তাঁর সামনে মার্শাল তাঁকে যে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন সেটা যে এক সময়ে অসামান্য হাতিয়ার হয়ে উঠবে ঈশ্বর বুঝেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট বিধাতা এখানেও হয়তো একটু মুচকি হেসেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে নতুন চাকরি তাঁর কাছে খুব একটা সুখের বাতাস বয়ে নিয়ে আসবে না বুঝতে পেরেছিলেন।



ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পাশ দিয়ে সনাতন বাংলা ভাষা শিক্ষাকে ঠান্ডা ঘর থেকে বের করে এনে বৈপ্লবিক চেতনার মধ্যে দিয়ে ছাত্র সমাজে প্রচলন করতে গিয়ে ঈশ্বর থমকে গেলেন। সামনে পাহাড় প্রমাণ বাধা। জীবনে সেই প্রথম। মস্ত এক বাধা পেলেন এমন মানুষের কাছ থেকে বলতে গেলে বিভীষণের মতো। স্বজাতি রসময় দত্তের ষড়যন্ত্রের ঘ্রাণ পেলেন খুব কাছ থেকেই। ফলে তাঁর ভিতরে ফেলে আসা বীরসিংহ গ্রামের সিংহপুরুষটি মাথার দু'পাশে মস্ত কেশর দুলিয়ে গর্জে উঠল।

সে জন্যেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরির জায়গায় ছোট ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন যাতে বহাল হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে খোঁজখবর করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন কোনও কারণে সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যদি মনোমালিন্য বা বিচ্ছেদ ঘটে তা হলে জীবিকার এই উন্মুক্ত দরজা থেকে বিদায় নিতে হবে। তারপর? তার আর পর নেই বললেও চলে। তবে ভাইয়ের চাকরিটা হলে পরিবারে সকলের একবেলা পেটে ভাতে কোনওভাবে চলে যাবে। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঈশ্বরের সেই ধারণা আমূল সত্যি হয়ে উঠেছিল।

অয়ি ভারতবর্ষ। এখানে ধুলায় ধুলায় কান পাতলে আর্য মুনি-ঋষিদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এ সবই প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎসারিত। ঈশ্বরচন্দ্র একাগ্রভাবে সেই শিক্ষার সংস্কার সাধন করে সাধারণ মানুষের কাছে আরও নতুন করে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। সে জন্য তিনি অনেক পড়াশুনো করে বিস্তর পুঁথিপত্র ঘেঁটে একটা পরিকল্পনার খসড়া বানিয়েছিলেন। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তের কাছে সেই ভাবনার কথা পেশ করলেন। কিন্তু সহকারীর রচিত পরিকল্পনা সংস্কৃত কলেজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তার বোধ হয় পছন্দ হল না। মানুষটা স্বয়ং বিদ্যাসাগর হলেও ক্ষমতার অলিন্দে বসে থাকা কর্তৃপক্ষের দাম্ভিক আচরণ এবং অন্তঃসারশূন্য অহমিকার সামনে তাঁর পরিকল্পনা ভেসে গেল খড়কুটোর মতো। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন অনমনীয় তেজস্বী এবং কর্তব্যবোধে অটল। খসড়াটি দেখে মার্শাল নিজেও ভূয়সী প্রশংসা করলেন না, সময়োপযোগী বলেও মন্তব্য করলেন। নিছক এক বঙ্গসন্তান হলেও বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যতের নিরিখে যা কিছু ভাল এবং ভাবীকালের মানুষের জন্যে উপযোগী তাকে সর্বান্তকরণে কুর্নিশ জানাতে সাহেবদেরও কোনও দ্বিধা ছিল না।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পাশ দিয়ে সনাতন বাংলা ভাষা শিক্ষাকে ঠান্ডা ঘর থেকে বের করে এনে বৈপ্লবিক চেতনার মধ্যে দিয়ে ছাত্র সমাজে প্রচলন করতে গিয়ে ঈশ্বর থমকে গেলেন। সামনে পাহাড় প্রমাণ বাধা। জীবনে সেই প্রথম। মস্ত এক বাধা পেলেন এমন মানুষের কাছ থেকে বলতে গেলে বিভীষণের মতো। স্বজাতি রসময় দত্তের ষড়যন্ত্রের ঘ্রাণ পেলেন খুব কাছ থেকেই। ফলে তাঁর ভিতরে ফেলে আসা বীরসিংহ গ্রামের সিংহপুরুষটি মাথার দু'পাশে মস্ত কেশর দুলিয়ে গর্জে উঠল। অমিত তেজস্বী বিদ্যাসাগর মনে মনে স্থির করলেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, তার উন্নতি সাধনে যদি কোনও বৈপ্লবিক চেতনা গড়ে তুলতে না পারেন তা হলে শুধু পয়সা উপার্জনের জন্যে সেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি আঁকড়ে পড়ে থাকবেন না। যশ-অর্থ প্রতিষ্ঠার চিটেগুড়ে হাবুডুবু না খেয়ে সামাজিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে ভাবীকালের মানুষের সামনে নবদিগন্তের বাতায়ন হাট করে খুলে দিয়ে যাবেন। নতুন নতুন স্কুল-কলেজ তৈরি করে পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে সরস্বতীর আসন আরও ব্যাপকভাবে পেতে রাখবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধা করেননি মুহূর্তকালও।

ঈশ্বরের বন্ধুবান্ধব হিতৈষীজনের অভাব ছিল না। ঘর সংসারেও যথেচ্ছ টানাপোড়েন। গ্রামের ভিটেমাটি থেকে শহরে চলে এসেছেন। এখানে দাঁড়িয়ে দু'চোখ মেলে নরনারায়ণের প্রাণের দেবতাকে করজোড়ে প্রণাম জানিয়েছেন। অসংখ্য-অজস্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েও নিজের স্বরূপটিকে চিনে নেওয়ার জন্যে খুঁজে চলেছেন অবিরাম বিশেষ করে চাকরির ভয়ঙ্কর আকালের মধ্যেও শুভানুধ্যায়ীদের শত অনুরোধ উপরোধ একবিন্দুও টলাতে পারেনি ঈশ্বরকে। বৃহত্তর মানুষের স্বার্থে সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। পায়ের তলায় ছেঁড়া চটির মতো ছেড়ে এসেছিলেন যশ-অর্থকেও। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন খ্যাংড়াকাঠির মধ্যে দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত তেজ বেশিক্ষণ থাকবে না। চাকরি না থাকলে ঈশ্বরের পেট চলবে কী করে। বাড়িতে মা-বাবা দিনময়ী। ওদের মুখের হাসি শুষে নেবে গুটিকয়েক অসিত মানুষ? তাহলে ওদের দেখবে কে?

দুঃখ দৈন্য যার মাথার মুকুট কঠিন লড়াইয়ে তার সহযোদ্ধা কেউ থাকে না— ঈশ্বর জানেন। তাই দাঁতে দাঁত চেপে আরও বড় ময়দানে দাঁড়িয়ে জবাব দিয়ে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর আলুপটল বেঁচে খাবে। লোহা গরম হলে শুধু লাল টকটকে বর্ণেরই হয় না আর মজবুত হয় — নীরেট ইস্পাতে পরিণত হয়। এমনি যার তেজ। সাহেবসুবো শুধু নয়, অন্যায়-অবিচারের সঙ্গে আপসহীন মোকাবিলার সময় বিশেষে মানুষও পাল্টেছে। সাম্রাজ্য লোলুপ ইউরোপীয়ানদের ময়লা হাতের থাবার বাইরে কখনও স্বজাতি বিদ্বেষ, চেনাজানা মানুষের বিরোধিতায় কঠিন অবস্থান, কখনও বা সামাজিক নৈরাজ্যের মধ্যে একটা নতুন মুখ।

চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে ঈশ্বর আরও দুর্বার। নিজের পুঁজি বলতে যা ছিল কেউ নিতে পারেনি। মানসিক ধৈর্য্য এব অসম সাহসিকতা। কলকাতায় তাঁর ঘরসংসারটিও মোটেই ছোট নয়। তার উপর গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়। বড় বাজারে জগৎ দুর্লভের বাড়িতে আশ্রয় নিলেও ঠাকুরদাস নিজেও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতেন। সাবালক হয়ে বিদ্যাসাগর সবার আগে ঠাকুরদাসকে পরিশ্রম থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেন। পরে গ্রামের বাড়িতে বসবাস করতে পাঠিয়ে দিলেন। কত বড় শহর কলকাতা। রুটি-রুজির ঠিকানা যেখানে। সাতসমুদ্র পার হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ারা এসে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছে। এ দেশের কোথায় কোনও সোনালি সবুজ ফসলের পাশ দিয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো ফল্গুধারা বয়ে চলেছে ঈশ্বরও জানেন। চাকরির জায়গাটায় গোলমাল হতে পারে ভেবে বিদ্যাসাগর অনেক আগেই বন্ধু মনমোহন তর্কালঙ্কারকে সঙ্গে নিয়ে একটা অভিযানের পথে ছাপাখানা খুলেছিলেন। স্বদেশি কারিগর দিয়ে পরিচালিত সেই ছাপাখানা এমন আহামরি না হলেও চারপাশে ক্ষুধার রাজ্যে ওটাই এক টুকরো মরূদ্যান। বিদ্যাসাগর নিজে যার নামকরণ করলেন 'সংস্কৃত প্রেস।' আবার সেই ভাষার ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকালেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে জীবনযাত্রায় এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন। 'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি' নামে একটা বইয়ের দোকান খুললেন। বই লিখে নিজেই প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম বাংলা বই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কোমলমতি ছাত্রদের বাংলাভাষা শিক্ষায় বইখানি অপরিহার্য। পুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশন তদুপরি বিপণন। বলতে গেলে সেই প্রথম গ্রন্থবিপণীর যাত্রা শুরু। সামনে দীর্ঘপথ। সেই পথে অসংখ্য চড়াই-উৎরাই। তা হলেও শুরুতে কার না হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা থাকে। বাংলা বই বিপণীর সেদিনও যে ছেলেবেলা।

১৮৪৯-এর মার্চ। আবার পায়ের নিচে শক্ত মাটির স্পর্শ পেলেন। জীবন ও জীবিকার খোলা ময়দানের অন্বেষণ নতুন করে দৌড় শুরু করলেন। ঠিক যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে এসে দাঁড়ালেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকরিতে যোগ

দিলেন। এবার হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে সময়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলতে চলতে ঘটনার মোচড় দেখতে পেলেন নতুন করে। স্মৃতির পাখির পিঠে চড়ে কিশোরবেলার সেই দিনগুলিতে ফিরে গেলেন। সেই সংস্কৃত কলেজ থেকে ডাক এল আবার। এখানে সাহিত্যের অধ্যাপক পদ শূন্য হওয়ার জন্য ডাঃ এফ জে মোয়াট ঈশ্বরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের খুব গুণাগ্রহী। ডাঃ মোয়াট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে বরণ করলেন বিদ্যাসাগরকে। অর্থাৎ কলেজ পরিচালন ক্ষেত্রে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তিনিই। বলতে গেলে তখনও পর্যন্ত কলেজে কোনও অধ্যক্ষ ছিল না। শুধুমাত্র সেক্রেটারি ও অ্যাসিটেন্ট সেক্রেটারি। এক কথায় বলতে গেলে কলেজ পরিচালন ক্ষেত্রে নিজস্ব দক্ষতা বলতে ছিল না। এমনকী ছাত্রদের কাছে ওদের অবস্থান অনেকটা যেন মণিহারা ফণী। ব্যতিক্রম শুধু সেই বঙ্গসন্তান। আকৃতিতে খর্ব হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রযুক্তির ব্যবহারে চরিত্র দৃঢ়তায় অনেকের মাথা ছাড়িয়ে উচ্চতায় উঠতে উঠতে এভারেস্টের কাছাকাছি। ভাষা এবং সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে ধারে কাছে কেউ তাঁর মতো ছিলেন না। কিন্তু দুটি পদ একত্র করে একজন অধ্যক্ষ পদ যেখানে স্থির হল সঠিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও সেখানে সকলের সামনে এসে প্রকাশিত হল। বারংবার বিপর্যস্ত হয়েও জীবন পদ্মের পাঁপড়ি মেলে ধরলেন মহাকালের দিকে।

১৮৫০-এর ৫ ডিসেম্বর। এক স্মরণীয় দিন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করলেন। সে দিন সমবেত ছাত্র শিক্ষকেরা সবাই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্যাসাগরকে অভ্যর্থনা জানালেন। বয়েস মাত্র তিরিশ। তা হলেও জীবনের দীপ্ত প্রহরে সামাজিক কাজকর্মে ব্যস্ত থেকে শুধু সংস্কৃত কলেজে নয় বাংলাদেশে ঘরে ঘরে বর্ণপরিচয়ের আলো জ্বেলে পৌঁছে গেলেন। ১৮৫১ সালের ২২ জানুয়ারি। মাসিক বেতন একশো পঞ্চাশ টাকা। আজকের দিনে অনেকের কাছে সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর মতো মনে হবে। কিন্তু সেদিনের জীবনযাপন ছিল এমনি। ভোগবিলাস আশাআকাঙ্ক্ষা মনের ভিতরে লুকিয়ে থেকে দাবানলের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত না। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার প্রতিযোগিতায় সামাজিক মূল্যবোধে ধস নামতে পারত না। যশ-অর্থ প্রতিষ্ঠায় ধীরে ধীরে এভারেস্টের মতো উচ্চতায় দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর সমাজের প্রান্তবর্তী মানুষের সার্বিক উন্নতিকল্পে সমবেদনার প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বারংবার গিয়ে বিদ্যাসাগরের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করলেন। এমনকী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর পরামর্শ অপরিহার্য। ১৮৫৭ সাল। কলকাতা শহরে পড়ুয়াদের আনাগোনায় টগবগ করে ফুটে উঠল কলেজ স্ট্রিট প্রাঙ্গণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাথা তুলে দাঁড়াল। বিদ্যাসাগর হলেন তার প্রথম ফেলো বা পরামর্শদাতা। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু দূরে জনতার উত্তাল ঢেউয়ের ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে যে কোনও নাগরিকের চোখে পড়বে একটি বাড়ি। কলকাতা যে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে উত্তরে সেই পথে চোখে পড়বে 'সুকেশ স্ট্রিটে' জোড়াবাড়ি। উনিশ শতকে কেউ কেউ বলত বারো নম্বর বাড়ি। কিন্তু সময়ের ধাক্কায় নম্বর বদলে হয়েছে ৪৮বি কৈলাস বোস স্ট্রিট। শুধু নম্বরটুকু বাদ দিয়ে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালে শোনা যায় পুরনো সেই দিনের কথা। অনর্গল বলে যাবে ১৮৫৩ সাল। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে বসে একটার পর একটা বই পড়ে চলেছেন বিদ্যাসাগর। বইয়ের অক্ষর শব্দ ভাষার ছন্দোবদ্ধ অনুচ্ছেদ পার হয়ে বিদ্যাসাগর ছুটে চলেছেন কতগুলো জলজ্যান্ত মেয়ের দিকে। সকলেরই বয়েস প্রায় আট থেকে দশের মধ্যে। শৈশবের সহজাত সারল্য মুখ থেকে শুষে নিয়েছে বিধাতার রোষে-সমাজের কাছে ওরা বাল্যবিধবা। ওদের হৃদয় আকাশে কেন যে মেঘ উড়ে আসে বিদ্যাসাগর নিজেও জানেন না। কিন্তু মানুষ যে মানুষের জন্যে এই সত্য থেকে একচুলও কেউ তাকে সরাতে পারে না। বিধবা ঠাকুমা জ্যেঠিমাদের মতোই মাথার চুল কামিয়ে আতপ চাল এবং কাঁচাকলা সেদ্ধ খাইয়ে অসময়ে বিষণ্ণতার ছায়া টেনে দেওয়া হয়। শখ-আহ্লাদ, শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান চেতনা থেকে ঠেলে দেওয়া হয় অনেক দূরে একেবারে হাসি-আনন্দের বিপরীত মেরুতে। এমনকী পুরুষের মুখদর্শন পর্যন্ত পাপের কারণ বলে মনে করা হয়। বিদ্যাসাগর এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখলেন অসুখ সমাজের গভীরে। মেয়ে জন্মগ্রহণ করলেই তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অনেকের তো শিশু বয়সেই শ্বশুরবাড়ি যাত্রা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবার বয়েস যখন বারো তখন সারদাময়ীর ছয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের দিনে সাত বছরের জ্ঞানদানন্দিনীকে তাঁর শাশুড়ি পালকি থেকে আলটপকা কোলে তুলে নিয়ে অন্দরমহলে ঢুকে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমের বয়েস যখন এগারো স্ত্রীর বয়েস মাত্র পাঁচ। সেকালে নিয়ম ছিল এইরকম। সমাজপতিদের নিজস্ব নিয়মের হাঁড়িকাঠে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে বাল্যবিবাহের ফলে বাল্যবিধবা বেড়ে চলল হু হু করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীও কপালের সিঁদুর মুছে ঠাকুর বাড়িতে এসে আবার সিঁদুর পরেছিলেন। কিন্তু অসহায় নিরুপায় বাল্য বিধবাদের চোখের জলের হিসাব কেউ রাখে না। তাদের জীবন থেকে সব রং মুছে দেয় কারা? বিদ্যাসাগর একাগ্রমনে শাস্ত্রের পাতা খুঁজে চলেছেন। যেখানে বাল্যবিধবাদের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়ার বিধান নেই কোনও। যারা মানুষের ভাল চায় না নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি জোর করে চাপিয়ে দেয় ভাগ্যহীনা অসহায় বিধবা মেয়েদের উপরে, তাদের কাছে শাস্ত্রের চিরনতুন বক্তব্য জোরোলো ভাষায় পৌঁছে দিলেন। এমনকী আইন করে বিধবা বিবাহ চালু করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নড়েচড়ে বসলেন শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব। বিদ্যাসাগরও নাছোড়। অনেক ঝড় বয়ে গেল। সেই ঝড়ে পলকা খুঁটির মতো মুখথুবড়ে পড়ল শোভাবাজারের প্রতিরোধ। বিজয়ী বীর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়ালেন অনেকেই, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বর্ধমানের দাপুটে মহারাজা, সবাইকে ছাপিয়ে শত শত রংচটা মুখের দীর্ঘশ্বাসের মিছিল। বিধবা বিবাহ আইন পাস হল। অনেক দিনের পরে যেন মেঘ ভেঙে বৃষ্টি হল। নিজ উদ্যোগেই এক বিধবার দু'টি হাত বেঁধে দিলেন পাণিপ্রার্থী এক যুবকের হাত দু'টির সাথে। সেই মুহূর্তে তিনি এক অবিভাবকের আসন দখল নিয়ে কর্তব্যবোধে অটল হয়ে উঠলেন। এমনকী কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো নিমন্ত্রণ লিপি পাঠালেন নিজ হাতে— ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার এক বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ। স্থান শিমুলিয়ার সুকেশ স্ট্রিটের বারো নম্বর বাড়ি। পাত্র যশোরের রাধারমণ তর্কবাগীশের পুত্র। পেশায় মুর্শিদাবাদের জর্জ পণ্ডিত (জেলা জজ) শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। আর পাত্রী বর্ধমানের পলাশডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কালীমতী। ১৮৫৬-র ৭ ডিসেম্বর। ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে হোমযজ্ঞের আগুনের সামনে দিয়ে বড় বড় মন্ত্র উচ্চারণে সাতপাকে ঘুরতে ঘুরতে বিধবা কন্যা কালীমাতা হৃদয়ের উত্তাপে চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন একজনের দিকে। খর্বাকৃতি, দৃঢ়চেতা প্রশান্ত নির্ভীক মানুষটি মহাকালের সামনে বসে বিধবা বিবাহের ইতিহাস লিখে চলেছেন তখন।

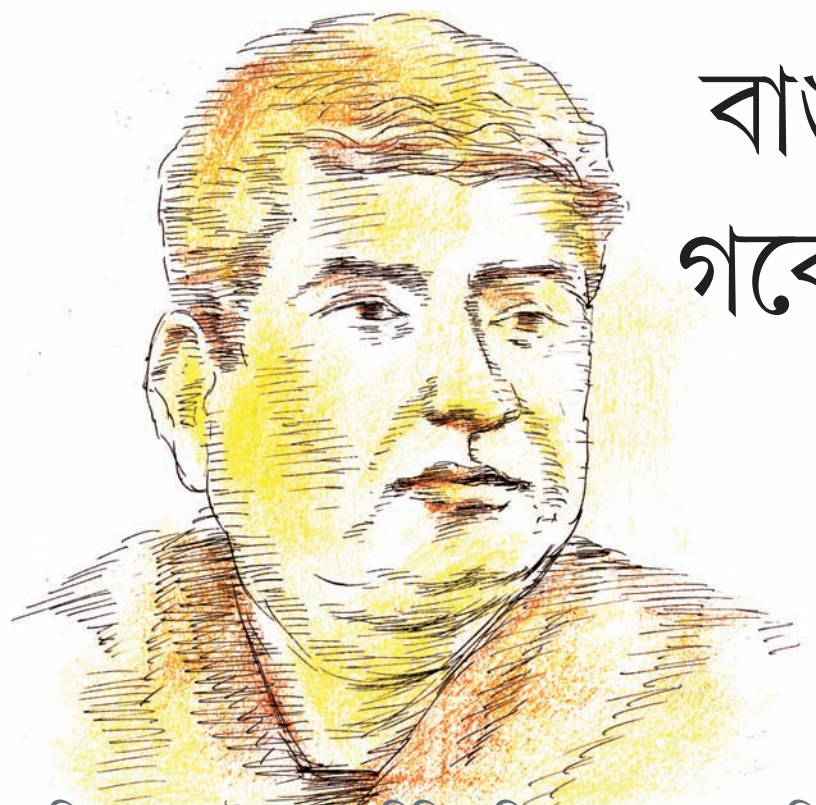

বাঙালির গবেষণার সূচনা

ছাব্বিশ বছর সেই সময়ের নিরিখে বিয়ের পক্ষে বেশ বেশি বয়স। ডাক্তারির ছাত্র গঙ্গাপ্রসাদ সেই বয়সেই অনেক জোয়ার-ভাটা দেখেছে। মা পায়ে হেঁটে পুরী গিয়েছিলেন! গঙ্গাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র ছয়। লিখছেন

নীল সরকার

মা কিন্তু পুণ্য শেষে আর ফেরেননি। জননীহারা দশ বছরের দুর্গাপ্রসাদ, আট বছরের হরিপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ আর মাত্র চার বছরের রাধিকাপ্রসাদ। সে সময় বাড়িতে কাজের মাসিরা থাকতেন। গঙ্গাপ্রসাদের জিরাটের বাড়িতেও ছিল জাহ্নবী। বাচ্চারা সহজ করে ডাকত 'জানি' নামে। সেই জানির হাতেই চার ভাই ও বোনেরা বড় হতে লাগল। গঙ্গাপ্রসাদের পারিবারিক ইতিহাস এই পর্যায়ে বড়ই আনন্দের। বাবা প্রথম জীবনে পিতৃহারা হয়ে মামার বাড়িতে মানুষ। বড় হয়ে কখনও মুহুরি, কখনও দারোগা। সে পেশা যাই হোক বিশ্বনাথবাবু সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। জিরাটে নিজস্ব বাড়ি। আর দানধ্যানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। শোনা যায় বড় মেয়ের মুখেভাতে এলাহি আয়োজন করেছিলেন। খরচ করেছিলেন হাজার টাকা। এমন রাজকীয় আচরণ, খরচের জন্য সকলে তাকে বাবু বলতেন। 'বাবু' তখন বেশ অভিজাত সম্বোধন। শুধু যে দেশে খরচ করতেন তা নয়, পুরীতে গিয়ে জাঁকজমক করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর? একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে পড়ে গেলেন। মাথায় আঘাত। তারপর মাত্র একমাস ছিলেন বিশ্বনাথবাবু। মা চলে গিয়েছিলেন ১৮৪২ সালে, বাবা ছেড়ে গেলেন চিরতরে ১৮৪৯ সালে। মাত্র সাত বছরের ফারাকে দুটো বড় ধাক্কা, আরও বড় আঘাত ছিল পাওনাদারদের তাগাদা। দাদা দুর্গাপ্রসাদ কলকাতায় পড়তে গিয়ে স্কলারশিপ পেলেন। সে টাকার এক অংশ দিয়ে জিরাটের সংসার চলত। কারণ বিশ্বনাথবাবুর টাকা জমানোর ধাত ছিল না। তবে চারজন ছেলেরই মাথাটা ছিল খাসা। যেমন স্মৃতিশক্তি তেমনই অঙ্কে মাথা। এটা সকলে জানে ভারতে শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল স্মৃতি। যাই হোক প্রথমে শিক্ষকতা, শেষে পূর্ত দফতরে চাকরি পেয়ে থিতু হলেন দুর্গাপ্রসাদ। কাঁসাই নদীর বাঁধ তাকে এনে দিল প্রতিষ্ঠা। ছিলেন শিক্ষক, হলেন বাস্তুকার। তখন এমনটা হত।

সিপাহী বিদ্রোহের বছর ১৮৫৭ সাল। তবে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল মে মাসে, তার আগে জানুয়ারিতে ১৮৫৪ সালের 'উডস ডেসপ্যাচে'র হাত ধরে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরদের পাশে বসিয়ে লর্ড ক্যানিং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করলেন। তা ছিল শুধুমাত্র পরীক্ষা নেওয়ার মালিক। বাঙালির নবজাগরণ-বীজ রোপণ করা হল। গঙ্গাপ্রসাদ সেই

বছরই এন্ট্রান্স পাস করলেন। চার বছরের মাথায় রবীন্দ্র-প্রফুল্ল আগমনের বছরে বিএ। মানুষের জানার আগ্রহ ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কারও আগ্রহ হয় একমাত্রিক, কারও বা বহুমাত্রিক। গঙ্গাপ্রসাদের ছিল বহুমাত্রিক। প্রথমে ছয় মাস আইন পড়লেন ব্যারিস্টার ই.সি. মনট্রি-ওর কাছে। ওদিকে সাহিত্যে মিল্টন, কিটস তাঁর ঠোঁটস্থ। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়তে নাম লেখালেন মেডিক্যাল কলেজে। পরের বছর বিয়ে করলেন জগত্তারিণী দেবীকে। ১৮৬৪ সালে ছাত্রাবস্থাতেই হল প্রথম সন্তান। তখন থাকেন বউবাজারের মলঙ্গা লেনের বাড়িতে, ভাড়াবাড়ি। দিনটা ছিল ১৮৬৪ সাল খুব বিখ্যাত। মার্কিন দেশে গৃহযুদ্ধ চলছিল। কলকাতায় সাইক্লোন আছড়ে পড়েছিল। সারা বাংলায় প্রায় সত্তর হাজার লোক মারা যায়।

প্রথম সন্তান, আদরযত্ন বেশি হয়। হচ্ছিল না যে সেটা বলা যাবে না। কিন্তু আড়াই বছরের মধ্যে ভাই এসে হাজির। ভাই আসতেই টনক নড়ল। প্রথমত, ভাই আদরের এক ভাগের অংশীদার। তাছাড়া বাঙালি পরিবারে যা হয়, গায়ের রং ফর্সা হলে, গাবলুগুবলো হলে সকলে আদরটা তাকেই দেয় বেশি। ছেলেটা একদিকে রোগা, গায়ের রংও আহামরি নয়, তার উপর মাথাটা আকারে বেশ বড়। স্বভাবতই বাড়িতে বাবা-মা, অতিথি বা আত্মীয় এলে ভাই হেমন্তের দিকেই সকলের চোখ পড়ত। ছেলেটার সহ্য হল না। গা হাত পা চিড়বিড় করলেও অতিথিদের তো কিছু বলা যাবে না। ভাইকে একটু শিক্ষা দিতে হবে, তবে জ্বালা জুড়াবে। ছোটবেলায় এমন মানসিকতা বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়? বাবা মা জানতে পারলে অভিজ্ঞতাটা নিশ্চয়ই সুখকর হবে না। ওদিকে ভাইয়ের আদরও মেনে নিতে পারছেন না। একদিন ভাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। "লোহার রডটা ধর দেখি।" ভাই আর কী করে জানবে দাদার পেটে এত প্যাঁচ। দাদা বলছে, সরল বিশ্বাসে তুলে নিল! তারপরই রাম চিৎকার। ভাই যখন চোখ খুলল, দেখল বাড়ির সকলে দাঁড়িয়ে শুধু দাদাই নেই। গরম লোহার রডে ভাইয়ের হাতে ছ্যাঁকা। তাড়াতাড়ি পেঁয়াজবাটা লাগায়। বাচ্চার কান্না আর থামে না। এবার খোঁজ পড়ল দাদার। কোথায় সে পাষণ্ড? দাদা ততক্ষণে বুঝে গিয়েছে কী সর্বনাশ হয়েছে। খোঁজ। খোঁজ। দাদার টিকিও দেখা গেল না। বাড়ির বড়দের কপালে ভাঁজ! সেও তো বাচ্চা! তাকে অন্যায়ের জন্য সাজা দেওয়ার চিন্তা ততক্ষণে লোপ পেয়েছে। বাচ্চাটার কিছু হল না তো? অবশেষে শোনা গেল ঘোড়ার জুড়ি গাড়ির ভিতর থেকে ফোঁপানোর আওয়াজ। বড় খোকা উদ্ধার হল। বাড়ির বড়রা হাঁপ ছাড়ল। এই ঘটনার প্রায় ১৮ বছর পর ছোট খোকা হেমন্ত জ্বরের মোকাবিলা করতে পারলেন না। মাত্র বিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনে ছেদ পড়ে। সেদিন বড় খোকা চোখের জল সামলাতে পারেননি। আর গঙ্গাপ্রসাদ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ঈশ্বরের দরবারে হাজির হন। সকলে বলে ছোট খোকার শোকে। আশুতোষের মেজো ছেলে ভূতো ওরফে শ্যামাপ্রসাদ কালো ছিলেন আর বিজয়ার দিন জন্ম বিজু ওরফে উমাপ্রসাদ ছিলেন ফর্সা। সেই হিংসেয় ভূতো বিজুকে কামড়ে দিয়েছিলেন।

বড় খোকার পাতলা শরীর বিশাল মাথা হলে কী হবে, ছেলের মগজ এই সময়ে হলে সুপার কম্পিউটারের মর্যাদা পেত। যা শুনে, যা পড়ে চট করে আত্মস্থ করতে পারে। গঙ্গাপ্রসাদের চোখে এই অনন্য প্রতিভা নজরে এল। কিন্তু খোকার নজর তখন ভিন্নদিকে। বাবার জুড়ি গাড়িতে চড়ে। তার গাড়িটা বেশ পছন্দ হল। না ঠিক গাড়ি নয়, গাড়োয়ানের কাজটা মনে ধরল, চাবুক হাঁকড়ালে কেমন ঘোড়াগুলো ছুটে যায়। সে এক যেন স্বপ্নের দৌড়! তখন রূপকথায় ঘোড়ার গাড়ি ছড়াছড়ি। তক্কে তক্কে থাকল। মওকা বুঝে একদিন গাড়োয়ানের আসনে দাঁড়িয়ে চাবুক চালাল। শপাং। তারপর যে কী হল? পায়ের তলায় পৃথিবীটা দুলে উঠল। পাক্কা তিন ঘণ্টা পরে যখন জ্ঞান ফিরল, ততক্ষণে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছে। বাড়ির বড়দের অজ্ঞান হতে বাকি!

গঙ্গাপ্রসাদ হাত ধরে রোজ ভোরে বাচ্চাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। ভোর চারটের ওঠার এই অভ্যেস তাঁর আজীবন ছিল। বেড়ানোর ফাঁকে পিতা-পুত্রে ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হত! ইংরেজ কবি ক্যাম্পবেলের "Pleasme of Hope"-এর তিনশো লাইন, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট-এর প্রথম কেন্ট তিনি চোখ বুজে গড় গড় করে বলে যেতেন। পরবর্তীতে অনুবাদও করেছিলেন। তখন তিনি ক্লাস থ্রির ছাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণিতে সমাধান করেছিলেন প্রথম কলা বিভাগের প্রশ্নপত্র। নীতিপদ, কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরীর মতো বই তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারতেন। টের পাওয়া যায়, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর কতটা দখল ছিল। বড় খোকার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও অঙ্কে দখল দেখে বাবা গঙ্গাপ্রসাদ মুগ্ধ। ঠিক মতো দিক নির্দেশ পেলে এই ছেলে দিকপাল হবে।

১৮৬১ সালও ভারতের ইতিহাসে বেশ আলোকিত বিষয়। সেই বছর কাথিয়াবাড়ের রাজপরিবারের এক কর্মচারীর ঘরে একজন জন্ম নেবেন। পরবর্তীকালে সততা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খ্যাত হবেন। অত দাপুটে ইংরেজরাও তাঁকে ভয় পেত। নাম মোহনদাস। সেই ১৮৬৯ সালেই বড় খোকা প্রথমবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা রাখল। ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া শিশুবিদ্যালয়ে। বাড়ির কাছে। কারণ গঙ্গাপ্রসাদ সরকারি চাকরি পাননি। তিনি বহু পরামর্শ করে চেম্বার খুলেছিলেন কলকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে। নব্বই বছর আগেও মানুষ ভবানীপুর থেকে কলকাতায় আসত। ভবানীপুর তখন উঠতি জনপদ প্রচুর খ্যাতনামা ব্যক্তির আবাস।

যাইহোক, বড় খোকা একটু মুখচোরা, চুপচাপ। কথাবার্তা কম বলে। প্রথমদিনে বিদ্যালয়ে গিয়ে অবাক। শিশুবিদ্যালয়ে যা হয়, চিৎকার চেঁচামেচি। ফিরে বাড়িতে জানিয়ে দিল ওটা বিদ্যালয় নয়। যাত্রার আসর। ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসে যাত্রার আসরকে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। তবে বিদ্যালয় শিক্ষার উপর ছেলের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মানুষ ছিলেন না ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ। পণ্ডিত পঞ্চানন পালধির কাছে পাক্কা উনিশ বছর সংস্কৃতচর্চা করেছিলেন। লন্ডন মিশনারি স্কুলের শিক্ষক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মধুসূদন দাসও ছিলেন। মধুসূদন দাস পরবর্তীকালে ওড়িশার বড় নেতা হয়েছিলেন।

তবে বড় খোকার শরীর কখনওই পুরো সুস্থ হয়নি। প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময় ভয়ঙ্কর ফোঁড়া হল শরীরজুড়ে। সেই ফোঁড়ার দাগ পরবর্তী জীবনেও ছিল। পেটের গন্ডগোল, বুক ধড়ফড়, এমন সব রোগ লেগেই ছিল। শোনা যায় তিনি নাকি দিনে তিনসের দুধ ও মাখন খেতেন। ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ একা ঝুঁকি নিতেন না। ইংরেজ ডাক্তার চার্লসকেও দেখালেন। বড় খোকার মাথার যন্ত্রণা, স্নায়বিক দুর্বলতা, হৃদযন্ত্রের বেতাল চালচলন শুরু হয়েছিল। তখন ডাক্তারবাবুরা পরিবেশ পরিবর্তনের নিদান দিতেন। বড় খোকাকে শুকনো আবহাওয়ায় মীরাটে পাঠানো হল। সেখানে আত্মীয় শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থাকতেন। পুজোর আগে গিয়েছিলেন। মোটামুটি তিন-চার মাসের মধ্যে বেশ শারীরিক উন্নতি হয়। ফেরার পথে গাড়ি মুঘলসরাই রেলস্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। স্টেশনে বাংলার দু'প্রজন্মের দুই যুগপুরুষের দেখা হয়। একজনের হাতে বাঙালির হাতেখড়ি অন্যজনের হাতে বাংলার উচ্চশিক্ষার সূচনা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বালক আশুতোষের জ্ঞানের বহর দেখে তুষ্ট। বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা সঙ্গে সঙ্গে বালকের জন্য স্পিনক কোম্পানির দোকান থেকে একটা রবিনসন ক্রুশোর বই উপহার দিয়েছিলেন। সেই বই পুরোটা পড়ে তো ছিলেনই এবং যত্ন করে সংরক্ষণ করেছিলেন অবশ্য রবিনসন ক্রুশো ও গালিভারস ট্রাভেলস তাঁর আগে মুখস্থ ছিল। বোঝা গেল ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের পরিশ্রম বৃথা

যায়নি। ছেলেকে উৎসাহ দিতে তিনি নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরীক্ষায় প্রথম হলে রোজ এক টাকা, দ্বিতীয় হলে আটআনা। ডাক্তারবাবুকে এক টাকাই বেশি দিতে হত। ডাক্তারবাবু ততদিনে বাংলায় ধাত্রীবিদ্যার উপর বই লিখে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। ভবানীপুরে তখন গোপাল রায় বলে একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারবাবু ছিলেন। তবু ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের পসার জমাতে অসুবিধা হয়নি। ভারতের প্রথম জনগণনার বছর 'অ্যানাটমি' বইটা প্রকাশিত হয়। পাঁচ টাকা দাম। বাজারে দারুণ কদর হয়েছিল। তবে ছেলে আর যাই হোক পেশা হিসাবে চিকিৎসাবিদ্যাকে পছন্দ করুক এটা তিনি চাননি। ডাক্তারবাবুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারক দ্বারকানাথ মিত্র। তিনি মাঝে মধ্যে আসতেন। তাঁকে দেখে ছেলেটি মুগ্ধ। ইচ্ছে হয় বড় হয়ে জজসাহেব হবেন। ডাক্তারবাবুর ফিজ দেওয়ার কষ্ট তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। পাঁচ টাকা ভিজিট দিতে বহুজনকে গয়না বন্ধক দিতে হত। ডাক্তারবাবুর বিবেকে বাধত। অমন টাকা তিনি নিতে পারতেন না। জ্ঞানের দিক দিয়ে যা হয় হোক, বড় খোকা ভীষণ চাপা। কিন্তু কথা বলতে না জানলে কী করে চলবে? বলিয়ে কইয়ে না হলে জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ হবে না। অতএব টুল এল। টুলের উপর দাঁড়িয়ে খোকাকে বক্তব্য রাখতে হবে। শুরু হল চর্চা। বই হিসাবে পছন্দ হল "Bell's Elocation", "Public Speaker' পরবর্তীকালে এমন মুখচোরা মানুষের সামনে কেউ দাঁড়াতে সাহস পেত না, এমনকী লাটসাহেবরাও তিনি বলতে উঠলে চিন্তায় পড়তেন। ব্যবস্থাপক সভায় মহামতি গোখলে ছাড়া তাঁর মতো বাগ্মী আর কেউ ছিলেন না। লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ আইন তাঁর বক্তব্যের জোরে পরিবর্তিত হয়। তবে সে সব দেখার জন্য গঙ্গাপ্রসাদ ইহলোকে ছিলেন না।

১৮৭৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষার আগে অতিরিক্ত পড়তে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গায়ে একজিমার মতো ঘা। তিনি সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও প্রথম হলেন হিন্দু স্কুলের প্রশান্ত কারফর্মা। তবে তিনি অকালে চলে যান, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ছাত্র ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের বড় ছেলে এবার নাম লেখালেন বাবার কলেজে প্রেসিডেন্সিতে। একই ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন সিমলার দত্ত পরিবারের নরেন। অধ্যক্ষ সি.এইচ টনি, অঙ্কে ছিলেন ডব্লু বুথ। বাবার সব কথা ছেলেটি মানলেও, পড়ার সময়টা মানতেন না। ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের নির্দেশ ছিল রাত দশটার পর পড়াশোনা বন্ধ। তখন মানব মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ছেলে কান খাড়া করে রাখত। বাবা শোওয়ার ঘরে গেলেই মাথার কাছে রাখা প্রদীপ জ্বালাতেন। শুরু হত পড়া। একদিন ধরাও পড়লেন। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। পড়াশোনা মাথায় উঠল। আবার চললেন পশ্চিমে। এবার জ্যাঠামশাই দুর্গাপ্রসাদের কাছে গাজিয়াবাদে। জুলাই মাস গাজিয়াবাদের শুকনো গরম আবহাওয়া। মাথায় যন্ত্রণা কমল না। তিনি বেড়াতে বেড়াতে একদিন একটা গোলাপ বাগানে ইঁদারার পাড়ে বসেছিলেন। যা হয়, এক দুষ্ট ছেলে ঢিল ছুড়ল, লক্ষ্য ভীমরুলের চাক। কথায় বলে ভীমরুলের চাকে ঘা। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের ছেলের কপাল মন্দ। বেচারা ভীমরুলের ভয়ঙ্কর কামড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। বাড়ির লোকেরা জানত না। খুঁজে পাওয়া গেল। জ্ঞান ফিরতে দেখা গেল মাথার যন্ত্রণা চলে গিয়েছে। সকলে খুশি। তবে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

কলকাতায় ফিরতে আবার মাথার যন্ত্রণাও ফেরে। উপরি পাওনা, টাইফায়েড। টাইফায়েডে ডান হাত অকেজো হয়ে যায়। এমন অবস্থায় পরীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না। লেখার হাত চলছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বিশেষ অনুমতি নিলেন! সুস্থ না হলে ছেলেকে পরীক্ষা থেকে বিরত করতে পারতেন। কিন্তু ছেলের আস্থার বিষয়টা ঘাটতির দিকে চলে যেত। তিনি চাননি ছেলের আত্মবিশ্বাসে কোনও আঘাত হোক। ফলে ছেলের হাত অবশ হয়ে গেলেই বাবা ব্যাটারি দিয়ে চার্জ দিতেন কনুইয়ের কাছে। আবার হাত সচল হত, ছেলে পরীক্ষা দিত। এভাবে তিনি তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। এই সময় তিনি ক্রমশ মাছ, মাংস খাওয়া ছেড়ে দেন। তবে দুধটা ছিল নিয়মিত পদ। আর ছিল সন্দেশ, পরবর্তীতে তিনি ভীমচন্দ্র নাগের নিয়মিত ক্রেতা ছিলেন। এর প্রায় উনিশ বছর পর তিনি প্রচণ্ড পেটের রোগে ভুগছিলেন। তখন ডাক্তার সহজপাচ্য মাগুর মাছের ঝোল ভাত খেতে নির্দেশ দেন। সেই পথ্যে সেরেও ওঠেন।

অঙ্ক, দর্শন, সংস্কৃত প্রভৃতি পাঁচটা বিষয় নিয়ে বিএ পাস করলেন। কিন্তু বিএ ক্লাসে তথাকথিত কলকাতার অভিজাত ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর অতটা সখ্য ছিল না। বরং মফস্বলের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বেশি। তিনি অবশ্য কলেজের সিঁড়িতে বা ক্যান্টিনে সময় নষ্ট করার মানুষ ছিলেন না। হাতে সময় পেলেই সিধে লাইব্রেরিতে চলে যেতেন। এই প্রেসিডেন্সিতে ছেলেটা একবার খুব বিপদে পড়েছিলেন। প্রথমে ক্লাসে এসে অধ্যাপক রবসন মুখে গ্রিস দেশের উপকথা বলে যেতেন। ছাত্ররা নিজের মতো লিখে দেখাতেন। ডাক্তারবাবুর ছেলের লেখা দেখে অধ্যাপক রেগে আগুন। মনে হয় নকল করছেন। বইয়ের লেখার সঙ্গে কমা, ফুলস্টপ পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে। অসম্ভব। ছেলের এক কথা। আমি নকল করিনি। পরে অধ্যাপকের ভুল ভাঙে। বলেন ওর লেখার ধরন বদলাতে হবে। স্মৃতিশক্তির দারুণ প্রশংসা করেন। ছেলেটাকে নিয়ে অন্যরা হাসি-মশকরাও করত। সে সময় ধুতি, পাঞ্জাবি, কোটের সঙ্গে চাদর ছিল পোশাকের অঙ্গ। একদিন হল কী ট্রাম থেকে নামার সময় পায়ে কাঁধের চাদর জড়িয়ে ছেলেটা পড়ে যান। তারপর থেকে ছেলেটা চাদর ব্যবহার করতেন না। অন্যরা করতেন। বাকিরা ব্যঙ্গ করে বলতেন, "চাদর নিবারণী সভার সভ্য" বলে। তিনি অবশ্য এ সমস্ত ব্যঙ্গকে পাত্তা দিতেন না। তেমনি বহু সহপাঠীর ধারণা ছিল, তাঁর জ্ঞান শিক্ষকদের তুলনায় বেশি। বুথ সাহেব ছেলেটার অঙ্কে মাথা দেখে মুগ্ধ। পরবর্তী জীবনেও দু'জনের সম্পর্ক অটুট ছিল। অঙ্গে ছেলেটার কৃতিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছিল। আসবে না কেন বলুন তো? ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার আগে ১৮৮১ সালে কেমব্রিজের "ম্যাথেজ্ঞার অফ ম্যাথামেটিক্স" জার্নালে প্রকাশিত হল তাঁর লেখা। ইউক্লিডের পঁচিশ নম্বর (প্রথম বইয়ের) প্রতিপাদ্যের নতুন ব্যাখ্যা-সহ প্রমাণ দিলেন। মজার কথা এই কাজ করেছিলেন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার আগেই। বি.এ. পরীক্ষার আগে ওই একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় পত্র। এবারের বিষয় "Some extensions, or theoram of Salmon"। এম.এ পরীক্ষার আগে খাঁটি ও ফলিত গণিতের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ছাপা হল। "A note on Elliptic Functions". এরপর এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ধারাবাহিকভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সাধে কী আর লাটসাহেব বলেছিলেন, "তিনি অঙ্কের বিষয়ে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ।" বহুজনের মতে মৌলিক গবেষণায় ভাস্করের পর অঙ্কের জগতে দীর্ঘদিন কোনও ভারতীয় নাম ছিল না। এদেশে যখন গবেষণা বিষয়টা খায় না গায়ে মাখে পর্যায়ে, তখন তিনি গবেষণা করে গবেষণাপত্র ইউরোপে ছাপিয়েছিলেন। ততদিনে অবশ্য রসায়নে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পদার্থবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানে ডঃ জগদীশচন্দ্র বোস এসেছেন। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছে। না গবেষকের জীবন তাঁর জন্য বিধাতা লেখেননি। তিনি বহু বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি অঙ্কে এমএ পাস করার পরের বছর ১৮৮৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় পরীক্ষক। অঙ্কর মতো বিষয়ে ভারতীয়দের সুযোগ মিলত না।

বাংলার বাঘ আশুতোষ গত হয়েছেন প্রায় নয় দশক হল। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর বড় ছেলে স্যর আশুতোষ অমর হয়ে রয়েছেন। এই বছর তার জন্ম সার্ধশতবর্ষ।



বৈশাখীর চর ও একটি ‘জলোদ্ভব’ দেশ

নলিনী বেরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১.

আমাদের গ্রামের আমরা ক'জন দু'দুটো নদী পেরিয়ে দু'দুটো নদী বালি মাড়িয়ে 'রোহিণী চৌধুরানি রুক্মিণীদেবী হাই-ইস্কুলে' পড়তে আসি।

হ্যাঁ, নদী। সুবর্ণরেখা। ওই একটা লাইব্রেরি আর ওই একটা নদী, নদীর এপার ওপার—আমার গোটা জীবনটাকেই বদলে দিল! নদীর ওপারটা আমার স্বদেশ, নদীর এপার গোটাটাই আমার কাছে বিদেশ। বিদেশ বলতে যেমন 'বিলেত' 'আমেরিকা' তেমনি এপারের লোক আমাদের কাছে 'নদীপারের লোক'। আর 'নদীপারের লোক' মানেই বিলেত-আমেরিকার লোক! এমনটাই ভাবা হত, এমনটাই বলা হত। কারণ, নদীপারে 'বাবুঘর' ছিল, রানি শৈলবালার গড় ছিল। বড় হাই-ইস্কুল ছিল, খাটুয়াদের ধানকল ছিল। ডি মৌলী-সালুয়া খড়গপুর-মেদিনীপুর ছিল। হাওড়া-কলকাতা ছিল। কতরকম গ্যাঁড়াকল-ওড়াকল ছিল। আর, আমাদের ওদিকটায়? মুথা-ঘলঘসি-সরন্তি-শুশনি-ঘোড়াকালা-নাহাঙ্গা-বনপুঁই-বনকাল্লা-চ্যাঁকা শাকপাতা ছিল। কাঁকড়ো-কুঁদরি-ভেলা-ভুড়রু-কেঁদ্-কষা-আঁউলা-বাঁউলা-পানআলু-খামআলু-চুন-চুরকা-মেহা-মাদাল ফলমূল ছিল। হা ডুডু - দাঁড়িয়া-কাতি-একমদুকম-ওলডাঁটার বল বেঁধে ফুটবল খেলা ছিল। ভুজু-ডিবরার বোন ছিল। এক গোরুবাগালের পাল্লায় পড়ে তাকে আচমকা 'দ্যাড়ইয়া' বলে ফেলার শাস্তি ছিল। দধিভারিয়া-সাতভায়া-কালপুরুষা-ভুলকা-ভুরখা-রাবণরাজার সিং-দুয়ারের তারা গোনার রাত ছিল। রাতভিত চিড়িকিনী-গোমুহা-কালামুহী-কুচ্‌লা-সাতভউনী-ঝাঁপড়ী-বাউটিয়া ভূত ছিল। মাছ ধরার পাটা-ঘুনি-গাঁতি-মাথাফাবড়ি-চারগোড়িয়া জাল ছিল। নদী পারাপারের জন্য 'হংসী নাউড়ীয়া' ছিলেন। চুল কাটবার প্রথম পরামানিক ছিলেন। আমার চুল কাটবার সময় হলে মেজো কাকাই বলতেন, "দে প্রথম, ললিনটার চুল ছেঁটে, ঘোড়ার ল্যাজের মতো ডগিয়েছে!" প্রথম বলতেন, "আজ থাক কাকা, আরেকদিন!" আরেকদিনও ছেঁটে দিতেন না প্রথম, কেবলই দিন ফেলতেন। এদিকে পরামানিকের অবহেলায় আমার চুলগুলি লাউডগার মতো লতিয়ে ঘাড়ে নামত। আঁকশির মতো বেঁকে যেত। যদি বা কোনওদিন দয়া দেখিয়ে তিনি কাটতে বসতেন—বড় অবহেলায় সেদিন সবকিছুই ছেঁটে দিতেন। ইউ-ছাঁট, উত্তম-ছাঁট তো দূরঅস্ত, শ্রীমন্তদার বিয়ের দিনটাতেই বেবাক মাথা মুড়িয়ে দিলেন আমার!

২

আমার মেজোকাকা তখন তল্লাটের নামজাদা কোবরেজ। দূর দূর গ্রাম থেকে সাঁজ-সকাল রাত-বিরাত 'কল' আসছে। কারও বুকে 'পদ্মল ঘা', কারও বা সান্নিপাতি, মধুমেহ। তারমধ্যে একটা দুটো 'সাপ-কাটি' তো আছেই! কাকার ক্লান্তি নেই, রোগীর অবস্থা বুঝে রোগের নাম শুনে—ওই যা একটু ভুরু কুঁচকানো! তারপর ওষুধের বটুয়া-হাতে ধন্বন্তরির মতো বেরিয়ে পড়া। ওষুধগাছের কতরকম নাম—গদ্‌গাছ, কিরকিচ, পিটনাসিজ্, ঘি-কুমারী, লাল ভেঁড়রা, হাড়জোড়া, দধিগড়া, দুধিয়া, শ্বেতবিড়ালা, ছাগল-হাঁচি। ছাগল-হাঁচি কী বাঘ নখীর দ্রব্যগুণে যখন পদ্মল ঘা ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসছে, গদ্‌গাছের রসে কী গোলমরিচের গুঁড়োয় 'সাপ-কাটি' রোগী যখন আস্তে আস্তে চোখ খুলছে, তখন আমাদের দশাসই মেজোকাকা ঘরে ফিরে মাটির দাওয়ায় বসে এমন সর্বহারার ভাব করতেন যে, আমাদের মা-কাকিরা তার কোনও কূল-কিনারা খুঁজে পেতেন না।

আসলে মেজোকাকা মনে মনে অঝোর ঝর্ ভাবতেন—সবই তো হল, কিন্তু অতঃপর কে? মেজোকাকার অবর্তমানে তাঁর



কোবরেজগিরি কার উপর বর্তাবে? "কারে দিয়া যাব গো"—এহেন আকুল চিন্তায় অত সাফল্যের পরেও আমাদের মেজোকাকা কেমন যেন মুষড়ে পড়তেন! অগত্যা মা-কাকিরা যোগ্য উত্তরসূরি ভেবে আমাকেই ঠেলে-গুঁজে পাঠিয়ে দিতেন, "যা না রে ললিন, দু-চাট্টা 'সাপ-কাটি'র মন্তর অন্তত শিখে নে!" অমন সুযোগ হেলায় হারাস না!" সেই হাঁটুমুড়ে বসা, হাঁটুতে কাপড় ঢেকে বসা। মেজোকাকা ফিস ফিস করে আউড়ে চলেছেন, "মেঘ কন কন আঁধার রাতি সাপে মারল ঘা। হেনকালে বিপদ হৈল স্মরণ করব কা।।"

আমিও বিড় বিড় করে মুখস্থ করছি, "মেঘ কন কন আঁধার রাতি সাপে মারল ঘা..." আর যাই কোথায়? মুখস্থ করছি বটে, কিন্তু মুহুর্মুহু মনে হচ্ছে, এই বুঝি একটা 'হলহলিয়া' ওই বুঝি একটা 'দুধিয়া'! যেন ঢুকে গেল পায়ের তলায়, দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গেল!

গলে আর গেল কোথায়? ওই তো ফিরে এল হল্ হল্ করে, আংকুড়া-বাঁকুড়া হয়ে। চোখ বুজে ফেলি ভয়ে, "হেনকালে বিপদ হৈল স্মরণ করব কা?" না মেজকা, আমার দ্বারা ওসব হবে না।"

কোবরেজ হওয়ার অত বড় 'চান্স'টাই মাটি হয়ে গেল আমার!

আর কী হওয়া যায় অতঃপর তক্কে তক্কে থাকি। পাশের গ্রাম বড়োডাঙায় সন্ধে হলেই আসর বসে যায়। 'হাটুয়া'দের আসর। 'নাটুয়া' নাচ হয়, 'চিড়িয়া-চিড়িয়ানী'র গান। 'ফরি খেল'-এর মাঠে লম্বা লম্বা লাঠি-হাতে মহড়ায় নেমে যায় ভটাডোম। প্রহ্লাদ সিং। মহড়া নাচ হয়।

তিরি তিরি করে হাওয়ায় কাঁপতে থাকে তলোয়ারের মতো ধারালো আখের পাতাগুলি 'আখুবনে', নদীধারে। হয়তো কাঁকড়ার খোঁজে খালেবিলে ভ্রাম্যমাণ দু-চাট্টা শিয়াল ডেকে ওঠে একত্রে, একসঙ্গে। হাওয়ায় ভেসে আসে ঢোল-বাজনার তালে তালে, 'চিড়িয়া-নাচুয়া'দের গান—"আলো যুবাকালে মো পাশে নাহি মোর ঘৈতা লো...আ লো ঘৈতা লো..."।

আর এসবেরই নাটের গুরু নুয়াসাহির অন্ত দত্ত। জাতে রাজু। আমি তাঁকে যারপরনাই সমীহ করি। তাঁর হাত ধরে কত কত ছোকরাই যে তরে গেল! আমাদের গ্রামের টুম্পা, ভাল নাম সত্যরঞ্জন, অনন্ত দত্তের হাতের ছোঁয়ায় বনে গেল এ তল্লাটের নাম করা নাচুয়া।

লাইবুকু, ভাল নাম নবীন, নবীন হয়ে গেল এ তল্লাটের সেরা গায়িকা। দু'হাত মেলে ধরে, দু'হাত নেড়ে চেড়ে মেয়ে সেজে সে যখন গাইতে শুরু করে, "কে নিবি ফুল? কে নিবি ফু-উ-ল? বেলা-মালতী-চাঁপা ও বকুল..."

তখন? তখন হাততালির ছর্‌রা ফুটে উঠবে না ভরা আসরে? তামাম দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠবে না, "এ-ন্-কোর! এ-ন্-কোর!!" অর্থাৎ, দৃশ্যটা আবার হোক, আবার হোক!

তো, সেই লাইবুকু ওরফে নবীন হয়ে গেল আমার 'রোল মডেল'। তখন স্বপ্নে-জাগরণে শুধু 'নবীন' 'নবীন'।

তার উপর নাটের গুরু অনন্ত দত্তেরও কী জানি কীভাবে পছন্দ হয়ে গেল আমাকে। আমাদের গুরুবারের হাটে মুলো-সজনে ডাঁটা-পোকামোকা বেগুন শুকামাছ সওদা করতে এসে রাজুর পো তো হপ্তায় হপ্তায় দরবার করে গেলেন মায়ের কাছে, "বউদি গো, টকাটারে মোর নাটুয়া দলে সঁপি দত্ত, মু গড়িপিটি মানুষ করি নিমু!"

একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ! আমাকে আর পায় কে? লাউ-বৈতালের ছায়াঘন মাচানতলে ঝিঙা-কাঁকুড়ের জালিভরা লতাবিতানে নিজেকে লুকিয়ে রেখে আশাতুর চোখে চেয়ে চেয়ে দেখি, পড়ন্ত বেলার ঝিলিমিলি রোদ এসে পড়েছে মায়ের মুখে। মা কি হাসছেন? মায়ের ঠোঁট দুটো কি নড়ছে? কিছু কি বললেন মা? মা কি হাসলেন? না শুধুই রাঙা-ভাঙা রোদ?

"হ্যাঁ" করে দিন না মা, রাজুর পো অত করে বলছেন যখন!

গরু ছিল, গরু গেল। ঘর ভরতি ছাগল ছিল, ছাগলও গেল। অবশিষ্ট আর একটাই মুরগি, ওই মুরগিটাই যখন সন্ধের মুখে এক পা তুলে টি-টি করে আমাদের ঘরে ঢুকতে গেল, তখন ঘরের মুখটায় বসে থাকা আমার মা হাত নেড়ে একটাও কথা না বলে হই হই করে উঠলেন।

কাকে মা? কাকে? মুরগিটাকে, না রাজুর পো' কে? মা বললেন, "না ঠাকুরপো, ছেলেটা এখন লেখাপড়া করছে—আরও কিছুদূর করুক তো!"

ধুতির খুঁটে বাঁধা কটা পোকা-মোকা বেগুন কাঁধে ফেলে বিমর্ষমুখে অনন্ত দত্ত হাঁটা দিলেন।

আমারও আর যাত্রাদলে 'চিড়িয়া-চিড়িয়ানি' সাজা হল না এ জন্মের মতো। মাঝে মাঝে মা যে কী করেন না!

৩

কোবরেজি গেল, নাটুয়া দলে 'নাচুয়া'-ও হওয়া গেল না—আমার দ্বারা আর কি হবে! হতাশায় হতাশায় মাঠে-ঘাটে-বিলে-বাতানে টঙ টঙ করে ঘুরে বেড়াই। রামধনু ওঠে, দিগঙ্গন কালো করে বর্ষা নামে, যেতে আসতে পায়ের তলায় পায়ের চাপে পুটুস পাটাস করে চেপ্টে গুঁড়ো হয়ে যায় কত যে 'ছাগল-হাঁচি'র ডুমো ডুমো ফল!

পাড়িয়ার বিলে ধানগাছের গোড়ায় নাড়া-জলে হঠাৎ হঠাৎ খলবলিয়ে ওঠে কই কী মাগুর। ধানফুল ঝরে 'আলা' হয়ে যায় করণতলার মঠ, গোঠা ফুলের মালা গেঁথে ঝিরিঝিরি জলে যায় ভেসে যায় 'ধানাহুলু' মাছ। 'কারিকুরি' পাখিরা কখন যে আকাশের কোনদিক থেকে এসে পড়ে!

ঢ্যাপচু-ট্যাঁসা—ওই তো, ওই তো উড়ে গেল জয়পাখি, যাকে বলে নীলকণ্ঠ! "জয়ের জন্য একটা পালক দাও না!" "জয়ের জন্য একটা পালক দাও না!" বলতে বলতে উড়ন্ত জয়পাখির ছায়ার তলে তলে দু'হাত পেতে আকাশে মুখ রেখে দৌড়ুচ্ছি—দৈবাৎ জয়ের জন্য যদি একটা পালক খসে পড়ে!

হঠাৎ ঘাড় নিচু করে দেখি, যেখানে পায়ে চলার পথটা মাকড়া পাথরের 'হুড়ি' ভেঙে উঠে গেছে উপরে, আরও উপরে, সেখানে গাধার পিঠে বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে শিকলি-বাঁধা মেনি বাঁদরকে টানতে টানতে ঘাঘরা পরা এক দঙ্গল নারী-পুরুষ হেঁটে চলেছে চলেছে আমাদের ইস্কুল টাঁড়ের হেলে-পড়া বটতলার দিকে।

ক'দিন বটতলা জমজমাট। ইট-ভাঙা, পাথরের টুকরো, কাদামাটি দিয়ে তৈরি উনুন থেকে ধোঁয়া উড়ছে অনর্গল। রান্না হচ্ছে চামচিকে বাদুড়ের ঝোল।

আমাদের গ্রামের ঝাড়েশ্বর রোজ দু'বেলা ঝরনার দিকে বিলে-বাতানে যেতে আসতে বটতলায় বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। একবার তাকাচ্ছে ফুটন্ত কড়াইয়ে নিহত চামচিকে-বাদুড়ের দিকে, আর একবার তাকাচ্ছে ত্রৈলোক্যদের শিমুল গাছে অবশিষ্ট জীবন্ত ও ঝুলন্ত চামচিকে-বাদুড়ের দিকে, আর জোরে জোরেই বলছে, "ইঃ বাবাঃ! এসব 'হাগ্‌রে-বাজকার'রা আর ক'দিন থাকলে এ তল্লাটের চামচিকা-বাদুড় যে ঝাড়ে বংশে শেষ হয়ে যাবে!"

শুধু কী চামচিকে বাদুড়, ব্যাঙ-ইঁদুর-শামুক-সামখোল-গেঁড়ি-গুগলি—কী-ই না খেত এবারের হা-ঘরে যাযাবরের দলটা! তবে হাঁ, খাপ-খোলা তরোয়ালের মতো ধার ছিল পায়ে 'খাড়ুয়া' হাতে 'বাজু' পরা এবারের যুবতী ঘাঘরাউলীদের।

শম্ভু বাগাল তো তাদের আশপাশে, কী ঝরনায় জল আনতে গেলে, কী গ্রামের ভিতর জড়িবটি বেচতে এলে, অষ্টপ্রহর ছুঁক ছুঁক

করত। তবে তেমন কিছু করে ওঠার সাহস পেত না, কারণ সে শুনেছিল—এ 'জাত'টার ঘাঘরার ভিতর গোঁজা থাকে 'গুপ্তি'। তারমানে এক ধরনের কুক্‌রি, বিষমাখা।

আমার সে-ভয় নেই। যার জন্য, যাদের জন্য বটতলায় সকাল-বিকাল যেতাম-আসতাম, সে বা তারা ঘাঘরাও পরে না, বড়জোর ল্যাজ নাড়ে, কান ঝাড়ে, অন্যের মাথার উকুন বেছে দেয়, আরও বেশি বিরক্ত করলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হেসে ওঠে। ছোলাটা কলাটা ছুড়ে দিলে আরও একধাপ এগিয়ে এসে বড়জোর 'বৈজয়ন্তীমালার ডান্স' দেখায়। কী করে এক লাফে হনুমান সাগর ডিঙিয়ে লঙ্কায় পৌঁছেছিল, লাঠি এগিয়ে ধরলে তাও দেখায়।

সেই আমারও কী যে হয়ে গেল, শুধু রাতটুকু পোহানোর অপেক্ষা সকাল হলেই দৌড়তাম বটতলায়, আর সে তখন এনামেলের থালায় ভাত নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেত। সাদা সাদা ভাত, বাদুড়-চামচিকের ঝোলও না, শামুক-সামখোল গেঁড়ি-গুগলিও না। দু'হাত ভরতি কাঁচের চুড়ি বাজত—রিন্‌ঝিন্‌! রিন্‌ঝিন্‌!!

পায়ে কি 'মল' ছিল? ছিল, ছিল। সে যখন পায়ের মল হাতের চুড়ি বাজিয়ে ঘাঘরা দুলিয়ে ঘুরে ঘুরে খেত, তখন দলের বুড়ো সর্দারটা পায়ের বুড়ো আঙুলে 'গুলতি'র আঙটা আটকে 'ছিলায়' টান দিত। কারও দিকে তাক করেও না, এমনি মিছামিছি। মিছামিছি, মিছামিছি।

তবু সে ভয়ে হোক নির্ভয়ে হোক, এঁটো হাতেই ঘাঘরা গুটিয়ে 'সাজঘরে' ঢুকে পড়ত। আমি তার পুনঃপ্রবেশের অপেক্ষায় আকুল হৃদয়ে পলকহীন চোখে সাজঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

আমাদের গ্রামের দশরথ চুপিসারে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে টের-ই পাইনি। আমার চোখের সামনে হাতের চেটো নেড়ে সে বলছে, "কী দেখছিস অমন ফ্যাল্‌ ফ্যাল করে? চাস যদি তো তোর বিয়ে দিয়ে দেব ওই হা-ঘরে ছুঁড়িটার সঙ্গে!"

পরিষ্কার বাংলা কথা, তবু যেন সে বুঝে ফেলে 'সাজঘর' থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল, এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল লাজে-রাঙা বধূটির মতো। আমিও লজ্জায় নত হই, চেষ্টা করছি কোনও মতে দশরথদার বগলের তলা দিয়ে গলে পালিয়ে যেতে।

দশরথদা জাপটে ধরে বলল, "পালাচ্ছিল যে বড়? বিয়ে করবি তো দাঁড়া!"

আর দাঁড়া, দৌড়-দৌড়, কিন্তু পরের দিন সকাল হলে ফের যে কে সেই, সেই বটতলা, সেই এনামেলের থালা, সেই ঘুরে ঘুরে ভাত খাওয়া। বধূ বধূ ভাব, কী যেন বললও আমাকে! কী বলল?

বলল কী — ওবেলা এসো, কথা আছে?

এ-বেলা নয় ও-বেলা, ও-বেলা নয় সে-বেলা, আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা। আচ্ছাই মেয়ে তো, বলব বলব করেও বলছে না!

অথচ কত জয়পাখির পালক ঝরে গিয়ে পড়ে থাকল পাড়িয়ার বিলে, কত 'কারিকুরি' পাখি পশ্চিম থেকে উড়ে এসে চলে গেল পুবে! পুবে, পুবে। কত না 'ছাগল-হাঁচি'র সবুজে-সিঁদুর রঙের ডুমো ডুমো ফল পায়ের চাপ ছাড়াই মরে হেজে শুকিয়ে গেল!

এসব ছেড়ে খালি ইস্কুল-টাঁড়ের বটতলা। বটতলা আর বটতলা দলের বুড়ো সর্দারটা কতবার যে পায়ের বুড়ো আঙুলে গুলতির আংটা আটকে আমাকে তাক্‌ করে তার ছিলায় টান দিল! তবু নড়িনি।

অবশেষে মনে হল, কাল, হ্যাঁ কাল। কালকেই ধরা দেবে যাযাবরী। রিন ঝিন চুড়ি, এনামেলের থালা, সাদা ভাত, না বাদুড়-চামচিকের ঝোল, না শামুক-সামখোলের তরকারি, ঘাঘরা, ঘাঘরার নিচে 'গুপ্তি' বা 'কুক্‌রি' আছে কী নেই—সব, সব, রহস্যেরই অবসান হবে কাল।

হ্যাঁ, কাল।

তখনও অন্ধকার কমেনি, ইস্কুল-টাঁড়ের বটতলা কুয়াশার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মশগুল, কাকে যেন কাদের যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আমাদের গ্রাম থেকে ইস্কুল-টাঁড়ে যেতে-আসতে একটা নড়বড়ে কাঠের পুল আছে, ধরে ধরে সাবধানে পেরোতে হয়।

আজ যেন মনে হল, পুলটা বেশ শক্তপোক্তই। লাফিয়ে লাফিয়েই পেরিয়ে এলাম। আর তো সামান্যই, দৌড়ব কী? কুয়াশার ধোঁয়া চোখে-মুখে ঝাপটা দিচ্ছে। দু'হাত দূরের জিনিসকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

তবু কুয়াশা ঠেলেই দৌড়লাম। দৌড়, দৌড়।

এক দৌড়ে পৌঁছে দেখি—বটতলা ফাঁকা, জনমানুষ নেই। হা-ঘরে বাজিকররা রাতের মধ্যেই চলে গেছে অন্যত্র। শুধু পড়ে আছে ভাঙা উনুন, পোড়ামাটি, ধোঁয়ামাখা পাথর। কোনটায় বা চুঁইয়ে চুঁইয়ে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

চামচিকে-বাদুড়ের দু-চারটা পোড়া ঠ্যাঙ কী আর নেই? আছে, আছে। নেই শুধু সলজ্জ বধূ-বধূ ভাব নিয়ে বিগলিত যাযাবরী মেয়েটা! সে চলে গেছে, বটতলা ফাঁকা করে চলে গেছে হা-ঘরে বাজিকররাও।

কিন্তু আশ্চর্য! থেকে গেছে একটা গন্ধ, সেই গন্ধটা—সেই গন্ধটাই এখন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে আমাকে, জড়াচ্ছে সমগ্র বটতলাকে। ফেলে যাওয়া গন্ধে বটতলা ম ম করছে। হা-ঘরে বাজিকরদের দলে ভিড়ে হা-ঘরে বাজিকরও হতে পারলাম না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

নদী এখানে পূর্বগামিনী। তার মানে নিরন্তর বয়ে চলেছে পশ্চিম থেকে পুবে। পুবে, পুবে।

আমাদের গ্রামের শিমুলতলার ঘাটে এসে দাঁড়ালে ডাইনে-বাঁয়ে অনেক দূর অব্দি নদী দেখা যায়। ওই তো, তালডাংরা মলতাবনী পাতিনা ছেড়ে দেউলবাড়ে এসে নদী যা একটু বাঁক নিয়েছে। তারপর চলেছে সোজা। থুরিয়ার ওখানে গিয়ে ফের বাঁক নিয়ে নদী ঢুকে পড়েছে লাউদহ কুলবনী কালরুইয়ে। তার উপর রোহিণী চৌধুরানি রুক্মিণী দেবী হাইস্কুলের পাস দিয়ে বহে যাওয়া ছোট নদী ডুলুং কুস্তুড়িয়া হাতিবান্ধির গা ঘেঁষে এসে নবকিশোরপুর-আন্ধারির কাছে মিশে গিয়েছে বড় নদী সুবর্ণরেখায়। বড় নদী ছোট নদী এখানে মিলেমিশে একাকার, যেন বা সমুদ্র!

হোক সে কুস্তুড়িয়া-আন্ধারি-হাতিবান্ধি-লাউদহ সন গ্রাম নামগুলি গেঁয়ো মাটিঘেঁষা অদ্ভুতুড়ে আর বাজে, তবু আমাদের কাছে, 'নদী-সেপার'-এর মানুষদের কাছে ওই হল লন্ডন নটিংহ্যামসেয়ার কানাডা কী কালিফোর্নিয়া। 'বিলেত' 'আমেরিকা'।

ভরা বর্ষায়, শ্রাবণ-ভাদ্রে, সাড়ে চার ফুটিয়া হংসী নাউড়িয়া যখন 'ছলাৎ ছলাৎ' শব্দে নদীজলে দাঁড় বাইতে বাইতে কুস্তুড়িয়ার ঘাট থেকে 'ভরা' নিয়ে 'নদী সেপারে' বড়ডাঙার ঘাটে, তার মানে আমাদের ঘাটে গিয়ে নৌকা ভিড়ান, ডোরা-কাটা তেলচিটে লুঙ্গির কষি এঁটে 'গজাল' হাতে বুক চিতিয়ে দাঁড়ান, তখন মনে হতেই পারে—কালিকট বন্দরে এই বুঝি নামলেন 'ভাস্কো দা গামা'!

নাউড়িয়ার পো'কে কতদিন বলেছি সে কথা। হংসী নাউড়িয়া সেসব ধর্তব্যে নেন না, হেসেই উড়িয়ে দেন, আর বলেন, "ধুর বাবু! সা-রে-গা-মা সা-রে-গা-মা করি কীই যে বকর বকর বকট ললিন! সেকথা থাউ।"



'থাউ'—তার মানে থাক। থাক বললেই কী ফেলে রাখা যায়? বস্তুত আমারই পীড়াপীড়িতে, বলতে কি আবিষ্কারের আনন্দেই তিনি আমাকে ডোঙায় করে মাঝে মাঝেই নিয়ে যেতেন নদীধারের 'জাহাজ কানার জঙ্গলে'।

'জাহাজ কানার জঙ্গল'—ওই যেখানে এককালে সুবর্ণরেখার নদীগর্ভে মালমশলা বোঝাই একটা আস্ত জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। যে-জাহাজ নাকি বালিপোত হয়ে মাটিপোত হয়ে এতদিনে 'জাহাজ কানার জঙ্গল'!

তার মানে সুবর্ণরেখা নদীতে এককালে জাহাজডোবা জল ছিল। জাহাজকে ডুবিয়ে দেওয়ার বড় বড় ঢেউ ছিল। জোয়ার ছিল, ভাটা ছিল। সমুদ্র ছিল খুব কাছেই। নাকি এই সেদিনও সেই ডুবো জাহাজের 'কানা' ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে, দ্বিপ্রহরে, নদীজলে ঝলসে উঠত। 'নদী সেপারের' মানুষ যেতে-আসতে আচম্বিতে কতদিন দেখে ফেলেছে!

জাহাজ কানার জঙ্গলে কতরকম গাছ! এদেশীয় গাছ কী আর? সব অজানা অচেনা। শাল-মহুল-ধ-আসন-কুচলা-কইম—একটাও না। দারুচিনি লবঙ্গও না। কে জানে এক জাহাজ বোঝাই মসলাপাতি, না বিদেশি কিসের কিসের বীজ ছিল, যার থেকে গাছ!

হংসী নাউড়ীয়া বেছে বেছে একটা গাছের গায়ে নৌকার গজাল দিয়ে খোঁচা মেরে জানতে চাইতেন, "অওটা কি গাছ কও ত ললিন?"

"জানি না, সেইটাই তো আমাদের আবিষ্কার করতে হবে নাউড়ীয়ার পো। তাই আপনাকে বলছিলাম না—ভাস্কো দা গামা...?"

২

বর্ষায় যখন নদীনালা একাকার হয়ে যায়, 'নদী-পারের' আন্ধারি-নবকিশোরপুরের ঘাট আর 'নদী-সেপারের' বড়োডাঙা-থুরিয়ার ঘাট এক হয়ে যায়, করণতলা-পাকুড়তলা-'পহলাদের পাটাঘাটি' জলে জলময়, খান্দারপাড়া-দেউলবাড় যখন আধাআধি জলের তলায়, নদীর মাছ-কাছিম-বালিগড় যখন অনায়াসে গবাদি পশুর পায়ে পায়ে ছরছরিয়ে উঠে আসে আমাদেরই গ্রামের জুনিয়ার হাইস্কুলের মাঠে, তখন, ঠিক তখনই নাউড়ীয়ার পো আমাদের ঘরে এসে হাঁক দিয়ে যান, "ললিন! যাব নাকি লৌকাবিলাসে?"

নৌকাবিলাস। নৌকোটাকে ফুল-চন্দন-তেল-সিন্দুর দিয়ে ঘটা করে সাজাতে হয়। আর এসব কাজে হংসী নাউড়ীয়ার উৎসাহটাই বেশি! কারণ, তাঁর নৌকোটাই তো বাছা হয় নৌকাবিলাসের জন্য। তাঁর নৌকোটাই তো একমাত্র নৌকাবিলাসের সাজগোজ করে।

আরও কেউ কেউ অবশ্য সাজে, তারা গাঁয়ের কীর্তনীয়ার দল। মাথায় তিলক, গলায় কাঠমালা, গায়ে লাউফুলের মতো সাদা গেঞ্জি, গলায় গামছা, পরনে ধুতি। বেজে ওঠে খোল-কত্তাল, গুপীযন্তর। নৌকায় উঠে শুরু হয়ে যায় 'নৌকাবিলাস'।

শুধু কী নৌকাবিলাস—মাথুর মানভঞ্জন বৈঠকী, আরও কত কী! নৌকা তির তির করে চলতে থাকে উজানে। ভাটিতে নামবে সেই ওবেলা। এখানে, গ্রামের সেই ঘাটে এসে দাঁড়ালে নদীর বুকে সূর্যের উদয়াস্ত দেখা যায়।

রাত্রি শেষে, ভোর ভোর, যখন তপোবন জঙ্গলমহালের লোধারা কাঠ কাঁধে, দু'পায়ে ভসভসে বালি ছড়িয়ে 'নদী-পারে' বিদেশ-বিভুঁইয়ে কাঠ বেচতে চলে আসে, তারা অবশ্য ফিরেও দেখে না—কোথায় কোন 'কাঁদালে' কখন সূর্য উঠল আর কোথায় কোন 'গাড়হায়' সূর্য অস্তে গেল! কারণ তাদের হাতে অত সময় কোথায়?

তারা তাদের মতো গেল তো গেল, বিরি-বেগুনের ঝাড়ের উপর কুয়াশার জল শিশিরের জল যখন মাকড়শার জাল বুনতে থাকে ধীরে ধীরে, তখনই, ঠিক তখনই তটে এসে পুবমুখো দাঁড়ালে মনে হবে বাছুরের মতোই লাফ দিয়ে জল থেকে ছলকে উঠল সূর্যটা!

প্রতিদিনই ওঠে, ওঠার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় নদীজলে রঙের খেলা। কে যেন—কে যেন কি, সূর্যটাই আপন খেয়ালে জলে রং গুলে চলে আর সে রং মেখে ছোট ছোট ঢেউগুলি ছল ছল করে নাচে। এসময় 'নদী-সেপার' থেকে কেউ যদি এপারে আসে, এপার থেকে কেউ যদি 'নদী-সেপারে' যায় তবে সেও তার অজান্তে চাট্টি রং মেখে রাঙা হয়।

হংসী নাউড়ীয়া তো প্রতিদিনই হন। কারণ এসময়ই তিনি "ওঁ গঙ্গা" "ওঁ গঙ্গা" বলে খানিকটা নদীজল মাথায় ছিটিয়ে নৌকোর কাছি খুলে নৌকোটাকে ঈষৎ পায়ে ঠেলে দিনের কাজ শুরু করে দেন। এমন সময় তাঁর তেলচিটে নীল লুঙ্গিটাও রাঙা আলোয় ময়ূরকণ্ঠী রং ধরে!

৩

তো, যা বলছিলাম— নৌকাবিলাস...খোল-কত্তাল...কীর্তনীয়ার দল, এ-গাঁয়ের সে-গাঁয়ের কয়েকজন মান্যগণ্য মাতব্বর, পঞ্চাৎ

কুচোকাঁচা, আমারই বয়সি ছেলেছোকরা সমভিব্যাহারে নৌকোটা যখন জল কেটে কেটে উঠে চলে উপরের দিকে, আরও উপরে, যখন 'নদী-সেপারের' গ্রাম খান্দারপাড়া দেউলবাড় পাতিনা তালডাংরা মলতাবনী, 'নদী-এপারের' গ্রাম আন্ধারি নবকিশোরপুর হরিপাল ঢেরাছাড়া খাড়বান্ধি রগড়া পড়ে থাকল নিচে, আরও নিচে; রামেশ্বর জীউর মন্দির তিলকমাটির 'হুড়ি' খুদুপাড়ের চর বৈশাখীর পাল ক্রমশ অপসৃয়মাণ, তটবর্তী দু'ধারের জনপদ লোকালয় বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক, যখন মন্দিরা মৃদঙ্গধ্বনি সহযোগে শ্রুত রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক 'নৌকাবিলাস' কর্ণকুহরে লৌকিক নয় প্রায় অলৌকিক হয়ে উঠেছে, তখন মনে হতেই পারে, আমার তো হতই— ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়ি জলে অথবা নদীর প্রচণ্ড স্রোত এসে ডুবিয়ে দিক আমাদের নৌকোটা বা পাকাদি সমাপনের নিমিত্ত কাষ্ঠসংগ্রহে অরণ্যে নেমে সমভিব্যাহারিগণ আমাকে বিসর্জন দিয়ে আসুক নদীতীরে বনবাসে!

আর তারপর, অ্যামেরিকো ভেসপুচ্চি, মার্কোপোলো কিংবা ভাস্কো-দা-গামার মতো আমিও আবিষ্কার করে ফেলি কোনও একটা নতুন ভূখণ্ড, গালিভারের লিলিপুট-ব্রবডিংনাগ-লাপুটা, নবকুমারের ন্যায় সমুদ্রের জনহীনতীরে আমারও কর্ণকুহরে কেউ এসে বলুক, "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?..."

এইরকম কত কী যে মনে হত! বাস্তবে কোনওকিছুই ঘটত না। না ঝাঁপ দিয়ে পড়া হত জলে, সমুদ্রে, না দৈবদুর্বিপাকে ঢেউয়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে টাইফুনে ডুবে যেত আমাদের নৌকোটা। না সমভিব্যাহারিগণ কাষ্ঠাহরণে মত্ত আমাকে বিসর্জন দিয়ে আসত নদীতীরে বনবাসে, না কর্ণকুহরে ধ্বনিত হত সেই চির আকাঙ্ক্ষিত ডাক, "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?"

বলাই বাহুল্য, পৃথিবীতে হেন নবকুমার নেই যে কিনা ওই ডাকটুকুই শুনতে বারবার বনে বিসর্জিত হতে না চায়, বারবার মনে প্রতিজ্ঞা না করে বসে, "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?"

হংসী নাউড়ীয়া বড়ই সরেস নাউড়ীয়া, নৌকো না ডুবিয়ে সারা দিনমান উজানে 'নৌকাবিলাস' করিয়ে ভাটিতে এনে তারা ফোটার আগেই নিরাপদে ঘরের ধারে নামিয়ে দেন আমাদের।

হায়! হংসীর হাতের কারসাজিতে না হওয়া গেল ভাস্কো দা গামা, অ্যামেরিকো ভেসপুচি, গালিভার, না হওয়া গেল নিদেনপক্ষে নবকুমার!

তবু, তবু বারবার ওই নদীটার ধারেকাছেই ফিরে ফিরে আসি। নদীর পাড়ে ঘাসভুঁইয়ে বসি, ঘাস ছিঁড়ি, লোক-পারাপার দেখি— কত লোকই যে এপার থেকে সেপারে যায়, সেপার থেকে এপারে আসে!

শুধু কি এপার-সেপার, নদীর পাড় বরাবর পশ্চিমে যায়, পুবে যায়, কাজে যায় কুটুম্বিতায় যায়—সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছায়াও নদীজলে ভেঙে ভেঙে যায়, ভাঙতে ভাঙতে যায়।

কতদিন ভেবেছি ওই যারা পশ্চিমে যায় তাদের পিছু পিছু আমিও যদি যাই, যদি চলতেই থাকি চলতেই থাকি, তারা হয়তো যেতে যেতে ডাইনে-বাঁয়ে এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে পাশের গাঁয়ে তার পাশের গাঁয়ে, পাতিনা-তালডাঙরা-ফুলবনী-মলতাবনী কী দাঁড়িয়াবান্ধি-খাড়বান্ধি-রগড়া- পদিমা-কাঠুয়াপাল-চর্চিতায় যে যার ঘরে, কুটুমঘরে ঢুকে যাবে—আমার পথচলা তখনও কিন্তু থামবে না। চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। চলতেই থাকবে...

৪

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অস্তাচলের দিকে মুখ করে সুদূর দিঙ অঙ্গনে ক্যানভাসে আঁকা হঠাৎ নীল-নীল 'নীলগিরি' দেখে ফেলে পরক্ষণেই নদীজলে নেমে জল ছুঁয়ে কতদিন প্রশ্ন করেছি, "নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" শুধুই "ছলাৎ ছলাৎ"! আর কোনও উত্তর নেই, অথবা ওই একটাই উত্তর — "মহাদেবের জটা হইতে"। ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার ঘেঁটে দেখেছি— "It originates from a surface spring near Pisk rail station 11 km South-West Ranchi town and after descending to 300 matres from the 800 metres high Ranchi plateau by magnificient waterfalls (e.g. The Hudru) and deep easterly gorgas, takes a sharp elbow-bend South words (at 23o26'N & 85o52' E) to describe the western boundary of the Purulia District..." সারফেস-স্প্রিং? তার মানে কী? An outflow of water from the earth—ভুঁইফোড়? পাতালঝরনা? নির্ঝর, প্রস্রবণ? A hot spring? এরম তো দেখেছি আমাদের কদমডাঙা হুড়ির পাদদেশেও একটা আছে—বুড়বুড়ি ঝরনা। দিবারাত্রি জল



উঠছে পাতাল থেকে বুড়বুড় করে। শীতে উষ্ণ গ্রীষ্মে শীতল। পাশাপাশি দু'-দুটো ঝরনা—একটা আমাদের একটা সাঁওতালদের। ভুলেও তারা আসে না এধারে, আমাদেরও কেউ যায় না ওধারে। কতদিন দেখেছি খেকরে মাঈ চালো কাঁদরি স্নান শেষে কালো কালো হাঁড়িতে একান্ত তাদেরই ঝরনা থেকে জল ভরে মাথায় নিয়ে চলেছে গ্রামে দিকে। কতদিন দেখেছি আমাদের টুকুরানি বিঝল তরুবালারা ফর্সা গায়ে রাঙা হলুদ মেখে আমাদেরই ঝরনায় উদ্‌লা গায়ে স্নান সেরে টুসু-গীত গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছে—"জলে জলে যাইও টুসু জলে তোমার কে আছে। মা-বাপ ছাড়া সবাই আছে গো জলে শ্বশুরঘর আছে।।" আমি তখন যে বুড়বুড়িতলায় পাড়িয়ার বিলে উড়ন্ত জয়পাখিয় ছায়ায় তলে তলে দু'হাত পেতে আকাশে মুখ রেখে দৌড়ুচ্ছি বলতে বলতে, "জয়ের জন্য একটা পালক দাও না" "জয়ের জন্য একটা পালক দাও না"! তো, এরকমই একটা বুড়বুড়ি ঝরনা থেকেই তাহলে এই নদীর উৎপত্তি? কোথায় কোন্‌দিকে ছোটনাগপুরের মালভূমি? রাঁচি—হুড্রুফলস? বইয়েই পড়েছি—পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন মালভূমি ছোটনাগপুরের মালভূমি, নিঃসন্দেহে ভারতের প্রাচীনতম। যার বয়স প্রায় চারশো কোটি বছর। এই তো চল্লিশ থেকে নব্বই কোটি বছর আগেও তুষারযুগে ছোটনাগপুর বরফে ঢাকা থাকত, রীতিমতো বরফ পড়ত। নদীনালা ছিল না। তারপরে কবে যেন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হল! মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, আর তার মানেই প্রচুর বৃষ্টিপাত। তৈরি হয়ে গেল দামোদর, উত্তর কোয়েল-দক্ষিণ কোয়েল, সুবর্ণরেখা। হুড্রু ফলস—মালভূমির আটশো মিটার উঁচু থেকে নামছে সুবর্ণরেখার জল! জলের গুঁড়োয় ধোঁয়াধার। জলে-আলোয় কত শত যে রামধনু আঁকা হয়ে চলেছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর! একদিন গিয়ে দেখে আসব। রাঁচি থেকে কত আর দূর—বড়জোর পঁয়ত্রিশ কী চল্লিশ কিলোমিটার। শুধু কী হুড্রু? আছে দাসম জোনহা হিরনি সীতা দুমারগারহি। খুব দূরে নয় দলমা-ধনঝোরি, খুব দূরে নয় উত্তর-কোয়েল দক্ষিণ-কোয়েল দামোদর। শঙ্খ বুড়হা আমানত খরকাই রাঢ়। নদী-উপনদী। কেঁদ কইম ভেলা কুসুম ডকা ভাদু করম করঞ্জি শাল পিয়াশাল ধ আসন। কত সব গাছপালা! আঁটারি চুরচু চিহড় কুড়চি পড়াশ গাবগুবি রাঙচিতা—কতসব ঝাঁটিপালা! কত আর দূর—এই তো সেদিন দলমা থেকে নেমে এসেছিল কালো মেঘের মতো হাতির পাল, বাঁশকরোল কলাগাছ পাড়িয়া-পাকুড়তলা-করণতলার ধান বড়োডাঙা-খান্দারপাড়া-থুরিয়ার আখ মায় মলিবুড়ির মদচুয়ানীর হাঁড়িটা পর্যন্ত সাঁবাড় করে দিয়ে রাতারাতি না হোক একদিন কী দু'দিন বাদেই ফিরে গিয়েছিল দলমায়। এদিক সেদিক দিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছিল 'হাতিডহর'—হাতি যাবার রাস্তা। না হয় সেই রাস্তা ধরেই হাঁটতে হাঁটতে একদিন পৌঁছে যাব ধনঝোরি-দলমায়!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

গ্রামের মধ্যে আমাদের 'বাখুল'টাই ছিল সবচেয়ে বড়। একদিকে নদী আর একদিকে ঘনঘোর জঙ্গল, মাঝখানে আমার জন্মভূমি গ্রাম, জন্মভিটা। বাবা-কাকাদের ঘর। বাবা-কাকাদের মা, আর আমার মা-কাকিরা। বর্ষায় যখন নদীর দু-কূল ছেপে হড়কা বান আসত, ধড়াস্ ধড়াস্ করে নদীর 'কাতা' ভাঙত, নদীধারের গ্রামের লোকেরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে গবাদি পশুপাখি নিয়ে উঠে যেত ইস্কুলডাঙায়, তখন আমাদের গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর একেবারে বাইরে এসে পড়ত, রীতিমতো 'আউটসাইডার' 'আউটসাইডার'। অঝোরঝর বর্ষণ, খড়ের চাল ভেদ করে জল এসে মেঝেয় পড়ছে অবিরাম। মা-কাকিরা গিনা-বাটি-তাটিয়া পেতে রেখেছেন জলের ধারা বরাবর। জলে-বাটিতে টুং টাং আওয়াজ, বাজছে জলতরঙ্গ। দড়ির খাটিয়ার উপর বাবা-কাকাদের মা। মুখে অবিরাম বলেই চলেছেন, বলেই চলেছেন—"যা না রে বিজু, গোবরগাদায় লাঙলটা পুঁতে আয়!" তাঁর ছোটছেলে বিজয় ল্যাংটো হয়ে হালের লাঙলটা গোবরগাদায় পুঁতে এলে তবেই না বৃষ্টি" থামবে! ছোটকাকা বিজয়চন্দ্র তখন কোথায়! এর-তার বাড়ি গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন—"ওপারে তুমি শ্যাম ওপারে আমি, মাঝে নদী বহেরে...।" আমরা জনাকয়েক "ল্যাঙটা ভুটুঙ সাধের কুটুম" ঘিরে ধরে আছি বাবা-কাকাদের মাকে, আমাদের ঠাকুরমাকে। একেকটা বাজপড়ার আওয়াজ আর বৃষ্টিপাতের ধরন দেখে মনে হত—এ বৃষ্টি আর কখনও থামবে না, আর কয়েক ঘণ্টার ভিতরে প্রলয়ে লয় পেয়ে যাবে পৃথিবী! ভয়ে-আতঙ্কে আরও বেশি বেশি করে জড়িয়ে ধরতাম বাবা-কাকাদের মাকে। বাবা-কাকাদের মা, ওড়িশার যাঁসড়ার অঞ্জনাসুন্দরী, ততক্ষণে 'কহিনী' বলতে শুরু করেছেন—সেই গুড়গুড়িয়া, সেই বেঁটে বাঁটকুল, সেই ঘোড়ার ল্যাজে সর্ষের পুঁটলি বাঁধা...। সে-কাহিনিও সহজে থামত না। গ্রাম তো গ্রাম, আশপাশে যে আর কারও ঘর আছে, বাখুল আছে—সেকথা মনেই হত না, মনেই থাকত না। এমন এমন যে গ্রাম, 'আউটসাইডার', সে-গ্রামে একটা 'গঁগা' বাটভিখারি এলেও রীতিমতো হুল্লোড় পড়ে যেত। লাল আলখাল্লা গায়ে, কাঁধে একটা এক-রং-য়েরই বিপুলকায় ঝুলি, কথা নেই বার্তা নেই, মুখে শুধুই একটানা সেই 'গঁ গঁ' আওয়াজ! সেই আওয়াজ শুনেই দৌড়ে এসেছেন মা-কাকিরা, পিছনে পিছনে ভিড় করেছে 'ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমরা', আর গঁ গাঁ বাবাজির ঝুলিতে একটানা প্যালা পড়ে চলেছে— চালটা আলুটা মুলোটা। এ গ্রামে কেউ তো আসে না, কেউই না—এমন এমন যে গ্রাম সে-গ্রামে কী করে যে একদিন এল 'রবিনহুড'! আমার নাইন পাস ছোটকাকা বইটা লুকিয়ে-চুরিয়ে কখনও আমগাছের ডালে কখনও বিঁড়াগাদার আড়ালে কখনও মাটির দোতলার ছাদে বসে পড়তে লাগলেন। কত লোক যে হাতে রোল করা দরখাস্তের ফর্দ কাগজ নিয়ে কাকার কাছে লেখাতে এসে ফিরে গেলেন! আমার তখন থ্রি কী ফোর। ক'দিন বাদেই দেখলাম—ছোটকাকা বইছেড়ে বাঁশের তিরধনুক বানিয়ে মাঝুডুবকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ততদিনে 'রবিনহুড' পড়ে আমিও 'লিটলজন'। তার আগে অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার 'বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র' কিছুটা 'রামায়ণ' আর কিছুটা 'মহাভারত'। "আগে রাম মধ্যে সীতা পিছনে লক্ষ্মণ মহাবীর। তিনজনে হইলেন পুরীর বাহির।।" কিংবা, "আলো জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতী। তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি।।" এছাড়া বই বলতে থ্রি-ফোরের 'কিশলয়'—সেই 'আম্রজাতক' 'অবাক জলপান' 'রাজার অসুখ', কন্বমুনির আশ্রম, তাত কন্ব কিসা গৌতমী...সেই 'সারি সারি তাল তমাল'...'বটপাতার ভেলা'...তবে হ্যাঁ, কে বিভূতিভূষণ কে অবনীন্দ্রনাথ—জানতাম না, লেখাগুলি বারবার পড়তাম, বারবার। কী সুন্দর লেখা! পড়তে পড়তে কখন যেন মুখস্থ হয়ে যেত, পড়া ধরলেই গড় গড় করে মুখস্থ বলতাম! আমাদের বাখুলে একসঙ্গে গাদাগাদি করে জনা তিরিশেক ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছিলাম। আমরা সাত ভাইবোন, তবে ছ'ভাই এক বোন চম্পা নই, তিনভাই আর চার বোন। বোন তো নয়, সব দিদি। বড়পুঁটি, রজনী, সুবোধ আর মুনকুদি। মেজোকাকার দুই ছেলে আর চার মেয়ে। শ্রীমন্ত হেমন্ত, কামারদি ভট-অ নই আর কঁই। এতদব্যতীত ও আছে—কারণ, আমার বাবা-কাকারাও পাঁচভাই, দুইবোন। আমাদের বাবা-কাকাদের যা আছে

আছে, তদুপরি তাঁদের দুইবোনের অর্থাৎ আমাদের দুই পিসিমারও অতিরিক্ত জনা ছয়েক ছিল। আমরা একত্রে একান্নবর্তী হয়েই বড় হচ্ছিলাম। আমাদের খামারে বেড়ার গায়ে লতানো ঘি-কুমারীর ফল পেকে ঝুনো হয়ে ফেটে পড়লে খামারময় পাখি-ওড়ার মতো ছড়িয়ে পড়ত তুলো! সেই তুলো লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ধরার জন্য 'ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমদের' আঙিনাময় যখন দাপাদাপি তুঙ্গে চলছিল, তখন, ঠিক তখনই আমাদের মেজোকাকা কোনও একবছরে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই স্মিতহাস্যে ঘোষণা করে দিলেন—তাঁর সেজো মেয়ে 'নই' অর্থাৎ নয়নতারার বিয়ের বন্দোবস্ত পাক্কা! সঙ্গে সঙ্গে বাবা-কাকাদের মা, আমাদের মা-কাকিরা কাকাকে ঘিরে ধরে আদি-অন্ত সব বৃত্তান্তই জানতে চাইলেন। কাকা একে একে সবকিছুই খুলে বললেন। —"বয়স? তা, বয়স একটু বেশিই। তা হোক, তবে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক, প্রায় জমিদার! পাত্রের নাম 'গান্ধী'।" গান্ধী? পাত্রের নাম শুনে আমি তো চমকে উঠলাম— এ কোন গান্ধী? ততদিনে পড়ে ফেলেছি কী না—"কে ওই চলে বিপুল দলে গান্ধীমহারাজ। উদার ধীর অতি গভীর চোখে পলক নাই।।" মুসাবনীর গান্ধীর সঙ্গে আমাদের মেজোকাকার জমি নিয়ে ক'দিন জোর বাদ-বিসম্বাদ চলল। মেজোকাকার একটাই গোঁ—"আগে ভূমিদান তারপরে কন্যাদান।" অগত্যা 'নই'-য়ের নামে দশ বিঘা ধানী জমি তড়িঘড়ি রেজিস্ট্রিকৃতও হয়ে গেল। জমি রেজিস্ট্রি হল বটে, কিন্তু 'নই'-য়ের সঙ্গে গান্ধীর বিবাহ কিছুতেই দেয়া গেল না। কারণ, তার আগেই বিবাহেচ্ছুক বৃদ্ধোপম গান্ধী আচমকা ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন পরলোকে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আমাদের মা-কাকিরা, আমাদের খামারটাও ফের ঘি-কুমারীর উড়ন্ত তুলো ধরতে চ্যাঙনা-ম্যাঙনায় ভরে উঠল। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের মেজোকাকার কপালের ভাঁজ কিন্তু গেল না—ওই যে 'নই'য়ের নামে রেজিস্ট্রিকৃত দশবিঘা ধানী জমি! তার কী হবে? তাই নিয়েই কাকার অঝোরঝর ভাবনা, অঝোরঝর ভাবনা। ক'দিন তো মেজোকাকা কোবরেজি ছেড়ে বিহার-মুসাবনী করে বেড়ালেন! কাজের কাজ কিস্‌সু হল না, কিস্‌সু না, গান্ধীর আগের পক্ষের সন্তানাদি উল্টে জমির আলের উপর দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচগ্র মেদিনী"। বাবা-কাকাদের মা, আমাদের মা-কাকিরাও শেষমেশ 'না' করে দিলেন মেজোকাকাকে। আমাদের দশাসই মেজোকাকাও মাটির দাওয়ায় ধপাস করে বসে পড়ে ফুৎকারে সবকিছুই উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "যানে দো!" "যেতে দাও" বললেই কী সবকিছু চলে যায়? কেন জানি না—গান্ধীর প্রতি একটা অশ্রদ্ধা তখন থেকেই মনে মনে জমা হচ্ছিল!

৩

আমার জেঠতুতো দাদা সতীশচন্দ্রই আমাদের গ্রামের বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'সেকেন্ড-টিচার'। তাঁর বালিশের তলা থেকেই একদিন পেয়ে গেলাম 'চারবন্ধু চতুর্দ্বীপ'। কে যে লেখক —এখন ঠিক মনে নেই, তবে কিছুদিন মনে মনেই ছিল। আসলে বইয়ের পাতায় চিত্রসহ মুদ্রিত গল্পগুলির চেয়ে আমাদের গ্রামে, গ্রামের আশপাশে, বিলে-বাতাসে, বনে-জঙ্গলে, টাঁড়ে-টিকরে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন জ্যান্ত গল্প তৈরি হচ্ছিল যা বইয়ের পাতায় কল্পিত গল্পগুলির চেয়ে কোনও অংশেই কম ছিল না। আমাদের বাখুলে 'নই'-য়ের না হোক, রমানাথকাকার বড়ছেলে সন্তোষের একদিন বিয়ে হয়ে গেল বেশ ঘটা করেই। তার দু'-এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই কুলটিকরীর হাট থেকে শিকে-বাঁহুকের একদিকে ক'আঁটি কলমিশাক আরেকদিকে পুঁটলিতে বাঁধা 'জীবন যৌবন' বইটি নিয়ে বেশ মউজে হেলতে দুলতে বাড়ি ফিরবেন সন্তোষদা। আর তারপর থেকে বেশ ক'মাস ওই বই নিয়েই গ্রামজুড়ে টানা-হিঁচড়ান, গুজগুজ ফুসফুস, গুঞ্জন, গান—"এ ব্যথা কী যে ব্যথা বুঝে কি আনজনে।" সত্যরঞ্জনের (ডাক নাম টুম্পা) বড় বউদি একদিন আমার সামনে আমারই নিত্য সহচর ন্যাঙটাভুটুঙ সত্যরঞ্জনের ওই, "ওই জিনিসটা নেড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "কী গো দেওর, রস যে গড়িয়ে পড়ছে!" ততদিনে শুরু হয়ে গেছে আমাদের দু'জনেরই অ্যাডোলেসেনস, আর গরুবাগাল সত্যরঞ্জনের না হোক আমার 'পি.কে.দে সরকার'। পি.কে.দে সরকারের ট্রান্সলেসান তো ট্রানশ্লেসান, এহ বাহ্য আমার সাহিত্যপাঠ! ওই যে বাংলায় এক একটা অনুচ্ছেদ, নিম্নে ইংরেজিতে অনুবাদ—ইংরেজি যেমন তেমন, ওই বাংলাটা! বাংলার ওই টুকরো-টাকরাই ঘা মেরে যেত আমার অন্তরে, মোক্ষম ঘা। নাড়িয়ে দিত সত্যরঞ্জনের ওই-ওই জিনিসটা নয়, আমার অন্তর ব্রহ্মাণ্ড, ভিতরের কলকব্জা। কী অসাধারণ কথাংশ—"একদিন সে তাহারই মতো একজন দরিদ্রকে কাছে পাইয়া বলিল, "বাপু, তোমরা" এখানে খাও কি করিয়া? সে বলিল, "চাকরি করিয়া খাটিয়া খাই। কলিকাতায় রোজগারের ভাবনা কি?" বা, 'রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" অর্ধরাত্রে ঝটিকা নিবারিত হইলে যুবক কহিলেন, "আপনারা এখানে কিছুকাল সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী গ্রামে যাই।" কিংবা, 'অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি যাব।" আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—"পাগল হয়েছে ভাই"। ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না।' অথবা, "রানী কথাটি শুনিয়া অপুদের বাড়ি আসিল। অপুকে বলিল—হাঁ রে অপু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি?" বা, 'সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কি চাও?" সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না— আমি এই সুড়ঙ্গ হইতে অন্ধকার হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, মুক্তি চাই, আকাশ চাই।" কিংবা সেইটা, "হে ভারত, ভুলিও না— নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।..." উত্তেজনায় উত্তেজনায় অনুবাদ করতাম—"Hail, India, do not forget that..." উত্তেজিত হয়ে একটার জায়গায় বসিয়ে দিতাম দুটো—"Hail Hail, India....। কোন গল্প বা উপন্যাসের অংশ, লেখক কে—কিছুই জানতাম না। মুদ্রিত অংশটুকুই বারবার পড়তাম, বার বার। মন ছট্‌ফট্ করত—কখন কবে যে 'সমগ্র'টা পড়তে পারব! লাউদহ গ্রামের পুলিন পৈড়্যা, আমাদের স্কুলের ইংরেজির স্যর, ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সদাহাস্যময়, ক্লাসে ইংরেজি পড়াতে এসেই আমার হাফ-হাতা জামার বুকের বোতামগুলি গলা অব্দি পটাপট বন্ধ করে দিয়ে ততদিনে বলতে শুরু করেছেন, "Just like Gandhi"। ফের গান্ধী! এতদিনে অবশ্য বুঝে গেছি—এ-গান্ধী মুসাবনির বিয়ে-পাগলা গান্ধী তো নন, বাপুজি গান্ধীজি। এতদিনে জানাও হয়ে গিয়েছে—"আমার জীবনই আমার বাণী।" ইংরেজিতে Essay লিখতে গিয়ে কতবার যে কোট করেছি—"My life is my message", said Gandhiji! ততদিনে মন থেকে গান্ধীর প্রতি আমার অশ্রদ্ধাটাও উধাও। উধাও, উধাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

মন মাঝে মাঝেই যখন তখন উতলা হয়ে ওঠে নদীর জন্য, হংসীর জন্য, হংসী নাউড়ীয়ার নৌকাটার জন্য। হোস্টেলে থাকলে তবু তো রাতদিন চোখের সামনে জেগে থাকে ডুলুং নদী। রাতভিত ঘুম



ভাঙলেও কানে আসে—ওই তো নদীজলে ভেসে যেতে যেতে জল থেকে ছিট্‌কে উঠে 'টুপুক' করে ফের জলেই ডুবে গেল কালবোয়াল, বাটা কী খয়রা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও টের পাই—জল ভাঙছে, জল ভাঙছে, ছোট ছোট 'উরালঘূর্ণি', খই ভাজার মতো বুজকুড়ি কাটল একসঙ্গে, একত্রে। আমাদের বাখুল থেকে বড়নদী সুবর্ণরেখা বেশিদূর না হলেও কম করে আধমাইল-পৌনে একমাইল তো হবেই। অন্যান্য দিনগুলোয় তেমন কিছু সাড়াশব্দ পাওয়া না গেলেও, বর্ষায়, বিশেষত শ্রাবণ-ভাদ্রে যখন এ-পার সে-পার একাকার করে বান আসে, কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছজলও হয়ে ওঠে লাল, ফেনায়িত, তখন অজস্র গোখরোর গর্জনের মতো নদীগর্জন শোনা যায়, শোনা যায় নদীর 'কাতা' ভাঙছে 'ধাস' 'ধাস'। বর্ষা নেমেছে—ওই খাপছাড়া, একদিন জোর হল তো পরের তিন-চারদিন শুকনা, তখনও বন্যার দেখা নেই—তবু হংসী, হংসী নাউড়ীয়ার নৌকা নতুন জল পেয়ে এরমধ্যেই খেলায় মেতেছে। নদী-পারাপার যা হল, অবসরে, যখন এ-পার সে-পারে আর পারাপারের লোক নেই, মধ্যাহ্ন, কিংবা একটি-দুটি করে লোক জড়ো হচ্ছে, জড়ো হোক, তখন সদ্য সাবালক হয়ে-ওঠা পুত্র অরবিন্দের উপর বড়নৌকার দায়িত্ব-ভার ন্যস্ত করে ছোট্ট ডোঙাটি নিয়ে ভেসে পড়েন হংসী। কখনও ভাটিতে কখনও উজানে, কখনও 'ডাইভ' মেরে কখনও চিত-সাঁতারের মতো নিশ্চেষ্ট ভেসে থেকে। দেখলেই দূর থেকে মনে হবে—বোমারু বিমানের মতো উল্টি-পাল্টি খেয়ে হংসী নাউড়ীয়ার ডোঙা যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। আসলে নাউড়ীয়ার পো একা হাতে মাথার উপর দিয়ে 'ফারড়ি' জাল ছুড়ে মধ্যাহ্ন আহারের ব্যঞ্জন-সংগ্রহে চানা-চুনো মাছ ধরছেন। জাল ছোড়ার তাড়সে নিঃসঙ্গ নৌকা এমনি এমনি দুলে উঠছে, কাৎ হচ্ছে, কান্নিক মেরে ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু হংসী নাউড়ীয়া বড়ই সরেস নাউড়ীয়া, তাঁর হাতের কারসাজিতে বে-সামাল নাউও সামলে উঠে ফের ঠিকমতোই চলতে থাকে। চলতে থাকে, চলতে থাকে। নদীর জল ও যৎকিঞ্চিৎ বেড়েছে, রং ঘোলা হয়েছে। একদিন নদীঘাটে সকাল-সকাল হাজির হয়ে বললাম, "এই যে খুড়া, ভাস্কো-দা-গামা—হবে নাকি 'নৌকাবিলাস'? হবে নাকি দেশ আবিষ্কার?" হংসী নাউড়ীয়ার তৎক্ষণাৎ জবাব, "হিনে ত ভালা—মোর 'না' নাই।" অর্থাৎ হলে তো ভাল, তাঁর না নেই। কেন যে হংসী নৌকাবিলাসের কথায় এত নেচে-কুঁদে ওঠেন, কেন যে আমার প্রায় নাবালক আব্দারে এত ঘন ঘন সাড়া দেন—তার কারণ তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছি। আসলে হংসী নাউড়ীয়ার ভিতরে ভিতরে একটা নাবালক মন ছিল, তাঁর মনে মনে একটা ভবঘুরে প্রবৃত্তি ছিল। শীত-গ্রীষ্ম বর্ষায়-রোদে সারাক্ষণ তো নৌকার গলুইয়ে হাল ধরে বসে থাকা, নদীর এ-পার সে-পার করা! হয় জল নয় স্থল নতুবা অন্তরীক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকা। চোখের সামনে খলবল খলবল করে বয়ে চলেছে অনন্ত স্রোতধারা। বিরামহীন, একটানা একাটানা। ছাতা-মাথায় হংসী নাউড়ীয়া জনমানবহীন ঘাটে সেদিকেই চেয়ে থেকে আবিষ্কার করেন—বাটা-খয়রা-মৌরলা-বাঁশপতরি-চ্যালা-ন্যাদোশ-পুঁটি-প্যাঙাস। শুধু কী মাছ? চাঁদমালা, শোলার টোপর, রাঙতার মুকুট। ফুলের মালা, মড়াপোড়ার কাঠ। অবরে-সবরে মাঝনদীতে কাঠের পাঠায় দাঁড়িয়ে দিনভর রাতভর জাল ছোঁড়ে এ-পার সে-পারের মৎসজীবীরা, কৈবর্তরা। সখেদে তাদের ভিতর গুঞ্জনও ওঠে, "আখু তভু অনেক ইল্‌শা উঠথায় সুবর্ণরেখায়। অখন সে-ইল্‌শা কুঠে আছে জাঅনু? —কলকাতায়।।" আগে আগে তবু সুবর্ণরেখায় অনেক ইলিশ উঠত। এখন আর সুবর্ণরেখায় ইলিশ ওঠে না, ইলিশ ওঠে সেই সুদূর কলকাতায়! মাঝে মাঝে ঘাটে এসে নোঙর করে কারবারিদের বড় বড় নৌকা। নৌকায় বোঝাই হয়ে চালান হয়ে যায়—গুড়কুঁদা, তিল-তিসি, সোনামুগ-বিরিমুগ, শালপাতার থানা, চেরাই-করা কাঠের তক্তা। বিয়ের মরশুমে একটি-দুটি রাঙা বউয়ের পানসী কী আর একেবারে ঘাটের ধার দিয়ে ভেসে যায় না? ভুল করেও কী এক-আধবার বড়ডাঙার ঘাটে ভিড়ে না? ভিড়ে, ভিড়ে। হংসী নাউড়ীয়ার মন কী তখন একবারের জন্যও উদাস হয়ে যায় না? যায়, যায়। যখন খোল-কত্তাল ইত্যাকার বাদ্য সহযোগে নৌকাবিলাসের নৌকা "সব সখীকে পার করিতে লব আনা আনা। আর, রাধিকাকে পার করিতে লব কানের সোনা" গাইতে গাইতে তার চোখের সামনে দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যায় ওই দূর লাউদহ-কুলবনী হয়ে দাঁতন-সোনাকনিয়ার দিকে, তখন, বড়োডাঙার ঘাটে নৌকার গলুইয়ে ছাতা মাথায়-বসা হংসী নাউড়ীয়ার ভবঘুরে মনও কী বলে ওঠে না—"আয় মন বেড়াতে যাবি?" বলে, বলে। পরে তো বইয়ের পড়েছি, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" অর্থাৎ, মন যখনই চেয়েছে তখনই বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। ভবঘুরে মানুষের স্বভাবই তো এই, ভবঘুরে শাস্ত্রের বিধানই তো এই।

২

হাঁক পেড়ে অরবিন্দকে ঘর থেকে ডেকে এনে ঘাটের দায়িত্ব-ভাব তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ডোঙায় উঠে আমাকেও হাঁক দিলেন, "আস-অ বেহারার পো! কুঠে যাব কইথিল?" আমিও ডোঙায় চড়ে বসে

হাতে গজাল বাঁশ নিয়ে বললাম, "ভাস্কো-দা-গামার মতো দেশ-আবিষ্কারে, নাউড়ীয়ার পো।" হংসী নাউড়ীয়ার সেই এককথা, "সা-রে-গা-মা সা-রে-গা-মা করি কী যে বকর-বকর বক ললিন! থাউ, আস্‌লি কথা কও—কুনবাটিয়া যাব?" আসল কথা বল—কোনদিকে যাবে? আমি আঙুল উঁচিয়ে দেখালাম, "ওই যে—ডুলুং যেখানে মিশেছে সুবর্ণরেখায়!" মুহূর্তে ডোঙার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন হংসী, ডোঙা খরবেগে স্রোতের অনুকূলে চলতে লাগল। পিছনে পড়ে থাকল বড়োডাঙার বড় নৌকার ঘাট। শিমুলতলার ঘাটের পাশ দিয়ে কাতা ধারে ধারে ছোট নৌকা ছোট ছোট ঢেউয়ের তরঙ্গাভিঘাতে এমনই ভেসে যাচ্ছিল, প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা গজাল-বাঁশে ঠেলা মারবার কোনও দরকারই হচ্ছিল না। শুধু যা খলবল খলবল করে জলে-নৌকায় সঙঘর্ষে অক্লান্ত কলরব উঠছিল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে বারবার দেখছিলাম—নদীতীরবর্তী লোকালয়ে, চাষাবাদের, ভূখণ্ডে, আমারই সমবয়সি বা কিঞ্চিৎ অনধিক বালক-বালিকার দেখা পাই কি না। দেখা হলে হয়তো একটা কথাও বলব না, হাতের তালু প্রসারিত করে তাদের দেখাব নিজেকে আর হংসীকে —দ্যাখো, দ্যাখো! এমনিতেই তল্লাটে হংসী আর আমার জোটবন্ধন নিয়ে হাসাহাসি, গল্পগাছা—সমধিক প্রচলিত ও প্রচারিত আছে। হংসী নাউড়ীয়ার স্ত্রী, খুড়িমা, নিজেই তো বলেন, "আর জন্মে ললিন আমারকার 'হাটুয়া ছুয়া' থিলা, নাহিনে এত!" আর জন্মে ললিন আমাদের 'হাটুয়া' ছেলে ছিল, না হলে এত! হাটুয়া, হাটুয়া। যারা হাটে যায় তাদের কী 'হাটুয়া' বলে? হাটে তো কে না যায়—সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভুঁইয়া, ভূমিজ, রাজু, খণ্ডায়েৎ, গহলা, কামার, কুমার, মাহাত, কৈবর্ত, কোরঙ্গা, হাড়ি, ডোম, লোধা, কাঁড়রা, তেলি, গৌড়, সদ্‌গোপ, আরও কতরকম লোক! তাদের সবাইকে কিন্তু 'হাটুয়া' বলে না, আদিবাসীদের তো একেবারেই না। আসলে যারা 'হাটুয়া ভাষায়' কথা বলে—তারাই 'হাটুয়া', এই যেমন হংসী নাউড়ীয়ারা। এ তল্লাটে বাংলা তো কেউ বলে না, কেউই না। বলে, বাংলা-উড়িয়া মেশামেশি। বলে দোকানদারেরা, বলে কোনও কোনও 'হাল-ধরা' হিন্দুরা। একেই বলে 'হাটুয়া ভাষা'। উদাহরণ —"আইলা বামহন মাইলা তালি, ঘিনি পালেইলা চাউল থালি।" মানে, বামুন এল হাততালি মারল, চালের থানা নিয়ে পালাল। কিংবা, "ছুটি গেলে হাতনু শর, চিন্‌হে নি সে আপন-পর।" হাত থেকে তীর ছুটে গেনে সে আপন-পর চেনে না। অথবা "ঘরে আছু নাকি জটিয়া ভাই? ঝড়িয়াটায় আজ তোর ঘরে মকা খাই। আরে মকা নাই তো বাদাম বারকা, আর ভাজা নাই তা ভাজা করা।" তার মানে, জটিয়াভাই, ঘরে আছিস নাকি? থাকলে, এই বর্ষার দিনে তোমার ঘরে ভুট্টা-ভাজা খাই। আরে ভুট্টা নেই তো বাদাম বের কর, আর ভাজা-বাদাম নেই তো বাদাম ভাজা করা। সে যা হোক, এই সময়টায় নদীজলের প্রকৃতিই এই, ঈষৎ উৎফুল্ল, ঘোলাটে। এখনও বর্ষার তেমন প্রাচুর্য নেই, খাল-বিল অর্ধপূর্ণ, নদীও সঙ্গীতিহীন। তবে মাঝে মাঝে নদীর উৎসমূলে ছোটনাগপুরের পার্বত্য প্রদেশে একটানা দু-চারদিন ভারী বর্ষণ হয়ে গেলে নদী বাড়তে বাড়তে ফুলেফেঁপে টইটম্বুর। সেরকম অবস্থায়, অথবা শ্রাবণ -ভাদ্রে, ভরা নদীতে তদুপরি হড়পা বান এসে গেলে এহেন ছোট ডোঙায় 'কাতা ধার' দিয়ে ভেসে যাওয়াই বিপজ্জনক! যে কোনও মুহূর্তে 'ধাস্' করে কাতা ভেঙে ডোঙার উপর আছড়ে পড়লে ডোঙাসুদ্ধ তলিয়ে যাবে আরোহী। এখন সে-ভয়টা নেই। তবে স্রোতের টান আছে প্রবল। সেই টানে ছোট নৌকা অনায়াসেই চলতে লাগল। শিমুলতলার ঘাট পেরিয়ে গেল, পেরিয়ে গেল জাহাজকানার জঙ্গল। মহিষাসুর দকেঁর অতদূরও যেতে হল না, ডোঙাখানা ঘুরে গেল বাঁয়ে। বাঁয়ে, বাঁয়ে। নদী-এপারের কুঠীসাইকে লক্ষ্য করে নদীর বুক চিরে আড়াআড়িভাবে চলতে লাগল। চলতে লাগল, চলতে লাগল। স্রোতের টানে মাঝেমাঝেই ডোঙার মুখ ঘুরে যাচ্ছে। হংসী নাউড়ীয়া বাঁশের গজাল মেরে ডোঙার গতিমুখ আবার আয়ত্তে আনছেন। তবে, এবার আর অনায়াসে নয়, রীতিমতো কসরত করতে হচ্ছে। কসরত বলে কসরত। নাউড়ীয়ার নির্দেশে আমিও দাঁড় খুলে বাইতে লাগলাম—ছপাছপ! দিনমান, দিনের বেলা। চারধারের দৃশ্যপট চোখে এসে গিঁথে যাচ্ছে—ওই তো খুদুপাড়ের বা কদোপালের চর, দুই নদীর জল এখন যাকে পূর্বসীমায় গোলাকারে বেঁধে রেখেছে চন্দ্রভাগার মতো। শুকা-শুকনায় আন্ধারি-হরেকৃষ্ণপুরের জনমানুষরাই এ-পথ দিয়ে শট-কাট্ করে, তাদেরই গরু-ছাগল কদোপালের চরে উঠে ঘাস-পাতা খায়, তাদেরই গরুবাগালরা চরে বাঁশি বাজিয়ে দাঁড়িয়াবান্ধি-কাতি-হাডুডু খেলে দিনভর মাতিয়ে রাখে। এখন তার কিনার দিয়ে একত্র হয়ে বসে চলেছে—সুবর্ণরেখা-ডুলুং—দুই নদীর দুই স্রোত। একস্রোতের রং গেরুয়া, আরেক স্রোতের রং স্বচ্ছ নীল। এক যেন সন্ন্যাসী ভৈরব, আরেক যেন গৃহবাসিনী উমা। দুই স্রোত দুই রং এখানে মিলে-মিশে একাকার। যেন একাকার হয়ে এক অদ্ভুত রং, এক অপূর্ব মায়ালোক রচনা করেছে। সেদিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকার বয়স হয়তো সেটা



নয়—তবু যেন কৌতূহলবশতই চেয়ে আছি আর ডোঙাটা কোথায় যেন ঠোক্কর খেয়ে একপাক ঘুরে গেল বোঁ-ও করে। আসলে নৌকা চলাচলের প্রসিদ্ধ পথ এটা নয়, কালে-ভদ্রে জেলেদের একটা-আধটা ডিঙি নৌকা হয়তো এদিক দিয়ে ঘুরে যায়। কোথায় উঁচু কোথায় ঢিবি হংসী নাউড়ীয়ার আন্দাজ ছিল না। তাই ছিটকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। পাকা নাউড়ীয়া হংসী মুহূর্তে সামলে নিলেন। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী বেহারার পো, ভয় করে?"

ভয়? হকচকিয়ে বললাম, "না!" তারপরেই মনে পড়ে গেল—কোথায় যেন পড়েছি, কোথায় যেন—। ততদিনে সম্পূর্ণ 'শ্রীকান্ত' পড়া না হলেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নৈশ অভিযান' তো পড়ে ফেলেছি! প্রায় মুখস্থ—"কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সমান্তরালে প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্র গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোর বয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সেকথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি।..." কতদিন ক্লাসে 'সাধু থেকে চলিত' করেছি, কতবার উত্তর লিখেছি—"কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ আর কখনও দেখিতে পাই নাই।"—(ক) উদ্দিষ্ট মহাপ্রাণটি কে? (খ) সে কিসে মহাপ্রাণ? কিংবা, "লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।"—(ক) কার উক্তি? (খ) কার বা কাদের মাথা ফাটার সম্ভাবনা? (গ) কারা এরূপ কার্য করতে পারে? কেন?" অথবা সেই যে সেই বিখ্যাত লাইনটি—"ওই লোকটি কি? মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছে?"—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখা কর। সেদিনের অভিযান ছিল নৈশ অভিযান, সঙ্গী ছিল কিশোর বয়স্ক দুটি বালক, আর আজ? নিশা নয় দিবা। দিবা অভিযান। সঙ্গী দুই অসম বয়সি মানুষ। তবে সে তো ছিল অন্য—মাছ চুরি করে সে-মাছ বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকায় ইন্দ্রের অন্নদাদিদি ও তাঁর সাপুড়ে স্বামীকে সাহায্য করা। তবু কোথায় যেন সামান্য হলেও মিল রয়ে গেছে। ওই যে—"কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়ে উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।" এখন এখানেও তাই। দূরে-কাছে সম্মুখে-পশ্চাতে চতুর্দিকে গোলাকারে তবকে-তবকে তলদেশ থেকে জল যেন উছলে উঠে ফেটে যাচ্ছে। আমরা তো একেই বলি, 'উরলে-ঘূর্নি'। তেমন তেমন উরাল-ঘূর্ণিতে ডিঙি-ডোঙা, ছোট নৌকা তো ছোট নৌকা, বড় বড় পানসিও হয়ে পড়ে বে-সামাল। অনুকূল-প্রতিকূল এই স্রোত-ওই স্রোত চাপান-উতোরে খল্‌বল্ খলবল ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে নদী যেন গর্জন করছে। আমাদের বাবা-কাকারা নদীর গর্জন তো বলেন না, বলেন—নদী 'ডাকছে'। নদী ডাকছে, নদী ডাকছে। নদীধারে নদীর কিনারে জলের ফেনা ভেসে-আসা খড়কুটো নোংরা-জবরা, তার উপর কালো কালো কাঠ-পিঁপড়ের চলন-গমন পদ্ধতি দেখেও হংসী নাউড়ীয়া তো হংসী নাউড়ীয়া, আমাদের বাবা-কাকারাও বলতে পারেন—নদী 'বাড়ছে'। নদী বাড়ছে, নদী বাড়ছে। আজ তেমনটা প্রায় নেই। আমাদের ডোঙা এখন ডুলুংয়ে পড়ল। ওই দেখা যাচ্ছে—আন্ধারি, লবকিশোরপুরগ্রাম, কুঠীসাই, কুঠীসাইয়ের ভাঙা নীলকুঠি। শিবের মন্দির, শীতলা মন্দিরের চুড়ো। স্নানের ঘাট। ডুলুংয়ের কাতা-ধারে ধারে আখের বন, বেগুন-বৈতালের খেত—যদিও আখের 'পোহা' রোয়া হয়েছে এইসবে, তবু লহ লহ করে পাতা বেড়ে উঠেছে কোমর-সমান। আর তাছাড়া গোচারণের মাছ—গরু চরছে। ডুলুংয়ে জল কম থাকলে ওই সমস্ত গরু-মোষ নদী পেরিয়ে এধারে খুদুপাড়ের চরে আসত। তাছাড়াও ফাঁকা-মাঠে কোথাও কোথাও বাঁশের খুঁটিতে জেলেদের টানা জাল শুকোচ্ছে। আঁশটে জালের গন্ধে দু'-চাট্টা কাকপক্ষী ধারে-কাছে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৩

আমাদের নৌকো ডুলুংয়ের বুক চিরে আড়াআড়ি চলেছে, চলেছে যেন সোজা লব্‌কিশোরপুর ঘাটের দিকে। নাউড়ীয়ার পো এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি, আপনমনে কী যেন ভেবে চলেছেন। বাম-বগলে শক্ত করে হাল চেপে ধরা, ডান হাতে ছাতা, নৌকার গলুইয়ে বসে থাকা সাড়ে চার ফুটিয়া হংসীকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল কবি-কবি আর নয়তো দার্শনিক-দার্শনিক। এক্ষুনি হয়তো কবিতা করে দু'হাত তুলে বলে উঠবেন হংসী—"যত চাও তত লও তরণী-পরে। আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে। এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে—এখন আমারে লহো করুণা ক'রে।।" লব্‌কিশোরপুর ঘাটে ডোঙা ভিড়িয়ে নোঙর করে ব্যস্ত সমস্ত হংসী বললেন, "ললিন, বহুৎ দাঁড় বাইছ, ডোঙায় বসি অখন টিকে বিশ্রাম কর—মুই লবোকিশোরপুর যামু আর আসমু।" অনেক দাঁড় বেয়েছ, ডোঙায় বসে এখন একটু বিশ্রাম কর—আমি নবকিশোরপুর যাব আর আসব। বলেই কী কাজে হাঁটা দিলেন হংসী। দু'পা গিয়েছেন কী যাননি, ফিরে এসে বললেন, "আছা, একলা থাকতে হবেনি, মোর সাঙে তুমি ভি চল।" আমিও নদী ছেড়ে নৌকা ছেড়ে হংসীর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে লাগলাম লব কিশোরপুর গ্রামের দিকে। ডুলুংয়ের কাতাধার বরাবর গ্রাম—সদ্‌গোপ, বোষ্টম, কৈবর্ত, দু-চার ঘর ব্রাহ্মণ আর 'গোড়িয়া' কুমোরদের বাস। আগেও এসেছি কতবার! কিন্তু এখন যেন আবিষ্কারের মন নিয়ে 'সতত সঞ্চরমান'—এদিক-ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোথাও কিছু নতুনত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ভাঙামন্দির, ভাঙামূর্তি, পাথরের টুকরো, একটাও তামা কী পাথরের কুড়ুল, তাম্র-প্রস্তর কী নব্যপ্রস্তর যুগের যে-কোনও নিদর্শন, নিদেনপক্ষে পুরনো পুঁথি-টুথিও পাই যদি! এইভাবেই তো চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তালপাতায়-খেজুরপাতায় আমাদেরও তো কতরকম পুঁথি ছিল— শীতলামঙ্গল, মনসামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, অত্রিজামঙ্গ, সারদামঙ্গল। এসব তো বইয়েই পড়েছি!

গ্রামের মাথায় নদীর কাতাধারে একটা অশ্বত্থগাছের গোড়ায় কিছু লোকজন ভিড় করেছে। কে জানে এই অসময়ে বৃষ্টি-বাদলার দিনেও গাধার পিঠে বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে শিকলি-বাঁধা মেনি বাঁদরকে টানতে টানতে হা-ঘরে বাজিকরের দল আগাম এসে পড়ল কী না! উপস্থিত লোকজনের মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে লম্বা একটা বাঁশের লগি। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে—এই বুঝি 'ট্রাপিজের' খেলা শুরু হবে! হংসী নাউড়ীয়াকে বললাম, "হা-ঘরে বাজিকররা কী আগাম এসে পড়ল?" হংসী হেসে বললেন, "হাগ্‌রীয়া বাজ্‌কার কঠে দেখল ললিন? শ্যামসুন্দর পুআ হরিসুন্দর বিশোই গটে সাপ মারছে বাঁশের লগি দেই—অখন সোউ ত বাঁশ-হাতে হম্বিতম্বি করেটে! গাঁয়ের লোক আসি তাকে ঘিরি ধরি সাপ দেখেটে—যে-সে সাপ কি আর, অশ্ব নাগ।" "অশ্বনাগ? এরকম সাপের নাম তো কখনও শুনিনি?" হংসী বললেন, "হঁ, সাপটার মুখের দু'পাশ জুড়ি ঘোড়ার লাগামের পায়া নাকি দাগ আছে। সেই দাগনু হিতে পারে 'অশ্বনাগ'।" সেই দাগ থেকে অশ্বনাগ, আর তাই দেখতে গাঁয়ের লোক তো গাঁয়ের লোক, অতদূর থেকে ডোঙা চালিয়ে এসে পড়েছেন হংসও। বললাম, "এই দেখতেই বুঝি লব্‌কিশোরপুরে আসা, নাউড়ীয়ার পো?" নাউড়ীয়ার পো দু'হাত

নেড়ে বললেন, "না রে বাপো, না। মোয় ভিনো কাত আছে। সকালনু নৌকায় বসি খালি শুঁনি আসিটি, যে-আসে সোউ ত বলে—অশ্বনাগ, অশ্বনাগ। তাই আর কি, বেহারার পো। অশ্বানাগকুভিটিকে দর্শন করি আসি!" আমার ভিন্ন-কাজ আছে। নৌকায় বসে সকাল থেকেই তো শুঁনে আসছি, যে আসে সেই ত বলে— অশ্বনাগ, অশ্বনাগ। তাই অশ্বনাগকেও একবারটি দর্শন করে আসি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

নবকিশোরপুরের গাঁ-মুড়োয় অশ্বত্থতলায় পড়ে আছেন অশ্বনাগ। হরিসুন্দর বিশোই বাঁশের লগি-হাতে তার পাশেই দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝেই লগি দিয়ে সাপের মাথাটা উল্টে-পাল্টে দেখাচ্ছেন দর্শকদের—"এই সেই অশ্বের মুখের লাগাম চিহ্ন, যার দরুন নাগের নাম অশ্বনাগ।" ভিড়ের ভিতর ফচকে কেউ যেন বলে উঠল, "নাগ না নাগিন?" আর তখনই হরি লগির মাথায় সাপটাকে তুলে অদৃশ্য বক্তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, "নাগ না নাগিন ঘাড়ে চাপলে বুঝবু—আয়!" আর কি থাকে? ভিড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে সে দৌড়ুল—ওই, ওই তো দৌড়ুচ্ছে! মস্ত সাপ—লম্বায় পাঁচ থেকে ছ'হাত। বন্যায় হয়তো পাহাড় থেকে ভেসে এসেছে। হয়তো পাহাড়ি বড়া-টড়া হবে। শুনেছি কানাইসর পাহাড় থেকেই তো ডুলুংয়ের উৎপত্তি। কানাইসর পাহাড়েই তো ফি-বছর আষাঢ় মাসের কোনও এক শনিবারে ধুমধাম সহকারে হাজার হাজার পাঁঠা ও মোরগ বলি দিয়ে পাহাড় দিয়ে পাহাড়কে পুজো দেওয়া হয়, যাকে বলে 'পাহাড় পূজা'। নাকি পাহাড়ের সাতশো আটশো ফুট উঁচুতে একটি পাতকুয়ো আছে। পাতকুয়োর শ্যাওলা-সবুজ জলে তির্ তির্ করে খেলে বেড়ায় চানাচুল মাছ। শুনেছি পাতকুয়োর ভিতরে ঠা ঠা গ্রীষ্মেও জল কখনও শুকোয় না—সে জল নাকি বড় পবিত্র জল! একদা সেখানে প্রকাণ্ড একটি গুহা ছিল—ওড়গোদা-মোটগোদা-শিলদার ওদিককার লোকেরাই বলেছে। গুহার ভিতরেই পাহাড়-দেবতার পূজা হত। নাকি একবার পূজারি বলি দিয়ে বলিদানের খড়গটা ভুলে গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তুলে আনতে। মনে পড়লে ফের যখন আনতে গেলেন তখন দেখলেন—পাহাড়ের দেবতা দু'-দুটি বাঘ নিয়ে মহাভোজে ব্যস্ত। চোখ ধাঁধিয়ে গেল পূজারির-এ কী দেখছেন! ততক্ষণে ক্রোধে ফেটে পড়েছেন দেবতাও। "এই নে তোর খড়গ!" বলেই পূজারির দিকে ছুড়ে মারলেন খড়গটি। "আর কখনও এদিকে আসিস না। পূজা করতে হয় করিস এই পাহাড়ের পায়ে, পাদদেশে।" নাকি সারি সারি পাহাড়, তার মধ্যে কানাইসরই সবচেয়ে উঁচু। আমি কোনওদিন পাহাড় দেখিনি—ওই যা সুদূর দিগঙ্গনে ক্যানভাসে আঁকা নীল নীল 'নীলগিরি'র ছায়া দেখেছি ছায়া, ছায়া। কেমন ছিল ব্যাঘ্রখাদক পাহাড় দেবতার জীবন্ত মূর্তি, —জীবন্ত কায়া কোনওদিন পাহাড়-পূজারি 'মাল'-এরা তা কিন্তু মুখ-ফুটে কখনও কোনওদিন বলেন না। নাকি তাঁদের বলতে নেই, বলতেও মানা। পাহাড়ের নিচে 'দেহুরির স্থান' —সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি মাকড়া পাথর। প্রায় একশো হাত লম্বা পঞ্চাশ হাত চওড়া। একটির উপরে আর একটি, যাঁতার মতো— তার মধ্যে ফুটো একটা। সে ফুটোয় দাও ফুলজল, দিয়েই হাত পাতো নিচে। নিচে, নিচে। "কী দিয়ে পূজিব তোমার ও রাঙা চরণ।" চন্দন চর্চিত ফুল যদি শীঘ্র শীঘ্রই ফুটো দিয়ে হাতে এসে পড়ে, তবে ভাগ্যও খুলে যাবে শীঘ্র শীঘ্রই। একদিন যাবই, কানাইসর পাহাড়ের পাথরের ফুটোয়, তলদেশে ফুলজল গলিয়ে হাত পেতে থাকব—কখন আমারই দেওয়া ফুল আমারই হাতে এসে পড়ে! যেমন করে "জয়ের জন্য একটা পালক দাও না" "জয়ের জন্য একটা পালক দাও না" বলতে বলতে উড়ন্ত জয়পাখির ছায়ার তলে তলে দু'হাত পেতে দৌড়াই পাড়িয়ার বিলে করণতলার মাঠে? কানাইসর থেকে উৎপন্ন ডুলুংয়ের জলে এত কিছু ভেসে আসে—ভেসে এল পানের পাতায় মোড়া বরোজিয়া কন্যা ভ্রমরের কুঞ্চিত কেশদাম, ভেসে এল মুখে লাগামবাঁধা অশ্বনাগ, কত চানাচুনো মাছ, পুঁটি-মৌরলা-বাটা-খয়রা, কত ফুল-বেলপাতাও তো ভেসে এল—কানাইসর পাহাড়কে নিবেদিত, একটা-আধটা ফুল-বেলপাতাও কী আর ভেসে আসে না? ভাসন্ত সে ফুল দৈবাৎ হাত মুঠোয় এসে গেলে তবে তো অবধারিত জয়, ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকাও?

২

অশ্বনাগ, ডুলুংয়ের উৎপত্তিস্থল, কানাইসর পাহাড়, পাহাড়পূজা, পূজার ফুল-জল—এই যখন ভাবছি, নাগরাজকে দেখতে আশপাশের গ্রামের লোকের ভিড় যখন বাড়ছে তো বাড়ছে, তখন, ঠিক তখনই হারিয়ে ফেললাম হংসীকে। এই তো ছিলেন, একটু আগে সাপের নাম কেন 'অশ্বনাগ'—তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গেই তো কথা হচ্ছিল। তবে কী এরমধ্যেই ভিন্ন কাজে চলে গেলেন? ওই যে—"না রে বাপো, না। মোর ভিনো কাজ আছে।" আমি এখন কোথায় যাব—লব্‌কিশোরপুর গ্রামে গিয়ে খুঁজে দেখব 'ভাস্কো-দা গামা' হংসীকে? নাকি ঘাটে ফিরে গিয়ে ডোঙায় বসে থাকব? আর সর্পদর্শন নয়, হরিসুন্দর বিশোইয়েরও অন্য কাজ আছে, সে-কাজে যাবার আগে নাগরাজকে দাহ-টাহ করে যাবে। তাই অশ্বত্থতলা ভিড়ে উপচে পড়েও ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে, ভিড় ক্রমশ পাতলা হচ্ছে। এখন প্রায় দুপুরবেলা। কতজনের কত কী কাজ আছে, শুধু শুধু একটা মরা সাপ নিয়ে এতক্ষণ পড়ে থাকলে চলে? দৌড়ুলাম লব্‌কিশোরপুর গ্রামের দিকে। গ্রামের মাথায় বিশোইদের ঘর, বড় নদী সুবর্ণরেখায় যেমন হংসীবধূকরা বড়ডাঙার ঘাটে নৌকা চালায় তেমনই ছোটনদী ডুলুংয়ের লব্‌কিশোর ঘাটে মনাবিশোইরা ডোঙা বায়। এটা মন বিশোইদের ঘর, হংসী নাউড়ীয়াদের আত্মীয়বাড়ি—হংসী এখানেও থাকতে পারেন। মনা বিশোইদের ঘরে উঁকিঝুঁকি মারছি—আর দেখি কী, জটাজুটধারী একজন বৃদ্ধ কতিপয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াকে ধর্মশাস্ত্র ব্যাখা করে শোনাচ্ছেন। আজ জেলে কৈবর্তদের কোনও ব্রত-উৎসব আছে নাকি? কানে এল—"শ্রীবৎস নামেতে রাজা বিদর্ভ নগরে। তথায় প্রজারা সব সুখে বাস করে। ভেদাভেদ নাহি কিছু পুত্রসম দেখে। রাজায়-প্রজায় মিলে মহানন্দে থাকে।" কোথায় যেন পড়েছি 'শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান'! 'বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্রেই' তো আছে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি গুরুবারেই তো আমাদের বাড়িতে বাড়ি থাকলে আমাকেই 'বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র' এখনও পড়তে হয়। ওই যে 'বিনন্দ রাখালের পালা'তেই তো আছে, আমার প্রায় মুখস্থ! "বিরাট-নগরে থাকে বিনন্দ রাখাল। পাতার কুটীরে তার দুঃখে কাটে কাল।। দুঃখের অবধি নাই কি কব কথায়। পাত্র বিনা ভাঁড়ে করি কষ্টে জল খায়।। শনি কোপানলে যথা শ্রীবৎস রাজন। তেমতি ভুঞ্জিলা দুঃখ দেহেতে আপন।।" শুনেছি, হংসী নাউড়ীয়াই বলেন, নাকি শ্রীবৎস রাজার সঙ্গে আগেকার যুগে তাঁদের জাতির একটা সম্পর্ক ছিল। সেই যখন শনিঠাকুরের কোপে পড়ে রাজা শ্রীবৎসের চরম দুর্গতি, ভিখারির দুর্দশা, খাওয়ার অন্ন নেই, তৃষ্ণার জল নেই, জল থাকলেও জল পান করার পাত্র নেই, শনির দশা কাটাতে চাই প্রতিদিন পোড়া শোলমাছ, তখন, এই জালুয়া-কৈবর্তরাই নাকি খালে-বিলে নদী-নালায় জাল ফেলে কাদা ঘেঁটে ধরে এনে দিত শোলমাছ, সেই শোলমাছ পুড়িয়ে খেয়েই তো রাজা শ্রীবৎসের শনিমুক্তি। আর শনির কী কোপ! শনির দৃষ্টিতে পোড়া শোলমাছও যে জীবন্ত হয়ে ছটফট করতে করতে ফের খালে-বিলেই নেমে যায়। বিশোইপাড়ায় কী এখন সেই 'শ্রীবৎস

রাজার উপাখ্যানই' পাঠ করে শোনানো হচ্ছে, আর সেই পাঠ শুনতেই লবকিশোরপুরে আজ হংসী নাউড়ীয়ার আগমন? কিন্তু কই, আসরে কোথাও তো হংসী নাউড়িয়াকে দেখছি না! মনা বিশোইয়ের বাড়ির উঠোনের এককোণে একটা মস্ত ত্রিশিরা মনসাগাছ, তার তলায় গোবরলেপা মনসাথান। মাথার উপর পলিথিন খাটিয়ে সেখানেই আজকের আসর বসেছে।

মনা বিশোই আমাকে দেখতে পেয়েই আসর থেকে উঠে এলেন। —"কাকে খুঁজট?" বললাম—বড়োডাঙার হংসী নাউড়িয়াকে। "হংসী মামু? হঁ, তাঁর আসার কথা ত আছে। কাঁই, অখনও ত আইলাননি?" হ্যাঁ, তাঁর আসার কথা তো আছে। কই, এখনও তো এলেন না? বলেই আমার হাত ধরে টেনে বসালেন, "আস-অ না, বুস-অ!" এইভাবেই আর একদিন হংসী নাউড়ীয়াই আমাকে প্রায় কোলে করে বসিয়ে দিয়েছিলেন আর একটি আসরে, তখন ছোট। আর আসরটি ছিল প্রায় মেয়েদেরই আসর। আজকের মতো এমনই একজন বৃদ্ধ আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে শোনাচ্ছিলেন কথকতা, ধারে-কাছে ছিল এমনই একটা ত্রিশিরা মনসাগাছ। যদ্দুর মনে আছে গল্পটা ছিল এইরকম—কোনও এক গ্রামে এক গরিব গৃহস্থ ছিলেন, কোনওক্রমে কষ্টে-শিষ্টে তাঁর সংসার চলত। তাঁর ছিল সাত-সাতটি মেয়ে! সাতভাই চম্পা—না, একটিও ছেলে ছিল না। একে একে প্রায় সব মেয়েদেরই পাত্রস্থ করেছিলেন তিনি, বাকি ছিল একটি, সবার ছোটটি। তার যে কিছুতেই বিয়ে হয় না! অথচ সুন্দরী সে। কথায় বলে—"অতি বড় সুন্দরী না পায় বর। অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর।।" চিন্তায় চিন্তায় বৃদ্ধ গৃহস্থের মাথায় হাত। অবশেষে সন্ধান মিলল। দূরবর্তী এক গ্রামে অনুরূপ এক বৃদ্ধের সাতটি ছেলে ছিল, একটিও মেয়ে ছিল না। বৃদ্ধের অবস্থা অতিশয় ভাল। তাঁর ছিল গোয়াল ভরা গাই, পুকুরভরা মাছ আর মাঠ ভরতি ধান। "ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা"। তাঁর ছয় ছেলেরই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল, বাকি ছিল একটি। ছোটটি। ছয় বউই বড় দেমাকি, অহঙ্কারে কারওই যেন মাটিতে পা পড়ে না! তাঁরা শ্বশুরকে মানুষ বলে জ্ঞান করেন না, যত্নআত্তি তো দূরের কথা! শ্বশুরের মনে তাই বড় খেদ—এবার ছোটর জন্য বউ আনতে হয় আনবেন গরিবের ঘর থেকে, গরিবের মেয়ে অন্তত শ্বশুর-শাশুড়ির দুঃখ বুঝবে। তাই দরিদ্র ও সুন্দরী মেয়ের সন্ধানেই ছিলেন বৃদ্ধ। এক বৃদ্ধ মেয়ে খুঁজছিলেন আর এক বৃদ্ধ ছেলে। অবশেষে দুই বৃদ্ধের সাক্ষাৎ হল, এঁর ছেলে তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। এসময়ই কথক বলে উঠলেন, "উলু দাও! উলু দাও!" একসঙ্গে কত যে উলু উঠল! দিন যায় মাস যায়। শ্বশুরবাড়িতে বৃদ্ধের ছোটমেয়ে তথা ছোট বউয়ের দুর্গতির অন্ত নেই। কেউ তো তাঁকে দেখতে পারেন না, ছয় বউয়ের কেউই না। একমাত্র শ্বশুর। শ্বশুরের চোখে একমাত্র তাঁর ছোট বউমাই লক্ষ্মী, বড় পয়মন্ত। তার সেবা শ্রুশ্রূষাতেই তিনি যেন আশার আলো দেখছেন, বেঁচে আছেন। কিন্তু ছয়বউ ছোট বউকে যেন পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-উর্ধ্ব-অধঃ ছয়দিক থেকেই সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছেন, তাঁদের চাপে পড়ে ছোট বউয়ের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। উঠতে-বসতে তাঁরা তাঁকে গরিব বলে খোঁটা দেন। তাতে অবশ্য ছোট বউয়ের কিছু যায় আসে না। শ্বশুরের স্নেহে-আদরে তিনি সবকিছুই ভুলে থাকেন। কী যেন নাম ছিল মেয়েটার, কী যেন—না, আজ আর মনে নেই। একবার এক বর্ষার দিনে মেয়েদের ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা হচ্ছিল— কে কী খেতে ভালবাসে, কী খেলে এই ঝড়িয়া-বর্ষায় বেশ জুতসই হয়, কার কী 'ফেভারিট'। একজন বললেন, তিনি পোলাউ-অন্ন খেতে খুব ভালবাসেন। একজন বললেন, খিচুড়ি আর ইলশা মাছ ভাজা না হলে তাঁর ঠিক জমে না। কেউ বললেন, খিচুড়ির সঙ্গে পাঁপড় আর বেগুনভাজা তাঁর চাই, চাই। তেলে-ভাজা বেগুনি আমতেল আচারের কথাও উঠল। বাইরে তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারাপাত! ছোটবউ অন্যান্য বউদের আড্ডায় কখনও থাকেন না। আজও ছিলেন না। অন্যান্য বউয়েরা তাঁকে লোক পাঠিয়ে ডেকে আনালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "বল্ তো ছোট বউ—আজ এই অঝোর ঝর বৃষ্টির দিনে তোর কী খেতে ইচ্ছা করে?" সহজ সরল মেয়ে ছোটবউ একটুও ভাবলেন না, তার যা মনে এল গড়গড় করে বলে ফেললেন। বললেন, তিনি খেতে ভালবাসেন 'পান্তাভাত আর মাছের টক'। আর তাই শুনে বাকিদের কী হাসি! কী বক্রোক্তি! কেউ কেউ ঘৃণায় নাক সিঁটকালেন। কেউ কেউ বললেন, "ছি! ছি! ছোট বউয়ের কী রুচি!" অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না ছোট বউয়ের। ঘরের কাছে নদীতে নাইতে গিয়ে তিনি গামছা দিয়ে ছেঁকেও আনলেন ছোট ছোট মাছ—পুঁটি-দাঁড়িকিনি-সরপুঁটি-মৌরলা। তাই দেখে অন্যান্য বউয়েরা টিপ্পনী কাটলেন, "এই তো জোগাড়যন্ত্র হয়েই গেল। ঘরে তো পান্তাভাত আছেই, জলদি মাছের টকটা রেঁধে ফ্যাল ছোটবউ! আজ আর বৃষ্টি থামবে না।" মাছের টক রাঁধুক চাই না রাঁধুক, হাঁড়িতে রাখা চুনো মাছগুলোকে আঁজলায় তুলে দেখতে গেলেন ছোটবউ। আর দেখেন কী, পুঁটি-দাঁড়িকিনি-সরপুঁটি-মৌরলা মাছ আর কোথায়, এযে সব এক একটা সাপের বাচ্চা! উঁ-হু, চ্যাঙ-শোল-গড়ুইও নয়, সব সাপ, সাপের বাচ্চা হাড়ির ভিতর কিলবিল করছে! তাদের লুকিয়ে রেখে ছোট বউ বড় করতে লাগলেন। সেই বলে না—দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা? ছোট বউ পরম যত্নে সাপই পুষতে লাগলেন। অন্যান্য বউয়েরা তার বিন্দুবিসর্গ টেরও পেলেন না। দিন যায়, দিন গেল। বছর যায়, বছরও চলে গেল। সাপেরাও বড় হয়ে স্বর্গে তাদের মা মনসার কাছে ফিরে গেল। এসময়ই কথক মন্ত্র আউড়ালেন—"আস্তিকস্য মুর্নিমাতা বাসুকিভগিনী স্তথা। জরৎকারু মুনিঃপত্নী মনসাদেবী নমোহস্তুতে।।" চারধারে বসা ব্রতীরাও বিড় বিড় করে মন্ত্র বললেন। মায়ের কাছে সাপেরা ফিরে গেল, ছোট বউও এতদিনে সাপমুক্ত হলেন—তবে কী গল্পও ফুরিয়ে গেল? না, স্বর্গে গিয়ে সাপের ছানারা তাদের আসল মাকে পালিতা মায়ের হেনস্তার কথা জানাল। মনসা তখন দয়াপরবেশ হয়ে ছোট বউকে নিয়ে এলেন স্বর্গে স্বর্গে সেইসব সাপেদের সঙ্গে ছোট বউয়ের দিন খুব ভালই কাটছিল। বাটনা-বাটা নেই, কুটনো-কুটোও নেই, বালতি বালতি জল তোলও নেই। কাজের মধ্যে ওই তো শুধু কাজ—পুজোর ফুল তোলা আর সাপেদের জন্য দুধটুকু গরম করা! আর এদিক-ওদিক শুধুই টঙস টঙস করে ঘোরা তবে ওই তিনদিক, দক্ষিণদিকে যাওয়া তাঁর বারণ। পরে তো অনুরূপ কাহিনিই পড়েছি, ওই যে 'নাগিনী কন্যার কাহিনি'র বেনেবউ—"মা, নাগলোকে এলে, থাক, দুধ নাড় দুধ চাড়, সহস্রনাগের সেবা করো। সবদিক পানে চেয়ো মা, শুধু দক্ষিণ দিক পানে চেয়ো না।" কী আছে দক্ষিণে? মনসার বারণ সত্ত্বেও ছোটবউ প্রবল কৌতূহলে একদিন দক্ষিণদিকে বেড়াতে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন—মা মনসা নাচছেন! আর সে কী নাচ! মুগ্ধ বিস্ময়ে সে-নাচ দেখতে দেখতে সাপের বাচ্চাদের জন্য দুধ গরম করতে ভুলেই গেলেন ছোটবউ। পরে সাপেরা এসে খেতে চাইলে তাড়াহুড়োয় ফুটন্ত দুধই তাদের খেতে দিলেন। আর তাই খেয়ে তাদের জিভ গেল পুড়ে! হংসী নাউড়ীয়াদের আসরে শুনেছিলাম—রাগে-দুঃখে সাপেরা ছোবল মেরে মেরেই ফেলত ছোটবউকে যদি না মা-মনসা হাত তুলে নিষেধ করতেন, "না বাছারা না, উপকারীর উপকার স্বীকার করতে হয়। ওকে বরং গয়নায় মুড়ে শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আয়।" তাই করেছিল সাপেরা।

হংসী নাউড়ীয়ার সেই আসরের কথকতার ছোটবউ মর্ত্যে এসে দশহরা আর নাগপঞ্চমীর দিন ত্রিশিরা ফণীমনসার ডাল ভেঙে এনে আঙিনায় পুঁতে মা-মনসার পূজা করেছিলেন। মনা বিশোইয়ের ঘরের

উঠোনেও সেই ত্রিশিরা মনসাগাছ। এখন আষাঢ় মাস। দশহরা তো জ্যৈষ্ঠ মাসে। তবে কী নাগপঞ্চমী? উঁ-হু, নাগপঞ্চমী তো শ্রাবণে। আজ কী মনসার ব্রত? মা-মনসার নাম শুনলে কেমন যেন ভয়-ভয়ই করে। মনসাকে নয়, মনসার বাহনকে। এই বুঝি এ-পাশ ও-পাশ থেকে হল হল করে বেরিয়ে এল—দুধিয়া-মেটে-জলখরিস, কালাচ-তোঁপ-কালকেউটে, বোড়া-চিতি-অশ্বনাগ! অথচ 'রোল মডেল' নবীনের পাল্লায় পড়ে কতদিন কত মধ্যাহ্ন যে কেটে গেছে বুড়বুড়ি ঝরনার ধারে ওঁত পেতে আশায় আশায় বসে থেকে! কখন, কখন ওই যেখানে ঝরনার মুখ দিয়ে বুড়বুড় করে জল বেরিয়ে আসে অবিরাম, ছিরছার একটি দুটি পুঁটি কী দাঁড়িকিনি মাছ, দিনক্ষণ ভাল থাকলে ওখান দিয়েই বেরিয়ে আসবে হল হল করে নাকে নোলকপরা সাপ, জলঘোখরা কী জলখরিস!

৩.

হংসী নাউড়ীয়ার খোঁজে মনা বিশোইয়ের ঘর ছেড়ে উঠে পড়লাম। আর কোথায় বা যেতে পারেন হংসী? অবশ্য লব্‌কিশোরপুরে হংসী নাউড়ীয়াদের আত্মীয়-কুটুম্বের অভাব নেই। আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িই যখন যাবেন তখন আমাকেই বা সঙ্গে নিয়ে আসা কেন? "আচ্ছা, একলা থাকতে হবেনি, মোর সাঙে তুমি ভি চল।" আর সঙ্গে এনে ফেলে রেখে একা একা চলে যাওয়াই বা কেন? এতটা স্বার্থপরতা? এতটা হৃদয়হীনতা! রাগে-দুঃখে লব কিশোরপুরের কুলহিরাস্তায় ছিপটি-হাতে দু'ধারের বেড়ার গায়ে চাবুক মারতে মারতে চলেছি, মনে মনে বলতে বলতে, আর কিছুক্ষণের ভিতর হংসী নাউড়ীয়ার দেখা না পাই যদি তো লব কিশোরপুরের ঘাটে গিয়ে ডোঙার 'কাছি' একা একাই খুলে ফেলব, তারপর ডোঙা-নৌকা ভেসে চলবে ভাটায়, ভাসতে ভাসতে পেরিয়ে যাবে আন্ধারী-কুঠীসাই। পেরিয়ে যাবে ভাঙা নীলকুঠির সারি সারি চৌবাচ্চা, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের কৃষকদের 'নীলবিদ্রোহ', 'গোচর আন্দোলন'। সেই যে সেই—রায়তী জমিতে মাঠে মাঠে নীলচাষ করো নতুবা মাঠে মাঠে তোমাদের গোচারণও বন্ধ। রসকুণ্ডু-আমলাগুড়া-গোদাপিয়াশাল-বিনপুর-কাঁকোও-ডেবরা-চন্দ্রকোনা-ক্ষীরপাই-গোপীবল্লভপুর-বেলিয়াবেড়া, জীমসোর-শতলান্দপুর-বাসুয়ান-কুতুবপুর, ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কলগুলিতে কাপড় ছোপাতে এখানকার নীলকুঠিগুলোয় চাষের নীলগাছ জমা দাও নচেৎ—নিল নীলকর সাহেব কোম্পানি, মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির নীলকর সাহেবদের চাবুক খাও, মরো—ভাবতে ভাবতে এরমধ্যেই পেরিয়ে যাব লাউদহ-কালরুই-কুলবনী-সোনাকনিয়া-দাঁতন, ক্রমে... "একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে... ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত...সাগরসঙ্গমে...একজন আরোহী কহিল, নবকুমার রহিল যে?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে... এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন...নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন।"...

আচমকা শুনতে পেলাম সামনে কোথায় যেন প্রচণ্ড ঝগড়া-মারামারির শব্দ! ঠিক ঝগড়া-মারামারি না হোক, অনেকজন মিলে বেশ উঁচুগলায় কথা বলছেন। গলা শুনেই মনে হচ্ছে—দু'-তিনজন স্ত্রীলোকও আছেন। মারামারি না হোক, কথা কাটাকাটি তো অবশ্যই হচ্ছে। কে জানে, নাউড়ীয়ার পো হংসীও সেখানে আছেন কিনা! হাতের ছিপটি ফেলে অকুস্থলের দিকেই দৌড়লাম। ডাইনে একটা মন্দির পড়ল, ভাঙা। গায়ে ক্ষয়ে-যাওয়া টেরাকোটার দাগ। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন—তবু দেখার আর এখন সময় নেই। দৌড়তে দৌড়তে দাঁড়িয়ে পড়লাম—বাঁদিকে ওই তো আশ-শ্যাওড়ার গাছ, পুকুরধার। পুকুরধারেই একটা দোতলা কোঠাবাড়ি, মাটির। উঠোনে সেই ত্রিশিরা মনসাগাছ। দেখেই মনে হচ্ছে—সম্পন্ন চাষি গৃহস্থ, কোনওকিছুর অভাব নেই। অথচ এই বাড়ির উঠোনেই এখন হুজ্জুতি-হাঙ্গামা, লোক জড়ো হয়েছে প্রচুর। যা ভেবেছিলাম তাই, হংসী নাউড়ীও এখানে উপস্থিত। বোধকরি হংসী বধুকদেরই কুটুম্বঘর।

যতটা দ্রুত দৌড়ে এসেছিলাম, নাউড়ীয়ার পোকে খুঁজে পেয়ে ততটাই ধীরপদে এগিয়ে চলেছি। তাছাড়া আমাকে দেখতে পেয়ে হংসীও ইশারায় ডাকছেন। এতলোকের ভিড়, চেঁচামেচি, তাছাড়াও এদিক-ওদিক থেকে তাড়া খেয়ে দু-চাট্টা মুরগি ডানা মেলে সামান্য উড়ে উপরে উঠে ধুপ করে পড়ে গেল, একটা তো পড়ল প্রায় আমার পায়ের উপর! খানিকটা ধাতস্থ হয়ে দেখলাম—উত্তরের ওদিকটায় গোয়ালঘরের দোরগোড়ায় নীল রঙের খুড়দা শাড়ি পরে জনৈকা মধ্যবয়সি স্ত্রীলোক শুষ্কচোখে বসে আছেন, এদিকেই চেয়ে। নির্লিপ্ত, অথচ তাঁকে ঘিরেই আজকের যতকিছু কাণ্ডকারখানা, যেন তিনি জানেনও না। সম্পর্কে তিনি হংসী নাউড়ীয়ার ছোটবোন, তাছাড়াও এ বাড়ির সন্তানহীনা মেজোবউ। দোতলা কোঠাবাড়ির উঁচু দাওয়ায় আরও দু'-তিনজন অধিক-বয়সি স্ত্রীলোক। বোধকরি তাঁরা পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকের শাশুড়ি-জা-ননদরাই হবেন। আমাকে কাছে পেয়ে হাতে



ধরে তাদের যেন মোকাবিলা করতেই হংসী নাউড়ীয়া বলে উঠলেন, "অউ ত একজন শিক্ষিত ছুআ, ভাস্কো-দা-গামা না কী—কুহো না ললিন, দত্ত ত দু'কলম ইংরাজি ঝাড়ি!" এই ত একজন শিক্ষিত ছেলে, ভাস্কো-দা-গামা না কী—বলো না ললিন, দাও তো দু'কলম ইংরেজি ঝেড়ে। অত রাগারাগি-দাপাদাপির মধ্যেও আমি ফিক করে হেসে ফেললাম। এইজন্য নয় যে, হংসী সঠিক উচ্চারণ করেছেন 'ভাস্কো-দা-গামা', হাসলাম তার কারণ—বড়দের ঝগড়াঝাঁটি-সালিশির মধ্যে আমারও ঢুকে পড়া। একথায় এ বাড়ির বড়কর্তা ছোটকর্তারা, উপস্থিত গিন্নিবান্নি স্ত্রীলোকেরা—বোধাহয় জালুয়া-কৈবর্তই হবেন—আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

৪.

ব্যাপারখানা ছিল এই, এ বাড়িতে বিয়ে হওয়া ইস্তক হংসীর ছোটবোনের কোনও অভাব ছিল না, এখনও নেই। এই ধান উঠছে, এই মুগ-মুসুর-ছোলা-বিরিকলাই তিল-তিসি, এই মাছ আসছে, এই মাছের পোনা, মীন—চালান হয়ে যাচ্ছে হাঁড়া হাঁড়া, ডেকচি ডেকচি। বস্তায় ভরতে, কুলোয় পাছড়াতে, মরাইয়ে তুলতে, আঁশ বাছতে, মাছ কুটতে একা হাতে হিমসিম খেত সে। অথচ বাপের বাড়িতে বিয়ের আগে সে খুব দুঃখে ছিল। তাদের বাড়ির অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। তারা খুব গরিব ছিল, গরিব বলে গরিব, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেত না। এখন এতসব ধনদৌলত নাড়াচাড়া করতে করতে সে এতটাই ব্যতিব্যস্ত যে তার মনে অরুচি এসেছে, সে হাঁপিয়ে উঠেছে, তার এখন কাঁদবার 'টায়েম' নেই—সে কাঁদতেও পারে না। অথচ আগে আগে সে কত কাঁদত, কেঁদে কূল পেত না, উঠতে-বসতে চোখ তার ছল্‌ছল্‌ করত। সত্যি সত্যি একদিন সে নিরালায় বসে কাঁদতে চেষ্টা করল—দেখি তো চোখে জল আসে কীনা! আসছে না, সে কাঁদতে পারছে না। কাঁদতে পারছে না, কাঁদতে পারছে না। এদিকে না-কেঁদে সে স্বস্তি পাচ্ছে না, না-কেঁদে সে ঘুমোতে পারছে না, পাগলের মতো নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন যে করেই হোক তাকে কাঁদতে হবে। কাঁদতে হবে, কাঁদতে হবে। ছোটবেলার সই, প্রতিবেশী, এই লব কিশোরপুরেই বিয়ে হয়েছে, একদিন পুকুরঘাটে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সই, তোর কী হিছে?" সই তোর কী হয়েছে? সই বলল, "মুই কাঁদি পারুনি।" আমি কাঁদতে পারছি না। "ভরা সংসার আলো তোর সুখের অধিপতি নাই। শুধু শুধু কাঁদবু ক্যানে?" হংসীর বোন বলল, "না সই, না কাঁদনে মুই মরি যামু। সই বলল, "বালাই ষাট্! মরবু ক্যানে?" "তাহিনে উপায়?" তাহলে উপায়? পুকুরের ওধারেই ঘোষেদের বাগানবাড়ি। মর্তমান কলা পেকে আছে কাঁদি কাঁদি। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে সইকে উপায় বাতলে দিল প্রতিবেশী সই। বলল—ঝগড়ুটে ঘোষবুড়ির চোখের সামনে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কাঁদি-কে-কাঁদি কলা ছিঁড়ে-কুটে যতটা পারে খেয়ে নিতে আর কলাগাছগুলোকে বাড়ি মেরে মুড়িয়ে দিতে। "তা দেখি ঘোষবুড়ি তোর বাপ-মা তুলি গালমন্দ করবে, আর অপমানে তোর চোখ ফাটি জল আসবে!" তাই করল হংসী নাউড়ীয়ার বোন, তাই। কিন্তু গাছগুলো ফের খাড়া হয়ে গেল যেমনকার তেমন, কলাকাঁদি ফের গাছেই লটকে গেল, যেমনকার বাগান তেমনি থাকল, গালমন্দ তো করলই না, উল্টে ঘোষবুড়ি আশীর্বাদ করল। কিছুদিন বাদে হংসী নাউড়ীয়ার বোন ফের বলল, "সই, মুই কাঁদি পারুনি"। সই বলল, "হুঁ, কাঁদবু।" বলেই তাকে পাঠিয়ে দিল অদূরবর্তী লাউ-কুমড়োর খেতিতে—"যা ছিঁড়ি-কুটি একশা করি দে! আন্ধারীর চাষিমেনে খুব রাগী, গালমন্দ করনে তোর চোখ ফাটি হুর্ হুর্ করি জল বারাইবে!" আন্ধারী গ্রামের চাষিরা খুব রাগী,, তোকে গালমন্দ করলে তোর চোখ ফেটে জল বেরোবে। তাই, তাই করল সে। আনাজ খেতিতে ঢুকে একের পর এক লাউ লতি কুমড়ো লতি ফুলসহ ছিঁড়ে ফেলল। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হল না। লাউ-কুমড়োর লতি লক্ লক্ করে আগের থেকেও দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে উঠল। আন্ধারির আনাজ চাষিরা তাই দেখে খুশি হয়ে 'গড়' করল—"মা, তুমি বড় পয়মন্ত! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!"

দিঙ্ দিঙ্ করে বার্তা রটে গেল চারধারে। হংসী নাউড়ীয়ার ছোটবোনের শ্বশুরবাড়িও জানল। জানাজানি হতেই বিপত্তি—ঝগড়া-মারামারি, কথা কাটাকাটি, তারপরে তো এই 'সালিশি'! শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, শাশুড়ি-ননদ-জা-ভাজরা প্রশ্ন তুলেছেন—"বউ কি মানুষ? পিশাচ? না, ডাইনি? কে ও?" সত্যি সত্যি হংসী নাউড়ীয়ার বোনের চোখে এখনও জল নেই। নির্জলা, শুষ্ক। মরুভূমি, মরুভূমি। সাড়ে চারফুটিয়া হংসী নাউড়ীয়ার তর্ক জোরাজুরি সাধাসাধি, আমার ইংরেজি ঝাড়া—কিছুতেই কিছু হল না। বিফল মনোরথে আমরা ফিরে চলেছি—আমি, হংসী ও হংসী নাউড়ীয়ার ছোটবোন—কারও মুখে এখন কোনও কথা নেই। চুপচাপ, চুপচাপ। লব কিশোরপুরের ঘাটে এসে ডোঙার কাছি খুলে দিলেন হংসী—জলে-নৌকায় ঘর্ষণে যা আওয়াজ উঠল "ছলাৎ!" জল ভাঙতে ভাঙতে নৌকা চলল বড়োডাঙার ঘাটে। জল ভাঙছে, জল ভাঙছে। ছোট ছোট 'উরাল-ঘূর্ণি' ফের খইভাজার মতো বুজকুড়ি কাটল একসঙ্গে, একত্রে। আমি ডোঙায় উঠে তখন থেকে দেখে যাচ্ছি, সমানে দেখে যাচ্ছি। দেবতা-পিশাচ-ডাইনিদের চোখে নাকি জল থাকে না। নির্জলা, শুষ্ক। হংসী নাউড়ীয়ার ছোটবোনের চোখও নাকি খট্‌খটে শুকনো। মুখ ঘুরিয়ে আছেন তিনি, ওইদিকে—ওই লব কিশোরপুরের দিকে। সহসা এদিকে মুখ ফেরালেন, আর দেখি কি—তাঁর দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে দর্ দর্! অঝোরঝর চোখের জলে মুখ তাঁর ভেসে যাচ্ছে! স্বর ফুটছে না, স্বর ফুটছে না। বড়োডাঙার 'হাটুয়াপাড়ার' ওদিক থেকে কেবলই গান ভেসে আসছে—"বিধি যাহা লেখি আছে কপালে। বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে—"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১.

সেবার শিমুলগাছে ফুল ফোটার অনেক আগে থেকেই পৌষমাসেই তল্লাটের সব ক'টা শিমুলগাছ 'জমা' করে নিলেন আমাদের মেজোকাকা। না, লাল-ভেঁড়রা হাড়-জোড়া কী দধিগড়ার মতো শিমুলের ছাল ছাড়িয়ে কোবরেজি জড়ি-বুটি বানানোর জন্য নয় নিশ্চয়, শিমুলের তুলো সংগ্রহ করে 'নদী-যে পারের' মহাজনকে অর্ডার মতো সাপ্লাই করার উদ্দেশ্যেই। সে-বাবদ অগ্রিম কিছু টাকা দাদন হিসাবে নেওয়াও হয়ে গেছে মেজোকাকার। তারপর থেকেই গাছগুলোর উপর তদারকির ভার পড়েছে ছোটকাকার। পড়াশোনা তো আর হল না—ওই নাইন পাস! "ও শিমুল" "ও পলাশ" গান গেয়ে গেয়ে অতঃপর এ-শিমুলগাছ থেকে ও-শিমুলগাছ, নদীর কাতাধারের শিমুল থেকে তপোবন জঙ্গলমহলের শিমুল, নিত্যানন্দ বেহেরার গজা-শিমুল থেকে কিয়াঝরিয়ার জেনা-ঘরের দাঁড়া-শিমুল পর্যন্ত আমাদের ছোটকাকা বিজয়চন্দ্রের 'গাছদারি'। একা একাই। কোনও কোনওদিন সঙ্গী হিসাবে জুটে যেতাম আমি, অবশ্য ছুটিছাটায়। বিশেষ করে তখন—ওই শীত শেষে পাতা ঝরার আর একটা পাতাও বাকি থাকত না, 'আখুবিলে' আখ-কাটা শেষ, শুধু পড়ে আছে চর্বিত-চর্বন আখের 'খুয়া', গায়ে-শরীরে খড়িও আর ফুটছে না, নদীধারের পালজমিনে চৈতালী বেগুন-বৈতালের খেতিতে কাজ করতে করতে মুনিষমাহিন্দররাও আনমনে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের

খুরপি দিয়ে পিঠ চুলকে চোখ কচলে অবাক— "ইস্! চার বিটিয়া যে লালে লাল! এত শিমুল ফুল কবে ফুটলা!" তারমধ্যেই হয়তো কেউ পণ্ডিতি করে বললও "দেখিতে শিমুলফুল কত মনোহর। গন্ধবিনা কেবা তারে করে সমাদর।।" কেউ সমাদর করুক ছাই না করুক—আমার, আমাদের কাকা-জেঠাদের কাছে তখন শিমুলফুলের সমাদর, মহা মহাসমাদর! নদীর কাতাধারের শিমুলগাছেও ফুল এসেছে অজস্র। নদীজলে তার ছায়া পড়েছে, নদীজল রাঙা হয়েছে। কত যে হলদে-টুঁটি বনি পাখি শিমুলফুলের গর্ভরেণুতে ঠোঁট ডুবিয়ে মধু খাচ্ছে! ছোটকাকা তো ছোটকাকা, আমাদের মেজোকাকাও রোগী দেখার ছলে এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে ঘুরে ঘুরে এসে এক ফাঁকে গাছতলে দাঁড়িয়ে থুতনি উঁচু করে ফুল দেখেন আর মনে মনে অঙ্ক কষেন—কত ফুলে কত ফল? "ধুলায় ধুলায় ধুল পরিমাণ...।"

শিমুল গাছগুলোয় এতদিন একটাও পাতা ছিল না, শুধুই ফুল আর ফুল। "কাল ছিল জল খালি আজ ফুলে যায় ধরে। বল দেখি তুই মালী হয় সে কেমন করে।" সত্যি সত্যিই পাতা ঝরার মরশুমে সব পাতাই ঝরে গিয়েছিল ডাল থেকে, গাছগুলোয় পত্রহীন শুধুই ছিল শাখা-প্রশাখার কারসাজি। দেখতে দেখতে সেই নিষ্প্রভ শাখা-প্রশাখায় ফুল এল। ফুল এল, ফুল এল। আর লালে লাল হয়ে গেল সমস্ত শিমুল গাছগুলি। হয়তো তখনও সত্যজিৎকৃত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর জন্মই হয়নি তবু কী আর ফুল দেখে বলা হয়নি, "আহা রে কী আনন্দ আকাশে বাতাসে!" আকাশে-বাতাসে না হোক অন্তত আমাদের 'বাখুলে'। আনন্দের ছড়াছড়ি—যাক তাহলে এবছর ফল খুব ভালই হবে। হলও তাই। ফুল ঝরে গিয়ে ফল এল, সঙ্গে কচি কচি পাতাও। কিশলয়। আমাদের স্কুলেও গ্রীষ্মের ছুটি পড়ল। ইত্যবসরে কখনও মেজোকাকা কখনও ছোটকাকার সঙ্গে আমিও শিমুল ফলের 'বাকড়া' দেখতে মাঝে মাঝে নদীধারে, তপোবন-জঙ্গলমহালে, গজা শিমুল-দাঁড়া শিমুলে যেতে থাকলাম। কেন জানি না, আমাদের বাখুলে একত্রে একঅন্নে প্রতিপালিত হওয়া জনা তিরিশেক ছেলেমেয়ের মধ্যে আমাকেই, কেবলমাত্র আমাকেই, বেশি বেশি করে পছন্দ করতেন বিশেষত মেজোকাকা আর ছোটকাকা। তাই অন্যেরা যেতে আব্দার করলেও তাদের মুখের উপর 'না' বলে দিতেন। উনত্রিশ জনকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সঙ্গে নিয়েও যেতেন আমাকেই। তাতে অন্যেরা, এমন কী আমার বড়দা, দুঃখিত হলেও আমার কিন্তু আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকত না। অবশ্য সবাই না হলেও কেউ কেউ, যেমন আমার বড়দা, একা একাই ওইসব স্থানে এমনকী আরও দূর অগম্য স্থানেও যেতে পারতেন। একবার তো কী কারণে মাধব পানীর ছেলেটার দেখাদেখি হাতে গরু-বাঁধার দড়ি নিয়ে গাছ থেকে ঝুলে পড়তে হুটমুট চলে গিয়েছিলেন অতিদূর ঘোড়াটাপুর জঙ্গলে। খান্দার বাড়ার মাধব পানীর ছেলেটা আবার অতদূরও যায়নি। নদীর কাতাধারে পূর্ব-পশ্চিমে আসা-যাওয়ার রাস্তার পাশে একটা সামান্য শ্যাওড়া গাছের ডাল থেকেই ঝুলে পড়েছিল। পরের দিন সকালে আমাদের গ্রামের অমিয়র সঙ্গে আমিও দেখতে গিয়েছিলাম—ততক্ষণে অবশ্য 'পানীঘরের' ছেলেটার গা বেয়েই নির্বিবাদে কালো পিঁপড়ের দল অসময়ের খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য 'শর্টকাট' করছিল নিজেদের পথের। তার বহুদিন আগেই পড়ে ফেলেছি—"পিপীলিকা পিপীলিকা দলবল ছাড়ি একা কোথা যাও যাও এই বলি।" "শীতের সঞ্চয় চাই খাদ্য খুঁজিতেছি তাই ছয় পায় পিল পিল চলি।" সে যা হোক, তো 'বাকড়া'—'বাকড়া' হল শিমুল ফল যার ভিতর ঘাপটি মেরে গোঁজা থাকে পুঞ্জ পুঞ্জ তুলো। খাপটি প্রায় চশমার খোপের মতো, লম্বায় ছয় থেকে আট ইঞ্চি। 'খাপ' অর্থাৎ আধার যত লম্বা হবে তুলোর পরিমাণও ততবেশি হবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকেই আমাদের মেজোকাকা আমাদের ছোটকাকারা তক্কে তক্কে থাকেন, বারবার গাছতলায় গিয়ে থুতনি উঁচু করে দেখেন—পাকল কি পাকল না। একবার পেকে ফেটে গেলেই সর্বনাশ—অমূল্য তুলো অযথা উড়ে যাবে হাওয়ায়! এখন "সবু উড়ি গেলা আউ কিছু নাই।" আপসোসের অন্ত থাকবে না। তাই যথাসময়ে ঘরে তুলতে হবে পাকা ফসল। তৈরি হল মজবুত 'ঝুলি-জাল'। মুখটা গোল—'মাঙ্কি ক্যাপের' মতো। দশ-বারো ফুট লম্বা লাঠির ডগায় মজবুত করেই বাঁধা হল মজবুত 'ঝুলি-জাল'। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বা মাটি থেকে অল্পবিস্তর উপরে গাছের ডালে উঠে 'ঝুলি-জালের' 'আকশি' বাড়িয়ে 'বাকড়ার' তলায় সামান্য খোঁচা মারলেই পাকাফল বোটা থেকে টুঙ্ করে খসে 'ঝুলি-জালে' আটকা পড়বে। আটকা পড়বে, আটকা পড়বে— যেমন করে লোকে আম পাড়ে আর কী।

২.

শিমুলতুলো আহরণের প্রস্তুতি পর্ব শেষ। ঠিক হল—একেক দিন কী দু'দিন ধরে একেকটা গাছে 'বাকড়া' ঝাড়া হবে। 'বাকড়া' ঝাড়তে যাবার 'যাত্রাটা' ও হল বেশ দেখবার মতো! সবার আগে টায়ারের চটি পায়ে আমাদের মেজোকাকা—একহাতে 'ঝুলিজাল' সাঁটা দশ-বারো ফুট ডান্ডা, কাঁধে একটা বস্তা। তার পিছনে ছোটকাকা, তার পিছনে আমি। আমাদের হাতেও জাল-ডান্ডা, কাঁধে বস্তা। আমাদের পিছনে আরও কেউ কেউ ছিল, তবে তাদের 'ঝুলি-ডান্ডা' ছিল না, অবশ্য হাতে-বগলে ছিল ঝুড়ি-ঠেকা-পাছিয়া, যার যার মতো। দু'দিন ধরে 'বাকড়া' ঝাড়া হল তপোবন জঙ্গলমহালের গাছগুলোয়। গজা-শিমুল দাঁড়া-শিমুল, নদীর কাতাধারও শেষ হল। এবার তো 'বাকড়া' ঘরে এনে খলায়-খামার ছাড়াতে বসা। সে-কাজে আমাদের বাবা-কাকাদের মা-কাকিদেরও দরকার হল না, আমরা আর 'ন্যাঙটাভুটুং সাধের কুটুমরাই' 'বাকড়া' ফাটিয়ে তুলো বের করে ফেললাম। পুঞ্জ পুঞ্জ তুলো আমাদের খলা-খামার উঠোনময় 'কাঁঠি-জালে' বন্দি হয়ে খরায় রৌদ্রে শুকোতে লাগল। তার কতক টুকরো-টাকরা 'কাঁঠিজাল'-এর ফাঁস এড়িয়ে হাওয়ায় উড়ে এসে আমাদের নাকে-মুখে ঢুকল। ঢুকল ঢুকল—আমরা তেমন গ্রাহ্য করলাম না। একদিন তো সে-তুলো বস্তাবন্দি হয়ে চলেও গেল মহাজনের ঘরে। আমারও 'সামার' শেষ হল। স্কুল খুলল। কাঁটা-শিমুলের গাছে উঠে 'বাকড়া-পাড়া' 'বাকড়া-ঝাড়া'র স্মৃতিও ফিকে অবছা হতে হতে একসময় মুছেও গেল। তারপরেও স্কুল-হস্টেল-সন্নিকটে বহমান ডুলুং নদীতে গ্রীষ্মে 'নেই নেই' করেও কত জলই যে বয়ে গেল! ছির্ ছার্ করে কত পুঁটি-দাঁড়িকিনী-চাঁদা-বাঁশচাতরি মাছই যে ডাঙায় উঠে এসে ফের নেমে গেল জলে। তার কতক আমাদের ইস্কুলের ভূগোলের স্যর কার্তিক দাসের ছুটি-ছাটার দিনে মাথার উপর দিয়ে ফেলা ঘূর্ণায়মান জালে ধরা পড়ল, কতক জাল কেটে ভেসে গেল নিচে। নিচে, নিচে—ওই যেখানে নবকিশোরপুর-আন্ধারির কাছে ছোট নদী এসে মিশেছে বড়নদীতে। ততদিনে হয়তো ছোট নদী-বড়নদীর সঙ্গমস্থল কুঠীসাইও পেরিয়ে মাছগুলো নেমে গিয়েছে নিচে, আরও নিচে। এমন সময় একদিন এর-তার হাত ঘুরে একটা বই এসে গেল আমার হাতে। বই, বই। বইটার কী নাম, লেখক কে — আজ আর মনে নেই। মনে নেই। মনে নেই। কিন্তু মনে আছে তাতে একটা ছবি ছিল, রঙিন। কোনও গল্পের 'ইলাস্ট্রেশান' হয়তো বা। আগে-পিছে একলাইন ধরে তিন-তিনটে বাঁদর, প্রত্যেকের হাতেই লাঠির ডগায় বাঁধা অবিকল 'বাকড়া' পাড়ার 'ঝুলিজাল'—সেই 'মাঙ্কি-ক্যাপের' মতো। পায়ে টায়ারের চটি, মোটা আর ধ্যাবড়া। সবচেয়ে আগে লম্বায় মাথা উঁচু বড় বাঁদরটা, তারপর মাঝারি, তারপর ছোট। যেন বা আমাদের মেজোকাকা, আমাদের ছোটকাকা আর আমি—একসঙ্গে চলেছি

লাঠির ডগায় বাঁধা 'ঝুলি-জাল' হাতে শিমুলের 'বাকড়া' পাড়তে। এত অদ্ভুত মিল যে খানিক দেখেই মুহূর্তে চোখ বুজে ফেললাম। চোখ বুজে কী আর থাকা যায়! অনন্তকাল! নিমেষে দু'চোখের কোণ বেয়ে এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে জল গড়িয়ে পড়ল টস টস! ছবিটার উপর বারবার হাত বুলোচ্ছি, বারবার। এখনও। যেন "ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে তাহা সিক্ত, অশ্রুপাতক্ষম, ফলে কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।" বলাই বাহুল্য, এতদিনে তো কমলকুমার মজুমদার প্রণীত 'অন্তর্জলী যাত্রা'ও পড়ে ফেলেছি!

৩.

কুস্তুড়িয়ার ওদিকে নীলকুঠির পাশ দিয়ে ইস্কুলে না গিয়ে আমরা মাঝে মাঝে 'শর্টকাট' করতাম রোহিণীগড়ের 'বাবু-ঘর'-এর এদিক দিয়ে। বিশেষত আমি। 'গড়-কাটা'র খাল পেরুলেই সামনের গ্রাম হাতিবাঁধি বা হাতিবান্ধি। সামনেই জমিদারের 'গড়' যখন, এককালে কোথাও না কোথাও হাতি-টাতি বাঁধা থাকত, আর তাই গ্রামের নামও হয়ে দাঁড়িয়েছে 'হাতিবাঁধি'। তবে, শীতে, যখন চাষিদের খলায়-খামারে ধান-বিরি-মুগ কলাইয়ের ছড়াছড়ি, 'রেমন' কী 'এশিয়ান সার্কাস' এই এল বলে, তার আগে আগেই 'মাগনে' হেলতে-দুলতে এসে পড়ত এক বা একাধিক হাতি। আর তারা বাঁধা থাকত আমাদের যাওয়া-আসার রাস্তার ধারে সেই হাতিবাঁড়ি গ্রামের বটতলায়। হাতি হয়তো চলে যেত, হাতি নয় আমরা দেখতে পেতাম বড়জোর হাতির 'নাদি'। কদলী কী বিরি-কলাইয়ের ভুষির জীর্ণাংশ। 'গড়' তখন লক্ষ্মীনারায়ণ ষড়ংগীর মেয়ে শ্রীমতী শৈলবালার। এককালে ওই গড় নাকি ছিল মারাঠাদের দুর্গ, মারাঠাদস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের আস্তানা। ততদিনে ইতিহাস পড়ে জেনেও ফেলেছি—এই তো আমাদের ঘরের ধারে রোহিণী-কুলটিকরী পেরিয়ে কেশিয়াড়ি থানায় ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে সুবর্ণরেখার ধারে-কাছেই ভাস্কর পণ্ডিতকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ। তার উপর কোন ছেলেবেলা থেকেই তো শুনে আসছি—"ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।।" ওই তো গড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈঋতকোণে কাঁটাবাঁশের ঝাড়, তার ভিতর দিয়ে ওই দেখা যায় 'ভৈরবডাঙা'-এখনও সেখানে মাকড়া পাথরের তৈরি ভাঙা ভৈরবেশ্বরের মন্দির নাকি ওই মন্দিরেই একদা "হর-হর-ভৈরব" তুমুল কলরব তুলে পূজা দিতে আসতেন বর্গী অধিনায়ক ভাস্কর পণ্ডিত। পাশেই একটি কুয়ো, একটি পুকুর ছিল। তাও এখন তো মজে গেছে। পড়ে আছে শুধু আধভাঙা একটি পাথরের মূর্তি, আর তার হাতে-ধরা একটি পেঁচা। এত পাখি থাকতে কেন যে হাতে-ধরা পেঁচা! নিশ্চয় পেঁচার সঙ্গে বর্গাদস্যুদের একটা হার্দিক সখ্য-সম্পর্ক ছিল। অথবা বাজ নয় কবুতর নয়—তারা শিকার করতে ভালবাসত পেঁচা! পেচক। নাকি ওই বর্গী দস্যুদের 'হাতিশালা' ছিল এই 'হাতিবাঁধিতেই'। তারাপদ দাশ ও শক্তিময় দাশবাবুদের বাখুলের ভিতর পুকুর খনন করতে গিয়ে এই তো সেদিন প্রত্ন-ঐতিহ্যের মতো আবিষ্কৃত হল দু'টি মরা হাতির কঙ্কাল! কিন্তু রোহিণীগড়ের 'বাবুঘরের' বাবুরা ভৈরবেশ্বর জীউর মন্দির সংস্কার করতে গিয়ে মাটি খুঁড়ে হাতি নয় পেয়েছিলেন শুধুই পিঁপড়ে। পিঁপড়ে আর পিঁপড়ে। সারি সারি কালো কালো ডেঁয়ো। কোথাও পা রাখার আর জায়গা নেই, কোদাল চালাবার উপায় নেই। ঢালো রে কেরোসিন, মারো রে পিঁপড়ে। আক্রার কেরোসিন কত আর ঢালা যায়! ঢাললেও সে-পিঁপড়ে কি আর মরে! রক্তবীজের মতো যত মরে তার দ্বিগুণ চতুর্গুণ হাজার হাজার গুণ পিঁপড়ে ফের মাটির ভিতর থেকে উঠে আসে। 'বাবুঘরের' মুনিষ-মাহিন্দররা অগত্য কাজ ছেড়ে পালায়। মন্দির সংস্কারের কাজ আর হয়ে ওঠে না। আমাদের গ্রামের দশরথ বায়া বা ঝাড়েশ্বরের মতো লোকেরা অতঃপর রটিয়ে দেন—"পিঁপড়ে কী আর, —ওসব বর্গীর দল, মরে ভূত না হয়ে হয়েছে পিঁপড়ে।" বর্গীদের এখন 'পিঁপড়ে-জ্ঞান' করলে কী হবে, একসময় তো কম জ্বালাময় 'হুল' তারা ফোটায়নি! পরে ইতিহাসেই তো পড়েছি,—"লুটি বাঙলার লোক করিল কাঙাল। গঙ্গাপার হৈল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল।। কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম-গ্রাম ঘুরি। লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী-বহুড়ী।।"

৪.

গড়ের দিকে যাবার রাস্তার দু'ধারে অনুচ্চ সব গাছপালা, সাঁইবনী ঝোপ, বাঁশঝাড়, কলাবন। গহলা-গৌড়-ভুমিজ-কৈবর্তদের বাস। কারও ঘরের উঠোনে মস্ত তুলসী-চৌরা, কারও ঘরের উঠোনে কালো হাঁড়িতে সেদ্ধ হচ্ছে ধান। রৌদ্রে কেউ শুকোচ্ছে চুল, কেউ বা বাঁশের বাতাস টাঙিয়ে রেখেছে মাছ ধরার জাল। কোনও কোনও দিন ইস্কুলের ঘণ্টা শোনা গেলে এখানে থেকেই দৌড়ুতে হয়—দৌড় দৌড়—অথচ পা আমার দৌড়ুতে চায় না, 'ফেল' মারে, বন্ধুদের কাছ থেকে কেবলই পিছিয়ে পড়ি। পিছিয়ে পড়ি। দু'ধারের কলাবন-বাঁশঝাড়-সাঁইবনী ঝোপের নিসর্গ কী আমাকে আকর্ষণ করে? পাঁড়কা-ঘুঘু গোবরা-চড়ুই সীম-ফুচির ডাক, কাক-কোকিল, রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে যেতে দ্রুতগামী বেজী-নেউলের আচমকা থমকে পড়ে ছুঁচোলো মুখ উঁচু করে একটুখানি দেখা—এই সমস্ত 'জু-লজি' 'বোটানী' কী আমাকে সেসময় অন্যমনস্ক করে দেয়? না, না। অদূরবর্তী ভৈরবডাঙা তথা ভৈরবেশ্বরের মন্দির, তথায় চূয়াড় বর্গীদের পূজা-আরাধনা ও তার অব্যবহিত পরেই হাঙ্গামার ইতিহাস,—রোহিণী গড়বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে বাঁয়ে অবস্থিত প্রায় আড়াইশো বছরেরও 'প্রাচীন-প্রাচীন' রাধাকান্ত জীউর মন্দিরই কি আমাকে তন্মুহূর্তে ইতিহাস-মনস্ক করে রাখে? না, না। ভূগোল-বিজ্ঞান-ইতিহাস—কোনওটাই নয়। আমাকে কেবলই পশ্চাদ্‌গামী করে তোলে 'দর্শন' আর জনৈক 'দার্শনিক'। ইস্কুল যেতে তাই আমি ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ি, পিছিয়ে পড়ি—

রাধাকান্ত জিউর মন্দির পেরোলেই বাঁয়ে 'গড়বাড়ি', সুবিশাল 'বাবু-ঘর'। একদা মাকড়া পাথর, তদুপরি অধুনা পোড়া ইটের ইতস্তত সংযোজন—দেখলেই মনে হবে, হ্যাঁ, এককালে মারাঠা বর্গীদের দুর্গই ছিল বটে! দর্শন, দার্শনিকের কথা স্বতন্ত্র, রোহিণী ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামে, এমনকী 'নদী-সেপারের' গ্রামেও বহিরাগত আত্মীয়-কুটুম্বের কাছে এককথায় গোটা 'বাবু-ঘর'-টাই ছিল বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।—"অতদূর থেকে এসেছি যখন, একবারটি চোখের দেখা তো দেখে যাই, 'বাবুঘর' বলে কথা"—এই আর কী!

সকাল-সন্ধ্যা তাই লেগেই থাকে দর্শনার্থীদের ভিড়। আমার 'দর্শনের' দৌড় কান্ট-হেগেল-কিয়েকেগাদ-ফুকো-দেরিদা পর্যন্ত নয় কিন্তু, আমাদের ইস্কুলে ওই যারা 'আটস'-এ 'লজিক' নিয়ে পড়ে, যেখানে ফ্যালাসি-ট্যালাসি আছে, বড়জোর কালরুই গ্রামের কালীপদ হাটুইয়ের ওই দার্শনিক 'মিল' পর্যন্ত। কালীপদ তো নয় 'কালুয়া', মনতোষ সিংহরায়ের মতো ফুটবলের দুরন্ত 'স্ট্রাইকার'। সারা বৈকালটা হাতিবাঁধির ডোমপাড়ায় ইস্কুলের মাঠে বল ঠেঙিয়ে, দুরন্ত গতিতে দুই 'উইংস' দিয়ে উপরে উঠে নিচে নেমে নিজে গোল দিয়ে গোল করিয়ে গলদঘর্ম হয়ে আসন্ন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, যখন ইস্কুল-হোস্টেলের গেটের কাছে বকুলগাছটায় অসংখ্য চড়ুই-চটি। হুরহার ফুরফার করে উড়ে বেড়ায়, গুঞ্জন করে, তখন, ঠিক তখনই ইস্কুল-হস্টেলের মাটির দোতলায় হেরিকেনের ছিপি খুলে তেল ভরে পলতেয় দেশেলাইয়ের কাঠি জ্বেলে 'ঘোড়া' ঘুরিয়ে ঈষৎ উসকে দিয়ে নিজের সিটে দড়ির খাটিয়ায় হেরিকেনের আলোয় পড়তে বসে কালীপদ 'লজিক',



"দার্শনিক 'মিল' বলেছেন" বলে শুরুও করে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। অত্যধিক ক্রীড়াজনিত ক্লান্তিতে শুরুর অব্যবহিত পরেই তার ঢুলুনি এসে যায়। কারও সশব্দ পদ-সঞ্চারে সে-ঢুলুনি হয়তো ভেঙেও যায়, সতর্ক হয়ে চোখ রগড়ে ফের সে পড়তে শুরু করে দেয়, "দার্শনিক মিল বলেছেন...। দার্শনিক মিল বলেছেন... সেনটেন্সটা কখনও পুরা হয় না, মিল যে কী বলেছেন তাও পুরোপুরি জানা হয় না, কালীপদ নিজেও না, আমরা প্রতিবেশী 'বোর্ডাররা'ও না, ইত্যবসরে ঘণ্টা পড়ে যায় রাতের খাবারের, হয়তো 'খব্‌লস্' শব্দে আচমকা ঘাই মেরে ওঠে বাটা কী খয়রা, ডুলুঙে।

গড়ের সামনের রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত। ফটকের দরজাটা সময়মতো খোলে, ফের সময়মতো বন্ধ হয়ে যায়। দর্শনার্থীদের জন্য প্রায় সারাদিনই খোলা থাকে দরজাটা। দর্শনার্থীরা কেউ কেউ দরজা থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরেই দর্শন সেরে নেন, কেউ কেউ ভিতরে ঢুকেও এ-দালান থেকে সে-দালানে ঘুরে বেড়ান, তখন সারা চবুতরা-দালান কবুতর পায়রার কুহরে ও দর্শনার্থীদের কলরবে গমগম করে। আমার কেমন যেন ভয় ওঠে, ভয়, আমি শুরু করি দৌড়াতে। অবশ্য তেমন জোরে নয়, ধীরে ধীরে। জানি এসময় একটা ডাক আসবে, আসবেই। দার্শনিকের ডাক। এলও তাই, অবধারিত!—সেই বৃদ্ধ; পরনে ধব্‌ধবে ধুতি, খালি গা। বাইরের বারান্দায় ভ্রাম্যমাণ, —এমুড়ো থেকে সে মুড়ো পর্যন্ত একটানা, বিরামহীন! গৌরকান্তি দেহ, ঈষৎ দ্রুত ব্যস্ত সমস্ত হাঁটাচলায় দোদুল্যমান উপনীত, ধবধবে পৈতে। ডাক শুনেই পশ্চাদপদ আমি আমার হাতের খাতাটা ও কলমটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিই। তিনি মনোযোগ সহকারে ভ্রাম্যমাণ অবস্থাতেই লিখে চলেন। লিখে চলেন, আর লিখে চলেন। —ওদিকে ইস্কুলে কার্তিকদা-কৃত ও বাজিত ঘণ্টাধ্বনি ঝরে পড়েও বাসি হয়ে হয়ে যায়, মন উন্মন হয়ে ওঠে, —প্রথম ক্লাসটাই তো কাট-বাঙাল ভূগোলের স্যর শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র সিংহরায়ের! যে কারণে আমার অপরাপর বন্ধুরা এই রাস্তাটা পরিহার করে ডাইনে না এসে চলে যেত বাঁয়ে, —ওই কুস্তুড়িয়ার ওদিকে নীলকুঠির ওপাশ দিয়ে...। ওই যেখানে গ্রীষ্মে, ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে, নীলকুঠির ভাঙা ইটের পাঁজায় সাপ তার লকলকে জিভ বের করে আপন খেলায় খেয়ালে মত্ত থাকে, যখন ভগ্নস্তূপের প্রাচীর ভেদ করে গজিয়ে-ওঠা ডুমুরের ডালে বসে মনোযোগী মাছরাঙা তার লম্বা ঠোঁটে চেয়ে থাকে প্রায় শুষ্ক সামান্য জল-থাকা ডোবাটার দিকে, যখন সাপ আর মাছরাঙা থেকে কিঞ্চিৎ দূরে ঈষৎ বিস্তৃত নীলকুঠি চত্বরে ঘুরে ঘুরে গলা ফুলিয়ে ডাক দিয়ে যায় পাঁড়কা ঘু ঘু...

কিন্তু আমি তো—তখন পর্যন্ত হয়তো ওই শ্যামা সংগীতটা শোনাই হয়নি আমার, ওই যে—"দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"—তবুও তো! কী এক দুর্বার আকর্ষণে —যে ক'টা দিন হস্টেলে না থেকে বাড়ি থেকে ইস্কুলে যাতায়াত করতাম আমি গড়ের 'বাবুঘরের' পথটা ছাড়তে চাই না! 'দার্শনিক' মানুষটা গড়ের রানি শৈলবালার স্বামী। বেশ কিছুক্ষণ বাদে খাতাটা আমার হাতে এসে গেলে ঝুঁকে পড়ে দেখি— শূন্য শূন্য শূন্য! একটার পর একটা শূন্য, শুধুই শূন্য! গোল, গোল! খাতাটা আমার হাতে ফেরত দিয়ে ততক্ষণে ভ্রাম্যমাণ মানুষটা বিড়বিড় করে বলতে লেগেছেন, —"সবু উড়ি গেলা, আউ কিছো নাই।" সমস্তই উড়ে গেল, আর কিছুই থাকল না। শূন্য, শূন্য। খাতাটা ফের বাড়িয়ে ধরে বলি, "একটা কিছু লিখে দিন, অন্তত এক লাইন—!" দার্শনিক 'বাবুমশায়ের' সেই একটাই উত্তর — "সবু উড়ি গেলা, আউ কিছো নাই।" বলেই শূন্য থেকে যেন কিছু একটা পুনরায় ধরে আনার প্রচেষ্টায় নিজেকে অনন্তর ব্যাপৃত রাখতেন। ততদিনে ওই গানটা আমার শোনা হয়ে গেছে বৈকি, ওই যে—"শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয় ফির আয়—"!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১.

ততদিনে ওড়িশা রাজ্যের ম্যাপ ঘেঁটে ঘেঁটে আবিষ্কার করে ফেলেছি—আমাদের মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানা সংলগ্ন ওড়িশা রাজ্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী জেলাটির নাম 'ময়ূরভঞ্জ'। ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপদা সুলিয়াপদা বেতনুটী বাংরিপোষি কুসমাসোল রাজলুকা চাদুয়ার নাম তো শুনে আসছি সেই কোন ছেলেবেলা থেকে! আর কুহী চিতরডা মুরুভায় তো আমার কত যে জেঠতুতো-খুড়তুতো দিদিদের বিবাহ-সাঙ্গা কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে! এতদিনে কত যে মেঘ এ পারের নয়াগ্রাম দোলগ্রাম খড়িকামাথানী বালিগেড়িয়া বিশ্বনাথপুর ঘোড়াতাড়িয়া চাঁদাবিলা ছাতিনাসোল গোপীবল্লভপুরের উপর দিয়ে অঝোরঝরে বৃষ্টি ঝরাতে ঝরাতে চলে গেছে ওপারে! কত যে ছায়া ওধারে

বারিপদা সুলিয়াপদা বেতনুটী বাংরিপোষি চিতরডা মুরুডায় রৌদ্র ফেলে রেখে শাল-পিয়ালশাল-ধ-আসন-বহেড়া-নিম-জাম-জারুলের মাথার উপর দিয়ে ঘনাতে ঘনাতে এসে গেছে এপারে! এক আকাশেই কখনও মেঘ কখনও রোদ্র। বা রৌদ্রচ্ছায়া। আসলে মধ্যবর্তিনী সুবর্ণরেখাই আমাদের প্রায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক করেছে। আজ বলে নয় সেই কোন ছায়াচ্ছন্ন আদিকাল, ইতিহাসের প্রায় সূচনাপর্ব থেকেই। বেশিরভাগ সময়টাই আমরা ছিলাম ওড়িশা বা তখনকার কলিঙ্গের মধ্যে। এই সেদিনও তো হেরিকেনের আলোয় মাটির দাওয়ায় বসে পড়তে শুনেছি, "There is a frog", দেয়ার ইজ এ ফ্রগো, সেঠিরে গুট্যে ব্যাঙো'। এখনও বারিপদ-মুরুডা থেকে প্রফুল্লদা (আমার জামাইবাবু) আমাদের গ্রামে এলে মাঝেমধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বলে ফেলেন, "ঝাড়া যিব-অ?" অর্থাৎ 'বড় বাইরে' সারতে মাঠের দিকে যাব কীনা জানতে চান। পরে পরে তো বইয়েই পড়েছি—১৮০৩ সাল অবধি আমরা ছিলাম ওড়িশার মধ্যেই। তারপরেও ওই ইংরাজ আমলেই নয়াগ্রাম-গোপীবল্লাভপুরকে ওড়িশার সঙ্গে ফের যুক্ত করা যায় কি না, এই মর্মে প্রস্তাব পাস হয়েও যাচ্ছিল, দেশপ্রাণ বীরেন শাসমল সে-প্রস্তাব রুখে দিয়েছিলেন। এতকথা সতাকাহন করে বলছি, বলতে হচ্ছে এই জন্য যে, মেঘ-রোদ-ছায়ার মতোই আমাদের মধ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল ওড়িয়াভাষাও। ঠিক ওড়িয়া তো নয় যাকে বলে 'হাটুয়া ভাষা'। আগেই বলেছি, রাজু তেলি সদগোপ করণ কৈবর্ত খণ্ডায়েৎ—সব 'হাটুয়া লোকেদের' ভাষা। "মইলা একা ডাঙে" কথাটার মানে বুঝি, লাঠির এক ঘায়ে লোকটি মরে গেল। "বিধি যাহা লেখি আছে কপালে—বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে—" কথাটার অর্থ হল, ঈশ্বর যার কপালে যেমনটি লিখে রেখেছেন তেমনটিই ঘটে গিয়েছে বৈশাখীর জেগে-ওঠা 'পালে' বা চরে। আর "বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে"—সে তো বৈশাখী পালকে নিয়ে রচিত একটা গানেরই ধুয়ো, ধরতাই। খঞ্জনী বা 'চাঙু' বাজিয়ে 'রিপিটেডলি' গাইতে হয়। আমাদের রোহিণী সিআরডি হাইস্কুলের স্কুল হস্টেলেও, বিশেষত রগড়া কাঠুয়াপাল বা তার আশপাশের গ্রামের বোর্ডাররাই ভাত খাবার এনামেলের থানাটাকে খঞ্জনী বা মঙুর মতো বাজাতে বাজাতে সময় সময় ওই এক-দু'লাইন (আচমকাই) গেয়ে ওঠে, ওই যে, "বিধি যাহা লেখি আছে কপালে—বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে—"। কোথায় কোন বৈশাখী পাল, কেন যে কোনও ঝঞ্ঝাটের কাণ্ড বাধলে তল্লাটের মানুষজন ওই বৈশাখীপালেরই নাম করে, বা ওই দু'ছত্র গানই গেয়ে দেয়—তখনও কিছুই জানি না, বুঝে উঠতে পারি না। আর তাছাড়া তখন বয়সটাও এমন যে যখন আঁদালে-কাঁদালে, সে আমগাছের ডালে হোক বাঁশঝাড়ের ফাঁকফোকরে হোক, একটা ভুসভুসে কালো কোকিল 'কু-হু-উ' করে ডাক দিলেই হল, অমনি গানের কলি এসে যেত ঠোঁটে বিদ্যুদ্বেগে "ও কোকিলা তোরে শুধাই রে, সবারই তো ঘর রয়েছে তোর কেন নাই রে..."। সে কী আর এই—"বৈশাখীর পালে মইলা একা ডাঙে"—যত্তসব 'হাটুয়া গান'? তখন কে আর ওসব গানকে পাত্তা দেয়! পুরা বা নিদেনপক্ষে ওই দুটো গানের কলিকে পাত্তা না দিলেও 'বৈশাখী পাল' কথাটা আমাকে মাঝেমাঝেই 'হন্ট' করত।

এখনও কথায় কথায় একটা-দুটো গানের কলি এমনই এসে যায়, এই যেমন "নদী আপন বেগে পাগল পারা"। হ্যাঁ, পাগলের মতোই তার হাবভাব, পথ চলা। চলতে চলতে কখনও সে উত্তরে ভাঙে তো দক্ষিণে গড়ে কখনও পূর্বদিকে যেতে যেতে হঠাৎ টান খেয়ে হাঁসুলির মতো বাঁক নিয়ে চলে আসে উত্তরে। উত্তরে, উত্তরে। আবার কখনও খেয়াল হল তো আন্ধারীর বটতলায় ছলাত ছলাত জলের ঘূর্ণি তুলে লাউদহ-দহবাড়-রামপুরা-কালরুইয়ের আখের খেত বিরিকলাইয়ের ক্ষেতকে ডুবিয়ে দিয়ে বালিপোত করে হরিহর কুঁড়—কেদার বধুক—বিশুই বুড়ির ঘর-বাঁশঝাড় সমূলে উৎপাটিত করে ছোট নদী ডুলুংকে অপহরণ করে, বইয়েই পড়েছি যাবে বলে 'নদীহরণ' 'রিভার পাইরেসি', ছোটনদী ডুলুংকে সেভাবেই গ্রাস করে সে ফের ভসরাঘাট-নয়াগ্রামের কাছে এসে বাঁক নিয়েছে দক্ষিণে। দক্ষিণে, দক্ষিণে। বছরের পর বছর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় দলমা ধানঝোরি হুড়ু দিয়ে হুড় হুড় করে নামতে নামতে সঙ্গে কী নিয়ে নেমে আসে সদানীর এই নদী? ভূগোলেই পড়েছি, ক্রেটোনিক শিলায় গড়া নদীবেড়ের উপর নরম কাদামাটির উর্বর পললস্তর, তারসঙ্গে নিয়ে আসে ক্যালসিয়াম পটাসিয়াম সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আর ফসফেট, যা কিনা জলে ধুয়ে ধুয়ে নদীখাতকে করে তোলে আরও উর্বর, যা কিনা জমতে জমতে একদিন বহন্তি নদীর মাঝখানে নদীর এধারে-ওধারে। কাছিমের পিঠের মতো নতুন নতুন চর হয়ে জেগে ওঠে। এইভাবেই তো একদিন জেগে উঠেছিল আমাদের এই 'কোদোপাল' 'বৈশাখী পাল' —তল্লাটের জনমানুষ নদীচরকে তো 'চর' বলে না, বলে 'পাল'। ওই যেমন "বিধি যাহা লেখি আছে কপালে—বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে...।"

২.

আমাদের গ্রামে আমাদের বাখুলে কুলটিকরী বা রোহিণীর হাট থেকে শিকে-বাঁহুকের একদিকে ঝুলন্ত কলমিশাকের আঁটি আরেকদিকে পুঁটলিতে বাঁধা 'জীবন যৌবন' বই-ই যে অতঃপর ঘনঘন আসতে লাগল এমনটা নয়, সময় সময় শিকে-বাঁহুকের আর একদিকে লালশালুতে মোড়া হয়ে ঝুলতে ঝুলতে এসে গেল 'ব্রহ্মবৈর্ত পুরাণ' 'প্রভাসখণ্ড' 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ' 'গরুড়পুরাণ' 'বিষ্ণুপুরাণ' 'মনুসংহিতা' 'নারদ সংহিতা' 'বেণীমাধব শীলের ফুল ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা', আরও কত কী! যাঁরা এসব চর্চা করেন তাঁরা যে সব আই এ, বিএ পাস করেছেন এমনটাও নয়, ওই বড়জোর থ্রি কি ফোর, তাতেই পুঁথিগত বিদ্যায় কী দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাঁদের! এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ঋষি বিশ্বামিত্র-বশিষ্টের মতো দাড়ি-গোঁফ রেখেছেন, গেরুয়া পরেন, রোজ দু'বেলা প্রাতঃকালে আর সায়াহ্নে বুড়বুড়ি ঝরনার শীতে উষ্ণ গ্রীষ্মে হিমশীতল মনোরম নাতিশীতোষ্ণ জলে অবগাহন ও আচমন অন্তে আহ্নিক করেন। তারপর গৃহে ফিরে এসে গুন গুন করে সুর ভাঁজেন—"হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হরে। কৃপা কর রমানাথ মুকুন্দমুরারে।।" আর একটুও দেরি না করে, হয়তো কাশীদাসী মহাভারত খুলে ওই সুরটাই ওখানে 'পুট' করে দেন, "মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।" অমনি ধারার এক মানুষ শ্রীনিত্যানন্দ বেরা। আমি হন্যে হয়ে 'কোদোপাল' 'বৈশাখী পাল' করে বেড়াচ্ছি শুনে আমকে একদিন হেঁকে ডেকে 'বিষ্ণুপুরাণ' খুলে দেখালেন, "এই দ্যাক—"! আমি তদ্‌গত হয়ে দ্রষ্টব্য অংশটুকু পড়তে লাগলাম, "হে ব্রাহ্মণ! আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিলও পৃথিবী উত্তরোত্তর শব্দাদি গুণযুক্ত। ইহারা নানাবীর্য ও পৃথকভূত বলিয়া সংহতি বিনা সম্পূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম। অন্যান্য সংযোগ এবং পরস্পর সমাশ্রয় জন্য সম্পূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম। অন্যান্য সংযোগ এবং পরস্পর সমাশ্রয় জন্য সম্পূর্ণ ঐক্যপ্রাপ্ত

এবং এক-সঙ্ঘাতের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অনুগ্রহবশত ওই মহদাদি ও বিশেষান্ত সকলে (অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্যন্ত) মিলিত হইয়া অন্ধ্র (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে। হে মহাবুদ্ধে! ব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর (হিরণ্যগর্ভরূপীর) উত্তম সংস্থানভূত, জলবুদবুদবৎ বর্তুলাকার, উদকেশর ওই বৃহৎ প্রাকৃত অণ্ড, ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে বিবৃদ্ধ হইল। অব্যক্তরূপ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ওই অন্ডে ব্যবস্থিত হইলেন। মেরু (সুমেরু) তাহার উল্ব (গর্ভবেষ্টন চর্ম), অন্যান্য মহীধর জরায়ু এবং সমুদ্রসকল মহাত্মার গর্ভোদক হইল। হে বিপ্র! ওই অন্দ্রে সপর্বত দ্বীপসকল, সমুদ্রসকল এবং সদেবাসুব মানুষ, সজ্যোতিঃ লোকসংগ্রহ সমুদয়ই উৎপন্ন হইল। পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দশ দশ গুণ অধিকবারি, বহ্নি, অনিল, আকাশ, ও ভূতাদি (তামস অহঙ্কার) দ্বারা ওই অণ্ড উত্তরোত্তর বহির্ভাগে আবৃত্ত হইল।" কোনওকিছুই ঠিকমতো বুঝতে পারছি না, পাঠ্যাংশটুকুতে এক 'অণ্ড' বা প্রকাণ্ড ডিমের কথা বলা হয়েছে, আর ওই অণ্ডই যে 'ব্রহ্মাণ্ড' (বিগ ব্যাং) সেটুকুই যা ঠিকমতো বুঝতে পেরেছি। মহাভারত রচনাকালে শ্রীশ্রীগণেশের কলম এত দ্রুত চলত যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁর 'ডিকটেশন' দেওয়ার সময়ে ইচ্ছে করেই কিছু কিছু 'ব্যাসকূট' অর্থাৎ জটিল বিষয়ের অবতারণা করতেন, যাতে করে একটুর জন্য হলেও যেন গণেশের কলম থেমে যায়! এখানেও যেন অনুরূপ ব্যাসকূটে ভর্তি। তবু নিত্যানন্দ বেরার কাছে অত সহজে হারব কেন? হাবভাবে বুঝিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, সমস্তই আগাগোড়া বুঝে ফেলেছি। মুখে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, "এই যে বলা হচ্ছে 'হে ব্রাহ্মণ' 'হে মহাবুদ্ধে' 'হে বিপ্র' — এসব বলা হচ্ছে কাকে? কার কার মধ্যে কথোপকথন তার মানে 'ডায়লগ' হচ্ছে?" নিত্যানন্দ বললেন, "সে তো বিষ্ণুপুরাণের গোড়ার কথা রে ললিন। শিষ্য মৈত্রেয়ের কাছে বিষ্ণুপুরাণ সংহিতা ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিলেন মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর। পরাশর কে জানিস তো? পরাশর ছিলেন বশিষ্ঠের নাতি, শক্তির বেটা, ওই যাকে বিশ্বামিত্র মুনির পোষা রাক্ষস ভক্ষণ করেছিল।" সাধু নিত্যানন্দ আমাকে এমনভাবে বশিষ্ট শক্রি-পরাশরের সম্পর্ক বোঝাচ্ছিলেন যেন তিনি তাঁর পাশের বাড়ির ঝাড়েশ্বর-বায়া-খুঁ-মদোতির পারিবারিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। আসলে আমাদের 'নদী-সেপারের' রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-সংহিতা শাস্ত্র বিশারদ লোকগুলোর হাবভাব ধরনধারণ বোলচালই ওইরকম। সাধু নিত্যানন্দ মুদ্রাদোষে কথায় কথায় বারবার 'হয়তো' বলেন, এতবেশি বার 'হয়তো' বলেন যে লোকে তাঁকে 'হয়তো বুড়ো' বলেই ডাকেন। 'হয়তো বুড়ো' কী করে 'কোদোপাল' আর 'বৈশাখী পালের' সৃষ্টি হল তাই বলতে গিয়ে আদিতে অণ্ড থেকে কী করে ব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠল তারই ব্যাখ্যা করে চলেছেন। দেখতে দেখতে লোকও জমে গিয়েছে মেলা! তল্লাটে তখন হাঘরে বাজিকরের দল। গঁগাবাবাজি, উল্কি-আঁকা খোদানি, ভাঙা পিতল-কাঁসা-তামা-সিসার বদলে বিস্কুট বেচনেওয়ালারা, আর এই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ শাস্ত্র বিশারদরাই লোক টানতেন বেশি। তবে সেসব কী আর শিক্ষিত বয়স্ক কর্মব্যস্ত পুরুষরা, বেশির ভাগই মেয়েরা, চ্যাঙনা-ম্যাঙনা, 'ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমরাই'।

ওই যে, "অব্যক্তরূপ জগৎপতি বিষ্ণু, ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ওই অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন।" অর্থাৎ ডিমের ভিতর বিবত্তু জগৎ সৃষ্টির জন্য অবস্থান করলেন। পঞ্চভূত—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম-ওই ডিমের বহির্ভাগকে বর্ধিত করল। তারপর একসময় সমস্ত ভূতকে ভক্ষণ করে সেই ডিম্ব জলমগ্ন হল। আর পরমেশ্বর ঈশ্বর তখন 'নাগপর্যঙ্কশয়নে' শয়ন করলেন। তখন না ছিল দিন, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, না ছিল আলো, অন্ধকার বা অন্য কোনও বস্তুও। 'নাগপর্যঙ্ক-শয়ন'-য়ের এই সেদিন পর্যন্ত মানে বুঝিনি। তবে রামায়ণ কী মহাভারতে পূর্ণপৃষ্ঠার রঙিন ছবি দেখেছি—মস্ত এক সাপ তার শরীর বেড় দিয়ে শয্যা রচনা করেছে আর নারায়ণ-বিষ্ণু সেই অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন। পরে জেনেছি, ওই 'অনন্তশয্যা' আসলে সর্পরাজ অনন্তনাগের শয্যা। অনন্তশয্যায় শুয়ে নারায়ণ-বিষ্ণু সৃষ্টিকাজে নিমগ্ন হলেন। তাঁর নাভি-সরোবর থেকে প্রস্ফুটিত হল এক পদ্ম, সেই পদ্মে আবির্ভূত হলেন চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি ব্রহ্মা। তৈরি হল ব্রহ্মাণ্ড। শুধু কী একটা, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। নাকি ওই পদ্মের বোঁটাতেই চৌদ্দোটা, তার মাঝখানেটাই আমাদের এই পৃথিবী। পর, পরার্ধ, কল্প—কত রকম সময়ের হিসাব! পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলাতে এক ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্তে এক অহোরাত্র, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে একমাস, ছয়মাসে এক অয়ন—উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন-দেবতাদের এক দক্ষিণায়ন সমান এক রাত্রি, এক উত্তরায়ণ সমান একদিন। এইভাবে দ্বাদশ সহস্র বছরে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারযুগ। আর—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—এই চারযুগের হাজারগুণ, তারমানে চারহাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন, ব্রহ্মার একদিন সমান চতুর্দশ মনু। মনু, মন্বন্তর, পর, পরার্ধ, কল্প, মহাকল্প কত রকম সময়ের হেরফের! যখন ব্রহ্মার কে পরার্ধ এক পরার্ধ শেষে এক মহাকল্পও শেষ, তখন একশো বছরেরও অধিককাল ধরে অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টিপাতের দরুন ভূমণ্ডল ভুর্বলোক স্বলোক, এমনকী সপ্তর্ষিগণের আশ্রয়স্থলও জলমগ্ন হল, প্লাবিত হল, আর সেই মহাপ্লাবনে অখিলভুবনও মহাসমুদ্রে ডুবে রসাতলে গেল। তখন ভগবান বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে জলে ডুব দিলেন। বিষ্ণুপুরাণে তো অনুরূপ লিখিত আছে, "সামস্বরধ্বনি শ্রীমান্ ধরণীধর পরিঘর্ঘর শব্দে গর্জন করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উৎপল পত্রসন্নিভ (স্নিগ্ধ শ্যাম) প্রফুল্ল পদ্মলোচন মহাবরাহ নিজ দন্ত দ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান নীলাচলের ন্যায় উত্থিত হইলেন।...পরমাত্মা মহীধর এইরূপে সংস্তূয়মান হইয়া, ক্ষিতিকে শীঘ্র উত্থাপিত এবং মহার্নবে ন্যস্ত করিলেন। দেহের বিস্তৃতির জন্য পৃথিবী নিমগ্না না হইয়া সেই সমুদ্রের উপর মহতী নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিল। তদনন্তর অনাদি পরমেশ্বর পৃথিবীকে সমান করিয়া, যথাবিভাগে পর্বত সকল স্থাপিত করিলেন...।" শুধু কি পর্বত, এইভাবে গাছপালা, নদনদী, পশুপাখি কীটপতঙ্গ, অবশেষে মানুষ, নর ও নারী তৈরি করলেন। 'সংস্তূয়মান' কথাটার কী আর মানে বুঝেছি? তখন বুঝিনি, তবু সাধু নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিনি, রোহিণী সি.আর.ডি হাইস্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র, যে কীনা "হে ভারত ভুলিও না" ট্রানশ্লেশানে একটার জায়গায় দুটো 'Hail' জুড়ে দিয়ে অনুবাদ করে "Hail Hail India, do not forget..", সে থ্রি-ফোর পাস করা সাধু নিত্যানন্দকে মানে জিজ্ঞাসা করবে? তাহলে আর রোহিণী সিআরডি হাইস্কুলের 'প্রেসটিজ' বলে থাকল কী? তাই সবজান্তার ভান করে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-সংহিতা ঘাঁটা সাধু নিত্যানন্দকে কিছুটা তাচ্ছিল্যভরেই জিজ্ঞাসা করলাম, "এসবের সঙ্গে বৈশাখী পালের কী সম্পর্ক?" "আছে, আছে হয়তো" বলেই সোল্লাসে সাধু নিত্যানন্দ বলে উঠলেন, "ললিন, বৈশাখী পালও একটা অণ্ড রে, সেই 'জল বুদবুদবৎ বর্তুলাকার'। এক বৈশাখে, সেবার প্রচণ্ড খরা, খরা বলতে খরা, যেন একশো বছর ধরে অনাবৃষ্টি, মাঠঘাট-সব ফুটিফাটা! যেন প্রলয়ঙ্কর সূর্যের

সাত রং সাতরশ্মি শোষণ করে নিয়েছে নদীনালা খালবিলের জল, প্রলয়ের আগে যেমনটা ঘটে আর কী! বুঝলি তো? —যেন একটা নয়, একসঙ্গে সাতটা সূর্য শোষণ করে চলেছে, ধরাকে দগ্ধাচ্ছে। সেবারই তো 'হা জল' 'হা জল' হাহাকার করে কানী বুড়ি, কালাচাঁদের পিসি রে, মরে গেল ছাতি ফেটে টাট্‌কা-টাট্‌কি! মাঠঘাট জমিজোতের চেহারা হয়ে দাঁড়াল কাছিমের পিঠের মতো ফাটাফুটো, যেন অবিকল ভগবানের 'কুর্ম অবতার'। অবশেষে একদিন হয়তো খরা কাটলই কাটল, বৈশাখেই সুবর্ণরেখার গোড়ায় হয়তো বৃষ্টি নামল, বৃষ্টি বলে বৃষ্টি, ধুলমাদুল অঝোরঝর বৃষ্টি! যেন সেই প্রলয়ের আগের একশো বছর ধরে বৃষ্টি! কত কত জল যে হড়হড়িয়ে নেমে এল সুবর্ণরেখায়! নদীর এ-ধার সে-ধারের গ্রাম— দেউলবাড়-খান্দারপাড়া-থুরিয়া-রগড়া-কাঠুয়াপাল-হরিপুরা-বহড়াদাঁড়ি-মহিষাসুর দঁক-জাহাজকানার জঙ্গল, ঘরবাড়ি মায় গোরু বাছুর—সব, সব ভেসে গেল! কেউ কেউ বলে—হয়তো সেবারই ভেসে এসেছিল টাকার গাগ্‌রা, আর সেই টাকার গাগ্‌রা মাথা-ফাব্‌ড়ি জাল ফেলে ছেঁকে তুলেছিল বড়োডাঙার দঁড়পাট মহাজনরা। আর তারপর থেকেই তো তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটল দিঙ দিঙ করে। ললিন, বিশ্বাস না হয় যদি তো জিজ্ঞাসা করিস তোর হংসী নাউড়ীয়াকে। নাউড়ীয়ার পো তখন তার নৌকার কাছি বেঁধে রাখত উদারডাঙার প্রায় ডুবে যাওয়া পাকুড়গাছের মগডালে। মাছ ত মাছ, ডুবে যাওয়া খেতিখামারে ধানখেতে খই চালার মতো ভুস করে ভেসে উঠত বড় বড় কাছিম, বালিগড়! কত ধরেছি, কিন্তু খাইনি, খাইনি এই জন্য যে, তুই হয়তো জানিস কী জানিস না—আমাদের গোত্রের নাম 'কাশ্যপ', ওই যাকে বলে 'কাছিম'। তাই কচ্ছপ আমাদের খেতে নেই, নাহলে দখিনসোল পাড়িয়ার বিল করণতলার ধানবিলে কত কত কাছিম যে কব কব করে ঘুরে বেড়াত! একটা শালমাছ উঠেছিল, ওজনে একশো কুড়ি সের, মাছটার নাকি পাখনা তো নয়, ডানা ছিল।—তো যা বলছিলাম, বৃষ্টি বৃষ্টি, হচ্ছে তো হচ্ছেই, যেন ঐরাবত হাতির শূড় দরিয়া থেকে জল তুলছে আর ঢালছে, তুলছে আছে ঢালছে। আমরা ভেবেছিলাম—হয়তো ধরিত্রী পাপে পরিপূর্ণ, তাই প্রলয় আর কে আটকায়? না হলে বৈশাখ মাসে এমন শুকনা নদীতে কী আর বান ডাকে? আমরা হরিনাম সংকীর্তন শুরু করেছিলাম, "হরে মুরারে মধু কৈটভ ভারে—"। শাস্ত্রের বচন যে হুবহু মিলে যাচ্ছিল,—এই দ্যাক্, পুরাণ শাস্ত্রেই লেখা ছিল, "সেই সময়ে লোকসমূহ অন্ধকারময় হইবে এবং স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কেবল সেই মেঘ শত বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ধারে বারিবর্ষণ করিতে থাকিবে।" সত্যিসত্যিই তো দিনের পর দিন সূর্যের দেখা নেই, চারধার অন্ধকার, কিবা দিন কিবা রাত্রি বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। গর্তে জল ঢুকে সাপগুলো বেরিয়ে আসছিল, হল হল করে ঘরের ভিতর সাপে-মানুষে জড়াজড়ি একাকার, তবে কেউ কাউকে কামড়ায়নি। কে কাকে কামড়াবে? যে যার জান বাঁচাতে তখন ব্যস্ত, সেই বলে না 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা?' তারপর 'কবে যে বৃষ্টি' থামল, 'কতদিন পরে যে নদী ছাড়ল' সূর্যের দেখা মিলল—আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে খুব মনে আছে কে বা কারা রটিয়ে দিল—নাকি নদী পারে রগড়া-কাঠুয়াপালের ওধারে ঠাকুর ফের 'বরাহ অবতার' হয়েছেন।"

"রগড়া-কাঠুয়াপালে নদীধারে বরাহ অবতার? তার মানে?"

সাধু নিত্যানন্দ অতঃপর উঠলেন, "তবে আর এতক্ষণ কী শুনলি! ললিনরে মহা প্লাবনের পরে পরে ভগবান বিষ্ণুই তো বরাহের রূপ ধরে জলের তলা থেকে ধরাকে দাঁতে করে তুলে এনেছিলেন জলের উপর! তেমনই সেই বৈশাখমাসে সুবর্ণরেখা নদীতে সেই মহাপ্লাবনের পরে নদী যখন 'ছিঁড়ে' গেল তখন সেই বিষ্ণুই তো বরাহের রূপ ধারণ করে ওই পলিপড়া উর্বর চরকে দাঁতে করে তুলে দিয়েছিলেন গোটা সুবর্ণরেখা নদীর উপর! যে-সে কথা নয়, কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ... সাকুল্যে একশো পঁচিশ বিঘা পলিপড়া উর্বর জমি, গোটা একটা পলি দ্বীপ, প্রায় বৈশাখের জন্ম তাই নাম হয়ে গেল 'বৈশাখী চর', বা 'বৈশাখী পাল'। সেই থেকেই তো গান শুনে আসছি—"বিধি যাহা লেখি আছে কপালে। বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে..."। এ বিষয়ে আরও বিশদ কিছু জানতে চাস যদি তো তোকে যেতে হবে কাঠুয়াপালের সন্তোষ দাসের কাছে, কবিয়াল সন্তোষ দাসই তো বৈশাখী পাল নিয়ে পালা লিখেছে, ওই যে সেই —"ওইরূপে দেখ হইলা শেষ। ভাবে ভুইলে সন্তোষ দাস।" ওভাবেই পালা শেষ হল, ভাবের ঘোরে সন্তোষ দাস রচনা করল।"

৩.

আমাদের তল্লাটের মানুষজনের স্বভাবচরিত্রই এই, কোনওকিছু বিষয়ে জোর তর্ক বাধলে, "বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর", এহেন 'প্রোভার্বের' ধারেকাছেও না গিয়ে প্রমাণ খুঁজতে খুলে বসেন গীতা-সংহিতা রামায়ণ-মহাভারত, আর মুখে বারবার বলতে থাকেন, "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" অবিরাম অঝোরঝর বৃষ্টিপাতের দরুণ মাঝে মাঝে প্লাবন হত, এক-আধ বছরের প্লাবন নয় দশ-বিশ-একশো-দুশো বছরের প্লাবন। প্লাবনে নদীর উপর পলি জমত। এক-আধ বছরের পলি নয় দশ-বিশ-একশো-দুশো বছরের বলি। পলি পড়ে পড়ে নদী-বেডের গভীরতা কমে যে, ভরাট হত নদী। ভরাটি নদীর উপর ফের উপর্যুপরি প্লাবন হলে নদীজল উপছে পড়ে তটবর্তী গ্রাম-নগর ভাসিয়ে দিত। পরে বইয়েই তো পড়েছি, নাকি এইরূপ মহাপ্লাবনেই ভেসে গিয়েছিল মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা। মহেঞ্জোদারোর মাটি খুঁড়ে নাকি পাওয়া গিয়েছিল নোয়ার নৌকার মতো অজস্র খেলনা-নৌকা! ধাস ধাস করে নদীর 'কাতা' ভাঙে, নদী একধার থেকে সরে যায় আরেক ধারে, মহাপ্লাবন শেষ হলে চর জেগে ওঠে, উর্বর পলি চর। এই যেমন আমাদের 'কোদোপাল', এই যেমন 'বৈশাখী পাল'। এতদূর অবধি আমার জানা ছিল, আমাদের গ্রামের অলকনিরঞ্জনের শিষ্য ভোলানাথ দণ্ডপাট, যিনি থেকে থেকেই গেয়ে ওঠেন, "রে মনুয়াভাই, রে মনুয়াভাই" তিনিও আরেক ধাপ এগিয়ে 'নারদ সংহিতা'র পাতা খুলে একদিন দেখিয়ে দিলেন জেগে-ওঠা বৈশাখীর পালকে কেন্দ্র করে যে দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল তা নতুন কিছু নয়, এরকম জেগে ওঠা চরের অধিকার নিয়ে, ভোগদখল নিয়ে 'যুদ্ধ' সৃষ্টির আদিকাল থেকেই চলে আসছে। শুধু জেগে-ওঠা চর নয়, চরের অধিকার নয়, চরের জমির প্রকৃতি নিয়েও নাকি লেখা আছে ওইসব শাস্ত্রে। নাকি জমি ছিল তিন রকমের—অনুপ, জঙ্গল আর সাধারণ। 'অনুপ' তার মানে যে জমির উপর জল জমে না। সেখানে কী কী পাখি বাস করে তাও নাকি বলা আছে—বক, সারস, চকাচকী, রাজহংস, বালিহাঁস। সেখানে কী কী পশু আছে? মোষ, বরা, খেঁকশিয়াল, খরগোশ। আর কী কী গাছ? আকন্দ, বেল, বাবলা, শাল, ছাতিনা। আখ তো লাটকে লাট! ভোলানাথ দণ্ডট চশমার দড়ি বাঁধা ডাঁটিটার দড়ি কানে পাক দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "বৈশাখীপালের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে

কী মিলছে না? বরাবরের জন্য না হোক, রগড়া-কাঠুয়াপালের সদ্‌গোপ রাজু-তিলি সব হাটুয়া চাষিদের গোরুমোষ গোচারণে সেখানে এখনও যায় কি না?" যায়, যায়। আর সরাল শামখোল খড়হাঁস বালিহাঁস তো শীত পড়তে না পড়তেই কোন সুদূর প্রদেশ থেকে 'কারিকুরি' পাখির মতো কখনও সরলরেখায় কখনও বক্ররেখায় মেঘপাতাল অঙ্কিত করে উড়ে আসে। এসে বৈশাখী পালে বালুচরে নদীকিনারে ঝুপঝাপ নেমে পড়ে। হুবহুই মিলে যাচ্ছিল। তারপর থেকে 'নদী-সেপারের' রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-সংহিতা শাস্ত্রবিশারদ লোকগুলোর প্রতি আমার শ্রদ্ধাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমি ছুটিছাটায় অলক নিরঞ্জনের শিষ্য কাম ডিগ্রিহীন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ভোলানাথ দণ্ডপাটের কাছে ওষুধ আনতে গ্রাম বতোডাঙায় যেতাম। ওষুধ তো সেই—ব্যথাবেদনায় আর্নিকা, সর্দিকাশিতে রাসটয়ু আর পেটের অসুখে নাক্সভোম—আসলে ওষুধ আনবার ছলে আমি তাঁর রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-সংহিতার তর্জমা শুনে আসতাম। আর এভাবেই জেনে যাচ্ছিলাম—ব্রহ্মার ডান আঙুল থেকে প্রজাপতি দক্ষের জন্ম, দক্ষের কন্যা অদিতি, অদিতির পুত্র সূর্য, সূর্যের পুত্র মনু, মনুপত্নী কন্যা প্রার্থনায় যজ্ঞ করলে সেই যজ্ঞকুণ্ড থেকেই কন্যা ইলার জন্ম, ইলা লিঙ্গ পরিবর্তন করে সুদ্যুম্ন নামক পুরুষ হয়েছিলেন, সুদ্যুম্ন ফের ভগবানের কোপে পড়ে স্ত্রী হলেন, চন্দ্রপুত্র বুধের ঔরসে তাঁর গর্ভে জন্মেছিলেন পুরুরবা, পুরুরবার জন্মের পর সুদ্যুম্ন ফের লিঙ্গ পরিবর্তন করে ফের পুরুষ হয়েছিলেন। মনুর হাঁচি থেকে জন্মেছিলেন, ইক্ষ্বাকু, মৃতদেহ থেকে জন্মেছিলেন জনক, বৃহদশ্ব ধুন্ধু নামের অসুরকে বধ করে হয়েছিলেন 'ধুন্ধুমার'। যুবনাশ্ব পুরুষ হয়েও যজ্ঞের মন্ত্রপূত বারি বেভুলে পান করে গর্ভবতী হলে তাঁর ডানবগলের কুঁচকি ভেদ করে জন্ম নিয়েছিলেন মান্ধাতা, দুধ তো নয় ইন্দ্রের আঙুল চুষে চুষে একদিনেই মান্ধাতা বেড়ে উঠেছিলেন, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজাধিরাজ রাজ-চক্রবর্তী হয়েছিলেন তিনি। রামের পুত্র যে কুশ আর লব—তা আমাদের সকলেরই জানা। তা বলে কুশের পুত্র যে অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের ছেলে নল, নল পুত্র নজঃ, নজের ছেলে পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের ছেরে অহীনগু, অহীনগুর পুত্র রূপ, রূপের পুত্র যে রুরু—তা আমরা জানি না। আমাদের গ্রামের ওই সমস্ত রামায়ণ- মহাভরত - পুরাণ- সংহিতা- গীতা- ভাগবত শাস্ত্রবিশারদদের কিন্তু সবনামই একধারসে মুখস্থ! আমার বাবার নাম গিরীশ, তাঁর বাবার নাম কৈলাস, কৈলাসের বাবার নাম গেঁড়া—ওই পর্যন্তই জানা ছিল আমার, গেঁড়ার বাবার নাম, তাঁর বাবার নাম, তাঁর বাবার নাম, তাঁর বাবার নাম জানা না থাকলেও আমি একে একে রামের পিতার নাম দশরথ, দশরথের পিতার নাম অজ। অজের পিতার নাম রঘু, তাঁর পিতার নাম দিলীপ—সব একে একে জেনে যাচ্ছিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১.

জেগে-ওঠা বৈশাখী পালের বা চরের পলি-পড়া মাটিতে দশযোজন চওড়া শতযোজন উঁচু নীলপাহাড় সদৃশ জলকেলিতে পারঙ্গম 'ধর্ম' নামের কোনও বরাহকে গড়াগড়ি খেতে দেখা না গেলেও সুবর্ণরেখার উত্তর তীরবর্তী কুচলাদাঁড়ি-রগড়া-নেপুরা-আমলাদাঁড়ি-কাঠুয়াপালের সাঁওতালপল্লি ধাঙড়পল্লির গাদাগুচ্ছের লিলিপুট সাইজের শুয়োর যে ঘোঁত ঘোঁত করে ক'দিন মাটি খুঁড়ে যেতে লাগল, কাদা মাখামাখি করল সে তো দেখেছিল অনেকেই। শুয়োররা যা করল করল, তারপর এল গরুর পাল, হাটুয়া আর ভূমিজদের কাড়া-মোষের দঙ্গল। ততদিনে চিরোল চিরোল ঘাস গজিয়ে গেছে একলপ্তে একশো পঁচিশ বিঘার বৈশাখী চরে বা পালে। সেখানে ঘাড় গুঁজে গরুমোষ চরে বেড়াল, ছাতামাথায় তাদের তদারকি করল গরুবাগাল কাড়াবাগালরা। তারা গান গাইতে লাগল। 'হাটুয়াগান' বাংলাগান হিন্দিগান, "মধুমালতী ডাকে আয় ফুলফাগুনের এ বেলায়" কিংবা "মন দোলে রে মেরা তন দোলে রে দিল কা গয়া কারার, কোন বাজায়ে বাঁশরিয়া" বা "মেরা মন কী গঙ্গা তেরা মন কী যমুনা ক্যায়া বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কী নেহি।" তারা নাচল, 'মহড়া নাচ' 'ফরিখেলের নাচ' এমন কী যাত্রায় দেখা 'টুইস্ট' নাচও। তারা গুলতি দিয়ে নদী কিনারায় বসা পাখি মারল—সরাল, শামখোল, খড়হাঁস, বালিহাঁস, জলপিপি, ডাহুক। মাটি শক্ত হয়ে গেলে তারা গর্ত খুঁড়ে 'কাতি' খেলল, হাডু-ডু, দাঁড়িয়াবাঁধা, একম-দুকম টিলিঙঠয়া...।



কাড়াবাগাল গরুবাগালদের পরেপরেই এল নদীধারের কেঁওট-কৈবর্তরা। তাঁরা নাভিতে জালবোনার কাঠি ঠেকিয়ে জালবোনার ছুঁচ দিয়ে জালের ফোঁড় তুলতে তুলতে এলেন। তবে জাল দিয়ে মাছ ধরতে নয়, নদীবক্ষে জেগে-ওঠা চরের অধিকার কায়েম করা যায় কি না দেখেশুনে সেসব বিচার-বিবেচনা করতে। নদীতে মহাপ্লাবনে ঝড়-ঝড়িয়ায় জেগে-ওঠা চরের ভোগদখল থাকার কথা তো মাছমারা কেঁওট-কৈবর্তদেরই, ওই যারা কী ঝড় কী জল কী গ্রীষ্ম কী শীত কী বর্ষায় নদীপাটায় দাঁড়ি থেকেয় মাছ ধরেন, মাছ মারেন, হ্যাজাক-লাইট জ্বেলে জলের ভিতর মাছেদের চোখের উপর আলো ফেলে তলোয়ারের এককোপে আলোর তাড়সে স্থির হয়ে ভেসে থাকা মাছকে দু'-টুকরো করে মারতে, পরমুহূর্তেই নদীজলের উপরিতলে ভেসে-ওঠা মাছের কর্তিত অংশকে তক্ষুনি সংগ্রহ করে খলুইয়ে ভরতে, সে তো হংসী নাউড়ীয়াকে বিপিন বধুককে আমিই দেখে আসছি সেই কোন ছেলেবেলা থেকে! মাছমারারাদের পালা শেষ হলে খোঁজখবর নিয়ে চর দেখতে এলেন তাঁরা সেই যাঁদের বাপঠাকুরদার বাপঠাকুরদার জমি একদা খেয়ে নিয়েছিল নদী। কারও অর্ধেকটা, কারও বা সবটাই। এতদিন বাদে নদী যখন ফের ফিরিয়ে দিয়েছে শ' শ' ডেসমল জমি তখন পুরনো নকশা ঘেঁটে দাগ-খতিয়ান মেলাতে উঠে পড়ে লাগবেন না রগড়া-কাঠুয়াপাল-আমরদাঁড়ির চাষিরা? কেউ কেউ তো নিজেদের খেত মাথায় দাঁড়িয়ে, সে চর থেকে এক-দেড় মাইল দূরে তো কী হয়েছে, নিরীক্ষণ করে দেখে তাঁদের জমি থেকে মোজা দক্ষিণ বরাবর গেলে বা মনে মনে লাইন টানলে জেগে-ওঠা চরের কোন্ অংশটায় তিনি পৌঁছবেন, সেই অংশটার ভোগদখল তো তাঁদেরই, একবার নদী যখন ক্ষতি করে দিয়েছে, সে বাপঠার্কুদার বাপঠাকুরদার বা তার বাপঠাকুরদার যার আমলেই হোক না কেন এবার সুযোগ যখন এসেছে ক্ষতিপূরণ করে দিতে হবে নদীকেই। দুমদুম করে তিনি হাঁটা দিলেন চরের দিকে, নদীর দিকে। আড়ে-দীর্ঘে তিনি যেন তাঁদের জমিটাকেই টেনে নিয়ে চলেছেন, আকন্দ-বৈঁচি-বেনাঝড়-ডুমুর-পাকুড়ের দিয়ে জমির কম্বল বিছাতে বিছাতে চলেছেন, আজ হোক কাল হোক চরের অধিকার কায়েম তিনি করবেনই করবেন। তাঁর নাম বলরাম দলুই, রামেশ্বর পালুই, সতীশচন্দ্র খাঁড়া, হরিহর কাপড়ী, কালীপদ বাগ, শ্রীহরি পাতর, বিধুভূষণ পৈড়্যা, নগেন্দ্রনাথ সৎপথী, শ্রীনিবাস সাহু, যা খুশি হতে পারে। তাঁর গ্রামের নাম দিগার বাঁধ কপতিডাঙা নেপুরা রগড়া বহড়াদাঁড়ি হরিপুরা দক্ষিণদাঁড়িয়া মৌভাণ্ডার যে কোনওটাই হতে পারে। সন্তোষ দাসের পালা অনুসারে, "সন ১১১২ সালে। ৭দিন ঝড় আরম্ভ হলে।। বৈশাখ্য মাসরে ১৩ তারিখে। সুবর্ণরেখা নদী বাড়ি আসিলে।। চারিদিন নদী দণ্ডাই থিলা। পাঁচদিনে দেখ নদী ছিঁড়িলা।। পাঁচদিনে নদী ছিঁড়িতে আর। নদী মধ্যে পাল বাঁধিলা তার।। পাল দেখি সবে লোক বসিলা...বিধি যাহা লেখি আছে কপালে। বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে।।" সুবিস্তৃত চর দেখে চরে যাঁদের যাঁদের অধিকার আছে মনে করেছিলেন সেই তাঁরা এসে প্রথম প্রথম খেড়ি-তরমুজের চাষ করলেন মাদা করে আখের 'পুয়া' পুঁতলেন, চালাঘর বেঁধে কেউ, কেউ শুরু করেছিলেন বসবাসও। রীতিমতো মোরসীপাট্টা। ছাগল পুষেছিলেন, মুরগি পুষেছিলেন। চরে দাঁড়িয়ে একটু হলেও মনোরম সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেছিলেন, অবশ্য তাঁদের ইহজীবনে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার অবসর আর কোথায় কতটুকু!

কেননা ক'দিন বাদেই 'গড়ের' নিযুক্ত 'আমিন' এসে নয়াচরের উৎপন্ন জমির উপর শিকলি টেনে টেনে জরিপ শুরু করলেন, ওই যে 'কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমান...' সাকুল্যে ১২৫ বিঘা উর্বর পলিজমি, লাঙল চালিয়ে মাটি খোঁড়ারও দরকার নেই, কাঠি গুঁজে বীজ ফেলে দিলেই যেন অঙ্কুরোদগম, চারা, চারা থেকে গাছ। প্রথমদিন শিকলি টানাটানিতে ছিঁড়ে গিয়েছিল লাউলতি বর্ষাতি কুমড়োর গাছ। দ্বিতীয়দিন এসে জমিদারের রাজপেয়াদারা লাঠিয়ালরা নয়াচরের ঘরবাড়িও ভেঙে দিলেন। নদীবক্ষে জেগে-ওঠা চর কেঁওট-কৈবর্তদেরও নয়, চৌদ্দোপুরুষ আগে যাঁদের জমি খেয়ে নিয়েছিল নদী তাঁদেরও নয়, নদীর 'নো ম্যান'স ল্যান্ড' এখন স্থানীয় জমিদারদের 'বৈশাখী পাল' এখন 'গড়ের'। তল্লাট-কে-তল্লাট তাঁদেরই তো জমিজমা, তাদেরই তো ঠিকে প্রজা। তবু যাহোক গরুবাগাল কাড়াবাগালরা লাঠিধারী রাজপেয়াদাদের পক্ষীরাজ ঘোড়া ঢাল-তলোয়ার না দেখেও কেবলমাত্র লাঠি দেখেই গান খুঁজে পেয়েছিল, "সাতভাই চম্পা গো রাজার কুমার কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া তার ঢাল তলোয়ার"। তাই তাই, তাই গেয়ে গেল তারা, তাদের কেউ চর থেকে হটিয়েও দিল না। চরে থেকে ঘুঘুপাখি, 'মাছরাঁকা', মরাল, শামখোল, জলপিপি। থেকে গেল ভাম-খটাশ-খেঁকশিয়াল-উদ্‌বিড়াল। আর থাকল, থাকল মাঝে সকাল-সন্ধ্যা এল-গেল বহড়াদাঁড়ি-আমলাদাঁড়ি-নেপুরা-কুচলাদাঁড়ির সেই লিলিপুট শুয়োররা। 'গজা মুখ' দিয়ে তারা 'তেড়ে' খেতে লাগল 'মজাসে' সেইসব পরিত্যক্ত চিনেবাদামের পেটের ভিতর সদ্য জমে-ওঠা দুধের সর। তবে বৈশাখীপালের পশ্চিম দিগন্তে অবস্থিত 'ছাতিনা গাছের' ডালে বসবাসকারী 'অলম্ভুশ' দাঁড়কাকটা খাদ্যান্বেষণে লোকালয়ে সেই কোন ভোর ভোর বেরিয়ে দিবাবসনে আমলাদাঁড়ি-বহড়াদাঁড়ি-কুচলাদাঁড়ি-রগা-কাঠুয়সপালের 'মেঘপাতালে পেটভাসিয়ে উড়ে এসে ঝপ করে ডান গুটিয়ে ফের সেই ছাতিনাগাছের ডালেই বসে যেত, ডালে বসে হেঁড়ে গলায় যখন ডাক দিত তখন বৈশাখী পালের আপামর ভূ-ব্যোম-কীটপতঙ্গ-বৃক্ষাদিও যেন ডাকশুনে বুঝে যে, যুদ্ধ আসছে।'

২.

'জলোদ্ভব দেশ' বা 'পুলিন দেশ' কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথার ভিতর, যার মানে চরভূমি, কোথায় শুনেছি বা পড়েছি ঠিক মনে পড়ছিল না, এর বহু-বহুদিন বাদে 'মহাভারত' খুলে ফের কথাটা আবিষ্কার করি। 'ষট্ ত্রিংশদধিক ত্রিশততম' অধ্যায়ের 'আদি বিষ্ণুমূর্তিদর্শনার্থী নারদের শ্বেতদ্বীপ গমন' শীর্ষক পাঠ্যাংশে 'শ্বেতদীপের' উল্লেখ রয়েছে। তার আগে 'জম্বুদ্বীপের' কথা শুনেছি, জম্বুদ্বীপেই তো অবস্থিত ভারতবর্ষ! যা সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ—তাইতো ভারতবর্ষ। নারায়ণ বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ 'শ্বেতদ্বীপে' গমন করেছিলেন। সুমেরু পর্বতের শিখরদেশে উঠে বায়ুকোণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই নাকি, ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরদিকে শ্বেতদ্বীপ। জেগে-ওঠা চরভূমিই। আমি আসমুদ্র ভারতবর্ষের 'ম্যাপ-পয়েন্টিং' করেও শ্বেতদ্বীপের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা নির্ণয় করে উঠতে পারিনি। অথচ নারদ শ্বেতদ্বীপের ভিতরেই অনেক গ্রাম, নগর, খেত, খামার, গোচারণ মাঠ, বন-বাদাড় দেখেছিলেন। সেখানে অনেক সোনা-রূপা-তামার পাহাড় ও খনি দেখেছিলেন। দ্বীপের ভিতর সুন্দর সুন্দর পাখি সুশোভিত জলাশয় দেখেছিলেন।

"নলবেণুশরস্তম্বকুশকীচক গহ্বরম। এক এবাতিয়াতোহহম দ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ।। ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলূকশি বাজিরম্।।"

নাকি তিনি নলবন-বাঁশবন-শরবন-শটিবন কুশঘাস ও লতাগুল্মে ভর্তি এক জঙ্গল দেখেছিলেন। যা ছিল সাপখোপ পেঁচা ও শিয়ালের অন্ধকারময় আবাসভূমি। নারদ সংহিতাতেও কি এই জেগে ওঠা শ্বেতদ্বীপের চরের কথাই বলা হয়েছে? এই চর নিয়েই কী প্রজাদের মধ্যে বেধেছিল, মাঝেমধ্যেই বেধে যেত, ধুন্দুমার লড়াই? রণ-মহারণ? অনেকগুলো বছরবাদে অনুরূপ একটা চর জেগে ওঠার কাহিনি পড়ে নেব 'চরকাশেম'-এ। "চরের বুকে পলিমাটি। সে তো মাটি নয়, ক্ষীর। যেমন নরম তেমনি মোলায়েম। সেই মোলায়েম মাটির কোল ঘেঁষে ঘেঁষে প্রথম জাগবে হেউলী গাছের ছোপা, তারপর জন্মাবে হোগলাপাতা—সবুজের তুলি বুলানো জল ও চরের মাঝ সীমানা। হাওয়া আসবে দক্ষিণা—ঢলক খেলবে উত্তরে। হাওয়া আসবে পশ্চিমা—ঢলক খেলবে পুবে। তারপর ধীরে ধীরে জন্মাবে দু'-এক ছোপা কই ও কত ও কাশ। দুর্বার দল মাঝ চরে ঝলমল করবে আলো ও শিশিরে।...পাখি আসবে নানারকম। কাঠঠোকরাও আসবে—মাথায় লম্বা ঝুঁটি! তবে একটু দেরিতে। বড় গাছ কই? হিজল, ছৈলা, বইন্যা? পাখির ঠোঁটে ঠোঁটে দানা আসবে, ছড়িয়ে পড়বে এখানে ওখানে। জন্মাবে চারাগাছ। ক্রমে প্রবীণ অশ্বত্থ, পাকুড়, আম, বাবলা আরও কত কী!" আসলে দেখছি সব চরেরই উৎপত্তি, অবস্থিতি ও প্রকৃতি একই রকম।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অনাবাদী বৈশাখী পালের পলিমাটিতেও আবাদী আখ-চিনাবাদাম-খেড়ি তরমুজ না জন্মাক, চরের মাটি তাবলে অফলা থাকল না। এমনিতেই জন্মাল চাগড়া চাগড়া কাঁটা বিরি-বেগুনের ঝাড়। কাঁটাকুল, আকন্দ, ফণিমনসার গাছ, কুশগাছ। কোথাও কোথাও 'বেনাবুদা' বা কুশঝাড়ের ছায়াঘন পিঙ্গলমাটিতে ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণেরই 'ছাগল হাঁচি' ঘাস। বৈশাখে খররোদ্রে দ্বিপ্রহরে যখন উরাল ঘূর্নি ঝড় 'রোল' খেতে খেতে পশ্চিম থেকে পুবে যায়, বা পুব থেকে পশ্চিমে, তখন বড়নদীতে স্নানে আসা অমুক বিশুইয়ের বউ, তমুক বধুকের বউ উদ্‌লাগায়ে আচমকা কেঁপে কেঁপে ওঠেন—এই রে, ওই বুঝি ধুলো উড়িয়ে সৈন্য দিল এল! ওই বুঝি যুদ্ধ বেধে গেল 'বৈশাখী পালে'! কারণ তাঁদের ঘরে গিয়েও তো অলম্ভুস দাঁড়কাকটা কুচলা কী চল্লাগাছের ডালে বসে আগেই বলে এসেছিল, 'যুদ্ধ আসছে'। যুদ্ধ আসছে, যুদ্ধ আসছে। জল থেকে লাফিয়ে ডাঙায় উঠে পড়েছিলেন বিশুই-বধুকদের বধূরা, তারপর যখন দেখলেন সৈন্যদের নয় তখন "আ লো মুখপুড়ি, সৈন্য কঁঠে দেখলু, বাও-বাতাসে তো ধুলা উড়েটে" বলতে বলতে ফের ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। সৈন্যদল নয়, আচমকা ঘূর্ণিঝড়ে বৈশাখী পালে ধুলা উড়ছে! বস্তুত সত্যিকারের সৈন্য তো তাঁরা দেখেননি, সৈন্য যেটুকু দেখেছেন ওই যাত্রায়, যাত্রা দলের 'সাজ' পরা, তাও তো হাতে নকল পিস্তল নচেৎ রাঙতামোড়া কাঠের তলোয়ার বা তীরধনুক। বৈশাখী পালে যুদ্ধ হলে এবার তাঁরা খাকি পোশাকপরা না হোক গামছাপরা লুঙ্গি পরা সত্যিকারের সৈন্য দেখবেন। তাই তাঁদের বড় আগ্রহ, শুধু নদীতে 'নাইতে' আসা বিশুই ঘরের বধুক ঘরের বউয়েরাই নন, বৈশাখীপালে যৎসামান্য 'হুরি' হলেও 'নদীপারের' 'নদী-সেপারের' লোকজনও 'কাতাধারে' এসে দাঁড়ান, বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ মউজ করে বসে থাকেন স্নান করার অছিলায় নদীজলে ডুবে থাকেন অনেকক্ষণ।

এই গ্রীষ্মে তেমন কিছু হল না, ঝপ্ ঝপ্ করে বর্ষা নেমে গেল আষাঢ়ের, ফেনাভর্তি ঘোলাজলে নদীও ভরে এল, নদীধারে ডাঙায় কালো কালো অজস্র কাঠ-পিঁপড়ের দঙ্গল। বৈশাখী পালে ফের চালা বেঁধে মাছ ধরতে এসে গেল রগড়া-কাঠুয়াপাল-বহড়াদাঁড়ি-আমলাদাঁড়ির কেঁওট-কৈবর্তরা। ফের বর্ষাতি কুমড়ার লইলতি চালাঘর ছাপিয়ে শুঁড় তুলল আকাশে, আখের 'পুআ' পোঁতা হল, মাদা করে করে লাগানো হল পালবেগুনের চারা, উচ্ছে-ঢেঁড়শ-পটল-মুলোর রাক্ষুসে বীজ। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল ধরার আগেই সেই ছাতনাগাছের বাসিন্দা অলম্ভুস দাঁড়কাকটা ঘাড় লম্বা করে ফের ঘনঘন ডাকতে লাগল। দাঁড়কাকের ডাক, তারমানেই কিছু অশুভ সংবাদ, বৈশাখী পালে অস্থায়ী ছাউনি গেড়ে যাঁরা চাষাবাদ শুরু করেছিলেন ওই হাটুয়া জনমানুষরা, তারা মনে মনে জেনেই গেলেন, বুঝেই গেলেন, 'যুদ্ধ আসছে'। এরপরে দু'দিনও কাটল না জমিদারের লাঠিয়ালরা এসে সাঁওতাল বস্তি ধাঙড়বস্তির লিলিপুট শুয়োরগুলোর মতো সারা বৈশাখী পাল ঘোঁত ঘোঁত করে চষে ফেলল, লাউলতি ছিড়ল, কাঁকড়-কুমড়ো-কাঁখুয়ারের লতি শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলল। দখলদারিরা সুড় সুড় করে বৈশাখী পালের মায়া ছেড়ে ঘরে এসে যে যার 'মাগের' পাশে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বহুদিন বাদে তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' পড়েও জেনে যাচ্ছিলাম, মাটি কারও 'বাপের' নয়, মাটি 'দাপের'। "রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী-ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালীনদী; এই কালীনদীর ও-পারে চর জাগিয়াছে।....জমিদারগণের প্রত্যেকের দাবি—চর তাঁহার সীমানা উঠিয়াছে, সুতরাং সেটা তাঁহারই খাস-দখলে প্রাপ্য। মহাজন দুইজনের প্রত্যেকের দাবি, —তাঁহার নিকট 'আবদ্ধীয়', জমির সংলগ্ন হইয়া চর উঠিয়াছে, সুতরাং চর তাঁহার নিকট 'আবদ্ধীয়' সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত এবং নাকি তাহাই হইতে হইবে। প্রজা কয়েকজনের দাবি—কালীর গ্রামে এপারে তাহদের জমি গিয়াছে, সুতরাং ওপারে যে ক্ষতিপূরণ বালী পিয়াছে সে প্রাপ্য তাহাদের।" আর কারও সঙ্গে নয়, প্রথম প্রথম চর নিয়ে দাঙ্গা বেধেছিল দাপুটে জমিদার-মহাজন-প্রজাদের সঙ্গে দখলদার গরিবগুর্বো সাঁওতালদের। নবীন লোহারের লাঠির একঘায়েই একজন মুসলমানের মাথা হয়ে গিয়েছিল দু'-টুকরো, ঠিক এখনকার "বৈশাখী পালে মইলা একাডাঙে" যেমন। দ্বিতীয় দাঙ্গাটা বেধেছিল নয়াচরে উদীয়মান কলের মালিকের সঙ্গে। কলের মালিকের দোর্দন্ডপ্রতাপে আর নিজেদের মধ্যে 'কাই হড়' (পাপীলোক)-এর বিশ্বাসঘাতকতায় গরু-ছাগল-কাড়া-মোষ বোঁচকাবুঁচকি ঘটি-বাটি-থালা-গিলাস-গিনা-তাটিয়া, সঙ্গে আরও কিছু লটবহর নিয়ে চর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সাঁওতালরা। কেউই প্রতিবাদ করলেন না, "সাঁওতালদের পুরুষের দল আপনাদের পাড়ার প্রান্তভাগে বসিয়া উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শক্তিমত্ত দখলদারী জনতার দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।" তাবলে সরাসরি প্রতিবাদ না করলেও বৈশাখী পালের দখলদার কেঁওট-কৈবর্ত রাজু-সদ্‌গোপ চাষিদের কারও কারও চোখ যে পাক-তরমুজের মতো লাল হয়ে গিয়েছিল সে খবর জমিদারের লাঠিয়ালরা ঠিক সময়ে পৌঁছে দিয়েছিল 'বাবুঘর'।

আমার আবাল্য-কৈশোরের দেখা সেই রোহিণীগড়ের 'বাবুঘর'। 'গড়বাড়ি'! ফর্সা ফর্সা, আর্য সদৃশ মানুষদের আবাসস্থল। সেই গৌরকান্তি দেহ, গলায় দোদুল্যমান ধবধবে পৈতে, হাতের খাতা টেনে তাতে শূন্যের পর শূন্য লেখা, মুখে অনর্গল বিড় বিড় করে বলা, "সবু উড়ি গেলা, আউ কিছু নাই", দার্শনিক চিন্তাভাবনায় মনকে উদ্বেল করা সেই কতসব বাণী! গড়বাড়ির সঙ্গে 'ভ্রমরগড়',

'ভ্রমর' 'বরোজিয়া পল্লী', প্রেমোন্মাদ রাজকুমারকে জড়িয়ে কতসব প্রচলিত কিংবদন্তি! গড়বাড়ির পশ্চাতে ভৈরবেশ্বর জীউর মন্দির, তার সংস্কার সাধনের প্রাক্কালে পিল পিল করে উঠে আসা কালো কালো ডেঁয়ো পিঁপড়া আর আর ঐতিহাসিক তাৎপর্য! আবিষ্কার করে ফেলি—এহেন 'বাবুঘরের'ও একদা একদল পোষা লাঠিয়াল ছিল, আর ছিল ইয়া লম্বা মোচওয়ালা কালী বাগদি, তার ডানহাতে ছ'-ছটা আঙুল ছিল। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ ষড়ংগীকে খবর দিয়ে গেল ওই কালী বাগদি যে, —বৈশাখী পালের জবর দখলকারীদের কারও কারও চোখ ছিল তরমুজের মতো গাঢ় লাল। তাই শুনে শঙ্কিত জমিদার পরের দিনই ঘোষণা করে দিলেন, —বৈশাখী পাল তিনি বেচে দেবেন, খদ্দের চাই! "সন্তোষ দাস ভনই, ১২৫ বিঘা পালটি আর। বার বিক্রি করিবে দেখ খরিদ্দার।। খরিদ্দার বাবু খুঁজিতে আর। নতুন খরিদ্দার মেলিলা তার।। কাঠুয়াপালরে ঘরটি আর। বার কালীদাস নামটি তাহার।।"

৩.

মহাভারতের যুদ্ধের বীর সেনানী ভীম অর্জুন নকুল সহদেব ঘটোৎকচ অভিমন্যু কর্ণ দ্রোণ দুর্যোধন দুঃশাসনের মতোই নাম সব বৈশাখী পালের যোদ্ধাদেরও। বীর কালী দাস, বীর কালীদহ বীর বিকু মণ্ডল বীর কুবের পাত্র বীর সন্তোষ পত্র বীর বেণীপাত্র বীর গয়াদত্ত গুলাব খাঁ বীর বিপিন দলুই বীর কালী জানা কানাই জানা বীর জলধর দাস। কোশল-উৎকল-মগধ-চেদি-বিরাট-তাম্রলিপ্ত-কামরূপ রাজ্যের মতোই গ্রাম না সব। রগড়া-কাঠুয়াপাল-বহড়াদাড়ি-নেগুড়িয়া-তেঁতুলিয়া-তারাডিহা-মাটিহানা-পেটবিন্ধি-রথকাহালিয়া-সাঁকারাদাঁড়ি-আমলাদাঁড়ি-কুচলাদাঁড়ি। সম্পন্ন চাষি গৃহস্থেরই গ্রামসব। বৈশাখী পালের জমি কিনতে তাঁরা তো একপায়ে খাড়া! বৈশাখী পালের ছাতনাগাছে তো গাছে, সারাদিনমান খাদ্যান্বেষণে ভ্রাম্যমাণ থেকে ওইসব গ্রামগুলোয় ঘুরে ঘুরে সেই অলম্ভুস দাঁড়কাকটা প্রতিদিনই জানান দিয়ে আসছে, 'কার জমি কে বেচে! যুদ্ধ আসছে।'

বীর কালী দাসকে সঙ্গে নিয়ে অতঃপর রোহিণী সিআরডি হাইস্কুলের হেডমাস্টার, ট্রিপল এমএ সেই শ্রীউমেশচন্দ্র দে, রোহিণীগড়ের ভিতরে প্রবেশ করলেন। "উমেশ মাস্টারকে সঙ্গে যে করি। গড় ভিতরকু যাইলে কালী।।" অমন ঢ্যাঙা, লম্বায় সাড়ে ছ'ফুট লোকটা মাথা হেঁট করে কীনা আরেকজন বেঁটেখাটো লোককে সঙ্গে নিয়ে রোহিণীগড়ের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন! ইংরেজিতে 'বোমবাস্টিক', ট্রিপল এমএ লোকটার জমিজমা সংক্রান্ত-বিষয়ে অত কীসের আগ্রহ, মাথা ঘামানো বা? শুনেই কেমন যেন গা রি রি করে উঠল আমার। যে সে লোক তো নন, তিনি যে শ্রী উমেশচন্দ্র দে, দি গ্রেট! আর তাছাড়া গড়বাড়ির পাষাণ কঠিন অন্দরমহলটা, সে যতই সারা চবুতরা-দালান কবুতর পারায়র কুহরে ও দর্শনার্থীদের কলরবে গমগম করুক না, তবু বড়ই হিমশীতল, তাপউত্তাপহীন আর নিস্তব্ধ। মন্ত্রণালয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলল, অনেক দর কষাকষি হল, তারমধ্যে কত যে টিকটিকি খিলানের আঁজে- ভাঁজে থেকে কতবার যে ডেকে উঠল "টিক্ টিক্ করে, কত গেল ফর ফর করে! তবু যেন নিস্তব্ধতা কাটল না। দর উঠল চৌদ্দো হাজার!" "একশো পঁচিশ বিঘা পালকু আর। চৌদ্দো হাজার টাকা দর তাহার।। ইহা মনে শুনিকি আনন্দ হেলা। বায়নানামা করি ঘর ঘুরিলা।।" শুধু বায়নানামার টাকা কেন, কড়ায় গণ্ডায় সব টাকাই নাকি মিটিয়ে দিয়েছিলেন বীর কালী দহের দল। কালী দাস তো নন, লোকে বলে 'কালীদহ'। কালীদহ, কালীদহ। শুধু কী কালীদহ, সঙ্গে উমেশচন্দ্র ও আরও একজন। "চার আনা দুই আনা ছয় আনা হেলা। উমেশমাস্টার তাকু কিনিলা।। দুইজনের পালে 'শেয়ার' থিলা। তিনু লোকে দেখ যাই মিশিলা।।" গল্পটা কেমন সাদামাটা আকর্ষণহীন হয়ে যাচ্ছে না? ঘাটে স্নানে আসা দঁড়া পাট-বধুক-বিশুইদের বধূরা 'জলকেলি' খেলতে বসেতাঁদের দৃশ্যপটে হঠাৎ ধু ধু বৈশাখী পাল এসে পড়লে এ-ওকে জল ছিটিয়ে জানতে চাইত, "কাই লো তোর বৈশাখী পালে অখনও তো যুদ্ধ হেলানি?" কই, বৈশাখীপালে এখনও তো যুদ্ধ হল না? এখন এই যেমন আমি, সন্তোষ দাসের কাছে বৈশাখী পালের পাঁচালি শুনতে উদ্‌ব্যস্ত—অধীর হয়ে পড়েছি, প্রথমে এ কিনলেন জমি, তারপর কিনলেন ও, তারপরেও কিনলেন রাম-শ্যাম-যদু ও মধুরা, দাম দিয়েই তো কিনছিলেন ক্রেতারা, তবে আবার কখন, কী কারণে যুদ্ধ বাধল? আমি অপেক্ষায় আছি, অপেক্ষায়—কখন যুদ্ধ বাধবে, কখন শুনব কার কপালে কী লেখা ছিল, "বিধি যাহা লেখি আছে কপালে। বৈশাখী পালে বৈশাখী পালে।।" তল্লাটের একমাত্র ও নামজাদা পূজা 'গড়ের দুর্গাপূজা'। খোদ কুমোরটুলি থেকে কুমোর এসে একমাস ধরে সোৎসাহেও সগৌরবে প্রতিমা গড়তেন। সেই দুর্গাপূজা এসে যাওয়ায় বাবু চৌধুরি লক্ষ্মীনারায়ণ ষড়ংগী 'জমি রেজিস্ট্রি' মুলতবি রাখলেন। "দুর্গাপূজার ভিড় আসিলা মোর। পূজা শেষে বন্দোবস্ত করি দিবা যে আর।" পূজা শেষেও জমি রেজিস্ট্রিকৃত করা গেল না, ঝামেলার উপর ঝামেলা, তারপর তো বছর ঘুরতে না ঘুরতেই লোকান্তরিত হয়ে গেলেন বাবু চৌধুরি লক্ষ্মীনারায়ণও। নটেগাছটিও মুড়লো, গল্পও ফুরলো। বৈশাখী পালের একশত পঁচিশ বিঘা উর্বর জমি নির্বিবাদে ভোগদখল করে চাষের ফসল ঘরে তুলে যেতে লাগলেন বায়নাদার কালীদহের দল। ধনধান্যে পুষ্পে ভরে উঠল বৈশাখী পালের ধরিত্রী। বৈশাখী পালের পশ্চিমে অবস্থিত ছাতিনাগাছে বসবাকারী অলম্ভুস দাঁড়কাকটা কিন্তু হেঁড়ে গলায় তখনও সমানে ডাকতে থাকল, তারমানে, কোনও ভুল নেই 'যুদ্ধ আসছে'। যুদ্ধ আসছে, যুদ্ধ আসছে।

পরে তো বইয়েই পড়েছি, এই ঘটনার ক'বছর আগে ইংরাজ ১৯৪৩ বাং ১৩৫০ সালে বাত্যা ও বন্যাপীড়িত বাংলায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' ঘটেছিল। নিদারুণ ক্ষতি হয়েছিল মেদিনীপুর জেলারও। নাকি যেখানে-সেখানে পড়ে থাকত মৃতদেহ ও নরকঙ্কাল। তাই খেয়ে দেদার পেট ভরাত শকুন, কুকুর ও শেয়াল। "একস্থানে একটি নারীর মৃতদেহ দেখিলাম। সে একখণ্ড মলিন ছিন্নবস্ত্র ও একটি মাটির ভাণ্ড আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। পরলোক যাত্রার প্রাক্কালেও সে তাহার যথাসর্বস্ব ফেলিয়া যাইতে চাহে নাই।" বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত লিখেছিলেন। নাকি অনাহারে ও মহামারীতে লোক মরেছিল, পঞ্চাশ হাজার! পরের বছরও অনাহারে ও ফসল না হওয়ায় খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষে লোক মরেছিল হাজার হাজার! তখনকার শাসকবর্গ তো এই 'দুর্ভিক্ষে মৃত্যু' কে—স্বীকারই করতে চান না, এখন এতযুগ পরেও যেমন 'অনাহারে মৃত্যু'! তাঁদের ধারণা যে, "দেশের লোকের ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা এতবেশি এবং ঘাস পাতা প্রভৃতির দ্বারা ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিবার দক্ষতা এমনই স্বাভাবিক যে, এদেশের শব্দকোষে 'দুর্ভিক্ষ' কথাটির প্রয়োগ একরূপ অবান্তর।" তখনও নিশ্চয় বাত্যা ও বন্যা নিপীড়িত বৈশাখী পালে প্রচুর শাকপাতা, , এই যেমন সরন্তি-শুশনি-নাহাঙা-ঘোড়াকানা-মুথা-ঘলঘসি-শ্যামা ইত্যাদি জন্মেছিল। আর তাই খেয়ে পেট ভরিয়েছিলেন নদীধারের রগড়ী-কাঠুয়াপাল-বহড়াদাঁড়ি-কুচলাদাঁড়ির কেঁওট-কৈবর্তরা, বেরা-বিশুই-খাটুয়া-পরামানিক-কুঁড়-কাঁড়া ঘরের লোকজনেরা। আর কেউ কেউ তো 'স্রেফ' পেট চেপে নিজের ক্ষুধাটাকেই গিলে খেয়ে ফেলেছিলেন,

সেই অবস্থায় নদীজলে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'জলকেলি' খেলতে খেলতে কেউ কেউ বৈশাখী পালের দিকে দৃষ্টিপাত করে নিশ্চয়ই ওইরকমই বলেছিলেন, "আ লো তুই যে কইথিলু বৈশাখী পালে যুদ্ধ হিবে, কাই অখনও ত হেলানি?"

যুদ্ধ হয়েছিল, ঘোরতর যুদ্ধ! তার আগে বৈশাখী পালের পালাগান শুনতে শুনতে আবিষ্কার করে ফেলি সেই ধবধবে পৈতে পরিহিত গৌরকান্তি-দেহধারী সুশিক্ষিত দার্শনিক মানুষটার কেবলই 'শূন্য শূন্য শূন্য' লিখন আর "সবু উড়ি গেলা, আউ কিছু নাই" অস্ফুট বচনের নিহিতার্থ অর্থ ও তাৎপর্য। ঠিক যেমন করে কোনও পবিত্র নদীর দুই তীরবর্তী তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে কোনও পরিব্রাজক হঠাৎ সেই তীরে স্বীয় গুরুজীর মন্ত্রপ্রভাবে কোনও কিছুর অলৌকিক প্রকাশ দেখে ফেলে, অন্তত চাক্ষুষ না হোক মনে মনে, "আহা কী দেখিলাম জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না" বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, ঠিক তেমন করে আমিও উল্লসিত হয়ে পড়ি সেই জিনিসটার গূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য আবিষ্কার করে ফেলে! আসলে অপুত্রক বাবু চৌধুরি লক্ষ্মীনারায়ণ ষড়ংগী লোকান্তরিত হলেন রোহিণীগড় অনাথ হয়ে গেল। দূরবর্তী গ্রাম বনডাহি থেকে একমাত্র বিবাহিতা কন্যা শৈলবালা এসে রোহিণীগড়ের হাল ধরলেন। শৈলবালা ছিলেন ডাকসাইটে সুন্দরী ও দাপুটে রমণী। তিনি যেমন এলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর স্বামীকেও। "শৈলবালার স্বামী থিলা যে আর। নগের মহাপাত্র নাম তাহার।" প্রচুর ভূসম্পত্তি, গো-মহিষাদি, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে জমিদারির আয় বার্ষিক প্রায় ছয়লক্ষ টাকা! এত বিশাল সম্পত্তি একা-হাতে আলাবেন কী করে অবলা, শৈলবালা? বনডাহিতে নিজের জমিদারী ছেড়ে তাই সদাশয় নগেন মহাপাত্রকেও সসম্মানে আসতে হয়েছিল রোহিণীগড়ে। আর তাছাড়া স্বর্গত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ ষড়ংগীর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার তো এক অর্থে তাঁরও।

বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ ষড়ংগীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, তখনও পারলৌকিক ঘাটক্রিয়াদি শেষ হয়নি, আত্মীয় কুটুম্বে ঘরবাড়ি গমগম করছে, নাকি এখনই দরকার হয়ে পড়েছিল কয়েকলক্ষ টাকা ও প্রায় পাঁচ কেজি পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার অন্যত্র সরিয়ে ফেলার। নাকি নগের মহাপাত্রের হাত মারফত সে সমস্তই বনডাহি শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শৈলবালা। "বনডাহি গ্রামে প্রবেশ হেলা। তার ভাইগন সবে বসিয়া থিলা।।" সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ আর স্বর্ণালঙ্কার সদাশয় নগেন মহাপাত্র চুপি চুপি সিন্দুকে তুলে রাখলেন। কাক পক্ষীটিও টের পায়নি, মনে মনে ভেবে ভারি আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। সত্বর রোহিণী ফিরে এসে যোগও দিলেন মৃত শ্বশুরমহাশয়ের পারলৌকিক কাজে। পাশে দাঁড়িয়ে থেকে কাঙালি ভোজনও করালেন। হাতিবাঁধির ডোমপাড়ার সন্তোষ বাগ তখন অব্দি প্রায় দশগণ্ডা রসগোল্লা গলাধঃকরণ করেছিলেন, পরিবেশনকারীদের বলে তাঁকে আরও দু-গণ্ডা বেশি খাওয়ালেন। তিনি মানুন আর নাই মানুন, রামা বাগ বামা কৈবর্ত কালী বাগদিকে হাতে করে মিষ্টি খাওয়ালেও তাঁর মন কিন্তু পড়েছিল সারাক্ষণ বনডাহির ওই সিন্দুকে, ওই যেখানে তাঁর প্রাণভোমরা রাশি রাশি টাকা আর ভরি ভরি সোনা গচ্ছিত রাখা আছে। এর আগে জমিদারির কথা আর কোথায় বা পড়েছি, ওই এক ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে 'পি কে দে সরকার' ছাড়া! ওই যেখানে আছে, "নগেন্দ্রনাথ মহাধনবান ব্যক্তি, জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম, তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার বর্ণনা করিব। নগেন্দ্রবাবু যুবাপুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র! নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই একদিন নির্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল চল চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে, নাচিতেছে-রৌদ্রে হাসিতেছে-আবর্তে ডাকিতেছে।" বাপ্ রে! কী বোমবাস্টিক! কী কঠিন ট্রান্সলেশন। অথবা আর একটা, "হরিদ্রা গ্রামে একঘর বড় জমিদার ছিলেন। জমিদারবাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমিদারির মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা।" তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহলে হরিদ্রাগ্রামের জমিদারের থেকেও রোহিণীগড়ের জমিদারের আয় বেশি? কোথায় দুই লক্ষ, আর কোথায় ছয় লক্ষ টাকা!

সে যা হোক, রোহিণীগড়ের কাজকর্ম মিটে গেলে বাবু নগেন মহাপাত্র বনডাহি নিজের গৃহে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন খুব। খুবই স্বাভাবিক, অতগুলো টাকা অত ভরি সোনা! স্ত্রী শৈলবালাও অরাজি হলেন না, স্বামীকে দ্রুত তুলে দিলেন গো-শকটে, গরুর গাড়ি ছাড়া তো তখন আর গতি ছিল না। অবশ্য রোহিণীগড়ের একটা নিজস্ব কালো রংয়ের মোটরকার ছিল, সে তো আমরাও দেখেছি! গোরুর গাড়িতে স্বামীকে তুলে দিয়ে গাড়োয়ান 'মানকে'-কে রাজকুমারী শৈলবালা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, "মানকে, গাড়ি চলা ইবু চোখকান খুলা রাখি, ঘুমে দমে ঢুলি পড়বুনি।" মানকে ঘাড় নেড়ে হেসেছিল, হ্যাঁ, সে চোখকান খোলা রেখেই গাড়ি চালাবে, ঘুমে একটুর জন্য হলেও ঢলে পড়বে না। তবে মনে মনে সে বলল, "ঘুম কী মানে অদা-বুদা?" তারমানে ঘুম এলে সে কিছুই মানবে না, ঝোপঝাড়-নদীনালা যেখানে হোক ঘুমিয়ে পড়বে। গো-শকট রওনা দিল, ডুলুং নদী-তীরবর্তী-বনডাহি গ্রামে পৌঁছেও গেল। মানকে একটুর জন্য হলেও দু'চোখের পাতা এক করেনি। গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথের ন্যায় বনডাহির জমিদার নগেন্দ্র মহাপাত্রও যদি বজরায় যেতেন তাহলে তিনিও নিশ্চয় দেখতে পেতেন—ডুলুং "নদীর জল অবিরল চলচল চলিতেছে—ছুটিতেছে-বাতাসে নাচিতেছে-রৌদ্রে হাসিতেছে-আবর্তে ডাকিতেছে।" ডাইনে-বাঁয়ে বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে গো-শকট বনডাহির জমিদারবাড়ির সিংহদুয়ারে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাফ দিয়ে বাবু নগেন মহাপাত্র গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। এরকম জায়গায় এসে পালাকার সন্তোষ দাস বর্ণনা দিচ্ছেন, "বাবুর কাজকর্ম সেষ হইলা। নগেন মহাপাত্র ঘর ঘুরিলা।। সদরে তালাকু ভাহ্না দেখিলা। ঘর ভিতরকু প্রবেশ হেলা।। সিন্দুকে যাই নগেন হাত মারিলা। টাকা সোনা সবু ফাঁকা দেখিলা।। সিন্দুকে নগেন মাথা কুড়িলা। আউ কিছু নাই সবু উড়ি গেলা।।" এতক্ষণে মার্কোপোলো কী ভাস্কো-দা-গামার মতো আমিও আবিষ্কার করে ফেলি,—ঘড়বাড়ির প্রশস্ত বারান্দার এমাথা সেমাথা দোদুল্যমান ধবধবে উপবীত পরিহিত ও শোভিত গৌরকান্তি দেহধারী ভ্রাম্যমাণ মানুষটার কলমে কেন শুধু 'শূন্য শূন্য শূন্য', কেন মুখে কেবলই ওই কথা, "সবু উড়ি গেলা আউ কিছু নাই"। আবিষ্কারের আনন্দে যেমন উল্লসিত হয়ে পড়ি, তেমনি ডুকরে কেঁদে উঠি। কেন যে কেঁদে উঠলাম—তখনই বুঝতে পারিনি, হয়তো পরে বুঝব। তবে তৎক্ষণাৎ ভেবে বড় দুঃখ হল, টাকা আর সোনা হারানোর শোক-সন্তাপে অত বড় ভাল মানুষটাও হয়ে গেলেন কীনা বদ্ধ উন্মাদ? তাই ঘুনাঘুন করে খঞ্জনীর তালে বোল উঠল, "বিধি যাহা লেখি আছে কপালে বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে।।"

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



পলাশ ফুটেছে

জয়ন্ত দে

মেয়েটা আমাকে পলাশের কথা বলেছিল।
আমি শুনছিলাম লাশ।
মেয়েটা বলছিল, আমি এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি রাস্তার দু'ধারে পলাশ আর পলাশ। লালে লাল হয়ে আছে চারদিক।

আমি 'লাশ' শুনে চমকে উঠেছিলাম।

আমি পরশুর আগের রাতে কলকাতা ছেড়েছি। পরশু ছিলাম লাভা। গতকাল পদমচেনি ঘুরে উঠে এসেছি জুলুক। ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ। এখনও বাইরের মানুষের সঙ্গে ভিতর মানুষের ভাব হয়নি যেন। চারদিকে কেমন একটা ছাড়ো ছাড়ো ভাব। যে কোনও কথার মুখে এখনও সব থতমত খেয়ে তাকায়, ট্যুরিস্টমোহিনী লেগে থাকা হাসি শিখে উঠতে পারেনি এখনও।

'টেম্পারেচার কত?'

হিমশীতল পাহাড়তলির অনিবার্য প্রশ্ন এটি। উত্তরে হোম স্টের মালকিন ছোট্ট একটা তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র ধরিয়ে দিল আমার হাতে। ঘরের ভিতর ১৩.৭ ডিগ্রি।

মালকিন উদাস ভঙ্গিতে বলল, 'বাহার যাইয়ে'।

এখন সবে সন্ধের রং লেগেছে পাহাড়ে। সাড়ে পাঁচটা। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পরতে পরতে কালো আর ধূসরের ছোঁয়া।

কোথাও কোথাও পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে নরম আলো।

বাইরে আসতেই হাতের মুঠোয় তাপমাত্রা কমছে হু হু করে, শেষে এসে দাঁড়াল আটে।

একজন কানের কাছে এসে ফিসফিস করল, 'রুমে গিজার নেই।'

আমি তাকে তাপমাত্রার যন্ত্রটি দেখালাম। সে যন্ত্রে চোখ রেখে দ্রুত হাতে মাথার টুপি টানল কানে। তারপর চাপা গলায় হোম স্টের মালকিনকে বলল, 'রাত মে বরফ গিরে গা!'

হালকা বরফ পড়েছে সারারাত। ধুলোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো।

কালো কালো পাহাড়গুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে।

'মোবাইলের টাওয়ার নেই।'

'টাওয়ার আছে। সব টাওয়ার আছে। জ্যামার দিয়ে আটকানো।'

'এটা হবেই। মিলিটারি কোর এরিয়ার মধ্যে আমরা। পাশেই চিনের বর্ডার।'

আজ সকাল বেরিয়ে পড়লাম জুলুক থেকে। কালো কালো পাহাড়ের গায়ে বরফ দিয়ে জেব্রা আঁকা জিগজ্যাগ রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। চেকপোস্ট। রাস্তার দু'ধারে মিলিটারি ব্যারাক। ট্রেঞ্চের ভিতর জাগ্রত প্রহরী। বোফর্স কামান। কালো পিচের রাস্তার ধারে ধারে বরফ জমছে।

এমন সময় হঠাৎই বেজে উঠল আমার মোবাইল। কাল রাতের পর এই এখন মোবাইল বাজল।

'আরে টাওয়ার পেলে?' এক সহযাত্রী বেশ ঈর্ষার চোখে তাকাল। 'আমিও দেখি, যদি বাড়িতে একটা খবর দেওয়া যায়।'

ওপারে একটা মেয়ের গলা। মেয়েটা বেশ উত্তেজিত, 'আমি এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি রাস্তার দু'ধারে পলাশ আর পলাশ। লালে লাল হয়ে আছে চারদিক।'

আমি শুনলাম, আমি এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, রাস্তার ধারে লাশ আর লাশ। লালে লাল হয়ে আছে চারদিক।

'লাশ' শুনে চমকে উঠেছিলাম আমি।

আমাদের গাড়ি ঘেঁষে বিশাল এক মিলিটারি ট্রাক। ট্রাকের টায়ারে টায়ারে চেন বাঁধা। সামনে মিলিটারি চেক পোস্ট। ওদের তীক্ষ্ণ নজর আমাদের দিকে। রাস্তার দু'ধারে জমে ওঠা বরফ ঠেলে একটু এগোলে সার সার মিলিটারি ব্যারাক। পায়ে পা মিলিয়ে ওদের গা হিম করা হেঁটে চলা। পাহাড়ের উপর থেকে দড়ি ফেলে অনুশীলন। অজস্র টিনের ঘর। দোচালা। ভিতরে মানুষ নেই। ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র। চুপ করে অপেক্ষা করছে। কামান, ট্রাঙ্ক, স্টেনগান। চারদিক জুড়ে শুধু অপেক্ষা।

আমি মেয়েটিকে বললাম, 'আপনি কোথায়?'

'আপনাদের ভাষায় বললে আমি এখন জঙ্গলমহলে। পুরুলিয়া।' মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি এখন কোথায়?'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'আমি ইস্ট সিকিমে। সামনে চিনের বর্ডার।'

মেয়েটি বলল, 'সামনে চিন!' মেয়েটা একটু থামল, কিন্তু ভাবল না কিছু, বলল, 'আচ্ছা আপনিও কি কোনওদিন বলেছেন—চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান?'

'না।'

'যাক বাবা বাঁচালেন, কথাটা শুনলে আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়।'

মেয়েটা একটু থামল। ফোনে ওপারে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, বলল, 'আপনি বেশ হাঁফাচ্ছেন। এত হাঁফাচ্ছেন কেন? কলকাতায় ফিরে ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন। চারদিকে যা হচ্ছে, খুব ভয় করে।'

'হাই অল্টিচ্যুড। অক্সিজেন কমের জন্য হয়তো হাঁফাচ্ছি। খুব ঠান্ডা।'

'ইস, আমার এখানে এর মধ্যেই যা গরম ভাবতে পারবেন না। আমি গাড়ির মধ্যে, তাই মাথা ঝনঝন করছে।'

'আমি মিলিটারি কোর জোনে। চারদিকে অস্ত্রে ঝনঝনানি....।'

মেয়েটির ভয়ার্ত গলা, 'চিনই তো আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা, তাই না?'

'তেমনই তো শুনেছিলাম।'

'কিছু কি হয়েছে?'

'না।'

'কিছু কি হতে পারে?'

'তেমন তো শুনিনি।'

'অফিসের কাজে গেছেন?'

'না, বেড়াতে।'

'বেড়াতে, ওই অস্ত্রের বনে বনে....?'

আমি হাসি, 'এটা শুধুই অস্ত্রের বন হবে কেন—এটা যে সিল্ক রুট!'

'আপনি তা হলে এখন ইতিহাসে?'

আমি বললাম, 'ওখানে কি কোনও সমস্যা? কলকাতা ছেড়েছি চারদিন, কোনও খবরের কাগজ, বা টিভি নিউজ শুনিনি।'

মেয়েটি হাসল, 'আমিও তাই করি। বেড়াতে যখন যাই তখন নো নিউজ পেপার, নো নিউজ চ্যানেল, এর সঙ্গে অবশ্য আমি মোবাইলটাও নো করে দিই। তবে ভাগ্যিস আপনি মোবাইলটা আমার মতো সুইচ অফ করেননি। করলে জঙ্গলমহলের কারেন্ট খবরটা আপনাকে দিতেই পারতাম না।'

'ওখানে কি কোনও সমস্যা?'

'তীব্র সমস্যা। চারদিক দেকে আমার কেমন পাগল পাগল লাগছে, তাই তো দু'টো কথা বলার জন্যে আপনাকে ফোন করে বসলাম।'

'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'ঠিক কী করে থাকি বলুন তো? আমরা পুড়ছি, ঝলসে যাচ্ছি। আপনি বরফের দেশে এক গা ঠান্ডা মেখে, আচ্ছা, ওখানে গুরাস ফুটেছে? রডডেনড্রন!'

'হ্যাঁ, গাছের পাতা নেই আর, লালের দখলে, লাল আর লাল তুমুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

'বাপ রে! সামনে চিন। আপনি লালের কথা বলছেন!'

আমি শ্বেতশুভ্র বরফের সমারোহের মধ্যে মাথা তুলে জেগে থাকা রেডডেনড্রন দেখছিলাম। 'ভয় কী? লাল রঙে ভয় কী? আমাদের প্রিয় রং লাল।'

'চেরবান্দা রাজু।' মেয়েটি হাসল। 'আমি জানি। আচ্ছা, আপনি কি মাওবাদী?'

'না।'

'ইশ হল না, আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছিল—জঙ্গলমহলে চাকরি নিয়ে যাচ্ছিস, পারলে একটা মাওবাদীকে বিয়ে করে ফেলিস।'

'তাতে কী সুবিধা হত?'

'আজ ফাগুন লেগেছে বনে বনে..., বুঝলেন আজ আমার সঙ্গে একজন মাওবাদী থাকলে জঙ্গলমহলের শাল মহুলের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া যেত!'

'হারিয়ে যাওয়ার জন্যে সুবিধা লাগে বুঝি?'

'লাগেই তো, এ হারানো তো নিজের কাছে ফিরে আসার জন্যে। এ হারিয়ে যাওয়া মানে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। লালে লাল হয়ে আছে চারদিক বলেই তো আপনাকে ফোন করে ফেললাম। লেখক হলেও আপনি তো একজন সাংবাদিক। আপনারা তো জঙ্গলমহল ঘুরে লাশের খবর দেন। আচ্ছা, কখনও আপনারা লাশের খবর লিখতে বসে পলাশের দিকে মুখ তুলে তাকান?

রক্তের হোলির মধ্যে পলাশের লালে মোহিত হন? কী জানি? আমি আপনার পাঠক—আপনাকে আজ পলাশের খবর দিলাম। পলাশ ফুটেছে, পলাশ।'

অলঙ্করণ : দেবনাথ নন্দী

শুরুতে শেষ



অদ্রীশ বর্ধন

কলাবতী বললে—"আমি ভারমুক্ত হতে চাই।"
কঙ্কর বললেন—"কোন ভার থেকে?"
"পেটের মধ্যে যেটা ঢুকেছে, সেটা বেরিয়ে যাক।"
"বের করে দেওয়াটা মহাপাপ। আমি ওর মধ্যে নেই।"

"তাহলে?"

চোখ নাচিয়ে কঙ্কর বললে—"সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। বিদ্যেটা আমি শিখে এসেছি তিব্বতের এক গুপ্ত মঠ থেকে। একটা পুঁথি থেকে। চিনেরা এখনও সেই মঠ আর সেই পুঁথির সন্ধান পায়নি। পেলে নষ্ট করে দিত।"

"তাহলে তাই করো।"

"আমার পুরস্কার?"

"আমি।"

কঙ্কর দরজার পর্দার পাশ দিয়ে উঁকি দিল করিডরের ওপাশের দরজার পর্দার দিকে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ঘরের ঠিক মাঝখানে, কড়িকাঠের ঘুরন্ত পাখার ঠিক নিচে, খাটে চিত হয়ে শুয়ে আছে কুমড়োপটাশ এক মূর্তি।

পুরুষ মূর্তি। এককালে ছিল ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়ান্ট বয়। বিধাতা তাকে স্পেশ্যাল মগজ দিয়ে ধরণীতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পৌরুষ দেননি সেই অনুপাতে। মগজের চমক দেখিয়ে ঘরণি বানিয়েছিল চকমকি মেয়ে কলাবতীকে।

তারপর?

পাঁচজনকে সে কথা বলা যায় না। এক হাতুড়ে ডাক্তার বুসটার ঠুসে দিয়েছিল তার অণ্ডকোষে। কড়া কেমিক্যালের মোক্ষম ইঞ্জেকশন।

গর্ভবতী হয়েছিল কলাবতী। কিন্তু...

রি-অ্যাকশন শুরু হয়ে গিয়েছিল ব্রিলিয়ান্ট বয়ের অণু-

পরমাণুতে। আস্তে আস্তে নির্জীব হয়ে গিয়েছিল। এখন সে অসাড়। শয্যাশায়ী। তার সব কাজ করে দিতে হয় কলাবতীকে। ভাল লাগে?

ব্রিলিয়ান্ট বয় আর একটা ব্রিলিয়ান্ট কর্তব্য করেছিল। ভালবাসলে পুরুষ নারীকে সব দেয়। সে তাই দিয়েছিল। এই বাড়ি, ব্যাঙ্কের টাকাপয়সা, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পুরুষ চায় নারীর সৌন্দর্য, নারী চায় পুরুষের ঐশ্বর্য।

সৌন্দর্যের দৌলতে কলাবতী এখন বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতি। তাকে কিছু করে খেতে হয় না। শুধু দেখভাল করতে হয় অক্ষম শয্যাশায়ী স্বামীদেবতাকে। ভাল লাগে?

এই মহৎ মূর্খ পুরুষটির নাম অনাবিল।

আর কঙ্কর হল গিয়ে কলাবতীর অগুন্তি প্রণয়পাত্রদের একজন।

এইবার শুরু হোক আসল গল্প।

গলে গেল অনাবিল। চেয়ে চেয়ে দেখল, তার উত্তরসূরির আবির্ভাবে বেশ তো গজগামিনী হয়েছে কলাবতী। বডি মেজারমেন্ট এখন বেঢপ। হোক। নারীর কাজ সৃষ্টি করা।

একটু রসিকতা এসে গেল জিভের ডগায়। এককালে সে ছিল ঠোঁটকাটা। তাই বললে—"ও কলা, মাছের মতো পোয়াতি হতে যেও না। বডিখানার বারোটা বাজবে।"

"মরণ!" বললে কলাবতী, চোখ ঘুরিয়ে।

কাহিনি সংক্ষেপ করা যাক।

তিব্বতি গুপ্তবিদ্যা খাটিয়ে গেল কঙ্কর—দূর থেকে। দিনে দিনে শুকিয়ে, গুটিয়ে ছোট হয়ে গেল অনাবিল। ছিল কুমড়োপটাশ, দিনে দিনে ছোট হতে হতে এসে দাঁড়াল অস্থিচর্মসার বাচ্চা ছেলের সাইজে। অসীম নিষ্ঠায় কলাবতী তাকে নতুন নতুন পোশাকে সাজিয়ে গেল—প্রতিটা নতুন



কঙ্কর বিদায় নিয়েছে। কলাবতী অনাবিলের ঘরে ঢুকছে। তার আগেই একটা ম্যাগাজিন চোখের সামনে তুলে নিয়েছিল অনাবিল—বধূর পদশব্দ পেয়ে।

কলাবতী খাটের পাশে এসে বললে—"এখন কেমন লাগছে?"

এখন তার চোখে নকল মায়া, গলায় নকল দরদ।

ক্ষিপ্ত স্বরে, যদিও সেই স্বর এখন চিঁচিঁ করছে, অনাবিল বললে—আমাকে কি বাচ্চা ছেলে পেয়েছো?"

উষ্মার কারণ, কলাবতী সাতসকালে তার পোশাক পালটে দিয়ে গেছে। আগের গেঞ্জি আর পায়জামা ঢলঢলে হয়ে গেছিল, তাই এক সাইজ ছোট গেঞ্জি পায়জামা পরিয়ে গেছে। অনাবিল ফোঁস ফোঁস করছে সেই কারণেই।

"বন্ধু, তুমি যে রোগা হয়ে গেছো," বললে কলাবতী নরম গলায়।

অনাবিলকে বন্ধু সম্বোধন করে কলাবতী। সার্থক তার নামকরণ। সত্যিই সে অনেক ছলা আর কলায় বিদূষী।

পোশাক সাইজে আগের পোশাকের চাইতে ছোট। অনাবিল ক্রমে ক্রমে হল বালক, তারপর শিশু। তখন তার জন্য ছোট খাটের ব্যবস্থা করল সেবাময়ী কলাবতী। তারপর শোওয়াল দোলনায়।

ইতিমধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল কলাবতীর উদর অঞ্চলেও। গর্ভ গুটিয়ে গেলে যা হয়; আবার ফিরে আসছিল বিয়ের আগের সেই ছিমছাম চেহারা।

তারপর একদিন সূর্য যখন হাস্যমুখে উঁকি দিলেন পুব গগনে, কলাবতী ঘরে ঢুকে দেখলে, দোলনায় আর নেই অনাবিল—রয়েছে পড়ে তার ডায়াপার।

কলাবতী, ললিত ভঙ্গিমায় ছিপছিপে শরীরটা দুলিয়ে নিয়ে গিয়ে টেলিফোন তুলে বললে কঙ্করকে—"ওগো আমার নতুন বর, আপদ বিদেয় হয়েছে—পেট থেকে, দোলনা থেকে। এবার হোক মালাবদল।"

শুভ কর্ম সেরে নিয়ে অশুভ এই ব্যবসায় নেমেছে কঙ্কর। ঠিকানা? সরি!



এক দম্পতির কথা

রমানাথ রায়

শহরের দক্ষিণে এক সুখী দম্পতি বাস করত। তাদের কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। তার জন্যে তাদের একটু দুঃখ ছিল। স্বামীর বয়স সাঁইতিরিশ। লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

বুকের ছাতি সাঁইতিরিশ ইঞ্চি। ওজন ছিল ছিয়াত্তর কিলো ছ'শো গ্রাম। রং ফর্সা। মাসিক আয় চল্লিশ হাজার। স্ত্রীর বয়স তেত্রিশ। লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। বুক ছত্রিশ ইঞ্চি। কোমর ছাব্বিশ ইঞ্চি। নিতম্ব আটত্রিশ ইঞ্চি। ওজন পঁয়ষট্টি কিলো পাঁচশো গ্রাম। রং ফর্সা। মাসিক আয় তিরিশ হাজার।

তারা প্রতিদিন সকালে উঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে শুনতে চা আর বিস্কুট খেত। তারপর স্নান করে এক সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসত। এক সঙ্গে অফিসে বেরত। বেরবার আগে প্রতিদিন একজন আর একজনকে আদর করত। তারা প্রতিদিন দুপুরে ফোনে কথা বলত। বিকেলে বাড়ি ফিরে তারা এক-একদিন গাড়িতে ঘুরে বেড়াত। কোনওদিন তারা সন্ধেবেলা সিনেমা দেখত। কোনওদিন থিয়েটার। কোনও চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ঢুকে চাউমিন খেত। কোনওদিন আবার ময়দানে বা গঙ্গার ধারে হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াত। যেদিন তারা ঘরে থাকত সেদিন তারা সোফায় পাশাপাশি বসে টেলিভিশনে সিনেমা দেখত। মাঝে মাঝে তারা ছুটি নিয়ে কখনও দিঘায় যেত, কখনও দার্জিলিং,

কখনও পুরী, কখনও হাজারিবাগ।

এইভাবে তাদের দিন কাটছিল।

কিন্তু একদিন স্ত্রী হঠাৎ গর্ভবতী হল। প্রথমে স্বামীর বিশ্বাস হল না। স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার স্ত্রী প্রস্রাব পরীক্ষা করাতে দিল। ফল পাওয়া গেল পজিটিভ। স্বামী আনন্দে স্ত্রীর মুখে সোহাগ এঁকে দিল। স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল।

এক মাস পেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় মাসে স্ত্রীর শরীর সকালের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। বমি বমি ভাব দেখা দিল। শরীর জুড়ে নামল ঘুমঘুম ভাব, ক্লান্তি।

একদিন স্বামী বলল :

—একটা কথা বলব?

—কী?

—আমার একটু ভয় হয়েছিল।

—কীসের ভয়?

—ভেবেছিলাম আমাদের হয়তো...

—ছেলেমেয়ে হবে না!

—হ্যাঁ। আমার এক একসময় খুব খারাপ লাগত।

—আমারও।

তৃতীয় মাসে শরীরে অবসাদ তীব্র হয়ে দেখা দিল। সেই সঙ্গে খাদ্য হিসাবে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসের প্রতি স্ত্রীর আকর্ষণ দেখা দিল। প্রায়ই চিবিয়ে খেতে লাগল মাটির খুঁড়ি। কখনও চাটতে লাগল আচার।

একদিন স্বামী জিজ্ঞেস করল :

—কী হবে বলো তো?

—মেয়ে।

—আমি বলছি ছেলে হবে।

—কী করে জানলে?

—আমার মন বলছে।

—আমার তো অন্যরকম মনে হচ্ছে।

—তা হোক। আমার কথাই ঠিক হবে।

—আমার কথা ঠিক হবে।

—দেখে নিও।

—তুমিও দেখে নিও।

চতুর্থ মাসে পেট স্ফীত হয়ে উঠল। কৌশলে স্ত্রী শাড়ি পরে তা ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ঘনঘন তার খিদে পেতে লাগল। ঘনঘন খেতে লাগল। শরীরের ওজন বাড়তে লাগল।

একদিন স্বামী জিজ্ঞেস করল :

—সৈকত নামটা কেমন?

—ভাল না।

—কেন?

—বড় গম্ভীর।

—তমাল?

—বড় কোমল।

—তা হলে সৈকত থাক।

—যদি মেয়ে হয়?

—আমার ধারণা ছেলে হবে।

পঞ্চম মাসে স্ত্রী বাচ্চার নড়াচড়া আস্তে আস্তে অনুভব করতে লাগল।

একদিন স্বামী বলল :

—চলো বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—কোথায় যাবে?

—কোথায় যাব?

—সিনেমা?

—না।

—থিয়েটার?

—না।

—তা হলে?

—কোথাও যাব না।

—পরে আর যাওয়া হবে না। কিন্তু।

—না হোক।

ষষ্ঠ মাসে বাচ্চার নড়াচড়া আরও বেড়ে গেল। স্ত্রী এবার স্পষ্ট অনুভব করতে পারল।

একদিন স্বামী জিজ্ঞেস করল :

—এখন বুঝতে পারো?

—স্পষ্ট বুঝতে পারি।

—কী করে বোঝো?

—যখন ও সরে যায়।

—আর কী করে?

—যখন ও মাথা দিয়ে গুঁতো দেয়।

—তোমার অসুবিধা হয়?

—না।

—এই সময় কী মনে হয়?

—ভীষণ মজা লাগে।

সপ্তম-অষ্টম মাসে পেট আরও স্ফীত হয়ে উঠল। সেই পেটে ফুটে উঠল সাদা সাদা লম্বা দাগ। ওজনও বাড়ল। মুখের রং বদলে গেল। সারামুখে মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিল। এই সময় স্ত্রীর পক্ষে আর অফিস করা সম্ভব হল না। অফিস থেকে ছুটি নিল। সংসারের কাজকর্মে দেখা দিল অস্বাভাবিক উৎসাহ। দিনে দশবার করে ঘর গোছাতে লাগল। গাড়ি করে ঘুরে ঘুরে বাজার করতে লাগল। বাচ্চার জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি জিনিস কিনতে লাগল। তবে পাশে সবসময় থাকল তার স্বামী।

একদিন স্বামী বলল :

—এত ঘুরো না।

—কেন?

—আমার ভয় করে।

—কীসের ভয়?

—কী করতে কী হয় বলা যায় না।

—কোনও ভয় নেই। এখন চলাফেরা করা ভাল।

—কে বলেছে?

—ডাক্তার।

—বলুক।

—তুমি ডাক্তারের থেকে বেশি বোঝ?

—তা বুঝি না।

—তা হলে চুপ করে থাকো।

নবম মাসে বাচ্চার নড়াচড়া কমে গেল। পেটের স্ফীতি বন্ধ হল। ঘন ঘন প্রস্রাব হতে লাগল। শরীর অসম্ভব ভারী হয়ে উঠল। চলাফেরা করতে কষ্ট হতে লাগল।

একদিন স্বামী বলল :

—আমি কাল স্বপ্ন দেখেছি।

—কীসের?



—স্বপ্নে দেখেছি ছেলে হয়েছে।
—আমিও স্বপ্ন দেখেছি।
—কী দেখলে?
—দেখলাম মেয়ে হয়েছে।
—বাজে কথা।
—তা হলে তোমারটাও বাজে কথা।
তারপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনে হাসতে শুরু করল।

একদিন রাত্রে স্ত্রীর অসম্ভব ব্যথা শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে গেল নার্সিংহোমে। সেখানে স্ত্রীকে ভর্তি করল।

প্রথম পর্যায়ে ব্যথা থাকল দশ ঘণ্টা। এই সময় একজন নার্সের সাহায্যে বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত স্ত্রীকে হেঁটে বেড়াতে হল। মাঝে মাঝে তার কষ্ট হচ্ছিল, হাঁপাচ্ছিল। তবু তার ঠোঁটের কোণে সব সময় একটা হাসি লেগে রইল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যথার মেয়াদ কমতে কমতে দু'ঘণ্টায় এসে দাঁড়াল। শেষপর্যায়ে পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর অন্তর ব্যথা দেখা দিতে লাগল। তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হল প্রসব ঘরে। পাশে দাঁড়িয়ে রইল ডাক্তার, নার্স। স্বামী বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। ছটফট করতে লাগল। পায়চারি করতে লাগল।

কিন্তু ডাক্তার নর্মাল ডেলিভারির দিকে গেল না। সিজার করে গর্ভ থেকে শিশুকে বের করে আনল। পুত্রসন্তান। গর্ভ থেকে বাইরে এসেই শিশুটি চিৎকার করে কেঁদে উঠল। স্ত্রীকে তার সন্তান দেখানো হল। সারা মুখে ক্লান্তির মধ্যেও হাসি ফুটে উঠল। তারপর শিশুটিকে সাবান দিয়ে গরম জলে স্নান করানো হল। কিন্তু পৃথিবীর বাতাস শিশুটি ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারল না। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে ভীষণ গোলমাল দেখা দিল। ডাক্তার শিশুটির দু'পা ধরে মাথা নিচের দিকে করে পাছায় আস্তে আস্তে চাপড় মারতে লাগল। শিশুটির কান্না আরও বেড়ে গেল। তবে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হল না। অক্সিজেন দেওয়া হল। তাতেও কিছু হল না। শেষপর্যন্ত শিশুটি মারা গেল। প্রসব-ঘর থেকে স্ত্রীকে তার কেবিনে আনা হল। স্বামী বাইরে অপেক্ষা করছিল। নার্সের মুখেই সব খবর পেল। স্ত্রী বিছানায় শুয়ে রইল। তার গায়ে চাদর বিছানো। তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। ডাক্তার-নার্স বেরিয়ে গেলে স্বামী ঘরে ঢুকল। একটা টুল টেনে বিছানার পাশে বসল। তবে কেউ কোনও কথা বলল না। কথা বলতে পারল না। একটু পরে দু'জনে একসঙ্গে চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। স্বামী আগের মতো অফিস যায়। স্ত্রী আগের মতো অফিস যায়। কিন্তু তারা আর সকালে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে শুনতে একসঙ্গে চা আর বিস্কুট খায় না। তারা আর স্নান করে একসঙ্গে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে না। একজন আর একজনকে আদর করে অফিস বেরোয় না। তারা সিনেমা দেখার কথা, থিয়েটার দেখার কথা ভুলে গেল। চাইনিজ রেস্তোরাঁয় গিয়ে চাউমিন খেতে ভুলে গেল। তারা ময়দানে বা গঙ্গার ধারে হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে ভুলে গেল। এমনকী, তারা সোফায় একসঙ্গে বসে গল্প করতেও ভুলে গেল। মাঝে মাঝে স্বামীকে স্ত্রী বলতে লাগল, তোমার দোষেই এটা হল। স্বামীও স্ত্রীকে বলতে লাগল, তুমি, তোমার জন্যই এটা হল।

এখন রাত্রিবেলা। বিছানায় তারা দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে শোয়। এক মৃত সন্তান দু'জনের মাঝখানে তুলে দিল পাঁচিল। তারা এক অসুখী জীবনযাপন করতে লাগল।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

রেহাই

তৃষ্ণা বসাক



নর্থের এনকোয়ারির সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক ঘণ্টার উপর। এসপ্ল্যানেড ইস্টে কোনও সমাবেশ ছিল মনে হয়। জমায়েত ফেরত দূরদূরান্তের মানুষগুলোর মুখ গোটা বাংলার মানচিত্রের মতো স্টেশন চত্বরে ছড়িয়ে আছে।

এরই মধ্যে একটু গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে সুমিতা কল্পনা করার চেষ্টা করছিল এই মানব মানবচিত্রের এক একটা বিন্দুর পিছনে কত বিচিত্র কাহিনি, উপকথা লুকিয়ে থাকতে পারে। সাউথে দাঁড়ালে অবশ্য এই একান্ত সময়টুকু, ভিড়ের মধ্যে একলা হওয়ার আনন্দটুকু তার থাকত না। এতক্ষণে হাজারও চেনা লোকের প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার হতে হত তাকে।

বাঁ হাতের কব্জির দিকে অভ্যেসমতো তাকাতে গিয়ে খেয়াল হল ঘড়িটা প্রায় একমাস হল সুজনকে সারাতে দিয়েছে। সত্যি বলতে কী সুজনই নিয়ে গেছে জোর করে। অনেকদিনের ঘড়ি। নাইনে ওঠার পর বাবা দিয়েছিল। মডেলটা ওর প্রিয় অভিনেত্রীর নামে—নূতন। ইটচাপা ঘাসের মতো হয়ে আছে কব্জিটা। সেদিকে তাকাতে তাকাতে নিজেকে কীরকম খালি খালি লাগছিল। ঘড়িটা পরে থাকলে মনে

হয়, বাবা সারাক্ষণ রয়েছে ওর সঙ্গে সঙ্গে। যদিও ওকে এখন ওর জীবনযাপনের আলো-আঁধারিতে দেখলে বাবা কতটা আঘাত পেত, কতটা বিচ্ছিন্ন করে নিত আদরিনী মেয়ের জীবন থেকে নিজের জীবন, সযত্ন সতর্কতায় বাঁচিয়ে চলত নিজেদের শ্রেণি মর্যাদা, সেইসব অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তপ্রসূত আলোড়ন যথেষ্ট অনুভব করতে পারে সুমিতা। স্কুলে পড়া ভূগোল বইয়ের ভূমিকম্পের ছবিটা ভেসে ওঠে মনে। একবিন্দু জায়গা থেকে কম্পন কতখানি ছড়িয়ে যেতে পারে। সেই ভূগোল বইটা হারিয়ে গেছে। সেই জীবনটাও মুছে গেছে এই জীবন থেকে। সোনারপুরে চাঁদমারির মাঠের পাশে ওর ঘরটায় ভূগোল কেন, কোনও বইয়ের জায়গা হবে না। একটা হিসাবের খাতা, বুক, গলা, পিঠ, পুটের মাপ লেখা। অনেকদিন ধরে সময়ের গোলমাল করলেও ঘড়িটা সারাতে দিতে পারেনি প্রাণে ধরে। সুজন জোর করে নিয়ে গেল। কব্জিটা আর একবার চোখের সামনে তুলে ধরে নিজেকে বড় নিঃস্ব, নিরাভরণ মনে হল সুমিতার।

পায়ের তলাটা জ্বালা জ্বালা করছে। আজকাল সকালে ঘুম ভাঙার পর চট করে মেঝেতে পা ফেলতে পারে না। যন্ত্রণায় আঙুলগুলো বেঁকে থাকে। সকাল থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত চর্কিপাকের মাঝখানে শরীরে অসুখ ঢুকল কখন! ঘাড়টা তো গিয়েছেই। আট-দশ ঘণ্টা টানা মেশিনের উপর ঝুঁকে সেলাই, আবার বাড়ি ফিরেও রান্নাবান্না সেরে শাড়ির ফলস বসায় সুমিতা। এক একটা শাড়িতে ছ' টাকা করে থাকে। না করে উপায় কী? চোখটাও একবার দেখিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। সুজন সেদিন বলছিল 'বাড়ির কাজ, কারখানায় দশটা-সাতটা ডিউটি, এর উপর আবার ব্যবসা ফাঁদছ, সামলাতে পারবে তো এত সব?'

সুমিতা অবাক হয়েছিল। তার জন্যে সুজনের এত দরদ দেখে নয়, সুমিতার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ওর পায়ের আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সুজন তাকে বারোমাসের তুই নয়, তুমি বলেছিল। সেই প্রথম! তুমির সেই গাঢ়তায় সুমিতার চোখে জল এসেছিল। আসলে শরীরের খাটনিটা তো বড় কথা নয়। আজীবন গ্যাসে অভ্যস্ত সুমিতাকে এখন অনেকদিনই কেরোসিন না পেলে কয়লা ভেঙে তোলা উনুনে রান্না করতে হয়। কিন্তু এই কয়লা ভাঙা হাতেও কি সব পাথর ভেঙে শেষ করা যায়? ভাঙতে ভাঙতেই সে দেখে সামনে কত যোজন যোজন বিস্তৃত পাথুরে জমি ধু ধু করছে। আজকাল তাই ভাঙতেও ইচ্ছে করে না। সব সরিয়ে রেখে দেয়, ফেলে রাখে। যতক্ষণ না অন্ধকারের গোলাটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ততক্ষণ চোখ বুজে থাকে সে।

নাঃ, সুজন আজ আর আসবে না। চটি ঘসতে ঘসতে সুমিতা হাঁটে লক্ষীকান্তপুর ধরার জন্যে। শরীরের প্রতিটা রোমকূপ জলের জন্যে হাঁ করে আছে।

"এই সুমিতা, এত দেরি তোর?" চিন্ময়ী। ওর কথায় হ্যাঁ হুঁ করতে করতে সাউথে আছে। ১১-র দিকে হাঁটতে যেতেই হাত ধরে টানে চিন্ময়ী। "আরে দেখছিস না ১৪-য় দিয়েছে, ১১টা তো কারশেড।" চিন্ময়ীই ওকে চালনা করে ১৪য় নিয়ে যায়। তারপর কীভাবে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে আসা তখনও চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠে একটা সিটে বসে, পাশের সিটে ব্যাগ রেখে চেঁচায়, "তাড়াতাড়ি আয়, এই ট্রেনে বেশিক্ষণ জায়গা রাখা যায়?" সুমিতা সিটে গা এলিয়ে দিয়ে বুঝতে পারে বসাটা ওর ভীষণ দরকার ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে চিন্ময়ীকে সে সহ্য করতে পারে না। "ওঃ, আজ পৌনে সাতটায় বেরোতে যাব, ব্যাটা মাইরি এমন খচরা, দিল তিনপাতার টাইপ গছিয়ে। আমিও তেমনি, আধপাতা অব্দি করে দেখি বস বাথরুমে গিয়েছে, অমনি কেটেছি। শালা মাসে দু'হাজার টাকা ঠেকাবে আর মুখের রক্ত তুলিয়ে খাটাবে।"

চিন্ময়ী বকতেও পারে। ফেরার পথে একটা বুড়ো ওর পিছনে লেগেছে, বস হিসাবে কারা ভাল—বাঙালি না মারোয়াড়ি, অফিসের একটা ছেলে ওকে সিনেমা নিয়ে যেতে চাইছে—ওঃ! ওভারহেডে কারেন্ট গেছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে চোখ বুজল সুমিতা। চিন্ময়ী বকেই যাচ্ছে, বকেই যাচ্ছে। সুমিতার বন্ধ চোখের মধ্যেও একটার পর একটা মুখ ঢুকে পড়ছে।

অন্ধকার মুখ করে মিনতি বলছে 'ওদের বুকলিস্ট দিয়ে দিয়েছে, ও বলেনি বুঝি?'

ছোট্ট গোপাল দু'হাতে ওর হাঁটু জড়িয়ে বলে "সেই চিকচিকে মিষ্টি আনোনি? মিষ্টি না নিয়ে আসবে না বলেছি না?"

বেলেঘাটার খালপাড় থেকে চোখের পলকে সিঁথির বাড়ি। সুমিতা আর সুজনকে ঢুকতে দেখে মা পর্দা ধরে দাঁড়িয়েই আছে। ছোট বোন অর্পিতা, অপু, ভিজে চুল মুছতে মুছতে বাইরে আসতে আসতে ওদের দেখে থমকে যায়। অপু, ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়া অপু ওদের দেখে কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

"সুমিতা, এই সুমিতা, নামবি না? সোনারপুর আসছে। নাকি ধপধপি যাবি আমার বাড়ি?" চিন্ময়ী ওর পানের ছোপ লাগা দাঁত বার করে হাসছে। সুমিতা সেই হাসি ফিরিয়ে দরজার দিকে এগোল।

২.

আপনার এত দেরি হল?

পাশের ঘরের বউটা, শানুর মা। অপ্রসন্ন মুখ। আবার বলল "ইস আজ কাহানি ঘর ঘর কি দেখা হল না, শানুর কান্না যদি দেখতেন" সুমিতা বলতে যাচ্ছিল "টিভিটা এবার থেকে তোমাদের ঘরেই রেখে দেব, আমার তো দেখা হয় না" সেটা গিলে নিয়ে বলল "আর বলো না, ট্রেনের যা অবস্থা" শানুর মা সে কথায় আমল দিল না "কি জানি বাবা, শানুর বাবা তো সাতটার মধ্যেই ফিরল।"

সুমিতা কথা না বাড়িয়ে ঘরের তালা খোলে। চৌকি আর একটা ট্রাঙ্ক রাখার পর যতটুকু জায়গা বেঁচেছে, তার উপর একটা শতরঞ্চি পাতা। একপাশে অনেকগুলি সেলাই জড়ো করা। টেবিল ফ্যানটা চালিয়ে শুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে পড়ায় লাইট জ্বেলে দেখে নিল কাঁচি টাঁচি সুচ সব ঠিক জায়গা মতো আছে কি না। একবার প্যাঁক করে সুচ ফুটে গিয়েছিল পায়ে। খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল সুমিতা। ইটের গাঁথুনির উপর অ্যাসবেস্টস ছাওয়া। সারাদিন বন্ধ ঘর আগুন হয়ে আছে। এই ঘরের ভাড়া সাড়ে ন'শো, ইলেকট্রিক আলাদা। নতুন টেবিলফ্যান অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলজ্বল করে। ঝোড়ো হাওয়ায় কখন যে ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে।

"কাকিমা, কাকিমা আপনার চিঠি।"

সুমিতা ধড়মড় করে উঠে বসে। শানুর দিদি, বাবলি।

"বাবলি, লাইটটা জ্বালাও তো"। লাইট জ্বেলে বিরক্ত মুখে পোস্টকার্ডটা দিয়ে বাবলি চলে যাচ্ছিল। কাকিমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আজ আর টিভি দেখার আশা নেই।

"কখন এসেছে বাবলি চিঠিটা?"

"বলতে পারব না। ইস্কুল ছিল। দুপুর ছাড়া আর কখন আসবে?"

সুমিতার প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেছে। দেরি করে ফিরে টিভি দেখা থেকে সবাইকে বঞ্চিত করার জন্যে ওর মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। কোনও একটা কথার খেই ধরে ও তাই রোজকার শব্দময় সম্পর্কে পৌঁছতে চাইছিল। বাবলি চলে গেলে সুমিতা উঠে পোস্টকার্ডটা টিভির মাথায় রাখল। কে ওকে চিঠি লিখবে এই ঠিকানায় এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছিল না। অলসভাবে পিছনের নামটা পড়ল, ইতি মিনতি। কে কোথাকার মিনতি ওর মাথায় ঢুকছিল না। সুমিতা গা ধোয়ার জন্যে সাবান, গা

ঘষার জালি গুছিয়ে নিচ্ছিল। ঘুমটা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছিল। যেমনভাবে চায়ের লিকারের গাঢ়তা দুধের ছোঁয়ায় আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে। মাথার কোষগুলোতে একটু সময় নিয়েই যেন সাড় ফিরছিল। সাবার ফুরিয়েছে, নিচু হয়ে ট্রাঙ্ক খুলে নতুন মোড়ক বার করতে গিয়ে সুমিতা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথার দপদপানিটা যেন একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো ঘাড়ে, শিরদাঁড়ায়, পায়ের পাতায় ছড়িয়ে পড়ছে। মিনতি, মিনতি!

৩

"আপনাকে চিটি লেকার মন ছিল না, দরকারে পড়ে লিকচি। ওরা নতুন কেলাসে উটেচে, ওদের নতুন বোয়ের কী করলেন? ওকে দিয়ে লিস্টি পাটিয়েচিলুম। ওর তো একে হুঁশজ্ঞান কম, তার উপর আপনার সঙ্গে লটকে থাকলে—যাকগে। কপালে কেউটে সাপ লেকা থাকলে আর কী হবে। টাকাটা শিগগির পাটিয়ে দেবেন। নইলে আমিও, আপনার কিত্তিকলাপ তো জানতে বাকি নেই কারু।"

একটা সাদা কাপড়ে মুসুরডাল বেঁধে ভাতের হাঁড়িতে ফেলছিল সুমিতা। ঘরে একটাও ডিম নেই। আজ খুব কষকষে ডিমের ঝাল খেতে ইচ্ছে করছে লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন ঠেসে। জিভে যেন কতদিনের বিস্বাদ। পেঁয়াজ লঙ্কা কুচোতে বসল সুমিতা। নুন, পেঁয়াজ, লঙ্কা, তেল দিয়ে মাখা মুসুর ডাল সেদ্ধ আর ভাত। খেয়েদেয়ে মেঝে মুছে বাকি ভাতে জল ঢেলে দিল। এঁটো থালা গেলাস কলতলায় নিয়ে এল, মাজবে।

শানুর বাবা লুঙ্গি পরে উঠোনে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

"কি, অ্যাঁ, আজ সুজনবাবু এলেন না, অ্যাঁ?"

"আজ ওর নাইট।"

"নাইট! হাঃ হাঃ হাঃ!"

লোকটা এত অকারণে হাসে, কিংবা অকারণে নয়। শানুর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ওকে দেখছে। মার পাশে বাবলি, অলস হাতে দুই বিনুনি বাঁধছে।

"...আপনার কিত্তিকলাপ তো জানতে বাকি নেই কারু..."

চিঠিটা মায়েঝিয়ে নিশ্চয় পড়েছে, বাপও।

"কি দিদি, রান্না খাওয়া শেষ?" শানুর মার গলায় উশখুশ কৌতূহল, চোখ দুটো কী এক উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। সুমিতা উত্তর না দিয়ে হেসে ঘরে ঢোকে, ইচ্ছে করেই জোরে চালিয়ে দেয় টিভিটা। মুহূর্তেই ওর ঘরে একগাদা অচেনা মানুষ। কী একটা ইংরেজি বই। একবর্ণও বুঝতে পারে না সুমিতা। একটা লোক খামোকা তিনজনকে গুলি করে, ফুটফুটে একটা মেয়েকে ঠেলে ফেলে দেয় পাহাড় থেকে, ধুমসি একটা বুড়ি একের পর এক সিগারেট খেয়ে যায়। একটা মেয়ে হঠাৎই জামা খুলতে শুরু করে। একরাশ পাগল যেন তার এই ঘরটায়। সুজন, সুজনকে যদি এখন, এই মুহূর্তে হাতের কাছে পাওয়া যেত! চিঠিটা আর একবার পড়ে সে। মিনতি নিশ্চয় লেখেনি। তার পেটে লাথি মারলেও এক অক্ষর বেরোবে না। এ চিঠি সে লিখিয়েছে তার বড় মেয়ে চম্পাকে দিয়ে। ক্লাস সিক্সে পড়ে থাকা চম্পা একবার তাকে খরখরে গলায় বলেছিল 'বরের সঙ্গে কেন থাকো না তুমি? বর নেয় না তোমায়?' ওর গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে গিয়েও পারেনি সুমিতা। মনে হয়েছিল ওই চড়টা নিজের গালেই মারা উচিত। মাধ্যমিক পাস করে সায়েন্স নেবে ভেবেছিল সুমিতা।



বাবা কাজ করত এজি বেঙ্গলে, হোক কেরানি। আজ বেলেঘাটা খালপাড়ে প্রায় বস্তির ঘরে বসে সুজন কারিগরের মেয়েকে চড় মারতে পারে না সে। ক্লাস নাইন, চোখে একরাশ স্বপ্ন ছিল অঙ্কে বরাবর আশির উপর নম্বর পাওয়া সুমিতার। হঠাৎই ডানা ছেঁটে দেওয়া হল। বাড়ি বয়ে আসা অত ভাল সম্বন্ধ, ফেরানো যায়? কী নাম ছিল লোকটার? পরিমল, না, না, আশিস। পাটনা ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে কাজ করত। কলকাতায় বন্ধুর বাড়ি থেকে বিয়ে করতে এসেছিল, আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না কোনও কূলে। বাবা কেবল চাকরি দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন। ফুলশয্যার দু'দিন পরেই পাঠনায় ফিরে গেছিল, বলেছিল, পরের মাসে সব গুছিয়ে এসে নিয়ে যাবে। আসেনি। পরের মাসে, তারপরের মাসে, ছ'মাস পর, কোনওদিনই সুমিতাকে নিতে আসেনি কেউ। পাটনা ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ওখানে ও নামে কেউ কাজ করে না।

নামমাত্র বিবাহে বিচ্ছিন্না, সুশ্রী পাত্রীর জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের কাগুজে শব্দে স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে পাত্রীর কুমারীত্বের দিকে। সুমিতাকে সত্যিই সেই লোকটা ছুঁয়েও দেখেনি। 'ভীষণ টায়ার্ড, শুয়ে পড়ো' আর একটা অচেনা পিঠ ছাড়া কিছু মনে পড়ে না। এমন একটা বিয়ে করে লোকটার যে কী লাভ হয়েছিল সুমিতা বোঝে না। বাবার দেওয়া আংটি আর বোতাম আর সুমিতার পায়ের তলার অভ্যস্ত মাটি—এছাড়া লোকটা আর কিছুই নিয়ে যায়নি। বাবা কেন তাকে

এমন একজন অজ্ঞাত কুলশীল লোকের সঙ্গে বিয়ে দিলেন, কেন পরে আর পড়ালেন না, কেনই বা সেলাইকে জীবিকা বেছে নিতে হল—এতদিন পরে দোষ চাপানোর মতো কোনও ঘাড়, কেঁদে ভাসানোর মতো কোনও পিঠ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু যখন খালপাড়ের এই বস্তির মতো ঘরে বসে চম্পাকে চড় মারতে গিয়েও হাত ওঠে না, মিনতির সঙ্গে গোপন আপস করতে হয়, সুজনকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া অন্য স্বপ্ন দেখার সাহস পর্যন্ত থাকে না, তখন, তখন নিজের আগেকার, যেন বা পূর্বজন্মের ভদ্রলোকের সমাজের কিংবা ভদ্রলোকের সমাজের মোহটাকেই গলা টিপে মারতে ইচ্ছে করে। টিভি অফ করে সতরঞ্চির উপর নামিয়ে রাখল সুমিতা, টেবিলফ্যানটা উঠিয়ে নিল টুলের উপর। চৌকিতে পাতা বিছানা একবার ঝেড়ে নিতেও ইচ্ছে করে না। শুধু মশারিটা গুঁজে বাইরে এসে লাইট নেভাল। তলপেটে চাপ লাগছে। কিন্তু এই নিঝুম রাতে উঠোন পেরিয়ে আর বাথরুমে যেতে সাহস হল না। ও থাকলে এই প্রবলেমগুলো থাকে না। কী করছে এখন। হেলদোলহীন মিনতির শরীর কামড়ে পড়ে আছে নির্ঘাৎ। সব পারে এই পুরুষজাতটা। বারো মাসই ওদের ভাদ্রমাস। মশারি তুলে ঢুকতে এই ছোট্ট বিছানাটাই বিরাট মাছ হয়ে গেল। এই বিছানায় সুমিতার বুকে মুখ গুঁজে সুজন কতবার বলেছে "বিশ্বাস করো, ওই হারামজাদির কাছে যেতে ভাল্লাগে না, মাইরি, মা কালীর দিব্যি বলছি, শুধু বাচ্চাগুলোর টানে যাই।'

বাচ্চা, হ্যাঁ এইটুকু স্বপ্ন, সাহস নয়, দুর্বলতা, যার টানে নিজের যাপনে সুজনকে মেনে নেয় সুমিতা। যার জন্যে এত পরিশ্রম, নতুন করে ব্যবসা ফাঁদা, একটা মজবুত ঘর, একটা বাচ্চা। এইভাবে পালিয়ে, চুরি করে বাঁচা অসহ্য। ওস্তাদ কারিগর সুজনকে নিয়েই সে এবার রোজকার তেল-হলুদ লাগা কাপড়ের জমিতে বিনি সুতোয় এমব্রয়ডারি করবে। অনেক অনেক হয়েছে। সুজনের নাছোড় প্রেমে সে তার সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, আগের চাকরিটা ছেড়েছে, মিনতির মুখ বন্ধ রাখতে ওর সংসার টেনে চলেছে।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই রোজকার অভ্যেসে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে সুমিতার। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে, একা বাঁচার সহজাত সতর্কতায় সে হঠাৎ জেগে ওঠে। কেউ কড়া নাড়ছে নাকি? হ্যাঁ, চেনা সঙ্কেত। ঠুক ঠুক, ঠুক, ঠুক। কেউ যাতে শুনতে না পায়, জেগে না ওঠে, অনেক রাতে এইভাবেই আওয়াজ করে সুজন। কত রাত এখন? ঘড়িটাও নেই। মাথায় একরাশ আগুন নিয়ে ঝেঁঝে দরজা খোলে সুমিতা।

"আমি তোমার বিয়ে করা বউ নই, যখন খুশি আসবে আমি ভাত সাজিয়ে বসে থাকব।"

সুমিতার রাগকে পাত্তা না দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে সুজন "আরে রাগ করিস কেন, তোর দোকানঘরের ব্যাপারেই তো সাহাবাবুকে ধরতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল, সেলামি কত কমিয়েছি জানিস, শুনলে তোর।"

শুনতে চাই না, হাঁড়িতে জল দেওয়া ভাত আছে, খেয়ে শুয়ে পড়ো, আর জ্বালিও না আমাকে। কত দুইবে তোমরা আমাকে বলতে পারো? দেবাদেবীতে মিলে?" চিঠিটা সুজনের গায়ে ছুড়ে মারে সুমিতা।

সুজন আগাগোড়া চিঠিটা পড়ে, একবার নয়, দু'বার, তারপর ফ্যাকাশে হেসে বলে "জানিসই তো ওই মেয়েছেলেটা কেমনধারা, তুইও যদি খেপিস" সুমিতা আজ সত্যিই খেপেছে। সুজন যে আজ ঝগড়া না করে হার মেনে নিচ্ছে, আশ্চর্য নরমসুরে কথা বলছে, তাইতে আরও আগুন চড়ে যায় মাথায়। এসবই আরও দুয়েমেড়ে নেওয়ার ছক। সে চেঁচিয়ে বলে "আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। কত পেলে তোমরা আমাকে রেহাই দেবে বলো। ঘড়িটা যে সেই একমাস হয়ে গেল নিয়ে গেছ, কোন যমরাজের দোকানে সারাতে দিয়েছ শুনি?"

সুজন আমতা আমতা করে বলে "ক'দিন ধরে বলব বলব করে বলা হয়নি, ঘড়িটা সারিয়ে ঘরে নিয়ে এসেছিলাম, পরের দিন তোকে দেব, সে গোপাল ছিনিয়ে নিলে হাত থেকে, ঘড়িটা তার খুব পছন্দ হয়েছে। বলে সুমিতামাসির ঘড়ি, তার নয়তো কার? তুই রাগ করিস না, এ মাসে মাইনে পেলেই তোকে আগে একটা ঘড়ি কিনে দেব।" গোপাল তো নয়, ও ঘড়ি নিয়েছে চম্পা কিংবা মিনতি। খালপাড়ের সেই অন্ধকার ঘরে জ্বলজ্বল করছে তার বাবার দেওয়া ঘড়ি 'নূতন' আর নির্ভুল সময় দিচ্ছে। টিক টিক টিক—শব্দটা যেন সুমিতার মাথায় বাজছে পাগলাঘণ্টির মতো। সুমিতা পাগলের মতো জড়ো করা সেলাইয়ের তাল তোলপাড় করে কাঁচিটা খোঁজে, ধারালো কাঁচিটা, একটু রক্ত খেলে তো আর মরচে ধরে যাবে না। সুজন বিপদের গন্ধ পেয়ে লাফিয়ে এসে সুমিতাকে জাপটে ধরে।

"কী করছিস কী পাগলের মতো?"

সুজনের হাতের টানে সুমিতা টাল খেয়ে পড়ে ওর বুকে। কী জোরে আঁকড়ে ধরেছে ওকে সুজন। সুমিতা আস্তে আস্তে গভীর অবসাদে ওর বুকে নিজেকে এলিয়ে দেয়। অনুভব করে, তীব্র বিস্ময়ে সে অনুভব করে, আজ তার কোথাও বাধছে না। এর আগেও কতবার টেনেছে সুজন, সেও ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে—তবু দু'জনের মাঝখানে একটা দেওয়াল, ঘড়িটার মতো ধাতব একটা বাধা কোথাও যেন ছিল। ঘরের এককোণে থেকে অদৃশ্য দুটো চোখ সারাক্ষণ নজর রাখত তার উপর। সারাক্ষণ টিক টিক টিক, টিক টিক টিক। আজ তার পৃথিবীতে, তার এই অনিবার্য জীবনপ্রণালীতে কোথাও সেই শব্দটা নেই, নেই নিজের হৃৎপিণ্ডের তলায় আর একটা মহার্ঘ হৃৎপিণ্ড, একটা মহাপৃথিবী বয়ে চলার যন্ত্রণা। আঃ, গভীর আরামে চোখ বুজল সুমিতা। তবুও চোখের ফাঁকফোকর দিয়ে যেটুকু আলো বিঁধছিল তাকে, তাও ঢেকে দিল ওস্তাদ কারিগর সুজনের উৎসুক শরীর।

অলঙ্করণ : শান্তনু দে





ঢেউ উত্তাল

উপমন্যু রায়

নিমতলার ইলেকট্রিক চুল্লিটা তখন সবে বাবার সুন্দর ও সুঠাম দেহটা বীভৎসভাবে গিলে খেয়েছে। মিনিট চল্লিশ মাত্র। তার মধ্যেই নির্বিকার লকলকে জিহ্বায় ছাই করে দিয়েছে সেই নশ্বর শরীরকে।

নাভি নেওয়ার সময় টাকা নিয়ে ডোম ঝামেলা করছিল। কিন্তু বাপ্পা ব্যাপারটা সামলাল। দরাদরি করে একটা রফা করল। আমার সে দিকে মন ছিল না। নাভি নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে স্নান করলাম। সাদা কাপড় পরে পাড়ে এসে ট্যাক্সি ধরলাম। ট্যাক্সিতে আমার পাশে বসল বাপ্পা।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে সে বলল, "সমুদ্র, এবার সামনের দিকে তাকা। পিছনের দিকে আর তাকাস না। পিছনের কথা পুরো ভুলে যা।" বাপ্পা আমার স্কুল জীবনের বন্ধু।

কথাটা, সন্দেহ নেই, নৃশংস। তবে এর বাস্তবতা পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। এতদিন বাবা ছিলেন মাথার উপর ছাদের মতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হওয়া পর্যন্ত সংসার চালানোর পাশাপাশি আমার সমস্ত চাহিদা মিটিয়েছেন তিনি। তার পর বাড়িতে খাওয়া-

দাওয়া, বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর শিয়ালদা স্টেশন থেকে বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষার ফর্ম কিনে ফিল-আপ করে পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্ট করা। ফর্মের সঙ্গে দিতাম বাবার থেকে টাকা নিয়ে কেনা পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট। মাঝে মাঝে রবিবার চাকরির জন্য পরীক্ষায় বসা। বাবা কখনও কোনও প্রশ্ন করেননি। শুধু বলতেন, "চেষ্টা করে যাও। এ ছাড়া আর কী করার আছে!"

আমি যখন ছোট ছিলাম, বাবা আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। মাকে বললেন, "দেখো, সমুদ্র একদিন বড় হয়ে দশজনের একজন হবে।"

দশজনের একজন! ভাবলেই কেমন একটা অনুভূতি হয়! চাকরি পরীক্ষায় যখন বসতাম, তখন মনে হত, দশজনের একজন না হলেও হয়তো কোনও দিন চাকরি পেয়ে গড় বাঙালির একজন হতে পারব। কিন্তু, বাবা চলে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম, সেটাও সম্ভব নয়। আর, তখনই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, পৃথিবীটা আদৌ রূপকথার কোনও দেশ নয়। আসলে পৃথিবীটা হল একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে সবাই সকলের বিরুদ্ধে লড়ছে। সেই লড়াইয়ে কোনও নিয়ম-নীতি নেই। সেখানে একটাই মন্ত্র। জিততে হবে। যে ভাবেই হোক, অন্য সকলকে হারিয়ে জিততে হবে আমাকে! ওই যে কথায় আছে না, "All fair in Love and War."

তার পরই মালুম হল, বাপ্পার সেই কথাটা যত নিষ্ঠুরই হোক, চরম সত্য। পিতৃ-মাতৃশোক প্রতিটি স্বাভাবিক মানুষকেই পেতে হয়। তখন থেকেই স্মৃতিকে ভুলতে হয় সকলকে। স্মৃতি আঁকড়ে থাকলে যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হতে হবে। পিছিয়ে পড়তে হবে। জীবন তা হলে চলবে না। কী নির্মম জীবনের এই দর্শন!

আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হল। বাবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। তাই তাঁর অফিস থেকে পাওয়া কিছু টাকায় মাস চারেক মোটামুটি চলে গেল। কিন্তু তার পরই দেখা দিল চরম অভাব। কী ভয়ঙ্কর দিন! চাকরি জোগাড় করতে পারলাম না। মা-ও অধৈর্য হয়ে পড়ল। অন্যদিকে, মামা ভয়ানক রেগে গেলেন আমার উপর। যেন আমাকে সবাই চাকরি দেওয়ার জন্য ডেকে হয়রান হচ্ছে। আমিই চাকরি না করার প্ল্যান করেছি!

শেষে একদিন মামা এসে মাকে জোর করে নিয়ে গেলেন। মা আমার উপর যতই রেগে যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে যেতে চায়নি। তবে মামা ছিলেন নাছোড়বান্দা। আমিও তাঁকেই সাপোর্ট করলাম। মাকে বুঝিয়ে মামার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কথা দিলাম সময় করে মাঝে মাঝে মাকে দেখে আসব। আর এ দিকে চাকরি জোগাড় করতে পারলে মাকে নিয়ে আসব। মা এখন রায়গঞ্জে মামার বাড়িতে।

কিন্তু মা চলে যেতেই আমার মন বদলে গেল। জীবনের প্রতি একটা ঘৃণা এল। বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম তার বিরুদ্ধে। দেখি এ ভাবে কতদিন বেঁচে থাকা যায়! আমরা থাকতাম উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে। দোতলা শরিকি বাড়ি। দোতলায় থাকেন কাকা-কাকিমা। তাঁদের এক মেয়ে আছে। বিয়ের পর মেয়ে এখন থাকে বালিগঞ্জে। একতলায় আমরা।

আমাদের ঘরগুলিতে তালা দিয়ে চাবি দিতে গেলাম উপরে। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে। কাকা ছিলেন না। কাকিমা ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

মায়ের সঙ্গে কাকিমার খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না কোনও কালেই। প্রয়োজন না পড়লে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেন না। কিন্তু আমার প্রতি একটা দুর্বলতা কাকিমার চিরকালই ছিল। ছোট থেকেই এটা দেখে আসছি। তবে কাকা আমাকে খুব একটা পছন্দ করেন না। কেন করেন না জানি না।

কাকিমার প্রশ্নের জবাবে বললাম, "ভাবিনি তো!"

কাকিমা অবাক হয়ে ফের প্রশ্ন করলেন, "ভাবিনি মানে?"

বুঝতে পারলাম ঠিক উত্তর বলা যাবে না। কারণ, ঠিক উত্তরটা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু কিছু তো একটা বলতে হবে। কী বলা যায়? মিথ্যে। হ্যাঁ, মিথ্যে। মহাভারতে আছে, বৃহত্তর সত্যের জন্য অল্প মিথ্যে বলা দোষের নয়। তবে বৃহত্তর সত্যটা যে কী, তা আমার কাছেই স্পষ্ট নয়। হেসে বললাম, "বন্ধুর বাড়ি।"

কাকিমা কিন্তু আবার প্রশ্ন করলেন, "কবে ফিরবি?"

এ তো মহা ঝামেলা! তবু হাসিমুখে বললাম, "আচ্ছা কাকিমা, এখনও গিয়ে পৌঁছলাম না, আর তুমি বলছ, কবে ফিরব?"

কাকিমা আর কোনও প্রশ্ন না করে বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, "কাজের খোঁজে যাচ্ছি। একটু সময় লাগবে।"

কাকিমা হেসে প্রশ্ন করলেন, "বন্ধুর বাড়ি কোথায়?"

কী মুশকিল! এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়? তড়িঘড়ি বললাম, "শিলিগুড়ি।" আর দাঁড়ালাম না। সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললাম, "আমি যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি মিস করব।" দ্রুত বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম বিবেকানন্দ রোড আর বিধান সরণির সংযোগ স্থলে। মোড়ে পৌঁছে দেখি রাস্তায় সব গাড়ি নিয়ম মেনে চলছে। ব্যাপারটা আমার কাছে চমকপ্রদ মনে হল। সাধারণত কলকাতার রাস্তায় কোনও গাড়িই নিয়ম মেনে চলে না। সিগনাল তো মানতেই চায় না, তার উপর ওভারটেকের প্রতিযোগিতা। সকলেরই আগে যাওয়ার তাড়া! কোথায় যে যেতে চায় সকলে, কে জানে! আমি এক-একসময় অবাক হয়ে ভাবি, সকলে শেষ পর্যন্ত ঠিক কোথায় পৌঁছতে চাইছে?

বিবেকানন্দ রোডের গাড়িগুলি চলছিল। তাই থেমে বিধান সরণির গাড়ি। আমি বিধান সরণি দিয়ে এগোলাম। দু' পা এগোতেই দেখি একটা শববাহী গাড়ি। ড্রাইভারের পিছনে কাচের বাক্সে শায়িত একটি মৃতদেহ। অল্প বয়স মনে হল। কিন্তু, হঠাৎই খটকা লাগল। মৃতদেহটা চেনা চেনা লাগছে। দ্রুত এগোলাম গাড়িটার দিকে।

দেখি বাক্সের ভিতরে শুয়ে একটি ছেলে। বয়স আমারই মতো। খুব চেনা। একেবারে বাক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মৃতদেহটা দেখে চমকে উঠলাম। এ তো আমারই মৃতদেহ! মানে? আমি মারা গিয়েছি? জানি না তো!

আমি ভাল করে দেখলাম। হ্যাঁ, আমাকেই এই শববাহী গাড়িতে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু, কী করে সম্ভব? আমি যদি মারা গিয়েই থাকি, তা হলে গাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা আমি কে? দু'-দু'টো তো আমি হতে পারি না! তা যদি হত, তা হলে না-হয় বলা যেত, আমার একটা আমি মারা গিয়েছে, আর একটা আমি এখনও বেঁচে আছে।

কিন্তু, তা সম্ভব নয়। রীতিমতো ভড়কে গেলাম। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগলাম। আমার সামনে শববাহী কাচের গাড়িতে শায়িত রয়েছে আমারই মৃতদেহ! আর, সেই দেহ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছি খোদ আমি! তবে বেশি কিছু ভাবতে পারলাম না। সিগনাল বদলে গিয়েছে। গাড়িটা দ্রুত আমার সামনে থেকে চলে গেল। আমি কয়েক মুহূর্ত গাড়ির চলে যাওয়া পথের দিকে দেখলাম। তার পর ফের হাঁটা দিলাম বিধান সরণি দিয়ে।

ব্যাপারটার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। পাব বলে মনে হল না। অতএব হাল ছেড়ে দিলাম। আর হাল ছেড়ে দিতেই আমার খুব হাসি পেল। ব্যাখ্যাতীত হলেও ব্যাপারটা বেশ মজার! হ্যাঁ, আমার খুব মজা লাগল। জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার প্রথম



মুহূর্তেই একটা অভিনব ঘটনার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল সে। আমি হাসি-মুখে মনে মনে জীবনকে স্যালুট করলাম। তবে আমাকে সে হারাতে পারেনি।

কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে বেশ ভিড়। বাসস্টপগুলিতে থিকথিক করছে মানুষ। বেশির ভাগেরই বাড়ি ফেরার তাড়া। বইপত্রের দোকানগুলি বন্ধ হচ্ছে। তবে কাপড়ের দোকানগুলি খোলা। সেখানে মহিলাদের ভিড়। আমি এমজি রোড ধরে পশ্চিমে এগোতে লাগলাম।

কী মনে হল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পৌঁছে বাঁ-দিকে ঘুরে ফের এগুতে লাগলাম। অনেকক্ষণ হাঁটার পর বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনে হল, এবার আমি কোথায় যাব? কোথাও তো আমার যাওয়ার নেই! বেশ সমস্যায় পড়লাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তো পড়লাম। কিন্তু যাবটা কোথায়? বুঝতে পারলাম, বাঙালি কেন এত ঘরমুখো! শেষ অবধি ঘরেই ফিরতে হয় তাকে। হয়তো বাঙালি শুধু নয়, প্রতিটি মানুষেরই ধর্ম তা-ই। কিন্তু, মানুষ যখন আদিম ছিল, বা তার পরে যখন সভ্য হয়েও যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াত, তখন? যদিও সময় এখন বদলে গিয়েছে। এখন সকলেরই একটা ঠিকানা আছে। গন্তব্যও নির্দিষ্ট।

দেখি সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের পাশে অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। এগিয়ে দেখলাম কালীমন্দিরে সকলে প্রণাম করছেন। কেউ বা পুজো দিচ্ছেন। ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি। অ্যান্টনি কবিয়াল এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালীমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম।

উল্টোদিকের ফুটপাতে দেখলাম এক শ্বেতশুভ্র সন্ন্যাসীকে। আমার কেন জানি না তাঁর দিকে চোখ আটকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তিনি নিজের থলে ঠিক করছিলেন। ভাল করে দেখলাম সন্ন্যাসীকে। অন্য সাধুদের থেকে তাঁর যেন অনেক তফাত আছে। এখন অবশ্য কলকাতায় তেমন একটা সন্ন্যাসী বা সাধু দেখা যায় না।

ছোটবেলায় অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকে পাড়া দিয়ে যেতে দেখতাম। বাড়িতেও আসতেন। তাঁদের প্রণাম করে বাড়ির মা-ঠাকুমারা খাবার দিতেন। সেই সব সাধু বা সন্ন্যাসী এখন আর দেখি না। এখন মাঝে মাঝে কিছু অবাঙালি আলখাল্লা পরা সাধু দেখি। হাতে কমণ্ডলু আর হাড়-পাঁজর নিয়ে তারা আসে। নানা ভেল্কি দেখায়। টাকা চায়। না দিলে অভিশাপ দিতে দিতে চলে যায়।

তবে এই সন্ন্যাসীকে আমার একটু অন্যরকম মনে হল। রাস্তা পার হয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তাঁর থলে ঠিক করার কাজে সাহায্য করলাম। তিনি আমাকে একবার দেখলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। থলে ঠিক হলে আমি তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে উঠে দাঁড়ালেন। বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ধরে পুবে হাঁটতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গ নিলাম। তিনি কিছু বললেন না। মৌনিবাবার মতো চলতে থাকলেন। আমি বললাম, "বাবা, আপনি এখন কোথায় যাবেন?"

তিনি আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। বউবাজার মোড়ে পৌঁছে তিনি গাড়ির রাস্তা পার হলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করি। বউবাজারের সোনার দোকানগুলি সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সোনা ছাড়া অন্য কয়েকটি দোকান খোলা। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মোড়ে পৌঁছে গেলাম। এবার তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এই প্রথম মুখ খুলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কোথায় যাবি?"

আমি বললাম, "আপনি যেখানে যাবেন?"

তিনি ফের প্রশ্ন করলেন, "কেন?"

আমি বললাম, "আমি আপনার মতো সন্ন্যাসী হতে চাই।"

তিনি এবার এক দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তার পর বললেন, "তোর সন্ন্যাসী হওয়ার সময় এখনও আসেনি।"

বললাম, "যতদিন না আসে, ততদিন আমি আপনার সঙ্গে থাকব। তার পর যখন সেই সময় আসবে, তখন না হয় সন্ন্যাস নিয়ে নেব।"

তিনি বললেন, "না। আমার সঙ্গে যাওয়ারও সময় তোর হয়নি।"

আমি হতাশ হই। জিজ্ঞাসা করি, "তা হলে আমি কী করব?"

তিনি বললেন, "তুই ফিরে যা।"

আমি কাতর গলায় অনুরোধ করি, "আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না বাবা। আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।"

তিনি বললেন, "কিন্তু আমার সঙ্গেও তোর যাওয়া হবে না।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তা হলে আমি কোথায় যাব বাবা?"

হঠাৎই তিনি খেপে গেলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুই জাহান্নামে যা।" বলেই হন হন করে সোজা পূর্বদিকে শিয়ালদার পথে হাঁটা দিলেন।

আমি স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পা যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে গেল। আমি তাঁর পিছনে আর এগুতে পারলাম না। শেষে ব্যর্থ মনোরথে উত্তর দিকেই হাঁটতে শুরু করলাম। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে হ্যারিসন রোড আর আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থলে চলে এলাম। এর পর কোথায় যাব বুঝতে পারলাম না। আচমকা মনে হল, আমি যেন খানিকটা উপবৃত্তাকার পথে চলে ক্রমশ একই জায়গায় এসে পৌঁছে যাচ্ছি। বেশ মজার লাগল ব্যাপারটা। সাধে কি বলে পৃথিবীটা গোল? যতই তুমি দূরে কোথাও যাও, ঘুরে-ফিরে তোমাকে সেই একই জায়গায় আসতে হবে!

আর কিছু না ভেবে হ্যারিসন রোড ধরে কলেজ স্ট্রিটের দিকে এগোলাম। বেনিয়াটোলা লেনের কাছাকাছি পৌঁছে অনুভব করলাম, খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে। পকেটে হাত দিলাম। না, এক পয়সাও নেই। একটু চিন্তা হল। জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে শেষে না খেয়ে মরতে হবে না কি?

ফুটপাতের উপর জলপানের সরকারি ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু যখন পেটে দেওয়ার উপায় নেই, তখন পেট ভরে জল খাওয়া যাক। কল থেকে জল পান করে অনুভব করি, মন্দ লাগছে না। তবে ক্লান্ত লাগছে। একটু বসতে পারলে ভাল হত।

হাঁটতে হাঁটতে বাসস্টপে চলে এলাম। ফুটপাতের বাসস্টপে সরকারি প্রতীক্ষালয়। অবশ্যই বাসযাত্রীদের জন্য। বসার ব্যবস্থাও আছে। অনেকক্ষণ বসে থেকে গাড়ির যাওয়া-আসা দেখলাম। রাস্তায় লোকজন একেবারেই কমে গিয়েছে। কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে লাগছে কলেজ স্ট্রিটকে!

আর বসতে ভাল লাগল না। দশটা বাজে বোধ হয়। উঠে দাঁড়ালাম। শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে ঢুকে পড়লাম। ফাঁকা গলি। মনে হল, এখানেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। তার পর সকালে উঠে না-হয় কী করব ভাবা যাবে।

কিন্তু, সমস্যা হল, গলি ফাঁকা হলেও দোকানগুলির বারান্দা, বা চৌকাঠ, কিছুই খালি নেই। সব চলে গিয়েছে ভিখিরিদের দখলে। শেষে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে একটি দোকানের বন্ধ দরজার সামনে একটু জায়গা পেলাম। কিছু না-ভেবে বসে পড়লাম সেখানে। শরীর এলিয়ে দিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম খেয়াল নেই।

কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি ভোরের আলো তখনও সেভাবে পরিষ্কার হয়নি। মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম আমার পাশে একজন বসে আছে। আমি উঠে বসলাম। তার দিকে তাকালাম। তাকিয়ে অবাক হলাম আমি। আবার ভাল করে দেখলাম তাকে। আলো-অন্ধকারের মায়াবী খেলায়ও বুঝতে পারলাম, অতিথিটি আমারই মতো এক জামা-প্যান্ট পরে আছে। কিন্তু তার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ তো আমারই মুখ! না, শুধু মুখ নয়, পুরোটাই আরেক আমি!

আমাকে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে জানতে চাইল, "কী দেখছ?"

আমি উত্তর দিলাম না। পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কে?'

সে বলল, "আমি সমুদ্র।"

আমি ফের প্রশ্ন করলাম, "আশ্চর্য! তুমি যদি সমুদ্র হও, তা হলে আমি কে?"

সে বলল, "তুমি কে, তা তো তোমারই জানার কথা!"

আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। কোনও কথা বলতে পারলাম না। তার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

সে বলল, "ও ভাবে তাকিয়ে না-থেকে ভাবো, এবার কী করবে?"

বললাম, "মানে?"

সে হেসে বলল, "কাল রাতে যে পেটে কিছু পড়েনি, সে খেয়াল আছে?"

এটাও সে জানে! আমি বিরক্ত হয়ে বলি, "তাতে তোমার কী?"

সে বলে, "তুমি না খেলে আমারও যে পেটে কিছু পড়ে না, তা জানো কি?" বলেই সে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে আমাকে দিল। বলল, "এই নাও আপাতত হাজার টাকা রাখো।"

এমন ভাবে সে টাকাগুলি আমাকে দিল যেন সে আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিল! সেই সঙ্গে কিছু খুচরো টাকা-পয়সাও দিল। বলল, "এগুলিও তোমার কাজে লাগবে।"

কেন যেন আমি আপত্তি করতে পারলাম না। হাত পেতে টাকা-পয়সা নিয়ে বললাম, "তুমি বললে তুমিও কিছু খাওনি। তা হলে আমাকে টাকা না দিয়ে দোকান থেকে কিছু কিনে খেলেই তো পারতে?"

সে হাসল। বলল, "সবই যদি তুমি বুঝতে...!" কথা শেষ করল না। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। জানতে চাইল, "আজ কী করবে ঠিক করেছ কিছু?"

এতক্ষণে সম্বিত ফিরল আমার। বললাম, "না।" একটু যেন চিন্তিতও হলাম।

সে বলল, "একটা কাজ করো। ক'দিন তারাপীঠ থেকে ঘুরে এসো।"

আমি তার দিকে তাকাই।

সে হাসতে থাকে। তার পর উঠে দাঁড়ায়। বলে, "বলো তো সমুদ্রের রং কী?"

আমি অবাক হলাম। বললাম, "কেন? নীল?"

সে হাসল। বলল, "হ্যাঁ, নীল। মনে রেখো। সমুদ্রের রং নীল। সমুদ্রের জল নীল।"

আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সমুদ্রের রং বা জল যে নীল, তা সকলেই জানে। এতে নতুনত্ব কী আছে?

সে হাসিমুখে আমার চোখে চোখ রাখে। তার পর হনহন করে কোথায় যেন চলে যায়!

আমি কিছু বলতে পারি না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমার মাথায় কিছু আসে না। কী করব বুঝতেও পারি না। শেষে উঠে দাঁড়ালাম। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ভোরের নরম আলো লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। তবে সূর্য ওঠেনি। এত ভোরে অবশ্য সূর্য ওঠারও কথা নয়। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম কলেজ স্কোয়ারে।

মনে হল হাত-মুখ ধোয়া দরকার। স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিমে আধুনিক শৌচাগার আছে। এগিয়ে গেলাম সেখানে। দেখলাম কেয়ার টেকার অল্প বয়সি একটি ছেলে বসে আছে। তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে জানতে চাইল, "কী করবেন?"

চমৎকার প্রশ্ন! বললাম, "বাথরুম, স্নান, সব।"

সে চার্জ বলল। তাকে টাকা দিলাম। তার পর বললাম, "ভাই, আমার কাছে সাবান নেই। একটা দেবে? দাম দিয়ে দেব।"

সে বিরক্তি-মাখা চোখে আমার দিকে তাকাল। এই ভোরেই চোখে

বিরক্তি! জানি না দুপুরের দাবদাহে কী হয়! সে বলল, "সাবান নেই।"

তাকে অনুরোধ করি, "পুরনো হলেও চলবে। দাম দিয়ে দেব। স্নান হলে সাবানটাও ফেরত দিয়ে দেব। একটু দেখো না ভাই।"

সে কী ভেবে উঠে দাঁড়াল। বলল, "দাঁড়ান।"

আমি বলি, "একটা গামছাও দিও, প্লিজ। চার্জ দেব।"

একরাশ বিরক্তি নিয়ে সে ভিতরে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যে ফিরে এসে একটা পুরনো গামছা আর সাবান আমায় দিল। দেখে মনে হল তারই গামছা-সাবান বোধ হয়। আমিও তার চাহিদা মতো চার্জ দিয়ে ভিতরে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে বাইরে এলাম। বেশ ভাল লাগছে। কলেজ স্কোয়ারে দেখলাম অনেকে হাঁটতে এসেছেন। বুঝতে অসুবিধে হয় না মধ্যবয়সিদের বেশির ভাগই নানা রোগে আক্রান্ত। কারও সুগার, কারও প্রেশার, কারও বা থাইরয়েড। তাদের চেহারায়ও তার প্রমাণ। কেউ বিশাল বপু। কারও একটু কম। কিছু অল্প বয়সি ছেলেমেয়েও আছে। তাদেরও এমন রোগ-টোগ আছে কি না, বুঝতে পারলাম না। তারা কেউ সাঁতারের উদ্দেশ্যে এসেছে। কেউ বা শরীরচর্চার নামে প্রেম করতে। কলেজ স্কোয়ারে আমিও কিছুক্ষণ হাঁটলাম। বেশ কয়েক পাক খেয়ে শেষে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। আধ ঘণ্টার মতো বিশ্রাম করে বাইরে বের হলাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল খিদেতে পেট গুলোচ্ছে। হ্যারিসন রোড দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সূর্য সেন স্ট্রিটের মুখে একটা কচুরির দোকান চোখে পড়ল।

গরম গরম কচুরি ভাজা হচ্ছে। দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার আগে আরও দু'জন খদ্দের ছিল। তাই তাদের পিছনে আমি দাঁড়ালাম। কিন্তু, অনুভব করলাম, আমার হাত ধরে কে যেন টানছে। দেখি একটি বাচ্চা ছেলে। খালি গা, হাফ প্যান্ট। কালো ময়লা শরীর। হাত পেতে রয়েছে আমার দিকে। বলি, "খাবি?"

সে মাথা নাড়ে। আমি দোকানে দু'জায়গায় কচুরির অর্ডার দিলাম। সঙ্গে জিলিপিও। দু'জনে পেট ভরে খেলাম। শেষে দাম মিটিয়ে দিয়ে তাকে বললাম, "যা, পালা।"

সে চলে গেল। আমিও হাঁটতে লাগলাম। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম মা তারা এক্সপ্রেস ছাড়বে সাড়ে সাতটায়। টিকিট কাউন্টার থেকে একটা রামপুরহাটের টিকিট কাটলাম।

ট্রেন ঠিক সময় শিয়ালদা ছাড়ল। ট্রেনে বসে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কাল রাতে রাস্তায় ঘুমোতে হয়েছে। অভ্যাস নেই। হয়তো তাই ভাল ঘুম হয়নি। সেই অসমাপ্ত ঘুম এসে আমাকে আঁকড়ে ধরল ট্রেনে। অনেকটা সময় ঘুমিয়ে কাটালাম। ঘুম ভাঙল হকারের চিৎকারে। বেশ কয়েকজন হকার উঠেছে ট্রেনে। খাবার বিক্রি করছে। কোনও স্টেশনে থেমেছে হয়তো। কোন স্টেশন জানার চেষ্টা করলাম না। কারণ, পাশের এক যাত্রীর মুখে শুনলাম রামপুরহাট আসতে এখনও ঢের দেরি। এক হকারের কাছ থেকে খাবার কিনে খেলাম। চা-ও খেলাম অন্য আরেক হকারের কাছ থেকে। চা-টা ভাল লাগল না অবশ্য।

রামপুরহাটে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। স্টেশনে নেমেই মুখোমুখি হলাম এক ভিখারিণীর। হাত পেতে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে চমকে উঠলাম। গায়ের রং কালো। রোগা। হয়তো রুগ্‌ণও। পরনে শতছিন্ন ময়লা কাপড়। মুখে জীবন সম্পর্কে অদ্ভুত একটা নিস্পৃহ ভাব। আমি ধীর চোখ তার দিকে তাকালাম। জন্মানোটাই হয়তো অভিশাপ এই ভিখারিণীর। জীবনের চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে শুধু যে ক'দিন বেঁচে থাকতে হবে, সেই জন্য এই লড়াই। সেই জন্য খাবারের প্রয়োজন। আর তাই ভিক্ষাবৃত্তি। কিন্তু, সে ভিক্ষু নয়, ভিক্ষুক।

সেই ভিখারিণী আমাকে বলল, "একটা টাকা দেবে বাবা? কাল রাত থেকে কিছু খাইনি।"

তার কথা শুনে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল যেন আমার সামনে হাত পেতে আমারই মা দাঁড়িয়ে আছে। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। আমার মা ভিক্ষে করছে! আর তার



ছেলে হয়ে আমি পকেটে টাকা নিয়ে খেয়েদেয়ে, আরাম-আয়েশ করে চলেছি!

আমি পকেটে হাত দিলাম। একশো টাকার আটটা নোট, আর কিছু খুচরো টাকা পড়ে রয়েছে আমার পকেটে। সবই বের করে তার হাতে তুলে দিলাম। বললাম, "আমার কাছে আর কিছু নেই মা। এই টাকাগুলি তুমি রাখো। আর কথা দাও এই ক'টা টাকায় যতদিন তোমার চলে, ততদিন তুমি আর ভিক্ষে করবে না?"

ভিখারিণী আমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল।

আমি বলি, "আমি তা হলে যাই?"

ভিখারিণী বলল, "তোমার কাছে আর টাকা নেই?"

বলি, "না।"

ভিখারিণী বলে, "তা হলে তোমার চলবে কেমন করে? তুমি খাবে কী?"

আমার চোখে জল এসে যায়। ঠিক যেন আমার মা! আমার মা-ও ঠিক এ ভাবে আমার খাওয়ার খোঁজ নিত। কান্না চেপে বলি, "আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি ঠিক আমার একটা ব্যবস্থা করে নেব।" একটু থেমে বলি, "আমি যাই।" বলে স্টেশনের বাইরে যাওয়ার জন্য হাঁটা দিই।

কিছুটা পথ এসে মুখ ঘুরিয়ে দেখি, সেই ভিখারিণী-মা তখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে প্রণাম করি তাকে। কে জানে আমার মা এখন কেমন আছে!

স্টেশনের বাইরে চলে আসি। সেখানে অটোর ভিড়। অটো করে হাই রোড হয়ে মন্দিরে যেতে হবে। কিন্তু আমার কাছে তো পয়সা নেই। হাঁটা দেব নাকি? কিন্তু দূরত্ব তো আট কিলোমিটার! এখন হাঁটতে শুরু করলে কখন গিয়ে পৌঁছব? আর টানা আট কিলোমিটারই বা হাঁটব কী করে? অভ্যাস তো নেই! কী করব বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ অনুভব করলাম কে যেন আমার ঘাড়ে হাত রেখেছে।

ঘুরে দেখি আমারই আরেক আমি।

সে হেসে আমাকে বলল, "কী? খুব সমস্যায় পড়েছ, তাই না?"

আমি কিছু বলতে পারলাম না।

সে বলে, "অত দয়া দেখাতে গেছ কেন? তোমার কাছে কি অঢেল টাকা আছে?"

আমি কোনও জবাব দিতে পারি না।

সে বলে,"আর দিলেই যখন, কিছু টাকা তো নিজের কাছে রেখে দিতে পারতে?"

এই প্রশ্নেরও কোনও জবাব দিলাম না।

সে বলল, "এই নাও অটো ভাড়া। যাও, মন্দির থেকে ঘুরে এসো।" আমাকে কিছু টাকা দিয়ে সে ফের অন্য কোথায় চলে গেল! আমি অবশ্য তাকে দেখার চেষ্টা করলাম না। আমি অটোর কাছে এগিয়ে গেলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যে মন্দিরের কাছে পৌঁছে দিল অটো। বেশ কিছুক্ষণ আমি তারাপীঠ ঘুরে দেখলাম। বাবার কাছে শুনেছি, তারাপীঠ হল সাধনপীঠ। এ ছাড়া তারাপীঠ বিখ্যাত বামাক্ষ্যাপার জন্যও। এখানেই তিনি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বাবা-ই বলেছিলেন, আগে নাকি তারাপীঠ বেশ ভয়ের জায়গা ছিল। এত লোকজন ছিল না। বিশেষ করে তারাপীঠের শ্মশানে যেতে অনেকেই ভয় পেতেন। বহু রহস্যময় তান্ত্রিকের ভিড় ছিল এখানে।

এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। মানুষের ভিড় ভয়কে এই জায়গা থেকে দূর করে দিয়েছে। প্রচুর হোটেল চারদিকে। একটু বিরক্তও লাগল। আমার মনে হল, আগেই হয়তো তারাপীঠ ভাল ছিল। একটু ভয় আর রহস্য না থাকলে কোনও স্থানই সেভাবে ব্যতিক্রম হয়ে ওঠে না। মানুষের ভিড় পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাকেই রহস্যশূন্য, নির্বিষ আর অসুন্দর করে দিচ্ছে! উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকি। এভাবেই এক সময় শরীরে ক্লান্তি আসে। মনে হয় একটু বিশ্রাম করা দরকার। তার পর ভাবব কী করব? বিশ্রাম করার জন্য একটি গাছতলা বেছে নিলাম। গাছের কাছে গিয়ে অপর পাশে এক সন্ন্যাসীকে দেখলাম চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে। ধ্যান করছেন নাকি? কাছে গিয়ে চমকে উঠি, আরে, কালকের সেই সন্ন্যাসী না? হ্যাঁ, তাই তো! আমি সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করলাম।

তিনি চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই আবার এসেছিস?"

আমি বলি, "বাবা, আপনাকে আমি অনুসরণ করে এখানে আসিনি।" একটু থেমে ফের বলি, "আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখি আমারই আরেক আমি আমার সামনে বসে। সে-ই আমাকে বলল তারাপীঠ আসতে। তাই আমি এখানে এসেছি। এখন আপনাকে দেখলাম।"

তিনি আমার দিকে গভীর চোখে তাকালেন।

বললাম, "চলে যখন এসেছি, তখন আমাকে আর ফিরিয়ে দেবেন না বাবা।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর বললেন, "ঠিক আছে। চলেই যখন এসেছিস, তখন কিছুদিন থাক আমার কাছে। দ্যাখ কেমন লাগে!"

সন্ন্যাসীর শেষ কথাটা ঠিক বুঝলাম না। জোর করে বোঝার চেষ্টাও করলাম না। তার পর মাথা তুলে মনে হল আমার চারদিকে সমুদ্রের জল। তার উথাল-পাথাল ঢেউ। তার রং নীল। গভীর নীল। কেমন যেন লাগছে আমার। আমি যেন ভেসে যাচ্ছি। নিজেকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। নিজের উপর যেন আজ আমার আর কোনও কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু, কেন এমন হচ্ছে? বুঝতে পারছি না।

ভাসতে ভাসতে আমি দেখতে পেলাম হঠাৎই সমুদ্রের জল ভেদ করে উঠে দাঁড়াল আমারই আরেক আমি। আমার দিকে দৃঢ় চোখে তাকাল। তার পর হাসতে শুরু করল। সে কী দুনিয়া কাঁপানো তার হাসি! আর উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ। তার মাঝে দুলতে দুলতে সে ক্রমশ সরে যাচ্ছে দূরে। অনেক দূরে।

মনে পড়ল আজই ভোরে সে বলেছিল, সমুদ্রের জল নীল!

কেন বলেছিল সে কথা?

না, বুঝতে পারলাম না এখনও।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু





ভেসে যাওয়ার আগে

অভিজিৎ সিরাজ

ফোনটা এল সন্ধে সাতটার পর। রিপোর্টিংয়ের টেবিল থেকে অশোক চেঁচিয়ে ডাকল— রূপম তোমার ফোন আছে। ওখানে দিচ্ছি না। কেটে যেতে পারে। তিনতলায় খবরের কাগজের এই দফতরে প্রতি মুহূর্তেই অজস্র টেলিফোনের ঝঙ্কার। তারই একটায় কেউ অপেক্ষা করে আছে।

এখানে টেলিফোন মানেই একেকটি আর্জি : দাদা, অমুক নিউজ কিংবা চিঠিটা একটু দেখবেন। অথবা তিন মাস হয়ে গেল, পত্রিকার রিভিউটা বেরল না... ইত্যাদি।

ডেস্কের টেবিল থেকে ঈষৎ বিরক্তি নিয়েই উঠে দাঁড়াল রূপম। এগিয়ে গেল পাশের দফতরে। সহকর্মী অশোক নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছে পুরসভার কোনও কেলেঙ্কারির কথা। কাছে যেতেই আঙুল তুলে একটা ফোন দেখিয়ে দিল।

উজ্জ্বল চেরি রঙের ফোনটা এবারে সরব হয়ে উঠেছে। বৃষ্টিভেজা নরম গলায় কেউ বলল : রূপমদা, কোনও কথা নয়। আগে শুনে নিন, তারপর। ঠিক আছে?

একটা নারীকণ্ঠ, তার পরিচয়, শরীরী অস্তিত্বের স্মৃতি— সবটুকু এক হয়ে গিয়ে কানে ও মগজে ধরা দিতে যেটুকু সময় লাগে, ঠিক

ততক্ষণই চুপ করে থাকল রূপম। তারপর মৃদুস্বরে বলল : ও তুমি! কেমন আছো? কোত্থেকে ফোন করছ?

জবাবে একটা অস্ফুট হাসির ঢেউ খেলে গেল। হাসির দমকটা চেপে ধরে সে বলল : রূপম দা, প্লিজ। আগে এটা শুনে নিন।

কানে আর একটু শক্ত করে ফোনটা চেপে ধরল রূপম। ওদিকে চায়ের কেটলি হাতে ঘরে ঢুকছে ক্যান্টিনের আব্দুল। রূপমের দিকে তাকাতেই সে হাত নেড়ে বারণ করে দিল। ততক্ষণে চারপাশে ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে : এই চা, এদিকে!

প্রচুর কোলাহল ও ব্যস্ততার মধ্যে দাঁড়িয়ে রূপম নিভৃতে যা শুনল, তাকে আর যাই হোক, সংলাপ বলা চলে না। সরল ভঙ্গিতে, আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে মেয়েটি একটি কবিতা শোনাল তাকে। স্পষ্টত বোঝা যায়, পদ্যটি টাটকা এবং তার উদ্দেশেই রচিত। গদ্যছন্দে, কয়েকটি সহজ চিত্রকল্পে একটি বিশেষ ঘটনা ও পটভূমির কথা বলতে চেয়েছে সে। যার সবটাই রূপমের পরিচিত।

শেষ লাইনটা পড়ার পর কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর আস্তে আস্তে শ্বাস ছেড়ে সে বলল : কেমন লাগল? মনে পড়ছে তো?... আবার চাপা হাসির শব্দ।

রূপমের চোখ ছিল ঘরের শেষ প্রান্তে, দেওয়ালের ধারে টেভির পর্দায়। কোনও ব্যাটসম্যানের বিপর্যয়ের দৃশ্য স্লো মোশনে দেখানো হচ্ছে। সেখানে স্পোর্টসের ছেলেদের ভিড়। পাশেই আর্ট রুমে কী নিয়ে জোর তর্কতর্কি চলছে। কেউ হাঁক পাড়ছে ডিটিপি-র কম্পোজ দফতরে, শঙ্করদা, আমার চার কলাম হেডিংটা কী হল? ক্যামেরার তরুণ রাতের ডিউটিতে হেঁটে যাচ্ছে করিডর ধরে। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে রূপমের দিকে হাত নেড়ে হেসে চলে গেল সে। আর্টিস্ট প্রসূন একটা বই তুলে ধরে ইশারায় কী যেন বলল। রূপম অন্যমনস্ক চোখে এসবই দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু তার কান ছিল সজাগ, ফোনের রিসিভারে।

এবার ঈষৎ ভারী স্বরে নারীকণ্ঠ বলল : কী হল রূপমদা? কিছু বলছেন না তো?

সদ্য একদিনের পরিচিত একটি তরুণীকে ঠিক কীভাবে নেওয়া উচিত, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না রূপম। মেয়েটি কি ছিটগ্রস্ত, নাকি বেপরোয়া? কিংবা প্রচণ্ড আবেগসর্বস্ব। বেশ বিপন্ন বোধ করছিল রূপম। যদিও এক ধরনের কৌতূহল তাকে আগ্রহী করে তুলেছিল। সে ছোট্ট করে বলল : তোমার কবিতা তোমার মতোই, বেশ সরল।

ও মা, তাই! খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ল সে : আসলে আমি কিন্তু ততটা সরল না, তবে আপনার কাছে কিছুটা সরল হতে চাইছি। যাতে আমাকে ঠিকঠাক বুঝতে পারেন।

রূপম মৃদু হেসে বলল : ঠিক আছে। তাহলে সরলভাবেই বল, কী বোঝাতে চাইছ?

তেমন কিছু না। আপনাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। ... এক নিঃশ্বাসে দু'টি বাক্য উচ্চারণ করে সে কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকল। তারপর আবার হাসি : কী হল, ঘাবড়ে গেলেন নাকি?

একটা অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে হল রূপমকে। তারপর সংযত ভঙ্গিতে বলল : তুমি কী একটা লেখা দিতে আসবে বলছিলে? এসো একদিন দেখা হয়ে যাবে।

সে তো রবিশঙ্করদার কাছে যাব। তার সঙ্গে আপনার কী?

ঠিক কথা। রূপম এবারে সরাসরি প্রশ্ন করল : কবে আসবে বলো, কখন?

মঙ্গলবার বিকেলে। অফিসেই থাকবেন তো? নাকি বাইরে, যদি বলেন... । মৃদু প্ররোচনার সুর তার গলায়।...

জলের ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছিল রূপম। গোড়ালি চেপে বসেছে বালির চরায়। সন্ধে নেমে আসছে দূরে কুয়াশার বুকে। ওপারে দিগন্ত বেলায় গাঢ় ধূসরতার আভা। কোথাও আলোর রেশ। এপারে গঞ্জের শহর। ঘাটে নৌকার ভিড়। মাটি আর জলের সোঁদা গন্ধ এসে ঝাপটা মারছিল চোখে মুখে। এখন সবকিছু নিয়ে ভাবার আগে, একটু থমকে দাঁড়ানো দরকার।...

যেন সত্যিই নদীর সামনে এসে দাঁড়াল রূপম। সেই গন্ধের স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অন্য কোথাও।

সম্বিত ফিরল বার্তা সম্পাদকের ডাকে—রূপম কোথায় গেল? এই কপিগুলি আগে ছাড়ো। দরকার হলে ফের লিখিয়ে নিতে পারো। পেজ থ্রির দুটো ছবি দিলাম।

রূপম হাত নেড়ে বলল : আসছি। তারপর ফোনে গলাটা ঈষৎ নামিয়ে বলল : এই রাখছি কেমন? তুমি এসো তারপর কথা হবে। বড্ড ব্যস্ত আজ। ভাল থেকো... ।

হগ মার্কেটের পুরনো ঘড়ির টাওয়ারকে বাঁ হাতে রেখে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সংবাদপত্রের একটি গাড়ি। মির্জা গালিব স্ট্রিটে বাঁক নিতেই স্টিয়ারিং থেকে মুখ তুলে শম্ভু বলল : রূপমদা, তেল নিতে হবে। ভোরে ডিউটি আছে, একদম ভুলে গেছি।

রূপম ঘড়ি দেখল, রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। এখন পাম্প খোলা থাকে? প্রশ্ন করল সে।

পার্ক স্ট্রিটে একটা আছে। ছোট্ট জবাব দিয়ে শম্ভু গতি বাড়াল গাড়ির।

তেল নিয়ে গাড়ি লাউডন স্ট্রিটে ঢুকতেই আবার ঘড়ি দেখল রূপম। প্রায় পৌনে একটা। কসবা পৌঁছতে আরও দশ-বারো মিনিট। তার মানে একটা। বিছানায় যেতে দেড়টা। তারপর ঘুমের জন্য প্রতীক্ষা। পরদিন সাতসকালে উঠে মেয়ের জন্য তোড়জোড়। সদ্য তিন পেরোনো একটা বাচ্চাকে স্কুলের জন্য তৈরি করার ঝঞ্ঝাট তাকেই পোয়াতে হয়। তারপর ফের বারোটায় তাকে আনতে যাওয়া। বাপ-মেয়ে ঘরে ঢোকার পর ফেরার পালা নন্দিতার। তারও স্কুল সকালে। মাঝে মাঝে নন্দিতা বড্ড দেরি করে। সবটাই কি যাতায়াতের গোলাযোগ? হঠাৎ কপালে ভাঁজ দেখা দিল রূপমের। কী জানি কোথায় কী ঘটে। কিচ্ছু বলা যায় না।

এই রে, মাঝরাতে আচমকা সন্দেহবাতিক হয়ে উঠল কেন সে? রূপম নিজেই কেমন অস্বস্তিতে পড়ে গেল। স্ত্রীকে সেভাবে কখনওই সন্দেহ করেনি সে। আসলে তাদের মাঝে কোনও আড়াল-আবডাল অবশিষ্ট নেই। রূপম তার যাবতীয় দুর্বলতা অকপটে ঢেলে দেয় স্ত্রীর কাছে। এনিয়ে প্রচুর সঙ্কট, ভুল বোঝাবুঝি, অশান্তি কম হয়নি। কিন্তু রূপম এরকমই। নিজের সবকিছুরই ভাগ দিতে চায় সে নন্দিতাকে। যেমন বিয়ের আগে দিত। এত বছর বাদেও সে বুঝতে চায় না, জীবনের সব আবেগ-অনুভূতির বা অভিজ্ঞতার ভাগ স্ত্রীকে দেওয়া যায় না। তাতে শৃঙ্খলা ভাঙে, নৈরাজ্য বাড়ে। কিন্তু নন্দিতা, সে-ও কি সব দিতে চায়? কী জানি। রূপমের ধারণা, তাদের মধ্যে আড়াল-আবডাল টুকু নেই বলেই হয়তো দিনগুলি রাতগুলি কেটে যাচ্ছে নিছকই পর্যায়ক্রমে। আর পেশাগত কারণেই সে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিজের হাতে খুন করে যাচ্ছে এক-একটি চমৎকার বিকেল, সন্ধে ও রাত। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

রূপমদা, সই করে দিন। শম্ভুর ডাকে হুঁশ ফিরল রূপমের। সিটের পিছনে মাথা হেলিয়ে কেমন ঘোরের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল সে। খেয়াল নেই, কখন সুইনহো লেনে গলির মুখে পৌঁছে গেছে। মাথার ওপর আলোটা চোখে লাগছিল তার। লগ বুকটা এগিয়ে দিতেই রূপম বলল : থাক, কাল করে দেব।

ক্লান্ত শরীরে কাঁধের ব্যাগটা টেনে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল সে।



ঠেলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে অভ্যস্ত গলায় বলল : আসি।

বেল বাজিয়ে গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল রূপম। তারপর গেট বন্ধ করে বারান্দায় গ্রিলের সামনে পৌঁছনোর আগেই ভেতরে পায়ের শব্দ টের পেল সে। নন্দিতা কি ঘুমোয়নি?

রোজ রাতে প্রায় দু'চোখ বন্ধ করেই দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল নন্দিতা। আজ তার চোহারা অন্যরকম। রাতের পোশাকে শিথিলতার চিহ্ন নেই। চোখেমুখে বাসি ঘুমের জড়তাও ছাপ ফেলেনি। তার মানে রাত জেগে খাতা দেখছিল, বা অন্য কোনও কাজ।

রূপম নিমেষে খুশি হয়ে উঠল। যাক, অন্তত নির্বাক অভিনেতার মতো এখনই বিছানায় যেতে হবে না। কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে। রাতের এই মুহূর্তটুকু তার কাছে বড় অসহ্য লাগে। তখন পেশাটাকেও বিরক্তিকর ঠেকে। যেন এক অলীক প্রভুর সেবায় সে ক্রীতদাসের মতো ক্রমশ নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে। অথচ এমন পেশাকে ভালবেসেই গ্রহণ করেছিল সে। নন্দিতার কাছেও প্রিয় হয়ে উঠেছিল তার স্বামীর চাকরিজীবন। কিন্তু দীর্ঘ দশ বছর বাদে কেমন ক্লান্তিকর মনে হয় সবকিছু। আর পাঁচটা পেশার সঙ্গে তফাতই বা কোথায়?

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে গিয়ে ফের তেতো হয়ে উঠল রূপমের জিভ। নন্দিতার দেওয়া জলের গ্লাস টেবিলে সরিয়ে রাখল সে। তারপর স্ত্রীর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ডিভানের ওপর। ফিসফিস করে বলল : শোনো একটু বসো আমার কাছে।

নন্দিতার শরীরী আকর্ষণ আজও ফুরোয়নি তার স্বামীর কাছে। সেকথা জেনেই ঈষৎ বিব্রত হচ্ছিল সে। কাল ভোরবেলা উঠতে হবে। তাই প্রথমটা এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রূপমের চোখমুখ দেখে সে অন্যকিছু টের পাচ্ছিল। তাকে কাছে টেনে নিয়ে স্নেহের সুরে বলল : কী গো, অমন করছ কেন? কিছু হয়েছে অফিসে?

নন্দিতার উৎকণ্ঠা গায়েই মাখল না রূপম। ডিভানের ওপর দু'পা ছড়িয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে সে। তখনও হাত ছাড়েনি স্ত্রীর। প্রায় দু'চোখ বুজে ফিসফিস করে নন্দিতার উদ্দেশে বলল : তোমাকে সেদিন ইছামতীর গল্প বলেছিলাম মনে আছে? সেই যে একটা অনুষ্ঠানে গেলাম। নদীর ধারে ছোট একটা শহর। সবুজে ঢাকা, কদমের গন্ধ। নদীর ওপর ঘন কুয়াশা। তারপর সন্ধে নামল। নদীর ঘাটে গোড়ালি ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা মেয়ে। আমি তার হাত ধরে জলে নেমে গেলাম। তোমাকে সব কথা বলা হয়নি। আজ একটা ভাল করে শুনবে?

মাঝরাতে কীসব পাগলামি শুরু করলে বলোতো? এক ঝটকায় রূপমের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল নন্দিতা। ওসব ছুটির দিনে বলো। পাশের ঘরে মেয়েটা একা আছে, সে খেয়াল আছে? আমাকে ভোরবেলা উঠতে হবে। তোমার আবার কী? বলতে বলতে দ্রুত পায়ে বিছানায় চলে যায় সে।

রূপম কেমন ঘোরের মধ্যে টলতে টলতে এগিয়ে যায় লেখার টেবিলের দিকে। একটা প্যাড টেনে নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে সে। কলম দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে থাকে। বহুদিন কিছু লেখেনি, অনেক চেষ্টাতেও একটা লাইন এল না তার কলমে। অগত্যা উদ্ধৃতিই ভরসা। এই মুহূর্তে দুটো লাইন ফুটে উঠল তার কলমের রেখায়।

এক গণ্ডুষে গোটা দামালপনা হাঁ করে গিলবে/এমন একটি নদী চাই।

শ্রাবণের সন্ধে ক্রমশ ভারী হয়ে নেমে আসছিল সীমান্তের এই ছোট্ট শহরে। দোতলার ছাদ থেকে। চারপাশে যত দূর চোখ যায় শুধুই সবুজ। একপাশে বিশাল কদম গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে ইছামতীর বাঁক। নদীর ওপারে কুয়াশা জমেছে। জলের উপরে সারি সারি নৌকোয় আলোর বিন্দু। সন্ধের মফস্বল শহরে বাস, লরি, রিকশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের হাঁকডাক, দোকানপাটের ভিড়, আড্ডা-সবই মুগ্ধ চোখে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল রূপম। এমন সব আচেনা সন্ধে বড় স্মৃতিময় মনে হয় তার কাছে। অন্তত রোজকার দমবন্ধ করা সন্ধেগুলির কাছে এ এক মুক্তির স্বাদ। সহকর্মী সুধীরদার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল সে। বস্তুত এ ধরনের সভা-সমিতিতে যেতে সে কখনই অভ্যস্ত নয়। ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকলেই তার স্বস্তি। অথচ আজকের আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে দু'-চার কথা বলতেই হয়েছে তাকে। আসলে এখানে তাকে টেনে আনার জন্য একটা অন্যরকম টোপ দিয়েছিল সুধীরদা। রূপমের ছবি তোলার বাতিক জেনেই ইছামতীর ধারে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবটা রেখেছিলেন উদ্যোক্তারা। সে টোপ গিলতে দেরি হয়নি রূপমের।

ইছামতী দেখতে যাবেন না?

আচমকা নারীকণ্ঠে এমন একটি প্রস্তাবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রূপম। ছিপছিপে চেহারার শ্যামলা এক তরুণী। চোখে মুখে প্রচণ্ড ঔজ্জ্বল্য ভরিয়ে সে চেয়ে আছে রূপমের দিকে। আশ্চর্য স্থির তার চাউনি, বেশ খানিকটা মুগ্ধতা মিশে আছে সেখানে। এ মেয়ে প্রচুর হাসতে জানে, স্বভাবে নিশ্চিত নির্মল। ভাবল রূপম। কিন্তু মেয়েটি কে? অন্তত উদ্যোক্তাদের কেউ নয়। কলকাতা থেকে একই গাড়িতে এসেছে তারা। পথে কয়েকবার চোখাচুখি হয়েছে। কিন্তু কথা হয়নি। লেখার বাতিক আছে সেটা জেনেছে এখানে এসে। অনুষ্ঠানে তাকে কবিতা পড়তে ডাকা হয়েছিল। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল রূপম।

সুধীরদা বলেছিল, আপনি নাকি ইছামতী দেখতেই এসেছেন। কিন্তু এই আলোতে ছবি হবে? ছবি না হোক, চলুন ঘুরে আসি। জল দেখতে আমার দারুণ লাগে। যাবেন?... এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে মেয়েটি একটু হাঁফ নেয়। তারপর কোমরে আঁচল জড়িয়ে সামনে এগিয়ে আসে গলার স্বর নামিয়ে বলে : এভাবে যেচে আলাপ করছি বলে কিছু মনে করলেন না তো?

প্রবল সঙ্কোচে গুটিয়ে যায় রূপম। বলে : না না, মনে করব কেন? আলাপ তো এভাবেই হয়। কেউ একজন এগোলেই হল।...

ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে রূপমদা বলেই ডাকব। হাসিমুখে মেয়েটি বলে।

ততক্ষণে রূপম খানিকটা সঙ্কোচ কাটিয়ে তুলেছে। সে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে : কিন্তু তোমার নাম তো জানি না।

আমার একটা নাম নিশ্চয় আছে। কিন্তু সেটা বিচ্ছিরি। আপনার ভাল লাগবে না। ঠোঁট উলটে বলে সে।

তাহলে তোমার একটা সুন্দর নাম চাই, তাই তো? বেশ আমিই না হয় ঠিক করে দেব। রূপম খানিকটা সাহসী হওয়ার চেষ্টা করে।

আপনি দেবেন? মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে রূপমের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর উদাসীন কণ্ঠে স্বগতোক্তির ঢঙে বলে যায় : আপনি সুন্দর কথা বলেন। বেশ গুছিয়ে। ওখানে সবাই কত কথা বলল। মাইক পেলে কেউ ছাড়তেই চায় না। অথচ আমি ঘড়ি দেখেছি, মাত্র সাত মিনিট বলেছেন আপনি। সবটা হয়তো মনে নেই। কিন্তু বিষয়টা বুঝতে কষ্ট হয়নি। একদম জলের মতো সহজ।...

এভাবেই দিনেরবেলায় আঁধার ঘনিয়ে আসার আগে অতিদ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তারা। তারপর এক পা দু'পা করে কখন যে নদীর পাড়ে পৌঁছে গিয়েছিল, তার খেয়াল নেই। সম্বিত ফিরল যখন গোড়ালি ডুবে যাচ্ছিল বালির চরায়। জলের স্রোত এসে ভিজিয়ে দিচ্ছিল পায়ের পাতা। অন্ধকার নদীর ধারে একদিকটা প্রায় নির্জন। দূরে নৌকোর সারি। সেখানে নিভুনিভু হলুদ বাতি। ওপারে ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে গাছপালা, ঘরবাড়ি। রূপমের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিল মেয়েটি।

ইছামতী। আমি তোমার নাম দিলাম ইছামতী। ফিসফিস করে বলল রূপম। তারপর সোজাসুজি তাকাল তার চোখের দিকে। এই আঁধারেও তার চোখের মণি বড় উজ্জ্বল। যেন শ্রাবণের মেঘে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎ। সেখানে স্ফটিকের মতো জমে আছে অশ্রু। সেদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল রূপম।

আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে রূপমদা। ঠোঁট কামড়ে ধরে কোনওক্রমে কথাটা উচ্চারণ করল সে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দতা কাটিয়ে উঠে আবার ঘন আবেগে ডুবে গেল তার গলা : আপনি ইছামতী দেখতে এসেছিলেন রূপমদা। আমি আপনাকে ওপারে নিয়ে যাব। এপারে কিছু নেই। আমার সব দেখা। বাজে, একঘেয়ে। যাবেন ওপারে? আমি আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব! খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ল সে।...

না, রূপমের ওপারে আর যাওয়া হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে উদ্যোক্তারা এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের চায়ের আসরে। তারপর ফেরার পথে তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততার মাঝে মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি রূপমের। অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল সে। নন্দিতা যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছিল। ইছামতীর বৃত্তান্ত শোনার ধৈর্য বা সময় কোনওটাই তার ছিল না। সারাদিন সকাল থেকে আবার প্রাত্যহিক আবর্তে ঢুকে পড়েছিল সে। ইছামতীর কথা সে ভুলতেই বসেছিল। তারই মধ্যে হঠাৎ টেলিফোনে এই বিপর্যয়। অতঃপর প্রতীক্ষা মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত।

সকালে ঘুম চোখে খবরের কাগজে চোখ রাখতেই রীতিমতো চমকে উঠল রূপম। অত বড় একটা ঘটনা তাদের কাগজে প্রায় নেই বললেই চলে। কাগুজে ভাষায়, একটা মারাত্মক 'মিস' করে ফেলেছে তারা। গতকাল রাতে খবরটা কোনওক্রমে ছোট্ট করে ভেতরের পাতায় সে নিজেই দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। টেলিপ্রিন্টারে গোলযোগ হেতু বা অন্য কোনও কারণে বিশদ খবর সে পায়নি। ফলে বার্তা সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী সাধ্যমতো গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেসব যুক্তি কতদূর কর্তৃপক্ষ মেনে নেবেন ভেবে উদ্বিগ্ন হল রূপম। সাত তাড়াতাড়ি অফিসে দৌড়ল সে।

নিজের টেবিলে বসতে না বসতেই সম্পাদক ডেকে পাঠালেন রূপমকে। তারপর একটি চিঠি তুলে দিলেন তার হাতে। চিঠি খুলে পড়তেই শক্ত হয়ে উঠল রূপমের চোয়াল। যাবতীয় ব্যর্থতার দায় তার কাঁধেই তুলে দিয়েছেন সম্পাদক। সেই সঙ্গে ভর্ৎসনা ও হুমকি দেওয়া হয়েছে তাকে।

রূপম ঠিক কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছিল না। সে আমতা আমতা করে বলল : এভাবে চিঠি দেওয়ার দরকার ছিল কি? তার আগে কারণটা অন্তত জানার চেষ্টা করলেন না?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব পেল রূপম। তুমি লিখিতভাবে সব জানাও, তারপর ব্যবস্থা নেব।

ফ্যাকাশে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রূপম। গত দশ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানে সে নিজেকে প্রায় বিলীন করে দিয়েছে। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার ডেটলাইন থেকে শুরু করে শেষ পৃষ্ঠার প্রিন্টার্স লাইন পর্যন্ত সবটাই তাকে প্রতি রাতে সতর্ক চোখে দিতে হয়। কাগজের নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো দায়িত্ববান কর্মী সে নয়। কিন্তু তার শ্রমের কি কোনও মূল্য নেই? বড্ড অসহায় বোধ করল সে। টেবিলে বসে একটা দায়সারা জবাব লিখে পাঠিয়ে দিল সে। তারপর উঠে গেল ছাদের ওপর। ধর্মতলার এই ঘিঞ্জি পাড়ায় একমাত্র মরূদ্যান এটাই। আকাশে তখনও সেই শ্রাবণের কালো মেঘ।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ মঙ্গলবার। দ্রুত নিচে নেমে এল সে। ঘরে ঢুকতেই সহকর্মী প্রদীপ তার হাতে একটা খাম নিয়ে বলল : একটু আগে একজন মহিলা তোমায় এটা দিতে বলে গেছেন।

রূপম উত্তেজিত স্বরে বলল : সে কি, তুমি বসতে বললে না কেন?

না না, উনি নিজেই বললেন, দেখা করার দরকার নেই। এটা পৌঁছে দিলেই হবে। প্রদীপ জবাব দিল।

রূপম খামটা প্রথমে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর কী ভেবে আবার বের করে পকেটে পুরে বলল : প্রদীপ, আমি একটু বেরোচ্ছি। তুমি দেখো।

অফিস থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হেঁটে যাচ্ছিল রূপম। এসপ্ল্যানেড, রাজভবন ছাড়িয়ে এক সময়ে পৌঁছে গেল গঙ্গার ধারে। স্নানের ঘাটে নেমে নির্জন একটি সিঁড়িতে বসল সে। তারপর ধীরে সুস্থে খামটা ছিঁড়ে ফেলল।

খামটা ছিঁড়তেই মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারল। একগুচ্ছ কামিনী ফুল, সঙ্গে একটা চিরকুট। তাতে লেখা, রূপমদা, আপনাকে ভাসাতে চাই না। ভাল থাকবেন।— আপনার ইছামতী।

রূপম চিরকুটটা হাতে ধরে বহুক্ষণ বসে রইল। ততক্ষণে সন্ধে নেমেছে। দূরে জেটির আলো। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা শান্ত হয়ে উঠল সে। তার ঠোঁটের কোণে নির্লিপ্ত হাসি খেলে গেল। এবারে উঠে দাঁড়াল সে। নেমে গেল জলের ধারে। ফুলগুলি ভাসিয়ে দিল। তারপর চিরকুটটাও ছুড়ে দিল নদীর বুকে।

দ্রুত পায়ে রূপম উঠে এল উপরে। পথে ধাবমান মিনি দেখে চিৎকার করে বলল : ভাই ধর্মতলা? ছুটে গিয়ে একলাফে পাদানিতে পা রাখল সে। নদীর তীর থেকে সে এখনই পালাতে চায়। দূরে কোথাও, সমতলে। যেখানে শক্ত মাটি আছে দাঁড়াবার।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু

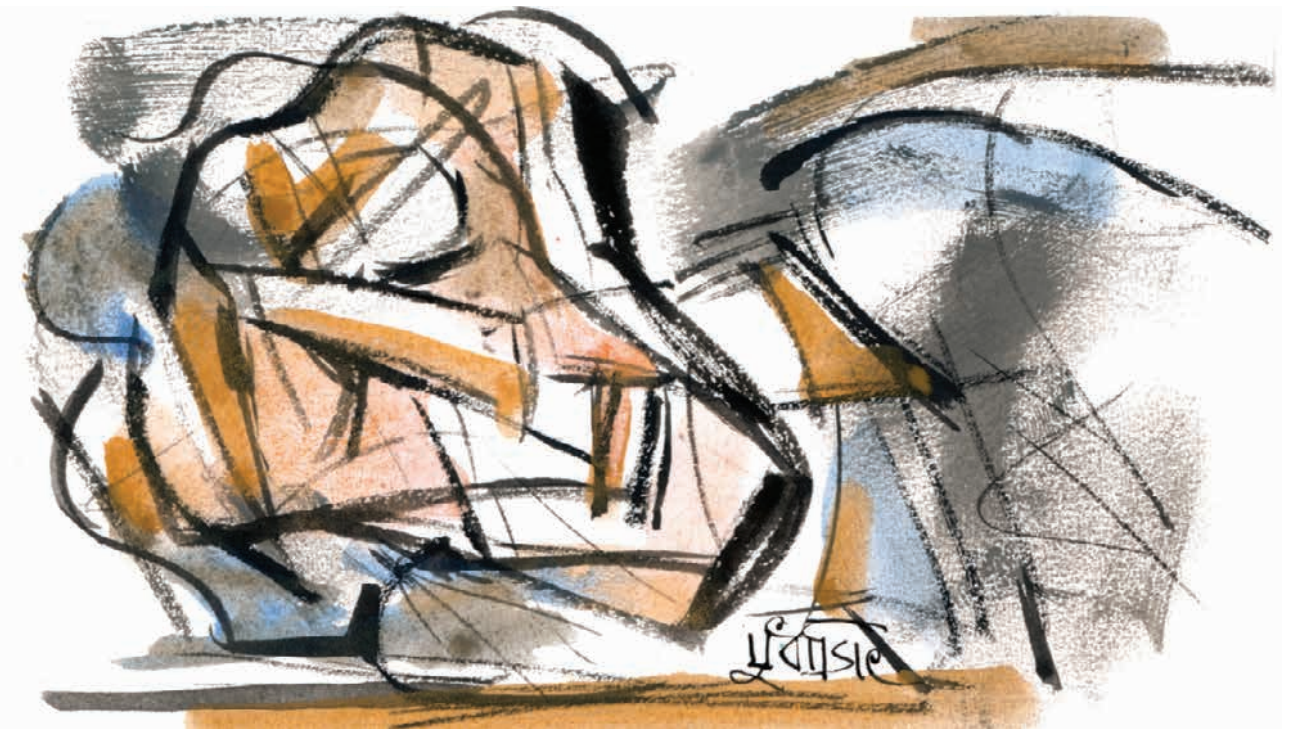

এক মরা মানুষের গল্প

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়

আমি বরাবরই যাত্রা, থিয়েটারে মৃত সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করে আসছি। অভিনয় করতে করতে আমার উপর মৃত সৈনিকের বেশ একটা ছাপ্পাই পড়ে গেছে। এর জন্য পথেঘাটে সর্বত্র আমাকে যথেষ্ট ব্যঙ্গবিদ্রুপেরও সম্মুখীন হতে হয়।

রকের ভাষায় যাকে বলে প্যাঁক। লোকে দেখলেই বলে, 'ওই দ্যাখ, ব্যাটা মৃত সৈনিক আসছে। ব্লাডি ডেড সোলজার।'

শুরুটা কী করে হল বলি। তখন আমার বয়স সতেরো, আঠারো। পাড়ায় দুর্গাপুজো উপলক্ষে পুজোমণ্ডপে যাত্রা হবে। প্রতিবারই হয়। অন্যান্যবার বাইরে থেকে দল এনে করা হয়। সেবার ঠিক হল পাড়ার ছেলে-মেয়েরাই করবে। পালার নাম 'মেবার পতন'। ঐতিহাসিক পালা। আর যেহেতু ঐতিহাসিক পালা অতএব লোক লাগবে প্রচুর। ঢ্যাঁড়া পেটা হল। "যারা যারা যাত্রায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক তারা তারা দলে দলে নাম লেখান।" ব্যস! হইহই পড়ে গেল। আমাদের ওই ছোট্ট মফস্বল শহরের ততোধিক ছোট্ট পাড়ায় প্রায় সব ছেলেমেয়েই এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে উঠল। বিশেষ করে ছেলেরা। স্টার হতে কে না চায়! লম্বা লাইন পড়ল নাম লেখানোর জন্য।

যারা দেখতে সুন্দর মানে শরীর, স্বাস্থ্য ভাল, বেশ লম্বা, চওড়া। তার উপর সুন্দর মুখশ্রী তারা প্রথমেই ভাল ভাল চরিত্রগুলো সব পেয়ে গেল। যেমন কেউ হল আকবর, কেউ রানাপ্রতাপ, কেউবা আবার মানসিংহ সাজল তো, কেউ বীরবল ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমার মতো পড়ে থাকা খ্যাংরাদের কপালে জুটল সৈনিকের চরিত্র। মঞ্চে ভিড় বাড়ানোর জন্য টিনের বা কাঠের তরবারি হাতে আমাদের বিস্তর লম্ফঝম্ফ করতে হবে। মন একটু খারাপ হলেও রাজি না হয়েও কোনও উপায় ছিল না। বন্ধু-বান্ধবরা যেখানে রংবাহারি মেক-আপ করে, ঝকমকে পোশাক পরে, কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে, মঞ্চ দাপিয়ে পাড়ার পাঁচজনের বাহবা নেবে আমি সেখানে দর্শকাসনে বসে থাকব তা কী করে হয়? অতএব কিছু না হোক পাতি সৈনিকই সই। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। তাছাড়া সৈনিকও তো একেবারে ফেলনা নয়। আসল যুদ্ধটা তো তারাই করে। রাজা বা সেনাপতির ভূমিকা আর কতটুকু?

এছাড়া আর একটা কারণও ছিল। ক'টা দিন অন্তত এই রিহার্সালকে উপলক্ষ করে বন্ধুবান্ধব মিলে কয়েক ঘণ্টা দারুণ হইচই তো করা যাবে।

রিহার্সাল দিতে গিয়ে মনে আর এক পোঁচ বিষণ্ণতা লাগল। দেখলাম আমরা যারা সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করছিলাম তাদের কারওরই কোনও সংলাপ নেই। একটা সামান্য শব্দও উচ্চারিত হবে না আমাদের মুখ দিয়ে। আমাদের শুধু যুদ্ধ করে যেতে হবে মঞ্চের এ প্রান্ত, ও প্রান্ত জুড়ে।

সিনেমায় এক্সট্রার ভূমিকায় অভিনয় করা নেপোদা ছিল আমাদের পরিচালক বা নির্দেশক। নেপোদার তত্ত্বাবধানেই চলত আমাদের রিহার্সাল। সিনেমায় এক্সট্রার ভূমিকায় অভিনয় করলেও নেপোদাকে ফালতু ভাবার কোনও কারণ কিন্তু ছিল না। পাড়াতে বেশ র‍্যালা নিয়ে ঘুরত। পাড়ার পাঁচজনেও বেশ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত তাকে। আরে যতই যাই হোক বেশ কয়েকবার ক্যামেরার সামনে তো দাঁড়িয়েছে। অনেক নামীদামি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কাছ থেকে তো দেখেছে। সেটাই বা কম কী! এই নেপোদাই আমাকে তৃতীয় ঘা-টা দিল। বলল, 'শুদ্ধ, শোন, তোর যা শরীর, স্বাস্থ্য তাতে স্টেজে তোর বেশিক্ষণ দৌড়াদৌড়ি না করাই ভাল। দেখতে বাজে লাগবে। তুই বরং মৃত সৈনিকের পার্ট করবি। যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে একজন তোর বুকে তরবারি দিয়ে একটা খোঁচা দিয়ে দেবে আর তুইও সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবি। মানে সত্যি সত্যি মরা নয়। হাত-পা ছড়িয়ে স্টেজের উপর পড়ে থাকবি।

আমি নেপোদাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, আমাকে দেখতে যতই খ্যাংরাকাঠির মতো হোক আমি কিন্তু আদৌ তেমন দুর্বল নই। সত্যিকারের যুদ্ধ না হোক স্টেজে উঠে মিথ্যেকারের যুদ্ধ এক আধ ঘণ্টা চালানোর মতো ক্ষমতা আমার আছে।

কিন্তু নেপোদা শুনলে তো আমার কথা। পাত্তাই দিল না আমাকে। অতএব রিহার্সালের দ্বিতীয়দিন থেকেই আমি মৃত সৈনিক। যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে আমার বুকে টিনের তরবারি দিয়ে একটা খোঁচা দিয়ে দিত আর আমিও নেপোদার কথামতো সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের উপর হাত-পা ছড়িয়ে চিৎপাত। নেপোদা চিৎকার করে বলত, 'শুদ্ধ, সাবধান নড়বি না। বুকটা যেন ওঠানামা না করে। মনে রাখবি তুই একজন মৃত সৈনিক।'

আমি চোখ বুজে দমবন্ধ করে পড়ে থাকতাম। কখনও দশ মিনিট, কখনও পনেরো মিনিট, কখনও বা আবার পাক্কা এক ঘণ্টা। অর্থাৎ যতক্ষণ যুদ্ধের দৃশ্যের রিহার্সাল চলত ততক্ষণ। আমার পাশ দিয়ে চলত অজস্র দৌড়ঝাঁপ, অগুনতি তরবারির ঝনঝনানি, অবিরাম রণহুংকার। আর আমি সব কিছুকে উপেক্ষা করে পড়ে থাকতাম স্থির হয়ে। ভাল অভিনয় আমাকে করতেই হবে।

টানা এক মাস রিহার্সাল চলার পর 'মেবার পতন' পালা অভিনীত হল। অভিনয় শেষে উচ্চ থেকে অল্পবিস্তর প্রশংসা সকলের ভাগ্যেই জুটল। পরিচালক নেপোদা থেকে আরম্ভ করে একেবারে শিশু অভিনেতাটি পর্যন্ত বঞ্চিত হল না এ পিঠ চাপড়ানি থেকে। বাদ গেলাম শুধু আমি। একটিবারের জন্যও কেউ আমার নাম করল না। কেউ বুঝল না অত দৌড়ঝাঁপের মধ্যে ওইভাবে স্থির হয়ে মঞ্চে পড়ে থাকা কী ভয়ংকর কষ্টকর। আর কিছু না হোক যে কেউ যে কোনও সময় আমায় মাড়িয়ে ফেলতে পারত। এর জন্য আমার সামান্য একটা অভিনন্দন অন্তত পাওনা ছিল।

প্রশংসা না জুটলেও টিটকিরি কিন্তু ঠিকই জুটল।

ওই যে লোকে দেখতে পেলে বলতে শুরু করল, 'ওই দ্যাখ মৃত সৈনিক আসছে। ওফ্ গুরু, তুমি কিন্তু মৃত সৈনিকের পার্টটা হে-ভি-ই করেছ। দেখে বোঝাই যাচ্ছিল না জ্যান্ত না মরা।'

এক কথায় নেপোদা দই-এর বদলে সারা জীবনের মতো আমার অন্য কিছু মেরে দিল।

আমি মুখ বুজে হজম করে যেতাম সমস্ত টিটকিরি, সমস্ত অপমান। ভাবতাম ঠিক আছে, সত্যি যদি কোনওদিন সুযোগ পাই তা হলে দেখিয়ে দেব ভাল অভিনয় আমিও করতে পারি। জ্যান্ত মানুষের চরিত্রেও।

সেবার যাত্রাপালা শেষ হওয়ার পরেও বেশ কিছুদিন চলল তার জাবর কাটা। পরস্পরের পিঠ চাপড়ানি, পরস্পরের পেছনে লাগা। তারপর এক সময় সব ঠান্ডাও হয়ে গেল। আমার মাথা থেকে কিন্তু ভূতটা গেল না। মাথার মধ্যে কেবলই ঘুরতে লাগল, এবার যেমন করেই হোক জ্যান্ত মানুষের চরিত্রে অভিনয় করতেই হবে। জীবনে অন্তত একবার। এমনই সময় পাশের পাড়ায় নাটকে আমার অভিনয়ের ডাক পড়ল। উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু কপাল এমনি যে এও সেই মরা মানুষের চরিত্রেই। মৃত সৈনিক না! তবে সারাক্ষণই মড়া সেজে মঞ্চে শুয়ে থাকতে হবে। আমি গাঁইগুঁই করাতে আমার বন্ধু দিলু বলল, 'আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ছোটখাটো রোল করতে করতেই তো লোকে উপরে ওঠে নাকি? একদিনে কে আর কবে নাম করেছে বল। তা ছাড়া প্রধান অতিথি হয়ে আসছেন ফিল্ম ডিরেক্টর রঞ্জিত মিত্র। ওঁর নজরে যদি একবার পড়ে যাস তা হলে চাই কী ফিল্মে চান্সও পেয়ে যেতে পারিস।' এইটুকু শুনেই আমার বুকের মধ্যে ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। মরা মানুষের অভিনয় করতে করতে ফিল্মে চান্স! ভাবা যায় না।

যাই হোক, মঞ্চে আমি সারাক্ষণ একটা খাটিয়ায় চড়ে সাদা চাদর গায়ে চাপিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলাম। নট নড়নচড়ন। সংলাপের তো প্রশ্নই আসে না। এরজন্য রিহার্সালও খুব বেশি দিতে হয়নি। দু'চারদিন দিয়েই হয়ে গেছিল। ফলে মঞ্চে যে কে কী অভিনয় করল, কেমন করল কিছু জানতেই পারলাম না। আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরছে।

অভিনয় শেষে আমি দিলুকে ধরলাম রঞ্জিত মিত্রর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। দিলু আমাকে নিয়ে গেল রঞ্জিত মিত্রর কাছে। বলল, 'রঞ্জিতদা, এই সেই ডেডবডি।'

দিলুর কথাটা আমার বুকে বড় বিঁধল। রঞ্জিত মিত্র অবশ্য আমার সঙ্গে ভালভাবেই কথা বললেন। বললেন, 'তুমি ভালই করেছ। ওভাবে অতক্ষণ মড়া সেজে পড়ে থাকা বেশ কঠিন। যে কোনও সময় অন্যমনস্কতায় বা অসাবধানে শরীর নড়ে উঠতেই পারে।'

রঞ্জিত মিত্রর কথা শুনে আমার উত্তেজনা বেড়ে গেল। মনে মনে বেশ গর্ব বোধ করলাম। ভাবলাম উনি নিজে ভাল পরিচালক



তো তাই প্রকৃত ভাল অভিনয়ের মর্ম বোঝেন। বোঝেন কোন চরিত্রে অভিনয় কতটা কঠিন। আমি আপ্লুত কণ্ঠে ওঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

দিলু বলল, 'রঞ্জিতদা, ওর সিনেমায় নামার খুব শখ।'

রঞ্জিত মিত্র আমার পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন, 'সিনেমায় নামা কি অতই সোজা? আগে আরও পাঁচ জায়গায় অভিনয় করো। ভাল করে অভিনয় শেখো। তারপর দেখা যাবে।'

তবে এই ঘটনার পর দিলুর দৌলতে আমার নাম বেশ ছড়িয়ে পড়ল। দিলু প্রচার করে দিল, রঞ্জিত মিত্র আমার মৃত মানুষের চরিত্রে অভিনয়ের প্রশংসা করে গেছেন।

এরপর অনেক জায়গায় আমি অভিনয়ের ডাক পেলাম। তবে সবই হয় মৃত সৈনিক নয়তো নেহাতই কোনও মৃত মানুষ। যাত্রা, থিয়েটারে কোনও মৃত মানুষের চরিত্র থাকলে লোকে আমাকেই খুঁজতে শুরু করল। এই মড়া সাজতে সাজতে আমি মড়া সাজায় বেশ দক্ষ হয়ে উঠলাম। কখনও কখনও নিজেকে মড়াই মনে হত। ভাবলাম, এও ভাল। জীবনে কোনও কিছুই ফেলা যায় না! এও হয়তো একদিন কোনও না কোনওভাবে কাজে লাগবে। সত্যিই কাজে লাগল একদিন।

এক কাবুলিওয়ালার কাছে কিছু টাকা ধার করেছিলাম। শোধ করতে পারছিলাম না। সুদ, আসল মিলিয়ে পরিমাণটা ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠছিল। রাস্তাঘাটে দেখতে পেলেই ব্যাটা তাড়া করত। আমিও যতটা সম্ভব পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। একদিন লোকটা বাড়িতে এসে হামলা চালাল, 'আসল নেহি মাঙতা। সুদ মাঙতা হ্যায়। সুদ।'

সেদিন আর আমি পালাতে পারলাম না। দশাসই কাবুলিটা একেবারে নাছোড়বান্দা। টাকা না নিয়ে ও যাবেই না। আর আমিও দেব না। প্রথমে তর্কাতর্কি থেকে পরে শুরু হল ধস্তাধস্তি। ও আমার জামার কলার চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। আমার ছোট বোন বিন্তিকে ইশারা করে দিয়ে হঠাৎই দুম করে মড়া সেজে গেলাম। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝের উপর একদম চিৎপাত। বিন্তি আর্তনাদ করে উঠল, 'ও দাদা, কী হল গো!'

আমি সাড়া দিলাম না। আমার বুকের ওঠানামা ছিল না। বন্ধ ছিল নিঃশ্বাস, প্রশ্বাসও। আমাকে পুরোপুরি মরা মানুষই মনে হচ্ছিল। বিন্তি গলা ছেড়ে মরাকান্না শুরু করল, 'ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ দেখে যাও। এই হতচ্ছাড়া কাবুলিটা আমার দাদাকে মেরে ফেলল।'

বিন্তির কান্নার আওয়াজে পাড়ার লোকজন সব জড়ো হতে শুরু করল। প্রথমে আমাদের বাড়ির চারপাশে, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতরেও।

লোকজন দেখে বিন্তি আরও জোরে চেঁচাতে শুরু করল। কাবুলিটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এসব দেখে। ও ভাবল আমি সত্যি সত্যি মরে গেছি। ও বারবার হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে লাগল। আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করল যে আমাকে মেরে ফেলার কোনও উদ্দেশ্য বা ইচ্ছে ওর ছিল না। ও শুধু ওর পাওনা টাকা ক'টাই ফেরত চেয়েছিল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। জনগণ তখন হাতের সুখ খুঁজতে ব্যস্ত। দুমদাম কিল, চড়, লাথি পড়তে লাগল কাবুলিটার শরীরে। লোকটা দু'হাত তুলে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল নিজেকে বাঁচাবার। কিন্তু পারছিল না। এত জোরে মারগুলো পড়ছিল যে পটাপট, দমাদম আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। চোখ খুলে দেখা তো সম্ভব নয়। তাই আওয়াজ কানে শুনেই সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, খাক ব্যাটা ধোলাই। ক'টা টাকার জন্য যেমন আমার পেছনে লাগা।

জনতা লোকটাকে মারতে মারতে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল। তখন আমার একটু ভয় হল। মনে হল, লোকটা যদি সত্যি সত্যি মার খেয়ে মরে যায় তা হলে আরও সমস্যা তৈরি হবে। লোকটার জন্য একটু মায়াও হল।

বাড়ি তখন প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। সব লোক বাইরে গিয়ে কাবুলিটার উপর হাতের সুখ করছে। আমি টুক করে উঠে বিন্তিকে ডেকে নিয়ে বললাম, 'শিগগিরি দেখ, লোকটাকে যেন সব মেরে না ফেলে। মেরে ফেললে কেলো হবে।'

বিন্তি তাড়াতাড়ি ছুটল কাবুলিটাকে বাঁচাতে। অনেক কষ্টে জনগণকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করা গেল সে যাত্রা। আর লোকটা ছাড়া পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচল। মনে হল, তার টাকা যাক তবু জীবনে কোনওদিন সে আর এ মুখো হবে না।

এই ঘটনার পর আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। ভাবলাম বেঁচে থেকে কিছু না করতে পারলেও মরে গিয়ে অন্তত কিছু করতে পারব।

শুকতারা আমাদের পাড়ারই মেয়ে। আমার বোন বিন্তির বন্ধু। খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু খুব বড়লোক। ওদের প্রাসাদের মতো বিশাল বাড়িটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনের দিকে মস্ত এক গেট। গেটে তাগড়া এক দারোয়ান। পাঁচিলের ওপাশ থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসে পোষা কুকুরের ভয়াল গর্জন। ওর রাশভারী, অহংকারী বাপটা একখানা সাদা রাজহাঁসের মতো গাড়িতে চেপে বেরোয়, আবার ফিরেও আসে। তখন কারও দিকে ফিরেও তাকায় না। তখন দারোয়াটনা সেলাম ঠোকে।

শুকতারা যখন ছোট ছিল তখন ও বিন্তির সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত, প্রায় রোজই আমাদের বাড়ি আসত, খেলত। পরে একটু বড় হওয়ার পর ওর স্কুল বদলে গেল। বদলে গেল ও নিজেও। বন্ধ হয়ে গেল ওর আমাদের বাড়ি আসা। তখন ও-ও ওর বাপের মতো অহংকারী হয়ে উঠেছিল।

আমার ওকে ছোটবেলা থেকেই ভাল লাগত। একটু বড় হওয়ার পর শুরু হল ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা। মাকড়সার জালের মতো স্বপ্নের জাল বুনেই যেতাম। মনেই থাকত না যে ও কত বড়লোক। আমাদের মতো মাটিতে পা দিয়ে হাঁটে না।

অনেকেবারই চেষ্টা করেছিলাম ওর সঙ্গে ভাব জমাবার। ও পাত্তা দেয়নি। তবু একদিন রাস্তায় ওকে একা পেয়ে ধরলাম। বললাম, 'কথা আছে।' স্বভাবসুলভ অহংকারে ওর ভুরু কুঁচকে গেল, বলল, 'আমার সঙ্গে তোমার আবার কী কথা?'

সাহস করে বললাম, 'তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? বড়লোক হলেই কী নিষ্ঠুর হতে হবে?' ও দাবড়ানি দিয়ে বলল, 'ন্যাকামি করো না তো। মড়ার অভিনয় করতে করতে চেহারাটাও তো ঘাটের মড়ার মতো করে ফেলেছ।'

বেশ দমে গেলাম ওর কথা শুনে। তবু যা বলব বলে ওর পথ রোধ করেছিলাম তা তো বলতেই হবে। বললাম, 'তুমি শুকতারা, আমি শুদ্ধশীল। শু আর শু। দু'জনে বেশ মিল তাই না।' শুকতার বলল, 'অত শু, শু করো না। জুতো, জুতো মনে হয়।' আবার আহত হলাম ওর কথা শুনে। বললাম, 'তুমি বুঝতে পারো না আমি তোমাকে কত ভালবাসি।'

শুকতরা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'ফের যদি এমন কথা শুনি তা হলে পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেব। জানো তো আমাদের বাড়িতে চার চারটে কুকুর আছে। আর তাতেও কাজ না হলে বাবার রিভলভার থেকে গুলি করব। দেখবে তখন আর মড়ার অভিনয় করতে হবে না। সত্যি সত্যিই মরে যাবে।'

তেমনই একদিন আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই নির্মলবাবু আমাকে ধরে বললেন, 'শুনলাম তুই নাকি আজকাল খুব কাটা সৈনিকের পার্ট করছিস।'

বললাম, 'কাটা সৈনিক না মৃত সৈনিক।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'ওই-ই হল। না কাটলে সৈনিক মরবে কী করে? জানিস তো প্রকৃত যোদ্ধা কখনও মরে না। কেটে কুচি কুচি না করে ফেলা অবধি লড়াই চালিয়েই যায়।'

মাস্টারমশাইকে বলতে পারলাম না, আমার এমনই ভাগ্য আসল জীবনযুদ্ধের কথা ছেড়ে দিন মঞ্চের উপর মেকি লড়াইটুকুও আমি চালাতে পারি না। লড়াইয়ের শুরুতেই আমাকে হেরে যেতে হয়। শত্রুর অস্ত্রাঘাতে আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। তারপর বাকি সময়টুকু ধরে আমি কেবলই এক মৃতদেহ এক ডেডবডি। মাস্টারমশাই, সেই ছোট্টবেলা থেকে জীবনের সব লড়াইতে আমি বিনা যুদ্ধেই হেরে বসে আছি!' মাস্টারমশাই জানতে চাইলেন, 'তা তুই মৃত সৈনিকের পার্ট বেছে নিলি কেন? তোর কি মনে হয় না মরে যাওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকাটা কঠিন বেশি? নাকি তোর কাঠিন্যের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে নেই? সহজলভ্য কোনও কিছু পেলেই খুশি।'

বললাম, 'জানি না। তবে এটুকু জানি মরে বেঁচে থাকাটা আরও কঠিন বেশি।'

একবার বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটল। এক পেশাদার দলের হয়ে নাটক করছি। সেই মৃত মানুষের ভূমিকা। আমাকে মড়া সেজে সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে মঞ্চের উপর। যদিও পুরো নাটকটা আমার ওই মৃতদেহকে ঘিরেই। এক অর্থে আমিই নাটকের মুখ্যচরিত্র। তবু মড়া তো!

যাই হোক, আগেভাগে মানে নাটক শুরুর সামান্য আগেই মঞ্চে উঠে আমি তো মড়া সেজে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিব্যি শুয়ে রইলাম। এরপর পর্দা উঠে নাটক শুরু যে হল সেটা দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলাম বিভিন্ন অভিনেতা, অভিনেত্রীদের সংলাপ কানে আসতে। বেশ চলছিল নাটকের অভিনয়। হঠাৎই অনুভব করলাম বেশ মশা কামড়াচ্ছে আমাকে। গায়ে ঢাকা দেওয়া চাদরটা ভেদ করে কামড়াচ্ছে। ঘাড়ে, মুখে, হাতে, পায়ে—যেখানে পারছে সেখানে কামড়াচ্ছে। এদিকে অভিনেতা, অভিনেত্রীদের সংলাপও যেন বন্ধ হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে না তাদের চলাফেরার শব্দ বা অন্য কোনও আওয়াজও। ভারী অদ্ভুত লাগল। সবচেয়ে অস্বস্তিকর বা যন্ত্রণাদায়ক হল ওই মশার কামড়। যেখানে কামড়াচ্ছে রীতিমতো জ্বলিয়ে দিচ্ছে। হাত, পা চালিয়ে যে মারব ওগুলোকে সে উপায়ও নেই। আমি তো মড়া। আমি নড়ব কী করে? আমি নড়লেই তো সব পণ্ড। নাটক ভণ্ডুল। অতএব চুপচাপ পড়ে থাকো। কিন্তু কতক্ষণই বা ওইভাবে কামড় সহ্য করে পড়ে থাকা যায়? তা ছাড়া, দেখা দরকার কী হচ্ছে। সবাই হঠাৎ এমন করে চুপ মেরে গেল কেন? কোনও সমস্যা হয়নি তো?

কোনওরকমে চাদরটা সরিয়ে চোখদুটো সামান্য খুললাম। অবাক লাগল দেখে। পুরো মঞ্চটা ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। একফোঁটা আলোর আভাস কোথাও নেই। এমন তো হওয়ার কথা নয়। দর্শকাসন অন্ধকার থাকবে কিন্তু মঞ্চ পুরোপুরি অন্ধকার...উঁহু! নাটকটা সম্পর্কে যতটুকু জানি তাতে তো এমন হওয়ার কথা নয়।

চাদর সরিয়ে উঠে বসলাম। এ কী! মঞ্চ ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রায় অন্ধকার দর্শকাসনও। শুধু দর্শকাসনের মাঝামাঝি জায়গায় টিমটিমে যে একটা আলো জ্বলছে তাতে দৃশ্যমানতা খুব স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহ সম্পূর্ণ জনমানব শূন্য।

যত না অবাক হলাম তার চেয়ে বেশি ভয় পেয়ে গেলাম। কোথায় গেল রে বাবা সব? সব ক'টাকে ভূতে খেল নাকি? পায়ে পায়ে হাতড়ে, হাতড়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে প্রশস্ত দরদালান একরাশ রিক্ততা নিয়ে হা হা করছে। এক পাশে বন্ধ টিকিট কাউন্টার। হাতে ঘড়ি ছিল না। টিকিট কাউন্টারের ওপরে বড় ঘড়িটায় দেখলাম রাত আড়াইটে। আর একবার চমকে উঠলাম। কী সব ভৌতিক ব্যাপার হচ্ছে। সন্ধের শো-এ অভিনয় ছিল। সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে রাত ন'টা। তাহলে রাত আড়াইটে বাজল কী করে? তবে কি মৃত মানুষের অভিনয় করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? হতে পারে। গতকাল প্রায় সারারাত বসে বসে টিভিতে বিশ্বকাপ

ফুটবল দেখেছিলাম। আজ সকালে এক, দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু সেটা তেমন জুতসই হয়নি। ভেবেছিলাম দুপুরে পুষিয়ে নেব। কিন্তু তালেগোলে সেটাও ঠিকঠাক হল না। ফলে মঞ্চে যখন উঠছিলাম তখনই সামান্য ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। দু-কাপ স্ট্রং কফি খেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এতেই ঠিক ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি হয়নি। আর এই লোকগুলো, যাদের সঙ্গে আমি অভিনয় করছিলাম তারাই বা কী রকম! যদি আমি ঘুমিয়েও পড়ি যাবার সময় ডেকে দিয়ে যাবে তো। দিব্যি সব বেরিয়ে চলে গেছে। একেই বোধহয় বলে পেশাদারি মনোভাব।

কিন্তু এখন বাইরে যাব কী করে? গেটে তো তালা দেওয়া। নজর করলাম চৌকিদারটা দরদালানের একধারে একটা বেঞ্চির উপর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। চাবি সম্ভবত ওর কাছেই আছে। কাছে গিয়ে হাত দিয়ে নাড়া দিলাম মানুষটাকে। বার দুয়েক নাড়া দিতেই ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। তার চোখে মুখে গভীর ঘুম চেপে বসে আছে। ভাল করে তাকাতেও পারছে না। আমাকে দেখে রীতিমতো অবাক। প্রশ্ন করল, 'আপ অন্দর ক্যায়সে আয়ে?'

উত্তর দিলাম, 'ম্যয় অন্দর হি থা। আভি বাহার জানা হ্যায়। চাবি হ্যায় আপকে পাস?'

'অন্দর হি থা?' আরও অবাক মানুষটা, 'হ্যায় কোন আপ?'

'ম্যয় এক কলাকার হুঁ! মরা হুয়া কলাকার।'

'কলাকার উহ ভি মরা হুয়া! লেকিন নাটক তো কব কা খতম হো চুকা।'

'লেকিন মেরি জিন্দেগি কা নাটক আভি তক খতম নেহি হুয়া। যাঁহা হর বখত জিন্দেগি মুঝে পিছে ছোড় কর চলি জাতি হ্যায়। যাঁহা ম্যয় হামেশা এক মুর্দা নজর আতা হুঁ! অব মেহেরবানি করকে আপ গেট খোল দিজিয়ে। মুঝে জানা হ্যায়। নেহি তো জিন্দেগি মুঝে অর ভি পিছে ছোড় জায়েগি।'

মানুষটা অবাক চোখে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে গেট খুলে দিল। রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। পেছনে ঝনাৎ করে আবার গেট বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল। জনমানব শূন্য পথ। কিছু ঘেয়ো কুকুর আর আমি এক কলাকার ছাড়া আর কেউ নেই সে পথে। এমনই কলাকার নাটকে যার ভূমিকা কেবলই মৃত মানুষের।

আমি চুপচাপ থেকে ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম কেউ যখন টের পায়নি তখন আমিও কাউকে বলব না। কিন্তু কী ভাবে জানি না ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। বন্ধুরা দারুণভাবে ব্যঙ্গ করল। বলল, 'শা—লা, অভিনয় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লি কী ভাবে?

কেউ কেউ বলল, 'তুই মড়ার পার্ট করতে করতে সত্যিই না একদিন মরে যাস।'

এরই মধ্যে একদিন সেই চিত্র পরিচালক রঞ্জিত মিত্র আমাকে ডেকে পাঠালেন। দিলু তখন রঞ্জিত মিত্রকে ধরে টিভি সিরিয়ালে, সিনেমায় ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করছে। সামান্য একটু পরিচিতিও হয়েছে। ট্যাক্সি ছাড়া আর চলাফেরা করছে না। বলছে, আরে বাসে, ট্রামে চড়লে, পাবলিক প্লেসে গেলে পাবলিক বড় বিরক্ত করে। হয় অটোগ্রাফ দাও, নয় সিনেমায় চান্স দাও। সিনেমা না হয় অন্তত টিভি সিরিয়ালে। বায়নার শেষ নেই। নাম করার জ্বালা অনেক। তোর নাম হয়নি, বেঁচে গেছিস। ভাবছি, এবার একটা গাড়ি কিনে নেব। ঝামেলা খতম।'

আমি নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম। বলার কিছু ছিল না। দিলু বলল, 'দ্যাখ রঞ্জিতদা নিজে তোকে ডেকেছে। অভিনয় করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়িস না যেন। আমার প্রেস্টিজের ব্যাপার।'

আমি বললাম, 'কী করব বল, ওই মড়া সাজতে সাজতে বোর হয়ে গেছি। একটা জ্যান্ত মানুষের পার্ট দিয়ে দেখ ঠিক ভাল অভিনয় করব।'

দিলু বলল, 'অভিনয় জগতে এক একজন এক এক ধরনের অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত। যেমন উত্তমকুমার, রাজেশ খান্না রোমান্টিক নায়ক হিসাবে। অমিতাভ বচ্চন অ্যাংগ্রি ইয়ংম্যান। তুইও তেমনই ডেডবডি স্পেশাল।'

শুনে খারাপ লাগলেও কিছু বলার ছিল না।

রঞ্জিত মিত্র আমাকে সুযোগ দিলেন ঠিকই। তবে আবার সেই মৃত মানুষ। ডেডবডি। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আবার সেই ডেডবডি।

দিলু বলল, 'কী করব বল, অনেক করে রঞ্জিতদাকে বলেছিলাম। কিন্তু রঞ্জিতদা শুনল না। তোর মতো ডেডবডির পার্ট কেউ নাকি করতে পারবে না।'

অগত্যা কী আর করা। আমি গেলাম অভিনয় করতে।

রঞ্জিতদা বললেন, 'দৃশ্যটা বেশ কঠিন। তুই একটা ডেডবডি। তোকে চিতায় তোলা হবে। তারপর চিতায় আগুন দিয়ে দেওয়া হবে। তুই কিন্তু ভয় পেয়ে নড়বি না। আমরা ঠিক সময় মতো তোকে চিতা থেকে তুলে নেব। ঘাবড়ে যাস না। আমি আসলে ডামি ব্যবহার করতে চাইছি না। আর হ্যাঁ, বি কেয়ারফুল, ঘুমিয়ে পড়িস না যেন। তোর তো আবার অভিনয় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ার বদভ্যাস আছে।

আমি বেশ নার্ভাস হয়ে পড়লাম। যদি সময় মতো আমাকে চিতা থেকে তুলতে না পারে তা হলে তো আমি গেলাম। জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে। সতীদাহর আধুনিক সংস্করণ, পতিদাহ। কিন্তু পাছে সুযোগ ফস্কে যায় এই ভয়ে মুখে কিছু বললাম না।

শুটিংয়ের সময় সবাই ধরাধরি করে আমাকে চিতায় তুলে দিল। আমি নিথর, কাঠ হয়ে পড়ে আছি। আমার চারপাশে কী সব মন্ত্র পড়া হচ্ছে। মানুষের চলাফেরার শব্দ কানে আসছে। বোধকরি আমার সৎকারের আয়োজন চলছে। বেশিক্ষণ কৌতূহল চাপতে না পেরে চোখ পিটপিট করে দেখার চেষ্টা করলাম কিন্তু বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। মাথার উপর চড়া রোদ। শরীর পুড়ে ঝামা হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ রোদ থাকার ফলে চিতার কাঠগুলোও তেতে উঠেছে। পিঠে বেশ ছ্যাঁকা লাগছে। হঠাৎ যেন মনে হল উত্তাপ কেমন বেড়ে উঠেছে। তবে কি ওরা চিতায় আগুন দিয়ে দিল? এই খেয়েছে! কই আমাকে তো টেনে তুলল না। চিতা ছেড়ে উঠে পড়ার জন্য কোনও নির্দেশও এল না। আমি এখন কী করব? উঠে পড়ব চিতা ছেড়ে নাকি আরও কিছুক্ষণ দেখব? কিন্তু কতক্ষণ? কেউ কিছু বলবে না তো? এদিকে উত্তাপ যে ক্রমশ বাড়ছে। নাহ! আর সহ্য হচ্ছে না। ওরা নির্ঘাত আমার কথা ভুলে গেছে। আগুন ধরিয়ে দিয়ে সবাই কেটে পড়েছে। একথা মনে হওয়া মাত্রই আমি তড়াক করে লাফ দিয়ে চিতা থেকে উঠে পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে হইহই রব উঠল আরে করে কী! করে কী! এ ছেলেটা করে কী!

রঞ্জিত মিত্র কাট কাট বলতে বলতে দৌড়ে এলেন, 'আরে তুই তো সব ম্যাসাকার করে দিলি। নেমে পড়লি কেন চিতা থেকে?'

আমি বললাম, 'আপনি যে বলেছিলেন চিতায় আগুন দিয়ে আমাকে ঠিক সময়মতো চিতা থেকে তুলে নেবেন।'

রঞ্জিত মিত্র রেগে আগুন, 'হ্যাঁ বলেছিলাম তো।'

'তাহলে তুললেন না কেন?'

'রাস্কেল, আগুন দিয়েছি চিতাতে? দেখতো চেয়ে একবার।'

'তাহলে গরম লাগছিল কেন?'

‘ওটা রোদ্দুরের জন্য ইডিয়ট। রোদটা কী রকম চড়া দেখেছিস আজকে? তুই কী করে ভাবলি একটা জ্যান্ত মানুষকে চিতায় রেখে আমরা আগুন দিয়ে দেব? আমাদের হাতে হাতকড়া পড়বে না?’

খানিক চুপ করে থেকে রঞ্জিতদা আবার বলল, ‘কোত্থেকে যে এসব ইডিয়টকে ধরে আনে!’ একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল তার কণ্ঠস্বর থেকে।

রঞ্জিতদার বিরক্তিটাকে উসকে দিল শালা ক্যামেরাম্যানটা—‘এ মাল চলবে না রঞ্জিতদা। চিতায় শুয়ে চোখ পিট পিট করছি।’

রঞ্জিতদা আর এক দফা লাফিয়ে উঠল, ‘যা বেরিয়ে যা। বোগাস কোথাকার। তোকে দিয়ে কিস্যু হবে না। এ কি তোর স্টেজে অভিনয় যে চোখ পিটপিট করলে, বুক ওঠানামা করলেও কারও চোখে পড়বে না। এখানে ক্যামেরা থাকে রে ইডিয়ট। ক্যামেরা। সামান্য এদিক থেকে ওদিক করলে সেটা ক্যাচ করে নেয়।’

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম স্টুডিও থেকে। শালা মৃত মানুষের পার্টটাও ঠিক করতে পারছি না আজকাল। অথচ লোকে আমাকে ওই ভূমিকাতেই দেখতে চায়।

এবার শেষ দৃশ্য। শুকতারার বিয়ের খবর আমাকে বেশ মর্মাহত করল। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কোনওভাবে যদি বিয়েটা আটকানো যেত। কিন্তু সে আমার সাধ্যের বাইরে। তাহলে কি আত্মহত্যা করব? কোনও কাজ হবে তাতে? কী কাজ হবে? আমি তো চলে যাব। আর শুকতারা ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে অন্যের ঘর করতে। এতে আমি কীভাবে লাভবান হব? আমার দু-তিনজন বন্ধু পরামর্শ দিল, ‘আরে দুর বোকা, তুই আত্মহত্যা করতে যাবি কেন? তুই যখন মিথ্যে মিথ্যেই অত ভাল মরতে পারিস তখন সত্যি সত্যি মরতে যাবি কোন দুঃখে? তুই একবার মড়া সেজে যা। তারপর দেখ কী হয়! খবরটা যেই কানে গিয়ে পৌঁছবে শুকতারা অমনি বিয়ের পিঁড়ি থেকে একেবারে দৌড়ে চলে আসবে।’

মনে ক্ষীণ হলেও আশার আলো দেখা দিল। বললাম, ‘সত্যি বলছিস?’

ওরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ‘সত্যি না তো কী! তোর সঙ্গে কি আমরা ইয়ার্কি করছি? এ তোর জীবন-মরণের সমস্যা। এখন কথা না বাড়িয়ে চটপট মড়া সেজে যা। আমরা শুকতারার কাছে খবর পৌঁছে দিচ্ছি।’

আমি মড়া সেজে গেলাম। ওরা গেল শুকতারার কাছে খবর পৌঁছতে। আমি চুপচাপ পড়ে আছি। সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কই শুকতারা তো এল না। বন্ধুরাও কেউ ফিরছে না। অধৈর্য লাগছে। কী করব বুঝতে পারছি না। যাব একবার, খোঁজ নিয়ে আসব? কিন্তু কেস যদি বিগড়ে যায় তাতে? আরও বেশ খানিকক্ষণ পরে আমার বন্ধুরা—শঙ্কু, রজত, অধীর সব ফিরে এল। সব ঘামছে। চোখেমুখে দারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ। জানতে চাইলাম, ‘কী রে, কী খবর?’

ওরা গম্ভীর মুখে বলল, ‘খবর খুব খারাপ।’

‘খারাপ মানে?’

‘খারাপ মানে, তোর মারা যাওয়ার খবর শুনেই শুকতারা বিষ খেয়েছে।’

ভীষণ জোরে ধাক্কা লাগল বুকে। বললাম, ‘সে কী রে! বিষ খেয়েছে কী রে! মরে গেল নাকি?’

‘না, মরেনি। তবে অবস্থা সিরিয়াস। নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছে।’

‘তা হলে তো আমার একবার যাওয়া দরকার।’

‘যাবি কী রে! পাগল নাকি! ওর বাড়ির লোকজন এখনও অবধি তোর প্রতি সিমপ্যাথেটিক। কিন্তু এরপর যদি দেখে তুই বেঁচে আছিস তা হলে হয় তোর নামে পুলিশ কেস করবে নয়তো মেরে তোর

> **শ্মশানের পেছন দিকের এক চোরা গলি দিয়ে আমি চুপিসারে পালিয়ে এসেছি। কেউ টের পায়নি। আমি, শুদ্ধশীল মুখার্জি আজ সত্যিকারের এক মৃত মানুষ। আর কোনও অভিনয়-টভিনয় নয়। জীবনের সেরা অভিনয় আমার করা হয়ে গেছে।**

টেংরি খুলে দেবে।’

‘কেন?’

‘কেন কী! তুই মারা যাবার খবর রটিয়ে ওদের মেয়েকে সুইসাইড করতে প্রোভোক করেছিস। এখন যদি ওরা দেখে তুই বেঁচে আছিস আর ওদের মেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তাহলে তোকে ছেড়ে দেবে?’

‘তাহলে?’

‘তাহলে এখন যেমন আছিস তেমনি চুপচাপ পড়ে থাক। একদম নড়াচড়া করিস না। পরিস্থিতি একটু ঠান্ডা হোক। তখন আমরা বলব। তুই নিঃসাড়ে, নিঃশব্দে কেটে পড়বি।’

ঘাবড়ে গেলাম বন্ধুদের কথা শুনে, ‘কেটে পড়ব! যাব কোথায় রে?’

‘যেখানে হোক, যেদিকে হোক। অন্তত কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিবি।’

‘বাড়িঘর ছেড়ে কোথায় গা-ঢাকা দেব?’

‘যেখানো হোক। বাঁচতে গেলে এ ছাড়া তোর সামনে আর কোনও পথ নেই। ক’দ্দিন আর মড়া সেজে পড়ে থাকবি। আমরা এখন সাধন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছি। ও এসে তোর একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে যাবে। তা হলে ব্যাপারটা কনফার্ম হয়ে যাবে।’

‘জ্যান্ত মানুষের ডেথ সার্টিফিকেট কী রে?’

‘আর দুর গাধা!’ বন্ধুরা ধমক দিল, ‘তুই জ্যান্ত কোথায়? তুই তো এখন মৃত মানুষ।’

‘কিন্তু যদি ধরে ফেলে।’

‘তোকে অ্যাক্টিংটা ভাল করে করতে হবে।’ অ্যাদ্দিন ধরে ডেডবডির পার্ট করার পর তোর যদি এটুকু কনফিডেন্স না আসে তা হলে আর কী বলব।’

খানিক পরে ওরা সাধন ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এল। আমার অভিনয় নিখুঁত। বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘নাহ্! অ্যাকটিং নয়। ব্যাটা সত্যি সত্যিই মরেছে।’

সাধন ডাক্তার আমার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেল। ডাক্তার চলে যেতে আমি ফিসফিস করে বললাম, ‘কী রে, আমি এবার কেটে পড়ব?’

শঙ্কু বলল, ‘খবরদার না। খবরদার না। খবর পেলাম শুকতারার

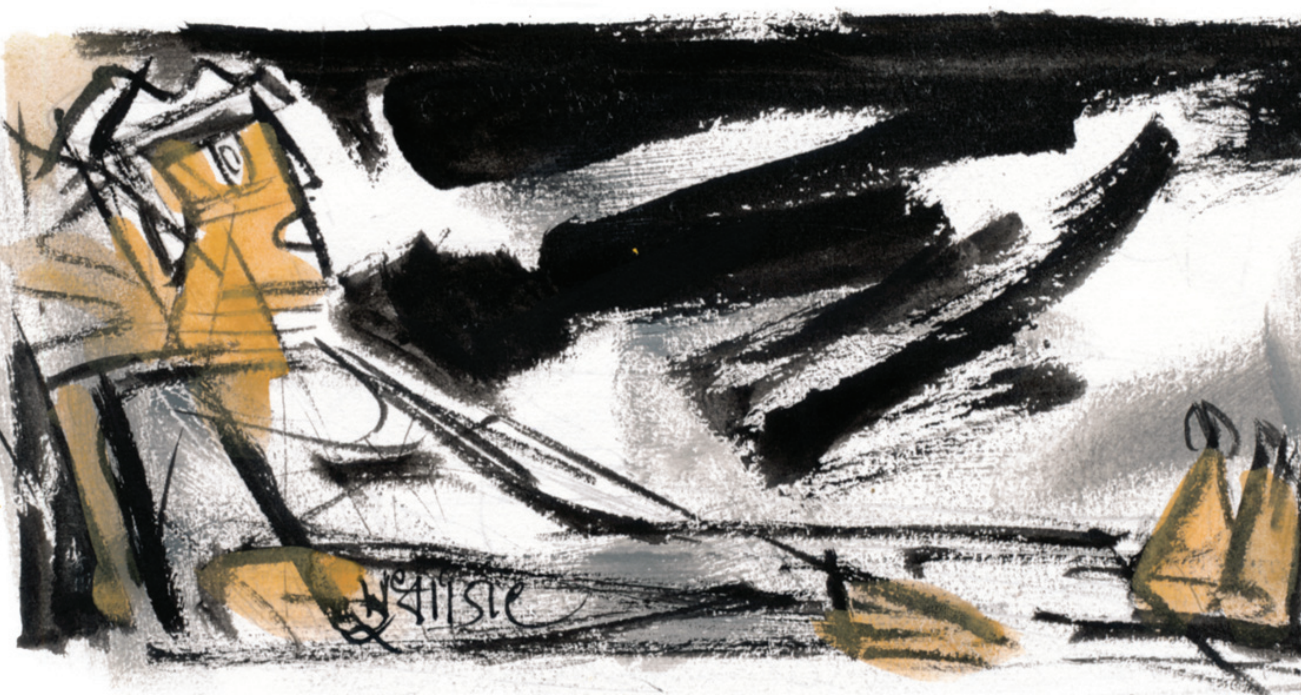

কাকা, দাদারা আসছে তোকে মালা দিতে। আসলে দেখতে আসছে তুই সত্যি সত্যিই মরেছিস না ফলস দিচ্ছিস। এখন কিন্তু তোকে আরও জোরদার অ্যাকটিং করতে হবে। মনে রাখবি এরা সাধন ডাক্তারের চেয়েও ডেঞ্জারাস। ধরতে পারলে শুধু তোকে নয়, আমাদেরও মেরে পাট করে দেবে।'

সত্যি সত্যিই একটু পরে শুকতারার কাকা, দাদারা এসে গেল। সাধন ডাক্তারের মতো ওরাও প্রশ্ন করল, 'সত্যিই ব্যাটা মরেছে তো নাকি ফলস মারছে?'

একজন বলল, 'আচ্ছা করে লাথি কশিয়ে দেখা না। বেঁচে থাকলে ঠিক উঠে বসবে।'

কথা শেষ হতে না হতেই আর একজন দমাদম আমার পাঁজরে, পেটে, পাছায় বেশ কয়েকখানা লাথি কশিয়ে দিল। আমি নড়লাম না চড়লাম না। মুখ দিয়ে সামান্য আঁক শব্দ পর্যন্ত বের হল না। দমবন্ধ করে পড়ে রইলাম। বুঝে গিয়েছিলাম ওরা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় আমি বেঁচে আছি তা হলে মারটা আরও জোরদার হবে। অতগুলো পদাঘাত করার পর ওরা নিশ্চিত হল, আমি মরেছি তখন একটা গাঁদার মালা আমার শরীরের উপর ছুড়ে দিল। এরপর বন্ধুরা আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোর শুরু করল।

আমি আবার ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, 'এবার কী রে?'

ওরা বলল, 'আর কিছুক্ষণ সহ্য কর। শ্মশানে নিয়ে গিয়ে একটু আড়াল করে আমরা তোকে শুইয়ে দেব। তুই পেছনের গেট দিয়ে চুপচাপ কেটে পড়বি। তারপর সময় বুঝে আমরাও কেটে পড়ব।'

শ্মশানের পেছন দিকের এক চোরা গলি দিয়ে আমি চুপিসারে পালিয়ে এসেছি। কেউ টের পায়নি। আমি, শুদ্ধশীল মুখার্জি আজ সত্যিকারের এক মৃত মানুষ। আর কোনও অভিনয়-টভিনয় নয়। জীবনের সেরা অভিনয় আমার করা হয়ে গেছে। এখন সমাজ, সংসার সবকিছুর চোখে আমি এক রিয়েল ডেডম্যান। স্বীকৃত ডাক্তারের দেওয়া আমার ডেথ সার্টিফিকেট এই মুহূর্তে আমার আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের হাতে হাতে ঘুরছে। সন্দেহের আর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

আমি চলেছি। কিন্তু কোথায় চলেছি জানি না। এদিকে কপর্দক শূন্য। পকেটে কানাকড়িও নেই। তবু কেন জানি না নিজেকে নবাব, বাদশার মতো লাগছে। মনে হচ্ছে সম্ভবত এই প্রথম আমি আমার জীবনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পেরেছি। চিরসাথি মৃত্যুকে হারিয়ে জীবনযুদ্ধে আজ আমি জয়ী। শুধু গলার কাছটায় কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করছে। গাঁদা ফুলের মালাটায় বোধহয় পিঁপড়ে ছিল।

আচ্ছা, শুকতারা সত্যিই বিষ খেয়েছিল তো। না—কি?

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



বেঁচে থাকার গান

বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী

শহিদের বাড়ি যে ঠিক কোথায়, সেকথা কেউ জানে না। শহরের বিভিন্ন ফুটপাতে জন্ম ইস্তক তার মা-বাবা আর পাঁচ ভাইবোনের সঙ্গে বসবাস। কোনও ফুটপাতে সাতদিন তো আবার কোনও কোনও ফুটপাত থেকে একেবারে দিন দু'য়েকের মধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে হয়।

শহরের বিভিন্ন আনাচে-কানাচে শহিদের ঠিকানা।

জ্ঞান হওয়া থেকে এই এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির জীবন। মা-বাবা দু'জনেই ছিলেন কাগজ কুড়ানি। মা অবশ্য মাঝেমাঝে রাতে কোথায় যেন চলে যেত। আবার সকালে তাদের সঙ্গে ফুটপাতে। সেইসব সকালে মা-কে কাঁদতে দেখেছে শহিদ। মা-বাবা একসঙ্গে যখন কাজে যেত তখন শহিদ আর তার ভাইবোনেরা মিলে এ- বাসে সে-বাসে পাথর ঠোকাঠুকি করে গান গাইত আর পয়সা চাইত। প্রত্যেক রোববার রকেটদা আর বেবিদি গান শেখাত। যেখানেই যাক না কেন রোববারের গানের ক্লাসের জন্য রকেটদার গ্যারেজে পৌঁছে যেত তারা। গানের ক্লাস বলে কথা। শুধু তারাই নয়, ওদের মতো আরও বেশ কয়েকজন মিলে শিখত। ক্লাস শেষে বেবিদির হাতে দশ টাকা করে দিত সবাই। বাজার চলতি সমস্ত হিট গান ছিল ওদের কণ্ঠস্থ।

গানের ক্লাসের পর হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরা। কত কী দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরত ওরা। এমনই একদিন ফেরার সময় বাবা শহিদ মিনার দেখাল। তাই দেখে শহিদের সে কী লাফালাফি, উচ্ছ্বাস! উফ্ কত বড় লম্বা বাড়ি তার নামে!

শহিদ তখন সাত কী আট হবে। বাবা ওকে বালিগঞ্জ স্টেশনে একটা চায়ের দোকানে রেখে এল। বলে এল এবার থেকে এখানেই নাকি ওকে থাকতে হবে। শুনে তো ও খুবই খুশি। যাক বাবা থাকার জায়গা হল। 'মাসি আর কাকার চায়ের দোকান'। না না ওর মাসি বা কাকা নয়, দোকানের নামটাই ছিল তাই। কেক বিস্কুট চা তো আছেই, বিকেলে ঘুগনি, ডিম সিদ্ধও পাওয়া যেত। হেভি ভিড় ছিল। চায়ের কাপ ধোওয়া, জল আনা, বাসন মাজা সব করত শহিদ। মাঝে মাঝে বেশি ভিড় হয়ে গেলে ডিমের খোসাও ছাড়াত ও। মাসি দু'বেলা ওকে খেতে দিত। রাতে দোকান বন্ধ হয়ে গেলে স্টলের মাথায় গুটিসুটি হয়ে রাতের আকাশ দেখতে দেখতে এককলি-দু'কলি গান গুনগুন করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ত। মাঝে মাঝে মা-র কথা খুব মনে পড়ত। তখন কাঁদত। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ত। বাবা মাঝে মাঝে আসত, কিন্তু মা-র সঙ্গে দেখা হত বছরে একদিন, যেদিন দুগ্গা ঠাকুর চলে যেত। ওইদিন দোকান বন্ধ, তাই ওর ছুটি। মায়ের কাছে যাওয়ার দিন। সেদিন মা ওকে দুটো করে নাড়ুও খাওয়াত। অন্য ভাইবোনরাও পেত, কিন্তু ও দুটো পেত।



মাসি আর কাকার চায়ের দোকানে ওর মোটামুটি ভালই কাটত। একটু-আধটু মারধর যে খেত না তা নয় তবে মোটের ওপর ওর ভালই দিন গুজরান হত। যেদিন খুব ভাল বিক্রি হত মাসি ওকে একটা ডিম সিদ্ধ দিত। ডিম খেতে যে কী ভাল লাগে ওর! রাতের বেলায় বেশিরভাগ দিনই ঘুগনির ডেকচিতে চাঁচিপুচি দিয়ে ভাত মেখে খাওয়া, তাই ঘুগনি ব্যাপারটা ভাল লাগত না। দুপুরে ঝোল ভাত। কোনও দিন কুমড়ো তো কোনও দিন আলুর ঝোল। তবে দুগ্গাঠাকুর এলে মাসি পাশের দোকান থেকে পরোটা আলুরদম আনাত। তখন রাঁধবার সময় কই? শুধু তো স্টেশনে নয়, একটা পুজো প্যান্ডেলের ওখানেও স্টল দিত। মাসি থাকত স্টেশনে, কাকা যেত পুজোর স্টলে। আর শহিদ— একবার স্টেশন তো একবার প্যান্ডেল। তবে এই দৌড়াদৌড়ি করতে খুব ভাল লাগত ওর। কত আলো, কত লোক, কত ভিড়! এপাড়া-ওপাড়া সব পাড়াতেই গানের মেলা। বড় বড় চোঙে গান বাজছে। সেই সব গান শুনে কয়েক কলি নিজেও গুনগুন করত। স্টেশনেও কত আলো। চারিদিক ঝলমল করত। ওর খুব আনন্দ হত। ওরও নতুন জামা হত। মাসি প্রত্যেকবার একটা হাফ প্যান্ট দিত। এছাড়া ট্রেনে যেত যে সব মা-কাকিমারা তারা ওকে জামা দিত। তাদের ছেলেদের পুরনো, একটু রংচটা দু'-চার সেট। তাতেই ও খুশি। ও তো আর ওগুলো আগে কখনও পরেনি, তাই ওগুলোই ওর নতুন জামা। ক্লাব থেকে ওকে একটা জামা দিত। তবে বড্ড বড় হত। ক্লাব থেকে একদিন ওকে ভোগও খাওয়াত। কত ভাল ভাল খাবার। হলুদ হলুদ মিষ্টি মিষ্টি ভাত, আলুরদম, সাদা সাদা কী একটা ছানার মতো দিয়ে তরকারি, চাটনি, মিষ্টি। কী সুন্দর ঝলমলে প্যাকেট করা। দারুণ! উফ্ দুগ্গা মা তো থাকলেই পারে, খেতে খেতে ভাবে ও।

রাতভর জেগে থাকে শহিদ পুজোর ক'দিন। ষষ্ঠী থেকে নবমী। শুধু কাজের জন্য তা নয়, রাত জাগে আর ভাবে আর ক'য়েক ঘণ্টা, তারপরই তো মা'র কাছে যাওয়া। আনন্দেই ঘুম আসে না। প্যান্ডেলে কাকার স্টলে যখন ওর বয়সের ছেলেমেয়েদের দেখে মা-বাবার হাত ধরে ঠাকুর দেখতে এসেছে তখন খুব আনন্দ হয়। ওদের স্টলে যখন ওরা আসে তখন আরও ভাল লাগে।

পুজো শুরু হওয়ার ক'য়েক দিন আগে থেকেই দৌড়াদৌড়ি শুরু। কাকা কোথা থেকে যেন টেবিল চেয়ার জোগাড় করে। মাসি দু'টো চাদর এনে দেয়। চারটে বাঁশ জোগাড় করে চাদর টাঙিয়ে তৈরি হয় স্টল। একটা পলিথিনও রাখে কাকা। যদি বৃষ্টি আসে! স্টল তৈরি হয়। এরপর সব জিনিস নিয়ে যাওয়ার পালা। মাংসের টুকরো দেওয়া স্পেশাল ঘুগনি বানায় মাসি। সঙ্গে থাকে চা-বিস্কুট-কেক। প্রচুর সেল। প্লাস্টিকের ছোট ছোট কাপে চা আর শালপাতার ডোঙায় ঘুগনি। শহিদ কখনও খাবার দেয়, কখনও হাঁকে 'মাসি আর কাকার স্পেশাল ঘুগনি-ই-ই-ই, না খেলে ঠকবেন।' তার ডাক হাঁক শুনে লোকে আসে, কেউ কেউ আবার ওর গাল টিপে দেয়। আর ওর মতো যারা, তারা হাসে। খুব ভাল লাগে ওর। খুব, খুব খু-উ-ব। এইভাবেই পুজোর দিন কাটে। অবশেষে ছুটির দিন— বিজয়া দশমী। সকাল হতে না হতেই স্টেশনের ধারে একটা কলের তলায় স্নান সেরে মাসির দেওয়া হাফ প্যান্ট আর ক্লাবের দেওয়া ঢোলা জামা পরে সে তৈরি। বাবার জন্য অপেক্ষা। বাবা এলেই দে ছুট।

ঢাকের কাঠিতে তখন বিসর্জনের বোল। কিন্তু সে জানে কোনও এক ফুটপাতে তার মা তার পথ চেয়ে বসে আছে।

অলঙ্করণ : দেবনাথ নন্দী



আজ বড় খুশির দিন

মিহির সরকার

এ বিজিনেস করি প্যাট চলবে না, বুঝলি কদম। অন্য ধান্দা দেখতি হবে। হরিহর মিদ্যে বলল। ঘরের শেষ প্রান্তে ষাট পাওয়ারের বাল্‌ব-এর আলোয় কদম মা-কালী ছবি বাঁধাই করছিল। কদম বিশ্বাস।

হরিপুর গ্রামের মানুষ। বাবা ছিদাম বিশ্বাস ভাল বাঁশি বাজাতেন। সারাদিন চাষের মাঠে কাটিয়ে সন্ধে লাগলে চূর্ণির ধারে বসে বাঁশিতে ফু-দেওয়া চাই। কত সুর তুললেন। তিনদিনের জ্বরে ছিদাম বিশ্বাস ইহলোক ত্যাগ করার পর কদম এল হরিহরের কাছে, ফ্যালফ্যাল চোখে। হরিহর বলেছিল—বাপের মতো চাষ-আবাদ কর। আমাদের জমিতেই তোর বাপের মতো লাঙল দে। খাওয়া-পরার অভাব হবেনি। কাল থেকে চলে আয়।

রোগা লিকলিকে কদম সেদিন হাত কচলে বলেছিল, "দাদা, চাষ-আবাদের কাজ হবেনি আমাকে দিয়ে। দাদা, তোমার ছবি বাঁধাইয়ের দোকানে কাজ দাও। ঠিক পারব।"

হরিহর বিদ্রুপের হাসি হেসে বলেছিল—চাষির ব্যাটা শিল্পী হবা! তা যা মন চায় তাই কর। ঠিক আছে কাল থেকি দুকানেই আয়। ফাঁকি মারবা না। অর্ডারি কাজ। সময়মতো ডেলিভারি দিতি হয়। বুঝলি কদম।

কদম মাথা নেড়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল হরিহরের দিকে। হরিহর এক ধমক মেরে বলেছিল—আবার কী ভাবছিস?

—না, মানে কাল থিকি আসব?

—হ্যাঁ, কাল থেকেই আসবা। ছুটি-ছ্যাটা পাবা না বেশি। মনে থাকে যেন।

সেই শুরু। আস্তে আস্তে কদম ছবি বাঁধাইয়ে হাত পাকিয়ে ফেলল। কোন ছবিতে কোন ফ্রেম দিলে দেখতে ভাল হবে, খোলতাই হবে, সে ভাব কদমের উপর ছেড়ে দিত হরিহর চোখ বুজে।

কদম মা-কালীর ছবি বাঁধাই করতে করতেই বলল, দাদা, বিজিনেসে জোয়ার-ভাঁটা থা-এ। এত তাড়াতাড়ি ভাঙি পড়লে চলবি ক্যান। আর কিছুকটা দিন দ্যাও।

হরিহর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—দিনকাল পাল্টি খেয়েছে। স্বীকার খাস তো? দেখিস না এহন ঢেঁকিতে ধান ভাঙে?

কদম কাজ থামিয়ে বলে—তা ঠিক। কথাটা তুমি ঠিকই কইছো। মেইরা আজকাল প্যান্ট-জামা পরে। আগের দিনে গ্রামে এসব ভাবা যেত দাদা?

হরিহর চুপ মেরে থাকে। কদমও। লোকমাতা আর্ট সেন্টারের সামনে সকাল সাড়ে ন'টার হেমন্তের রোদ ধারালো তরবারির মতো চুপচাপ শুয়ে আছে। কিন্তু ঘরের শেষ প্রান্তে এই আলো পৌঁছয় না। তাই ছবি বাঁধাই করতে যাট পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বালাতে হয়। হরিহর ওই ধারালো রোদের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে ঝিম মেরে বসে আছে। আসলে সে এক ভাবনার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। তার মনের আনাচে-কানাচে দোল খাচ্ছে—নতুন কোনও বিজিনেসের ধান্দা...। এ বিজিনেস আর ওই রোদের মতো ধারালো নয়। ঝকঝকে ঘরের দেওয়ালে কেউ আর পেরেক পুঁতে নিজের মৃত মা-বাবার ছবি ঝোলায় না। বড় বড় মনীষীদের ছবিও কেউ বাঁধাই করতে আসে না। ঘরে ছড়ানো ছেঁড়া-ফাটা ছাট কাগজের মতোই তার জীবন, তার স্বপ্ন।

হরিহর হঠাৎ তার দু-বাহু দু'দিকে প্রসারিত করে শরীরটা টান টান করে একটা হাই তুলল। তারপর বুক পকেট থেকে বিড়ি বের করে ফু-মেরে ধরাল। দু'বার সুখটান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—কদম ছবিটা ভাল করে বাঁধাস। কুমুদবাড়ির মন্দিরে যাবে। কত মানুষ দেখবে। আমাদের প্রচার হবে। মাথায় রাখিস কদম।

কদম কাজ করতে করতে ... হু-হু করল। হরিহর আবার হাই তুলল। তারপর বলল—কদম এটাই এ মাসের শেষ কাজ। হাতে আর দু'খান ছবি আছে। তা বাবুরা তো সামনের মাসে নিতি আসবে, তখন পেমেন্ট দেবে। সংসার যে চালাই কেমনে .... তোরে দিতি হবে হাজার টাকা ...

হঠাৎ কদম কাজ থামিয়ে বলল—এত ভাবলি চলে না। সে আমারে না হয় দু'শো কম দেবেন। অতো ভাবতি হবে না।

—না রে কদম। ভাবতি হয়। তবে কদম ভয় পাই নে। ভয় হল মানুষের অপমৃত্যু।

কদম মাথা নাচিয়ে বলে—দাদা কথায় আছে—আঁধার ঘরে সাপ সারা ঘরেই সাপ।

হঠাৎ হরিহর হেসে ফেলে—কদম তুই তো দেখতিছি লেখাপড়া জানা মানষির মতো কথা কইতাছিস। তবে কথাটা ঠিক বলেছিস। ভয় নয়। তবে কদম এ কথাটাও জেনে রাখ—ভয় না থাকলি সাহসের দাম কী?

কদম বাঁধাই করা মা-কালীর ছবি দু'হাতে মাথার উপর তুলে বলে—দেখ দাদা। কেমন হইছে?

—ভাল। তবে আর একটু ফিনিশিং দে। ফ্রেমে পালিশ দিতি হবে।

হরিহর মা-কালীর ছবির দিকে দু'হাত জোড় করে বলল—মা, মা গো, রক্ষা কর মা। তুমি ছাড়া এ জগতে আমাদের আর কে আছে মা।

কদম বলল—এবার নামাই?

—নামা।

তখনও হরিহর করজোড়ে বিড়বিড় করে কী সব বলে যাচ্ছে। এক সময় হরিহর হাত স্বাভাবিক করে চোখ মেলে বলল—বুঝলি



কদম এ জাতটার যে কী হবে কে জানে!

কেউ এখন আর মা-বাপ, ঠাকুর-দেবতা, জ্ঞানীগুণি মানুষের ছবি বাঁধাই করে না। ছবি বাঁধাই আমার পৈতৃক ব্যবসা। এতকাল ধরে কত কিছু দেখলাম রে!

কদম ফস করে জিজ্ঞেস করল—কেন বল দিখিন এমনটা হচ্ছে? মা-বাবাকে শ্রদ্ধা না ররলে জগতে আর কে আছেন?

—আছে রে কদম আছে। তুই যার ছবি বাঁধাই করতিছিস, তিনি আছেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, লোকনাথ বাবা আছেন। এ যাত্রায় এরাই আমাদের ভাত-কাপড় দেয়।

কদম একটা হাই তুলে বলল—তবে দাদা যাই বলো, ছবি বাঁধিয়ে ঘরে রাখার মতো আর আছেন কে?

—আছে কদম আছে। চোখজোড়া খুলা রাখতি হয়। আগে ঘরে ঘরে রাখত, নেতাজি সুভাষ, রবিঠাকুর, নজরুল, জওহরলাল নেহরু, লেলিন, মার্কস আর কত ছবি।

কদম আবার হাই তুলল। তাই দেখে হরিহর বলল—যা দু'কাপ গরম গরম চা নিয়ি আয়। তুর-আমার দু'জনারই হাই উঠতিছে।

কদম উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটা টান টান করে নিয়ে বলল—দাদা যাই বলো, ইন্দিরা গান্ধী আমাদের ভাল বিজিনেস দিছিলো।

—ও ইন্দিরার মৃত্যুর পর তো? ও সেবার বাম্পার বিজিনেস হইছিল।

একটু থেমে হরিহর বলে—কদম তোর মনে নেই নাকি, রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পরও তো বাম্পার বিজিনেস পাইছিলাম। মনে নাই?

—তবে দাদা ইন্দিরার মতো নয়। হরিহর তাড়া দেয়—যা যা, চা নিয়ি আয়। তারপর আপন মনে বলে, তেমন আর নেতা কই, মরলি পরে বাম্পার বিজিনেস পাব?

চা-পান শেষ করে হরিহর সকালে কাগজ পড়ছিল। কদমের এ বিদ্যে নেই। হরিহর পেপার পড়ে যেটুকু বলে। সেদিন হরিহর পেপার পড়ে বলল—কী হচ্ছে বলতো? সারা দেশে খুন-জখম আছে। আবার ট্রেন উড়াইছে। মাওবাদীদের কাম। উত্তরপ্রদেশের গ্রামে ছেলে কোপাইছে বাপরে। বাপ অন্য মেয়েছেলির সঙ্গে রাত কাটাত। সেই রাগে।

কদম বলল—তাহলি ছেলি মা রে কত ভালবাসত কও।

—তা ঠিক। তাই বলি, বাপ রে খতম করতে হবে! এমন সময় শেঠপাড়ার লক্কা হাজির। হাতে একটা বড় ছবি। — বাঁধাতে হবে, ভাল করে হরিদা।

—এ কার ছবি?

—তোমার কাকার। সৌরভ গাঙ্গুলির। আবার ইন্ডিয়া টিমে ঢুকেছে। কাল নয়তো পরশু বাঁধাই ছবি চাই। ফিস্টি হবে ক্লাবে। ছবিতে ফুলের মালা পরিয়ে রাতভর ফিস্টি।

লক্কা চলে যেতেই হরিহর হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল—মা মুখ তুলি দেখেছেন। মা-মাগো রক্ষা করো।

কদম ছবিটা দেখতে দেখতে বলল—দাদা টাকার কথা তো কিছু হল না।

—হইছে, ইশারায়। পাঁচশো দেবে। যে ভাল করি বাঁধায় দে। পাড়ার ছেলে মনে থাকে যেন! শোন কদম, এ মাসে তোরে আর দু'শো টাকা কম নিতি হবে না। পুরো টাকাই পাবা। ভাল করি কাজটা করবা।

—চিন্তা করবেন না দাদা। কেন সেবার সেই যে জীবনদার ছবি দু'দিনে বাঁধাই করিনি?

হরিহর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, ও'রে জীবনদা নয়, জীবনানন্দ দাশের ছবি বাঁধাই করেছিল। মস্ত কবি।

—দাদা, রবিঠাকুরের চাইতে বড়?

—না। বয়সে ছোট। তবে সেবার তোর ছবি বাঁধাই দেখে আরও দশটা অর্ডার পেয়েছিলাম।

—তবে দাদা ওই জেবনানন্দবাবুর ছবি দেখে পেত্তম ভেবেছিনু আমাদের গ্রামের মানুষ।

হরিহর তাড়া মেরে বলে—যাক আর কথায় কাজ নেই। ছবি বাঁধাই শুরু করে দে। দেরি করলে লক্কা মাথায় বোম ফাটাবে।

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। কোনওমতে টেনেটুনে চলছে হরিহরের বিজিনেস। অন্য ধান্দা করব করব ভেবেও তেমন জুতসই ধান্দা খুঁজে পায় না। এক-এক সময় ভাবে, বাপের ভাগে পাওয়া জমি কাকার ছেলেদের জলের দামে বিক্রি করাটা ভুল হয়েছে। চাষের জমি কিছুটা হাতে রাখলে এই সময় বছরকার ধান ঘরে তোলা যেত। ভুল হয়েছে। খুব ভুল হয়েছে।

কদমও এক সময় বলেছিল—দাদা জমিটুকু রাখুন। বিপদে আপদে কত কাজে লাগবে।

তখন বিজিনেস ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। জোয়ারের জল আর থামে না। গ্রাম ঘরের মেয়েরা দলে দলে আসত। তাদের সুঁচ-সুতোয় লেখা, 'পতি পরম গুরু' 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' বাঁধাই করত। এমব্রয়ডারি করে কাপড়ে আঁকত পাহাড়, গ্রাম ও রবি ঠাকুরের ছবি। মেয়েরা সে সব ছবি বাঁধাই করতে আসত। বিয়েতে পাত্রপক্ষকে দেখাতে হত, এটাই প্রমাণ করতে, মেয়ে হাতের কাজ জানে।

না সেসব দিন আর নেই। সব যেন কেমন হারিয়ে যাচ্ছে। এইসব পুরনো দিনের কথা, পুরনো আচারের মতো।

এখন ড্রইং-এর যুগ। এই তো গতকাল চ্যাটার্জিবাবুর ছেলের জল রঙে আঁকা পাহাড়ি গ্রামের ছবি বাঁধাই করতে দিয়ে গেল। ঘরে টাঙিয়ে রাখবে। লোকে দেখবে। এসব কাজ ন'মাসে ছ'মাসে একটা-দু'টো আসে। এইতে বিজিনেস চলে?

চ্যাটার্জিবাবুর ছেলের আঁকা ছবি বাঁধাই করছে কদম। এক মনে।

এমন সময় হরিহর বুক ঠেলে ভারী নিঃশ্বাস ফেলে বলল—কদম রে আর চলে না। রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে। ইবার আমাদেরও পরিবর্তন করতি হবে। ভাবছি দোকানটা ভাগ করে সামনে স্টেশনারি দোকান করব। আর পেছনে থাকবে বাঁধাই দোকান। তোর কী মত?

—দাদা আপনি মালিক। যা বলবেন তাই হবে। আমি তো দোকানে দোকানে চা-বিস্কুট সাপ্লাইয়ের কাজ করে কিছু রোজগার করছি। সবই জানেন। আপনাকে বাঁচতি হবে। যা ভাল বোঝেন করেন। এমন সময় লোকমাতা আর্ট সেন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেন গ্রামের গণ্যি-মান্যি মানুষ সুবল দত্ত। দরদর করে ঘামছেন। ফিনফিনে সাদা পাঞ্জাবি ফর্সা গায়ে সেঁটে বসে আছে। হাতে কাগজে মোড়া কিছু, ছবিই হবে। হরিহর করজোড়ে বলল—বাবু কেমন আছেন?

—আছি রে, বলেই পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন—হরি, ছবিটা দেখ। ভাল করে বাঁধাই করতে হবে। দশদিন পরে আমার নাতির প্রথম জন্মবর্ষ। বাড়িতে লোকজন আসবে। তার আগেই ছবিটা চাই।

—হয়ে যাবে বাবু।

—হরি ছবিটা দেখ। পারবি তো? নতুবা কলকাতায় দিয়ে আসব।

ছবি দেখে হরিহর চমকে ওঠে। এতো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর পাশে সুবলবাবু। ইলেকশনের আগে প্রচারে এসেছিলেন। তখন নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী নন। মঞ্চে নেত্রীর পাশে সুবলবাবু বসে আছেন গম্ভীর মুখে। সুবলবাবু ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলেন—অনেক কষ্টে ছবিটা জোগাড়

করেছি। পারবি তো?

—পারব বাবু। পারব। চিন্তা করবেন নি।

—এই নে আর একটা ছবি। হরিহর অবাক। সুবল দত্তের ছোট্ট নাতিকে কোলে নিয়ে আদর করছেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী।

—এটাও ভাল করে বাঁধাবি।

—হ্যাঁ বাবু। সব হয়ি যাবে। চিন্তা করবেন নি।

—এসব ছবি দেখে যেন আত্মীয়-স্বজনরা চমকে ওঠে। এমন সুন্দর করে বাঁধাবি।

ঠিক সময়ের আগেই ছবি বাঁধাই করে ডেলিভারি দেয় হরিহর। নিজে দায়িত্ব নিয়ে বাঁধাই কাজ করেছে। সত্যি বাঁধানোর পর যেন ছবি কথা বলছে।

হরিহরও জন্মদিনের নিমন্ত্রণ পেয়েছে। দুপুরবেলায় সুবল দত্তের বাড়িতে গিয়ে হরিহর অবাক। যেন হাট বসেছে। কত লোক। উঠোনজুড়ে প্যান্ডেল। ঠিক মাঝখানে একটা বড় টেবিলে ছবি দু'টো রাখা। ঘুরে-ফিরে সবাই দেখছে। সবার চোখে বিস্ময়। কে একজন আত্মীয়া বললেন,—সুবল, তুই তো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মানুষ। জানতাম না। আপদে-বিপদে পড়লে তোকেই ধরব।

সুবল একগাল হেসে বলল—সে চিন্তা করতে হবে না। আর একজন আত্মীয় জিজ্ঞেস করলেন—পরের বারে বিধানসভার টিকিট পাবি তো?

—দেখা যাক। সুবল দত্ত একগাল হেসে বললেন।

দিন সাতেক পরে সুবল দত্ত হাজির। দু'হাজার টাকা হরিহরের দিকে এগিয়ে বলে—আর কত দেব?

—আর দুশো দিন।

—তোর ছবি বাঁধাইয়ের প্রশংসা সবাই করল। এই নে পাঁচশো দিলাম।

সুবলবাবু চলে গেলেন। কদম চারপাশ দেখে মুখ খুলল, দাদা, সুবলবাবুর মা গত বছর মারা গেলেন, তা মায়ের ছবি বাঁধিয়েছেন?

—না, তাতে তুর কী রে? যা চা নিয়ে আয়। এমন সময় লক্কা হাজির। একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি বের করে হরিহরকে দেখায় —এটাকে বড় করে কাকা বাঁধাই করতি হবে। পারবা?

লক্কার দিকে তাকিয়ে হরিহর বলল—পারব, কিন্তু খরচা আছে।

—কত?

—দেড় হাজার তো লাগবেই। কলকাতা যাতি হবে। ছবি সেখানে বড় করে আনতি হবে। বুঝলে ভাইপো।

ঘচাং করে বুক পকেট থেকে হাজার টাকার একটা নোট বের করে লক্কা বলল—সামনে বিয়ে। বউভাতের দিন প্যান্ডেলে রাখব। কতদিন লাগবে কাকা।

—দিন দশেক।

—ঠিক আছে কাকা। ভাল কথা, ছবি বড় করে এনে দেখাব।

হরিহর ছবিটা দেখে বলে—ভাইপো, মুখ্যমন্ত্রী তোমার বাইকের পেছনে বসে কোথায় যাতিছিলেন?

—আরে কাকা নির্বাচনে এসেছিলেন। গ্রামের রাস্তায় গাড়ি ঢুকবে না। তাই সুবলদা আমার বাইকে বসিয়ে প্রচারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এ ছবি অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। সে ব্যাটা ফটোগ্রাফার দেড়শো টাকা নিল। নিক। এমন ছবি কি আর এ জন্মে হবে? কাকা চলি। ভাল করি করবা।

—চিন্তা নাই ভাইপো।

লক্কা চলে যেতেই হরিহর প্রায় নেচে উঠে বলল—ও কদম, মা মুখ তুলি চাহিছেন। মনি হচ্ছে, বিজিনেসে আবার জোয়ার এল।

কদম দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল—জয় মা মুখ্যমন্ত্রী। তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছেন!

দিন পাঁচেক পরে রাতের দিকে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে যাচ্ছিল হরিহর। এমন সময় বিমল মুখার্জি হাজির।

—হরিহর দোকান বন্ধ করছো নাকি?

—হ্যাঁ কাকা।

—শোনো কথা আছে।

—কী কথা? কাল বললি হয় না?

—না রে হরিহর। ছবিটা আবার ফেরত নিয়ে যাব?

—ও ছবি বাঁধাই-এর কথা। আসেন কাকা। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে ছবি দেখে হরিহর আর কদম।

—ভাল করে বাঁধাবি হরি।

—হবে। সব হবে কাকা। ভাল ফ্রেমে বাঁধাই করব। খরচটা একটু বেশি লাগবে। তা হাজার খানেক তো লাগবেই।

—এই নে পাঁচশো দিয়ে গেলাম। বাঁধানোর পর বাকি টাকা দেব। বিমলবাবু চলে গেলেন সাইকেলে। বেশ কিছুটা দূরে যেতে কদম বলল—দাদা, ইনি তো হাত চিহ্নির লোক। মুখ্যমন্ত্রীর গলায় ওটা কী দিচ্ছেন?

—গাধা, এরে কয় উত্তরীয়।

খানিক থেমে হরিহর বলে, সবাই স্মৃতি বাঁধাই করে রাখতিছে। তোরে খবর দিই, আরও পাঁচখান ছবির বাঁধাই অর্ডার আসতিছে। বুঝলি কদম, মা মুখ তুলি চায়িছেন।

কদম প্রশ্ন করে—মা কালী না মা মুখ্যমন্ত্রী?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হরিহর একটা সিগারেট ধরিয়ে আর একটা কদমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—তুইও ধরা। আজ বড় খুশির দিন রে ....

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু





মারাদোনা

গৌতম ঘোষদস্তিদার

সকালে চা খেতে-খেতে ডায়েরির পৃষ্ঠায় চোখ বোলাচ্ছিল মারাদোনা মণ্ডল। খবর কাগজ পড়ার বদভ্যাস ছেড়েছে অনেকদিন হল। আগের জীবনে সে খবরের কাগজ পড়ত শেষ-পৃষ্ঠা থেকে। খেলার খবর ছাড়া পৃথিবীতে আর-কোনও খবর আছে, ভাবতেই পারত না সে।

খেলার খবরের মধ্যে ক্রিকেট নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না মারাদোনা। ফুটবলটাই ছিল তার 'প্যাশন'। প্যাশন কথাটা তাকে শিখিয়েছিল পুলকদা। পুলকদা ছিল তাদের কোচ। বলত, ফুটবলটাকে প্যাশন বানাতে হবে। রাতে ফুটবলের স্বপ্ন দেখবি। স্বপ্নে যে-দিন দেখবি, মারাদোনার পা থেকে তুই বল কেড়ে নিচ্ছিস, সে-দিন বুঝবি, ফুটবল তোর প্যাশন।

সত্যি-সত্যি একদিন ওইরকম স্বপ্ন দেখেছিল মারাদোনা। দেখেছিল মাকালতলার মাঠে সত্যিকারের মারাদোনার পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে দৌড়চ্ছে বিপক্ষের গোলপোস্টের দিকে। ডিফেন্স ভেদ করে কোণাকুনি শটে গোলকিপারকে ধরাশায়ী করে বলটা ঢুকিয়ে দিল একেবারে বারের গা-ঘেঁষে। সারা-মাঠ ফেটে পড়ল উল্লাসে। আর, সে দেখল, মারাদোনা মাঝ-মাঠ থেকে কোমরে হাত দিয়ে হতবাক হয়ে দেখছে, তাদের গোলকিপার নিচু হয়ে বল কুড়িয়ে আনছে জালের ভিতর থেকে।

হতচকিত মারাদোনা এগিয়ে এসে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলেছিল, 'লেগে থাকো, ফুটবলটা তোমার হবে।' মারাদোনার স্পষ্ট মনে আছে, স্বপ্নের মারাদোনার গায়ে নীল-সাদা নয়, ছিল লাল-হলুদ জার্সি। খেলার শেষে জার্সিটা খুলে তার দিকে ছুড়ে দিয়েছিল মারাদোনা।

পরদিন বিকেলে মাকালতলার মাঠে সেই স্বপ্নের বিবরণ দিতে তার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। শুনে বন্ধুরা হ্যা-হ্যা করে হেসেছিল। হাসেনি শুধু পুলকদা। গম্ভীর-মুখে বলেছিল, 'আমি জানতাম, একদিন তুই ঠিক এমন স্বপ্ন দেখবি।'

মারাদোনা বলেছিল, 'কিন্তু, মারাদোনার গায়ে লাল-হলুদ জার্সির কেসটা কী বলো তো, পুলকদা!'

পুলকদা বলেছিল, 'ওটা সিম্বলিক। মানে হল, ওই লাল-হলুদ জার্সি একদিন তোর গায়ে উঠবে।'

সে-সবার ডিস্ট্রিক্ট-লিগের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেছিল মারাদোনা। তৃতীয় গোলটা দেওয়ার জন্য সে যখন মাঝ-মাঠ থেকে প্রতিপক্ষের একের-পর-এক প্লেয়ারকে কাটিয়ে বল নিয়ে ছুটছে প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের দিকে, তখন সাইডলাইন থেকে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে পুলকদা, 'গো মারাদোনা, গো ফার্স্ট মারাদোনা, ফার্স্ট।' সেই থেকে পাড়ায় তার নাম হয়ে গেল মারাদোনা। আগের মানিক নামটা ভুলেই গেল সকলে, সে নিজেও।

এমন সে-সব ভাবলে হাসি পায় মারাদোনার। তবে, মারাদোনা নামটি ছাড়েনি সে। ব্যাঙ্কের লোকেরাও তাকে ওই-নামেই জানে। নামটা এখন ওই মহলে বেশ-পরিচিত, বিখ্যাত। নামটা ফেটেছে। মাঝে-মাঝে মনে হয়, ওই নামটার জন্যই করে খাচ্ছে সে। লোকে নামটাকে চমকায়।

ডায়েরির পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে সারাদিনের কাজের কথাগুলি ভেবে নিচ্ছিল মারাদোনা। এতদিন সে যে-সব কাজ করত, এখনকার কাজটা তা থেকে হেল-হেভেন আলাদা। এখন আর বিশেষ গজ বা মেশিনটেশিন ব্যবহার করতে হয় না। স্রেফ চমকালেই কাজ হয়। তা-ও সব সময় পার্টির মুখোমুখি না-গেলেও চলে। টেলিফোনেই কাজ হাসিল হয়ে যায়। যারা একটু-বেশি ত্যান্ডাম্যান্ডাই করে, তাদের জন্য একটু আঙুল বেঁকাতেই হয়। সেগুলিও এমনকিছু নয়, বাঁয়ে হাত কা খেল।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে মারাদোনার ব্যবস্থা একেবারে পাকা। কেস-অনুযায়ী সার্ভিসচার্জ পায় সে। লোন-রিকভারি এজেন্ট হিসাবে মারাদোনা এখন তিনটে ব্যাঙ্কের হয়ে কাজ করছে। কয়েকজন লোকও রাখতে হয়েছে। লোক মানে কী—ওই বেজি, জুজু, সাক্ষী, পটল ওরাই সব সাল্টে দেয়। মারাদোনার জন্য জান লড়িয়ে দিতে পারে ওরা। স্টেশন রোডের 'আকাশকুসুম অ্যাপার্টমেন্ট'-এ একটা ছোট অফিসও বানিয়েছে মারাদোনা—'মারাদোনা ফিনান্সিয়াল এজেন্সি'। টেলিফোন, কম্পিউটার রেখেছে, সাজিয়েছে চমকাই করে। লক্ষ্মী-গণেশের মাটির মূর্তির পাশে দেওয়ালে লাগিয়েছে মস্ত মারাদোনার ছবি। পায়ে বল নাচাচ্ছে। ঘরটা বাবুল সেনকে চমকেই পেয়েছিল। দারুণ পজিশন। বেচলে লাখ-বিশেক তো পেতই। অবশ্য, একেবারে ফোকটে ঘরটা ছাড়েনি ঘাগু প্রোমোটার বাবুল সেন। দত্তবাড়ির পিছনের পুকুর ভরাট করা থেকে ভাড়াটে তোলা থেকে মিউনিসিপ্যালিটি সামলানো সবই করেছিল মারাদোনা। পার্টি-ফান্ডেও কম ঢালতে হয়নি তাকে। স্টোনচিপ আর বালি-সিমেন্ট সাপ্লাই করেছিল এলসিএসের সিন্ডিকেট। মারাদোনা সে-সব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। দেখতে-দেখতে চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াল জি-প্লাস থ্রি আকাশকুসুম অ্যাপার্টমেন্ট। নতুন লোকজন আসা শুরু করল। বেশ জমাটি হয়ে গেল জায়গাটা।

ফ্ল্যাটের অনেককেই ক্রেডিটকার্ড করিয়ে দিয়েছে মারাদোনা। কার্ড করাবার ফ্রাঞ্চাইজিও তাকে দিয়েছে আইপিআই ব্যাঙ্ক। ফ্র্যাঞ্চাইজি মানে ওই আর কী। পার্টি ফিট করে তাকে সে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেয়। কেস ম্যাচিওর করলে সে নিজের কমিশন পেয়ে যায়। হিসাব বরাব্বর। প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলি এখন টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারে একেবারে কাছাখোলা হয়ে গেছে। 'টাকা নাও, টাকা নাও' বলে সাধাসাধি করছে। একটা সময় চাকরিবাকরি না-পেয়ে সে যখন ছোটখাটো ব্যবসা করবে বলে ব্যাঙ্কে-ব্যাঙ্কে একটা দশ-বিশ হাজার লোনের জন্য মাথা কুটেছে, তখন তাকে কেউ পাত্তাই দেয়নি। গত কয়েক বছরে অবস্থাটা চোখের সামনে পাল্টে যেতে দেখল মারাদোনা। ব্যাঙ্কগুলি এখন নিজেরাই যাচ্ছে লোকের বাড়িতে টাকা গছাতে, ফোন করে বলছে, 'লোন নেবে গো, লোন?'

মজার ব্যাপার এই ক্রেডিটকার্ড। পকেটে ওই ছোট প্লাস্টিক-কার্ডটা থাকলেই তুমি সর্বেসর্বা। মেশিনে কার্ড ঢোকাও, দু-চারটে বোতাম টেপাটুপি করো, ব্যস, খেল খতম, তোমার হাতে চলে আসবে ঝকঝকে কাঁচা-নোট, যেমন খুশি হজম করো। পকেটে টাকা নিয়ে বাজারে বের হতে হবে না, দোকানে ঢুকে ইচ্ছেমতো কেনাকাটা করে আলতো করে পার্স থেকে বের করে দাও চকচকে কার্ড, দোকানদার মেশিনে ঘষে উসুল করে নেবে তার প্রাপ্য। ব্যাঙ্ক বলে, এ-ভাবেই জীবন সহজ করে দিচ্ছে তারা।

সহজই বটে। লোভী-মানুষ যদি একবার আদিগন্ত বিল দেখতে পায়, তা হলে তাকে আর ঠেকায় কে! তখন কেবল, ভোগ করো, ভোগ করো, ঋণ করে মাখন খাও। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

আর, এখান থেকেই সিনে ঢোকে মারাদোনা। ব্যাঙ্ক তাকে লিস্ট ধরিয়ে দেয়, কে-কে টাকা শোধ করছে না। লিস্টে থাকে পার্টির নাম, ঠিকানা টেলিফোন নম্বর, বাড়ির, অফিসের, মোবাইলের। ব্যস, কাজ শুরু করে দেয় মারাদোনা। কাজ ফেলে রাখার অভ্যাস নেই তারা।

সকালেই ডায়েরির পাতা উল্টে দিনটাকে মোটামুটি ছকে নেয় মারাদোনা। কাকে ফোন করতে হবে, কার অফিসে লোক পাঠাতে হবে, কার বাড়ি থেকে ফ্রিজ বা টিভি তুলে আনতে হবে, বেজি বা জুজুদের কাকে কোথায় পাঠাবে,—সব মনে-মনে সজিয়ে নেয় মারাদোনা।

আজকের লিস্টের প্রথমেই রয়েছে কৃষ্ণগোপাল সাহার নাম। সরকারি চাকুরে, বেহালায় থাকে, ক্রেডিট-লিমিট ক্রস করে গেছে, গত ছ-মাসে ব্যাঙ্কে একটা টাকাও ঠেকায়নি। লিস্টে নামের পাশে দুটো স্টার মারা রয়েছে। তার মানে, একে ভিআইপি-ট্রিটমেন্ট দিতে হবে— এমারজেন্সি কেস। দু-তিনদিন বাড়িতে ফোন করে গোপালকে পাওয়া যায়নি। মোবাইলটা বন্ধ করে রেখেছে। আজ লোকটার অফিসে জুজু বা বেজিকে পাঠাতে হবে। তার আগে এখন একবার বাড়িতে ফোন করে দেখা যেতে পারে।

রিসিভারটা তুলে একে-একে নম্বরগুলো পুশ করল মারাদোনা। টেলিফোন-নম্বর মুখস্থ রাখার অসামান্য প্রতিভা রয়েছে তার। একবার করলেই নম্বরগুলো মনে গেঁথে যায়। অন্তত শ-পাঁচেক নম্বর তার মনে জ্বল-জ্বল করছে।

বাজছে, বেজে যাচ্ছে ফোনটা। কাঁধের কাছে গাল দিয়ে রিসিভারটা চেপে রেখে, শব্দে কান পেতে সিগারেট ধরাল মারাদোনা। সিগারেট ধরালে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ভিলেনরা ঠোঁটে সিগারেট চেপে কথা বলে, হিন্দি-সিনেমায় দেখেছে মারাদোনা।

এক-লাখের লিমিট একেবারে ননীর মতো চেটেপুটে খেয়েছে কৃষ্ণগোপাল। দেদার জিনিস কিনেছে, ফ্লাইটের টিকিট কেটেছে, ক্যাশ তুলেছে এটিএম থেকে। মারাদোনা মনে-মনে বলার কথাগুলি গুছিয়ে নিচ্ছিল।

'হ্যালো?' ও-পারে ফোন তোলার সাড়া।

'কৃষ্ণগোপালবাবু বলছেন?' ও-পারে প্রশ্ন।

'আইপিআই ব্যাঙ্ক থেকে মারাদোনা মণ্ডল বলছি। গত ছ-মাসে আপনি ব্যাঙ্কে একটা টাকাও ঠেকাননি। আপনাকে ছ-মাসে বারোটা

রিমাইন্ডার পাঠানো হয়েছে। কোনও রেসপন্স করেননি। আপনি মোবাইল বন্ধ করে রেখেছেন। আপনার অফিসে-বাড়িতে গিয়ে আপনাকে পায়নি আমাদের লোক। আপনার শরীর ঠিক আছে তো, গোপালবাবু?' মারাদোনা গলায় মধু ঢেলে বলল।

'আমার নাম গোপাল নয়, কৃষ্ণগোপাল!' কৃষ্ণগোপাল বলল।

'ওই হল। যে কৃষ্ণ, সে-ই গোপাল! খামোখা দুটো নাম দিয়ে কী হবে, বলুন তো!' মারাদোনা বলল।

'আপনাকে আমার নাম দিয়ে অত ভাবতে হবে না। নিজের নাম নিয়ে ভাবুন। নাম ভাঁড়িয়ে ফোন করছেন কেন?' কৃষ্ণগোপাল বলল।

'আমিও তো তা-ই বলি। কাম টু দ্য পয়েন্ট। আপনি তো ডিফল্টার হয়ে যাবেন মশাই!' মারাদোনা বলল।

'কী করা যাবে, আমি কলকাতায় ছিলাম না। সময় হলেই দিয়ে দেব।' কৃষ্ণগোপালের গলায় বেশ ঝাঁঝ।

'ওয়েল, ওয়েল। তা, আপনার সময়টা কবে হবে, জানতে পারি, স্যার?' মারাদোনা আরও শান্ত।

'তা কী করে বলব!' কৃষ্ণগোপালের গলায় বিরক্তি।

'সে তো ঠিকই। কার হাতে কবে টাকা আসবে, তা কি আগে থেকে বলা যায়। তবু, একটা টেন্টেটিভ ডেট যদি বলেন! বুঝতেই পারছেন, ব্যাঙ্ক তো আর দানসত্র খুলে বসেনি!'

'আই কান্ট কমিট। তাছাড়া, কাস্টমার টাকা দিতে দেরি হলে তো ব্যাঙ্কেরই লাভ। আপনারা তো ইন্টারেস্ট চাপাচ্ছেন।' কৃষ্ণগোপাল মচকাবার নয়।

'আপনি স্যার ঘুঘু দেখেছেন, আপনাদের বেহালায় ঘুঘু আছে দু-চার পিস?' মারাদোনা শান্ততর।

'অ্যাঁ, কী, হোয়াট ডু ইউ মিন!' কৃষ্ণগোপাল বিচলিত।

'ঘুঘু, ঘুঘু, একরকম পাখি, খাকি-রঙের, দেখেননি?' মারাদোনা আরও গলা নামাল।

'মানে!' কৃষ্ণগোপাল স্তম্ভিত।

'খুব সিম্পল। দু-একটা ঘুঘু স্রেফ আপনার ভিটেয় ছেড়ে দিয়ে আসব। আমার অনেক পোষা-ঘুঘু আছে, স্যার। দারুণ পাখি, পোড়ো-ভিটেয় চরে বেড়ায়, মার্ভেলাস, খুব সুন্দর লাগে দেখতে!' মারাদোনা বলল, একেবারে সাধা-গলায়।

'আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!' কৃষ্ণগোপাল ঈষৎ-ত্রস্ত।

'শুয়োরের নন্দন, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দ্যাখোনি, অ্যাঁ, ফাঁদ দ্যাখোনি! টাকা দেখেছ, মারাদোনা দ্যাখোনি! এক-হপ্তার মধ্যে পুরো-টাকা ফেরত দেবে, বুঝলে গোপাল!' মারাদোনা গলা না-চড়িয়েই বলল।

'আপনি, আপনি আমায় থ্রেট করছেন! জানেন, আমি কে! আমি পুলিশে যাব, কোর্টে যাব। মগের মুলুক পেয়েছেন! দেশে আইনকানুন নেই নাকি!' কৃষ্ণগোপাল উত্তেজিত, হাঁফাচ্ছে।

'কী হল চেঁচাচ্ছ কেন, কার ফোন?' ফোনের ভিতর সন্ত্রস্ত নারীকণ্ঠ শুনতে পেল মারাদোনা। বুঝল, এতক্ষণে তির সঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে।

রিসিভারটা বাঁ-কান থেকে ডান-কানে নিতে-নিতে মারাদোনা বলল, 'আহা, বেচারি বউদি বোধহয় ভয় খেয়ে গেছেন! আপনি এত ভলিউম বাড়িয়ে দিলেন! আমাকে কিন্তু দোষ দেবেন না! এক-কাজ করুন, আমাকে ফোনটা একবার দিন। আমি ওনাকে বুঝিয়ে বলছি, ভয়ের কিছু নেই।'

কৃষ্ণগোপাল বলল, 'ওনার কথা অত ভাবতে হবে না আপনাকে। নিজের চরকায় তেল দিন।'

মারাদোনা হাসল, 'আরে, আপনারাই তো আমার চরকা। আপনাদের মতো টিকরমবাজদের চরকায় তেল লাগানোই তো আমার কাজ!'

কৃষ্ণগোপাল বলল, 'আপনি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছেন। আমি ব্যাঙ্কে রিপোর্ট করব।'

মারাদোনা বলল, 'শুনুন এ-সব করার অনেক সময় পাবেন। করে অবশ্য কোনও লাভ হবে না। তার চে ভালয়-ভালয় কেসটা মিটিয়ে ফেলুন।'

লোকটা হুট করে লাইনটা কেটে দিল। এ-সব মালকে কম চেনে না সে। ব্যাঙ্কিংয়ে কম দিন তো হল না। ফুটানি মারার ব্যাপারে ষোলো-আনার উপর আঠারো-আনার। কেরানি কেরানির মতো থাকবি। তা নয়। পুরনো টিভি পাল্টে এলসিডি না-নিলে পাড়ায় প্রেস্টিজ থাকে না, ফ্রিজ না-পাল্টালে রাতে বউ বিছানায় ঝামেলা করে, কিচেনে চিমনি না-নিলে বউয়ের হাড়মাস কালি হয়ে যায়, এসি ছাড়া ছেলেমেয়ের ঘুম হয় না, গরমে শিমলা না-গেলে শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখানো যায় না—নানা বায়নাক্কা এইসব ভেতো-কেরানিদের। আরে বাবা, ব্যাঙ্ক তো এত সুযোগ দিচ্ছে, আর ব্যাঙ্কের কথা তোরা একটু ভাববি না! এই যে কৃষ্ণগোপাল, এসসিডি টিভি কিনেছে, বউকে প্লেনে চাপিয়ে শিমলা বেড়াতে নিয়ে গেছে, দামি হোটেলে থেকেছে—সে-সব টাকা ব্যাঙ্ক তো সবাইকে গুনে-গুনে মিটিয়ে দিয়েছে। মাসে-মাসে সামান্য ইনস্টলমেন্ট দিয়ে শোধ করে দে। তা না, খালি ফেরেব্বাজি! ব্যাঙ্ক কি এখন তোমার জন্য আঙুল চুষবে! নিজের ঠাকুর-দেবতার নামের একটা মর্যাদা দিবি না! টাকা দিতে পারিসনি, আটকে গেছিস, ঠিক আছে। সে জন্য মোবাইল বন্ধ করে দিবি! একটু ভদ্রতাজ্ঞান নেই! আবার কোর্ট দেখাচ্ছে মারাদোনাকে! রোয়াবি একেবারে চটকে দিতে পারে মারাদোনা, জানে না কৃষ্ণগোপাল!

অবশ্য, এ-সব গোপালঠাকুররা আছে বলেই মারাদোনা করেকম্মে খাচ্ছে। আগে বাজার থেকে তোলা তুলতে হত, এলসিএসকে তোয়াজ করতে হত, প্রোমোটারের হয়ে জমি-বাড়ি খুঁজতে হত, ভাড়াটে তোলার দায় নিতে হত, ভোটের সময় বুথ-জ্যাম করতে হত। সে-সব উঞ্ছবৃত্তি তো আর এখন করতে হয় না মারাদোনাকে। সে লাল-হলুদ জার্সি পরতে পরেনি ঠিকই, কিন্তু লালঝাণ্ডা তো কম ওড়ায়নি জীবনে। সে-জন্য কাঠখড় তো কম পোড়ায়নি মারাদোনা। হাতে একটু-আধটু রক্তও লেগেছে কখনও সখনও। সে-সব নিয়ে বেশি ভাবেনি মারাদোনা। হাত থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলেছে, মুছে ফেলেছে।

অবশ্য, পুরনো রাজপাট একেবারে ছেড়ে দেয়নি মারাদোনা। এখন সে-সব কেস জুজু-বেজিরাই সামলায়। মারাদোনা ব্যাঙ্কের কাজেই ধ্যান দিয়েছে। ব্যাঙ্কই তাকে মোবাইল দিয়েছে, একটা মারুতিও নিয়েছে সে কার-লোনে। তার এখন নিজের ভিজিটিং-কার্ড আছে। কার্ডে সোনার জলে নাম ছাপা, নীচে লেখা, রিকভারি এজেন্ট। লোকাল থানায় মারাদোনার আধিপত্য কম নয়। বড়বাবুকেও একটা ক্রেডিট-কার্ড করিয়ে দিয়েছে সে। বড়বাবুর অবশ্য তা বিশেষ কাজে লাগে না। তার সবটাই ডেবিট।

এই কৃষ্ণগোপাল লোকটা তাকে বেশ-কিছুদিন ধরে খুব জ্বালাচ্ছে। অফিসে-বাড়িতে ফোন করে-করে হন্যে হয়ে গেছে। আজই প্রথম মালটাকে জালে পেল। পার্টিদের বিষয়ে সে কিছু এথিকস মেনটেন করে। প্রথমেই বাড়ির লোক, পাড়া বা অফিসে কিছু জানাতে চায় না। আগে পার্টিকে বাজিয়ে নেয় মারাদোনা। যদি বোঝে, কোনও হুজ্জত নেই, তা হলে ঠিক আছে। সে সোজা আঙুলেই ঘি তুলতে চায়। তাতে কাজ না হলে তাকেও আঙুল বেঁকাতেই হয়। দু-তিনদিন মোবাইলে ট্রাই করে লোকটাকে না-পেয়েই মটকা গরম হয়ে গিয়েছিল মারাদোনার। সে সম্যক বুঝেছে, এ-গোপাল মোটেই সে-গোপাল নয়। লোকটা হাড়ে-হাড়ে বজ্জাত। চাঁদু, এখনও মারাদোনাকে চেননি!

মারাদোনা ভেবে নিল, প্রথমে লোকটার বাড়িতে যাবে। তারপর তার অফিসের বস কিংবা কলিগদের একে-একে জানাবে কায়দা করে। একটা রোববার দেখে জুজু-বেজিদের গোপালের বাড়িতে পাঠিয়ে কচি করে

পাড়ায় শোর মাচিয়েও দেওয়া যায়। এই টোটকাটা খুব কাজে লাগে। নিমেষে আমোদগেঁড়ে পাবলিক বাড়ির চারপাশে জড়ো হয়ে সমস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে, দাদা, কেসটা কী?' আর, তাতেই মুচকে যায় সব মিডল-ক্লাস গোপালেরা। তবে, মারাদোনার বিবেক আছে। সেই যখন ফুটবল খেলত, পুলকদা তাকে বলেছি, 'শোন ফালতু-ফালতু মাঠে ফাউল করবি না। তোকে তোর স্কিল দিয়ে অপনেন্টের পা দিয়ে বল কেড়ে নিতে হবে। তুই তো আর মস্তানি করার জন্য মাঠে নামিসনি। তবে, বাধ্য হলে একটু-আধটু পুশটুশ তো করতেই হবে। ফুটবলটা তো বডি-গেম।' পুলকদা চলে গেছে। কিন্তু, তার কথাটা মনে রেখেছে মারাদোনা। বাধ্য না-হলে ফাউল-প্লে সে করে না পারতপক্ষে। সে কি হৃদয়হীন কাবলিওয়ালা নাকি যে, অফিসের গেটে বা পাড়ার মোড়ে পার্টির গলায় গামছা দেওয়ার জন্য ওত পেতে থাকবে!

কিন্তু, মারাদোনা ভেবে দেখেছে, এইসব আধুনিক ব্যাঙ্কগুলি ওই কাবলিওয়ালাদেরই আধুনিক সংস্করণ। এরা তো আসলে তাদের দিয়ে কাবলিওয়ালাদের কাজটাই করাচ্ছে। মধ্যবিত্তের ঠুনকো আত্মসম্মানবোধের উপর চাপ দেওয়ার কনসেপ্টটা নিশ্চিত কাবলিওয়ালাদের থেকেই এসেছে। মাথা বটে এসব শিক্ষিত মালদের। জানে, আইন-আদালতের ঝুটঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই কোনও। তাতে খামোখা টাকা আর সময় নষ্ট। কোর্ট যে তাদের পক্ষে রায় দেবে, তার গ্যারান্টি কী! বিচারকগুলো বহুত ইয়ে পাবলিক। পার্টির পক্ষেই কথা বলে। এত হেবি ইন্টারেস্ট নিতে বলেছে নাকি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, এ-সব উটকো প্রশ্ন তোলে। তার চেয়ে মারাদোনাদের দিয়ে কম-পয়সায় বেশি কাজ হয়। তারা একটু চমকালেই সুড়সুড় করে টাকা ফেরত দিয়ে দেয় গোপালেরা।

বিপদ যে কখনও হয় না, তা নয়। কিন্তু, সে-সব কালেভদ্রে। গত বছর কেশবপুরে একটা এমন কেস হয়েছিল। জুজুটা ফালতু মাথাগরম করে লোকটাকে বেমক্কা চড় কষিয়ে দিল। গোটা হাউজিংয়ের লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। পাবলিকের চরিত্র খুব জটিল। কখন কোনদিকে পাল্টি খাবে, বোঝা যায় না। বেশ সবাই দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে মজা দেখছিল। লোকটা একটু তড়পাতেই জুজু তাকে দিয়ে দিল একেবারে কানের গোড়ায়। দেখে লোকটার রোগা-পাতলা বউটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। লোকটা কলেজে পড়ায়, পাড়ায় ইজ্জত আছে। চড় খেয়ে লোকটা কেমন ভ্যাবলার মতো তাকাল চারপাশে। আর, তাতে লোকটার বউ মরাকান্না কেঁদে উঠতেই পাবলিক নিমেষে একেবারে খেপচুরিয়াস হয়ে গেল। চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল তাদের। বাধ্য হয়ে মেশিন বের করেছিল মারাদোনা। কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছিল তিনজনে। সেদিন রাতেই লবঙ্গলতা কলেজ-মাস্টারটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল। অবশ্য, কপালজোরে বেঁচে যায়। সময়ে চোখে পড়েছিল লোকটার বউয়ের। রাতদুপুরে কেলেঙ্কারির এক শেষ। তবু, জল গড়িয়েছিল অনেকদূর। পাড়ার লোকেরা থানা ঘেরাও করেছিল। ব্যাঙ্ক আর মারাদোনার নামে এফআইআর করেছিল ক্লাবের ছেলেরা। আর, ওই সাংবাদিকদের খেয়েদেয়ে কোনও কাজ নেই, কাগজে ফলাও করে ছেপে দিয়েছিল খবরটা। কেসটা সাল্টাতে হেবি কিচাইন হয়েছিল। ব্যাঙ্ক তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। মারাদোনা বলেছিল, 'একটা আলতো চড় খেয়েই যে লোকটা গলায় দড়ি দেবে, কী করে বুঝব স্যার!' তারা তখন ক'দিন দার্জিলিংয়ে বেড়াতে চলে গিয়েছিল। থানার বড়বাবুকে মাল ঢেলে ব্যাঙ্ক কেসটা ধুয়ে-মুছে দিয়েছিল।

কাল জুজুরা একটা কালার-টিভি তুলে এনেছে বেলগাছিয়া থেকে। ব্রান্ড-নিউ, এলসিডি। পার্টি বাড়িতে ছিল না। পার্টির বউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বেজি তাকে বলে এসেছে, 'আজ টিভিটা নিয়ে যাচ্ছি। কাল সময় করে এসে ফ্রিজ আর ওয়াশিং-মেশিনটাও নিয়ে যাব।' সেগুলি অবশ্য কথার কথা। লোকটা কেবল টিভিই নিয়েছিল ক্রেডিট-কার্ডে। ওটুকু চমকাতেই হয়। কিছু করার নেই।

সন্ধেবেলাই অফিসঘরে কেবল-লাইনের ব্যবস্থা করে টিভিটা চালিয়েছিল জুজুরা। বেশ ঝকঝকে কালার, দারুণ ভলিউম। দামি জিনিস, নামী কোম্পানির। অফিসঘরে টিভিটা বেশ মানানসই হয়েছে। টিভিটার পিকচারে চোখ রেখে মারাদোনা দেখছিল অন্য-দৃশ্য। টিভিহীন বাড়িটায় এখন কোন দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে, তা ভাবার চেষ্টা করছিল সে।

আজ আগেই অফিসে এসে পড়েছে মারাদোনা। বাহাদুর দশটায় এসে অফিস খোলে। রোজ এগারোটার মধ্যে একে-একে এসে পড়ে জুজু, বেজি, অসীমা। জুজু, বেজি কাজ বুঝে নিয়ে বেরিয়ে যায়। অসীমা অফিসে থাকে। সে কোম্পানির রিসেপসনিস্ট-কাম-পিএ। জলের মতো ইংরেজি-হিন্দি বলতে পারে। পার্টিদের সঙ্গে সে-ই কথা বলে। ফোন করার থাকলে করে, ফোন এলে ধরে। মেয়েছেলে-পার্টির জন্যই অসীমাকে রেখেছে মারাদোনা। সে এ ব্যাপারে খুব এফিসিয়েন্ট। নির্বিকার-মুখে লোককে তিন-ভাষায় গাল দিয়ে যেতে পারে টেলিফোনে। অসীমা তাদের মহিলা-পুলিশও। অবশ্য, মহিলা-পার্টিদের সঙ্গে এখনও তেমন কিচাইন হয়নি।

দুপুরে একবার বেরিয়ে বাড়িতে গিয়ে খেয়ে এল মারাদোনা। ফেরার পথে অন্য-দুটো কাজ সেরে এল। অফিসে ফিরে মনে হল, মাথাটা একটু ধরেছে। অসীমাকে নিজের চেম্বারে ডেকে কপালে বাম লাগিয়ে দিতে বলবে কি না, ভাবল একবার। তারপরেই মনে পড়ে গেল গোপালের কথা। কাজ ফেলে রিলাক্স করায় মারাদোনা নেই। ভাবনাটা বাতিল করে মোবাইলটা তুলে নিল মারাদোনা।

এই দুপুরে গোপালঠাকুর নিশ্চয়ই বাড়িতে নেই। সেই সুযোগে গোপালের বউকে একটু বাজিয়ে নেওয়াই যায়। মহিলা তখন 'কী হয়েছে, কার ফোন' বলে খুব উতলা হয়েছিলেন। ওনার কৌতূহলটা মিটিয়ে দেওয়া দরকার। ফালতু এক মহিলাকে টেনশনে রেখে লাভ তো নেই কিছু, মারাদোনা ভাবল।

ফোনটা বাজছে। একটু অপেক্ষা করল মারাদোনা। সম্ভবত, পাশের ঘর থেকে এসে ফোন ধরলেন গোপালের বউ।

'হ্যালো?' মহিলার গলা বেশ সুরেলা।

'হ্যালো, বউদি, নমস্কার, আমার নাম মারাদোনা মণ্ডল।' মারাদোনা নরম করে বলল।

'ক্‌কী! মারাদোনা! দুপুরবেলা মজা করছেন! কাকে চাই?' মহিলা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

'আপনাকেই চাইছি, বউদি। সকালে আমি কৃষ্ণগোপালবাবুকে ফোন করেছিলাম আইপিআই ব্যাঙ্ক থেকে।' মারাদোনা বিনীত-গলায় বলল।

'কী ব্যাপার, বলুন তো! উনি তো এখন বাড়িতে নেই।' পলকে মহিলার গলার তাপ নেমে গেল।

'ব্যাপার তেমন-কিছু না, বউদি, ভেরি সিম্পল, আমি সকালে সেই কথাটাই বোঝাতে গেলাম গোপালবাবুকে।' মারাদোনা বলল।

'ওনার নাম গোপাল নয়।' মহিলা বললেন।

'সরি, সরি, পুরোটা আমি মনে রাখতে পারি না।' মারাদোনা হাসল।

'কথাটা কী?' মহিলা বললেন।

'আরে, ওই যে বললাম, সিম্পল, ভেরি সিম্পল। আসলে, কেষ্টগোপালবাবু ক্রেডিট-কার্ডে এক-লাখ টাকা নিয়েছেন। আপনি তো সবই জানেন, বউদি। রিসেন্টলি দাদা বোধহয় একটু অসুবিধায় পড়েছেন। ছ-মাস ব্যাঙ্কে একটা টাকাও উপুড় করেননি। আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন। দেরি করলে ফালতু ইন্টারেস্ট চেপে যাবে, বোঝেনই তো, ব্যাঙ্কগুলি আজকাল যা হয়েছে, সব রক্তচোষা বাদুড়। আমি সকালে দাদাকে সে-কথাই বোঝাতে গেলাম। দাদা বেকার চেঁচামেচি করলেন। আরে, বাবা, চেঁচিয়ে কী হবে! ব্যাঙ্ক তো আর রাজা হরিশ্চন্দ্র নয়।' মারাদোনা সহৃদয়ের মতো বলল।

'কী বলছেন আপনি! এত টাকা নেবেন কেন উনি! আপনাদের



কোনও ভুল হচ্ছে। অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন।' মহিলা কাতর হলেন।

'যাহ্, বাবা, আপনি তো ভাল ড্রামাবাজি শুরু করলেন! আপনাদের টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং-মেশিন— এ-সব কি আপনার কত্তা নগদে কিনেছেন? আর, এপ্রিলে যে আপনারা শিমলা বেড়াতে গেলেন, প্লেনের টিকিট তো কার্ডেই কেটেছিলেন। সব ভুলে গেলেন এরই মধ্যে!' মারাদোনা বলল।

'আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আমাদের তো সেই কবেকার টিভি-ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন তো নেইই। আর, শিমলাটিমলা তো ওই সিনেমায় দেখেছি।' মহিলার গলায় উদ্বেগ জড়ো হল।

'শুনুন ম্যাডাম, ওইসব গালগপ্পো শুনে আমার কোনও লাভ নেই। গোপালবাবুকে বলুন তাড়াতাড়ি টাকা ফেরত দিতে। চালাকি করে কোনও লাভ হবে না। আমার সঙ্গে ডিল করতে বলুন। আমি ব্যাঙ্কে কথা বলে কিছু কনসেশন করিয়ে দেব।' মারাদোনা বলল।

'আপনি বিশ্বাস করুন! কোথাও নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে!' মহিলা কোনওরকমে বললেন।

'ন্যাকামি ছাড়ুন! এ-সব আমরা অনেক দেখেছি। সাতদিনের মধ্যে টাকা জমা না-পড়লে আপনার শাঁখা-সিঁদুরের রিস্ক কিন্তু আমি নেব না।' মারাদোনা এ-বার কর্কশ হল।

'আপনার বিশ্বাস না-হয়, বাড়িতে এসে দেখে যান। অতগুলি জিনিস তো আর সরিয়ে ফেলিনি আমরা। আপনি আসুন, এখনই, আসবেন!' মহিলা বললেন।

'আমি গিয়ে কী করব! আপনি বরং আপনার গোপালকে আজই জিজ্ঞেস করুন, ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন নিয়ে অন্য-কোথাও নতুন সংসার পেতেছেন কি না।' মারাদোনা হাসল।

'কী বলছেন আপনি!' মহিলার গলা ডুবন্ত-মানুষের।

'ঠিকই বলছি। আপনি পুরনো টিভি দেখছেন, নতুন বউঠান হয়তো নতুন টিভি দেখছেন। দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয়, ম্যাডাম।' মারাদোনা অবিচল।

মারাদোনা এ-বার ফোন রেখে দেবে কি না, একবার ভাবল। তখনই মাথায় এল অন্য-প্রশ্ন। দ্রুত-হাতে ডায়েরির পৃষ্ঠা ওল্টাল সে। একটি পৃষ্ঠার এন্ট্রিতে আঙুল রেখে বলল, 'আচ্ছা, ম্যাডাম, গত এপ্রিলে আপনার গোপাল কলকাতায় ছিলেন?'

'না, আমার বেশ মনে আছে। উনি তখন ওনার এক সহকর্মীকে ট্রিটমেন্ট করাতে ভেলোরে গিয়েছিলেন। কেন, বলুন তো?' মহিলার গলা থমথমে।

'কেন, আর কী। কেস সলভড। গোপালবাবু আপনাকে ছাড়াই শিমলা গিয়েছিলেন। উনি মোটেই ভেলোরে যাননি।' মারাদোনা বলল।

'কী বলছেন আপনি! আপনার কাছে প্রমাণ আছে?' মহিলার গলা ধরে এল।

'সে তো আছেই। গোপালের সব সইসাবুদ তো ব্যাঙ্কের কাছে আছেই। কথা তা নয়। আপনি ভাবছি অন্য কথা।' মারাদোনা বলল।

'কী?' মহিলা খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইলেন।

'ম্যাডাম, আপনার নামটা জানতে পারি?' মারাদোনা জিজ্ঞেস করল।

'আমার নাম মাধুরী সাহা।' মহিলা কোনওরকমে বললেন।

'সরি, মিসেস সাহা, আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে। আপনার স্বামীর সঙ্গে যে শিমলায় গিয়েছিল, তার নাম সাবিত্রী সাহা। গোপালকে জিজ্ঞেস করবেন, ওই সতী-সাবিত্রীটি তাঁর কে!' মারাদোনা বলল।

মহিলা স্পষ্ট কেঁদে ওঠার আগে ফোনটা ছেড়ে দিল মারাদোনা। মেয়েছেলের কান্না তার একেবারেই পছন্দ হয় না।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



সময়ের স্রোতে

সুবোধ ভট্টাচার্য

সকাল থেকে ব্রজকিশোরের মেজাজ খারাপ। তাতাই ওর বাঁধানো দাঁতের পাটি দু'টুকরো করে দিয়েছে। ভাঙা পাটি নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল ব্রজকিশোর। যদি কোনওভাবে জোড়া দিয়ে কাজ চালানো যায়। কিন্তু বুঝল সে গুড়ে বালি। এমন ত্রিভঙ্গ মুরারি হয়ে ভেঙেছে নতুন করে আবার বাঁধাতে হবে।

আর তার নিটফল খাওয়ার বারোটা। টাকার শ্রাদ্ধ।

ভাঙা দাঁতের পাটি হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ব্রজকিশোর। রাগে শরীর কাঁপছে। ছেলেটাকে মেরে দুরমুশ করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আদরের নাতি। ছেলে বউমার সবেধন নীলমণি। কিছু বলা যাবে না।

ভাঙা টুকরো দুটো অসহায় দৃষ্টিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গলা উঁচিয়ে বলে উঠল—সব কিছু সহ্যের একটা সীমা আছে। নিজের ছেলে বলে সাতখুন মাফ হতে পারে না। এই রকম অসভ্যতামি ওইটুকু ছেলের! লাই পেয়ে বাঁদর হচ্ছে দিন দিন।

তাতাই দাদুর দাঁত জোড়া ভেঙে বুঝতে পেরেছে কাজটা সে ভাল করেনি। এর পরিণাম আন্দাজ করে সে পালিয়েছে।

কিন্তু ব্রজকিশোরের রাগ যতখানি নাতির উপর তার থেকে বেশি ছেলে বউমার উপর। ওরা দু'জন একবারের জন্য রা কাড়ল না। এমনকী মুখেও ছেলেটাকে বকাঝকা। বাবা, কী হয়েছে দেখি, তাও বলল না। যেন এটা এমন কিছু ব্যাপার নয় যে মাথা ঘামাতে হবে।

আবির আর দিয়ার নীরবতা ওকে আরও বেশি কষ্ট দিচ্ছে।

ছেলেটার এতবড় অপরাধ। ওরা কী একটা চড় বা কানমলা দিতে পারত না। এতে ওর ভাঙা দাঁতের পাটি জুড়তো না ঠিকই, কিন্তু ছেলেটা তো একটু শিক্ষা পেত।

নিজের মনে রাগ পুষে নিয়ে নতুন অঙ্ক কষতে থাকে ব্রজকিশোর। ফের একগাদা টাকার ধাক্কা। রিটায়ার করে যা পেনশন পান তা এই বাজারে টানাটানি ফেলে দেয়। তারপর আশালতার সুগার প্রেশারের মোটা বাজেটের ওষুধ। নিজেরও আজ এটা কাল সেটা লেগেই আছে। আবির দিয়া মুখে কিছু বলে না। কিন্তু দেয় টাকা কম দিলে মুখ ভারী হয়ে যায়। ব্রজকিশোর বোঝে অখুশি। তাই নিজেদের অসুবিধা হলেও সংসারের টাকা কমাতে সাহস পায় না।

চাপা রাগ নিয়ে নিজের ঘরে এল ব্রজকিশোর। আশালতা ডেঙ্গুতে শয্যাশায়ী। গা হাত পায়ে ব্যথা। শুয়ে আছে নিশ্চুপে। সব জায়গায় এত মশা বেড়েছে ডেঙ্গু না হওয়াটাই আশ্চর্য। নেতাদের শুধু কাগজে বক্তৃতা। টিভিতে ছবি। কাজের কাজ নেই। ভুগছে সাধারণ মানুষ।

অত রাগারাগি করছ কেন? কী হয়েছে? আশালতা দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করে।

হবে আর কি? তোমার গুণধর নাতি আমার বাঁধানো দাঁত ভেঙে দিয়েছে।

সে কী? কী করে? আশালতা উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, দাদুভাই টেবিলের উপর আমার দাঁতটা আছে, নিয়ে এসো তো।

সে তো ভাল কথা।

বাঁদর ছেলেটা দূর থেকে ওটা আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল ক্যাচ ইট। ব্যস। মাটিতে পড়ে চুরমার। প্রতিটি কথায় ব্রজকিশোরের রাগ ঠিকরে ওঠে।

এটা ওর দোষ নয়। তোমার।

আমার? ফের চেঁচিয়ে ওঠে ব্রজকিশোর।

নিশ্চয়ই। ওইটুকু ছেলেকে কেউ ওসব দিতে বলে? আর ও যা চঞ্চল।

তুমি থামো। ক্লাস ফোরে পড়ে। এমন কী ছোট। সামান্য একটা জিনিস দিতে বললে ভেঙে দেবে?

ওতো ভাঙেনি। মিছিমিছি ওকে দোষ দিচ্ছ। তোমরা দাদু নাতি দিনরাত ক্রিকেট নিয়ে পাগল। তা ও যদি তোমাকে ক্যাচ ধরতে বলে, সেটা কি ওর দোষ?

এই তোমাদের দোষ। তাতাইয়ের কোনও কিছুতেই দোষ দেখ না। ছেলেটা যে গোল্লায় যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আদরে। সে খেয়াল নেই। হাতে দিতে বললাম। ছুড়ে দিয়ে ভেঙে দিল। এটাও আমার দোষ। ওই ছেলে বড় হলে বুঝবে। তখন আমার কথা মনে হবে। কথাগুলি ব্রজকিশোর আশালতাকে বললেও ওর লক্ষ্য আবির আর দিয়া।

ওরা সামনে নেই। কিন্তু রান্নাঘর বারান্দায়—নিশ্চয়ই আছে। ওর কথাগুলি কানে গেলে কিছু একটা তো বলবে এটা আশা করেছিল ব্রজকিশোর। না পেয়ে মনে মনে আরও চটে উঠল।

পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল দু'জনেই আছে। সামনে হাট করে খোলা আলমারি। কাপড় জামার ডাঁই মেঝেতে পাহাড় তুলেছে। দিয়া আলমারিতে থরে থরে সাজিয়ে রাখছে। আর মেঝে থেকে আবির পরিপাটি ভাঁজ করে তুলে দিচ্ছে রিয়ার হাতে।

দৃশ্যটা দেখামাত্র ব্রজকিশোর আরও রেগে গেল। মনে মনে বলল, এই তো প্রকৃত স্বামীর কাজ করছে। এরপর ঘরঝাঁট, বাটনা বাটা, রান্না করা, ঘর মোছা, কাপড় কাচা সবই করবে। বউ নিয়ে মত্ত। ছেলে কী করছে দেখার দরকার নেই।

আবির আচমকা বাবাকে ওদের ঘরের দোরগোড়ায় দেখে একটু লজ্জা পেল। খানিকটা সাফাই গাওয়ার মতো আমতা করে বলল—আলমারি গুছানো বড় ঝকমারি কাজ। একা হয় না। তাই একটু হাত লাগিয়েছি।

ব্রজকিশোরের কানে কথাগুলি গেল। কিন্তু সে কোনও উত্তর করল না। বাবাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল—তাতাই কী একটা ভেঙেছে, তোমার পেন না চশমা?

সঙ্গে সঙ্গে লেজে পা-পড়া সাপের মতো ব্রজকিশোর ফোঁস করে উঠল।

সকাল থেকে এত কাণ্ড হল, আর তুই যেন কিছুই জানিস না। বলে তাতাইয়ের ভেঙে দেওয়া দাঁতের পাটি দেখিয়ে গলা চড়াল, ছেলের বাপ হলেই হয় না। তাদের মানুষ করতে শিখতে হয়।

দিয়া যেন মুখিয়ে ছিল। কথাটা শোনামাত্র আলমারির সামনে রাখা টুল থেকে ধপাস করে নেমে বলল—আজ তাতাইয়ের একদিন কী আমার একদিন। এত বড় সাহস! ওকে আমি এমন শিক্ষা দেব জীবনে ভুলবে না। কোথায় গেল বাঁদরটা? হাঁকডাক ছেড়ে রাগে ফুঁসতে থাকে দিয়া।

ব্রজকিশোরের ঘরে ঢুকে দেখে ঠাম্মিকে জড়িয়ে গুটিশুটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে তাতাই। দিয়ার রাগত চেহারা দেখে আশালতা তাতাইকে বুকের মধ্যে আগলে নেয়। কিন্তু দিয়া ছাড়বার পাত্রী নয়। আজ সে একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে। তাতাইয়ের একটা হাত ধরে প্রবল জোরে হ্যাঁচকা টান মারে। ব্যথায় তাতাই চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

কান্না হচ্ছে? তোমাকে আজ ঘুঘু দেখিয়ে ছাড়ব। রাগে ফুঁসতে থাকে দিয়া।

এটা তুমি কী করছ বউমা! বাচ্চাটাকে এভাবে মারছ কেন? ওর তো কোনও দোষ নেই।

কে বলল ওর দোষ নেই। দাদুর সব জিনিসে সর্দারি। এটা ফেলবে। ওটা ভাঙবে। মগের মল্লুক পেয়েছে। কিছু বলা হয় না দেখে সাপের পাঁচ পা দেখেছে। আজ আমি ওকে ছাড়ব না। আপনি আমাকে কোনও কথা বলবেন না মা। দিয়া আশালতার কাছে সরে আসে। জোর করে তাতাইকে চুলের মুঠি ধরে ঠাম্মির কাছ ছাড়া করতে চায়। আশালতাও ছাড়বে না। দিয়াকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে, বউমা, তুমি যা করছ, তাতে তাতাইয়ের চেয়ে তোমার দোষও কিছু কম দেখছি না। মারলে কি ছেলে ভাল হয়ে যাবে? তোমার বাবার ভাঙা জিনিসটা জোড়া লেগে যাবে? আমার কাছ থেকে তুমি এভাবে জোর করে ওকে নিতে চাইছ কেন? তোমার ছেলে বলে? ও আমার কেউ না? শুধু তোমারই ছেলে। আমি বলছি তুমি যাও। ওকে যদি শাস্তি দিতে হয়, বকাঝকা দিতে হয় আমি দেব। আশালতাও রাগে টালমাটাল। দিয়া শাশুড়ির এমন উগ্রচণ্ডা ভাব দেখেনি। তাই হঠাৎ করে জ্বলে ওঠার মতো হঠাৎ নিভেও গেল।

মা, আপনি তো জানেন ও কেমন হতচ্ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। একটু শাসন না করলে তো আরও বেশি লাই পেয়ে যাবে।

সব বুঝি বউমা। এই বয়েসটাকে তুমি দেখবে না? আর পাঁচটা ভাইবোন নেই যাদের সঙ্গে খেলবে। দৌরাত্ম্য করবে। এখন আধুনিক যুগ। এসব তোমাদের মানিয়ে নিতে হবে।

বাবার কত অসুবিধা হবে ভাবুন তো। আবার টাকা খরচ। সঙ্গে সঙ্গে যে পাবেন, তাও তো হবে না। সব কিছুতে ঝঞ্ঝাট বাধাল ছেলেটা।

কী আর করা যাবে। ওটা তো ওঁর হাত থেকে পড়েও ভাঙতে পারত। উনি যদি ক্যাচটা লুফে নিতেন তা হলে তো মাটিতে পড়ে গিয়ে ভাঙত না। এত ক্রিকেট খেলা দেখে যে মানুষটা, তিনি সামান্য

এই ক্যাচটা ধরতে পারবেন না তাতাই বুঝবে কেমন করে? শুধুই ওর দোষ দেখলে হবে।

বাবা খুব রেগে গেছেন মা।

এই বয়সে মানুষ খিটখিটে রাগী হয়। সব কিছুতে এত রাগ হলে সংসারে থাকা যায় না। মানিয়ে নিয়ে চলাটাও একটা শিক্ষা বউমা।

ততক্ষণে তাতাইয়ের কান্নায় বাড়িতে চিল শকুন পড়ার অবস্থা। ছেলেটার কান্নার সঙ্গে ফোঁপানির শব্দ টানা ভেসে আসছে। ব্রজকিশোর বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ওর মন ও কান সজাগ। ছেলেটাকে ওর মা নিশ্চয়ই খুব মেরেছে। না হলে যে ছেলে আঘাত যন্ত্রণায় কাঁদে না। সে কেন এভাবে কাঁদছে। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় ব্রজকিশোরের। তারজন্যই ছেলেটা এভাবে কষ্ট পেল। একটা বাচ্চা ছেলে যদি একটা ভুল করেই ফেলে তার জন্য সারা বাড়ি মাথায় করা কি উচিত? এবার নিজেকে দোষী ভাবতে থাকে ব্রজকিশোর। এই দাঁতের বয়স তো কম দিন হয়নি। চাকরি থাকাকালীন জয়ন্ত ডাক্তার বলেছিল, যা গোটা কয়েক ঝুলছে এদিক সেদিক আমি তুলে ফেলে দিয়ে দু'পাটি নতুন দাঁত বসিয়ে দিচ্ছি। প্রাণখুলে হাসবেন। যা খেতে ইচ্ছে হয় খাবেন। তবে দেখবেন, বলেই দুষ্টমিভরা ফিচেল হাসি হাসল ডাক্তার।

ডাক্তারবাবু, কথাটা শেষ করলেন না। কোনও ভয়ের ব্যাপার নেই তো।

মানে, আমি বলছিলাম, গলা খ্যাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে জয়ন্ত ডাক্তার বলেছিল, হাসি দিয়ে কাউকে ভোলাবেন না যেন।

ও এই ব্যাপার। এক চোট হেসেছিল ব্রজকিশোর।

সে সব কবেকার কথা। এখন দুটো পাটি অনেকটা আলগা হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা আবার ক্ষয়ে গিয়েছে। আশালতা বহুদিন বলেছে —ওগুলি এখন বাতিল। ফেলে দাও। নতুন পাটি লাগাও তো। পান খাবার সময় দাঁতগুলি এমনভাবে নড়াচড়া করে এই বুঝি খুলে পড়ল মাটিতে।

ব্রজকিশোর নিজের মধ্যে অনুতাপে পুড়ছে। এতটা বাড়াবাড়ি সে না করলেও পারত। বউমাকে সে ভাল করে চেনে। রেগে গেলে চামুণ্ডারূপিণী। ছেলেটাকে এমনই বেধড়ক পিটিয়েছে এখনও সমানে কেঁদে চলেছে।

নিজেও তো এমন ছিল না ব্রজকিশোর। অফিসে বাড়িতে সব জায়গায় সে ছিল আড্ডাবাজ। ফুর্তিবাজ মানুষ। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের ভিড় লেগে থাকত চারপাশে। এখন সবই শূন্যতা। স্মৃতি হাতড়ে বেঁচে থাকা। নিজে কখন কীভাবে পাল্টে গেল বুঝতে পারে না। হয়তো বয়স। হয়তো বা সাংসারিক পরিবেশ। আসল কারণটা কী বুঝে উঠতে পারে না ব্রজকিশোর।

ডাঃ জয়ন্ত রায়ের চেম্বারের পথে দেখা হয়ে গেল পরিতোষের সঙ্গে। ওরা একই ডিপার্টমেন্টে ছিল রাইটার্সে। আর রিটায়ারও করেছে এক মাস একদিন ওদিক। পাইকপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে ছিল। দু'কামরা ঘরে অনেক কষ্ট ছিল তখন। তবে ওই বউ মাধুরীর তুলনা হয় না। ঘর সংসার এমন টিপটাপ ফিটফাট রাখত মনে হত পরিতোষ বুঝি কেউকেটা চাকুরে।

ছেলে হিরণ তখন কত ছোট। সেন্ট টমাস স্কুলের ছাত্র। তবে বরাবর রেজাল্ট ভাল করত। বোঝা যাচ্ছিল ছেলেটার ভবিষৎ ভাল হবে। সে সব কবেকার কথা। ব্রজকিশোর রিটায়ার তো কম দিন করেনি। এখন কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই। শামুকের মতো খোলসে গুটিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

পরিতোষ ছাতা মাথায় ব্রজকিশোরকে দেখেছিল গাড়ি থেকে। ফুটপাত ধরে হাঁটছে। কেমন আলুথালু চেহারা। বয়সের আঁচড় শরীরে দাগ ফেলেছে। এক মুখ দাড়ি। কতদিন যে ব্লেড ছোঁয়ায়নি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজা খুলে তড়িঘড়ি নামল পরিতোষ। তারপর কয়েক পা এগিয়ে ধরল ব্রজকিশোরকে। কীরে চিনতে পারছিস? আমাকে তো ভুলেই গেছিস। ভাগ্যিস রাস্তায় বেরিয়েছিলিস। তাই দেখা হয়ে গেল।

কি রে, গাড়িতে উঠবি তো? কতদিন বাদে দেখা। তা বারো পনেরো বছর তো হবে। পরিতোষ দামি সিগারেট ধরায়। ব্রজকিশোরের দিকে প্যাকেট এগিয়ে দেয়।

না রে পরিতোষ, এখন আর চলে না। হার্টের গোলমাল ধরা পড়েছে। ডাক্তারের কড়া শাসনে আছি। বলে একটু দম নেয় ব্রজকিশোর। তারপর বলে, আমি কিন্তু চমকে গেছি। মনে হচ্ছে তোর নবজন্ম হয়েছে। এত বৈভব, সুন্দর চেহারা, সাজগোজ নিজের গাড়ি। এ তো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্পের কথা মনে হচ্ছে আমার।

দুর, পাগল কোথাকার! তুই চিরকাল একরকম থেকে গেলি। হিরণ এখন আমেরিকান মাল্টিন্যাশনালের বড় কর্তা। বউটিও আইটি-তে আছে। ফলে টাকা-পয়সা বাড়ি গাড়ি এসব এখন জলভাত ওদের কাছে।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু তোর ভোলবদল এই বয়সে এটাই তো বুঝতে পারছি না পরিতোষ। তা আমরা কোথায় যাচ্ছি পরিতোষ? ব্রজকিশোর খানিকটা বিচলিতভাবে জিজ্ঞেস করে।

আমার বাড়ি। কাছে বলে তোকে নিয়ে যাচ্ছি। মাধুরী থাকতে কতবার গেছিস সেই ভাড়াবাড়িতে। এখন তো নিজের বাড়ি। তবে দুঃখ একটাই মাধুরী চলে গেছে।

মাধুরী চলে গেল কেন পরিতোষ? এত করতে পারলি। অথচ বউটাকে রাখতে পারলি না? ব্রজর গলায় স্মৃতিমন্থনের বেদনা।

পারলাম না রে ব্রজ। পারলাম না। বিনা নোটিসে দুম করে চলে গেল। কাউকে কিছু করার সময় দিল না। ব্যাডলাক।

পরিতোষের চারতলা সুন্দর বাড়ি। ছাদে টবে নানা রকমের ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো। সঙ্গে লেবু লঙ্কা বেগুনও রয়েছে। নিচে পাতাবাহার আর রকমারি সিজন ফ্লাওয়ার।

ঘরে ঢুকে ব্রজকিশোর দেখল পেল্লাই বসার ঘর। জানলা দরজার পর্দার রঙের সঙ্গে ম্যাচ করা সোফা সেট। টবে সাজানো সবুজ সতেজ ক্যাকটাস। ফুলদানিতে রং-বেরং তাজা বর্ণময় ফুলের কোলাজ। তৃপ্তিতে মন ভরে যায় ব্রজকিশোরের।

নিজের বাড়ির কথা মনে হয়। সারা দিন খিটিমিটি ঝগড়া অশান্তি। সেই সঙ্গে নাতি তাতাইয়ের দৌরাত্ম্য। কিছু বলা যাবে না। বউমার গোসা হবে। ঠাম্মি ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওর কথা কেউ ভাবে না। এই বয়সে একটু শান্ত পরিবেশ, নির্জনতা, শরীরের আরাম, মনের বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু সে কথা আর ভাবছে কে? ব্রজকিশোর গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

পরিতোষ জিজ্ঞেস করে, ব্রজ কী খাবি? হার্ড, সফট, চা, কফি যা বলবি।

তুই এখন মদ ধরেছিস নাকি?

খেতে হয় মাঝে মধ্যে। ওষুধের ডোজে খেলে কিছু হয় না। বরং উপকার হয়।

না, ভাই। তুই চায়ের ব্যবস্থা কর।

কালু, পরিতোষ গম্ভীর গলায় ডাকল। ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম পরা অল্পবয়েসি একটি ছোকরা এসে হাজির হল। মেমসাহেবকে বল, বড়সাহেবের বন্ধু এসেছেন। দু-কাপ চা পাঠিয়ে দিতে। একটা চিনি ছাড়া।

ছেলেটা চলে গেল। ব্রজকিশোর কোমর ডোবানো আরামের

সোফায় বসে নিজের একফালি ঘরটার কথা ভাবতে থাকে। এখানে কোনও হইহল্লা নেই। চিৎকার চেঁচামেচি নেই। বড় শান্ত নির্জন পরিবেশ। ওর ঘরের মতো সারাক্ষণ বাজার চলে না।

তোর নাতিপুতি নেই রে পরিতোষ? ছেলের বিয়ে কতদিন হল?

ওদের ওসবে মন নেই। সময় কোথায়? দিনরাত কাজ আর টাকা। আমি দু'একবার আকার ইঙ্গিতে বলেছিলাম। তা কি বলল জানিস?

কী? ব্রজকিশোর উৎসাহী হয়।

বলল, ওসব ঝামেলা পোহাতে পারবে না। বাচ্চা হবার বয়স পার হলে অ্যাডাপসন নেবে।

বলছিস কী রে? এতো বাঙালি গেরস্ত ঘরের কথা নয়। মা হওয়া ঝামেলা! তা হলে সে কেমন মেয়ে?

আমিও তাই বলি রে ব্রজ।

তোর সময় কাটে কী করে? আই মিন সারাটা দিন করিস কী?

সিঁড়িতে জোরালো পায়ের শব্দ উঠছে। ব্রজকিশোর ভাবছে এই বুঝি চায়ের কাপ নিয়ে হিরণ আর তার বউ ঢুকবে ঘরে। কোন ছেলেবেলায় দেখা হিরণ এখন কেমন হয়েছে কে জানে। আর বউটিকে তো সে দেখেইনি। ব্রজকিশোর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে। পরিতোষ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। ওর কোনও হেলদোল নেই।

শব্দটা এবার আরও কাছে। ওদের দরজায় এসে পৌঁছল। ব্রজকিশোর তাকিয়ে দেখল পরিতোষের ছেলে আর বউমাকে। দু'জনের পোশাকে উৎকট সাহেবিয়ানা। বউমার পোশাকে নজরকাড়া শরীরের প্রদর্শনী। ওরা গটগট করে হেঁটে চলে গেল। একবার বাবা আর তার বন্ধুর দিকে তাকানোর প্রয়োজন মনে করল না। যেন এইসব ফালতু লোকের জন্য ওদের কোনও সময় নেই।

কালু চা সঙ্গে বিস্কুট মিষ্টি এনে টেবিলে রেখেছে।

পরিতোষ বলল—শুরু কর। ঠান্ডা হয়ে যাবে।

আমি একটু ঠান্ডা খাই। আলসার আছে। পুরনো ভালবাসা যেতে চায় না।

তাই বুঝি? তুই তো এখনও সুন্দর কথা বলিস ব্রজ।

তুই আছিস বলে কথা বের হচ্ছে। অন্য কেউ হলে শুধু ঝগড়া।

তবু তো তোর ঝগড়ার লোক আছে। আমার যে তাও নেই রে ব্রজ।

তাই তো জিজ্ঞাসা করছিলাম তোর সময় কাটে কী করে?

সময় কী আর কাটে রে! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। ফুল গাছে জল দিই। ওদের নিয়ে খানিকটা সময় চলে যায়। এই এত বড় বাড়ি। এত বিলাসী জীবন। তবু নিজেকে সুখী ভাবতে পারি না। সার্কাসের ক্লাউন মনে হয়।

রাতে ওষুধ ছাড়া ঘুমুতে পারিস? ব্রজকিশোর আলটপকা প্রশ্ন করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মোটেও পারি না। অ্যালজোলাম ফাইভ না খেলে পাতা জোড়ে না। একরাশ দুঃখ ঝরে পড়ে কথার মধ্যে।

সারা ঘরে স্তব্ধতা। হাওয়া কেটে পাখা ঘুরছে। ব্রজকিশোরের মনে হল এখন তার ওঠা উচিত। বাড়িতে তার ফেরার দেরির জন্য হয়তো একপ্রস্ত নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে।

আজ চলি রে পরিতোষ। মন খারাপ করবি না। অনেক ঝড় জলে আমিও তো টিকে আছি।

রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত তাতাইয়ের দেখা নেই। আশালতাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে ওকে ওর বাবা-মা ঘরে আটকে রেখেছে। দাদু, ঠাম্মার ঘরে গেলে ঠ্যাং ভেঙে দেবে বলেছে। সেই সকাল থেকে ছেলেটা একবারের জন্যও এ ঘরে পা রাখতে পারেনি। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ব্রজকিশোরের কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। যার জন্য ছেলেটার এই শাস্তি।

ব্রজকিশোর নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে। সত্যি এতটা বাড়াবাড়ি করা ওর উচিত হয়নি। ছোট বাচ্চারা ভুলভ্রান্তি, ভাঙচুর করবে। এটাই স্বাভাবিক। তাই নিয়ে ব্রজকিশোরের এভাবে মেজাজ গরম করা ঠিক হয়নি। পরিতোষের কথা ভাবে। বিশাল অট্টালিকা। প্রচুর টাকা। ধোপদুরস্ত পোশাক। আদবকায়দা। সব কিছুর পরিণাম যে একরাশ শূন্যতা, এই ভাবনায় এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে।

এই সময় মাধুরীর কথা মনে পড়ে। সংসারটাকে বুকে করে আগলে রাখত। পাইকপাড়ার পলেস্তরা খসা দু'কামরার ভাড়াবাড়ি। তাও কেমন ঝলমল করত ওর হাতের ছোঁয়ায়। পরিতোষের কথার তোয়াক্কা না রেখে অফিস ছুটির পর কতদিন বলেছে, আজ তোর সঙ্গে যাব।

কোথায়? পরিতোষ জেনেও মশকরা করত।

মাধুরীর কাছে। অনেক দিন ওর হাতের চা খাই না।

বাজে বকিস না। গত সপ্তাহে তো খেয়ে এলি। চায়ের ছুতো করে গেলি। রাতে খেয়ে ফিরলি। তোর মতো হ্যাংলা লোভী দুনিয়ায় দুটো নেই।

তুই তো খাবার দেখছিস। আমার চোখ তো অন্য জায়গায়। ব্রজকিশোর চোখ নাচিয়ে মিটিমিটি হাসে। যা দেখে পরিতোষের গা পিত্তি জ্বলে যায়।

এইজন্য খাল কেটে কুমির আনতে নেই। দু'জনের কথার মাঝে মাধুরী এসে হাজির।

তোমরা পারো বটে। মহিলাদের নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া না করলে পেটের ভাত হজম হয় না। অফিসেও কী এই কালচার?

ব্রজকিশোর লজ্জায় মুখ তোলে না। পরিতোষও বোঝে ব্যাপারটা বাউন্ডারি ছাড়িয়ে গেছে। সেই মাধুরী নেই। সংসারটা পুরো ভেসে গিয়েছে।

তার নিজের সংসারে মাধুরীর মতো আশালতা সুপ্রিম কোর্ট। সংসারে খুঁটিনাটি নিয়ে কত অশান্তি হয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। লাগাম থাকে আশালতার হাতে। ছেলে-বউমাকে রা কাড়তে দেয় না। এই যে তাতাইয়ের জন্য ব্রজকিশোরের ক্ষতি হল, আশালতার বিচারে দোষী ব্রজকিশোরই। আর সেটা তাকে মেনেও নিতে হয়েছে। এটা শুধু আজকের ঘটনা নয়। সব সময় ঘটে যাচ্ছে। সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি ভগবান বুঝি আশালতাকে দিয়ে পাঠিয়েছে।

একটা স্বস্তির শ্বাস আরামে টানল ব্রজকিশোর। ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেছে। কতক্ষণ একটানা ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই। হঠাৎ মাঝরাতে চুপ করে বুকের উপর কী যেন লাফিয়ে পড়ল। বিড়াল না কি চোর? ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে ব্রজকিশোর। কে ঢুকল বিছানায়? গাঢ় অন্ধকারে দুটো কচি হাত ব্রজকিশোরের গলা জড়িয়ে ধরেছে। বুঝল তাতাই এসেছে। মা-বাবার ঘুমন্ত চোখকে ফাঁকি দিয়ে মাঝরাতে সোজা চলে এসেছে ঠাম্মি-দাদুর ঘরে। দু'জনের মাঝখানে ঠেলেঠুলে শুয়েও পড়েছে সে। ওদের শরীরে তার পা দু'খানা উঠে গিয়েছে। আশালতা বোধহয় জানত তাতাই আসবে। এই ঘরটা যে তার দস্যিপনার ড্রেসিংরুম। এই ঘর ছেলে সে থাকবে কেমন করে? তাতাই ঠাম্মির বুকের কাছে সরে আসে। ওর শরীরে হাত রেখে আশালতা ভাবে এবার ওদের সত্যি ঘুম আসবে।

অলঙ্করণ : শরদিন্দু বসু



রাকার দুঃখতাপ

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

দরজায় টোকার শব্দে দরজা খুলে দিয়েই যেন প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির রাকা। নীলা যে এত অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দরী তা তো নয়ন বলেনি কখনও তাকে। অথচ স্ত্রীর কাছে পরস্ত্রী বা পরনারীর রূপচর্চায় অকাতর নয়ন।

খুব শ্লীল ভাষায় নারীশরীরের রহস্যময় আনাচকানাচ আরও রহস্যময় করে তোলার বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী নয়ন। বর্ণনার সময় নয়ন আবার অদ্ভুত ফন্দিবাজের চোখে তাকায় রাকার মুখের দিকে—মিটিমিটি হাসে—যেন বুঝে নিয়ে নিতে চায় তার এই রোমাঞ্চকর বর্ণনার কী প্রতিক্রিয়া হয় রাকার উপরে।

যতবারই নয়ন ইচ্ছাকৃতভাবে এই দুষ্টুমি করে রাকার সঙ্গে ততবারই কিন্তু অবাক না হয়ে পারে না রাকা। নম্র মার্জিত অত্যন্ত অভিজাত চরিত্রের বলে যাকে একসময়ে সত্যি মনে ধরেছিল রাকার—প্রথম দেখার পরই বিয়েতে মত দিয়ে দিয়েছিল—মেয়েদের সম্বন্ধে তার স্বভাবে এতটাই জোরালো কামনা তখন কি বুঝতে পেরেছিল? তাহলে ওই মার্জিত ভদ্র মুখের ভাব ছিল নিতান্তই একটা মুখোশ? মাঝে মাঝে অসহায়ের মতো বলেছে রাকা—উঃ থামাবে তোমার ওই ব্যাখ্যান? এসব কথা আমাকে বলতে তোমার লজ্জা করছে না?

ততোধিক অসহায় মুখ করে বলেছে নয়ন—তোমাকে বলব না তো কাকে বলব বলো তো? বউ ছাড়া আর কে শুনবে আমার এসব কথা?

—বউ সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা খুব উঁচু দেখছি। এরকম

কামুক পুরুষ জানলে কি আমি আগে কখনও— মিচকি মিচকি হাসে নয়ন, বলে— সত্যি কথা বলো তো—মেয়েরা কামুক পুরুষদের বেশি পছন্দ করে কি না—

ঝঙ্কার দিয়ে বলে রাকা—খুব চিনেছ মেয়েদের, এখন একটু থামো তো—ভাল লাগছে না আমার।

এরকম কড়া ধমক খেয়েও বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয় না নয়ন। মিচকি হেসেই বলে—বেশ, মুখ যখন সেলাই করে দিতে চাইছ তখন চুপ করলাম কিন্তু কথাটা একটু ভেবে দেখো—

ধমক খেয়ে চুপ করে যায় বটে নয়ন কিন্তু রাকার মনের সংশয় আর যায় না। শুধু যে খুবই ভদ্র পরিশীলিত ভাষায় মেয়েদের নিখুঁত রূপবর্ণনা করা তা তো নয়, বিয়ে আগে কোথায় কোন মেয়ের সঙ্গে কী রহস্যময় আলাপ পরিচয় ঘটেছিল তাও রসিয়ে রসিয়ে বলতে মুখে আটকায় না নয়নের। গল্পগুলি মাঝে মাঝে বেশ অবিশ্বাস্যরকমের শোনায় বলেই ভরসা হয় রাকার এগুলি আসলে হয়তো একেবারেই সত্যি নয়, নিছক গল্প বানানোর আনন্দেই বলা। খানিকটা রাকাকে উত্ত্যক্ত করার জন্য তো নিশ্চয়ই—এমনকী মাঝে মাঝে মনে হয় রাকার তাকে আগ্রাসী উত্তেজিত করে তোলার জন্যই বানিয়ে তোলা নয় তা এসব গল্প? কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্ন আর সংশয় ছাপিয়ে মাঝে মাঝেই যে ভয় আর সন্দেহ সরীসৃপের মতো তার শিরদাঁড়া বেয়ে হেঁটে যায় তা হল এত গল্প একি সবটাই বানানো? কিছুও কি সত্যি নয় এর? মেয়েদের রূপের প্রতি যার এতটাই তীব্র কামনা তার কি কোথাও কোনওভাবেই কোনও মেয়ের সঙ্গে—সংশয়টা আরও তীব্র হল যেন এ মুহূর্তেই নীলাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে। নীলা যে এত আশ্চর্যরকমের সুন্দরী—দেখে এমনকী মেয়েমানুষেরও বুক কেঁপে ওঠে একথা তো কখনও তাকে বলেনি নয়ন। এত মেয়ের রূপবর্ণনা করেছে নয়ন—এই রূপ যা সমস্ত বর্ণনার অতীত সে-সম্বন্ধে নীরব নিশ্চুপ রয়ে গিয়েছে কেন নয়ন—তাহলে কি কোনও গোপন অপরাধবোধ—কোনও জুগুপ্সা—

—দেখুন, নয়ন রায় তো এখানেই থাকেন— রাকার চিন্তার ঘোরটা কেটে যায় নীলার কণ্ঠস্বরে—

—হ্যাঁ,

—নমস্কার, আমি—

—জানি, নীলা মিত্র—

—বাব্বা আপনি জানলেন কী করে?

অবিশ্বাস্যরকমের সুন্দর দুই চোখ, ঠোঁট আর চিবুকের লাবণ্যময় ভঙ্গির ভিতর দিয়ে অবিশ্বাস্য সুন্দর এক হাসি যেন কৃষ্ণচতুর্দশীর শেষ রাতের জ্যোৎস্নার মতো ফিনকি দিয়ে ফুটে উঠল—

রাকা হেসে বলে—চিনলাম আপনার রূপ দেখে। কিন্তু আপনি যে রূপসী নন অপরূপ সে কথা আপনার বন্ধু কখনও বলেনি আমাকে। বললে আর এটুকুও সময় নিতাম না চিনতে।

—বলেন কী? আশ্চর্য ভঙ্গিতে ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে আবার হেসে ওঠে নীলা।

ইতিমধ্যে গায়ে একটা নতুন পাঞ্জাবি চাপিয়ে চলে এসেছে নয়ন। পরনে ধোপভাঙা পাজামা। একনজরে দেখে নেয় রাকা, ঘরের মধ্যে একেবারে অগোছালো ন্যালাখ্যাপা হয়েই থাকতে ভালবাসে নয়ন। বলে—ঘরেও যদি সেজেগুজে থাকতে হবে, তাহলে ঘর আর বাইরে তফাত কী? রাকা তার পিছনে অনর্গল লেগে থেকেও একটু ফিটফাট ধোপদুরস্ত করে তুলতে পারে না তাকে। সেই নয়ন কী আশ্চর্য দ্রুততায় নিজেকে সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়ে নিচে চলে এসেছে। স্বামীকে এক লহমা দেখে নেয় রাকা। সত্যি সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে। এত সুন্দরভাবে সে রাকার সামনে কখনও সেজে থাকে না। বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন খুব সূক্ষ্ম একটি দংশন জ্বালা অনুভব করে রাকা। সপ্তম রিপুর দংশন। মুহূর্তে তা ভুলতেও চেষ্টা করে রাকা। এতকাল সংসার করার পরও আত্মসম্মান আজও তার প্রবল।

নয়ন হাসতে হাসতেই আসে সেখানে।

—কী ব্যাপার, জানা নেই শোনা নেই, ইতিমধ্যেই আলাপ জমিয়ে নিয়েছ তোমরা? এ বাবা শুধু মেয়েরাই পারে—আলাপে কলহে সমান দক্ষ।

নীলা রুষ্ট ভ্রূভঙ্গি করে বলে—হ্যাঁ, আলাপটা বউদির সঙ্গে হয়েছে এবার কলহটা তোমার সঙ্গে বাকি রয়েছে নয়ন—

নয়ন হতভম্বের মতো ভঙ্গি করে বলে— এসেই কলহ? আমার অপরাধ?

—অপরাধ সাঙ্ঘাতিক। তুমি নাকি বউদির কাছে আমার রূপের তেমন প্রশংসা করোনি—অর্থাৎ আমি নাকি তেমন সুন্দরী নই। এতে বউদির কাছে আমার মানসম্মান নষ্ট হয়েছে। দরকার হলে এর জন্য মানহানির মামলা দায়ের করা যেতে পারে আদালতে।

নয়ন বলে—বাব্বা—মেয়েদের চোখে এ অপরাধের ক্ষতিপূরণ তো স্বয়ং কুবেরও করতে পারবে না। আমি তো কোন ছাড়— আর তুমি সুন্দর নও বলে আমি শেষে রূপের দেবতার রোষানলে পড়ব নাকি?

নয়ন হঠাৎ বলে, সরি, একটা কথা আমি ভুল বলে ফেললাম—আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু রূপের কোনও দেবতা নেই—কামের আছে কিন্তু রূপের নেই। রূপের দেবীর সন্ধানে তাহলে আমাদের গ্রিসে ভেনাসের কাছে যেতে হয়। আমাদের পুরনো কাব্যে শাস্ত্রে রূপের গুণগানের তো আর শেষ নেই, অথচ রূপের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও দেবতা বা দেবী কেন নেই কে জানে?

রাকা বেশ গম্ভীর গলায় বলে—হুঁ, থাকলে তোমারই খুব সুবিধে হত তাই না নয়ন রায়? রূপের দেবতা সব অপরাধ মার্জনা করে দিত তোমার, না? বলেই আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে রাকা। বলে—তোমার পতি পরম গুরুর কাণ্ডটা শুনবে বউদি, শোনো—শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের আনুষ্ঠানিক নাচ-গান পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমরা ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে চলে যেতাম আম্রকুঞ্জের নিচে একেবারে নিজেদের প্রাণের খুশিতে নাচব গাইব বলে। মঞ্চে আমরা হাত-পা ঘুরিয়ে মুদ্রা তৈরি করে যেটা করতাম সেটা হল নৃত্য—আমবাগানে গাছের নিচে দল বেঁধে যেটা করতাম সেটা নাচ। ভেবে দ্যাখো একবার— আমের গাছে বোল ধরেছে, তার নেশা ধরানো গন্ধ, বসন্তের ঈষৎ তপ্ত খ্যাপাটে হাওয়া মাঝে মাঝে ঘূর্ণির পাক খেয়ে ছুটে যাচ্ছে লাল ধুলো, শুকনো বোল ঝরাপাতা উড়িয়ে নিয়ে, মাঝে মাঝে জ্বলছে পলাশের শিখা, আর এর মধ্যে আমরাও নেচে চলেছি ঘূর্ণির মতো—যেন আমাদের কোনও শরীর অবয়ব নেই, আছে শুধু ওই নাচের ছন্দ আর তাল।

নীলা রাকার দিকে তাকিয়ে বলে—আপনার স্বামীটি সঙ্গীতভবনের ছাত্র ছিলেন না বটে কিন্তু খুব ভাল নাচতে পারতেন তখন। কোথাও কোনও জোড়া নাচের ডাক পড়লে আমাদের দু'জনের ডাক পড়ত গাছের তলায় জমায়েত ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে নাচতাম—প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে—বাঁধন খুলে দাও—নাচের ছন্দে দুলতে দুলতে আমরা ভুলে যেতাম জগৎ সংসার।

রাকা শুনছিল বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে। কী অকপটে একথা বলে যাচ্ছে নীলা। সামান্য মাত্র দ্বিধা বা জড়তা নেই। মিচকি মিচকি হাসতে হাসতে অনায়াসে শুনেও যাচ্ছে নয়ন। যেন নিজের নয়, অন্য কোনও মানুষের জীবনকাহিনি শুনছে সে। নীলা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলে—তারপর একদিন কী হল জানেন বউদি, নাচের পর আসর ভেঙে গেছে—আমরা আমবাগান থেকে হস্টেলের দিকে যাচ্ছি—রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই, ঝরাপাতা বাসন্তী নাচ নেচে বেড়াচ্ছে লাল কাঁকড় আর ধুলোয়, আবিরের রঙে লাল হয়ে আছে রাস্তার পাশের কালো বলো যা আছে সব। কিছু—তোমার স্বামী দেবতাটি আমার পাশে পাশে যাচ্ছেন—চোখে যেন এই বসন্তের ঘোর। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—নীলা, কি সুন্দর তুমি, নাচলে তোমাকে এত সুন্দর দেখায় জানতাম না—তোমাকে বিয়ে করলে কেমন হয়—

খিলখিল করে হেসে বলে নীলা —বললাম, মন্দ হয় না, বিয়ে করে ফেললেই তো হয়।

ভদ্রলোক তার জবাবে কী বললেন জানো, বলল—তোমাকে নয়, তোমার রূপকে আমি শুধু বিয়ে করতে চাই। বোঝ কাণ্ড বউদি। বললাম—সরি, আমার রূপকে আমার শরীর থেকে খুলে তো তোমাকে দিতে পারব না—তোমাকে বাপু তাহলে অন্য পাত্রী খুঁজে নিতে হবে। হো হো করে হেসে বলে নীলা—আমাদের সেই বিয়ের প্রস্তাব এভাবে ভেস্তে গেল। বিশ্বাস হল না তো বউদি, কিন্তু এসব কথা শতকরা একশো ভাগ সত্যি। জিজ্ঞাসা করে দেখুন ওকে। রূপের দেবতাকে খুশি করার কী চেষ্টা।

হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর নীরস গলায় বলে রাকা—সেজন্যই আপনার আর বিয়ে করাই হয়ে উঠল না বুঝি।

শতমুখ কাকনের মতো আলোর ঝলকানিতে যেন হেসে উঠে বলে নীলা—ওঃ বাব্বা, এই সময়ের মধ্যে এত কিছু দেখেও নেওয়া হয়েছে? কিন্তু কী করে বুঝলে ভাই? সিঁথিতে সিঁদুর নেই দেখে?

—না, আপনার বন্ধুই আমাকে বলেছে। আরও অনেক কিছুই বলেছে কিন্তু পুরুষ প্রবরটি যে নাচতেও জানতেন একথা তো আগে কখনও বলেননি—

হেসে উঠে লঘুস্বরে বলে নয়ন—অ্যাই, এটা কিন্তু সত্যের অপলাপ হচ্ছে। আমি নাচতে জানি শুনে হো হো করে হেসে উঠে বলেছিলে নাচতে ছাই জানো, জানো শুধু নাচাতে। কি? বলোনি?

বিরস স্বরে বলে রাকা—মনে নেই। তা নাচতে যখন জানো নেচে দেখাও না একটু, তোমার বন্ধুও দেখুক—

নীলার দিকে আঙুল তুলে নয়ন হেসে বলে— তাহলে তো ওকেও নাচতে হয়। বসন্তোৎসবে তো রাস্তায় হাঁটতাম আমরা সবাই একসঙ্গে নেচে নেচে। আমাদের একসঙ্গে নাচারই অভ্যাস।

নীলা বলে—তা মন্দ হয় না। বউদিও তাহলে নাচবে আমাদের সঙ্গে। এসো না সবাই মিলে নাচি আমরা।

এ কথার উত্তরে গম্ভীরভাবে রাকা বলে—কিন্তু আমি তো আর আম্রকুঞ্জে নাচেনি কখনও।

হাঁড়িকড়া ঠেলতে ঠেলতেই জীবন গেল। কোনও কুঞ্জবনও দেখিনি কখনও।

এ-কথায় হাওয়া একটু ভারী হয়ে আসতে চায় কিন্তু এসব কোনও কিছুকে পাত্তা না দিয়েই নীলা কলকল করে হেসে বলে—আমাদের এ-নাচ সে-নাচ নয় বউদি, নাচার ইচ্ছেটাই নাচ। ইচ্ছে হলেই নাচতে পারবে।

আসলে তোমার সঙ্গে তো আমার পরিচয় ছিল না, তাই তোমার অনুমতি নিয়ে আমি আসতে পারিনি—এটা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এই অপরিচিতা অগ্নিশিখার মতো সুন্দরী মেয়ের মুখে ঘনিষ্ঠ 'নয়ন' সম্বোধন যেন তার বুকে গরম লোহার শিকের ছ্যাঁকা দিয়ে যাচ্ছিল—ইঙ্গিতে যেন জানিয়েও দিল নয়ন তার কতদিনের চেনা।

চোখ টিপে বলে—নাচবে নাকি ভাই—দ্যাখো।

তেমনি শান্ত ঠান্ডা গলাতেই বলে রাকা—কিন্তু এটা তো আর আম্রকুঞ্জ নয়, এখানে যে-নাচ নাচতে হয় তাকে নাচ বলা যায় কি? এই তো আপনি আমাদের বাড়ি এই প্রথম এলেন। আপনি না হয় আমার স্বামীর বান্ধবী কিন্তু আমার তো অতিথি। এখনও অবধি আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি—ভিতরে বসতেও বলিনি—

নীলা শান্ত হেসে বলে—দরকার কী? আমাকে বন্ধু ভেবে নিলেই তো এসব ল্যাঠা চুকে যায়। কি বউদি? যায় না?

নয়ন হা হা করে ওঠে—সত্যি তো এই প্রথম আমাদের বাড়ি এলে তুমি নীলা, অথচ দ্যাখো এতক্ষণ অবধি বাইরেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি তোমাকে। আরে, এসো এসো ভিতরে এসে বোস। কই রাকা, একটু চা করো তো দরদ দিয়ে। তোমার চায়ের তো খুব সুখ্যাতি।

কেমন যেন একটু রহস্যের সুরে বলে রাকা—হ্যাঁ তোমরা দু'জনে বরং ততক্ষণ একটু নাচো—আমি আমার কাজে যাই—

রাকা রান্নাঘরের দিকে এগোয়। পিছনে পিছনে নিঃশব্দে আসে নীলা। ওর একেবারে কাছে গিয়ে নিচু গলায় বলে—একটা কথা বলি ভাই, নয়ন কি আমার আসার কথা তোমাকে বলেনি কিছু—কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম এ-কারণে যে আমি তো চিনি ওকে যা ব্যোমভোলা স্বভাবের মানুষ হয়তো আমার আসার কথাটা তোমাকে বলতে ভুলেই গেছে। আসলে তোমার সঙ্গে তো আমার পরিচয় ছিল না, তাই তোমার অনুমতি নিয়ে আমি আসতে পারিনি—এটা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এই অপরিচিতা অগ্নিশিখার মতো সুন্দরী মেয়ের মুখে ঘনিষ্ঠ 'নয়ন' সম্বোধন যেন তার বুকে গরম লোহার শিকের ছ্যাঁকা দিয়ে যাচ্ছিল—ইঙ্গিতে যেন জানিয়েও দিল নয়ন তার কতদিনের চেনা। সে কি এভাবেই প্রমাণ করতে চাইছে নয়নকে 'নয়ন' বলে ডাকার অধিকার তার আছে।

রাকা স্থির গলায় বলে—আমার অনুমতির প্রয়োজন নেই, বাড়ি আপনার বন্ধুর নামে। যতদিন তার ইচ্ছে তিনি রাখতেই



পারেন যাকে চান।

অপলক চোখে খানিকক্ষণ রাকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে নীলা—আমি তোমার স্বামীর সহপাঠিনী, বয়সে তোমার চেয়ে বড় তাই তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করলাম। মনে কিছু করলে না তো? সম্পর্কে কিন্তু আমিই ছোট কেননা তোমার স্বামীকে আগে আমি নয়নদা বলেই ডাকতাম। তুমি আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করলে বুঝব তুমি অন্তত কোনও কারণে রাগ করোনি আমার উপরে।

স্টোভে চায়ের জল চাপাতে চাপাতে রাকা বলে—কেন রাগ করব বলুন তো আপনার উপরে? আমাদের বাড়িতে কি অতিথি আসা বারণ নাকি!

অপ্রত্যাশিত এই আঘাতে হঠাৎ যেন নীলার মুখটা কালো হয়ে যায়। কিন্তু রাকাকে তা বুঝতে না দিয়ে খিলখিল করে হেসে বলে—বাঁচলাম বাপু, ভাগ্যিস রাগ করোনি। একদম কাছে এসে দাঁড়ানোর দরুন নীলার শরীরের যা মারাত্মক উচ্চাবচ সব যেন স্পষ্ট ধরা পড়ছে এখন রাকার চোখে। ঘিয়ে রঙের মাড় দেওয়া তাঁতের শাড়ির সঙ্গে শরীরের রং যেন মিলেমিশে গেছে। রাকা জানে মেয়েদের এই গাত্রবর্ণ কী দারুণ পছন্দ নয়নের। বুকের কাছে অনেকটা উঁচু হয়ে থাকার দরুন শাড়ির ফাঁকে রাকার চোখে পড়ে যায় ঘিয়ে রঙের ব্লাউজে ঢাকা পুষ্ট সুগঠিত বুক, মসৃণ তলপেট নেমে গেছে নাবাল নাভিতে— চিকন কোমরের তলদেশ যেন ডমরুর মতো সঙ্গীত—একরাশ ঘন কালো চুল ঘাড় ছাপিয়ে যেন বর্ষার কালো মেঘের মতো নিচে নেমে এসেছে। গোড়ায় তা ফিতে দিয়ে বাঁধা। ব্লাউজের হাতা থেকে পেরিয়ে আসা হাত দুটো যেন লতার মতোই নমনীয়। খুঁত যে একেবারেই নেই এমন নয়—উপরের ঠোঁটটা যেন একটু বেশি পুরু কিন্তু তাতে কঠিন ব্যক্তিত্বের চেয়ে নরম মাধুর্যের ভাবটা বেশি প্রকাশ পাওয়ার ফলে রূপটা যেন অন্য মাত্র নিয়ে এসেছে। দু'হাত তুলে এই শরীর যখন নাচের ছন্দে দুলে ওঠে তখন তা কীরকম লাগে দেখতে ভাবা মাত্রই যেন ঈর্ষার একটা আগুন বুকের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায়। রাকার মনে হয় নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে ওর।

বসার ঘর থেকে হাঁক পাড়ে নয়ন—নীলা তুমি চলে এসো। চা বানাতে দাও আমার বউকে। খেয়ে দেখো কেমন চা। ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করলে চা বরবাদ হয়ে যাবে।

নীলা হেসে বলে—বাপস্ রে বাপ বউটার সঙ্গে একটু কথা বলছি তাও সইছে না, হিংসে হচ্ছে? আমি তো মেয়েমানুষ বাবা, তোমার বউকে তো আর তুলে নিয়ে যাচ্ছি না। ঠিক আছে বাবা আমি যাচ্ছি, আমিও চা খোর কম নই। কলাভবনের ক্যান্টিনে চাপের পর চাপ চা খেতাম। ভুলে গেলে সেসব কথা!

রান্নাঘর থেকে গটগট করে হাঁটতে হাঁটতে বসার ঘরের দিকে যায় নীলা আর রাকা পিছন দিক থেকে দেখে হাঁটার তালে তালে সমস্ত শরীরে যেন তার ঢেউ খেলছে। দুলে উঠছে পায়রার মতো গ্রীবা, কোমর আর পশ্চাদদেশ।

এক লহমা দ্যাখে রাকা এই অপরূপ দেহছন্দ—আবার বুকে সেই আগুনের দহন।

(২)

নীলা যে আসবে সে কথা রাকাকে বলেছিল নয়ন কিন্তু কেন আসবে সেকথা বলেনি। দেরাদুন থেকে আসবে সে। কলকাতায় তার চেনাজানা কেউ নেই। নয়ন যদি তাকে দিন তিন-চারেকের জন্য একটু ওর বাড়িতে ঠাঁই দেয় তাহলে খুব উপকার হয় নীলার। এ উপকারের কথা সে ভুলবে না কখনও। চিঠিটা ডাকে এসেছিল কয়েকদিন আগে। চিঠিটা নয়নই পড়িয়ে শুনিয়েছিল রাকাকে। সম্বোধনে 'প্রিয়'-র কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে শুধু 'নয়ন'-ই লিখেছিল নীলা। চিঠির নিচে—শুভেচ্ছাসহ, অনেকদিন আগের এক বন্ধু নীলা।

রাকা একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল—বাব্বা, কী বিশেষণ। তোমার অনেকদিন আগের বন্ধু কবিতা টবিতা লিখত নাকি!

নয়ন হেসে বলে—লিখত কেন বলছ? এখনও লিখতে পারে

না বুঝি? শান্তিনিকেতনের মেয়ে একটু আধটু কবিতা লিখবে তাতে আর আশ্চর্য কী? না লিখলেই তো অস্বাভাবিক হত।

রাকা একটু তেতো গলায় বলে—যাই বলো, বাপু, শান্তিনিকেতনের মেয়েরা একটু ন্যাকা আর পুরুষঘেঁষা হয় বলে শুনেছি।

নয়ন একটু অপ্রসন্ন সুরে বলেছিল—দ্যাখো রাকা তুমি যদি না চাও আমি নীলাকে আসতে বারণ করে দিচ্ছি কিন্তু যাকে তুমি চেনো না- জানো না, তার সম্বন্ধে এরকম আলটপকা মন্তব্য করা বোধহয় ঠিক নয়।

রাকা বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলেছিল—বাব্বা, কী একটু বললাম কি বললাম না তোমার বন্ধুকে অমনি গায়ে একেবারে ফোস্কা পড়ে গেল তোমার?

নয়ন খুবই শান্ত গলায় বলে—না, তা নয় রাকা, হুট করে অচেনা অজানা একজন মেয়ে এভাবে এসে দিন তিন-চারেক থাকবে এখানে তোমার তো তাতে অসুবিধে হতেই পারে। তোমার কোনও দোষ নেই এতে। সে তো আমার বান্ধবী তোমার তো কেউ নয়। তোমার আপত্তি থাকলে আমি না করে দিচ্ছি। এটা কোনও রাগের কথা নয়।

আত্মাভিমানে লেগেছিল রাকার। না, নয়ন আর তার বান্ধবীর কাছে কিছুতেই ছোট করবে না নিজেকে সে। বলেছিল—আমি বারণ করার কে? এই বাড়ি তোমার। সংসারের কর্তা তুমি। তুমি যা মনে করো তাই করবে।

অভিমানের সুরটা খুব গোপন করতে পারেনি রাকা। নয়ন তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—জানি তোমায় একটু অসুবিধে হবে কিন্তু একটা খুব বড় কাজ করলে তুমি। নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে এরকম চিঠি লিখত না নীলা। যদিও ঠেকাটা কী তা লেখেনি সে।

চুপ করে শোনে রাকা কিন্তু একটা সূক্ষ্ম সংশয়ের কাঁটা খচখচ করতে থাকেই বুকের মধ্যে। সত্যিই জানে না নয়ন কী কারণে আসছে এখানে নীলা? নাকি নয়ন তাকে গোপন করতে চাইছে কিছু।

ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকে রাকা।

(৩)

ছোট কয়েকশো বর্গফুটের বাড়ি নয়নের। সামান্য স্কুল মাস্টারির টাকায় কতবড় বাড়িই বা আর করা যায়। একটা বেডরুম আর বসার ঘর। বসার ঘরেই বিছানা পাতা হয়েছিল নীলার রাতে শোয়ার জন্য। দরজা খোলা থাকলে বেডরুম থেকে দেখা যায় বসার ঘর। লম্বা বেতের সোফায় পাশাপাশি বসে গল্প করছিল দু'জন। বিকেলবেলা এসে পৌঁছেছিল নীলা। সন্ধে পর্যন্ত নীলা আর নয়ন খালি গল্প করেই কাটিয়ে দেয়। সংসারের টুকিটাকি কাজ সারতে সারতে আড়চোখে তাকিয়ে দ্যাখে রাকা—কখনও উঁচু কখনও নিচু গলায় কখনও উচ্চহাসি হাসতে হাসতে কী এত গল্প ওদের? বলার মতো এত কথা জমে আছে ওদের পরস্পরের ভিতরে অথচ নিতান্ত লঘু ঠাট্টা রসিকতা ছাড়া বিয়ে হওয়া অবধি রাকাকে ক'টা গভীর গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে নয়ন? রূপের এত গুণ!

মধ্যে দু'বার নীলা উঠে এসে রাকার হাত ধরেছে।

—খালি আমরা দু'জন বসে বসে গল্প করব বুঝি? —ভাল লাগছে না। তুমিও চলো বউদি গল্প করবে আমাদের সঙ্গে।

নয়নও ঘরের ভিতর থেকে বলে— নীলা এত করে বলছে ওর কথাটা রাখো অন্তত।

অর্থাৎ নীলার মানরক্ষার জন্য গল্প করতে হবে ওর সঙ্গে।

খুব চাপা কিন্তু তীব্র গলায় বলে রাকা—সংসারে কত কাজ পড়ে থাকে জানো না তুমি? আমি বসে বসে গল্প করলে আমার কাজ তুমি এসে করে দেবে?

নীলার দিকে তাকিয়ে বলে— আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। আপনারা দু'জন গল্প করুন। নিশ্চয়ই অনেক কথা জমে আছে আপনাদের দু'জনের।

নীলা ঈষৎ হেসে বলে—তা জমে আছে বউদি, শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসার পর তো আর দেখা হয়নি নয়নের সঙ্গে। ঈর্ষার সেই তপ্ত লোহার শলাকা বুকের ভিতরটা ক্রমাগত রক্তাক্ত করতে থাকে তার কিন্তু মুখে কিছু বলে না রাকা।

খাওয়ার টেবিলে গম্ভীরমুখে দুটো থালায় ভাত বেড়ে দিয়ে রাকা বলে নয়নকে—তোমরা দুই বন্ধু আগে খেয়ে নাও—

নীলা বলে—সে কি বউদি, তুমি বুঝি আমাদের শত্রু? তুমিও খাবে আমাদের সঙ্গে। আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়া খাব না।

নীলার এই ঔদার্যের ভান যেন আরও ক্ষতবিক্ষত করে তোলে রাকাকে। আপ্রাণ চেষ্টায় নিজের ক্ষোভকে সংযত করে। একদিন দু'দিনের জন্য আসা বাইরের এক অতিথির কাছে নিজের অভিমানকে প্রকাশ করার মতো আত্মসম্মানজ্ঞানহীন নিশ্চয়ই নয় সে।

হঠাৎ কেমন বেখাপ্পা হেসে উঠেই গম্ভীরভাবে বলে রাকা — আমি তো ওর বন্ধু নই, ওর স্ত্রী।

কথাটা বলেই আড়চোখে নীলার দিকে তাকায় রাকা। এ কথার ভিতরের বিষাক্ত হুলটুকু ওর কাছে ধরা পড়ল কি না যেন বুঝে নিতে চায়। কিন্তু নীলার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারে না। নীলা শুধু হেসে বলে—তুমি নয়নের স্ত্রী কিন্তু আমার তো বন্ধুই—

এ-কথার কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না রাকা।

(৪)

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে চুকতে রাত দশটা।

রাকা বলে নয়নকে—আমি শুয়ে পড়লাম, ক্লান্ত লাগছে। তোমার বন্ধুর বিছানাটা তুমিই করে দিও।

নয়নের কোনওটাতেই কোনও আপত্তি নেই। বলে — তথাস্তু। শুয়ে পড় তুমি। ওর সঙ্গে আরও কিছু কথা আছে আমার। সেরে আমি আসছি।

ঠোঁটের কোণে কঠিন হাসি ফুটে ওঠে রাকার। মনে মনে বলে—ওর সঙ্গে কথা কি তোমার এ-জন্মে শেষ হবে? মুখে কিছু বলে না। ঘুম আসে না রাকার বিছানায় ছটফট করে। নানা কথা ঘুরে ফিরে আসতে থাকে মাথার ভিতরে।

নীলার কথা যে নয়ন কখনও বলেনি তাকে এমন নয়। কিন্তু তা সামান্য মামুলি কথা—যেমন নিজের জীবনের অনেক মেয়ে পুরুষের সম্বন্ধেই গল্পচ্ছলে নানা কথা বলেছে সে। নীলা আর নয়ন একই সময়ে পড়াশোনা করেছে শান্তিনিকেতনে। নীলা গান নিয়ে সঙ্গীতভবনে—নয়ন বাংলা নিয়ে বিদ্যাভবনে। শান্তিনিকেতনের উৎসব অনুষ্ঠানে একসঙ্গে গান গাইত, নাটক করত ওরা। একসঙ্গে হাঁটত ওরা বল্লভপুরের খোয়াইয়ের রাস্তায়, শান্তিবীথিকার ছায়ায়—সকালবেলায় বৈতালিকে হাঁটত ওরা গান গেয়ে গেয়ে। শান্তিনিকেতন থেকে একসঙ্গেই পাস করে বেরিয়ে আসে ওরা দু'জনে। পরীক্ষা দিয়ে নয়ন বছর না ঘুরতেই স্কুলের চাকরি পেয়ে যায়। নীলা নাকি ভেবেছিল চাকরি বাকরি করবে

না—গান নিয়েই থাকবে সারাজীবন কিন্তু তা আর হয়নি। সংসারে তার ছিল একমাত্র বাবা—পাস করে বেরুবার বছরখানেকের মধ্যেই বাবার মৃত্যু হলে একা, স্বজনহীন নীলা একটা এনজিওতে পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত চাকরি নিয়ে চলে যায় দেরাদুনে। তারপর এই পনেরো-ষোলো বছর নীলার কোনও খবরই নাকি জানত না সে। সব স্ত্রীরাই স্বামীকে যেমন চেনে নীলা তার চেয়ে কম চিনত না নয়নকে। নয়ন যে একজন রূপ-উন্মাদ নারী-কাতর পুরুষ সে-সম্বন্ধে জানতে আর কিছু বাকি নেই রাকার। নয়নও সে কথা খুব গোপন করতে চায়নি—এমনকী চেনাশোনা মেয়েদের নিয়ে বানানো নানা রসাত্মক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসত এই সত্য। কিন্তু নীলাকে নিয়ে কোনওদিনই কোনও গল্প বানায়নি নয়ন। কৌতূহল অবশ্য একটা ছিলই রাকার। কৌশলে তার কাছ থেকে শান্তিনিকেতনের জীবনের কথা মাঝে মাঝে জানতে চেয়েছে রাকা কিন্তু শান্তিনিকেতন শোনামাত্রই নয়ন বিভোর হয়ে খালি গল্প করে গেছে লাল খোয়াইয়ের রাস্তায় বসন্তে লাল পলাশের মহোৎসব, সকালবেলার বৈতালিক গান আর দোলপূর্ণিমার জ্যোৎস্নার। যেন নীলা সেখানে কোথাও নেই।

এ অবধি ঠিক ছিল কিন্তু আজ সন্দেহের একটা বিষাক্ত তির রাকার বুকে আমূল গেঁথে দিয়েছে নীলার রূপ। নীলার এই অসম্ভব রূপের কথা কেন সচেতনভাবে রাকার কাছে গোপন করে গেছে নয়ন। তাহলে কি—সেই তিরের ডাগাটা যেন কুরে কুরে তার হৃদপিণ্ডের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাকার নীলাকে বাইরের দরজায় দাঁড়ানো দেখা মাত্রই নয়নের দু'চোখে সেই আনন্দের বিদ্যুৎ ঝিলিক। সুতীব্র কামনা কি প্রচ্ছন্ন ছিল না সে-দৃষ্টিতে। আত্ম-অনুকম্পায় কয়েকফোঁটা চোখের জল যেন নিজের অজান্তেই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে রাকার। দশ-এগারো বছর বিবাহিত জীবন পার হতে চলল তাদের। কখনও কি এত কাতর মদির চোখে নয়ন তাকিয়েছে তার দিকে। শুধুমাত্র যান্ত্রিক একটা জীবনযাপনের নিয়ম পালন করে গেছে সে রাকার সঙ্গে। মনে মনে ভাল হয়তো সে বেসে গেছে নীলাকে। চোখের জলের বদলে এবার ঠোঁটের কোণে যেন একটা কঠিন হাসি ফুটে ওঠে রাকার। মনে মনে সে যেন বলে—আমি তোমাকে চিনে গেছি নয়ন রায়। জেনে গেছে নীলার সঙ্গে তোমার সত্যিকারের সম্পর্ক যতই তুমি তা গোপন করার চেষ্টা কর না কেন।

আর দু'দিন পরই দোলপূর্ণিমা। জুঁই সাদা জ্যোৎস্নার ধবধবে আলো জানালা দিয়ে এসে পড়েছে রাকার মুখে। ঘুমটা যেন আরও চটে যায় তাতে। পাশের ঘরে এখনও কথা বলে চলেছে নীলা আর নয়ন। একটু নিচুস্বরেই কথা বলছে তারা—বোধহয় রাকার ঘুমের যাতে কোনও ব্যাঘাত না হয় সেজন্য কিন্তু এখানে শহরের এই একপ্রান্তে এত রাতে শব্দের প্রাদুর্ভাব কম। তাই ওদের কাটা কাটা কথাগুলি পৌঁছে যাচ্ছিল রাকার কানে।

—অনেক রাত হয়েছে নয়ন। এত রাত অবধি জাগতে নেই। যাও শুতে যাও—নরম, পাতা ঝরার শব্দের মতো যেন অস্ফুট গলার স্বর নীলার।

—আজ শুতে ইচ্ছে করছে না জানো, কতদিন পর যেন এই জ্যোৎস্না দেখলাম—হঠাৎ মনে হয় যেন কারা এখুনি দল বেঁধে বৈতালিকের গান গেয়ে উঠবে। ও আমার চাঁদের আলো। এমন মায়াবিভ্রম হয় মাঝে মাঝে।

—মনে পড়ে একবার কী বাই চেপেছিল আমাদের—ঠিক করলাম দোলপূর্ণিমার রাতে খোয়াইতে গিয়ে নেচে নেচে গান গাইব—খিলখিল হাসি নীলার।

—মনে নেই আবার নীলা—তুমিই প্রথম নাচতে নাচতে গান ধরলে—নিশীথরাতের প্রাণ—মনে হচ্ছিল তুমি নও, যেন খোয়াইয়ের মাঠপ্রান্তরই গাইছে এই গানটা। কী যে মায়া সেই গানের।

—কেন, তুমি যে নাচতে সেই নাচটা মালকোচা এঁটে—এতকাল যে বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুণে—হঠাৎ মনে হত মুহূর্তের মধ্যে তুমি লোকটাই যেন পাল্টে গেছ। এ নয়ন তো সে নয়ন নয়। যেন ভূতে পেয়েছে ওকে—সুর আর তালের ভূত। নাচের সময় তোমার ঠোঁটে অদ্ভুত একটা হাসি লেগে থাকত। সে হাসিটা এখনও মনে আছে আমার।

—ভূতই বটে। সুর আর তালের ভূত। এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে তোমার সেই শরীরভরা নাচের ছবিটা—নিশীথরাতের প্রাণ—এখন তুমি আর নাচো না নীলা—

—আহা তুমিও নাচো বুঝি, কোথায় আমাদের জীবনের সেই খোয়াই যে নাচব? কোথায় গেল সেসব দিনগুলো—এখন শুধু মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্যগুলো—

রাকা সজাগ হয়ে শোনে। কিছু কানে যায় কিছু যায় না। এরপর অনেকক্ষণ স্তব্ধতা—

—এখন কেমন আছো তুমি নয়ন—ভাল নিশ্চয়ই।

—বুঝি না ঠিক তবে তোমার কথা মনে পড়ে খুব, সেই খোয়াইয়ের নাচের কথা—তুমি কেমন আছো—

—আমিও জানি না। মাঝে মাঝে সেই সুরটা শুনতে পাই এতকাল যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে—দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

—যাও এবার তুমি নয়ন, আমরা কথা বলছি আস্তে আস্তে হয়তো তাতে বউদির ঘুমের ব্যাঘাত হবে না কিন্তু তুমি না গেলে কি বউদির ঘুম হওয়ার কথা?

—হ্যাঁ আমি এবার যাই নীলা। কথায় কথায় অনেক রাত হল তোমার রাত শুভ হোক।

নয়ন বিছানায় আসে। একটুও ঘুম নেই রাকার চোখে। বুকের ভিতরটা জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে তার কিন্তু নয়নকে তা বুঝতে না দিয়ে মটকা মেরে বিছানায় পড়ে থাকে রাকা। মনে মনে বিড়বিড় করে রাকা, জানতে আমাকে হবেই তোমার সঙ্গে কী সম্পর্ক রূপসী নীলার। জ্যোৎস্না গড়িয়ে যেতে থাকে বিছানার উপর দিয়ে।

(৫)

সকালে চা করে চায়ের টেবিলে রাকা ডাকে দু'জনকে।

নয়ন হাতমুখ ধুয়ে চায়ের টেবিলে বসেই চমকে ওঠে—একি? কী হয়েছে রাকা তোমার? সারারাত ঘুমোওনি নাকি?

চায়ের পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে রাকা— কী হবে? কিচ্ছু হয়নি আমার। তুমি বাজারে চলে যাও—তোমার বন্ধু কী কী ভাল খান জানো নিশ্চয়ই। সেই মতো বুঝে বাজার করে এনো—

নয়ন হেসে বলে—ওরে বাব্বা ও কী ভাল খায় আমি জানব কী করে? তবে সব মেয়েদের মতো ফুচকা যে ভাল খায় এটা জানি। কিন্তু আমি এখন বাজার থেকে ফুচকা আনব না। আর রবীন্দ্রনাথের গান যারা ভালবাসে তারা ফুচকা খাবেই বা কেন? ফুচকা তো খেত টেনিদা। আর টেনিদা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত বলে শুনিনি।

খিলখিল করে হেসে বলে নীলা—বাব্বা তাও মনে রেখেছ? যাই বলো বাপু, আমি রবীন্দ্রনাথ ছাড়তে রাজি আছি কিন্তু ফুচকা নয়।

বাজার থেকে নয়ন ফিরে আসা মাত্র রাকা গম্ভীরমুখে বলে—শোনো, আমি চলে যাচ্ছি—

না বুঝতে পেরে নয়ন বলে—চলে যাবে মানে?

—মা আমাকে ফোন করেছিল। অত্যন্ত জরুরি দরকার। কী দরকার তা ফোনে বলতে চাননি। তুমিও আবার ফোন করে জিজ্ঞেস করতে যেও না যেন।

নয়ন বিব্রত গলায় বলে—কিন্তু নীলা যে—

—তোমার বন্ধুকে তুমিই একটু দেখো, কাজের মাসিকে বলে যাচ্ছি আমি। আমি মাঝেমধ্যে না থাকলে, তো রান্নাটা তো ওই করে দেয়। আর খুব খারাপও ও রাঁধে না। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না নীলাদির। তা তোমার বন্ধু এখনও বলেননি কেন এসেছেন উনি?

নয়ন কেমন অসহায় ভঙ্গিতে নিচু গলায় বলে—না, এখনও বলেনি তো। নিজে না বললে বারবার তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না। কিন্তু তুমি যে যাচ্ছো ফিরছ কখন?

—ধরো, আর যদি নাই ফিরি—

নয়ন তীব্র গলায় বলে—মানে? এসব কথার মানে কী?

রাকা শুকনো হাসি হেসে বলে—একজনের বউ হয়ে কাটালাম তো এই পনেরোটা বছর। সারাজীবনই কাটাতে হবে তারই বা মাথার দিব্বি কে দিয়েছে—

বিরক্ত গলায় বলে নয়ন—এই উদ্ভট রসিকতা এখন আমার ভাল লাগছে না। আমাকে তো জানতে হবে কবে আসছ তুমি—

চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ রাকা তারপর বলে—আজ যদি না আসতে পারি কাল দোল, আসা হবে না। তারপর কী হবে কেউ কি বলতে পারে?

নয়ন অনুযোগের সুরে বলে—ব্যাপারটা কিন্তু খুব খারাপ হল—গৃহে অতিথি কিন্তু গৃহকর্ত্রীরই কোনও পাত্তা নেই—

তিক্ত হেসে বলে রাকা —গৃহকর্তা তো আছেই—দু'দিনের জন্য গৃহকর্ত্রী বদলালে আর অসুবিধে কি? তোমার বন্ধুকে তুমিই বুঝিয়ে দেবে সব।

বিরক্ত গলায় বলে নয়ন — কী যে মাথামুন্ডু বকছ বুঝছি না কিছু। যাবার আগে নীলাকে কিন্তু বলে যেও—

শান্ত গলায় বলে রাকা—সেটুকু বলে যাবো আমি। ভয় নেই তোমার।

(৬)

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেয় রাকা। তারপর সিটে সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে চুপ করে পড়ে থাকে। সুরমা এই অসময়ে মেয়েকে দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হবেন। সংসারে বেনিয়ম বিশৃঙ্খলা একদম বরদাস্ত করতে পারেন না সুরমা। নিশ্চয়ই হাজারটা প্রশ্ন করবেন নীলাকে। কিন্তু একটা বানিয়ে বলে দিতে হবে তাঁকে—যেমন বানিয়ে বলে এসেছে নয়নকে। খোলা জানালা দিয়ে নরম আদরের মতো হাওয়া এসে লাগছে ওর চোখেমুখে। যেন ওর যন্ত্রণায় শুশ্রূষার হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। মুছে নেয় রুমালে। হঠাৎ ভয়ের একটা তীব্র শিহরন যেন নেমে যায় সমস্ত শিরদাঁড়া বেড়ে। নয়নের প্রতি তীব্র অভিমানে কী কাণ্ড করে বসল সে? কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়—না, যা করেছে সে ঠিকই করেছে। খানিকক্ষণ আগের শোকের জায়গা নেয় হঠাৎ যেন নিষ্ঠুর আনন্দ। নির্জন ফাঁকাবাড়িতে দু'জনকে রেখে সে চলে এসেছে। কাজের মাসি ছুটি চাইছিল অনেকদিন থেকে—ওকে বলে এসেছে রান্নাটুকু করে দিয়েই যেন চলে যায়। আর কোনও কাজ করতে হবে না তাকে। সারা বাড়িতে তারপর দু'জন—নয়ন আর নীলা। নীলা আর নয়ন। নয়নের সামনে রূপের সেই অগ্নিশিখা যা দেখে মেয়েদেরও বুক কাঁপে—যার কাছে রূপকাতর নয়ন নিতান্ত এক পতঙ্গমাত্র। সে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জ্বলেপুড়ে মরতে যে নয়ন প্রস্তুত তার ইশারাও দেখেছে রাকা নয়নের মুগ্ধ চোখেমুখে। তার নারীর চোখ এ-দৃশ্য দেখতে ভুল করেনি। আর এই জ্বালাপোড়ার স্বাদ নিতেই বোধহয় অত রাত অবধি ওরকম নির্লজ্জের মতো হাসি গান গল্প ওদের। গলার কাছটা আবার ধরে আসে রাকার। সে দেখতে নিতান্তই সামান্য বলে স্বামী হিসাবে নয়নের যে দুঃখ মুখে তা কোনদিনই না বললেও স্ত্রী হিসাবে তা কি আর জানতে বাকি ছিল রাকার। রাকা সুন্দরী নয় বলেই কি কাল্পনিক সব সুন্দরীদের নিয়ে নয়নের ওইসব আশ্চর্য রসের গল্প নয়? আজ সব আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হোক তার। আজ কোনও বাধানিষেধের চোখ তাকিয়ে নেই তার দিকে। আজ নয়ন স্বাধীন। দু'জনের গোপন নিবিড় মিলনদৃশ্য বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একবার কল্পনায় জ্বলে উঠতেই যেন বুকটা তার ব্যথায় নীল হয়ে যায় কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই নিষ্ঠুর আনন্দটাই যেন ফিরে আসে আবার। রূপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে নয়ন—সেই হবে রাকার প্রতিশোধ—তারপর ছাই হয়ে যাওয়া সেই পুরুষের পাশে গিয়ে বিজয়িনীর মতো দাঁড়াবে রাকা। বলবে—এখন তুমি ছাই মাত্র। আর তোমাতে কোনও প্রয়োজন নেই আমার। তোমাদের দু'জনের সম্পর্কটা জানার দরকার ছিল আমার। জানলাম। এবার যাও, মুক্ত তুমি।

তীব্র উল্লাসের সঙ্গে তার চোখ ফেটে বেরিয়ে আসে আর এক ফোঁটা জল। এভাবে রাগে উল্লাসে দুঃখে ফুটতে ফুটতে গন্তব্যে পৌঁছে যায় রাকা। সুরমা সত্যই অবাক হন মেয়েকে এই অসময়ে হঠাৎ দেখে।

সুরমাকে বোঝায় রাকা নয়ন বিশেষ কাজে বর্ধমান চলে গেছে। রাতে ফিরবে। হাতে কোনও কাজ নেই তাই চলে এসেছে সুরমার কাছে। ফোনের সুইচ অফ করে রেখেছে রাকা যাতে নয়ন তাকে ফোন না করতে পারে। ভেবেছিল পুরো দিনটা থাকবে রাকা সুরমার কাছে। তার পরদিন দোল। করুক প্রাণ ভরে হোলি লীলা দু'জনে। তার পরদিন না হয় ফিরবে রাকা সবকিছু শেষবারের মতো বুঝে নিতে। কিন্তু সুরমাই বাধা হয়ে দাঁড়ান। সংসারী মানুষের চোখ এড়ায় না এসব। সুরমা বলেন, কি রে? হঠাৎ এলি এখানে কিন্তু সারাদিন তো হাঁড়ির মতো মুখ করেই কাটিয়ে দিলি। নয়নের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে আসিসনি তো?

উদাস গলায় বলে রাকা—না মা, ঝগড়াঝাটি হবে কেন? ও থাকে ওর নিজের মতো। ঝগড়াঝাটির প্রশ্নই নেই।

সুরমা তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েকে দেখে নিয়ে কড়া গলায় বলেন—আজই এখান থেকে চলে যাবে বলে দিলাম। নিজেদের ঝগড়াঝাঁটি নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেবে। আমাকে এর মধ্যে জড়াবে না।

কোনও কথা বলে না রাকা। নিজের মনে ভাবে—নিজের সংসার নিজের বাড়ি ঠিক কী তা আজ অবধি যেন বোঝাই হয়ে উঠল না অথচ সেই সংসার ছেড়ে দু-মুহূর্ত বাইরে থাকলেই বুকটা কেমন টনটন করতে থাকে। কিন্তু না, সেজন্যও নয়। আজ বাড়ি ফিরতে চাইছে সে শুধু বুঝবার জন্য সত্য আসলে কী?

নিজের ক্ষতস্থান যেমন মানুষ বারবার তীব্র গোপন কৌতূহলে দেখে নিতে চায় তেমনি বুঝে নিতে চায় নীলা কেন সারাজীবন নয়ন এভাবে প্রতারণা করল তার সঙ্গে। নীলার সঙ্গে যে তাঁর এত মাখামাখি কেন এতদিন গোপন রেখেছিল তার কাছ থেকে।

অসহ্য জ্বালা ধরছিল বুকে রাকার। তাই তীব্র কৌতূহল বোধ করছিল সে শুধু এটুকু জানতে কীভাবে নয়ন আজ এসে দাঁড়ায় তার সামনে।

(৭)

দরজায় কড়া নাড়তে নয়নই এসে দরজা খুলে দেয়। আড়চোখে একবার দেখে নেয় ওকে রাকা। ঠিক পড়তে পারে না ওর মুখের ভাব। নয়ন বলে—কী হয়েছিল তোমার বলো তো। আমি তো ফোনও করতে পারছি না। তুমি বারণ করে দিয়েছ।

চারদিকটা একলহমায় জরিপ করে নেয় রাকা। কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে রাখতে রাখতে বলে— বন্ধু কোথায় তোমার?

নয়ন বলে—সে তো চলে গেছে। তুমি যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরই। কাজের মাসি থাকতেই চলে গেছে।

রাকা অবাক হয়ে বলে—মানে? নীলাদি চলে গেছে? কই একবারও বলেননি যে তিনি চলে যাবেন?

নয়ন বলে—নীলা বলেনি পাছে তুমি আটকে দাও সেই ভয়ে। আমিও জানতাম না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর রাকা জিজ্ঞেস করে—তুমি আটকালে না?

—না রাকা? তার যাওয়ার অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন ছিল।

নীলা চোখের জল মুছে বলল—সরি নয়ন, বড় বোকার মতো কথা বলেছি। সত্যি তো তা আর হয় না। আমাদের যার যার জীবন তার তার। আমি একাই চলে যাচ্ছি। শান্তিনিকেতনের সেই উৎসবেও যদি একা একা না যেতে পারি তাহলে যাওয়ার আর জায়গা রইল কোথায়? একাই চলে গেল সে। চোখ দিয়ে জল পড়ছিল না তার কিন্তু বুঝছিলাম ভিতরে ভিতরে সে কাঁদছে।

—গেলেন কোথায় তিনি?

—শান্তিনিকেতন।

কিছুই বুঝতে না পেরে রাকা অধৈর্য হয়ে বলে—উঃ কী হেঁয়ালি করছ? আমাকে স্পষ্ট করে বলবে তো সব। কলকাতায় এসেছিলেন কেন তোমার বন্ধু?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে নয়ন অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলে—সে খুব দুঃখের কথা রাকা। বলতে ইচ্ছে করে না তবু বলছি। আমিও কিছুই জানতাম না। শেষমুহূর্তে বলে গেল আমাকে। অনেকদিন ধরেই গলা জ্বালা জ্বালা করছিল ওর। দেরাদুনের ডাক্তাররা ধরতে পারেনি শেষে এক ডাক্তার সন্দেহ ধরেছিল ক্যানসার বলে। অ্যাডভাইস করেছিল ভাল কোথাও দেখিয়ে নিতে।

রাকা অস্ফুট গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল—ক্যানসার?

নয়ন বলে—হ্যাঁ, সেজন্যই কলকাতায় এসেছিল নীলা ক্যানসার হাসপাতালে দেখাতে। ডাক্তাররা বলেছে—ক্যানসারই, তবে সম্ভবত ফার্স্ট স্টেজ। প্রাণের ভয় আপাতত নেই।

তবে যত দ্রুত সম্ভব অপারেশন করিয়ে নিতে হবে।

রাকা শান্তভাবে বলে—যাক প্রাণের ভয় নেই তো—

—না প্রাণের ভয় নেই, কিন্তু অপারেশনের পর স্বরনালী স্থায়ীভাবে ড্যামেজ হয়ে যাবে। গান আর কোনওদিনই গাইতে পারবে না নীলা।

কথাগুলি বলার সময় কিন্তু একটুও কাঁদেনি নীলা। শুধু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। চোখের জল মুছে বলেছিল—কোনওদিনই আর গাইতে পারব না নয়ন—শেষবারের মতো বড় গাইতে ইচ্ছে করছে।

আমি বললাম—কাল দোলপূর্ণিমা তুমি জানো—

আমার কথায় চমকে উঠল না নীলা। যেন কথাটা সে আগেই ভেবে রেখেছে। অস্ফুটস্বরে শুধু বলল—হ্যাঁ জানি তো। কাল বসন্তোৎসব।

বললাম—শেষ গানই যদি গাইতে হয় কাল তুমি সেখানে গিয়েই গাও—সেই যে খোয়াইয়ের জ্যোৎস্নায় গেয়েছিলে নিশীথরাতের প্রাণ।

কেমন ঘোরে-পাওয়া মানুষের মতো বলল নীলা—আমি ভাবছিলাম যাব তুমি যখন বললে আমি তবে যাই এখনই? আমার শেষ গান আমি ওখানেই গিয়ে গেয়ে আসব। আমার হাত ধরে বলল, নয়ন তুমি আমার সঙ্গে যাবে জ্যোৎস্নারাতে নাচতে?

আমি বললাম—তা তো আর হয় না নীলা, বাড়ি-ঘরদোর বন্ধ করে আমি যাব কী করে? রাকা তো কিছু জানে না।

নীলা চোখের জল মুছে বলল—সরি নয়ন, বড় বোকার মতো কথা বলেছি। সত্যি তো তা আর হয় না। আমাদের যার যার জীবন তার তার। আমি একাই চলে যাচ্ছি। শান্তিনিকেতনের সেই উৎসবেও যদি একা একা না যেতে পারি তাহলে যাওয়ার আর জায়গা রইল কোথায়? একাই চলে গেল সে। চোখ দিয়ে জল পড়ছিল না তার কিন্তু বুঝছিলাম ভিতরে ভিতরে সে কাঁদছে।

একটুক্ষণ চুপ থেকে নয়ন বলে—যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো তুমি। নীলা শান্তিনিকেতন নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে অনেকক্ষণ।

আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে ছিল রাকা।

হেরে গেছে। নীলা আর নয়নের কাছে নিদারুণভাবে হেরে গেছে সে। নয়নের সঙ্গে নীলার কী সম্পর্ক যদি জানতেই পারল না সে তাহলে নয়নের সঙ্গে এতগুলি বছর তার কেটে গেল কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে? পিছনে ফেলে আসা জীবনটার কথা ভেবে আজ হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে তার। মোটামুটি সুখী সচ্ছল জীবনই তো কাটিয়েছে তারা যেমন কাটায় আরও দশজন কিন্তু



সত্যি কোন জীবন চেয়েছিল সে জানতে পেরেছিল কোনওদিনই?

আস্তে আস্তে উঠে আসে রাকা নয়নের কাছে। নয়নও বসে ছিল অন্ধকার খাটের উপরে। জ্যোৎস্না যেন কেউ উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে বিছানার উপরে।

রাকা নয়নের পাশে নিঃশব্দে বসে। বিয়ের একেবারে পরপর যেরকম দুষ্টুমি করে স্বামীর নাম ধরে ডাকত তেমনি আজও ডাকে নয়নকে।

—নয়ন, তুমি তো কোনওদিনও বলোনি তুমি নাচতে জানো।

অনেকদিন পর রাকার মুখে নিজের নামটা শুনে চমকে তাকায় নয়ন তারপর বলে—ঠাট্টা করে কয়েকবার বলেছিলাম রাকা, তুমিও ঠাট্টা ভেবেছিলে—তারপর অন্য কথায় হারিয়ে গেছে।

—কেন হারিয়ে যায় নয়ন? কেন জীবনের অনেক কথাই বলা হয় না!

নয়ন চুপ করে থাকে।

বিড়বিড় করে বলে রাকা—নীলাদি চেয়েছিল তার গাওয়া জীবনের শেষ গানে তুমি নাচো—কেন চলে গেলে না তুমি নীলাদির সঙ্গে।

নয়ন শান্ত গলায় বলে— তা তো আর সত্যি হয় না রাকা, জীবনের নিয়ম সেরকম নয়, জীবন চলে জীবনের নিয়মে।

—না, না, না—আর্তনাদে ভেঙে পড়ার মতো যেন বলে ওঠে রাকা— নীলাদিই শুধু তোমার নাচ দেখবে? আমি দেখতে পাব না কখনও? কোনওদিনই না?

আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে বলে—কাল খোয়াইতে দোলপূর্ণিমার জ্যোৎস্না উঠবে না নয়ন?

—উঠবে রাকা।

—আমি কোনওদিনও খোয়াই দেখিনি, খোয়াইয়ের জ্যোৎস্না দেখিনি—কোনওদিনও বলোওনি তো আমাকে এই জ্যোৎস্নার কথা।

—না, বলিনি নীলা, কত কথাই তো বলা হয়ে ওঠে না এ-জীবনে।

—নীলাদি তার জীবনের শেষ গান গাইবে সেখানে আমি জানি—কতদিন যে বসে ছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুনে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

—নয়ন কিছুটা অবাক হয়ে বলে—তুমি জানলে কী করে রাকা এ গানের কথা?

—আমি জানি, কিন্তু তুমি কোনওদিনই বলোনি আমাকে। শোনো কাল নীলাদির শেষ গানের সঙ্গে তুমিও নাচবে। কাল ভোরবেলাতেই শান্তিনিকেতনে রওনা দেব আমরা।

নয়ন বলে—দূর! কী যে বলো রাকা। নাচ আমি ভুলে গেছি। আমি তো আর নাচ শিখিনি। সব খেয়ালখুশির নাচ।

রাকা বলে—না, তুমি ভুলতে পারো না। জ্যোৎস্নায় নীলাদিকে কাল পরীর মতো দেখাবে আমি জানি। সেই রূপ নিয়ে সে যখন গান গেয়ে উঠবে তোমার ভুলে যাওয়া নাচ—সব মনে পড়ে যাবে তোমার। আমি জানি নয়ন তুমি কোনওদিনই হয়তো আর নাচবে না যে-নয়ন নাচে তাকে এ-পৃথিবীতে কেউ আর হয়তো দেখবে না কিন্তু নীলাদির শেষ গানের মতো তোমার শেষ নাচ আমাকে একবার অন্তত দেখতে দাও নয়ন, একবারের জন্য নয়ন...অন্তত একবার।

নয়নের কোলে মুখ গুঁজে হঠাৎ পাগলের মতো হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ে রাকা।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে নয়ন। রাকার পিঠের উপর তার হাত। নয়ন সেই হাত দিয়ে যেন রাকার দুঃখকে স্পর্শ করতে চায়, কিন্তু পারে না।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

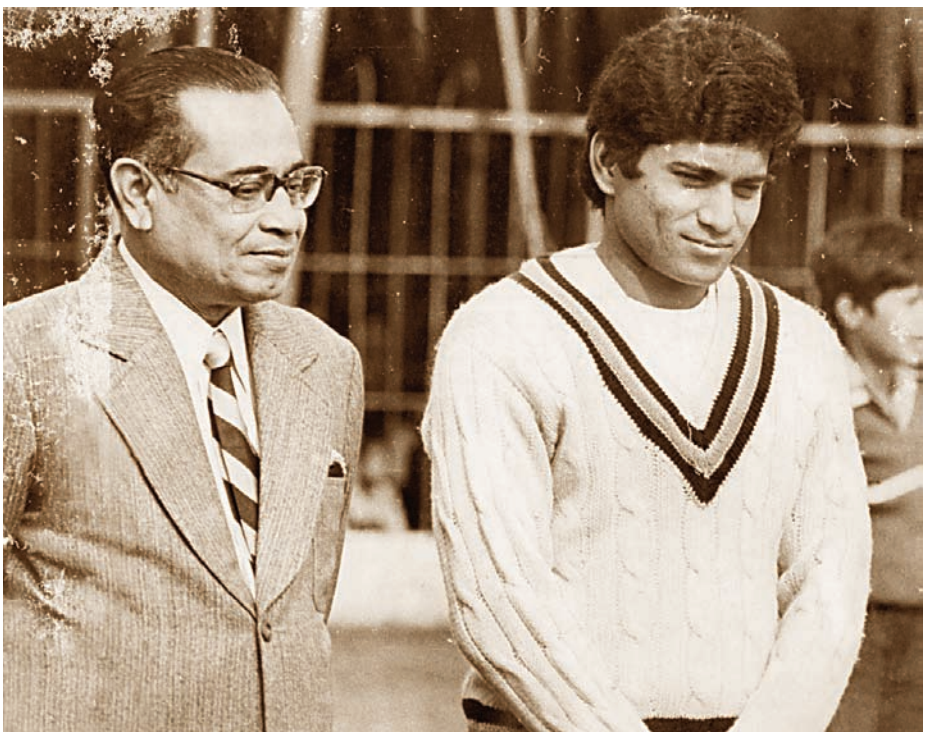

আমার বাবা

প্রণব রায়

‘ইন্ডিয়া-এ’ টিমের হয়ে খেলতে পরের দিন ভোরেই জামশেদপুর রওনা দেব। বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু বাবার সঙ্গে তখনও কথা হয়নি। কীভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলারদের সামলাব, ভেবে পাচ্ছি না!

রাত ১০টা বেজে গিয়েছে। বাবা যে কখন আসবেন? অস্থির হয়ে আমি তখন এঘর-ওঘর করছি। হঠাৎ বাবার গাড়ির শব্দ। ছুট্টে গেলাম। দেখলাম বাবা বেশ ক্লান্ত। আমতা আমতা করে বললাম, “কাল সকালেই ইন্ডিয়া-এ টিমের হয়ে জামশেদপুর যাচ্ছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ম্যাচ। কীভাবে ওদের ফাস্ট বোলিং সামলাব?” বাবার টিপস, “ভেরি গুড। যখন ব্যাট করবি সব সময় বোলারের হাতের বলটাকেই দেখবি। অন্য কিছু নয়। বল থেকে কখনও চোখ সরাবি না। ব্যস। তাহলেই হবে। আর বাকিটা তুই যা ক্রিকেট জানিস, তা দিয়েই চলবে।” যতদিন আমি ক্রিকেট খেলেছি শেষদিন পর্যন্ত বাবার ওই ছোট্ট ‘টিপস’ ফলো করেছি।

আমার বাবা পঙ্কজ রায়ের এটাই ছিল ‘কোচিং স্টাইল’। এমনিতেই মিতভাষী। ক্রিকেটের কোনও কিছু জানতে চাইলেও ঠিক যতটুকু দরকার, ততটুকুই বলতেন। ততটুকুই যত্ন সহকারে দেখিয়ে দিতেন। আর সেটাই ছিল অমূল্য। আমার সারা জীবনের ‘সঞ্চয়’।

শুনলে হয়তো অনেকেই অবাক হবেন, আমার ক্রিকেটের প্রথম কোচিং বলতে যা কিছু, তা হয়েছিল বাবার সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে। পুরোটাই গল্পের ছলে। বাবা হয়তো তাঁর সময়ে ক্রিকেটের কোনও গল্প করছেন, তখন ভাত হাতেই টেবিল থেকে উঠে দেখাতেন কীভাবে হুক বা পুল করতে হয়। কিংবা স্কোয়ার কাট বা স্ট্রেট ড্রাইভ। আবার দেখিয়ে দিতেন কীভাবে বাউন্সার ছাড়তে হয়। খেতে খেতে কখনও হয়তো আমি ক্রিকেট নিয়ে কোনও প্রশ্ন করলাম, তার উত্তরও সেই খাবার টেবিলেই দিতেন। এমনকী, বাংলা বা ইন্ডিয়া খেলার সময়ও কোনও শট নিয়ে সমস্যা হলে খাবার টেবিলেই বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিতেন। বুঝিয়ে দিতেন কীভাবে খেললে সমস্যা হবে না। কখনও তাঁকে এতটুকু বিরক্ত হতে দেখিনি। বকাবকি তো না-ই!

এমন খুব কমই হয়েছে যে, উনি আমাকে নেটে কোন শট কীভাবে খেলতে হবে তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। বাবার কাছ থেকে ক্রিকেটের যেটুকু শিখেছি তা খাবার টেবিলে প্রশ্ন করেই। তিনি আমার কাছে যেমন ছিলেন অসাধারণ মানুষ, তেমনই বাবার এই 'কোচিং স্টাইল'-ও ছিল দুর্দান্ত। অনবদ্য। ক্রিকেটের সৌজন্যে দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। কিন্তু জীবনে কারও কাছে এমন কোচিংয়ের কথা শুনিনি।

আসলে ছোটবেলা থেকেই বাবার একটা জিনিস লক্ষ করেছি, কিছু জানতে হলে ওঁকে যে কোনও বিষয় প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন না করলে উনি আমাদের কোনও ব্যাপারে নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে দেখিনি। তা সে ক্রিকেট বা পড়াশোনা—যাই হোক। তবে শান্ত, রাশভারী, মিতবাক ওই মানুষটি সব সময় নজর রাখতেন আমাদের তিন ভাইয়ের ব্যাপারে। স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় পড়াশোনা বিশেষ দেখিয়ে না দিলেও কড়া নজর রাখতেন। স্কুল ও প্রাইভেট টিউটরদের জিজ্ঞাসা করতেন কেমন পড়াশোনা করছি? রেজাল্ট মোটামুটি হলেও কখনও বকেননি। বরং শান্তভাবে বোঝাতেন, "ভবিষ্যতে যেন ভাল হয়।" ব্যস ওইটুকুই।



সুইপ করছেন পঙ্কজ রায়

আসলে উনি আমাদের নিজের নিজের মতো করে চলতে শিখিয়ে ছিলেন। কখনও নিজের সিদ্ধান্ত আমাদের উপর চাপিয়ে দেননি। বাংলা ক্রিকেটে প্রথম তারকা ক্রিকেটার হয়েও বাবা যেমন মাটির মানুষ ছিলেন, তেমনই চেয়েছিলেন আমরাও যাতে সাধারণভাবেই বড় হই। রায় পরিবারের সন্তান হয়েও আর পাঁচটা ছেলের মতোই ট্রামে-বাসে করে আমি খেলতে গিয়েছি। বাংলার হয়ে খেলার সময় একইভাবে ট্রামে-বাসে করে প্র্যাকটিস করতে গিয়েছি। কথায় কথায় উনি কখনও ব্যাট কিনে দেননি। মনে আছে, আমার জীবনে প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলাম বন্ধুর ব্যাট দিয়ে। বিলাস বহুল জীবনে যাতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ি তার দিকে বাবা সব সময় খেয়াল রাখতেন।

শুনেছি ছেলেরা নাকি সাধারণত বাবার খুব একটা অন্তরঙ্গ হয় না। কিন্তু আমি ছিলাম এক্কেবারে যাকে বলে 'ফাদারস চাইল্ড'। যেহেতু দাদা ও ভাই বাইরে পড়াশোনা করত, তাই ছোট থেকেই বাবাকে বেশি কাছে পেতাম আমিই। সুযোগ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি সান্নিধ্য পাওয়ার। ছোটবেলা থেকেই বরাবরই বাবাকে 'প্রতিষ্ঠান' হিসাবে দেখে এসেছি। নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কারিশ্মায় উনি ছিলেন চির ভাস্বর। উনি আমার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক। প্রিয় বন্ধু। স্নেহশীল বাবা। ক্রিকেটীয় অভিভাবক। রোল মডেল। মা-ও অনেক সময় বলতেন যে, আমি নাকি একদম বাবার মতোই হয়েছি।

ছোটবেলাতে যখন একটু-আধটু বুঝতে শিখেছি, তখন থেকেই জানতাম আমার বাবা একজন 'সেলিব্রিটি'। বাংলা তথা ভারতীয় ক্রিকেটের তারকা ক্রিকেটার। বিশ্ব রেকর্ডধারী ওপেনার ব্যাটসম্যান। মনে আছে, ছোটবেলাতেই আমাদের ৮ নম্বর অভয় মিত্র স্ট্রিটের বাড়িতে স্যর গ্যারি সোবার্সকে দেখেছিলাম। তখনই আলাপ হয়েছিল। ক্রিকেট জগৎ ছাড়াও বাড়িতে অন্যান্য ক্ষেত্রেরও বিশিষ্টজনেরা আসতেন। অবাক হয়ে দেখতাম, যখন ওই সমস্ত জ্ঞানীগুণী মানুষদের সঙ্গে কথা বলতেন তখন বাবার কী ব্যক্তিত্ব! যেন অন্য মানুষ! আবার আমাদের কাছে এলেই বাবা সেই চেনা প্রিয় কাছের মানুষ।

অনেকেই ভাবতেন পঙ্কজ রায়ের ছেলের আবার অন্যের কাছে কোচিং নেওয়ার কী প্রয়োজন? তবে আমার ভিতটা যাতে ভাল হয় তাই ছোটবেলায় আমাকে সেইসময়ের বিখ্যাত ক্রিকেটার-কোচ কার্তিক বসুর কাছে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। কিন্তু পঙ্কজ রায়ের ছেলে হওয়ায় আমাকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার কথা উনি কখনও বলেননি। এমনকী, কোচ কী শিখাচ্ছেন, তা-ও কখনও জিজ্ঞেস করতেন না। আসলে কার্তিক বসুর প্রতি বাবার অসম্ভব শ্রদ্ধা-ভরসা ছিল। মাঝে মাঝেই বাবা আমার প্র্যাকটিস দেখতে যেতেন। দূর থেকে দেখতেন। কিন্তু কখনও নেটে গিয়ে কিছু দেখিয়ে দিতেন না। উনি চাইতেন না যেন আমার কোচের প্রতি কোনওরকম অসম্মান বা অনাস্থা তৈরি হয়। ভারতীয় টিমে সুযোগ পাওয়ায় উনি খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "টিমে সুযোগ পাওয়া বড় ব্যাপার নয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই বড় কথা। কমপক্ষে দশ বছর টেস্ট টিমে থাকাটা বড় ব্যাপার।" এইকারণে জীবনে দু'টির বেশি টেস্ট খেলতে না পারায় বাবার কিছুটা দুঃখ বা খারাপ লাগা তো ছিলই। তবে বাবাকে বেশি ভারাক্রান্ত লাগত নিজের বিশ্বরেকর্ডের কোনও কথা বলার সময়। আনন্দের মধ্যেও একটা হতাশা। ডবল সেঞ্চুরির এত কাছে গিয়েও তা হাতছাড়া হয়। সারাজীবনে যা বাবার একটা আফসোস! অনুশোচনা!

সত্যিই কত স্মৃতি! বাবার যে গুণগুলো ভাল লাগত, তার মধ্যে অন্যতম হল উনি ছিলেন ভীষণ শৃঙ্খলাপরায়ণ। ছিলেন অসম্ভব পাংচুয়াল। বাড়িতে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল যে, রাত ন'টার মধ্যে ফিরতে হবে। এমনকী, যখন একটু বড় হয়েছি তখনও সেই নিয়ম ভাঙার সাহস হয়নি। তবে দু'-একদিন দেরি হলে বাবা শুধু আমার সামনে এসে দাঁড়াতেন। তাতেই বাবার বক্তব্য আমার বোঝা হয়ে যেত। রাশভারী, গম্ভীর, শান্ত, নম্র, ভদ্র বাবাকে দেখলে অনেকসময়ই অবাক লাগত যে, কী করে এই মানুষটিই হল গিলক্রিস্ট, ট্রুম্যানদের মতো পেস বোলারদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। কীভাবে অসীম ধৈর্য, সংকল্প, মনোযোগ নিয়ে এঁদের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করতেন। সত্যিই অসাধারণ!

গুরুগম্ভীর এই মানুষটিই ছিলেন আমুদে। ভোজনরসিক।

সত্যিই কত স্মৃতি! বাবার যে গুণগুলো ভাল লাগত, তার মধ্যে অন্যতম হল উনি ছিলেন ভীষণ শৃঙ্খলাপরায়ণ। ছিলেন অসম্ভব পাংচুয়াল। বাড়িতে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল যে, রাত ন'টার মধ্যে ফিরতে হবে।



পঙ্কজ রায়ের স্কোয়ার ড্রাইভ

সিনেমা-গানের প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান অসম্ভব পছন্দ করতেন। ভালবাসতেন উত্তম-সুচিত্রা-সুপ্রিয়ার সিনেমা দেখতে। বাবা ছিলেন একেবারে খাঁটি বাঙালি। প্রকৃত গুণীর সমাদর করতেন। মনে আছে সুনীল গাভাসকরের খেলা উনি ভীষণই পছন্দ করতেন। ভালবাসতেন শচীন, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণকে। আর অবশ্যই বাংলার 'মহারাজ' সৌরভকে। দেখেছি, শচীন একটা স্ট্রেট ড্রাইভ মারলে উনি তারিফ করতেন। আবার সৌরভ সম্পর্কে বলতেন, "ওকে আউট করা শচীনের থেকেও কঠিন। কারণ সৌরভ স্ট্যাম্পের বলটা সোজা ব্যাটে খেলে।" আবার নিজের সময়ের বিজয় মার্চেন্ট, বিজয় হাজারে, ভিনু মানকড়, গ্যারি সোবার্স, পিটার মে, নিল হার্ভিদের কথা বলতে গিয়ে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়তেন। বলতেন, "উফ্, কী খেলত।"

নিজে যেমন খেতে পছন্দ করতেন, তেমনই খাওয়াতেও ভালবাসতেন। ছোটবেলায় সপ্তাহে দু'দিন আমরা সপরিবারে বাইরে খেতে যেতামই। ইলিশ মাছ খেতে খুব ভালবাসতেন। ছোটবেলায় লাহোর বলে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। সেখানে শিক কাবাব ও লস্যি খেতাম। আর চাইনিজ খেতে যেতাম পার্ক স্ট্রিটের ওয়াল্টড্রবে। যেতাম নানকিন নামে এক রেস্তোরাঁতে-ও। শুধু তাই নয়, শেরিফ হওয়ার পরও বাবাকে শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে তেলে ভাজা খেতেও দেখিছি। ঘুগনি খেতে দেখেছি। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে জমিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতেন।

বাবা অসম্ভব অ্যাডভেঞ্চারাস ছিলেন। আমি তো বাবার সঙ্গে গাড়িতে করেই সারা ভারত ঘুরেছি। বাবাই ড্রাইভ করতেন। একবার তো গাড়ি নিয়ে কাশ্মীর চলে গিয়েছিলাম। একবার গভীর রাতে জিম করবেট জঙ্গল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাবলেই কেমন যেন গায়ে কাঁটা দেয়! অসম সাহসী এই মানুষটির ঝোঁক ছিল শিকারেও। তবে বাবার জীবনে একটা দুঃখ থেকেই গিয়েছিল। দু'বার কাছ থেকেও বাঘ শিকার করতে পারেননি।

জীবন সায়াহ্নে এই অসম সাহসী, রাশভারী মানুষটিকেই ভীষণ ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম। ব্যবসায়ীক কারণে বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। চুপ থাকতেন। তারমধ্যেও তখন নাতি-নাতনিদের সঙ্গে আনন্দে কাটাতেন। ওদের সঙ্গে হাসি-খাট্টা-মজা করতেন।

তখন দেখলে বোঝা যেত না, এই মানুষটির নাম পঙ্কজ রায়। গম্ভীর, রাশভারী, অ্যাডভেঞ্চারাস...।

অনুলিখন : অনিন্দ্য সিনহা চৌধুরি



পুরনো মতে

শেখর বসু

বাড়ির নাম ‘আনন্দনিকেতন’। আনন্দেরই নিকেতন। তিনতলা বাড়ির সব জায়গায় আনন্দ আর সমৃদ্ধির চাপ। বাড়ির মালির বিশ্বরূপ গুপ্ত মস্ত বড় ব্যবসায়ী। পাঁচ-পাঁচটা চালু ব্যবসা। প্রতিটি ব্যবসাই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

এত বড়লোক হলে মানুষের চলাফেরা, কথাবার্তায় একটু বুঝি বেয়াড়া ধরনের ছাপ ফুটে ওঠে। নিন্দুকেরা একেই বলে বোধহয় বড়লোকি চাল। কিন্তু অতি বড় নিন্দুকও এই দোষটা খুঁজে বের করতে পারেনি বিশ্বরূপের মধ্যে।

মানুষটি সজ্জন, বিনয়ী, লোকের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ান। নানা ধরনের সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। বিস্তর দানধ্যানও করেন, কিন্তু সবকিছুই পাঁচজনের চোখের আড়ালে। নিজেকে কখনও প্রচারের আলোর মধ্যে রাখেন না। এই মানুষটির বাড়িতে আজ একটি বাড়তি আনন্দের খবর আছে। ছেলে মন্দার ইতিহাস অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বিএ পাস করেছে। এই উপলক্ষে বিশ্বরূপ বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেননি, কিন্তু এর-তার মুখে খবর পেয়ে আত্মীয়-বন্ধু আর হিতৈষীদের বেশ কয়েকটা ঝাঁক বাড়িতে চলে এসেছিল। এ-বাড়িতে কারও আদর-আপ্যায়নে কখনওই ঘাটতি পড়ে না, কিন্তু আজ অতিথিসেবায় একটু বুঝি বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছিল।

মন্দার একটু লাজুক প্রকৃতির ছেলে। পালিয়ে-পালিয়ে থাকার

চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পেরে ওঠেনি। না পারার পেছনে আছে ছোট বোন মল্লিকা। বারো ক্লাসের ছাত্রী। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। অভিনন্দনের উত্তরে দাদার লজ্জা পাওয়াটা ও-ই উপভোগ করেছিল সব চাইতে বেশি। বাড়ির গৃহিণী মীরা সোজা কথার মানুষ, ঘোরপ্যাঁচ জানেন না; ছেলের কৃতিত্বের আনন্দ আর পাঁচজনের সঙ্গে তিনিও বোধহয় ভাগ করে নিচ্ছিলেন বারবারই।

বিশ্বরূপের দিন শুরু হয় ভোর পাঁচটায়। তারপর থেকে তাঁর প্রতিটি কাজই চলে ঘড়ির সময় ধরে। প্রাতঃভ্রমণে যান, ফিরে এসে স্নান, পুজো, সামান্য ব্রেকফাস্ট। তারপরেই শুরু হয়ে যায় তাঁর অফিসের কাজ। নানা জায়গায় ফোন, ই-মেল, ফ্যাক্স ইত্যাদি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সকাল আটটায়। সব ঋতুতেই এক নিয়ম।

বাড়ি ফেরেন রাত আটটা নাগাদ। নিজের ঘরে বসে মৃদু আলোয় এক কাপ কালো কফি খান। তারপর স্নান। খাওয়ার টেবিলে আসেন রাত সাড়ে ন'টায়। কর্তা-গিন্নি আর ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করেন। খেতে খেতে চারজনের মধ্যে নানা ধরনের গল্প হয়। খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও গল্প চলে কিছুক্ষণ।

পারিবারিক জীবনের এই উত্তাপটুকু পাওয়ার জন্যে বিশ্বরূপ কেমন যেন মুখিয়ে থাকেন। পরিবারের বাকি তিনজন তো নিজেদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ যখন তখন পাচ্ছে। ওঁর অভাববোধ ছেলেমেয়ের কাছে কতখানি, তাঁর খোঁজ তিনি আলাদা করে কখনওই নেননি, তবে এটা টের পান—রাতের খাবার-টেবিলের এই আড্ডার প্রতি প্রত্যেকেরই বেশ একটা টান আছে।

আজকের এই আড্ডায় প্রধান বক্তা ছিল মল্লিকা। বেশ মজা করে দাদার লজ্জার পাওয়ার গল্পগুলো ও বাবাকে শোনাচ্ছিল। কখনও-কখনও খানিকটা মূকাভিনয়ও করে নিচ্ছিল। হাসতে হাসতে বোনকে দু'চারবার থামাবার চেষ্টা করেছিল মন্দার, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি।

খাওয়া শেষ হওয়ার পরে বিশ্বরূপ ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এবার তুমি কী করবে ঠিক করেছ?'

বিশ্বরূপের কণ্ঠস্বর একটু বুঝি পাল্টে গিয়েছিল। অবাক হয়ে মন্দার জিজ্ঞেস করল, 'কী করব মানে?'

একটু হাসলেন স্নেহপ্রবণ বাবা। 'তুমি এখন গ্র্যাজুয়েট, মানে উচ্চশিক্ষিত। এবার আমাদের পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকে পড়ো। পাঁচটা ব্যবসা। তুমি পাশে থাকলে আমি নিশ্চিত বোধ করব। আমার তো বয়েস হচ্ছে—।'

বাবার কথার জবাবে ছেলে কিছু বলল না। ওর মুখ নিচের দিকে আর একটু ঝুঁকে পড়েছিল।

ব্যবসায়ী বাবা ছেলের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'এটা মাসের শেষ। এই ক'টা দিন বন্ধুদের সঙ্গে একটু আড্ডাটাড্ডা মেরে নাও, সামনের মাসের গোড়া থেকে আমাদের নতুন অফিসে জয়েন করো।'

ছেলে এখনও চুপ।

বাবার কণ্ঠস্বরে এবার একটু আবেগ খেলে গেল। 'ব্যবসায় ঢোকার এটাই বয়েস। আমাকে অবশ্য বেশ কিছুটা আগেই ঢুকে পড়তে হয়েছিল। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পরেই। পরীক্ষার ফল খারাপ ছিল না, কিন্তু তখন বিদ্যে বাড়াতে যাওয়া মানে না খেতে পেয়ে থাকা। আমি একা নই, বাড়িসুদ্ধু সবারই। হঠাৎই বাবা মারা যাওয়ায় আমাদের সংসার একেবারে ধসে পড়েছিল। কিন্তু ওইটুকু বিদ্যে নিয়ে অল্পবয়সি একটা ছেলে কী করবে! তবে খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্যে, তোমাদের ভাষায় যাকে বলে জীবন সংগ্রাম—তাতেই নেমে পড়তে হয়েছিল আমাকে। দিনরাত্তির পরিশ্রম করতাম, অমানুষিক পরিশ্রম—। আর হ্যাঁ, ঈশ্বরের আশীর্বাদও ছিল নিশ্চয়ই, একটু-একটু করে পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়ে উঠেছিল।'

বিশ্বরূপ যে ফকির থেকে রাজা হয়ে উঠেছেন—সে গল্প এই খাবার-টেবিলের তিনজনেরই জানা। বিশ্বরূপ নিজেই বলেছেন বহুবার। অন্যান্য সূত্র থেকেও এরা শুনেছে। কিন্তু তিনি যখন তাঁর লড়াইয়ের গল্প শুরু করেন, কেউ বাধা দেয় না। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করা জীবনের কথা বলতে অতিমাত্রায় সফল একজন মানুষ ভালওবাসেন। শুনতে কারও খারাপ লাগে না। কিন্তু আজ বোঝা যাচ্ছিল, বিশ্বরূপের এইসব কথা গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনও কথার ভূমিকা মাত্র।

একটু বুঝি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন বিশ্বরূপ। ছেলের দিতে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর সামান্য উপরে তুলে বললেন, 'কী হল, তুমি কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

মন্দার এবারও কথার কোনও উত্তর দিল না। ওর মুখ নিচের দিকে আরও একটু বুঝি ঝুঁকে পড়েছিল।

লোকচরিত্র বোঝার অসম্ভব ক্ষমতা ধরেন সফল ব্যবসায়ী বিশ্বরূপ। কেউ ঠোঁট নাড়লেই তিনি তার পেটের কথা বুঝে যান। মুখ দেখে মনের কথা ধরে ফেলার ব্যাপারে ওঁর বুঝি জুড়ি মেলা ভার।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বিশ্বরূপ একটু নির্দেশ দেওয়ার গলায় বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, সামনের মাসের এক তারিখ থেকে তুমি আমাদের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে বসছো। আমি সেদিন তোমাকে ওই অফিসে নিয়ে গিয়ে অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আলাদাভাবে একটা ব্রিফিংও দিয়ে দেব তোমাকে। কোনও অসুবিধা হবে না তোমার।

মন্দার মাথা নিচু করে রেখেই ধীরে ধীরে বলল, 'আমি আমার পড়াশোনা আর একটু চালাতে চাই।'

মনে মনে ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিলেন বিশ্বরূপ। একটু কেটে কেটে বললেন, 'বিএ-র পরে এমএ, তারপর পিএইচডি। তুমি ভাল ছাত্র, আমেরিকার কোনও একটা ইউনির্ভাসিটিতে স্কলারশিপও পেয়ে যেতে পার। পিএইচডি করা মানে চারটে বছর। তারপর হয় বিদেশে নয় স্বদেশে অধ্যাপনা—।'

মন্দার কী যেন বলতে যাচ্ছিল, ওকে থামিয়ে বিশ্বরূপ বলে উঠলেন, 'এ লাইনে তুমি একা নয়, অধিকাংশ বাঙালির চিন্তাভাবনা এই পথেই ঘোরে। হয় ক্লার্ক, নয় অফিসার, কিংবা একজন অধ্যাপক। চাকরি করা বাঙালিদের রক্তে মিশে গেছে। ব্যবসাকে ঘেন্না করে বাঙালি।'

মন্দার আবারও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এবারও ওকে থামিয়ে দিয়ে বিশ্বরূপ বলে উঠলেন, 'আমি যা বলেছি, সেটাকেই তুমি একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সুন্দর করে বলবে—এই তো?'

'না।' কেমন যেন ধাক্কা-দেওয়া গলায় বলে উঠেছিল মন্দার।

টেবিলের সবাই বুঝি একটু চমকে উঠে ওর দিকে তাকিয়েছিল।

বিশ্বরূপ নিজের মনোভাব কাউকে বুঝতে দেন না। ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট বিরক্ত হলেও একটু শান্ত গলায় বললেন, 'আমার পাঁচটা ব্যবসা। দু'তিনটে বড় এক্সপ্যানশন স্কিম নিয়েছিলাম, এবার সেগুলো বন্ধ করার কথা ভাবতে হবে। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, অমরও নই। আমার ব্যবসা যখন এক জেনারেশনের ব্যবসা, অহেতুক আর খাটাখাটুনি করে কী লাভ!'

মন্দারের মুখ এখনও নিচের দিকে ঝোঁকানো। মৃদু আর্তনাদের ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'তুমি তো আমাকে কথাই বলতে দিচ্ছ না—!'

'যা বলার তা তো বলেই দিয়েছ। ব্যবসা করবে না, আরও পড়তে চাও—এই তো?'

'আমি ব্যবসা করব না—এ কথা একবারও বলিনি।'

'আলাদাভাবে বলার আর কী আছে! আরও দু'বছর সময় নিয়ে এমএ পড়বে, তারপর চার বছর ধরে পিএইচডি—। পরে আরও কিছু গবেষণাও করতে পারো—।'

মন্দার কখনও বাবার মুখের উপর কথা বলে না, দুর্বিনীত তো নয়ই; হঠাৎ একটু বুঝি রুখে ওঠার গলায় বলে উঠল, 'তুমি আমার মুখে কথা বসিয়ে দিচ্ছ।'

বিশ্বরূপ চটে উঠতে গিয়েও অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলতে চাইছ তুমি?'

মন্দার একটু কাশল, এক চুমুক জল খেল, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'আমি এমএ পড়ার কথা একবারও ভাবিনি। আমি এমবিএ করব।'

সামান্য অবাক হয়েই ছেলের দিকে তাকিয়েছিল বাবা।

আর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে মন্দার বলল, 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়া থাকলে মনে হয়, আমি আমাদের ব্যবসা আরও ভালভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বিশ্বরূপ। নিজেকে উনি বেশ খানিকটা ভূয়োদর্শী ভাবতেন, লোকচরিত্র বোঝার দক্ষতা থাকার জন্যে চাপা অহংকারও ছিল—সেই উনি ছেলের মনের এই কথাটাই ধরতে পারেননি! কিন্তু মানুষটি সহজ উচ্ছ্বাস কখনওই প্রকাশ করেন না, অবলীলায় হ্যাঁ বা না-এর মধ্যে যেতে চান না। একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিতে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ, ভেবে বলো তো।'

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মন্দার আবার মুখ তুলল। ওকে একটু বুঝি আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। শান্ত অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, 'পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি। এই বিষয়ে ম্যানেজমেন্টের কয়েকজন এক্সপার্টের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁদের কথাবার্তা আমার কাছে বেশ কনভিনসিং বলে মনে হয়েছে। ব্যবসার ধরনধারণ এখন একেবারে পাল্টে গিয়েছে। প্রযুক্তির কত উন্নতি হয়েছে। পৃথিবী ছোট হয়ে গিয়েছে। এখানে বসে এখন পৃথিবীর আর এক প্রান্তের সঙ্গে কত সহজে ব্যবসা করা যায়। ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমেও প্রচুর রদবদল হয়েছে। তাই ভাবছিলাম আমাদের ব্যবসাগুলো যদি আধুনিক কনসেপ্টের মধ্যে ফেলা যায়, আমাদের ব্যবসা বহুগুণ বেড়ে যাবে।'

ছেলের কথা শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন বিশ্বরূপ। ওর মধ্যে তিনি অদূর ভবিষ্যতের একজন সফল শিল্পপতিকে দেখতে পাচ্ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হল—আরও একগাদা পড়াশোনা করে চাকরিবাকরি বা অধ্যাপনার দিকে নজর নেই ছেলের।

মনোভাব গোপন করতে পারেন বিশ্বরূপ, ওঁর মুখে আনন্দ প্রকাশের একটা রেখাও ফুটে ওঠেনি। একটু বুঝি কঠিন গলাতেই প্রশ্ন করলেন, 'এমবিএ শেষ করতে তোমার ক'দ্দিন লাগবে?'

'দু'বছর।'

'তারপরেই কি তুমি আমাদের ব্যবসায় ঢুকতে চাও?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। দু'বছরে যা শিখব, সেগুলো তো আমাদের ব্যবসায় অ্যাপ্লাই করতে হবে।'

'এমবিএ কোথায় পড়বে ঠিক করেছ?'

'ইচ্ছে তো আমেদাবাদে—।'

'কোনও ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছ?'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকটার সঙ্গে।'

'বাহ্!' স্বস্তিদায়ক শব্দটা বুঝি আলগোছেই বেরিয়ে পড়েছিল বিশ্বরূপের মুখ থেকে। ওই একটি শব্দেই ঘরের চেহারা আনন্দময় হয়ে উঠেছিল।'

এবার হাসি ফুটল সফল ব্যবসায়ীর মুখে। 'ঠিক আছে, এগিয়ে যাও।' তোমার এই ব্যাপারটায় আমার পুরো সায় আছে। তবে দেখো ইনস্টিটিউটটা যেন ভাল হয়। আজকাল তো ব্যাঙের ছাতার মতো এখানে-সেখানে এমবিএ পড়ানোর আখড়া গজিয়ে উঠছে—।'

বহুক্ষণ বাদে মন্দারের মুখে ঝলমলে হাসি ফুটে উঠেছিল। 'না-না, আমি ভাল জায়গাতেই ঢুকব।'

মল্লিকা বাবার নয়নের মণি। ও আদুরে গলায় বলে উঠল, 'পরে আমিও কিন্তু এমবিএ করব—।'

বাবা হেসে উঠেছিলেন। 'তুই এমবিএ পড়ে কী করবি?'

'কী আবার, ব্যবসা।'

'তোর শ্বশুরবাড়ির লোক যদি রাজি না হয়?'

ঠোঁট ওল্টালো আদুরে মেয়ে। 'যে ছেলে ব্যবসায় ইন্টারেস্টেড নয়, তাকে আমি বিয়েই করব না।'

এবার হেসে উঠেছিলেন গৃহকর্ত্রী মীরা। 'তুই যা ঠোঁটকাটা, তোর বিয়ে হওয়াই শক্ত!'

এ বাড়ির আনন্দঘন আরও একটি রাত শেষ হল।

২

সুখের দিন, আনন্দের দিন একটু বুঝি জোরেই গড়ায়। এই আনন্দ নিকেতনের দুটো বছর বেশ দ্রুতই ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমেদাবাদের একটা ভাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিল মন্দার। ভাল ছাত্র ও, তাছাড়া এখানে পড়তে আসার পরিকল্পনা ওর নিজেরই; সুতরাং প্রথম দিন থেকেই ও লেখাপড়ার ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি সেমিস্টারেই দারুণ ফল। দু'বছরে মাত্র অল্প কয়েকদিন বাড়ি থেকে ঘুরে গিয়েছে। পরীক্ষার ফল এখানেও দারুণ—প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয়।

এমবিএ করা কৃতী সন্তান ফিরে এসেছে বাড়িতে। বিশ্বরূপ মনের কথা খুব বেশি বলেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা চাপা আগ্রহ নিয়ে এই দিনটির দিতে তাকিয়েছিলেন। রাত সাড়ে ন'টার খাবার টেবিলের জন্যে আজ বিশেষ কিছু পদের আয়োজন করেছিলেন গৃহকর্ত্রী।

সরু চালের ধপধপে ভাত, মুখরোচক বেশ কয়েকটা পদ। খাবার-টেবিলে এ-বাড়ির চারজন। খাবার সার্ভ করছিল বাড়ির কাজের লোক। খেতে খেতে রান্নার প্রশংসা করল সবাই। রান্নাঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল রাঁধুনি। প্রশংসা শুনে হাসিমুখে নড়েচড়ে উঠেছিল। নানা ধরনের গল্প চলছিল খাবার টেবিলে। আমেদাবাদ শহর, ওদের ইনস্টিটিউট, এমনকী ওখানকার রাজনীতি নিয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেলেছিল মন্দার।

শুনতে বাকি তিজনের বেশ লাগছিল। বিশ্বরূপ লক্ষ করছিলেন ছেলে আগের চাইতে ঢের বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। চেহারায় বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব এসেছে।

মন্দার থামতেই বিশ্বরূপ নিজের সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প জুড়েছিলেন। এ গল্প এ টেবিলের তিনজনের জানা, কিন্তু সে-কথা আগেভাগে জানিয়ে বক্তাকে নিরুৎসাহিত করেনি। এখন ওই

কাহিনিটি শোনানোর পেছনে বিশ্বরূপের একটা অন্য হিসাব কাজ করেছিল। যাকে বলে ইন্সপায়ার্ড টক, আজকের কথাগুলো অনেকটা সেইরকমই হবে। ছেলে ব্যবসায় ঢুকতে যাচ্ছে—এই বৃত্তান্তটি নিশ্চয়ই ওর মনোবল আর জেদ বাড়াতে সাহায্য করবে।

মুখের খাবার একটু চিবিয়ে গলার মধ্যে নামিয়ে দিলেন বিশ্বরূপ। তারপর এক চুমুক জল খেয়ে নিয়ে বললেন, 'তখন আমার বয়েস সতেরো-আঠারো। বছর দেড়েক ছোটখাটো একটা চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরার পরে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ধরেছিলাম। নামেই ব্যবসা। এ অফিস, সে অফিস ঘুরে পিন, কুশন, জেমস ক্লিপ—এইসব স্টেশনারি আইটেমের ছোটখাটো অর্ডার সাপ্লাই করতাম। নামমাত্র লাভ হত, তবে সব সময় নয়। কিছু ধারবাকি থেকেই যেত, কিছু আবার মারও যেত। একদিন ক্লান্ত হয়ে সন্ধেবেলায় চৌরঙ্গির একটা ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ে চা খাচ্ছিলাম। মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ। একটা অফিস থেকে কিছু টাকা পাওয়ার কথা ছিল, পাইনি। পরদিনের সংসার খরচের পয়সাও হাতে নেই। চায়ের ভাঁড় হাতেই ধরা, দুশ্চিন্তায় খেতে পারছিলাম না।'

নিদারুণ ওই কষ্টের কথা বলতে বলতে একটু থামলেন বিশ্বরূপ, তারপর মালাইকারির মস্ত বড় একটা চিংড়ি প্লেটে তুলে নিলেন। এক টুকরো ভেঙে নিয়ে চিবোলেন, তারপর কথা শুরু করলেন আবার। 'পাশের একটা পুরনো অফিসবাড়ির দেওয়ালের নিচের দিকে একটা অংশ সারাচ্ছিল একজন রাজমিস্ত্রি, তাকে মালপত্র জোগান দিচ্ছিল একটু মজুর। সেদিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে নোংরা ফতুয়া আর খাটো ধুতি-পরা একটা দেহাতি লোক। কী করতে চায় ওরা ওখানে? জানার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না আমার। কিন্তু মনের দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে একটু অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যে গল্প জুড়ে দিলাম ওই লোকটার সঙ্গে। ও ছিল বিহারের অসংখ্য ভাগ্যান্বেষীদের একজন। লোকটার বায়োডাটা দারুণ—।'

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল বিশ্বরূপের মুখে। মালাইকারির সঙ্গে ভাত মেখে একটু খেলেন। তারপর কথা শুরু করলেন ফের। 'লোকটা বিহারের একটা গণ্ডগ্রাম থেকে কলকাতায় এসে রাস্তার ধারে বসে দাঁতন বেচত। তখন কলকাতায় লোকজনের সংখ্যা আজকের তুলনায় অনেক কম। শহরতলিতে বিস্তর গাছপালা ছিল। নিমগাছও ছিল বেশ কয়েকটা। লোকটা ওই গাছ থেকে সরু-সরু ডাল কেটে আনত। বিনি পয়সার প্রোডাক্ট। কাটারি দিয়ে কেটে দাঁতন বানিয়ে রাস্তার ধারে বসে বেচত। দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজার লোকও ছিল অনেক। দাঁতন বেচে বেচে ছোট্ট একটা ক্যাপিটাল বানিয়ে ফেলেছিল ওই লোকটা। সেই টাকা নিয়ে এখন অন্য ব্যবসায় নামল। কী ব্যবসা বলো তো?'

উত্তরটা শ্রোতাদের তিনজনেই জানে, কিন্তু গল্পের রসভঙ্গ হবে ভেবে কেউ উত্তর দিল না। চিংড়ির আর একটা টুকরো মুখে ফেলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে চিবোলেন বিশ্বরূপ, তারপর কথা শুরু করলেন আবার। 'কলকাতায় গড়ের মাঠে কিন্তু ফেরিওয়ালা তখন পেতলের কলসিতে করে চা বেচত। ছোট-ছোট খুরিতে করে চা। সে চায়ের বিচিত্র স্বাদ, কিন্তু তা খাওয়ার লোক ছিল অনেক। গড়ের মাঠে বসে বাদাম, ঝালমুড়ি খাওয়ার পরে একটু চায়ের তেষ্টা পেত অনেকেরই। খোলা আকাশের নিচে মাঠে বসে চা খাওয়ার মজাই আলাদা, তা সে যেমনই চা হোক না কেন। এসব ওই লোকটার মুখ থেকেই শোনা। বলেছিল বাবু, চা বেচে ভালই ফয়দা হয়েছিল। তা ভাবলাম, আর একটা বড় বেওসা করা যাক। বড় ব্যবসা মানে জুতোর দোকান। চাদরে বেঁধে একগাদা নানা ধরনের জুতো নিয়ে ফুটপাথে বসত। মাথার উপর পলিথিনের ছাউনি। লোকটার নিজের মুখে বলা—ওই ব্যবসায় ওর ভালরকম লাভ হয়েছে। লোকটা ধরতে গেলে হাতজোড় করে রেখেই গল্প জুড়েছিল। অত্যন্ত বিনীত। বলল—বাবু, এবার নতুন ব্যবসা করতে যাচ্ছি। কী ব্যবসা? এই দেওয়ালের উঁচু জায়গাটায় তক্তা লাগিয়ে একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান করব। বোতলে ভরা মিঠা পানিও থাকবে। ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম—তা, এই দোকানটা বানাতে তোমার কত খরচ হবে? বলল—পচাশ হাজার। পঞ্চাশ হাজার! সেই আমলে পঞ্চাশ হাজার মানে অনেক টাকা। জিজ্ঞেস করেছিলাম—এত টাকা কি তুমি জুতোর দোকান বানিয়ে করেছ? লোকটা মিনমিন করে জবাব দিয়েছিল—না বাবু, পুরোটা নয়, দেশে কিছু ক্ষেতিজমি ছিল, সেসবও বিক্রি করে দিয়েছি। শুনে ওর জন্যে সত্যিই আমার কষ্ট হয়েছিল তখন। বিহারের গাঁয়ের সরল একটা লোক নির্ঘাত কোনও জোচ্চরের পাল্লায় পড়ে সর্বস্ব খোয়াতে বসেছে!'

চিকেনের বাটিটা টেনে নিয়েছিলেন বিশ্বরূপ। ছোট-ছোট পিসের চিকেন কারি। ভাতে একটু কারি ঢেলে নিলেন। তারপর মুখে দিয়ে বললেন—বাহ্! বেশ হয়েছে তো! খানিকটা খাওয়ার পরে আগের গল্প শুরু করলেন আবার। 'সত্যি কথা বলতে কী, সেই মুহূর্তে আমি বুঝি আমার নিজের দুঃখকষ্টের কথা ভুলে গিয়ে লোকটাকে সাহায্য করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। বললাম—তুমি কি পাগল হয়েছ! এত টাকা খরচা করে পরের বাড়ির দেওয়ালে দোকান বানাচ্ছ! দু'দিন বাদে বাড়ির মালিক আর কর্পোরেশনের লোক এসে তোমার এই দোকানঘর ভেঙে দেবে। এটা পুরোপুরি বেআইনি। তুমি কিছু করতে পারবে না। লোকটার উত্তরটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। আগেরই মতো হাত জড় করা, কিন্তু গলায় বেশ আত্মবিশ্বাস। শান্ত গলায় বলেছিল—না বাবু, কেউ ভাঙতে আসবে না। দাদাদের টাকা দেওয়া আছে। দাদা, মানে ওখানকার মাস্তান। বলল, কেউ ভাঙতে এলে দাদারা সামলে দেবে। বললাম, দাদাদের কী অনেক টাকা দিয়েছ? বলল, হ্যাঁ বাবু। তখন মনে হয়েছিল— সরল-সাদাসিধে লোকটা সর্বনাশের একেবারে মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর বাঁচার আর কোনও রাস্তা নেই।'

বিশ্বরূপ খাওয়ার সময় নিয়ম মেনে খান না। আগেরটা পরে আবার পরেরটা আগে খান। চিকেনকারি ছেড়ে হঠাৎ উনি আলু-পোস্তয় চলে গিয়েছিলেন। খানিকটা আলু-পোস্ত খাওয়ার পরে তিন শ্রোতার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমার ব্যবসার জীবনে ওই দেহাতি লোকটিকেই আমি আমার গুরু বলে মানি। আরও বছর দুয়েক জীবন সংগ্রামে নাস্তানাবুদ হওয়ার পরে ভাবলাম —যাই তো, ওই দেহাতি লোকটাকে একবার দেখে আসি। ওই দিকেই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি রমরম করে দোকান চলছে। পান-সিগারেট তো আছে আছেই। সঙ্গে নানা ব্র্যান্ডের কয়েক ক্রেট কোল্ড ড্রিংকস। খদ্দেরের ভিড়। শুধু ওই দেহাতি লোকটিই নয়, সঙ্গে আরও দু'জন সহকারী দোকান সামলাচ্ছে। লোকটির সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমাকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পরে ওই লোকটির সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে গেলেই ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে আসতাম আমি। ওর যে জিনিসটা আমাকে সবচাইতে বেশি মুগ্ধ করেছিল, তা হল ওর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা। ওই যে বলে না—নো রিস্ক, নো গেন—কথাটা খুব সত্যি। ঝুঁকি নিতে হবে। বড় ধরনের ঝুঁকি



মানেই বড় ধরনের লাভের সম্ভাবনা। আর একটা বিষয়েও শিক্ষা নিয়েছি ওর কাছ থেকে—তা হল পরিশ্রম। অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারত লোকটা। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা—সব ঋতুতেই সমান। দিন শুরু হত সেই ভোরবেলায়, শেষ হত অনেক রাতে। দোকানে লাভ হচ্ছিল প্রচুর, কিন্তু ওর চালচলন, পোশাকআশাকে তার কোনও ছাপ পড়েনি কোনওদিন। বছর দশেকের মাথায় ধর্মতলা স্ট্রিটে ছোট একটা হোটেল কিনে ফেলে লোকটি। পরে হোটেল-লাগোয়া একটা দোকানঘর কিনে নিয়ে এক্সটেনশন করেছিল। সেই হোটেলের ব্যবসাও দারুণ! যাকে বলে র‍্যাগ্‌স টু রিচেস—ঠিক সেই কাহিনি। লোকটির আর একটি মস্ত গুণ ছিল—সৎ প্রকৃতির, সজ্জন মানুষ। লোকটি আজ আর বেঁচে নেই। ওর সেই পান-সিগারেটের দোকান আর হোটেলের ব্যবসা চালাচ্ছে ওর ছেলে আর নাতি।'

আজ এ গল্প শুধু গল্পেই থামল না। বিশ্বরূপ কায়দা করে একটি নীতিবাক্য জুড়ে দিলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে কোনও উদ্যোগী মানুষেরই এর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার।'

উনি আশা করেছিলেন, ছেলে গল্পের ভেতরের অর্থটা ধরে নিয়ে ব্যবসায় ওর নতুন উদ্যোগের কথা শোনাবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মন্দার ওই ব্যাপারে একটা কথাও বলল না। একটু বাদে আবার টেবিল থেকে উঠে পড়েছিল সবাই

৩

পরদিন খাবার টেবিলে আগ বাড়িয়ে ওই প্রসঙ্গেই কথা তুলেছিল মন্দার। একটু বুঝি খাপছাড়া ভঙ্গিতেই বলে বসল, 'বাবা, তোমার ওই দেহাতি লোকটা ব্যবসায়ী নয়, জুয়াড়ি।'

ছেলের কথা শুনে বিষম খাওয়ার দশা হয়েছিল বিশ্বরূপের। অবাক মানুষের গলায় বললেন, 'জুয়াড়ি! জুয়াড়ি বলছ কেন?'

'জুয়ায় কেউ-কেউ হঠাৎ অনেক টাকা পেয়ে যায় না? ওই লোকটাও তাই পেয়েছিল। ওই যে লোকটার ঝুঁকি নেওয়ার কথা বলছিলে না, ওটা ব্যবসায়ীর ঝুঁকি নেওয়া নয়, জুয়াড়ির ঝুঁকি। ব্যবসায়ীরা যে ঝুঁকি নেয়, তাকে বলে ক্যালকুলেটেড রিস্ক।'

নিজের সারা জীবনের রোল-মডেলকে নিয়ে এই ধরনের কথা সহ্য করা কঠিন বিশ্বরূপের পক্ষে। একটু উঁচু গলাতেই প্রশ্ন করলেন, 'এটা ব্যবসায়ীর ঝুঁকি নেওয়া নয় কেন?'

আত্মবিশ্বাসী মানুষের গলায় মন্দার বলল, 'পান-সিগারেট-কোল্ড ড্রিংকসের দোকান বানাবার আগে লোকটার হাতে কোনও ফিজিবিলিটি রিপোর্ট ছিল না। রিস্ক কভারের জন্য কোনও ইনসিওরেন্স ছিল না। কোনও পার্টির সঙ্গে কোনওরকম ডিডও করেনি। এই অবস্থায় সত্যিকারের কোনও ব্যবসায়ী নিজের সর্বস্ব ঢেলে দেয় না। লোকটার ডুবে যাওয়ার চান্স ছিল নাইনটি-নাইন পারসেন্ট। না ডুবে ভেসেছে, এটা হচ্ছে শিয়ার লাক। একে বলে গ্যাম্বলার্স লাক। ঘোড়দৌড়ের মাঠে আচমকা অনেক টাকা নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা। আমি তোমাকে ম্যানেজমেন্টের উপর একটা বই পড়তে দেব। বিদেশের নানা জায়গায় বইটার খুব প্রশংসা হয়েছে। আমার কথাগুলো সত্যি কি না—ওই বইটা পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে।'

শুনে বিশ্বরূপ বেজায় চটে গিয়েছিলেন। তবে রাগ না প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'সারা জীবন ধরে ব্যবসা করছি। একটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা। প্রতিটিই শূন্য থেকে গড়ে তুলেছি। প্রতিটিই এখন লাভজনক। হাতে-কলমে কাজ শিখেছি। নিজের অভিজ্ঞতা আর কাণ্ড-জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছি। প্রয়োজনে ঝুঁকিও নিয়েছি প্রচণ্ড। সেই ঝুঁকি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আমার হাতে কখনও কোনও ফিজিবিলিটি রিপোর্ট ছিল না। তুই যাকে ক্যালকুলেটেড রিস্ক বলছিস —তেমন ঝুঁকি নয়। ঝুঁকি নেওয়ার পেছনে কাজ করেছে কাণ্ডজ্ঞান। এটা জেনে রাখিস—দিনরাত্তির পরিশ্রম করা আর সৎ থাকা আমার ব্যবসার মূলনীতি।'

সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল এমবিএ মন্দার। মৃদু গলায়, 'কিছু মনে করো না বাবা, এসব সেরেস্তাদারিমার্কা কথা। আধুনিক ব্যবসায় এগুলো অচল। তুমি এতকাল ধরে ব্যবসা করছ, তোমার ব্যবসার ভলিউমও বেশ বড়, অথচ তুমি কখনও ব্র্যান্ড প্রোমোশনের দিকে যাওনি। মডার্ন বিজনেস কিন্তু ব্র্যান্ড প্রমোশন

ছাড়া চলতে পারে না। আর ওই যে সততার কথা বলছ, আধুনিক ব্যবসার জগতে ওটা একটা রিলেটিভ টার্ম। তুমি ব্যবসা করছ কেন? লাভ করার জন্যে তো? সবাই তাই করে। মরে গেলেও দুধে জল মেশাব না—এমন সততা মডার্ন কনসেপ্টের ব্যবসায় চলে না।'

বিশ্বরূপ প্রথম দিকে যুক্তি-বুদ্ধি সাজিয়ে ছেলের ধারণা রদবদল করতে চাইছিলেন, কিন্তু দেখলেন ওই পরিশ্রম অর্থহীন। ছেলের মগজ মডার্ন বিজনেস ম্যানেজমেন্টের তত্ত্ব আর থিয়োরিতে ঠাসা। তিনটে কথার পরেই একটা বিলিতি বইয়ের নাম বলে। বিজনেস টাইকুনদের বক্তৃতার অংশবিশেষ শোনায়।

একটু আপত্তি তোলার গলায় বিশ্বরূপ বলেছিলেন, 'এ দেশটা আমেরিকা, ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়া নয়। এখানকার লোকদের চাহিদা, অভ্যাস, ভাল-মন্দের বোধ অনেকটাই আলাদা। এখানকার ব্যবসায় ওখানকার থিয়োরি চোখ বুজে মানা সম্ভব না।'

কিন্তু সদ্য এমবিএ হওয়া ছেলেকে এত অল্প কথায় ঠেকিয়ে রাখা কঠিন। ম্যানেজমেন্টের মুখস্থ করা বিদ্যে গড়গড় করে উগরে যাচ্ছিস। বৃথা কর্মের মধ্যে গেলেন না বিশ্বরূপ। ছেলেকে ঠিকঠাক করার একমাত্র উপায় হল—ব্যবসার মধ্যে দ্রুত ঢুকিয়ে নেওয়া। হাতে-কলমে কাজ করলে বই-পড়া বিদ্যে কিছুটা থিতিয়ে যাবে।

পাঁচটা ফুলে ফেঁপে ওঠা পৈতৃক ব্যবসা। প্রথম দিন থেকেই ব্যবসা চালাবার সাবেক নিয়মে পরিবর্তন আনার কাজে লেগে পড়েছিল এমবিএ মন্দার। বিশ্বরূপ কিছু বলতেন না। ওঁর ধারণা ছিল, ছেলে ঠেকে শিখবে। কিন্তু পদে পদে ঠেকে যাওয়ার পরেও ছেলে কিছুই শিখল না। আসলে শিখতে চাইছিল না। মুখে একটাই কথা : নতুন কনসেপ্ট ছাড়া মডার্ন ব্যবসা দাঁড়াতে পারে না।

পাঁচটা ব্যবসাতেই মডার্ন ম্যানেজমেন্টের নানারকম পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিল মন্দার। কিন্তু ব্যবসার হাফ ইয়ার্লি রিপোর্টে দেখা গেল, নতুন ব্যবস্থায় খরচা অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু লাভ একটুও বাড়েনি। লাভ বাড়েনি, অথচ খরচ অনেক বেড়েছে। তার মানে লোকসান।

খুব সহজ অঙ্কটা আরও সহজভাবে ছেলেকে বুঝিয়েছিলেন বিশ্বরূপ। কিন্তু মন্দার তাতে একটুও ঘাবড়ায়নি। গলা সামান্য তুলেই বলেছিল, 'এটা আমার দোষ নয়। দোষ তোমার এই ব্যবসার পুরনো ধরনধারণের। ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি সাবেক কালের হয়, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবসা তার ওপর দাঁড়াবে কীভাবে? তোমাকে আমি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পাঠ্য ম্যানেজমেন্টের উপর একটা বই পড়তে দেব। দেখবে, এই কথাগুলোই তিন-চারটে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে।'

বিশ্বরূপ অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলেছিলেন, 'তুই আর একবার পড়তে পারিস, আমার পড়ার দরকার নেই।'

মন্দার ওর জায়গা থেকে একটুও সরে আসেনি। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ব্যবসার উপর আরও কতগুলো নতুন পদ্ধতি চাপিয়ে দিল। ও খুব আশায় ছিল, এবার সুফল ফলবে। কিন্তু ব্যবসাগুলোর বাৎসরিক রিপোর্ট দেখার পরে ও নিজেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

চালু ব্যবসা ডুবতে একটু সময় লাগে। আরও কয়েকটা মাস যাওয়ার পরে পাঁচটা রমরমা ব্যবসার তিনটেয় ভাটার টান ধরেছিল। বিশ্বরূপ এবার আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারলেন না। উত্তেজিত হয়ে ছেলেকে বললেন, 'সারা জীবন ধরে রক্ত জল করে ব্যবসাগুলো আমি দাঁড় করিয়েছি। তোর খামখেয়ালিপনায় ওগুলো আমি ভরাডুবি হতে দেব না। দু'বছরের বইপড়া বিদ্যে দিয়ে যদি ব্যবসায়ী হওয়া যেত, তা হলে পৃথিবীর সবাই ব্যবসায়ী হয়ে উঠত। এই দেড় বছরে তুই আমার বহু টাকা নষ্ট করেছিস। আর আমি নষ্ট হতে দেব না। ব্যবসা তুই যদি একান্তই করতে চাস, অন্য কোথাও গিয়ে কর। নতুন ব্যবসার জন্যে কিছু টাকা আমি দিতে পারি, তবে এটাই হবে আমার প্রথম আর শেষ দফার টাকা। পরে আর একটা পয়সাও দেব না। ওই ব্যবসা ডোবাও, ভাসাও—তোমার ব্যাপার। আমার ব্যবসাতে আর হাত দিতে দেব না। এটা আমার সাফ কথা।'

সাফ কথা শুনে অভিমানে গলার স্বর বুজে গিয়েছিল মন্দারের। কিন্তু জবাব দেওয়ার মতো মনের জোর ওর আর নেই। ব্যবসায় ও যে'কটা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছিল সব ক'টাই ডাহা ফেল। যা আশা করেছিল তার ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে। ফল হচ্ছে বিস্তর টাকার লোকসান।

মন্দারের মা মীরা এতদিন ছেলের দলে ছিলেন। অন্ধভাবে ছেলেকে সমর্থন করে গিয়েছিলেন প্রতিটি ব্যাপারে। কিন্তু ব্যবসায় লোকসানের ওই বহর জানার পরে তিনি এবার রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। মন্দার বুঝতে পেরেছিল মা যে কোনও মুহূর্তে ওর দল ছেড়ে বাবার দলের যোগ দেবে। বোন মল্লিকা তো প্রথম থেকেই বাবার পক্ষে ছিল, এবার বোধহয় ওর দাপট আরও বাড়বে

৪

'আনন্দনিকেতন' সত্যিই আনন্দের নিকেতন ছিল, কিন্তু গত দেড় বছরে এই বাড়ির অনেক কিছুই পাল্টে গিয়েছে। বাড়িতে এসোজন বোসোজন আগের মতোই আছে। অতিথি-আপ্যায়নে কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় না। মস্ত বড় বাড়িতে একগাদা কাজের লোক। তাদের কাজ ভাগ-ভাগ করা, সব কিছুই নিখুঁতভাবে চলছে; কিন্তু বাড়ির চারজন মানুষ টের পেয়েছিল কোথায় যেন সুর কেটে গিয়েছে। রাতে খাবার টেবিলের সেই আড্ডা আর নেই। দু'চারটে কথা বলার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে যায়। মন্দার এখন এই খাবার টেবিলে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। অনুপস্থিত থাকার কারণগুলো সব সময় জোরালো হয় না, কিন্তু তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না কেউ।

পাঁচটা ব্যবসার মধ্যে তিনটে ব্যবসার মস্ত লোকসানের খবর অফিসের বিভিন্ন দফতরেও পৌঁছে গিয়েছিল। তার ফলটাও ভাল হয়নি। কর্মচারীদের মনোবল ধাক্কা খেয়েছিল খানিকটা। তার ছাপ পড়েছিল উৎপাদনের উপর।

আমেদাবাদের নামকরা একটা ইনস্টিটিউট থেকে পাওয়া ম্যানেজমেন্টের প্রথম শ্রেণির ডিগ্রির উপর খুব হালকা ধুলোর স্তর পড়েছিল। মন্দারের আত্মবিশ্বাসে বেশ বড় রকমের একটা চোট পড়েছে। থিয়োরি আর প্র্যাকটিসে মিলছে না। তা হলে কী তত্ত্ব প্রয়োগের ব্যাপারে ওর কোনও ভুল হচ্ছে? নাকি গোলমালটা অন্য কোথাও!

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে ও ব্যবসার আর একটা ছক কষল। এটা যদি ঠিক ভাবে কাজ করে, গত দেড় বছরের লোকসানকে শুধু সামাল দেওয়াই নয়, সেই সঙ্গে মস্ত বড় একটা লাভের মুখও দেখা যাবে।

একটা বহুজাতিক কোম্পানি এ রাজ্যে ব্যবসা করতে আসছে। বিশাল টাকার লগ্নি করবে। স্থানীয় এজেন্টকে দিয়ে কাজ করাতে চায়। সেই এজেন্ট হতে গেলে যা যা গুণ থাকা দরকার, সবই

আছে ওর। শুধুমাত্র গুণই নয়, বাড়তি কিছু ব্যাপারেরও প্রয়োজন হবে—সেসবও ওর আছে। অনেক টাকার দরকার। সুতরাং মায়ের মাধ্যমে বাবার কাছে প্রস্তাব পাঠাল ছেলে।

মীরার কাছ থেকে সব কিছু শোনার পরে বিশ্বরূপ বললেন, 'বহু টাকা! ঠিক আছে আমি দেব। তবে এটাই শেষবার। আর একটা কথা, তোমার ছেলেকে স্পষ্ট করে বলে দিও, আমার কোম্পানির নামে ওকে ব্যবসা করতে দেব না। নতুন একটা কোম্পানি তৈরি করে নিক। ব্যবসার জন্যে কোনও অফিস অ্যাকোমোডেশন ভাড়া নিক— তার জন্যে যে টাকা লাগবে—সেটাও আমি দেব। গত দেড় বছরে আমার কোম্পানির বিস্তর বদনাম হয়েছে তোমার ছেলের জন্য, সেই বদনাম আমি আর বাড়তে দেব না। আমার শর্তে যদি ও রাজি থাকে, তা হলেই টাকা দেব, না হলে নয়।'

যা শুনেছেন ঠিক সেই কথাগুলোই ছেলের কাছে গিয়ে বললেন মা। মন্দার ঠিক এটাই চাইছিল। মডার্ন বিজনেস হাউসের সব কিছুই মডার্ন হওয়া দরকার—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ছেলে মাকে বলল, 'তুমি বাবাকে গিয়ে বলো আমি রাজি। আমি কিন্তু এখনই কাজ শুরু করতে চাই।'

তাই হল। কাজ এগোতে লাগল ঝড়ের গতিতে। পার্ক স্ট্রিট এলাকায় বেশ বড়সড় একটা সাজানো অফিস পাওয়া গেল। মন্দারের নির্দেশে নামকরা একজন ইন্টিরিয়র ডেকরেটর অফিসে হাল ফ্যাশনের আরও কিছু পরিবর্তন আনল। মডার্ন কোম্পানির নাম হল 'অ্যামবিয়েন্‌স'। কোম্পানি রেজিস্ট্রি করতেও বেশি সময় লাগল না।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেল নতুন কোম্পানির। অল্পবয়সি সুশিক্ষিত কিছু ছেলেমেয়েকে মন্দার বেছে নিয়ে চাকরি দিল ওর সংস্থায়।

মডার্ন কোম্পানির মডার্ন মালিক এখন পাখির চোখ তৈরি করেছে বহুজাতিক ওই কোম্পানির শাখা অফিসকে। শাখা অফিসের জেনারেল ম্যানেজারের উপর দায়িত্ব এখানে সোল এজেন্ট নিয়োগ করার। প্রথম অর্ডারটিই দশ কোটি টাকার।

ছোট-বড় একুশটি কোম্পানি লাফিয়ে পড়েছিল সোল এজেন্ট হওয়ার প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতা না বলে ইঁদুর দৌড় বলাই ভাল। এজেন্সি পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল প্রতিটি সংস্থা। শুধু প্রেমে আর যুদ্ধে নয়, ব্যবসাতেও মিথ্যে বলে নাকি কিছু নেই। উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে যতটা নিচে নামা দরকার তার চাইতেও নিচে নামার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল প্রতিটি কোম্পানি।

মডার্ন ম্যানেজমেন্টের থিওরি অনুসারে যা-যা করা দরকার সবই করেছিল মন্দার। অঙ্ক কষে তত্ত্বের প্রয়োগ করেছিল। এর মধ্যে সোজা পথ বাঁকা পথ কিছুই বাদ রাখেনি। এজেন্সি ধরার জন্যে এন্টারটেনমেন্ট খাতে মোটা টাকা বরাদ্দ করেছিল। নিজের লোক ফিট করেছিল বহুজাতিক এই কোম্পানির শাখা অফিসে। সেই লোকটির একমাত্র কাজ ছিল ব্যবসা ধরার জন্যে কোথায় কে কী করছে সেই সব খবর মন্দারের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ব্যবসায়িক ঢাল সেই হিসাবে বদবদল করত মডার্ন কোম্পানি অ্যামবিয়েন্সের কর্তৃপক্ষ।

সঠিক মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা জাল খুব আস্তে আস্তে গোটাতে শুরু করেছিল মন্দার। কিন্তু এতরকম চেষ্টা করার পরেও ও এ রাজ্যে বহুজাতিকের সোল এজেন্ট হতে পারল না। যে কোম্পানি এজেন্সি পেল সেটার নাম সিদ্ধেশ্বরী এন্টারপ্রাইজ।

জীবনে এই সংস্থার নাম শোনেনি মন্দার। মাঝবয়সি, কালো-কোলো, গেঁয়ো চেহারা একটা লোক সিদ্ধেশ্বরীর হয়ে উমেদারি করতে আসত ঝকঝকে মাল্টিন্যাশনালের দফতরে। লোকটাকে কখনওই প্রতিযোগী হিসাবে ভাবতে পারেনি মন্দার। দুঃসংবাদ শোনার পরে মুখ কালো করে বাড়ি ফিরে এসেছিল ও। হাতের সব টাকা শেষ। দু'দিন ধরতে গেলে ও আর নিজের ঘর থেকে বের হয়নি।

তৃতীয় দিন রাতের বেলা বাবার কাছ থেকে ডাক এল। বাবা খাবার-টেবিলে। বাবার সঙ্গে রাতের খাওয়া ইদানীং ওর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছেলে মৃদু পায়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, ছেলের দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বাবা বললেন, 'বোসো এখানে। এক সঙ্গেই খাব।'

একটু বাদে মন্দারের মা আর বোনও এসে বসল টেবিলে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। কাজের লোক টেবিলে চারজনের খাবার সাজিয়ে দিয়েছিল।

সামান্য আগে-পরে খাওয়া শুরু করল চারজনই, কিন্তু কেউ কথা বলছিল না। অত বড় একটা সুযোগ একটুর জন্যে হাত থেকে ফসকে যাওয়ার জন্যে মন্দারের আত্মবিশ্বাস একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। চেয়ারে বসেছিল ঠিক কাঠের পুতুলের মতো। খুব আস্তে আস্তে ভাত মাখছে, কিন্তু মুখে তুলছে না একেবারেই।

একটু বাদে গলা খাঁকারি দিলেন বিশ্বরূপ, তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ব্যবসার কী খবর?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না মন্দার। প্লেটের উপর আঙুল নড়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে একই প্রশ্ন করলেন বিশ্বরূপ। মন্দার এবার খুব চাপা গলায় উত্তার দিল, 'ভাল নয়।'

'মাল্টিন্যাশনালের ওই এজেন্সিটা পাওনি তা হলে?'

গলা একেবারে বুঝি বসে গিয়েছিল মন্দারের। অতি কষ্টে বলল, 'না।'

'কে পেল?'

'একেবারেই এলেবেলে একটা কোম্পানি।'

'কী নাম কোম্পানির?'

'নাম শুনিনি আগে কখনও।'

'এখন তো শুনেছ। মনে আছে কোম্পানির নামটা?'

'সিদ্ধেশ্বরী এন্টারপ্রাইজ—একেবারে নতুন কোম্পানি।'

'তোমার কোম্পানিও তো নতুন। অবশ্য অ্যামবিয়েন্স নামটার মধ্যে বেশ চটক আছে। শুনলেই বোঝা যায় মডার্ন কোম্পানি।' খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথাটা বললেন বিশ্বরূপ।

কথার জবাবে কিছুই বলতে পারল না মন্দার।

খাবার-টেবিলে আবার একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছিল। একমাত্র বিশ্বরূপ ছাড়া আর কেউই তেমন কিছু খাচ্ছিল না।

একটু বাদে মৃদু গলায় মন্দার বলল, 'এজেন্সি পাওয়ার জন্যে অনেকগুলো বড়-বড় কোম্পানিও চেষ্টা করেছিল, তারাও পায়নি।'

'তাদের না-পাওয়াটা কি তোমার সান্ত্বনা?'

'না, মানে—।'

'পরের কথা ভেবে কী লাভ? তুমি চেষ্টা করেছিল, নিশ্চয়ই খুব ভালভাবে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাওনি—এটাই তো ঘটনা।'

কথার ধাক্কায় মন্দারের মাথা নীচের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছিল।

বিশ্বরূপের কণ্ঠস্বর এবার আর একটু গম্ভীর। 'টাকা-পয়সা যা



দিয়েছিলাম, তার কিছু আর আছে কি?'

অবিকল একজন অপরাধীর মতো হয়ে উঠেছিল মন্দারের মুখ। ও দু'দিকে মাথা নাড়াল আস্তে আস্তে।

মুখের মধ্যে মাছ-ভাত ছিল বিশ্বরূপের, সেটা শেষ করার পরে বললেন, 'অনেকগুলো টাকা দিয়েছিলাম তোমাকে। ওই টাকায় নতুন একটা ব্যবসা শুরু করা যেতে পারত!'

মন্দারের তরফ থেকে কথার কোনও জবাব এল না। ওর মুখ আর একটু বুঝি নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

খাবার-টেবিলের পরিবেশ আনন্দে খাওয়াদাওয়া করার মতো নয়। মীরা আর মল্লিকা খুঁটে-খুঁটে অল্পস্বল্প খাচ্ছিল, মন্দার একেবারেই নয়।

কিছুক্ষণ বাদে একটু থেমে থেমে বিশ্বরূপ বললেন, 'এখানে ওই মাল্টিন্যাশনালের সোল এজেন্সি তুমি যদি পেতে—এখনই তোমার হাতে দশ কোটি টাকার একটা অর্ডার আসত, সময়মতো তুমি কি তা সাপ্লাই দিতে পারতে?'

এখন এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অর্থহীন। এজেন্সিই পায়নি, মাল সরবরাহ করার প্রশ্ন উঠছে কোত্থেকে? মন্দার চুপ করে ছিল।

একই প্রশ্ন আবার করলেন বিশ্বরূপ।

মিনমিন করে এবার জবাব দিল মন্দার। 'পারতাম। কীভাবে সাপ্লাই দেব, সব পরিকল্পনাই আমার ছকা হয়ে গিয়েছিল। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ডেডলাইন মিট করার উপর জোর দেয়। আমি সেটা জানি বলে আগে থেকেই কিছুটা ব্যবস্থা এগিয়ে রেখেছিলাম। সময়মতো সাপ্লাই দিতে কোনও অসুবিধা হত না।'

এবার একটা বোমা ফাটাবার মতো কথা বললেন বিশ্বরূপ। 'বেশ, কাল সকাল থেকেই তুমি ওই অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ শুরু করে দাও।'

'মানে!'

শুধু মন্দারই নয়, ওই কথাটা শুনে ওর মা আর বোনও চমকে উঠেছিল।

কয়েক মুহূর্ত বাদে অসম্ভব শান্ত ভঙ্গিতে বিশ্বরূপ বললেন, 'সিদ্ধেশ্বরী এন্টারপ্রাইজ আমারই একটা বেনামা কোম্পানি। মাল্টিন্যাশনালের সোল এজেন্সি ধরার জন্যেই কিছুদিন আগে কোম্পানিটা বানিয়েছি। এজেন্সি পাওয়ার ব্যাপারে যাবতীয় তদ্বিরের কাজ আমাদের কল্যাণীর এজেন্ট মুকুন্দবাবুকে দিয়ে করিয়েছি।'

বাবার কথা শুনে ছেলের চোখের সামনে সিদ্ধেশ্বরীর কালোকোলো মাঝবয়সি গেঁয়ো চেহারার লোকটার ছবি ভেসে উঠেছিল।

বিশ্বরূপ পরম তৃপ্তির সঙ্গে মাছের আর একটা টুকরো খাওয়ার পরে আগেরই মতো শান্ত গলায় বললেন, 'এজেন্সিটা পাওয়ার জন্যে আমারও একটা পরিকল্পনা ছিল। তবে আমি নিজে কখনও সামনে আসিনি। সব কাজ ওই মুকুন্দবাবুকে দিয়েই করিয়েছি। কী করতে হবে, টেলিফোনে বলে দিতাম, উনি সেইভাবে কাজ করে প্রতি রাত্তিরে আমাকে ফোন করতেন। পরের দিন কী করতে হবে—সে নির্দেশও আমি টেলিফোনেই দিয়ে দিতাম। গোটা কাজটা ওইভাবে এগিয়েছিল। ব্যস, সোল এজেন্সিটা পেয়ে গেলাম। দশ কোটি টাকার অর্ডারটা আজই রিলিজ হয়েছে, সেটাও আমার হাতে এসে গিয়েছে। কাজ শুরু করতে হবে তোমাকে কাল সকাল থেকেই।'

মন্দারের চোখমুখ চমক আর উত্তেজনায় ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। সামান্য কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কীভাবে করলে তুমি এটা?'

একচিলতে বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল বিশ্বরূপের ঠোঁটে। একটু থেমে থেমে বললেন, 'আমি মডার্ন বিজনেস ম্যানেজমেন্টের কিছুই জানি না। এই ব্যাপারে সাহেবদের লেখা বইপত্তরও পড়িনি। আমার ব্যবসার আসল মূলধন অভিজ্ঞতা আর কাণ্ডজ্ঞান। হ্যাঁ, বড় ব্যবসা করতে গেলে টাকাপয়সা অনেক লাগে, সেটা সংগ্রহ করেছি আমার ব্যবসা থেকেই। তোমার কাছ থেকে ব্যবসার খবরটা জানতে পেরে মনে হয়েছিল—এই ব্যবসাটা ধরতে পারলে মন্দ হয় না। আমার আর পাঁচটা ব্যবসার সঙ্গে এই ব্যবসা ঠিক মেলে না। তবু এই ব্যবসাটার ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে হয়েছিল—একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক না। তাই—।'

উত্তেজনায় ছটফটে গোছের হয়ে উঠেছিল মন্দার। 'কিন্তু চেষ্টাটা কী ভাবে করলে?'

'আর পাঁচজন ব্যবসাদার যেভাবে করে—সেইভাবেই। তবে আমার নিজস্ব বাড়তি কিছু উদ্যোগ ছিল, সেগুলো বেশ কাজ দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী সেগুলো?'

'তোমাদের এই বহুজাতিক কোম্পানির শাখা অফিসের জেনারেল ম্যানেজার সিনহাসাহেবের সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনিই তো সব। দু'তিনটে পার্টিতে ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। উনি তো আমার সম্পর্কে একটা আলাদা ইন্টারেস্ট নিয়েছিলেন। তার ফলে মনে হয়েছিল এজেন্সিটা আমি পেয়ে যেতে পারি।'

আনারসের চাটনির বাটিটা টেনে নিয়েছিলেন বিশ্বরূপ। 'তোমাকে পছন্দ না করার তো কোনও কারণ নেই। তুমি ইয়ং, হ্যান্ডসাম, উচ্চশিক্ষিত, এমবিএ-তে ফার্স্ট ক্লাস। বুদ্ধিমান, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করার ক্ষমতা আছে। তোমাকে সবারই ভাল লাগবে। কিন্তু ভাললাগা আর একটা বড় ব্যবসা পাইয়ে দেওয়া কি এক হল?'

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই মন্দারের। একটু থতমত খেয়ে বাবার দিকে তাকিয়েছিল।

তারিয়ে তারিয়ে দু'চামচ চাটনি খেলেন বিশ্বরূপ, তারপর কথা শুরু করলেন আবার। 'আমাদের ব্যবসা চলে পুরোপুরি দেশি নিয়মে। এই নিয়মটা সাহেবদের জানা নেই। ব্রাঞ্চ অফিসের জিএম সিনহাসাহেব যে চিংড়ি খেতে খুব ভালবাসতেন—এই খবরটা তুমি কি জানতে?'

অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়েছিল মন্দার।

'জানো না। জানার কথাও নয়। কিন্তু আমি খবরটা বের করে মুকুন্দবাবুকে দিয়ে জিএম-এর বাড়িতে টপ কোয়ালিটি টাইগার প্রন পাঁচ কেজি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

মন্দারের বিস্ময়ের ঘোর বোধহয় কাটতে চাইছিল না। আবার কথা শুরু করলেন বিশ্বরূপ। 'সিনহাসাহেবের শাশুড়ি বাতে ভুগছেন, শয্যাশায়ী। অসহ্য কষ্ট। কোনও ওষুধেই কাজ হচ্ছে না। এ খবরটাও নিশ্চয়ই জানতে না। আমি আমার লোককে দিয়ে বের করেছিলাম, তারপর ওই মুকুন্দবাবুকে দিয়ে শাশুড়ির রোগ নিরাময়ের জন্যে স্বপ্নাদ্য মাদুলি পাঠিয়েছিলাম। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, বিশ্বাস রোগ সারাতে সাহায্য করে থাকে অনেকখানি। শাশুড়ি ধর্মপ্রাণা মানুষ। ওই স্বপ্নাদ্য মাদুলি মাথায় ঠেকিয়ে ধারণ করলেন এবং বেশ কিছুটা সুফলও পেলেন।'

মন্দার যেন রূপকথার গল্প শুনছে। বাবার দিকে তাকিয়েছিল অল্পবয়সি একটা ছেলের মতো।

আর একটু চাটনি মুখে ফেলে বিশ্বরূপ বললেন, 'বাহ্! বেশ হয়েছে তো চাটনিটা! তারপরেই দ্রুত ফিরে গেলেন আগের কথায়। 'সিনহাসাহেবের এক শালা ক্যান্সারে ভুগছেন। কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি হয়েছে, কিন্তু খুব একটা কাজ হয়নি। খবরটা জানার পরে মুকুন্দবাবুকে দিয়ে একজন বড় কবিরাজকে ওঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম। এই কবিরাজের খুব সুনাম আছে দেশ-বিদেশে। উনি নাকি কয়েকজন ক্যান্সার রোগীকে পুরোপুরি সারিয়ে তুলেছেন। ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া শক্ত। যাই হোক, সোর্স ধরে পাওয়া গেল। মুকুন্দবাবুকে দিয়ে ওই কবিরাজকে পাঠিয়েছিলাম সিনহাসাহেবের শালার কাছে। ওঁর ট্রিটমেন্টেই আছেন এখন শালাবাবু। দুরারোগ্য অসুখ, কিন্তু কবিরাজি চিকিৎসায় লাইফ স্প্যান যদি কিছুটা বেড়ে যায়—। হয় তো এমন—। রোগ আর ছড়াল না, রোগী মোটামুটি সুস্থ দেহে বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকল।'

শুধু মন্দার নয়, ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর মা আর বোনও মুগ্ধ হয়ে ব্যবসা ধরার বিচিত্র এই কাহিনি শুনে যাচ্ছিল। কৌতূহল চেপে ধরেছিল তিনজনকেই।

শেষ পাতে বিশ্বরূপ এক বাটি টক দই আর একটা সন্দেশ খান। দইয়ের বাটিটা টেনে নেওয়ার পরে মুখ খুললেন আবার। 'মানুষের আকাঙ্ক্ষার কখনও নিবৃত্তি হয় না—তা বয়স যতই হোক না কেন। জেনারেল ম্যানেজার সিনহাসাহেব চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে, কিন্তু ওঁর আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই আরও ওপরে ওঠার। সেটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পোস্ট পাওয়া হতে পারে, কোম্পানির শেয়ারের আর একটা বড় অংশ হাতে আসা হতে পারে—। এটা অবশ্য আমার নিছকই অনুমান। এই অনুমান থেকেই আর একটু এগোলাম। মুখেচোখে খই ফোটাতে পারে এমন এক জ্যোতিষীকে পাঠিয়েছিলাম সিনহাসাহেবের কাছে। হ্যাঁ, ওই মুকুন্দবাবুকে দিয়েই। জ্যোতিষী হাতের রেখা, কোষ্ঠী ইত্যাদি বিচার করার পরে মানুষটাকে উঁচু গাছের একেবারে মগডালে তুলে দিয়েছিল। সিনহাসাহেবের জীবনের সেরা সুখের দিন নাকি শুরু হবে আর কয়েকটা সপ্তাহ পর থেকেই। সিনহাসাহেব এসব শুনে খুব খুশি। খুশি মুকুন্দবাবুর উপরেও। কারণ উনি রাজজ্যোতিষীকে ওঁর কাছে নিয়ে এসেছেন। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি, সিনহাসাহেবের মায়ের জন্য তিরুপতির প্রসাদও পাঠিয়েছিলাম একদিন—ওই মুকুন্দবাবুকে দিয়েই।'

কথা শেষ করার পরে সন্দেশের প্লেট টেনে নিয়েছিলেন বিশ্বরূপ। এক টুকরো সন্দেশ ভেঙে মন্দারের দিকে তাকিয়ে বসলেন, 'এগুলো আমার বাড়তি উদ্যোগ—দিশি নিয়মে। এজেন্সি পাওয়ার জন্যে তুমি এবং অন্যান্য সব বড় কোম্পানি যা-যা করেছে তা-তো আমি করেইছি। অতিরিক্ত হল ওই দেশি ব্যাপার-স্যাপার। আমাদের দেশের এই অতিরিক্ত ব্যাপারগুলো তুমি সাহেবদের লেখা মোটা-মোটা বিজনেস ম্যানেজমেন্টের বইতে পাবে না।'

মন্দার ছোটখাটো দু'একটা প্রশ্ন করছিল, কিন্তু টেবিলের ও-পাশের দু'জন চুপচাপ ছিল এতক্ষণ; তবে বিশ্বরূপের ওই কথাটা শেষে একইসঙ্গে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল মল্লিকা আর মীরা। অনেক দিন পরে আবার এ-বাড়ির খাবার টেবিল হাসি-গল্পে জমজমাট হয়ে উঠেছিল।

আনন্দনিকেতনে সেই আনন্দ ফিরে এসেছে আবার। বাড়ির মধ্যে বেশ কয়েকজন কাজের লোক—প্রত্যেকেই এখন ওই আনন্দের শরিক।

এ-বাড়ির কাজের নিয়ম যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে, শুধু বাবা আবার ছেলের কাজের সূচিতে একটু বদল হয়েছে। সকালে চা খাওয়ার টেবিলে বিশ্বরূপ আর মন্দার আধঘণ্টা একসঙ্গে কাটায়। নতুন ব্যবসার জন্যে কোথায় কী করতে হবে বলে দেন বিশ্বরূপ। মন্দার বাধ্য ছেলের মতো নোটবুকে নোট নেয়। বাবার কথার বাইরে একটুও যায় না।

কিছুদিনের মধ্যে এই ব্যবস্থার আশ্চর্য সুফল ফলতে লাগল নতুন ব্যবসায়। পুরনো ব্যবসাপত্তরের লোকসানের ব্যাপারটাও সামলে নিয়েছেন বিশ্বরূপ। ব্যবসায় লাভ ফিরে এসেছে আবার আগের মতো। পাঁচটার জায়গায় এখন ছ'টা ব্যবসা। ছ'টা ব্যবসারই পালে চমৎকার হাওয়া।

মন্দার ওর এমবিএ-র ডিগ্রিটা ট্রাঙ্কে পুরে ভাঁড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। কেউ ওই বিষয়ে কথা বলতে চাইলেই ও বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় না।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ছোটগল্প



সতেরোই ফেব্রুয়ারি

তপনকুমার দাস

সময়ের ঘড়িটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেখার অভ্যাসটা অনেকদিনের। এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ঝগড়া-ঝামেলা কম হয়নি জীবনে। প্রথম প্রথম বোঝাতে চেষ্টা করত কমলাক্ষ। বলত, মানুষকে সব সময় দৌড়াতে হয় সামনের দিকে।

ঝড়-ঝঞ্ঝা চড়াই উৎরাই দুঃখ-শোকের মিনার টপকে টপকে পরমানন্দে বেঁচে থাকা আর পাঁচজনকে বাঁচিয়ে রাখাই জীবন। ঘড়ির কাঁটা উল্টো ঘুরিয়ে দিলে পিছনে যে স্মৃতির ছবি দেখা যায় তার বেশিরভাগই অ-সুখের স্মৃতি। কমলাক্ষের কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগত। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেত স্বাগতা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করত ফেলে আসা সময়কে আর ফিরে দেখবে না।

কিন্তু না, অভ্যেসটা শেষ পর্যন্ত স্বভাবে পরিণত হয়েছিল স্বাগতার। কমলাক্ষ বলত, এটা এক ধরনের ম্যানিয়া। মানসিক রোগ। একবার এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে কাউন্সিলিংও করিয়েছিল কিছুদিন। তবুও ফল হয়নি। আর ইদানীং বিষাদের যাবতীয় স্মৃতি ঘাঁটতে ঘাঁটতে হাপুস নয়নে কান্না যেন নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাগতার জীবনে।

তুমি ডায়েরি লেখার অভ্যেস করলে পার — একসময় পরামর্শ দিয়েছিল কমলাক্ষ। বাজার থেকে দিস্তে কাগজ কিনে রেক্সিনের মলাটে বাঁধিয়ে এক সন্ধ্যায় উপহার দিয়েছিল

স্বাগতাকে। সঙ্গে দামী একজোড়া কলম। ডায়েরি হাতে খুশিতে ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিল — লিখব, সব লিখে রাখব। খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি। লিখে রাখব কথামৃতের বাণী।

না না, ওসব লিখতে যাবে কেন? বলেছিল কমলাক্ষ, লিখবে তোমার নিজের কথা। ডায়েরি লেখা মানে সময়কে ধরে রাখা। আগামীর কাছে অতীতের উপস্থাপনা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বারংবার উপলব্ধি করা।

ডায়েরি আর কলম হাতে চিলেকোঠার ঘরে দৌড়ে পালিয়েছিল স্বাগতা। খুশি হয়েছিল কমলাক্ষ। অনেকদিন পরে মায়ের শরীরে, মনে পাখির চাঞ্চল্য দেখে আনন্দের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল দুই আত্মজা। সুমন আর তিলোত্তমা। বুড়ো আঙুল হাওয়ায় ভাসিয়ে মায়ের সেই আনন্দক্ষণ বাবার সঙ্গে সেলিব্রেট করেছিল।

"আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে/তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে। /নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে / না দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ঘিরে, / লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে—/ অশ্রুত বাঁশি হৃদয় গহনে বাজে।" না, আর গাইতে পারে না স্বাগতা। কালবোশেখীর মতো একরাশ কাশি উথলে উঠে ভেঙে দিতে চায় বুকের পাঁজর। মাংসহীন চামড়া ঢাকা চোখের কোঠর ছেড়ে পালিয়ে আসতে চায় একদা সুন্দরী স্বাগতার কালো হরিণ চোখ। হুইল চেয়ারের পাশে রাখা জলের গেলাসটা কাঁপা হাতের ক্ষীণ বাঁধন ছেড়ে লাফিয়ে পড়ে ঘরের মেঝেয়। বিকট শব্দে ঝনঝন ভাঙে গেলাসের কাচ। ঠাকুরের থালার মতো ছোট্ট স্টিলের ঢাকনা তার নিজস্ব ধাতব শব্দ ছড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

রান্নাঘর থেকে জলের জগ হাতে ছুটে আসে সোনালি। ডানহাতের চেটোয় মালিশ করে দেয় স্বাগতার পিঠ। বাঁ হাতে জলের জগ তুলে ধরে স্বাগতার মুখে। একটু ধাতস্থ হয় স্বাগতা। কমে যায় কাশির বেগ। গলার গলিপথ বেয়ে উঠে আসা একদলা কফ গিলে নেয় এক ঢোকে। তারপর চোখ রাখে সোনালির চোখে — কাশির সিরাপটা ফুরিয়ে গেছে?

ফুরোবে না? ওইটুকু তো শিশি। দিনে কতবার গিলছ হিসেব আছে? স্বাগতার প্রশ্নের জবাবে তড়িঘড়ি উত্তর ঝরিয়ে দিতে দেরি করে না সোনালি।

সমুকে একটা ফোন করে দে। অফিস ফেরতা নিয়ে আ সবে, আবার চলকে ওঠা কাশি জোর করে থামিয়ে রাখে স্বাগতা।

না, আনবে না। ফোন করে বরং আমি নিষেধ করে দেব, মায়ের জন্য কিচ্ছু আনবে না। কিচ্ছু না, জলে ভেজা হাতে শাশুড়ির মুখ মুছিয়ে হুইল চেয়ারের ব্যাক রেস্টে ঝোলানো ছোট্ট টাওয়েলে জল শুষে নেয় সোনালি।

কেন? আমি কি কোনও অন্যায় করেছি?

করোনি?

কী করেছি রে? সদ্য কথা শেখা শিশুর মতো গলার স্বরে জানতে চায় স্বাগতা।

গান করেছো।

ওঃ। না করে পারলাম না। সকাল থেকেই গানটা তোলপাড় করছে মনের ভিতরে। তোর শ্বশুর প্রথম যেদিন আমায় দেখতে গিয়েছিল, সেই দিন গেয়েছিলাম ওই গানটা। জীবনভোর কতবার যে গানটা শোনার বায়না করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শোনানো হয়নি।

আজ কাকে শোনাচ্ছিলে? মেঝেয় ছড়িয়ে পড়া কাচের টুকরো পরিষ্কার করতে করতে জানতে চায় সোনালি।

তোর শ্বশুরকে। বসে বসে চোখটা একটু লেগে এসেছিল। হঠাৎ দেখি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে সেই গানটা একটু শোনাও না। আজ তো আমাদের—

কী?

বলবো না, যাহ্। আমার বুঝি লজ্জা করে না?

বেশ বলো না। সুমন বাড়ি ফিরলে আমিও সব বলে দেব।

কী বলবি?

বলব, মা আবার গান গাওয়া শুরু করেছে। হাই স্কেলে — মৃদু অভিমান ঝরায় সোনালি।

আজ আমাদের বিয়ের দিন। সতেরোই ফেব্রুয়ারি।

কোনওদিন বলোনি তো? পুত্রবধূ নয়, কচি মেয়ের প্রগলভা হয় সোনালি— কত বছর হল গো মা?

চুপ কর মুখপুড়ি। শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলছিস না কোনও বন্ধুর সঙ্গে— ধমক দেয় স্বাগতা। ধমক দিলেও মনে মনে খুশি হয়। সত্যিই মেয়েটা অন্যরকম। আর পাঁচটা ছেলের বউয়ের মতো নয়। সেই প্রথম দিন, সুমনের সঙ্গে এ বাড়িতে ঢুকেই ঘোষণা করে দিয়েছিল — আমি কিন্তু আপনি, আজ্ঞে বলতে পারব না। তুমি বলে ডাকব। আমার তো মায়ের মুখ মনে নেই। আজ থেকে তুমিই আমার মা। আমাকে তুমি মেয়ে করে না নিতে পার নিও না কিন্তু বউমা বউমা ডাকে পর করে দিও না। বউমা ডাকলে কি ছেলের বউ পর হয়ে যায়? সোনালির মাথায় হাত রেখেছিল স্বাগতা — বউমা কত মধুর ডাক বল তো? নিজের অজান্তে মুখ ফসকে 'তুই' সম্বোধন করেই জিভ কেটেছিল স্বাগতা, যা, তুই বলে ফেললাম। এই তো চাই—শরীরে ধেই ধেই না করলেও মনে মনে ধেই ধেই নাচ করছিল সোনালি। অমনি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভার করে মায়ের দিকে আঙুল তুলেছিল তিলোত্তমা— দেখা যাবে, দুধের স্বাদ কতটা ঘোলে মেটাতে পার। বাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বউদি সোনালির মুখোমুখি, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া হলে আমাকে কিন্তু পঞ্চায়েতি করতে ডেকো না। আমি বার বার অত দূর থেকে ছুটে আসতে পারবো না।

না, ছুটে আসতে হয়নি কোনওদিন। সুমন সোনালির বিয়ের তেরোটা বৈশাখ পার হয়ে গেছে। শাশুড়ি পুত্রবধূর বিরোধ দূরে থাক, সামান্য মনোমালিন্যও হয়নি কোনওদিন। মাঝে মাঝে বিচিত্র সব খেয়াল হয় স্বাগতার। স্বেচ্ছায় বরণ করতে চায় মৃত্যুর নিথর নিঃস্পন্দ জীবন। কিন্তু পারে না, সোনালির জন্যে। সোনালি সব বুঝতে পারে। টের পায় আর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর মমতা ঢেলে ভুলিয়ে দেয় স্বাগতাকে।

আবার তুমি পুরনো দিনের কথা ভাবছো? ভাঙা কাচের টুকরোগুলো একেবারে সরিয়ে ফেলতে মেঝের পাথরের উপর ফুলঝাড়ু বোলায় সোনালি।

তুইও দেখছি কমলাক্ষের মতো শাসন করতে শিখেছিস। পুরনো দিনের স্মৃতি আঁকড়েই তো নতুন দিনের শুরু হয়।

আমি জানি মা—স্বাগতার তাল কেটে দেয় সোনালি।

কী?

তুমি বরদাসুন্দরী বালিকা মহাবিদ্যালয়ে ফিলোজফি পড়াতে, টপাটপ উত্তর দেয় সোনালি— কথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসল কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছো। তাই না?

পঞ্চাশ বছর—

ইয়া— দুই হাতে তালি বাজিয়ে নেচে ওঠে সোনালি— ভাগ্যিস কমলাক্ষবাবু বেঁচে নেই। এক দৌড়ে স্বাগতার ঘর ছেড়ে ছুটে যায় নিজের ঘরে। মুহূর্তে ফিরে আসে মোবাইল হাতে।

ছুঁয়ে দেয় শাশুড়ির পাকা চুলে ঢাকা মাথা— বাবা বেঁচে থাকলে আজ তোমাদের নতুন করে বিয়ে দিতাম। কি মজাই না হত।

আর দুঃখ? দুঃখটা সইতে পারতিস তো? এ বংশে বিয়ে মানেই তো অঘটন— হাড়ের পাঁজরে ঢাকা ফুসফুসের হাপর থেকে একবুক দীর্ঘশ্বাস ঘরের বাতাসে ঢেলে দেয় স্বাগতা। পঞ্চাশ বছর আগের সেই উনিশে ফেব্রুয়ারি। সবে বন্ধ হয়েছে বিসমিল্লা খানের সানাই। স্ত্রী আচারও শেষ। পঁচিশ বছর বয়সের যুবতী বধূ বসে আছে লাজনতা মালতীলতার মতো মুখ ঝুঁকিয়ে ফুলের ঝালর ঝোলানো বিছানায়, দাম্পত্য জীবনের উদ্বোধনী সঙ্গীত গাওয়ার অপেক্ষায়। কমলাক্ষকে ঘরে ঢুকিয়ে দেওর, ননদ, আত্মীয়-পরিজনদের হাসিঠাট্টাও শেষ। বাকহীন মুখে খুশির দোলনায় দুলতে দুলতে বর বসেছে বধূর পাশটিতে।

স্বাগতার শরীরটা হঠাৎ আনচান করে ওঠে। সোনালি বোধহয় মোবাইলে কথা বলছে সুমন কিংবা তিলোত্তমার সঙ্গে। পরিবেশন করছে শাশুড়ি মায়ের পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকীর খবরটা। তবু কোনও কথাই কানে ঢুকছে না স্বাগতার। চোখের পরিধি ঘিরে তিরিতিরি নেচে বেড়াচ্ছে দলা দলা অন্ধকার। অথচ কান চোখ কোনওটাই খারাপ হয়নি তার।

তিলু কথা বলবে, মোবাইলটা স্বাগতার হাতের কাছে তুলে ধরে সোনালি— তোমাকে কনগ্রাচুলেট করবে। নাও।

হাতের ইশারায় সোনালির মোবাইল সরিয়ে দেয় স্বাগতা। আর ঠিক তখনই কানের ভিতর লাফিয়ে পড়ে সেই ফুলশয্যা রাতের আর্ত সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন ধ্বনিগুলো। নববধূকে কমলাক্ষ কি ছুঁয়ে দিয়েছিল? মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে বন্ধ ঘরের বাইরে শাশুড়ি মায়ের হা হা চিৎকার— এ কি সর্বোনাশ হল? কে কোথায় আছিস শিগগির আয়। কমল, রানি, বিন্দি, সমু, নিতু শিগগির ডাক্তার ডাক। তোদের বাবা কেমন করছে। চোখ উল্টে গিয়েছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিন্দি, দরজা খোল দাদা। বাবা কেমন করছে। নিতু ছুটেছিল ডাক্তার বিনোদ ঘোষালের বাড়ি।

কমলাক্ষের পিছন পিছন পায়ে পায়ে স্বাগতা পৌঁছে গিয়েছিল শ্বশুর-শাশুড়ির ঘরে। মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে থাকা নলিনাক্ষবাবুর নিথর শরীরটা একঝলক দেখেই দু'হাতে চোখ বন্ধ করে ডুকরে উঠেছিল। ধপাস বসে পড়েছিল শ্বশুরমশাইয়ের পায়ের কাছে। আর ঠিক তখনই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে ঘোষাল ডাক্তার শুনিয়েছিলেন নিষ্ঠুর ফরমান — ঘণ্টা তিনেক পরে কাউকে পাঠিয়ে দিও কমল। সার্টিফিকেট দিয়ে দেব।

কী হয়েছে বাবা? ঘুমজড়ানো গলায় জানতে চেয়েছিল কমলাক্ষের ছোটভাই সমু। ম্যাসিভ অ্যাটাক — ছোট্ট জবাব দিয়ে অ্যাটাচি হাতে ঘর ছেড়েছিলেন ডাক্তার বিনোদ ঘোষাল।

ডাক্তারবাবু ঘর ছাড়তেই ক্রুদ্ধ বাঘিনী হয়েছিলেন ননীবালা। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শিকারি স্বাগতার উপর। টেনে হিচড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন স্বাগতার নববধূর সাজ — ফুলের মালা, ফুলের গয়না মুকুট— অলুক্ষুনে ডাইনি, দূর হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই জলজ্যান্ত মানুষটাকে গিলে খেলি। এরপর না জানি আর কাকে গিলবি। মায়ের তালে ঠেকা দিয়েছিল বিন্দি। পোঁ ধরেছিল রানি— আমাদেরও তো বিয়ে হয়েছে। কই ফুলশয্যার রাতে শ্বশুরকে তো মরতে হয়নি হার্ট অ্যাটাকে। একখণ্ড জগদ্দল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা কমলাক্ষের পিঠে হাত রেখেছিল মেজো ভাই নিতু। এলাকায় শ্রীনিত্যানন্দ নামে পরিচিত 'গয়না ঘর'-এর জ্যোতিষ— লক্ষণটা কিন্তু মোটেও ভাল নয় দাদা। তোমার বউয়ের রাহু, শনি, মঙ্গলের দশা। বৃহস্পতি বক্রী। শুক্র...।

না-আঁ-আঁ, হঠাৎ আকাশ ফাটানো বজ্রপাতের শব্দে ফেটে পড়ে স্বাগতা। চমকে ওঠে সোনালি। মোবাইল বন্ধ করে ছুটে আসে শাশুড়ির হুইল চেয়ারের পাশে।

কী হল মা, শরীর খারাপ লাগছে। চলুন, একটু শুয়ে পড়বেন





চলুন — জানলার সামনে বসে থাকা স্বাগতার হুইল চেয়ার চালিয়ে বিছানার পাশে চলে আসে সোনালি। হাতের ভরে শাশুড়ির শরীরটাকেও তুলে দেয় বিছানার উপর। তারপর চোখ রাখে স্বাগতার চোখে। সেখানে তখন জলের ধারা — কাঁদছো কেন মা? তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? সুমনকে ডেকে পাঠাব?

না থাক।

ডাক্তার কাকাকে খবর দেব?

আমাকে দেওয়ার মতো কোনও ওষুধ তাদের কোনও ডাক্তারের কাছে নেই, বুকের উপর হাত জোড়া তুলে নেয় স্বাগতা — তোর তো খাওয়া হয়নি। যা খেয়ে নে গে যা। বেলা অনেক হল।

তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো? তোমার পাশে বসেই খেলাম, স্বাগতার মাথার কাছে খাটের উপর বসে সোনালি। হাত বুলিয়ে দেয় কপালে। মনে মনে ভাবে, শ্বশুরমশাই যখন বেঁচে নেই তখন পঞ্চাশের বিবাহবার্ষিকী নিয়ে হইচই করে মায়ের মনে আঘাত দেয়নি তো?

ও, হবে হয়তো। ভুলে গিয়েছি — একগাল ফোকলা দাঁতের হাসি ছড়িয়ে দেয় স্বাগতা। সেই হাসিতে চুপসানো গালে টোল পড়ে।

হাসলে তোমাকে কি যে ভাল লাগে, তুমি নিজেই জানো না। সব সময় এমনি হাসি-খুশি থাকতে পারো না?

ডাইনিরা হাসলে সংসারে অমঙ্গল হয়— এবার নীরব নয় শব্দ ছড়িয়েই হাসে স্বাগতা।

দ্যাখো মা, তোমাকে বহুবার বলেছি এইসব আবোল-তাবোল কথা বলবে না— শাশুড়ির নাকের সামনে তর্জনী তুলে ধরে সোনালি। ফিলোজফির স্টুডেন্ট হয়ে নিজের জীবনের দর্শন বুঝতে পারো না।

একটা ঘুমের ওষুধ দিবি?

এখন, এই বিকেলবেলা?

হ্যাঁ রে। বড় ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। ঘুম আর মৃত্যুর ভিতরেই তো মানুষের সব শান্তি, সব প্রশান্তি। গত মাসে কত ঘটা করে তোরা আমার পঁচাত্তর বছরের জন্মদিন পালন করলি। আমার মা-বাবাও এমন করেনি কোনওদিন। শীতকালের দুপুরবেলায় জন্ম, তাই প্রতিবছর একবাটে খেজুর গুড়ের পায়েস বানিয়ে দিতেন মা আমার। সেই পায়েসের কী যে স্বাদ ছিল কী বলব— স্বাগতা সাধারণত সুখের স্মৃতিতে পা ভেজাতে চায় না। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে জীবনের সামান্য যে ক'টা সুখের স্মৃতি আছে তাতে অবগাহন করে মন ভরিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। অন্তত আজকের এই দিনটায়।

আজই সুমনকে বলবো, অফিস ফেরতা নলেন গুড় নিয়ে আসতে। গোবিন্দভোগ চাল ঘরে আছে। কাল দুপুরে পায়েস খাওয়াব তোমাকে। টেস্ট করে বলবে, কার পায়েস ভাল। আমার না আমার দিদি শাশুড়ির। বলবে তো? ছোট্ট মেয়ের আহ্লাদের মতো স্বাগতাকে জড়িয়ে, স্বাগতার পাশেই একই বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে সোনালি।

তোরটাই ভাল হবে — এবার পুত্রবধূর কপালে শিরাখোদিত কঙ্কালসার হাত তুলে দেয় স্বাগতা। কারণ তুই যে আমাকে ভালবাসিস। ভালবাসার-জনের জন্য যা করবি সবই ভাল হবে।

কোনও উত্তর দেয় না সোনালি। বিয়ের আগে ভীষণ ভয় ছিল। শাশুড়িভীতি। যুগে যুগে, কালে কালে এমনকী গান্ধারীর আমল থেকে যে ভয় তাবৎ বাঙালি পুত্রবধূদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সেই ভয়। এই সংসারে প্রথম দিন থেকেই সেই ভয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল সোনালি এবং আজ পর্যন্ত জয় হয়েছে তারই। অবশ্য স্বাগতাও সোনালিকে অনেক অনেক বড় আসন দিয়ে রেখেছে।

একটা গান শুনবে মা?

শুনতে পারি, একটা শর্তে।

কী শর্ত?

আমিও গলা মেলাব তোর গলায়—
কিন্তু তোমার কাশি। কাশি উঠলে যে তার ছিঁড়ে যাবে।
গলা না চড়িয়ে গুনগুন করে গাইব—
বেশ। তবে কাশি উঠলে আমিও কিন্তু ছাড়ব না। বাসক পাতার রস গিলিয়ে ছাড়ব, বিছানার উপর উঠে বসে সোনালি।
সমুকে বলেছিস, কাফ সিরাপ আনার কথা?
তুমি বড্ড বেরসিক। দিলে তো গানের ভাবনাটা চটকে?
নে ধর — ঘাড় পিট উচু করে ডান হাতটা এগিয়ে দেয় সোনালির দিকে। উঠে বসতে চায় স্বাগতা।

শাশুড়ি পুত্রবধূ; স্বাগতা আর সোনালি মুখোমুখি বসে বিছানার উপর। তারপর পুত্রবধূর কাছে জানতে চায় স্বাগতা কোনটা গাইবি? রবীন্দ্রনাথ না দ্বিজেন্দ্রলাল? রজনীকান্ত, নজরুল না অতুলপ্রসাদ।

"এই লাভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর" — কোনও উত্তর না দিয়ে সরাসরি গানের ভিতরে অবগাহন করে সোনালি— "পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর, /সুন্দর হে সুন্দর।"

ক্ষীণ স্বরে উদ্দাত্ত সুর মেলায় স্বাগতা — "আলোকে মোর চক্ষু দুটি, মুগ্ধ হয়ে উঠলো ফুটি, /হৃদগগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর— / সুন্দর হে সুন্দর।" শেষ পর্যন্ত গাইতে পারে না। অগত্যা একা সোনালিকেই শেষ করতে হয় গানটা।

বিয়ের আগে পড়াশুনোর পাশাপাশি গান ছিল স্বাগতার প্রাণ। সেই সময়কার বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে অরুণ বসুর কাছে তালিম নিত নিয়মিত। কমলাক্ষও ভারি পছন্দ করত। বলত, বিয়েটা হয়ে যাক। তোমাকে এইচএমভি, মেগাফোনে নিয়ে যাব। তোমার গানের রেকর্ড হবে। সারারাত সেই রেকর্ড বাজিয়ে শুনব। কিন্তু না, রেকর্ড দূরে থাক, ফুলশয্যার পরদিন থেকে সংসারে নির্বাসিতা নারীর জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই জোটেনি। ফুলশয্যার পরের দিন সকালে শ্বশুরমশাইয়ের মরদেহ শ্মশানের পথে রওনা করিয়ে রায় ঘোষণা করেছিলেন শাশুড়ি মা — খবরদার, তুমি আমার ছেলেকে স্পর্শ করবে না। তোমার নিশ্বাসে, তোমার ঘামে, তোমার ছায়ায় বিষ। স্বামী হারিয়েছি। পুত্র হারাতে পারব না। শ্মশান ফেরত কমলাক্ষকে একই কথা বলেছিলেন ননীবালা। আর তারপরই চিলেকোঠায় একচিলতে ঘরে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন স্বাগতাকে। সঙ্গে দিয়েছিলেন কেরোসিনের আলাদা স্টোভ। দেওর ননদ আত্মীয়স্বজনদেরও হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। কমলাক্ষকে বলেছিলেন, খবরদার ওই ডাইনিটার ছায়া মাড়াবি না।

জীবনের বাসন্তী দিনগুলোর সাত-সাতটা বছর নির্বাসনে কেটেছিল এক যুবতী বধূর। স্বাগতার দাদা সুভদ্র বদলি হয়ে বাবা-মাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল হিমাচল প্রদেশে। চিঠিই ছিলো যোগাযোগের একমাত্র সম্বল। বাবা, মা, দাদা, বউদির কাছ থেকে ডাকে আসা স্বাগতার চিঠিগুলো সেন্সর করে তবেই ঢুকতো চিলেকোঠার ঘরে হরিদার মারফত। কখনও কখনও লুকিয়ে কমলাক্ষের চিঠিও নিয়ে আসতো হরিদা। উত্তর পৌঁছে দিত কমলাক্ষের কাছে। দু'চার লাইনের চিঠির দু'-চার লাইন উত্তর। মাঝে মধ্যে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করত স্বাগতার। চেষ্টাও যে করেনি তা নয়। কিন্তু পারেনি। মানুষের মূল্যবান জীবনকে এক টুসকিতে শেষ করে দিয়ে জিতিয়ে দিতে চায়নি ননীবালাকে। বরং কমলাক্ষের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে অপেক্ষা করেছে মাসের পর মাস। সাত-সাতটা বছর।

বরদাসুন্দরী গার্লস কলেজের অস্থায়ী শিক্ষিকার চাকরিটা কমলাক্ষই জোগাড় করে ছিল। বাধা দিয়েছিল ননীবালা। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন বড় ছেলেকে — ঘরের বাইরে পা রাখলে ভ্রষ্টা হয়ে যাবে ডাইনিটা। ডিভোর্স করানোর পরামর্শও দিয়েছিলেন অনেক অনেকবার। কিন্তু কমলাক্ষ রাজি হয়নি। কেন রাজি হয়নি সে খবর আজও জানে না স্বাগতা। এখন আর জানার উপায়ও নেই।

সাড়ে সাত বছরের নির্বাসিতা জীবনের মাঝে একবার মাত্র একদিনের জন্যে বাবা, মা, দাদা, বউদি আর তাদের ফুটফুটে টাবুনকে কাছে পেয়েছিল স্বাগতা। কিন্তু না, কিছুই বুঝতে পারেনি তারা। বুঝতে দেয়নি স্বাগতা। শাশুড়ির হুমকি তো ছিলই। বাবা, মা চলে যাওয়ার পরের দিন কলেজ ফেরত দু'পাতা ঘুমের ওষুধ কিনে ফিরেছিল। আর ফেরার পথেই সিঁড়ির মুখে ছোট্ট চিরকুটটা হাতে গুঁজে দিয়েছিল হরিদা। কমলাক্ষ লিখেছিল, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো। কলকাতায় বদলির আবেদন করেছি। হয়তো হয়ে যাবে। আমার স্বপ্নের রাজকুমারীকে সেদিন উদ্ধার করে নিয়ে যাবই। চিরকুটটা পড়ে সারারাত শুধু নিম্নচাপের অবিশ্রাম বর্ষণের মতো কান্নায় বুক ভিজিয়েছিল স্বাগতা।

কই বললে না তো?
কী? সোনালির প্রশ্নে ঘোর ভাঙে স্বাগতার।
কেমন লাগল?
খারাপ লাগবে কেন? রেওয়াজি গলা তোর। কিন্তু আমার জন্যে তোর সব গেল। চাকরি গেল, গান গেল, শখ-আহ্লাদ সব গেল। পারিস তো আমাকে ক্ষমা করে দিস, আবার বিছানার বুকে নিজেকে সঁপে শরীর এলিয়ে দেয় স্বাগতা। কষ্ট হয় সোনালির জন্যে। স্বার্থপর হতে শিখল না মেয়েটা। একটা আয়া বা কাজের লোক রেখে স্বচ্ছন্দে ড্যাং ড্যাং করে বেড়াতে পারতো। কিন্তু না, তারা যদি ঠিকমতো মায়ের যত্ন না করে! মায়ের যদি কোনও অসুবিধা হয়। সুমনও বহুবার বলেছে সোনালিকে — তুমি একা হাতে কত সামলাবে? একটা হোলটাইমার রাখো। আজকাল তো সেন্টারে খবর দিলেই বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায়। দিল্লি থেকে অনুরোধ করেছে তিলোত্তমা, মায়ের ওই স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে কান্নাকাটি করার স্বভাব বহুদিনের। সারাজীবন বাবাকে পাগল করেছে। এখন তোমাকে পেয়েছে। তুমি কিছুতেই মুরগি হয়ো না বউদি। মায়ের মতো কোমর ভাঙা অনেক মানুষ হুইল চেয়ারে চেপে হিল্লি-দিল্লি ঘুরছে। তুমি কোনও চিন্তা করো না। সুমনের কথা, তিলোত্তমার উপদেশ, সোনালির সিদ্ধান্ত সব কানে এসেছে স্বাগতার। সব শুনে মনে মনে ভেবেছে ছেলেমেয়েরা তো বাস্তব কথাই বলে। কেন যে সোনালি ওদের পরামর্শ পাত্তা না দিয়ে অবাস্তব গোঁ ধরে বসে আছে কে জানে। ভাল পুত্রবধূ হয়ে শাশুড়ির সেবা করার একটা সীমা থাকা উচিত। সোনালি তো সব সব সীমার, সব গণ্ডির বাইরে।

ক্ষমা! বয়েই গেছে তোমাকে ক্ষমা করতে। দিনের পর দিন যে অন্যায় করে তাকে ক্ষমা করা উচিত নয় — খাট ছেড়ে মেঝেয় নামে সোনালি। দুপুর ফুরিয়ে গিয়েছে। জানলায় উঁকি দিচ্ছে বিকেলের নরম রোদ। চা করতে হবে। রেবা মাসি চলে আসবে এখুনি। দুপুরের বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে বাজারে যাবে। সন্ধেবেলার প্রথম বাজারের টাটকা সবজি কেনার অভ্যেস অনেকদিনের। সেই স্বাগতা যখন সুস্থ ছিল, কোমর ভাল ছিল তখনকার অভ্যেস। তখন রেবামাসি নয়, বাজারে যেত শাশুড়ি আর পুত্রবধূ। স্বাগতা আর সোনালি।

বেশ, ক্ষমা করতে হবে না। কিন্তু আমার একটা কথা রাখবি তো মা?

কথাটা কী, আগে শুনি।

আমি মারা যাওয়ার পর তুই আবার রেওয়াজ শুরু করবি। চাকরি করবি — বাকিটা বলতে পারে না স্বাগতা। আবার দমকা কাশি এসে উথাল-পাথাল করে দেয় শুইয়ে রাখা শরীরটাকে। কি ভাল গান গাইতো মেয়েটা। সকাল সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা করে রেওয়াজ করত। অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে আসতেন গান শেখাতে, সেদিনও শেখাচ্ছিলেন গানটা — "তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে / যত দূরে আমি যাই, / কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, / কোথাও বিচ্ছেদ নাই। ... ...অন্তর গ্লানি, সংসার ভার / পলক ফেলিতে কোথা একাকার, / তোমার স্বরূপ জীবনের মাঝে / রাখিবারে যদি পাই।" গান শেষ হতে না হতেই চিৎকার উঠেছিল সুমন — কী হল মা, তুমি এমন করছো কেন? সুমনের চিৎকার শুনে বসার ঘর থেকে ছুটে এসেছিল সোনালি। সঙ্গে অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানহারা স্বাগতাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে শুইয়েছিল বিছানায়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই হাজির হয়েছিলেন ডাক্তার শান্তিরঞ্জন সেন। সব শুনে রায় দিয়েছিলেন, কঠিন কঠোর রায় — গান বন্ধ করতে হবে। এ ধরনের মানসিক রোগীর পক্ষে গানের কথা সহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বাগতাকে সুস্থ রাখার স্বার্থে এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তে গান ছেড়েছিল সোনালি। পরের সপ্তাহে খবরটা শুনে আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল স্বাগতা। একবার নয়, বারবার।

করব— কথা না বাড়িয়ে জবাব দেয় সোনালি। তারপর জিজ্ঞাসা করে — চা খাবে তো?

অল্প একটু চিনি দিয়ে দিবি তো? আধ চামচ?

যা খেলে তোমার ক্ষতি হয়, কষ্ট হয়, সেটাই তুমি খেতে চাইবে মা? পুত্রবধূ নয়, কন্যার স্নেহে প্রশ্ন করে সোনালি।

কে? কার কথা? 'মা' শব্দটা বাদ দিলে বাকি বাক্যটাই তো কমলাক্ষের। আর ভঙ্গিটা? সেটাও অবিকল কমলাক্ষের মতোই। চা বানাতে রান্নাঘরে চলে যায় সোনালি। আর ঠিক তখনই ঘামতে শুরু করে স্বাগতা। শরীরের চামড়া ফুঁড়ে ফুঁড়ে দপদপানি। মেয়েটা শ্বশুরের অমন অবিকল গলা পেল কোত্থেকে?

কলকাতায় বদলি দিয়ে বহরমপুরের বাড়ি ছাড়ার দিন সে কি তাণ্ডব। স্বাগতা সঙ্গে যাবে শুনে পাড়া মাথায় চিৎকার শুরু করেছিলেন ননীবালা। সঙ্গে বুক চাপড়ে কান্না। একে ডাইনি, তার উপর বাঁজা মেয়েটা সঙ্গে থাকলে তোকেও আর ফিরে পাব না — কাঁদতে কাঁদতে কমলাক্ষের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলেন ননীবালা। 'বাঁজা' শব্দটার প্রতিবাদ করেছিল কমলাক্ষ — যে স্ত্রী বিয়ের প্রথম রাত থেকেই স্বামী সঙ্গীহীন, তাকে বাঁজা বলো কোন বিচারে মা? কী? তুই আমার খুঁত ধরতে শিখেছিস কমল? হামলে পড়েছিলেন ননীবালা — বুঝেছি, গুন করেছে, তুকতাক করেছে। মাদুলি তাবিজ করেছে। যাই করুক, এতোদিন আমি অন্যায় করেছি — দৃঢ় জবাব শুনিয়েছিল কমলাক্ষ। বলেছিল, আমার উচিত ছিল অনেকদিন আগেই তোমার জেলখানা থেকে স্বাগতাকে উদ্ধার করা। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? দাঁতকপাটি কিড়মিড় করেছিলেন ননীবালা — এই আমার দিব্যি দিয়ে রাখলাম। যদি ওই মুখপুড়ি ডাইনিটাকে সঙ্গে নাও তা হলে আমার মরা মুখ দেখবে। ত্যাজ্যপুত্র করে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে ছাড়ব। আর তার পরেই হাতের কাছে পড়ে থাকা কাঠের পিঁড়িটা ছুড়ে মেরেছিলেন স্বাগতাকে লক্ষ্য করে কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাথা ফেটেছিল কমলাক্ষের। ফিনকি রক্ত এসে পড়েছিল স্বাগতার চোখে মুখ কপালে। আর সেই প্রথম অজ্ঞান হওয়ার রোগটা কোন ফাঁকে ঢুকে পড়েছিল স্বাগতার শরীরে। তারপর আস্তে আস্তে গড়তে শুরু করেছিল ঢিবি। উইপোকার মতো।

জ্ঞান ফিরেছিল বহরমপুর স্টেশনের ওয়েটিং রুম-এ। কমলাক্ষের কোলে মাথা রেখে। কিন্তু সেও অল্পক্ষণের জন্য। মাথা নয় সাদা ব্যান্ডেজ জড়ানো কমলাক্ষকে চিনতে না পেরে চিৎকার করে উঠেছিল স্বাগতা — কে? কী চাই আপনার?

তুমি? এত সকাল সকাল? ডোর বেলের আওয়াজে দরজা খুলেই চমকে ওঠে সোনালি।

ভাবলাম আজ একটু মায়ের সঙ্গে থাকা দরকার, সোনালিকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকে সুমন — মা কী করছে?

শুয়ে আছে। এখুনি চা দেব। তুমি খাবে? দরজা বন্ধ করে দেয় সোনালি— জানো সুমন, আজ অনেকদিন পরে মা গান গেয়েছেন। আমার সঙ্গে।

কী সর্বনাশ? তুমি গাইতে দিলে?

বাবা বেঁচে থাকলে আজ কত আনন্দ হত, তাই না?

ক'জন মানুষের ভাগ্যে পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকী পালন করা সম্ভব হয়। মায়েরও তো এতদিন চলে যাওয়া উচিত ছিল। সারাজীবন যা ধকল সহ্য করেছে, জুতো-মোজা খুলে ওপেন স্পেসে — পা বাড়ায় সুমন, শুধু টিকে আছে তোমার শাসনে, তোমার যত্নে।

যাও, একটু মায়ের কাছে গিয়ে বসো। আমি চা নিয়ে আসছি। ক'টা বাজে? রেবামাসি এখনও আসছে না কেন? বলতে বলতে রান্নাঘর মুখো হয় সোনালি। আর সুমন ঢুকে যায় মায়ের ঘরে।

কেমন আছে, মা? মায়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায় সুমন। না, কোনও উত্তর দেয় না স্বাগতা। টিউবলাইটের আলোয় কপালময় ছড়ানো ঘামের বিন্দুগুলো জ্বলজ্বল করে হিরেকুচির মতো। পাখার সুইচ অন করে দেয়। মায়ের ঠিক মাথার উপর ঝোলানো ছবিটায় বাবার চেহারাটা দেখে নেয় একবার। সেই ছবিটার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করে মায়ের মুখের ছবি। দুই ছবি জুড়েই অজস্র ক্লান্তির ছাপ। সংসার — রণক্ষেত্রের যুদ্ধক্লান্ত দুই সৈনিক। মনের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যায় সুমনের। ছল ছল করে চোখ জোড়া।

চলে এলে যে? মায়ের ঘরের দরজায় দেখা হয়ে যায় চায়ের ট্রে হাতে সোনালির সঙ্গে।

মা ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগাতে ইচ্ছে করল না।

ঘুমিয়ে পড়েছে? অবাক হয় সোনালি— চলো তো দেখি।

মা, মা গো — প্রথমে আলতো টোকা, তারপর খুব জোরে জোরে স্বাগতার শরীরটা নাড়িয়ে দেয় সোনালি আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ-বাতাস ফাটানো চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাশুড়ির বুকে — মা আর নেই সুমন। শিগগির ডাক্তার ডাকো।

পা নড়ে না সুমনের। বাবার ছবিটা আর একবার দেখে নেয় ঝাপসা চোখে। মনে মনে বলে — মাকে নিয়ে যাওয়ার সতেরোই ফেব্রুয়ারি দিনটাই চিহ্নিত করে রেখেছিল বাবা?

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

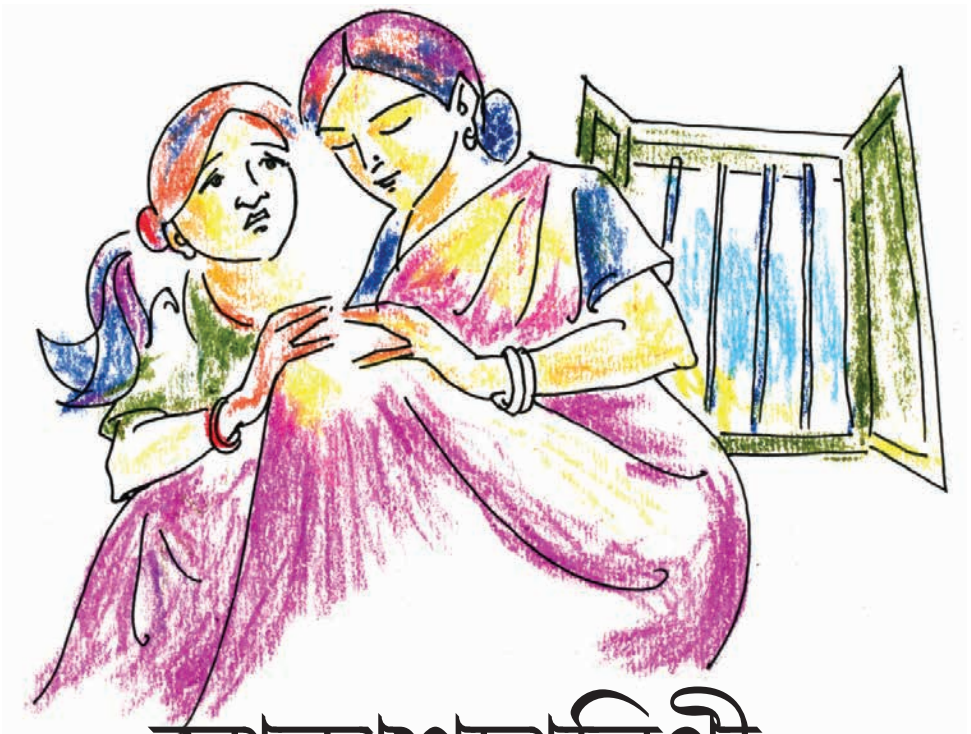

আকাশচারিণী

বিনতা রায়চৌধুরি

দুর্গার তিন মেয়ে।
পরপর তিনটি কন্যাসন্তান উপহার দেওয়ার জন্য দুর্গার স্বামী কৈলাস স্ত্রীর উপরে রিরস তবে বিতৃষ্ণ নয়। ব্যাপারটায় যে দুর্গার হাত নেই সেটা সে বোঝে।

তবে একটাও ছেলে হল না বলে একটু মন খারাপ লাগে বৈকি তাঁর। দুর্গার স্বামীর মন খারাপটা বোঝে কিন্তু কিছু বলে না।

বলবে কেন? সে তাঁর তিন মেয়েকে নিয়ে খুব খুশি।

দুর্গা ছোট থেকেই আকাশ দেখতে ভালবাসত। বুকের উপর মস্ত আকাশখানা নিয়ে শুয়ে থাকতে খু-উ-ব ভাল লাগে ওর। দুর্গা ওর মেয়েদের নাম রেখেছে আকাশের বাসিন্দাদের নামে।

তাঁর বড় মেয়ের নাম চন্দ্রা।

মেজ মেয়ের নাম তারা।

ছোট মেয়ের নাম নক্ষত্র রাখবে ভেবেছিল, কিন্তু মেয়ের নাম নক্ষত্র মানায় না। তাই সে ছোট মেয়ের নাম রেখেছে পূর্ণিমা।

মাঝে মাঝে দুর্গা ভাবে, তাঁর যদি ছেলে হত তা হলে কী সে ছেলের নাম রাখত সূর্য? নাকি সরাসরি আকাশ। কে জানে? ছেলে যখন হয়নি, তখন তার নাম নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই।

দুর্গার বাবা মারা যায় দুর্গার ষোলো বছর বয়সে। সে তখন দশম শ্রেণি। তখন একাদশ শ্রেণির পরই ছিল উচ্চমাধ্যমিক। বহু কষ্টে-সৃষ্টে দুর্গা উচ্চমাধ্যমিকটা পেরিয়ে গেল কিন্তু কলেজের



মুখ দেখা তাঁর ভাগ্যে হল না। সে অনেকদিন আগের কথা। তখন বোধহয় চাকরি পাওয়া এত কঠিন ছিল না। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। ক'টা মেয়েই বা তখন চাকরি করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসত? কিন্তু দুর্গা এসেছিল।

দুর্গার বাবা অফিসে কেরানির চাকরি করত। হৃদয়বান মানুষ ছিল। সে নাকি লুকিয়ে কবিতা লিখত। তাই দুর্গার মধ্যেও বেশ সরল-মিষ্টি কবি কবি একটা ভাব ছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর দুর্গাদের সংসারে কাব্যরস একেবারে মুছে গেল।

দুর্গা নিজের জীবনটাকে সুস্থভাবে চালিয়ে নিতে যেতে আর মায়ের উপর দায়িত্ববোধ থেকে নিজেকে শক্ত করল। আত্মীয়-স্বজনদের বারণ অগ্রাহ্য করে দুর্গা মেয়েদের একটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসাবে যোগ দিল।

তারপর দুর্গা আর তার মা মিলে সুখের ঘর গড়ে তুলেছিল। ওদের কোনও অভাব ছিল না। না প্রাণে, না ভাঁড়ারে। সেই সুখের ঘরে যোগ দিতে কৈলাস এসেছিল অনেক পরে।

যে স্কুলে দুর্গা কাজ করত, সেই স্কুলেই কৈলাস দারোয়ানের কাজ করত। দু'জনেই দু'জনকে চিনত কিন্তু তেমন আলাপ কখনও হয়নি দু'জনের। এক বর্ষণমুখর বিকেলে দুর্গা আটকে পড়ল স্কুলে। সেইদিন কৈলাস ছাতা মাথায় দিয়ে দুর্গাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে এসেছিল। দুর্গার মা কৈলাসকে ঘরে ডেকে বসাল। চা করে দিল। খুব ভাল লেগে গেল ছেলেটাকে দুর্গার মায়ের। তারপর যখন শুনল ওই ছেলের নাম কৈলাসপতি, তখন মনে মনে ভাবল এর চেয়ে ভাল পাত্র দুর্গার আর হতেই পারে না। কৈলাসের ঘরের সব কথা শুনে নিল মা। ব্যস, চার হাত এক হতে আর দেরি হল না।

যাঁরা মনে করবেন কৈলাস আর দুর্গার এটা লাভ-ম্যাকের, তাঁরা ভুল করবেন। পুরোপুরি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ওদের।

কৈলাস সৎ, নির্বিরোধ আর নিরভিমান ছেলে। দুর্গার মা যতদিন বেঁচেছিল, ওদের সংসারেই ছিল। কোনও অসুবিধা হয়নি।

২

চন্দ্রা, তারা আর পূর্ণিমাকে নিয়ে দুর্গা ভালই সংসার করছে।

কৈলাস কিন্তু ভীষণ চুপচাপ হয়ে গেল। তিন কন্যার চাপটা তার উপর একটু বেশিই পড়েছিল। বউয়ের উপর সে রাগ করেনি, অভিমানও না। মেয়েদের সে ভালওবাসত না, মন্দও বাসত না। কৈলাস প্রথমদিকে খুব মনমরা হয়ে থাকত, তারপর একদিন নেশা করা ধরল। সংসারে থেকেও যেন সংসারের কোথাও ছিল না কৈলাস।

চন্দ্রার যখন বারো বছর বয়স আর পূর্ণিমার পাঁচ, তখন দুর্গার সংসারে অমাবস্যা নেমে এল কৈলাসের মৃত্যুর হাত ধরে।

দুর্গার জীবনে রইল শুধু তার তিন মেয়ে আর চাকরি।

তাই নিয়েই দুর্গা সংসার করতে লাগল। মেয়েদের মানুষ করতে হবে।

স্কুলের চাকরির পাশে ঘরে বসে ঠোঙা বানানোর কাজ শুরু করল ও। চন্দ্রা আর তারা পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মাকে সাহায্য করে। ঠোঙা থেকেও রোজগার মন্দ হয় না। তবে সে আর কত? একদিন দুর্গা বলল, 'জানিস তো, তোদের কী করে বিয়ে দেবে সেই চিন্তাই তোদের বাবাকে কুরে কুরে খেত।'

চন্দ্রার বাবাকে বেশ ভালই মনে আছে, 'হ্যাঁ মা, বাবা বেঁচে থাকলে কত ভাল হত!'

দুর্গা চুপ করে থাকল।

মাঝে মাঝে দুর্গারও আকুলতা বাড়ত, সত্যিই তো, তিন-তিনটে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া কি সামান্য কথা? চন্দ্রা তাড়াতাড়ি বলত, 'আমি বিয়েই করব না মা। তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব

না আমি। তারাও দিদির সঙ্গে গলা মেলাত, দেখাদেখি পূর্ণিমাও।

'সত্যি? সত্যিই তোরা আমাকে ছেড়ে যাবি না?' দুর্গা মেয়েদের আঁকড়ে ধরত। খুশি উপচে পড়ত তার চোখে। একদিন মেয়েদের বিয়ে দিতেই হবে, সে জানে। তবু মেয়েদের সহানুভূতিভরা কথা মনকে ভরিয়ে দিত।

চন্দ্রা একদিন মাধ্যমিক পাস করল। আর কিছুদিন পরই পালিয়ে গেল তার গোপন প্রেমিক বাচ্চুর সঙ্গে। দুর্গা অবাক হয়ে গেল 'তবে যে চন্দ্রা কেবলই বলত, বিয়ে করব না আমি। তোমাকে ছেড়ে কখনও যাব না।'

'দিদিটা খুব স্বার্থপর মা। মিথ্যে কথা বলত। নিজে বেশি ভাল থাকবে বলে ভালবাসার মানুষের হাত ধরে কেমন সরে পড়ল।'

'তুইও অমন করে চলে যাবি তারা?'

'আমি? কোনওদিন না। তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা আমি ভাবতেও পারি না। তুমি আর পূর্ণিমা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।'

খুশি হল দুর্গা।

দুই মেয়ে নিয়ে সে স্কুলে যায়। দিবারাত্রি খাটে। জীবনটা আবার নতুন করে গড়ে নেওয়ার কথা ভাবে। স্কুলের বড়দিকে বলে রেখেছে, সে রিটায়ার করলে তারাকে যেন একটা সুযোগ দেয় স্কুলে। তার পদেই বহাল করে তার মেয়েকে। বড়দি ঘাড় নেড়েছেন, হেসেছেন। হ্যাঁ বলেননি, তবে না-ও বলেননি।

তারা মাকে দুশ্চিন্তা করতে দেয় না, কেবলই বলে, 'আমি তো আছি, ভাবনা কী তোমার? পূর্ণিমার বিয়ে আমিই দেব। চাকরিটা পাই আগে।'

দুর্গা তারার কথায় মনে জোর পায়। তারার মুখ দেখে শান্তি পায়। চন্দ্রা তো আর একদিনও আসেনি, মাকে ভুলে গেছে। সে দুঃখ মন থেকে সরিয়ে রাখে দুর্গা। তারার মতো মেয়ে আছে তার, এই গর্বেই বুক ফুলে ওঠে।

সেই গর্ব একটু চুপসে গেল দুর্গার, তারা যখন মাধ্যমিকে ফেল করল।

তারাও যেন হতাশ। দুর্গা বলল, 'তাতে কী? আবার পড়।'

তারা মাথা নাড়ল। পড়বে না আর। ঠোঙা বানাতে লাগল দিনরাত।

তারপর একদিন মাকে চিঠি লিখল, 'তারক আমাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে। চলে যাচ্ছি আমি। ঠোঙা বানিয়ে কি আর জীবন চলে? তোমার বোঝা কমালাম।'

দুর্গা সেই চিঠিটা নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। পড়ল বারবার। পূর্ণিমা মায়ের হাত থেকে চিঠি কেড়ে নিয়ে পড়ল। তারপর ছিঁড়ে কুচিয়ে ফেলল। রাগে গরগর করে বলে উঠল, 'সব বিশ্বাসঘাতক। যেমন দিদি, তেমনই ছোড়দি। তুমি ভেব না মা, আমি আছি, তোমার পূর্ণিমা। যে তোমাকে ছেড়ে কোনওদিনই যাবে না!'

দুর্গা তাকিয়ে রইল পূর্ণিমার দিকে। তারপর মনে মনে বলল, 'সে সুযোগ তোকে দিলে তো!'

৩

একমাস কাটতে না কাটতেই দুর্গা নিজে ছেলে দেখে পূর্ণিমার বিয়ে দিয়ে দিল। পূর্ণিমা কিছুতেই বিয়ে করবে না, যাবে না মাকে ছেড়ে। দুর্গা মেয়ের কোনও কথাই শুনল না।

পূর্ণিমা বলল, 'তা হলে তুমি চলো আমার সঙ্গে।'

দুর্গা ঘাড় নাড়ল, 'পাগল নাকি? আমার চাকরি আছে না?'

'এত দূরে বিয়ে ঠিক করলে কেন? তোমাকে কে দেখবে?'

'ইচ্ছে করেই তো করলাম। দু'জন আমাকে ছেড়েছে, আমি তোকে ছাড়লাম।'

'দিদিদের উপর রাগ আমার উপর দিয়ে তুললে?' মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসাতে লাগল পূর্ণিমা। দুর্গার মুখে হাসি, 'আমাকে ছেড়ে যেতে তোর চোখ জলে ভাসছে। এটা দেখা কি কম ভাগ্যের কথা? দু'বার ঠকেছি, আর ভুল করি!'

'সত্যিই আমি তোমার কাছে থাকতে চেয়েছিলাম মা। দিদিদের মতো করতাম না।'

'কী মিষ্টি কথা! কান যে জুড়িয়ে যাচ্ছে আমার। আবার মায়ের কর্তব্য করতে পেরে বুক ভরেও যাচ্ছে। কী ভাগ্যি বেশি দেরি করে ফেলিনি।'

তারা মায়ের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'তুমি কার কাছে থাকবে মা?'

'নিজের কাছে। যে নিজের সঙ্গে থাকতে শেখে সে কি কখনও একা হয়?'

'আমাকে ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে দিলে তুমি।'

'কী ভাগ্যি! নে-নে, অনেক কাঁদা-কাটা হয়েছে। এবার সত্যিকারের বিদায়ের পালা। দেখ, সূর্য চিরকালই পুব আকাশে উদয় হবে, পশ্চিম আকাশে অস্ত যাবে। আমি উল্টো করে শুয়ে থাকলে তো আর ব্যাপারটা পাল্টে যাবে না।'

৪

দুর্গা অবসর নিয়েছে। একা থাকে। বেশ থাকে। অন্যরকম থাকার আবার কোনও উপায় আছে নাকি?

দিন দিনের মতো করে কেটে যায়। রাত রাতের মতো করে।

দুর্গা এখনও বুকের উপর আকাশ নিয়ে শুয়ে থাকে।

তিন কন্যার কথা সে মনে আনে না। তারা নিজের নিয়মে এসেছিল আবার নিজের নিয়মেই চলে গেছে।

চন্দ্রা, তারা, পূর্ণিমারা দুর্গার আকাশে বিরাজমান। তাদের দেখে।

দু'জন মানুষের কথা তার খুব মনে পড়ে। এক, মায়ের কথা। মায়ের নাম রেখেছে সে ভূমি। যাকে সে সব সময় ছুঁয়ে থাকে। দুই, নীরব-নিরভিমান কৈলাসের কথা। দুর্গার তার নাম রেখেছে সূর্য। দুর্গার জীবনে তার একাকীত্ব ছাড়া শুধু এই দু'জনেই আছে—ভূমি আর সূর্য। যারা কখনও মানুষকে ছেড়ে যায় না।

অলঙ্করণ : দেবনাথ নন্দী





আয় করুন বা না করুন আপনি আয়কর দিতে বাধ্য

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপরের শিরোনামটা কোনও হেঁয়ালি নয়। গল্পের গরুও নয় যে গাছে উঠেছে। এটা বাস্তব এবং নির্মম সত্য। আয়কর বিশেষজ্ঞরা বলেন, আপনি আয়কর তখনই দেবেন যখন আপনি সত্যিকার রোজগার বা আয় করবেন।

কোনও 'ধারণা' (National) বা 'কাল্পনিক' (Imaginary) আয়ের উপর কর চাপানো বেআইনি, যা জোরজুলুম পর্যায়ে পড়ে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদালত এবং উচ্চ আদালত একই মত পোষণ করে।

মুশকিল হল 'কে শোনে কার কথা'। আয়কর আইন রচয়িতারা মনে করেন কর ফাঁকি বা কালো টাকা রুখতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, অবশ্যই আইনকে কঠোর করতে হবে। এবং তারজন্য প্রয়োজনে (বাস্তবে এটাই করা হয়েছে) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আয় না করলেও, কাল্পনিক আয়ের উপরও করদাতাকে কর দিতে হবে।

প্রথম চিত্র

বাড়িভাড়ার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন অনুযায়ী, আপনাকে কর দিতে হবে যত টাকা বাড়িভাড়া পেয়েছেন অথবা যত টাকা ওই এলাকায় বাড়িভাড়া বাবদ আয় হয় (Fair Rental Value)—যেটা বেশি তার উপরে।

নিচের চিত্রে তা দেওয়া হল—

	প্রথম ক্ষেত্র	দ্বিতীয় ক্ষেত্র
বাড়িভাড়া পেয়েছেন।	১,০০,০০০টাকা	১,৫০,০০০টাকা
একই বাড়ি ওই এলাকায় ভাড়া হয়।	১,৪০,০০০টাকা	১,৪০,০০০টাকা
আয়কর দিতে হবে।	১,৪০,০০০টাকার উপরে	১,৫০,০০০টাকার উপরে

(সন্দেহ নিরসনের জন্য জানানো হচ্ছে দু'টি ক্ষেত্রেই করদাতার মোট আয় ন্যূনতম করযোগ্য আয়ের চেয়ে বেশি।)

সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে আপনি ৪০,০০০ টাকা রোজগার করলেন না, কিন্তু কর দিতে হল ওই কাল্পনিক ৪০,০০০ টাকা রোজগারের উপর। কী বুঝলেন, আয়করের 'গরু' গুঁতো মারে।

দ্বিতীয় চিত্র

আপনি কি আপনার পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করতে চান? কী দামে বিক্রি করবেন, ঠিক করেছেন কিছু? না করলে দাম নিয়ে এখনই কাউকে কথা দেবেন না। খবরদার, আপনি নিজে দাম ঠিক করবেন না। কী বললেন? সম্পত্তি আমার আর দাম ঠিক করবে অন্যজন! এখন উলটপুরাণ চলছে। সম্পত্তি আপনার হলেও, দাম ঠিক করবে রেজিস্ট্রি অফিস।

তাই দেরি না করে, জমি কেনা-বেচার আগে রেজিস্ট্রি অফিসে চলে যান। জেনে নিন আপনার জমির দাম কত।

আয়কর আইন বলছে কর প্রদানের ক্ষেত্রে আপনি কোন দামে জমি বিক্রি করেছেন সেটা বড় বিষয় নয়।

কোন দামের উপর আপনার জমি রেজিস্ট্রি হবে এবং Stamp Duty দেবেন, সেই দামই হবে আপনার বিক্রয়মূল্য মূলধনী কর (Capital Gains) দেওয়ার ক্ষেত্রে, ওই দামে (Stamp Duty Valuation) জমি বিক্রি করতে পারলে আপনার কোনও 'অতিরিক্ত কর' দিতে হবে না, না পারলে আপনাকে 'অতিরিক্ত কর' দিতে হবে কাল্পনিক আয়ের উপর। আপনার অসহায়তার ছবি নিচে দেওয়া হল—

বিক্রিত দ্রব্য থেকে আয়	প্রথম ক্ষেত্র	দ্বিতীয় ক্ষেত্র
জমির বিক্রয় মূল্য	(A)১০ লাখ টাকা	২৫ লাখ টাকা
রেজিস্ট্রি অফিসের দাম	(B)২২ লাখ টাকা	২২ লাখ টাকা
অন্যান্য উৎসখাতে আয় (A)-(B)	(C) ১২ লাখ টাকা	শূন্য
জমির ক্রয়মূল্য	(D) ৮ লাখ টাকা	১০ লাখ টাকা
মূলধনী লাভ (Capital Gains) যার উপর কর দিতে হবে (A)-(D)	(E) ২ লাখ টাকা	১৫ লাখ টাকা
মোট আয় (যার উপরে কর দিতে হবে) (C)+(E)	(F) ১৪ লাখ টাকা	১৫ লাখ টাকা

মজার ব্যাপার হল প্রথম ক্ষেত্রে (উপরের চিত্রে) অন্যান্য উৎস খাতে আয় ১২ লাখ টাকা যার উপরে কর দিতে হবে, অথচ ওই টাকা আপনি চোখেও দেখেননি এবং রোজগারও করেননি। আরও মজা এবং অবাক হওয়ার ব্যাপার (প্রথম ক্ষেত্রে) আপনার মোট আয় (যার উপর কর দেবেন) আপনার জমি বিক্রির অর্থের চেয়েও বেশি। সত্য সেলুকাস 'কী বিচিত্র এই দেশ'।

মনে রাখতে হবে রেজিস্ট্রি অফিসে দাম নির্ধারণ হয় একটা বিশেষ 'অঞ্চল' (Zone) ধরে। জমি বা বাড়ির অবস্থানগত চরিত্র



মজার ব্যাপার হল প্রথম ক্ষেত্রে (উপরের চিত্রে) অন্যান্য উৎস খাতে আয় ১২ লাখ টাকা যার উপরে কর দিতে হবে, অথচ ওই টাকা আপনি চোখেও দেখেননি এবং রোজগারও করেননি। আরও মজা এবং অবাক হওয়ার ব্যাপার (প্রথম ক্ষেত্রে) আপনার মোট আয় (যার উপর কর দেবেন) আপনার জমি বিক্রির অর্থের চেয়েও বেশি। সত্য সেলুকাস 'কী বিচিত্র এই দেশ'।

ধরে নয়। তাই বিক্রেতা সাবধান।

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে (Individual/HUF) এই তুঘলকি আইন বড় বিপদ এবং বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এই আইনের আওতার মধ্যে কোম্পানি, অংশীদার ব্যবসায়ী এবং অন্যান্যরা পড়েন না।

আয়কর আইন এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে। আপনি মনে করলে রেজিস্ট্রি অফিসের নির্ণায়ক মূল্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার অভিযোগ Valuation Officer-এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অভিজ্ঞতা বলছে, Valuation Report পেতে বছরের পর বছর পেরিয়ে যাবে। ঠিকমতো 'খুশি' এবং 'তদ্বির' না করতে পারলে সময় পেরিয়ে যাবে এবং তারপর রেজিস্ট্রি অফিসের মূল্যকেই মান্যতা দিয়ে সিলমোহর লাগিয়ে দিয়ে বলবে, 'দেখ কেমন লাগে?' আর ততদিন আপনাকে বসে থাকতে হবে 'তোমারি পথ চেয়ে'।

(লেখক-CII- এর Economic Forum-এর ভূতপূর্ব সদস্য এবং FCA)

দিশারি মমতা



মালুম হোতা হ্যায় পরধানমন্ত্রী বনেঙ্গে

অশোক বসু

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণমন্ত্রী। শাস্ত্রীভবনে বসেন। একেবারে প্রথম দিক। দিল্লি গিয়ে একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল তখন দিল্লিতেই। ওর সঙ্গেই গিয়েছিলাম। ঢুকে বেশ ভাল লাগছিল। গর্ববোধ হচ্ছিল।

কালীঘাটের আটপৌরে মেয়েটা দিল্লির শাস্ত্রীভবনে বসে মন্ত্রিত্ব চালাচ্ছেন। সেইসময় আশপাশে কোথাও একটা ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। দিল্লির গা লাগোয়া উত্তরপ্রদেশে। সেদিন মমতা সেখানে যাবেন। কিছু ত্রাণ দেওয়া বা ঘোষণা করার কথা ছিল। উদ্যোক্তারা একটা ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। মমতা বললেন, আমার সঙ্গে চলুন। এখানে তো আপনার তেমন কোনও কাজ নেই। জয়ন্তদাও যাবেন। জয়ন্ত বলল, না না, আমি এখন যেতে পারব না। অশোকদা যাক।

নীল গাড়িটা সংসদ ভবনের ৪ নম্বর গেটের সামনে এসে গিয়েছে। আর ভিতরে ৬ নম্বর ঘরে তখন বিদায়-বিষণ্ণতা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিন এই ঘর গমগম করে। এটা সংসদে রেলমন্ত্রীর ঘর। আজ নিস্তব্ধতাই বেশি। একটু আগে সেন্ট্রাল হলে আদবানি, সুষমারা হাতে হাত রেখে বলেছেন বেস্ট অফ লাক। প্রধানমন্ত্রী কাছে এসে বললেন, জয়ী হয়ে ফেরা চাই। সোনিয়া জড়িয়ে ধরে কানে কানে কী যেন বললেন।



সত্যিই সেদিন মমতার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ছাড়া অন্য তেমন কোনও কাজ ছিল না। রাজি হয়ে গেলাম ওঁর সঙ্গে যেতে। বললেন, যেতে যেতে কথা হবে। রতন মুখোপাধ্যায় ছিলেন মমতার সবচেয়ে কাছের লোক। মমতা যেমন হই হই করে কথা বলেন, তেমনভাবেই বললেন, রতনদা অশোকদাও আমাদের সঙ্গে যাবেন।

গেলাম। এমন কিছু দূরের রাস্তা নয়। ঘণ্টাখানেকের জার্নি। যাওয়াটার মধ্যে বৈচিত্র কিছু নেই। কিন্তু যেখানে গিয়ে পড়লাম, সেখানটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম কোনও হলঘরে অনুষ্ঠান হবে। হচ্ছে একটা খোলা মাঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে তখনই জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে এতটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়ে গিয়েছে তা ভাবতে পারিনি। জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গ নয়, উত্তরপ্রদেশ। শহরাঞ্চলও নয়। তা সত্ত্বেও সেই ছোট্ট অনুষ্ঠানে অনেক লোক এসেছিল। গাদাগাদি ভিড়। আমরা পৌঁছনো মাত্র কর্মকর্তারা মমতাকে প্রায় ছিনতাই করে মঞ্চ বলে ঘোষিত একটা ছোট্ট বেদিতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। শুরু হয়ে গেল মমতার ভাষণ। বাংলা মেশানো হিন্দি, হিন্দি মেশানো ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন মমতা। অবাক হয়ে শুনতে লাগল লোক। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন মমতা। সেইসময় আমি মঞ্চের কাছাকাছি না থেকে একটু পিছন দিকে চলে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ওই সভায় আসা লোকজনের সঙ্গে একটু আলাপ করি। একদম পিছনের দিকে দাঁড়িয়েছিলেন এক মাঝবয়সি দেহাতি ভদ্রলোক। তাঁকে ডেকে নিয়ে কথা বলতে চাইলাম। ভদ্রলোক আপত্তি করলেন না। কারণ, তিনি সামনে যেতে পারেননি। যা ভিড়, তাতে এতদূর থেকে মমতার কথা কিছু শোনা যাচ্ছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁকে আপনি চেনেন? হিন্দিতেই কথা বলছিলাম। বললেন, চিনব না! মমতাজি। বঙ্গাল সে আয়া। আভি দিল্লি মে মন্ত্রী হ্যায়। কথায় কথায় যা বেরিয়ে এল, বাংলার এখনকার দু'জন রাজনীতিককে তাঁরা খুব ভাল করে চেনেন। একজন জ্যোতি বসু। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আর একজন মমতা ব্যানার্জি। উত্তরপ্রদেশের ওই আধা দেহাত অঞ্চলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধারণ মানুষ এতটা চেনে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিলাম বইকি।

সেই মমতা তারপর দীর্ঘদিন দিল্লিতে মন্ত্রী থেকেছেন। রেলমন্ত্রকের মতো দফতর চালিয়েছেন। আস্তে আস্তে জাতীয় রাজনীতিতে মমতা একটা নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বে এনডিএ জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক ছিল তৃণমূল। অটলবিহারী ব্যক্তিগতভাবেও মমতাকে ভীষণ পছন্দ করতেন। একবার বাজপেয়ীর সঙ্গে বিদেশ সফরে কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম। সেইসময় বহু জায়গায় ওঁর কাছ থেকে মমতা প্রসঙ্গে অনেক কথা শুনেছি। তা ছাড়া বাজপেয়ী মমতাকে যে কতটা পছন্দ করতেন তা দেখা গিয়েছে মমতার কালীঘাটের বাড়িতে। সেখানে এসে মমতার মা গায়ত্রীদেবীকে প্রণাম জানিয়েছেন তিনি, তাঁর হাতের তৈরি খাবারদাবারও খেয়ে গিয়েছেন। সেই এনডিএ জোটও মমতা ছেড়ে এসেছিলেন। ওরা কথা রাখেনি। সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হলে মমতা সেখানে নেই। ছিলেন বিজেপির ভিন্ন মেরুর জোট মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রীও। তখন অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেস শরিক হিসাবেও যথেষ্ট শক্তিশালী। জনস্বার্থে নেওয়া হচ্ছে বলে এই সরকার যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মমতা তার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। সেই কারণে হেলায় ইউপিএ সরকার ছেড়েও বেরিয়ে এসেছেন।

এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে যাঁরা দেশের চালিকাশক্তি হতে পারেন তাঁদের একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস এবং বিজেপি চালিত জোটের বাইরে তৃতীয় এক ফ্রন্ট গড়ার ডাক দিয়েছেন। মমতার ভাষায় ফেডারাল ফ্রন্ট। একটা আঞ্চলিক দলের নেত্রী হিসাবে এই ডাক আপাতভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং জোরদার মনে না হলেও সেই ডাকে কিন্তু নড়াচড়া শুরু হয়ে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। মুলায়ম সিং যাদব, মায়াবতী, জয়ললিতা, নীতীশ কুমার, নবীন পট্টনায়েক, প্রকাশ সিং বাদল সবাই আঞ্চলিক দল হিসাবে রাজ্যে সরকার চালাচ্ছেন। কিন্তু কেন্দ্রে সরকার গড়ার ডাক মমতা

যেভাবে দিতে পেরেছেন তা আর কারও কাছ থেকেই পাওয়া যায়নি। এমন বুকের পাটা কারও হয়নি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ-৩ লড়াই করবে। বিজেপির নেতৃত্বে ময়দানে থাকবে এনডিএ জোটও। তবে একদা এনডিএ কিংবা ইউপিএ শরিকরা তৃতীয় বিকল্প জোট গড়ে তুললেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে আঁচ পাওয়া যাচ্ছে তাতে জয়ললিতা, নবীন পট্টনায়েক, নীতীশ কুমার কিংবা মায়াবতীরা যে মমতার ডাকে এগিয়ে আসবেন না এমনটা নাও হতে পারে। তলায় তলায় অনেকেই এই ডাকের গুরুত্ব খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। কারণ, একটা বিষয় নিশ্চিত, আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইউপিএ কিংবা এনডিএ জোট কেউই নিরঙ্কুশভাবে গরিষ্ঠতা পাবে না। মমতার নেতৃত্বে যদি তৃতীয় ফ্রন্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে তাহলে তারাই হবে নির্ণায়ক শক্তি। ওঁরা সকলেই জানেন, সামান্য শক্তি নিয়েও মমতা জাতীয় রাজনীতি তোলপাড় করে দিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন বামপন্থীরা এবং মমতা কখনওই কোনও এক জোটে যাবেন বলে মনে হয় না, তেমনই মায়াবতী-মুলায়ম, জয়ললিতা-করুণানিধি, নীতীশ-লালুপ্রসাদও কখনও একদিকে যাবেন না। দিল্লির রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ, আগামী লোকসভা নির্বাচনে মমতা, মায়াবতী, জয়ললিতা, নীতীশ কুমার, নবীন পট্টনায়েকরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েই দিল্লিতে আসবেন। অন্ধ্রের জগন্মোহনও বড় সংখ্যা নিয়ে আসতে চলেছেন। তবে এঁদের সকলের মধ্যেই ব্যতিক্রম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৌশলগত কারণে অনেকেই আড়ালে আবডালে তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও ঠিক সময়ে তাঁরাই মমতাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন। কারণ, এতদিনে মমতা প্রমাণ করে দিতে পেরেছেন তাঁর শক্তি যাই হোক তাই নিয়েই রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি।

একদিনের একটা ছবি তুলে ধরি। এই ছবিটাই বলে দেবে জাতীয় রাজনীতিতে মমতার অবস্থান কোথায়?

নীল গাড়িটা সংসদ ভবনের ৪ নম্বর গেটের সামনে এসে গিয়েছে। আর ভিতরে ৬ নম্বর ঘরে তখন বিদায়-বিষণ্ণতা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিন এই ঘর গমগম করে। এটা সংসদে রেলমন্ত্রীর ঘর। আজ নিস্তব্ধতাই বেশি। একটু আগে সেন্ট্রাল হলে আদবানি, সুষমারা হাতে হাত রেখে বলেছেন বেস্ট অফ লাক। প্রধানমন্ত্রী কাছে এসে বললেন, জয়ী হয়ে ফেরা চাই। সোনিয়া জড়িয়ে ধরে কানে কানে কী যেন বললেন। সাড়ে পাঁচটায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট। সাড়ে তিনটেয় মমতা বললেন, রতনদা গাড়ি এসেছে? রতন মুখোপাধ্যায় জানালেন, হ্যাঁ। কিন্তু বেরনো সহজ নয়। দরজার সামনে বেজায় ভিড়। করিডরে ভিড়। সবাই জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ চলে যাবেন। লোকসভায় তাঁর নিশ্চিতভাবে এই শেষ। কারণ ততদিনে সবাই জানে তিনি জিতছেনই। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেনই। ২৫ বছরের সম্পর্কের ইতি। ঘর থেকে বেরিয়ে গটগট করে হাঁটাই তাঁর স্টাইল। তাঁর সঙ্গে হাঁটা মানে অন্যদের দৌড়তে হবে। কিন্তু এই বিকেলটির সবকিছুই ব্যতিক্রমী। মমতা নিজেই শ্লথগতিতেে হাঁটছিলেন। কিছুক্ষণ সংসদের করিডরের ফ্রেসকোগুলি দেখলেন। ৪ নম্বর গেট থেকে বেরোতেই অসংখ্য ক্যামেরা, বুম। দিদি কিছু বলুন... দিদি বললেন, ভাল থাকবেন। গাড়ি চলতে শুরু করল। তিনি চুপ। অন্যসময় গান চালিয়ে দেওয়া হয়। এদিন সেসব কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণ পর স্বগতোক্তি-সকলের চোখ ছলছল করছিল

দিল্লিতে তখনই ভোটের হাওয়া উঠে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এসে গিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। নিম্নবর্গের লোকেরা এখন সবাই বলতে গেলে আম আদমি পার্টিরই সমর্থক।

দেখলেন...আমাকে সকলেই ভালবাসে তো। বলতে বলতে হঠাৎ শেষ চৈত্রের দমকা হাওয়া দেয়। ধুলো উড়ে নীল রঙের জেনের জানালা দিয়েও ঢুকে পড়ল। তাড়াতাড়ি আঁচল চাপা দিয়ে চোখ ঢাকলেন মমতা। ধুলোর ভয়ে? কে জানে? তবে ভাগ্যিস হাওয়া দিল!

এই অংশটা আমি আগেও ব্যবহার করেছি। কারণ এই অংশটুকু দিয়েই জাতীয় রাজনীতিতে মমতার অবস্থান আঁচ করা যায়। সাংবাদিক সমৃদ্ধ দত্ত একটা পুজো সংখ্যায় লিখেছিলেন। বছর দুয়েক আগে। মমতাকে প্রায় এক দশক সাংসদের ভূমিকায় খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। আগেও দেখেছেন। সেই সব নিয়েই একটি বিস্তৃত লেখা। তার মধ্যে এই অংশটা ছিল। গত আগস্ট মাসে দিল্লি গিয়েছিলাম। সংসদ ভবনে গিয়ে অনুভব করলাম মমতার অশরীরী উপস্থিতি। সাংসদের দায়িত্ব ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বছর আড়াই দিল্লি থেকে চলে এসেছেন। সংসদে আর যান না তিনি। তবু সেই একই মাত্রার কৌতূহল তাঁকে ঘিরে। কলকাতা থেকে তৃণমূলের যে সব সাংসদ সংসদভবনে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের ঘিরেই নানা রাজ্যের রাজনীতিক, সংসদ সদস্য, সাংবাদিকদের কৌতূহলী ভিড়। মমতা কী করছেন, কী বলছেন। তাই জানতেই হাজারো জিজ্ঞাসা।

সংসদের রাজ্যসভা ও লোকসভা বেশ কিছুদিন ধরে বিঘ্নিত হচ্ছে। চালু হওয়ার পর পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই অধিবেশন স্থগিত হয়ে যাচ্ছে। দফায় দফায়। কখনও কখনও সারাদিনের জন্য বাতিল। অধিবেশন চললে যেমন সংসদ ভবনের করিডরে ভিড় থাকে না। তেমনই সংসদে দুই কক্ষের অচলাবস্থায় প্রায় সবসময়ই করিডরে গুলতানি।

আগেও বলেছি, তবু এই প্রসঙ্গে আরও একবার বলি। চা খেতে খেতে বাম মতাবলম্বী এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। একটা চ্যানেলের রিপোর্টার। কুড়ি-বাইশ বছর সাংবাদিকতায়। তাঁর সাংবাদিক জীবনের পুরো সময়টাই মমতাকে দেখেছেন নিবিড়ভাবে। গত এক দশক নিজের আগ্রহেই মমতাকে অবজারভ করেছেন। বললেন, মমতার মতো ক্রাউডপুলার খুব কম দেখেছি। তবে সাধারণভাবে মনে হয় মমতাকে কেউ খুব একটা বিশ্বাস করেন না। কখন যে তিনি কী করে বসবেন, তা ভগবানও জানেন



না। তাই আড়ালে-আবডালে তাঁর সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রুপও করেন অনেকে। কিন্তু এঁরাই আবার দেখেছি সবচেয়ে বেশি ভরসা করেন মমতার উপরই। কারণ, এঁরা সকলেই জানেন, মমতা যা বলছেন, বা যা করছেন তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন বলেই বলছেন বা করছেন। এবং সকলে যা ভাবছে বা করছে তিনি তার উল্টোদিক থেকেই যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করেন। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য যেমন অনেকে মমতাকেই খোঁজেন তেমনই অগতির গতিও মমতা। পালছেঁড়া হালভাঙা নৌকাতেও গতি আনতে পারেন তিনি।

কয়েকটা ঘটনার কথা তুলে ধরে তিনি বললেন, এই যে ধরুন না প্রণববাবুর রাষ্ট্রপতি হওয়া নিয়ে যে কাণ্ডটা ঘটল তাতে সবাই মমতাকেই দোষের ভাগী করল। কিন্তু মমতা কি জানতেন না, মুলায়মের চরিত্র কী? মমতা কি জানতেন না, হাতে সুযোগ এসে গেলে সেটা ভাঙিয়েই মনমোহন-সোনিয়াদের ব্ল্যাকমেল করতে পারেন মুলায়ম? তবু মমতা বিশ্বাস করেছিলেন মুলায়ম সিংকে। কেন? ধরেই নিয়েছিলেন এটা হবে না। যথারীতি মুলায়ম সিং যাদব তাঁর প্রস্তাব (অপ)ব্যবহার করবেন। তা সত্ত্বেও কেন তিনি এটা করলেন? কারণ, মমতা জানতেন মুলায়ম যাই করুন না কেন তা নিয়ে তোলপাড় পড়ে যাবে জাতীয় রাজনীতিতে। হলও তাই। অনেকেই বুঝতে পারেননি, সামান্য ১৯ জন সাংসদ নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় করে দেওয়ার ক্ষমতা যে তিনি রাখেন তা জানেন মমতা। নিজের ওপর মমতার অগাধ আস্থা।

কেন মমতার উপর ভরসা? কারণ, মমতা সকলের চেয়ে আলাদা। এই ব্যতিক্রমী চরিত্রের জন্য তিনি সকলের কাছ থেকে সমীহ আদায় করে নিয়েছেন। অন্য সবাই যেভাবে প্রশাসন চালান, তেমন নয়, দিল্লিতে মন্ত্রিত্বে থাকার সময় যেমন, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেও তেমনই। মমতা সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাবে তাঁর প্রশাসন চালাচ্ছেন। এই বিকল্প প্রশাসনের দিকেই নজর বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক শাসক দলগুলির। অন্য আঞ্চলিক দলের মুখ্যমন্ত্রীরা প্রায় একই ভাষায় কথা বলেন, একই ভঙ্গিতে আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁদের ভাবনা-চিন্তা একই খাতে বয়। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঠিক যেভাবে শিল্পপতিদের কাছে তাঁর রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্জি রাখেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতও সেই ভাষায় কথা বলেন। এ রাজ্যে যখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন রাজ্যের শিল্পপতিরা তাঁকে 'স্যর' বলে কথা বলতেন। মমতাকে কিন্তু বলেন দিদি। শিল্পপতিদের সম্মেলনে প্রত্যেক শিল্পপতিকে আলাদা আলাদাভাবে নাম ধরে ধরে কথা বলেন। হয়তো বা কেউ গান ভালবাসেন তাঁকে অবলীলায় বলে দিতে পারেন আপনি একটা গান শোনান তো। অবাক করা ব্যাপার। এবং এ ব্যাপারটা যে অনেকেরই পছন্দ হবে না তাও তিনি জানেন। কিন্তু তাতেও তাঁকে দমিয়ে রাখা যায় না। এমন ঘটনা তিনি প্রায়ই ঘটিয়ে থাকেন। এবং তা মেনে নিয়েও মুকেশ আম্বানিরা তাঁর দরজায় এসে কড়া নাড়েন।

দিল্লিতে ঘটনাচক্রে একদিন পটপড়গঞ্জ থেকে পার্লামেন্ট হাউসের দিকে আসছিলাম। সম্প্রতি। গাড়ি বিভ্রাট। অটোয় করে আসছিলাম। দিল্লিতে তখনই ভোটের হাওয়া উঠে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এসে গিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। নিম্নবর্গের লোকেরা এখন সবাই বলতে গেলে আম আদমি পার্টিরই সমর্থক। আপাতভাবে অন্তত তাই মনে হয়। বছর তিরিশের অটোচালক সুনীল বাধওয়ানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। চলতে চলতেই। সুনীলের ডাকনাম সানি। থাকে মঞ্জুটিলা এলাকায়। রাজনীতি সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর রাখে। শীলা দীক্ষিতের সরকার অনেক কাজ করেছে। সে সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই সানির। কিন্তু শীলা দীক্ষিতের সরকার যে দুর্নীতিবাজ সরকার সে সম্পর্কেও তার কোনও দ্বিমত নেই। কাম কিয়া হ্যায় বহোত, লেকিন করাপশন ভি বহোত। শীলার খাস আদমিরা অনেক টাকা করেছে। এই সরকার পুরোটাই খুব দুর্নীতিপরায়ণ। এবারের ভোটে যে সে আম আদমিকেই ভোট দেবে তাও বলতে দ্বিধা করেনি। সুনীল মুলায়ম-মায়াবতী সম্পর্কে খোঁজ রাখে। খোঁজ রাখে লালুপ্রসাদ-নীতীশ কুমার সম্পর্কেও। রাহুল গান্ধীকে একদম পছন্দ করে না। ভ্যাবলা মনে করে। ওর দ্বারা প্রাইম মিনিস্টার হওয়া হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কেও খোঁজ রাখে সানি। নাম শুনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, রেলমন্ত্রী থা। টিভি মে বহোত দেখতা হ্যায়। আভি পশ্চিমবঙ্গালের মুখ্যমন্ত্রী আছে। মালুম হোতা হ্যায় পরধানমন্ত্রী বনেঙ্গে।

পুনশ্চ : সানির কথা আবেগ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ওড়ানো যাচ্ছে না। এই লেখা ছাপতে যাওয়ার আগে একটা জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানা গেল, একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা সংস্থা সমীক্ষা করে দেখেছে, কংগ্রেস ও বিজেপি-র নেতৃত্বে সরকার গঠিত না হলে দেশের অধিকাংশ মানুষের পছন্দের প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাওড়া জিলা পরিষদ

১০, বিপ্লবী হরেণ ঘোষ সরনী ,হাওড়া-৭১১১০১
দূরভাষ-২৬৩৮-৪৬৩৩/৩৪

আসন্ন শারদীয়া উৎসব , দীপাবলী

ঈদ-উজ্জ-জোহায়

মা-মাটি-মানুষকে

আমাদের শুভেচ্ছা,

অভিনন্দন ও বিনম্র শ্রদ্ধা

অজয় ভট্টাচার্য্য
সহকারী সভাধিপতি
হাওড়া জেলা পরিষদ

করবী ধূল
সভাধিপতি
হাওড়া জেলা পরিষদ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
ঋষি বঙ্কিম সরণি, বারাসাত

ফোন নং (০৩৩) ২৫৮৪-৬৩৮৫ (০৩৩) ২৫৫২-৩২২৯

সে এক মহাপ্রলয়—তারপর এলো বহু প্রতীক্ষিত এক মাহেন্দ্রক্ষণ। যখন মানবিকতা বিপন্ন, সেই মুহূর্তে তিনি এলেন। নিজেকে উজাড় করে দিলেন বাংলার অশ্রুসিক্ত মানুষের জন্য আর আমাদের দিলেন সেই গুরুদায়ভার।

আমরাও বদ্ধপ্রতিজ্ঞ ১০০ দিনের কাজ, সুস্বাস্থ্য, সুশিক্ষা, পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নদীবাঁধ নির্মাণ, নারী উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্পে তাঁর দেখানো পথে আপামর জনসেবায় নিজেদের উৎসর্গীকৃত করব মা-মাটি-মানুষের জন্য।

জাগো বাংলার সকল পাঠক-পাঠিকাদের জানাই শুভ শারদীয়ার এবং পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা।

অভিনন্দন সহ

কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী সভাধিপতি
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
ফোন নং-৯৪৩৩৪৯৫০১৭

রহিমা মণ্ডল
সভাধিপতি
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
ফোন নং-৯৭৩৪৬৯৫২৫৯

নারায়ণ গোস্বামী
দলনেতা
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
ফোন নং-৯৭৩২৬৯৭৪৫৫

‘পঞ্চায়েত’ গ্রামীন মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতিষ্ঠান, একে ‘সুরক্ষিত’ রাখুন।

উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে

হুগলী জিলা পরিষদ

শুভ শারদীয়া, দীপাবলী ও ঈদুজ্জোহার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ :-

শ্রী সমীরণ মিত্র	শ্রীমতী চামেলী মুরমু	আল্‌হাজ সেখ মেহেবুব রহমান
দলনেতা	সহকারী সভাধিপতি হুগলী জিলা পরিষদ	সভাধিপতি হুগলী জিলা পরিষদ



প্রথম বাঙালি স্বভাবকবি

পাচু রায়

বাংলার ঘরে ঘরে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে পরিচিত এক নাম ‘খনা’। খনা আমাদের চলমান ‘শিক্ষিত’ ‘আধুনিক’ সমাজে এবং সরকারি হিসেবনিকেশে এখন ব্রাত্য। এর পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি আছে। আমরা সেই বিতর্কে ঢুকব না।

আমরা আজ তুলে ধরব খনা সম্পর্কে রচিত একটি গবেষণাধর্মী বই যা ‘গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল’ প্রকাশ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে। বইটির বিবর্ণ একটি কপি হঠাৎই আমার হাতে এসে পড়েছে।

খনা ও বরাহমিহির দুই অবিচ্ছেদ্য নাম। একজন নারী এবং কিংবদন্তি কবি। অন্যজন পুরুষ এবং অগ্রগণ্য গণিতবিদ। আমাদের আদি বাঙালি কবিদের মধ্যে খনা এক উজ্জ্বল নাম। খনার কাব্য বা ছড়া ‘খনার বচন’ নামেই সমধিক খ্যাত। তাঁর রচিত ছড়া থেকে বোঝা যায় তিনি শুধু কিংবদন্তি কবি নন, জ্যোতিষবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। খনা সম্পর্কে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। আর কাটবে বলে মনেও হয় না। ইংরেজ আমলের শেষদিকে যুদ্ধোত্তর পর্বে যখন ‘গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল’ দ্বারা অবিভক্ত বাংলা শাসিত,

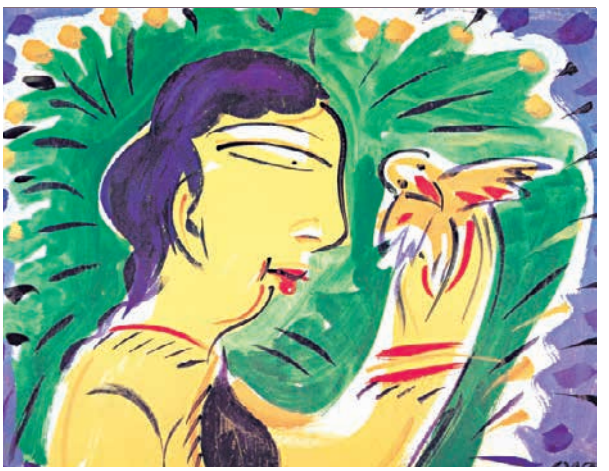

তখন তাঁর কৃষিভিত্তিক ১২২টি বচন বা ছড়ার এক সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন সরকারের 'উন্নয়ন বিভাগ' তদানীন্তন 'ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি মিস্টার এ ই পোর্টার সিআইই, আইসি, এস মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে...'। তদানীন্তন ডেভলপমেন্ট কমিশনার এস এম ইসহাকের ভূমিকা-সহ প্রকাশিত সঙ্কলনটির সঙ্কলক ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডেভলপমেন্ট কমিশনার রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। সেটি ছিল এক গবেষণাধর্মী কাজ। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র সঙ্কলিত পুস্তক 'খনার বচন'-এ খনাকে নিয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা নেই। খনার বচন নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা আছে। আর আছে সারা বছর বিভিন্ন সময়ে কোন কোন দ্রব্য চাষের পক্ষে উপযুক্ত সেই বিবরণ। এই পুস্তকটিকে ঘিরেই আমাদের এই রচনা। তবুও পাঠকের জ্ঞাতার্থে স্বভাবকবি খনা সম্পর্কে প্রাপ্য সঠিক বেঠিক কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ প্রয়োজন বোধ করি।

খনার জন্মস্থান ও জন্মকাল নিয়ে একাধিক মত আছে। একটি মত অনুযায়ী নবম থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খনা জন্মেছিলেন। এই মত অনুযায়ী বারাসতের দেউলি নামক স্থানে থাকতেন খনা। অন্য একটি মতানুযায়ী বাংলা-অসম সীমান্তে প্রাগজ্যোতিষপুর নামক স্থানে খনার জন্ম। অপর একটি মত দক্ষিণবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়ে বসবাস করতেন খনা ও তাঁর শ্বশুর বরাহমিহির ৫০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অনেকেই যেমন মনে করেন যে খনা ও বরাহমিহির উজ্জয়িন তথা বঙ্গভূমিতে বসবাস করতেন, তেমনই আবার আর একটি মতানুযায়ী খনা শ্রীলঙ্কায় জন্মগ্রহণ করেন ও গণিতবেত্তা জ্যোতিষবেত্তা বরাহমিহিরকে বিয়ে করেন। বরাহমিহির ছিলেন বিক্রমাদিত্যর সভার নবরত্নের এক রত্ন। ত্রিকোণমিতির বেশ কিছু সূত্র বরাহমিহিরের আবিষ্কার বলে কথিত। যেমন নিম্নলিখিত সূত্রটি $\sin \times = \cos(\pi/2 - \times)$ বরাহমিহিরের আবিষ্কার। বরাহমিহিরের 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা' আজও বিস্ময়ের। খনার গণনা বার বার এ-হেন পণ্ডিত বরাহমিহিরকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল বলে, বরাহমিহির (স্বামী বা শ্বশুর যাই হন না কেন) নিজে বা তাঁর ভাড়া করা লোক দিয়ে খনার জিভ কেটে নেন বলে কথিত। প্রথম বাঙালি নারী কবির জিভ কেটে নেয় দূরপনেয় পুরুষতন্ত্র। তাঁর বিস্ময়কর মেধা ও অসামান্য কল্পনাশক্তি ছিল তাঁর 'অপরাধ'। তবুও স্তব্ধ করা যায়নি খনাকে। আজ এত বছর পরেও শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বিহার, অসম ও ওড়িশার কিছু কিছু অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খনার বচন এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তাই বইটির ভূমিকায় ইসহাক সাহেব লিখছেন, 'খনার বচন'-এ বহুকালের অভিজ্ঞতালব্ধ কৃষি-জ্ঞানের চমৎকার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষির উন্নতির জন্য বাংলাদেশে এককালে 'খনার বচন'-এর বিশেষ প্রচলন ছিল। এই বচনের সারমর্ম অনুসারে কৃষিকাজ করিয়া হয়তো বা সেকালে কৃষির যথেষ্ট উপকারই হইয়াছিল। অতীতে বাংলাদেশের কৃষি যে উচ্চ ধরনের ছিল, তার অনেকটা আভাস ইতিহাসে পাওয়া যায়। হুমায়ুন বাদশাহ বাংলাদেশকে 'জিন্নাতাবাদ' বা 'স্বর্গরাজ্য' আখ্যা দিয়াছিলেন। 'আইনী আকবরী'-তেও বাংলাদেশকে 'Paradise of Provinces' বলা হইয়াছে। পুস্তকটি প্রকাশের যৌক্তিকতা বর্ণনায় তিনি লিখছেন, ''নিরক্ষর কৃষকেরা 'বচন' বা 'ছড়াকে' গুরুবাক্যের মতো অকাট্য মনে করিয়া এবং জানা বচনগুলিকে সাধ্যমতো পালন করিয়াও থাকে। যে কারণেই হউক 'খনার বচনগুলি' আজকাল প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডেভলপমেন্ট কমিশনার রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এই লুপ্তপ্রায় 'বচনগুলি'-র পুনরুদ্ধার ও সঙ্কলন করিয়া বাংলাদেশের ও তাহার কৃষির বিশেষ উপকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই।''

আঁটপুর (হুগলি)-এর তদানীন্তন বাসিন্দা লেখক দেবেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'নিবেদন'-এ ১৫ চৈত্র ১৩৫২-তে লিখছেন, 'পুস্তকের প্রত্যেক পাতায় প্রথম দিকে বচনগুলি এবং অপরদিকে উহাদের সহজ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। উহার নিম্নে 'মাসিক শস্য-বপন' অতি সাধারণভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, ইহা বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন দফায় শস্য বপন সম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় মাটি, জলবায়ু ইত্যাদি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার তারতম্য হইবে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের উদ্ভাবিত কতকগুলি উন্নত শ্রেণির আউশ ও আমন ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণও উহার পর লিপিবদ্ধ আছে।'

একটি উদাহরণেই বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে যদি পাঠক কিঞ্চিত মনোসংযোগ ঘটান। খনার বচন শুরু হচ্ছে একটি পাতায় এই ভাবে :

'১। মাঘ মাসে বর্ষে দেবা। / রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা।।
২। যদি বরে মাঘের শেষ। / ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।।
৩। যদি বরে ফাগুনে। / চিনা কাওন দ্বিগুণে।।
৪। চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি / চাষার ক্ষেতে শুভ দৃষ্টি।।
৫। মাঘের আদা ফাগুনের বাদা। / চৈতের কানি বৈশাখের ফেণী।'

প্রথমে 'বচন'-এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

১। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে রাজাকে আর প্রজাদের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, কারণ মাঘ মাসের বৃষ্টি ফসলের পক্ষে খুব উপকারী।

২। মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হইলে রাজা ধন্য হন এবং দেশ পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হয় অর্থাৎ দেশের কৃষিসম্পদ বাড়ে। ইহা রবি শস্যের পক্ষে উপকারী।

৩। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে চিনা ধান ও কাঙনী ধান দ্বিগুণ ফলে।

১। মাঘ মাসে বর্ষে দেবা। / রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা।।
২। যদি বরে মাঘের শেষ। / ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।।
৩। যদি বরে ফাগুনে। / চিনা কাওন দ্বিগুণে।।
৪। চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি / চাষার ক্ষেতে শুভ দৃষ্টি।।
৫। মাঘের আদা ফাগুনের বাদা। / চৈতের কানি বৈশাখের ফেণী।

৪। চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলে চাষের সুবিধা হয়; কৃষকের উপর ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি পড়ে অর্থাৎ কৃষক ক্ষেতের কাজ ভালভাবে করিতে পারে। এই সময় গ্রীষ্মকালের ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করিতে হয়।

৫। মাঘ মাসের শেষ ভাগে, ফাল্গুনে মাঝে মাঝে, চৈত্রে কণা কণা এবং বৈশাখে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইলে শস্যের ফলন যথেষ্ট হইয়া থাকে।'

এরপর ওই পৃষ্ঠাতেই মে মাসে অর্থাৎ 'বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি' মাসিক শস্য বপনের বিস্তারিত তালিকা রয়েছে পরবর্তী ছ'টি পাতা জুড়ে। সেখানে আউশ-আমন থেকে শুরু করে বেগুন-কুমড়ো-লাউ হয়ে গোলমরিচ, চিনাবাদাম, শসা, পাট, শন ইত্যাদি চুয়াল্লিশ রকমের কৃষিজ ফসল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই বইতে। এইভাবে মাসোয়ারি বিবরণ যোগ করলে প্রায় সাড়ে তিনশো রকম আইটেম সন্নিবেশিত রয়েছে এই বইতে। বিবরণগুলি কতটা বিশদ তা বোঝাতে আমরা একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরি।

'পান-দোআঁশ মাটিতে জন্মে; তিন ফিট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দু'ফিট অন্তর কাটিং বসাইতে হয়; আশ্বিন-অগ্রহায়ণ মাসে পান পাওয়া যায়, একর প্রতি ৩০০ কাটিং লাগে, একর প্রতি ৬০/৭০ কাহন পান হয়।'

সেই সঙ্গে এই বইতে আছে খনার আদলে রচিত খনার এই প্রয়োজনীয় সঙ্কলক দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের ১২টি এবং পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫টি কচুরিপানার ছড়া। 'নিবেদন'-এ সঙ্কলক পতিতপাবনকে 'উদীয়মান কথাশিল্পী' আখ্যা দিলেও, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বা পতিতপাবনবাবুর ছড়া সাহিত্যগুণে অন্তত দেড় হাজার বছর আগে রচিত 'খনার বচন'-এর ধারে কাছেও আসে না।

খনার জ্যোতিষ-চর্চা যদি বা আমাদের অপছন্দ হয় তাঁর বিজ্ঞান চেতনা আমাদের চমকে দিতে বাধ্য। জমির পুষ্টি বাড়াতে মান্দার গাছ রোপণের ব্যাপারটা এখন বহুজন গ্রাহ্য। এই বিষয়ে অন্তত দেড় হাজার বছর আগে খনা লিখছেন, "শোন রে বাপু চাষার পো। / সুপারি বাগে মান্দার রো। / মান্দার পাতা পড়লে গোড়ে। / ঝটপট তার ফল বাড়ে।' আবার মাটি কোন চাষের পক্ষে যথোপযুক্ত সেটা বলাও তো এক বিজ্ঞান। 'আউশের ভুঁই বেলে। / পাটের ভুঁই আঁঠালে।' অর্থাৎ আউশ ধানের জন্য লাগে



বেলে মাটি। পাটের জন্য এঁটেল মাটি। এই রকম আর একটি বচন হল : 'কচু বনে যদি ছড়াও ছাই। / খনা বলে তার সংখ্যা নাই।' বা 'লাউ গাছে মাছের জল। / ধেনো মাটিতে ধান প্রবল।'

বাংলার প্রথম নারী কবিকে নিয়ে এই কাজটি ইংরেজ আমলে সরকারি উদ্যোগে হয়েছিল এটা ভাবতেই এখন অবাক লাগে। বইটি শুধুমাত্র কৃষিকাজ নিয়ে মূল্যবান টিকাতে পরিপূর্ণ তাই নয়, এই পুস্তকে আঁকা ছবিগুলিও দুর্দান্ত। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, কোথাও কোনও চিত্রকরের নামোল্লেখ নেই।

৬৫/৭০ বছরের পুরনো বই মানে তেমন পুরনো নয়। কিন্তু এই বইটির পরম বৈশিষ্ট্য হল, এটি সরকারি আমলা রচিত, সরকারি আমলা অনুপ্রাণিত এবং সরকার দ্বারা প্রকাশিত। ইংরেজ সরকার। বইটি অবশ্যই এক আদর্শ সংগ্রহ। আমাদের দুই বাংলার সরকার যদি প্রথম বাঙালি স্বভাবকবি খনাকে নিয়ে গবেষণায় সামান্য মদত দেয় খুব একটা খারাপ হয় না।





সেই প্রথম মিডিয়ায় আত্মপ্রকাশ

প্রবীর ঘোষাল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও পাদপ্রদীপের আলোয় আসেননি। অর্থাৎ লোকসভায় নির্বাচিত হননি। ১৯৮২ সালের কথা। গরমকাল। একদিন রিপন স্ট্রিটের আইএনটিইউসি অফিসে গিয়ে প্রথম এক অগ্নিকন্যার সাক্ষাৎ পেলাম।

আমি তখন 'লোকসেবক' কাগজে কাজ করি। কাগজের প্রধান সম্পাদক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। আমার উপর দায়িত্ব পড়ল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সদর দফতরে রোজ যেতে হবে। খবর করতে হবে।

সেদিন দুপুরে আইএনটিইউসি অফিসের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ চোখ আটকে গেল, সিঁড়ির নিচের ঘরটিতে। একেবারে সাধারণ একটি মেয়ে ঘরোয়া সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। শ্রোতা আট-দশজন সমবয়সি তরুণী। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁরা বসে আছেন। ধর্মীয় প্রার্থনা সভার মতো। যে মেয়েটি বলছেন, তাঁর চেহারা থেকে পোশাক সবই সাদামাটা। কিন্তু গলায় অসম্ভব এক তেজ। বক্তৃতায় আগুন ঝরছে।

সিপিএমকে ঘায়েল করতে হলে নিজেদের কীভাবে সংগঠিত করতে হবে, সহকর্মীদের সেটাই বোঝাচ্ছেন।

আমি দাঁড়িয়ে শুনছি দেখে, ওই তরুণী বক্তৃতা থামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কাউকে খুঁজছেন? কিছু বলবেন? দু'টি প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, না। আপনার বক্তৃতা শুনছি। মুখে সলজ্জ হাসি। পরিচয় হল। নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি কালীঘাটে। আইএনটিইউসি'র মহিলা শাখার সম্পাদক পদে আছেন। নিজেই বললেন, দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেস করি।

আলাপ ক্রমশ জমে উঠল। অফিসে গেলেই দেখা হয়, কথা হয়। বলতে ভুলে গিয়েছি, প্রথমদিন তাঁর বক্তৃতা শুনে একটা খবর লিখেছিলাম, সেটা লোকসেবক কাগজে প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল। অর্থাৎ মমতার নাম দিয়েই হেডিংও ছিল। কোনও সন্দেহ নেই, আজকের মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রথম মিডিয়ায় আত্মপ্রকাশ।

কিছুদিন পর, মমতা একদিন তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে দুপুরবেলায় খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেই প্রথম টালির বাড়িতে গিয়ে রত্নগর্ভা এক নারীর পরিচয় নাই। গায়ত্রীদেবী। মমতার মা। স্নেহময়ী এই মহিলা যেন সকলেরই মা! শত সমস্যার মধ্যেও মুখে সদা হাসি। আমৃত্যু তাঁকে সেরকমই দেখেছি। কখনও বুঝতে দেননি, দিব্যি কষ্টের মধ্যে সংসার চালিয়েছেন, ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। সেদিন দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনে ভাত, ডাল, পোস্ত, মাছ, মাংস, ডিম সব ছিল। গায়ত্রীদেবী বলেছিলেন, আজ সব রান্না আমি করিনি, ডিম আর মুরগির মাংসটা মমতা রেঁধেছে।

১৯৮৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর মমতার দিল্লির ঠিকানা হল, নর্থ অ্যাভিনিউ। একটা দোতলা ফ্ল্যাটে। এমপি'দের কোয়ার্টার। বর্তমান কাগজের দিল্লির অফিসও ছিল পরেই, রেফবগঞ্জ গুরুদোয়ারা রোডে। দিল্লিতে পোস্টিং হলাম। যেখানে অফিস, সেখানেই থাকি। আসলে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম নেতা এবং তৎকালীন এমপি চিত্ত বসু আমাদের কাগজকে একটা ঘর ব্যবহার করার জন্য দিয়েছিলেন। সেই ঘরে দিনে অফিস, রাতে ক্যাম্প খাট পেতে শোয়া।

লোকসভার অধিবেশন চললেই আমাদের পোয়াবারো। কারণ, মমতা এসে থাকবেন। ওঁর ফ্ল্যাটে ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া হবে। আসলে চিত্তবাবুর বাংলোয় নিরামিষ খাবার ব্যবস্থা ছিল। মমতার তখন প্রধান সঙ্গী কৃষ্ণা দত্ত। বেহালার মেয়ে। এখন তৃণমূলের বিশিষ্ট নেতা সমীর (বুয়া) চক্রবর্তীর স্ত্রী এবং সল্টলেক পুরসভার চেয়ারপার্সন। মমতা হাতে করে কৃষ্ণাকে তখন নিত্যনতুন রান্না শেখাচ্ছেন। মুরগির মাংস থেকে চিংড়িমাছ।

দিল্লির গোলমার্কেট থেকে আমরা বাজার করতাম। আমাদের দিল্লির গাইড তখন রতন মুখোপাধ্যায়, মমতার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের এক নিঃশব্দ সঙ্গী। খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ এই রতনবাবু। তিনি আবার ভাল মাছ পেলে, মাঝেমধ্যে চিত্তরঞ্জন পার্ক থেকেও কিনে আসতেন।

মূলত শনিবার মমতার ফ্ল্যাটে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হত। সকাল থেকেই চলত তোড়জোড়। এদিকে আমায় তখন বর্তমান গোষ্ঠীর প্রধান সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত পরামর্শ দিয়েছেন, মমতার সঙ্গে লেগে থাকো, ও বিরাট নেত্রী হবে! ১৯৮৯ সালে যাদবপুর কেন্দ্রে সিপিএম বল্গাহীন রিগিং এবং সন্ত্রাস চালিয়ে লোকসভা নির্বাচনে মমতাকে হারিয়ে দেয়। বরুণবাবু লিখেছিলেন, মমতাকে এভাবে ফিনিশ করা যাবে না!

যে কথা হচ্ছিল, খাওয়া-দাওয়া। মমতার হাতের রান্না যাঁর খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে, তিনিই জানেন, কী অসম্ভব পারদর্শী এই মহিলা। পোস্ত থেকে মাছ, মাংস, এমনকী কোনও কোনওদিন আলুর দম রান্না করেও মাতিয়ে দিতেন। মজার বিষয় হচ্ছে, বরাবর দেখছি, মমতা নিজে কিন্তু স্বল্পাহারী! আমাদের মধ্যে বসে বহুবার খাওয়া-দাওয়া করেছেন। কিন্তু একেবারে মেপে, সেই রুচি আজও একই আছে।

১৫ বছর আগের কথা। রাজ্যে তখন পঞ্চায়েত নির্বাচন। উত্তরবঙ্গের প্রচার সেরে প্রথমে মিরিক, পরে দার্জিলিং। দু'দিনের সফর। মমতার সদলবলে সেই প্রথম পাহাড় দর্শন। মিরিকের কটেজ থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন সোজা হেঁশেলে। নেপালি মহিলা রান্না করছিলেন। মমতাকে সামনে দেখে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, তাঁকে অবশ্য সামলে দিলেন মমতাই। নাম জিজ্ঞেস করে, হাত থেকে খুন্তিটা নিয়ে নিজেই রান্নায় মন দিলেন। চিলি চিকেন জাতীয় একটা কী যেন বানিয়েছিলেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী নয়না, সোনালি গুহ সেবার সকলে মিলে সেই খাবার উপভোগ করেছিলাম। আর নেপালি মহিলাটি বলেছিলেন, দিদি, আমাকে একটা নতুন রান্না শিখিয়ে গেলেন!

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মমতা দু'দিনের সফরে পশ্চিম এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় গিয়েছিলেন। শীতকাল। তার উপর নিম্নচাপ। কলকাতা থেকে সকালে বেরোলাম। রাস্তায় বৃষ্টি। সোজা ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ি। তখন অবশ্য আকাশ ধরে গিয়েছে। বিকেলে মুড়ি-তেলেভাজা খাওয়া হবে। রান্নার লোকজনরা দিদির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তাদের আলুর দম বানাতে বললেন মমতা। রেসিপিও বুঝিয়ে দিলেন। বর্ষার বিকেলে সেই চপ আর মুড়ি যে সকলের কী ভাল লেগেছিল, বলে বোঝানো যাবে না। মমতা সাধারণ খাবারকে রেসিপির গুণে অসাধারণ করে দিতে পারেন। তবে ঝাড়গ্রামের রাজবাড়িতে আমরা গোগ্রাসে চপগুলি হজম করলেও, মুখ্যমন্ত্রী নিজে কিন্তু আধখানার বেশি খাননি।



এই পুজোতে ফুলমাসিমা নেই

বিশ্বজিৎ সিংহ

শ্রীচরণেষু,

শরৎকালে আপনার কথা বেশি বেশি করে মনে পড়ে।

আসলে ভাদ্র মাস পড়লেই কাশফুলের আবির্ভাব, চারদিকে একটা পুজো পুজো গন্ধ। আর আপনি কোনওবার ফোনে, কখনও চিঠিতে কিংবা সাক্ষাতে গাওনা শুরু করেন, "এবার পুজোতে তোরা সবাই মিলে পাঁচথুপি আয়।"

রাঢ় বাংলার আদ্দিকালের এক বর্ধিষ্ণু জনপদ পাঁচথুপি। ডাকবিভাগের মানচিত্রে জেলা মুর্শিদাবাদ.. মহকুমা কান্দি.. থানা বড়ঞা। বিশাল গ্রামে এক প্রান্তের নাম বারকোণা। রয়েছে স্তূপ। পণ্ডিতকুলের ব্যাখ্যা, আদিকালে ছিল বৌদ্ধবিহার। ময়ূরাক্ষী নদীর কিনারে প্রাণবন্ত এই সবুজ জনবসতি নিয়েই অনন্য তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন হরিসাধন দাশগুপ্ত।

এই পাঁচথুপি আপনার বাপের বাড়ি। আমার মায়েরা পাঁচ বোন। ক্রমানুসারে আপনি চতুর্থ। রক্তের টানেই আপনি আমার ফুলমাসিমা। আমার মাকে নিয়ে একটা মহাভারত রচনা করা যায়। অনেক লেখা যায় মায়ের দিদি ও অপর দুই বোনকে নিয়েও। তবু দেখুন, অন্য সবাইকে ছেড়ে আপনাকেই চিঠি লিখতে বসেছি আমি। তবে বলে রাখছি, চিঠিটি লিখছি শুধু আপনাকে। অন্য কারও পাঠের জন্য নয়।

বাবা আপনার কলকাতার উকিল। কাকা ডাক্তার। আর মামা অধ্যাপক। অথচ আপনি গ্রামের পাঠশালার গণ্ডি পেরিয়ে স্কুলে ছিলেন অল্পদিন। পুরনো বনেদি বাড়ির রক্ষণশীলতা আপনাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। আপনার মেয়েবেলা আমি দেখিনি। দেখার কথাও নয়। মায়ের কাছে শুনেছি, বাড়িতে পড়াশোনায় ছেদ টানেননি আপনি। অসীম নিষ্ঠা, অসাধারণ ধৈর্য আপনার। রবি ঠাকুর হয়ে ওঠেননি ঠিকই, কিন্তু পরে পদে পদে অনুভব করেছি আপনার জ্ঞানের গভীরতা।

ফুলমাসিমা,

বাবা মারা যাওয়ায় মাত্র ১৬ বছর বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে আপনাকে। সংসার করতে গিয়েছেন ভাগলপুর। কিছু পরে প্রয়োজনের টানে ফুলমেসোমশাই চাকরি করতে পাড়ি দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের অজ কোলিয়ারি এলাকা কুরাশিয়ায়। আপনার কোলে তিন সন্তান। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তুলতে ফিরে এসেছেন বাপের বাড়ি, পাঁচথুপি।

বাড়ি অভিজাত হোক বা খোলামেলা পরিবেশ থাক, কোনওকালেই কারও বিয়ের পর বাপের বাড়ি বাস মনের মতো হয় না। হতে পারে না। আপনার বেলাতেও হয়নি। ছেলেবেলায় মামারবাড়ি বেড়াতে এসে নানা ঘটনায় আপনার চাপা বেদনা চোখ এড়িয়ে যায়নি। আপনার ছোট ছেলে পোলিও রোগের কারণে হয়ে পড়েছিল কিছুটা প্রতিবন্ধী। তাকে সুস্থ করে তুলতে, স্বাভাবিক রাখতে আপনার দীর্ঘ ৫০ বছরের লড়াই এক দৃষ্টান্ত। জানলে দেশের রাষ্ট্রপতি আপনাকে নিশ্চয় সম্মানিত করতেন।

ফুলমাসিমা,

বিধবা মায়ের অঢেল জমি, পুকুর, বাগান এবং সংসারের নানা দিক সামলে আপনি বিকেলে পাড়ার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসতেন আবৃত্তি শেখাতে। শিক্ষার্থী হওয়ার আগ্রহ ছিল না, কিন্তু শ্রোতা হিসাবে আজও কানে বাজে সেই স্পষ্ট উচ্চারণ, উদাত্ত স্বর— 'হও ধরমেতে ধীর...'। নিত্যদিনের শত মানসিক কষ্টের মধ্যেও এভাবে আনন্দ খুঁজে নিতেন কী করে?

শুনতে মন্দ লাগবে, তবু বলি। সম্পন্ন ও উদার পারিবারিক পরিমণ্ডল হলেও আপনার বাপের বাড়িতে বাস ওই আধুনিকমনস্ক গ্রামের চোখে ছিল কার্যত অবহেলার বস্তু। অর্থাৎ সবাই আপনার ও আপনার ছেলেদের একরকম গার্জেন। সন্তানদের নামে অহরহ নালিশ করা হয়ে উঠেছিল প্রতিবেশী ও পরিচিতদের অভ্যাস। কিন্তু আপনাকে দেখে সেদিনই শিক্ষা নিয়েছিলাম, অপরের ক্রমাগত অভিযোগে কান দিতে নেই।

বছরে একবারই, পুজোর সময় কয়েকদিনের ছুটিতে শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে আসতেন ফুলমেসোমশাই। সেসময় আপনাকে দেখতাম হিমানি স্নো, হিমালয়া পাউডার বেশি বেশি করে মাখতেন। কপালে গোল বড় লাল টিপ। আপনাকে উজ্জ্বল লাগত। আপনার জন্য নানা রঙিন শাড়ি আনতেন মেসোমশাই। আপনার একটাও পছন্দ হত না। আপনি ছেলেমানুষির সুরে বলতেন, "এই বয়সে কি ওই রংচঙে শাড়ি মানায়? সাদা খোলের শাড়ি আমার পছন্দ।" এখন বুঝি, সেসময় আপনার জমে থাকা অসংখ্য অভিমান ক্ষোভ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ত।

ফুলমাসিমা,

আপনার কাহিনি অভিনব কিছু নয়। বাংলার অসংখ্য পরিবারে কুড়ি-তিরিশ বছর আগেও অহরহ এরকম ঘটত। কিন্তু আপনি আমার কাছে একটু আলাদা। একটু অন্যরকম। ভিন্ন কারণে। কিশোর বয়সের দু'টো ঘটনা আমার মনে আজও গেঁথে। দু'টোই পুরোপুরি একান্ত। মনে পড়ে, একবার, তখন আমি ইলেভেনে পড়ি। রায়সাহেবের ছেলে হলেও বাবা তখন পড়ন্ত জমিদার বাড়ির বংশধর। চোখের অপারেশনের জন্য কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে সঙ্কটজনক অবস্থায় ভর্তি। আমাকে পাঠানো হয়েছিল ফুলমাসিমার কাছে পাঁচথুপিতে। সেদিন টের পেয়েছিলাম, বিপন্নের মাথায় চড়তে চায় অনেকে। আশ্রিত ভেবে সেদিন এক মামিমাকে দেখেছিলাম অহেতুক 'গার্জেনগিরি' ফলাতে। আপনি অবশ্য সেদিনের তরুণটিকে আগলে রেখেছিলেন পরম যত্নে ও সসম্মানে। আরও একবার। তখন আমি কলেজ ছাত্র। বিতর্কসভায় নিয়মিত অংশ নিতাম। তথ্যের প্রয়োজনেই গ্রাহক হয়েছিলাম দেশ পত্রিকার সঙ্গে দেশব্রতীরও। 'অতি সক্রিয়' পুলিশ প্রশাসনের চোখে নকশাল বলে চিহ্নিত হয়ে পড়ায় লুকিয়ে চলে আসতে হয়েছিল আপনার কাছে। সেই অজ্ঞাতবাসের দিনগুলিতে আপনার মমত্ব আমাকে ভরসা জুগিয়েছিল। বাবার মৃত্যুর সময় বাইরে ছিলাম আমি ও দুই দাদা। সেসময় অসহায় মেজদি'র কাছে সবার আগে পৌঁছে গিয়েছিলেন আপনিই।

ফুলমাসিমা,

দীর্ঘ জীবনে আপনাকে ঘিরে এরকম অজস্র টুকরো হিরে জহরতের মতো মধুর অভিজ্ঞতা আমার। একটা চিঠির মধ্যে তার সবটা কুলোয় না। তবে এই সেদিনের কথা বলি। ৭৯ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে আপনার। হাত ভাঙার জন্য কিছুটা পঙ্গু, শ্বাস নিতে কষ্ট, বুকে মাঝেসাঝে চাগিয়ে ওঠে ব্যথা। তবু, নিত্যসকালে পড়া চাই—'সংবাদ প্রতিদিন'। ফোনে বলছেন, "দারুণ লিখেছে জয় গোস্বামী। ঋতুপর্ণর লেখা মন ছুঁয়ে গেল।" বলছেন, "তোর লেখা পড়ে, টিভিতে তোর কথা শুনে বুক ভরে যাচ্ছে।" আর আপনি নিজে? এই বয়সেও কাঁপা কাঁপা হাতে আপনি লিখছেন, আমার মেয়ের বিয়ের কবিতা!

ফুলমাসিমা,

আপনাতে মুগ্ধ আমি। তবু বলি, আপনার উপর টাটকা একটা গভীর অনুযোগও জন্মেছে। এবারও ভাদ্র মাস পেরিয়ে গেল। চলে এল আশ্বিনও। দুর্গা প্রতিমায় রং পড়েছে, কাশ ফুল ফুটেছে, চারদিক জুড়ে পুজো পুজো গন্ধ। কিন্তু কই, এবার তো আপনার সেই ডাক পেলাম না—"এবার পুজোতে তোরা সবাই মিলে পাঁচথুপি আয়।"

পুজোর ঠিক ২২৫ দিন আগে চিরকালের জন্য চলে গিয়ে আপনি কিন্তু মোটেই ঠিক করেননি।

প্রণাম। ইতি—

অলঙ্করণ : শান্তনু দে

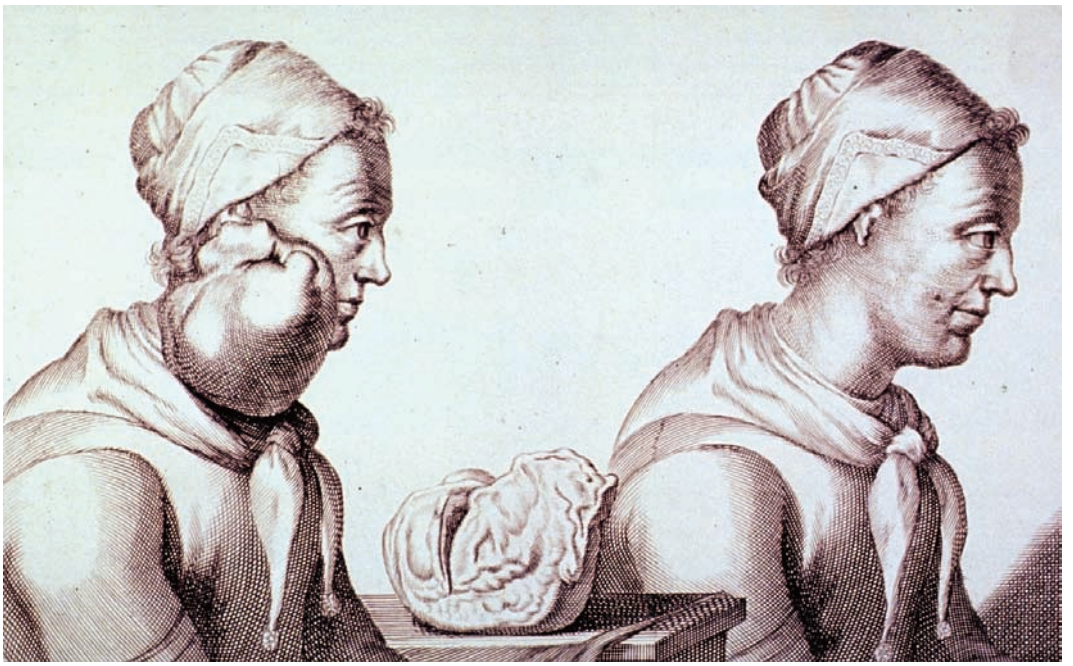

ম্যালিগন্যান্ট টিউমার

ডাঃ শান্তনু সেন

এমন অনেক গুরুতর অসুখ আছে যেগুলির আক্রমণ ধীর গতি হয়। সেইসব রোগের উপসর্গগুলিও সাধারণ বলে রোগের স্বরূপও বোঝা যায় না। ফলে দীর্ঘদিন উপেক্ষিত থাকে। একসময় গিয়ে সেই অসুখ এতটাই ভয়ঙ্কর হয় যে তাকে নিয়ে মরণ বাঁচনের লড়াই শুরু হয়।

এমনই এক অসুখ টিউমার। আর টিউমার বিষয়ক তত্ত্বটাই হল অনকোলজির বিষয়বস্তু। অনকোলজি বা Oncology এই ইংরেজি শব্দটি সৃষ্টি Oncos, Logos এই দু'টি শব্দের সমন্বয়ে। Oncos অর্থাৎ কলা বা টিউমার। Logos অর্থ বিশেষ জ্ঞান বা তত্ত্ব। টিউমার কখন ম্যালিগন্যান্ট বা ক্যানসারে পরিণত হল, তা জানার আগে দরকার টিউমারের বিষয়ে জেনে নেওয়া। টিউমারকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয় Swelling দেহকোষের অস্বাভাবিক অনিয়ন্ত্রিত, স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধিকেই টিউমার বলে।

এটি এমন একটি ব্যাধি যা সমস্ত প্রকার জৈব পদার্থকেই আক্রমণ করতে পারে। প্রকৃতি ও বৃদ্ধির হার অনুযায়ী টিউমার দু'ধরনের—বিনাইন ও ম্যালিগন্যান্ট। বিনাইন হল সাধারণ টিউমার। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হল ক্যানসার। ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের আবার দু'টো ভাগ। কারসিনোমা-আচ্ছাদক বা আবরণী কলার টিউমার। তবে, কারসিনোমা যা সারকোমা সব ধরনের

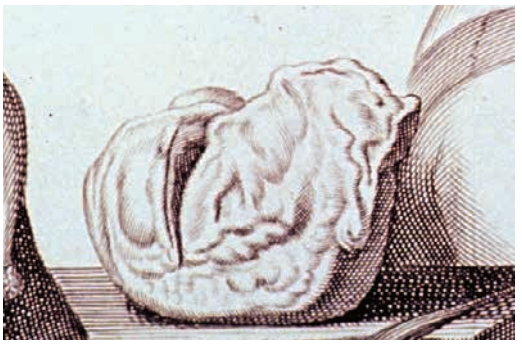

ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকে বলা হয় ক্যানসার। তাই আমাদের মনে রাখা দরকার, কোনও কোনও বিনাইন টিউমারও ভবিষ্যতে ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে পরিণত হতে পারে। তাই শরীরের যে কোনও টিউমারই প্রাথমিক অবস্থাতেই অপারেশন করিয়ে নেওয়া জরুরি। কারণ টিউমার এক জায়গায় স্থির থাকে না। বংশবৃদ্ধি হতে হতে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহের বিভিন্ন অংশে।

টিউমার কোষ কীভাবে বিস্তার করে

সরাসরি অনুপ্রবেশ : বিভিন্ন কোষের মধ্যবর্তী ফাঁকফোকর দিয়ে টিউমার কোষ পার্শ্ববর্তী সুস্থ কোষগুলিকে আক্রমণ করে ধীরে ধীরে গড়ে তোলে টিউমার কলোনি।

লসিকার মাধ্যমে বিস্তার : মানব শরীরে অসংখ্য লসিকাগ্রন্থি বা লসিকা নালি ছড়িয়ে থাকে। এদের মাধ্যমে টিউমার কোষ, বিশেষ করে কার্সিনোমা এবং ম্যালিগন্যান্ট মেলোনোমা সহজে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও টিউমার অপারেশন করার সময় অপারেশনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির খোঁচাখুঁচির ফলে লিম্ফনোড বা লসিকাগ্রন্থির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

রক্তের মাধ্যমে বিস্তার : রক্তের মাধ্যমে ভয়ঙ্করভাবে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়তে পারে। সারকোমা এবং কার্সিনোমাও ছড়িয়ে পড়ে এইভাবে। সাধারণ রক্তশিরার মাধ্যমে ক্যানসার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে লিভার ও ফুসফুসে। সাধারণভাবেও টিউমার বিস্তার হয়।

স্টমাকে কার্সিনোমা হলেও ডিওডিনাম ও ইনটেসটাইনেও টিউমার হয়।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হওয়ার কারণ

বংশগত : বেশ কিছু ক্যানসারের পিছনে বংশগত প্রভাব থাকে। যেমন—শিশুদের রেটিনো ব্লোসটোমা ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে বংশগত। তা ছাড়া পরিসোমিমা কোলাই, জেরেডার্মা পিগমেনটোসাও বংশগত অস্বাভাবিকতা। কোলোনি ও স্কিন ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

নেশা : একথা অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে, আমাদের জীবনধারার পদ্ধতি আমাদের জটিল অসুখের জন্য দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে সে দেশের মোট ক্যানসার রোগীর ৩০ শতাংশের কারণ হয়েছে ধূমপানসহ তামাক জাতীয় দ্রব্যের নেশা। আর কমপক্ষে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যানসারের মৃত্যুর কারণ হল ধূমপান, জর্দা, দোক্তা, খৈনি, গুড়াখু, পান ইত্যাদি।

কেমিক্যালের সংস্পর্শ : বেশ কিছু কেমিক্যাল বা রাসায়নিক যৌগ আছে যার সংস্পর্শে ক্যানসার হতে পারে। যেমন—পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন, আর্সেনিক অ্যাসবেসটস। বেঞ্জিন, অ্যারোমেটিক অ্যামাইন, আজোডাই, নাইট্রোস অ্যামাইন প্রভৃতি যৌগ ক্যানসার সৃষ্টিতে সক্ষম। হয়তো, পেশার খাতিরে অনেককেই এসব কেমিক্যালের সংস্পর্শে আসতে হয়। তাই আপনিও যদি কেমিক্যালের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

আরোনাইজিং রেডিয়েশন : সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রে, এক্সরে, রেডিও নিউক্লাইভ ইত্যাদি রশ্মির মাধ্যমে ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে। হাইভোল্টেজ ইলেকট্রিক লাইনে কর্মরত মানুষদের ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এমনকী, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে যে সব শিশুর বসবাস তাদের মধ্যে লিউকোমিয়ার সম্ভাবনার কথাও জানা গিয়েছে। টিউমার ম্যালিগন্যান্ট কি না তার উপসর্গভিত্তিক ৭টি মারাত্মক লক্ষণের উপর জোর দিয়েছে আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি, যেমন—

- তিল বা আঁচিলের পরিবর্তন,
- শরীরের যে কোনও অংশে, বিশেষত স্তনে কোষ কলা বা পুঁটুলি।
- মুখে, চামড়ায় বা শরীরের যে কোনও অংশে কোনও ঘা, যা সারছে না।
- দেহের কোনও অংশ থেকে অকারণে রক্তপাত
- দীর্ঘস্থায়ী খুসখুসে কাশি
- অজীর্ণ, খাবার খেতে বা গিলতে কষ্টবোধ,
- হঠাৎ করে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন। —এইসব লক্ষণগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকলে, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকে প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করার জন্য দরকার নিয়মিত পরীক্ষা করা অর্থাৎ কুড়ি বছরের পর সমস্ত মেয়েরই ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার ৫ দিন পর স্তন পরীক্ষা করা দরকার। যাঁরা সরাসরি সূর্যের আলোয় অনেকটা সময় ব্যয় করেন, তাদের খুঁটিয়ে দেখা উচিত শরীরের কোনও তিল বা আঁচিলের পরিবর্তন হচ্ছে কি না, নতুন করে তিল বা আঁচিল হচ্ছে কি না কিংবা আঁশের মতো কোন দাগ দেখা যাচ্ছে কি না। এরকম কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা দিলেই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়লে অপারেশন সম্ভব এবং জীবনরক্ষা করা সহজসাধ্য হয়। তবে চিন্তার বিষয় হল, এই ধরনের রোগীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেরিতে বুঝতে পারেন। তখন চিকিৎসকের পক্ষে টিউমারকে অপসারিত করে রোগীকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বিশেষত, ত্বক ক্যানসার কোষ রক্তপ্রবাহের দ্বারা বিস্তার পায়, স্তন ও জরায়ুর টিউমার, পুরুষ বা মহিলাদের ত্বক, অন্ননালী, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, মূত্রস্থলীতে যে সমস্ত টিউমার দেখা দেয় তার বেশিরভাগটাই ম্যালিগন্যান্ট। ক্যানসার চিকিৎসায় সার্জারি, রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি করা হয়। টিউমার যদি দেহের বিশেষত কোথাও ছড়িয়ে না পড়ে, তাই সার্জারি করা হয়। কিন্তু, চিউমারের বিস্তার পরিধি বেড়ে গেলে কেমোথেরাপি করা হয় ক্যানসার প্রতিরোধ করার জন্য। হরমোন ঘটিত ক্যানসারের ক্ষেত্রে হরমোন থেরাপি করা হয়। যেমন— স্তন ক্যানসার, থাইরয়েড ক্যানসার, প্রোস্টেট ক্যানসার ইত্যাদি। মোট কথা টিউমার চিকিৎসায় যা কিছু পদ্ধতি আজ তা প্রয়োগ করা হয়।

তবে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে রোগীর মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব করা ছাড়া চিকিৎসকের বিশেষ কিছু করার থাকে না।



স্বাস্থ্যের হাল হকিকত

ডাঃ সুব্রত মৈত্র

চৈত্র মাসের দুপুরবেলা। আমাদের গাড়িটা দ্রুতগতিতে চলেছে স্টেট হাইওয়ে দিয়ে পুরুলিয়ার দিকে। আমরা কয়েকজন ডাক্তার গ্রামবাংলার দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চলেছি। লালমাটি কিছুটা রুক্ষ হলেও প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার মতো চারিদিকে পলাশ, শিমুল কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ।

বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত ছুটছি। উদ্দেশ্য বাংলার সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে আবার কীভাবে উজ্জীবিত করা যায় তার একটা রূপরেখা দেওয়া। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি স্বাস্থ্য দফতরটাও দেখছেন, মন্ত্রিসভা গঠনের কয়েক মাসে পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে আমার উপর এই গুরুদায়িত্বভার দিয়েছেন। উনি চান বাংলার স্বাস্থ্যব্যবস্থার খোল-নলচে পাল্টে দিতে, একটা মানবিক মুখ নিয়ে পরিষেবা দিতে তাই এই সিদ্ধান্ত। কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। প্রথমে খুব ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না। ঠিক করলাম কিছু সমাদর্শী ডাক্তার ও সমাজকর্মীকে নিয়ে একটা team গঠন করব এবং প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সমীক্ষা করব। যাকে বলে stock taking এবং সেই



এই তো সেদিন জঙ্গলমহল যাওয়া হয়েছিল বাঁকুড়ার রানিবাঁধ থেকে শিলড়া হয়ে বেলপাহাড়ি— মনোরম দৃশ্য-সুন্দর রাস্তা। মাঝে মাঝে সুদূর বিস্তৃত শালবন। শিলড়া আসতেই মনটা কেমন আঁতকে উঠল...

সূত্রেই এই পরিদর্শন। কলকাতার কাজ প্রাথমিকভাবে শেষ এবার প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের (Primary and Secondary) হাসপাতালগুলি পর্যবেক্ষণ করা। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াতের সুবাদে মনে মনে ভয় পেতাম যে আমাদের এই যাতায়াতটা আদৌ সুখকর হবে না। কিন্তু ক্রমাগতভাবে ভুল ভাঙল যখন দেখলাম বাংলার বেশির ভাগ স্টেট হাইওয়ে এবং গ্রামীণ রাস্তাগুলির অবস্থা যথেষ্ট ভাল এবং আমাদের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কোনও অসুবিধা হয়নি এমনকী গ্রামীণ রাস্তার অবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় রাস্তা অতটা ভাল নয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ রাস্তা সারালে কী হবে এক বর্ষাতেই কুপোকাত। আমার মনে হয় রাস্তা সারাইয়ের (Contract) কন্ট্রাক্ট দেওয়ার সময় ন্যূনতম তিন থেকে পাঁচ বছরের Comprehensive maintainance contract দিলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। এইতো সেদিন জঙ্গলমহল যাওয়া হয়েছিল বাঁকুড়ার রানিবাঁধ থেকে শিলড়া হয়ে বেলপাহাড়ি- মনোরম দৃশ্য-সুন্দর রাস্তা-মাঝে মাঝে সুদূর বিস্তৃত শালবন। শিলড়া আসতেই মনটা কেমন আঁতকে উঠল-তারপরই বেলপাহাড়ি। একটু দ্বিধা-সঙ্কোচ নিয়েই মানুষজনের সঙ্গে কথা বললাম। হাসপাতাল পরিদর্শন করলাম। খুব ভাল লাগল। সহজ সরল মানুষ। এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক উন্নতিতে এবং শান্তি ফিরে আসাতে মানুষজন খুশি। তেমন কোনও বাড়তি চাহিদা নেই। দুরদূরান্ত থেকে আসছেন চিকিৎসা নিতে। চাহিদার তুলনায় জোগানের ঘাটতি আছে ঠিকই কিন্তু তার জন্য কোনও ক্ষোভ নেই। মুখ্যমন্ত্রী তো এইজন্যই আমাদের দায়িত্ব দিয়ে এইসব জায়গায় পাঠাচ্ছেন মানুষের অভাব অভিযোগ বোঝার জন্য। ডাক্তারবাবু স্থানীয় মানুষ সুতরাং তাঁর জন্য ওটা নির্বাসনের পোস্টিং নয়। তিনি উৎসাহ নিয়েই কাজ করছেন। দু-তিনজন মিলে হিমশিম খাচ্ছেন পরিস্থিতি সামাল দিতে। বেডের অপ্রতুলতায় রোগীদের অনেক ক্ষেত্রেই ফ্লোরিং করতে হচ্ছে। গড়ে ১২০ জন রোগীর রাউন্ড শেষ করতেই লাগছে ৪-৫ ঘণ্টা এবং তার পরে আউটডোর। পর্যাপ্ত নার্স ও টেকনিশিয়ানের অভাব। সর্বোপরি বাসস্থানের অবস্থাও ভাল নয়। বস্তুত এই চিত্রটাই আমরা দেখতে পেলাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। ডাক্তারের অভাব, নার্স সংখ্যায় কম, টেকনিশিয়ান নেই, প্রয়োজনের তুলনায় বেড অপ্রতুল। হাসপাতালের কনস্ট্রাকশনে অনেক সময় লাগছে PWD এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমাঝোতার অভাবে। আসলে হাসপাতালগুলিতে বেড সংখ্যা ও আনুপাতিক স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছিল সেই কয়েক যুগ আগে, তৎকালীন জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তারপর তো সেই সংখ্যার পুনর্মূল্যায়ন হয়নি। এখন খুবই দরকার সেই সংখ্যার পুনর্মূল্যায়নের এবং জনসংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত বেড ও মানবসম্পদ বাড়ানোর। Medical College গুলিতে আসনসংখ্যা বাড়ছে জেলায় জেলায় নতুন Medical College হচ্ছে। নতুন নতুন নার্সিং স্কুল হচ্ছে, নতুন নতুন প্যারামেডিক্যাল কোর্স চালু হচ্ছে, এগুলিতে সময় লাগবে। তাছাড়া এগুলি সফলভাবে করেও খুব লাভ হবে না যদি না মানবসম্পদ এলাকা অনুযায়ী সমবণ্টন হয়। ডাক্তারি পাস করার পর যদি Internship এর সময় বাধ্যতামূলক ৬ সপ্তাহ গ্রামে পাঠানো হয় তবে প্রচুর মানুষের উপকার হবে। বিশেষ করে কর্মরত ডাক্তারবাবুরা আরও ভালভাবে পরিষেবা দিতে পারবেন। ডাক্তারবাবুরাও এই স্বল্পকালীন Posting আনন্দ সহকারেই করবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা বাড়বে। তাছাড়া অল্প বয়সে সবার মধ্যেই একটা আদর্শ ও একটা Service দেওয়ার মনোভাব কাজ করে এবং বেশিরভাগ ডাক্তারই তা আনন্দের সঙ্গেই করবেন এবং তাঁদের সহকারী ও সহযোগী ডাক্তারের ভূমিকা দারুণভাবে সাহায্য করবে এই গ্রামীণ ব্লক হাসপাতালগুলিকে। একইভাবে Paramedical Course এ Internship এর মেয়াদ কিছুদিনের জন্য বৃদ্ধি করে Subdivisional ও জেলা হাসপাতালগুলিতে যদি দেওয়া যায় তবে সাময়িকভাবে কর্মীর অভাব কিছুটা হলেও মিটবে। কারণ অনেকক্ষেত্রেই দেখেছি Pathological test হচ্ছে না পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও। এই লোকবলের অভাবে Medical Collge গুলিতেও আউটডোরে লম্বা লাইন। Priclinical ও Paraclinical পড়ানোর ডাক্তারবাবুরাও (যারা প্রধানত শিক্ষক ও ডাক্তার ছাত্র তৈরি করেন) আজকাল আউটডোর-এ বসতে শুরু করেছেন তাতে কিছুটা হলেও আউটডোরের কাজের মান বাড়বে ও পরিষেবা আরও ভাল হবে। তাছাড়া আছে পর্যাপ্ত Nursing কর্মীর অভাব। বনগাঁ হাসপাতাল পরিদর্শন করার সময় আমরা একটু বিক্ষোভের মধ্যে পড়েছিলাম। কোনও এক রোগী শ্বাসকষ্ট নিয়ে এসেছেন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ১০০ কিমি দূরবর্তী R.G. Kar Hospital- এ কারণ এখানে কোনও Critical Care Unit নেই। আমি এও জানি যে প্রচণ্ড চাপে আক্রান্ত R.G Kar এ হয়তো এই রোগীর স্থান হবে না। 'Regret no bed vacant' এই তকমা নিয়ে রোগীটি ঘুরবেন সারা কলকাতায় এবং তারপরই কাগজের খবর হবে হাসপাতাল ভাঙচুর। সত্যিই জেলায় জেলায় আপৎকালীন অসুস্থতার জন্য কোনও Critical Care Unit নেই। জেলায় জেলায় একটা বা দুটো Critical Care Unit হলেই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার হাসপাতালগুলিতেও চাপ কমে। এছাড়া কলকাতার হাসপাতালগুলিতে যদি Emergency Observation Ward এর ব্যবস্থা করা যায় তবে Emergency রোগী ফেরত দেওয়ার প্রবণতাও কমে যাবে এবং তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর Zero Refusal Policy ও সফলভাবে রূপায়িত হবে। মালদহর সালামপুর ব্লক হাসপাতালেও একই ব্যাপার—আমরা উত্তেজিত জনতার সম্মুখীন। রোগীকে ডাক্তারবাবু দেখে ওষুধ লিখেছেন কিন্তু পেটে ব্যাথার ওষুধ হাসপাতাল ফার্মাসিতে নেই। এবং ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হবে। মনে হল সত্যি আমাদের Drug Budget বাড়ানো দরকার যা বর্তমান বাজেটে করা হয়েছে এবং জীবনদায়ী সাধারণ ওষুধগুলি হাসপাতাল থেকেই সরবরাহ করা একান্ত জরুরি। এটাও ঠিক সব ওষুধ বিনামূল্যে হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা কখনওই সম্ভব নয়। সেইসব ওষুধগুলি যদি গরিব মানুষরা অন্তত সস্তায় কিনতে পারেন তবে তাঁদের পকেটের সাশ্রয় হবে। আমরা ক'জন জানি যে প্রতিবছর ভারতের প্রায় ২৪% মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে চলে যান চিকিৎসা করাতে গিয়ে, তার বেশির ভাগটাই যায় ওষুধের

সত্যি আমাদের Drug Budget বাড়ানো দরকার যা বর্তমান বাজেটে করা হয়েছে এবং জীবনদায়ী সাধারণ ওষুধগুলি ও হাসপাতাল থেকেই সরবরাহ করা একান্ত জরুরি ।

পিছনে। Fair Price Shop গুলির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে এ ব্যাপারে। তাই বলে কি ওষুধের দোকানের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে? তা কখনওই হবে না কারণ এই ব্যবস্থা তো শুধু তাঁদেরই জন্য, যাঁদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ৯কোটি মানুষের বাংলায় তাদের খদ্দেরের কোনও অভাব হবে না, অথচ গরিব মানুষরা বেঁচে যাবেন। কোনও দেশই কিন্তু সম্পূর্ণ নিখরচায় চিরদিনের জন্য সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পারে না। প্রাথমিকভাবে সফল হলেও ভবিষ্যতে ভাঁড়ারে টান পড়বেই। যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি England-এর National Health Serviceএর ক্ষেত্রে। তাই গরিবদের জন্য নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি মধ্যবিত্তদের জন্য কিছু user charge এর ব্যবস্থা রাখার দরকার। এইক্ষেত্রে Insurence Policyগুলির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। Universal Insurence Schemeএবং RSVY (রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা) দরিদ্র মানুষের জন্য দুটি ভরতুকি দেওয়া সরকারি Insurence Policy। এই Policy গুলির ফলে যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোট ছোট বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি সুবিধা নিচ্ছে তেমন Subdivisional ও District হাসপাতালগুলিতেও চালু করা হচ্ছে এই Insurence ব্যবস্থা। রোগীরও যেমন সুবিধা তেমনি হাসপাতালেরও কিছু অর্থ উপার্জন হচ্ছে যেটা হাসপাতালেরই উন্নয়নে কাজে লাগবে। এই ব্যবস্থা সফল হলে, পরিষেবা আরও উন্নতমানের হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে হাসপাতালের Paying Bed গুলিকে সংস্কার করে মধ্যবিত্ত মানুষকে সরকারি পরিষেবার মধ্যে আনা যেতে পারে সরকারি Insurence Scheme অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে। নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের ছোটখাটো Insurence Scheme গুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই Corporate হাসপাতালগুলির খরচ জোগাতে পারে না। মনে রাখা দরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশে ৩০-৩৫ শতাংশ মানুষ পরিষেবা পাবেন এবং বাদবাকি মানুষকে সরকারি ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল হতে হবে। তাই প্রতিযোগিতা নয়, এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করতে হবে। একে অপরের পরিপন্থী নয়, পরিপূরক হয়েই কাজ করতে হবে। তাই মানুষের কল্যাণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হবে।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা নদিয়ার শেষ প্রান্তে উপস্থিত। পাশেই কাঁটাতারের বেড়া, ওপাশে বাংলাদেশ। তার ধারেই একটা ছোট গ্রামীণ Primary Health Centre (গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র) সুন্দর পরিবেশ। যেন একটা Picnic spot । ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। তরুণ যুবক এবং অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে কাজ করছেন। নিজের উদ্যোগে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের উন্নয়নে নেমে পড়েছেন। স্থানীয় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে উনি হাসপাতালের বাগান বানাচ্ছেন। রোগীদের বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন এবং গ্রামের মানুষরা নিজেদের অর্থেই সব করছেন। দেখে অবাক হলাম, সত্যিই এটা কি সম্ভব? কাগজে তো শুধু ডাক্তারদের বিরুদ্ধেই লেখা দেখি আর পড়ি জনসাধারণ সরকারি হাসপাতালের পরিষেবায় অখুশি। অথচ এখানে এসে এক সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি দেখলাম। একই জিনিস চোখে পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটা ছোট হাসপাতালে। সেখানেও এক নিচুতলার স্বাস্থ্যকর্মী পুরো হাসপাতাল সামলাচ্ছেন, বাড়তি কাজ করে, কর্মীর অভাব বুঝতেই দিচ্ছেন না। বুঝলাম এঁরা সব নীরব কর্মী। কাজের উৎসাহেই এঁরা কাজ করেন নীরবে, নিভৃতে। কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে নয়। এইরকম আরও বহু কর্মীর খবর কে রাখে? এদের জন্যই তো ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখনও চলছে। মনে হল এঁদের স্বীকৃতি দেওয়া দরকার শুধুমাত্র তাঁদেরই জন্য নয়, সমস্ত স্তরের কর্মীদের মধ্যে এই বার্তা দেওয়ার জন্য যে ভাল কাজের স্বীকৃতি আছে। এইরকমই এক অভিজ্ঞতা হল কলকাতার এক হাসপাতালে যেখানে একজন Radiologist মাসে ৭০০-৮০০টা আল্ট্রা সাউন্ড পরীক্ষা করছেন একা হাতে। মুড়ি মিছরির এক দর হলে সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কখনওই উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে না। সুতরাং দক্ষ, কর্মীকে স্বীকৃতি দেওয়াও একান্ত জরুরি। একইভাবে দেখেছি হাসপাতালের অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমি লক্ষ করেছি ওয়ার্ড মাস্টাররা এবং অনেক অস্থায়ী কর্মী (Contractrul Workers) তাঁদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত। স্বভাবতই এঁদের মধ্যে একটা হতাশা কাজ করছে। অথচ এঁরাই হাসপাতালের কর্মকাণ্ডের একটা স্তম্ভ। আমাদের মনে হল এদের যোগ্য স্বীকৃতি দরকার। কারণ যে কোনও প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল 'Happy workers.' শুধুমাত্র দক্ষ কর্মীকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বীকৃতি দেওয়া। ঘুরতে ঘুরতে আমরা পৌঁছলাম মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের একটা অত্যন্ত কর্মব্যস্ত District হাসপাতালে। ডাক্তারবাবুদের প্রচণ্ড কাজের চাপ। ডাক্তারবাবুরা একা একাই Operation করছেন কোনও Assistant ছাড়াই। এই চিত্রটা অবশ্য সব জেলা হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন Operation চলাকালীন। তাহলে কী হবে? আসলে দরকার আরও ডাক্তার এই জেলা ও Subdivisional হাসপাতালগুলিতে। কিন্তু বললেই তো আর ডাক্তার পাওয়া যাবে না। সদ্য Post Graduate করা (MD, MS অথবা DM, MCh) ডাক্তারবাবু যদি বাধ্যতামূলকভাবে এক বছরের জন্য জেলা হাসপাতালগুলিতে কাজ করেন তবে সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হবে। এটা কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ধরলে চলবে না কারণ এতে ডাক্তারবাবুদেরই লাভ বেশি কারণ চিকিৎসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এমন সুযোগ আর কোথায়। এছাড়াও Post Graduate স্তরের অনেক Course আছে যেমন MD র সমতুল্য DMB, যেগুলি District-এ চালু করলে অনেক স্নাতকস্তরের ডাক্তার পাওয়া যাবে জেলাস্তরে যাতে করে মানবসম্পদের সমস্যাটা কিছুটা হলেও মিটবে।

কোচবিহার জেলার একটা হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম একটা X-Ray Machine বহুদিন বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে। সেখানে কোনও Radiologist বা Technician নেই। একই জিনিস দেখেছি উত্তর ২৪ পরগনার একটা Block হাসপাতালে পরিকল্পনাবিহীন বিনিয়োগের জন্য। এছাড়াও প্রায়ই চোখে পড়ল Posting এর অসঙ্গতি। কোথাও Surgeon আছেন তো Anaesthesist নেই কোথাও বা উল্টো। দেখে মনে হল যদি পরিকল্পনা মাফিক post-

ঘুরতে ঘুরতে আমরা নদিয়ার শেষ প্রান্তে উপস্থিত। পাশেই কাঁটাতারের বেড়া, ওপাশে বাংলাদেশ। তার ধারেই একটা ছোট গ্রামীণ Primary Health Centre (গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র)। সুন্দর পরিবেশ।

ing দেওয়া যায় সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যেও পরিষেবা অনেক ভাল দেওয়া যাবে। একইভাবে পরিকল্পনামাফিক যন্ত্রপাতি কিনলে তার সার্থক ব্যবহার হবে। কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক রং নয় কাজের গুণগত মান ও উৎকর্ষতা দেখেই নিয়োগ করা উচিত। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নাগরিক পরিষেবা। তার অভাব আমরা অনুভব করলাম বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে। রোগীদের আত্মীয়দের জন্য রাত্রিআবাস, পানীয় জল সরবরাহ, রোগী সহায়তা কেন্দ্রগুলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সুখের বিষয় আমরা দেখলাম অনেক ক্ষেত্রেই এর সফল রূপায়ণ হচ্ছে বিভিন্ন জেলার হাসপাতালে। পর্যাপ্ত Security না থাকার জন্য প্রায়ই হাসপাতালে গোলমাল হচ্ছে। Security-র প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র দ্বিতীয় স্তর নয়, প্রাথমিক স্তরের হাসপাতালেও আছে সেটা আমরা উপলব্ধি করলাম। জেলা হাসপাতালগুলিতে আর একটা অভিনব সমস্যা চোখে পড়ল। মুমূর্ষু রোগীদের জন্য Special female attendant দরকার, তাতে কিছু দুঃস্থ মহিলার রুজির ব্যবস্থা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে জোর করে attendant রাখতে বাধ্য করা হয় যেটা একদমই অভিপ্রেত নয়। আসলে আমাদের মতো দেশে এটা একটা উভয় সঙ্কট। একদিকে রুজির তাগিদে অপরদিকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রোগীদের ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় সঙ্কোচন। আসলে দুটিরই দরকার আছে। এখানেই দরকার সামঞ্জস্যপূর্ণ Balancing act যার জন্য দরকার প্রশাসনিক দক্ষতা। তবে অনিচ্ছুক এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগীকে জোর করে attendant রাখতে বাধ্য করাটা কখনওই কাম্য নয়।

এবার আমরা এসেছি জলপাইগুড়ি জেলার একেবারে শেষ প্রান্তে নাগরাকাটা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে ভুটানের প্রান্তে পাহাড়ি রাস্তার দৃশ্যটা যদিও মনোরম, এখানে কিন্তু শারীরিকভাবে বিপদে পড়লে ভগবানই ভরসা। আশপাশে ডাক্তার নেই, Emergency হলে Block হাসপাতাল অনেক দূরে। তাছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থাও অপ্রতুল। Helth Care Worker রাই সম্বল বিপদে আপদে। বস্তুত কিছু কিছু শ্রেণির Helth Care Worker কে সরকারই দায়িত্ব দিয়েছে একান্ত প্রয়োজনে কিছু কিছু ওষুধ প্রয়োগ করার জন্য। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাক্তারের অভাব অদূর ভবিষ্যতে দূর করা যাবে বলে মনে হয় না। এই সব অঞ্চলে কোয়াক ডাক্তাররাই বিপদের বন্ধু হিসাবে কাজ করবেন এটা একটা অপ্রিয় সত্য যা আমাদের মানতেই হবে। এঁদের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে অতীতে অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তিন বছরের আধা ডাক্তার বানাবার Course এর বিরোধিতা আমরা পাস করা ডাক্তারবাবুরাই করেছিলাম অবশ্যই কতগুলি ন্যায্য এবং সঙ্গত কারণে। এই সমস্যার আশু সমাধান চোখে পড়ছে না। তবে আমি মনে করি ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িয়ে বা আরও ১০০ Primary Helth Centre বাড়িয়েও এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কারণ যতই PHC বাড়ানো হোক না কেন বেশির ভাগ প্রত্যন্ত অঞ্চলে এগুলির অবস্থান অনেক জনবসতি থেকে অন্তত ১০-১৫ কিমি দূরে এবং রাতবিরেতে বিপদে পড়লে সেই সব জায়গায় পৌঁছনোই গ্রামীণ ব্যবস্থায় একটা দুরূহ ব্যাপার। আমার ব্যক্তিগত মত, এই সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার Trained Health Care Worker এর সংখ্যা বাড়ানো এবং বর্তমানে কর্মরত কোয়াক ডাক্তারদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো স্বল্পকালীন Training এর মাধ্যমে। জানি আমি একটা অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়ের ঢাকনা খুলে দিলাম। কিন্তু এই বিতর্কের প্রয়োজন আছে কারণ আমরা গ্রামীণ মানুষের সাম্যতা ও স্বাধিকারের Sentiment কে উসকে দিয়ে এর বিরোধিতা করতে পারি কিন্তু তাতে সমস্যার কোনও সমাধান হবে না এবং ভুক্তভোগী হবেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষজন।

দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলের হাসপাতাল দেখার সময় লক্ষ করলাম পাহাড়ি হাসপাতালগুলি অনেক বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাছাড়া কর্মসংস্কৃতিও অনেক ভাল। রোগীর পরিবারের লোকজনও হাসপাতালের নিয়ম মেনে চলেন। স্থানীয় Nursing Home এর অভাবে এই সরকারি হাসপাতালগুলির Paying Bed গুলিও বেশ ভাল চলে। একই ধাঁচে মফস্বলের হাসপাতালগুলিতেও এই পরিষেবা আবার নতুন করে ভালভাবে চালু করলে অনেক মানুষেরই অর্থনৈতিকভাবে লাভ হবে। এক বছরের অভিজ্ঞতাতে দেখলাম অনেক হাসপাতালই পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত এবং কোনও কোনও জায়গায় পরিবেশ অস্বাস্থ্যকরও বটে এবং এই পরিবেশেই রোগীর আরও অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই হাসপাতালের পরিবেশ রক্ষা একান্ত জরুরি। শুধুমাত্র কংক্রিটের জঙ্গল না বানিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে হাসপাতালের সম্প্রসারণ করলে পরিবেশ রক্ষা পায়। এই ধরনের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চোখে পড়েছে কি কলকাতায় কি জেলাগুলিতে, যে জায়গাগুলি আদৌ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই জায়গাগুলিকে সঠিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করে মূল হাসপাতালের পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। গাছপালা লাগাতে হবে, ক্যাম্পাসের ভিতরের জলাশয় ও পার্কগুলি সংরক্ষণ করতে হবে তবেই হাসপাতালের সেই পুরনো আমলের পরিবেশ ফিরে আসবে।

আমার এক সেক্রেটারির দাদা সুদূর কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা আসেন সপ্তাহে দু'দিন ডায়ালিসিস-এর জন্য। কারণ জেলা হাসপাতালগুলিতে এই ব্যবস্থা নেই। ভরসা শুধু কিছু সংখ্যক Private Clinic. সাধারণ মানুষের এই হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য দরকার সরকারি হাসপাতালগুলিতে এই পরিষেবা চালু করা। শুনলাম আমাদেরই এক সদস্যের কাছে যে শীঘ্রই PPP মডেলে এই পরিষেবা চালু হবে সরকারি জেলা হাসপাতালগুলিতে। জেলার মানুষের জন্য এটা নিশ্চয়ই একটা সুখবর। একইভাবে PPP মডেলে আরও ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র দরকার বিশেষ করে দূরদূরান্ত গ্রামাঞ্চলে। নন্দীগ্রাম, মেমারি সহ কয়েকটা জায়গায় দেখলাম ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রগুলি সফলভাবে চালু হয়ে গিয়েছে।

এই তো সেদিন নদিয়ার একটা হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গিয়ে রাস্তা অবরোধের মধ্যে পড়লাম। কোনও একটা স্থানীয় সমস্যার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই নাকি এই অবরোধ। আমাদের মতো অনেকেরই সেদিন ভোগান্তি হয়েছিল। শেষমেশ আমাদের পরিদর্শনটা বাতিল করতে হল। আরও বহু

কোচবিহার জেলার একটা হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম একটা X-Ray Machine বহুদিন বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে। সেখানে কোনও Radiologist বা Technician নেই।

মানুষের হয়তো আরও বড় ক্ষতি হয়ে গেল সেদিন। ভুক্তভোগী হয়ে বুঝলাম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা প্রতিবাদের একটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি। গণতান্ত্রিক দেশে ধর্মঘটের অধিকার মানুষের থাকবে এবং তাকে ন্যায্য দাবিতে প্রয়োগ করলে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। কিন্তু এইভাবে আচমকা জানান না দিয়ে অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো স্থানীয় সমস্যার জন্য সাধারণ মানুষকে শাস্তি দেওয়া কখনওই প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। কর্তৃপক্ষের কতটা টনক নড়ে জানি না, সাধারণ মানুষের বিস্তর ক্ষতি হয়। আমার ব্যক্তিগত মতে আইনগত ভাবে এই আচমকা রেল রোকো, রাস্তা অবরোধ নিষিদ্ধ করা উচিত। সেদিন এবং প্রায়শই রাতে ফিরতে রাত হচ্ছিল। আমার স্ত্রী চৈতালী একদিন বিস্তর রাগারাগি করলেন এবং হুমকি দিলেন আমার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে। যাক কোনওভাবে ম্যানেজ করতে পেরেছি। কারণ গৃহে বিদ্রোহ হলে আর রক্ষা নেই। পরের দিন আলোচনায় আমার পিতৃদেবের কাছে জানতে পারলাম এই ধরনেরই একটা কাজে আমার পিতামহ স্বর্গত পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র জড়িয়েছিলেন ১৯৪৩-৪৪ সালে। এবং তাঁকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে হয়েছিল। সেই সময় Sir Joseph Bhore-এর নেতৃত্বে গঠিত বিখ্যাত BHORE COMMITTEE-এর একমাত্র নন-মেডিক্যাল সদস্য ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে এই BHORE COMMITTEE-র সুপারিশের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে স্বাধীন ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো। শুনে চমকে উঠলাম, কারণ এই তথ্যটা আমার জানা ছিল না। এই রকম কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না এক'দিনে হল। আমরা এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমাদের চিন্তাধারাকে স্বাস্থ্য দফতরকে নিয়মিত ভাবে জানাচ্ছি। এবং দেখে ভাল লাগছে বেশিরভাগ Recomendation স্বাস্থ্য বিভাগ গ্রহণ করছে এবং তার রূপায়ণে অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে সচেষ্ট হচ্ছে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে। মনে হয় যদি মাঝে মাঝে আলাদিনের প্রদীপটা হাতে থাকত এবং এক বছরেই সব কাজ শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের মতে গণতান্ত্রিক দেশে তো এই সময়টা লাগবেই। বিদ্বজ্জনেরা অনেকেই কথায় কথায় চিন দেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এবং প্রতিনিয়তই ভারতের গতিহীনতার সাথে তুলনা করে চিনের অগ্রগতির সাতকাহন করেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা কি তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের জন্য প্রস্তুত? চিনে তো SEZ করার জন্য গুলি চলে, বুলডোজার চলে বিনা প্রতিবাদে। আমরা কি তার জন্য প্রস্তুত? তা যদি না হই তবে এই ভারতীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই আমরা এগোব। (গণতান্ত্রিক অতিস্বকীয়তাকে অবশ্যই বর্জন করে) ভারতবর্ষই হোক মডেল, চিন নয়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমাদের একটা গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আমার আছে কি না জানি না, সদর্থক কিছু দিতে পারব কি না জানি না- তবে এইটুকু স্বীকার নিশ্চয়ই করব যা দিচ্ছি তার থেকে পেলাম অনেক বেশি। অর্জন করলাম নতুন অভিজ্ঞতা, নিজেকে সমৃদ্ধ করলাম বাংলার মাটি ও মানুষজনকে চিনে। দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখেছি বহু জিনিস কিন্তু সত্যিই চোখ মেলে দেখা হয়নি নিজের ঘরেরই সম্পদ।

এই দু'সপ্তাহ আগে আমাদের এক পারিবারিক বিদেশিনী ডাক্তার বন্ধু তাঁর এক ছাত্রীকে নিয়ে England থেকে আমাদের পরিবারের সাথে কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন। Dr. Williams একজন Anasthesist, Leicester Hospital -এ কর্মরতা। ভারতে বহুবার এসেছেন। এই সুবাদে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে আমি আমার স্ত্রী চৈতালী ও বড় পুত্র সোমাঙ্ক ছোটখাট ছুটি কাটালাম ওঁদের সাথে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। আমার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে একটু Showcase করা। প্রথমেই দিন তিনেকের জন্য ডুয়ার্সের চা-বাগান আমাদের এক বন্ধুর অতিথি হয়ে। মেঘঘন আকাশ দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ চা বাগানে, উচ্ছল পাহাড়ি নদী। আর পাহাড়ে ঘেরা সবুজ অরণ্য দেখে আমাদের অতিথিরা মুগ্ধ। রাস্তাঘাট যথেষ্ট ভাল। তবে toursim -এর স্বার্থে আরও ভাল হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত সামসিং-এর রাস্তা বা চা বাগানের ভেতরের রাস্তাগুলি। ডুয়ার্সের আনাচে কানাচে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে। মন খারাপ হয়ে গেল কোনও কোনও অঞ্চলে বিশালকায় শহুরে ধাঁচের উচ্চতল বিশিষ্ট Tourist lodge গুলি দেখে। যা প্রকৃতির সাথে একদমই মানানসই নয়। সঠিকভাবে পরিকল্পনা করলে ডুয়ার্সই হতে পারে ভারতের পর্যটন মানচিত্রের মূল আকর্ষণ এবং স্থানীয় মানুষের রুজি। তবে বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করতে হবে আমাদেরই স্বার্থে। ফেরার পথে নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ-এর সদ্য চালু হওয়া Critical Care Unit-টা ঘুরে দেখালাম। Dr. William এই Unit টার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে একদিনের সফরে সুন্দরবন সফর —ঝড়খালি হয়ে। বছর ছয়েক আগে একবার এসেছিলেন তবে এবার বাসন্তী Express Wayটা আগের তুলনায় যথেষ্ট ভাল তাই পৌঁছতে সময় লাগল না। সাড়ে তিনঘণ্টার একটা বোট সফরে হেড়োভাঙা ব্লকের সুরজমুখী খালে বিস্ময়করভাবে সাক্ষাৎ হল জঙ্গলরাজ দক্ষিণ রায় Royal Bengal-এর সাথে। অত্যন্ত দুর্লভ একটা ঘটনা। দেখা মিলল রোদ পোহানো এক বিরাট কুমিরের। কলকাতার এত কাছে সুন্দরবনের এই গহন অরণ্যের এই সৌন্দর্য দেখে Dr. William একেবারে মুগ্ধ। আমার মনে হল প্রকৃতির এই অকৃপণ দানকে আমরা আরও ভালভাবে কাজে লাগাতে পারি ট্যুরিজম প্রকল্পে। দরকার আরও ট্যুরিস্ট লজ। ঝড়খালির নদীর ঘাট পর্যন্ত শেষ তিন কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার দরকার। ট্যুরিজম, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ও ফরেস্ট Department- -এর যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠতে পারে বহু পর্যটন কেন্দ্র। প্রায় ৭০ কিলোমিটার বিস্তৃত পূর্বে সামশেরনগর ঝিঙেখালি থেকে পশ্চিমে লোথিয়ান দ্বীপ ও হেনরি আইল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল বনাঞ্চলকে ঘিরে। তবে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে, অরণ্য রক্ষা করে এবং ন্যূনতম পরিষেবার ব্যবস্থা করে। এই সব জায়গায় পাঁচতারা হোটেলের কোনও স্থান নেই। দরকার ছোট ছোট বন বাংলো—প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য কোনও একটা বিশেষ স্থানকে কেন্দ্র করে অনেক ছোট ছোট পর্যটন কেন্দ্র দরকার। বিশালাকায় সুন্দরবনে অন্তত এই রকম ১০-১২টা কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। তাতে যানবাহন ও tourist সংখ্যা বা বোটের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বাংলাদেশের সাথে যৌথ উদ্যোগেও করা যেতে পারে।

দু'সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে ফেরার পথে Dr. William আপ্লুত। বাংলার সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বাঙালির ঘরোয়া cuisine আস্বাদনে তাঁর ব্যক্তিগত মত যে পশ্চিমবাংলার স্থান ভারতের পর্যটন মানচিত্রে কেরল, রাজস্থান...

এরই ফাঁকে ফাঁকে আমাদের অতিথিকে নিয়ে কর্মশেষে রাতের কলকাতাটা দেখালাম। কলকাতার সম্বন্ধে একটা নেতিবাচক ধারণা নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু আলো ঝলমলে রাতের কলকাতা বিশেষ করে গঙ্গাপাড়, ময়দান এবং ডালহৌসি পাড়ার হেরিটেজ বিল্ডিংগুলি দেখে বললেন এখনও পর্যন্ত লন্ডন না হলেও ভারতের অন্যান্য শহরের তুলনায় যথেষ্ট ভাল এবং উপলব্ধি করলেন কেন কলকাতাকে একসময় 'City of Palace' বলা হত। তবে আরও উন্নয়ন দরকার। বিশেষ করে Traffic নিয়ন্ত্রণ ও বস্তি উন্নয়ন। আমার মনে হয় বস্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে Housing Dept, Kolkata Corporation ও নগরোন্নয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে একটা Task Force গঠনের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজ করলে আগামিদিনে ফল মিলবে। এ ব্যাপারে বাগবাজারে মায়ের বাড়ি সংলগ্ন বসতিকে নিয়েই একটা Pilot Project করা যাক না। Traffic নিয়ন্ত্রণ ও Parking -এর ব্যাপারে অনেক পদক্ষেপ করা হচ্ছে দেখলাম। কিন্তু সমস্যার মূলে আঘাত করতে হবে। কলকাতায় প্রতিনিয়ত পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সীমিত পরিকাঠামোতেই যোগ হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ ও বাড়তি গাড়ি— তাই চাই নতুন রাস্তা অথবা আরও অনেক Flyover। নচেৎ এই Supply এবং Demand-এর অসঙ্গতির জন্য কলকাতার গতি ভবিষ্যতে আরও শ্লথ হয়ে যাবে।

আমাদের অতিথিদের নিয়ে আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল ছিল মন্দারমণি ও দিঘার সমুদ্রসৈকত। ৬নং জাতীয় সড়ক হয়ে দিঘাগামী রাস্তা খুবই ভাল। মন্দারমণির শেষ ১০ কিমি গ্রামীণ রাস্তারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বাজপেয়ীজির আমলে তৈরি এই সোনালি চতুর্ভুজ জাতীয় সড়ক সত্যিই আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। শুধু বুর্জোয়া শ্রেণির মানুষ নন, এতে উপকৃত হয়েছেন সাধারণ মানুষ আরও অনেক বেশি। পণ্য চলাচল অনেক দ্রুত হয়েছে। অনেক খেটে খাওয়া মানুষই আজকাল কলকাতার কাজ সেরে দিনের দিন বাড়ি ফিরছেন এই রাস্তাগুলির সুবাদে। আমাদের তো মনে হয় আরও বেশি সংখ্যক এই ধরনের সড়ক নির্মাণ বিশেষভাবে জরুরি। এবং সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজন মতো জমি অধিগ্রহণ করে নতুন রাস্তা নির্মাণ ও রাস্তা সম্প্রসারণ একান্তভাবে দরকার জমি অধিগ্রহণ আইন মেনে ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে। কারণ দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যমেই আসবে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন। এই ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩৪ নং জাতীয় সড়কের কথা প্রথমেই মনে পড়ে যায়। এই দূরদর্শী চিন্তার ফল পাবে আগামী প্রজন্ম। আমার মতে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান যেমন প্রয়োজন, তেমনি দরকার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে। এই চিন্তারই সুফল আমরা পাচ্ছি প্রায় ৮০ বছরের পুরনো B.T Road অথবা রসা রোড যেখানে এখনও ১০ লেনের মতো Trafic বহন করার ক্ষমতা রাখে। অথচ আমাদের ১৫ বছরে তৈরি Salt lake-এর Sector V নিয়মিত Traffic Jam-এ দীর্ণ। অধুনা জেমস লঙ সরণির উপর দিয়ে কালীঘাট-ফলতা রেললাইনটা থাকলে হয়তো বর্তমানের জোকা metro line-এর এতটা দরকার হত না। হাওড়া হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখলাম গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের Foreshore Road বরাবর Railline-টা আস্তে আস্তে বুজে যাচ্ছে। অথচ আমার মনে হয় এই লাইনটাই ভবিষ্যতে হাওড়া সার্কুলার রেল চালানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

যা হোক বাংলার সমুদ্র সৈকত দেখে আমাদের অতিথি একটু হতাশ। চারিদিকে কংক্রিটের জঙ্গল। ঝাউবনগুলি লুপ্তপ্রায়। গাড়ি করে যাওয়ার পথে সমুদ্র প্রায় চোখেই পড়ে না। অথচ বিদেশে দেখেছি যে কোনও সমুদ্র সৈকতে Marine Drive একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় জায়গা।

এমনকী পুরী বা বিশাখাপত্তনমেও বেশ সুন্দর Marine Drive আছে। ফ্রেজারগঞ্জ-এর হাসপাতাল দেখার সময় মনে হয়েছিল এইরকমই একটা মেরিন ড্রাইভ যেটা ফ্রেজারগঞ্জ থেকে শুরু করে বকখালি হয়ে ইউটার্ন করে Henry's Island--এর mangrove পর্যন্ত বিস্তৃত হলে এটা একটা দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে। এবং পর্যটক সংখ্যাও বাড়বে।

ফ্রেজারগঞ্জ পরিদর্শন করে ফেরার সময় ইলিশ মাছ খোঁজ করেও পেলাম না। কারণ এ বছর নাকি ইলিশের আকাল। অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা। England এ দেখেছি Samon মাছের ক্ষেত্রে (যার status ওদেশে ইলিশের মতো এবং ইলিশের মতোই সামুদ্রিক মাছ। ডিম পাড়তে নদীতে ঢোকে)। বিশেষ Farming -এর মাধ্যমে সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে। কাগজে দেখলাম মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ইলিশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছেন। তবে আমাদেরও প্রত্যেককে সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। সরস্বতী পুজার আগে ইলিশ খাওয়াটা বারণ। আমরা মানি কই।

দু'সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে ফেরার পথে Dr. William আপ্লুত। বাংলার সংস্কৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বাঙালির ঘরোয়া cuisine আস্বাদনে তাঁর ব্যক্তিগত মত যে পশ্চিমবাংলার স্থান ভারতের পর্যটন মানচিত্রে কেরল, রাজস্থান বা হিমাচল প্রদেশের সমতুল্য হতে পারে এবং একটা জনপ্রিয় International destination হতে পারে। প্রয়োজন শুধু সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা। Airport-বিদায় জানানোর সময় আমরা ওঁকে আবার এই বাংলায় ফিরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। এই বাংলার বুকে এই আশ্বাস দিয়ে যে রূপসী বাংলা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে নতুন সাজে। কারণ এতদিনে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বুকের গভীরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে এই বাংলার সগৌরবে, স্বমহিমায় ব্যাঘ্রকে বাহন করে মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র মুকুটে ভূষিত হয়ে চিরদিনের জন্য আপন ভাস্বরে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে।

ছোটগল্প



ছুটে আসে বিষাক্ত তির

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত তখন মধ্যরাত, হঠাৎ টেলিফোনের গুঞ্জনধ্বনি শুনে ঘুম ভেঙে গেল মুখার্জি সাহেবের। এত রাতে সাধারণত কেউ টেলিফোন করে না, যদি না কোনও জরুরি সংবাদ থাকে। বস ডিএমের কথাই মনে পড়ল প্রথমে। কিন্তু ডিএম খুব বিচক্ষণ মানুষ, চট করে মধ্যরাতে ফোন করার মানুষ নন।

হয়তো কোনও রাজনৈতিক নেতার এত রাতে দেশোদ্ধারের কথা মনে পড়েছে, এতএব এসডিওর ঘুম ভাঙাও। কিংবা হয়তো কোনও আনাড়ি লোক ফোন করে তার দুঃখ-বঞ্চনার কাহিনি শোনাতে চাইছে এই ঘোর মধ্যরাতে।

মুখার্জি সাহেবের বালিশের পাশেই রাখা থাকে ল্যান্ডফোনের কর্ডলেসটি, সেটি অন করতেই শুনলেন ওপাশে গম্ভীর কণ্ঠস্বর, এসডিও সাহেব বলছেন?

মুখার্জি সাহেব 'হ্যাঁ বলছি' বলতেই ওপাশে আবার সেই গম্ভীর উচ্চারণ, আমি এসপি বলছি—

এত রাতে পুলিশ সুপার ফোন করছেন শুনে মুখার্জি সাহেব উৎকর্ণ হলেন, উৎকণ্ঠিতও, নিশ্চয় কোনও সিরিয়াস ব্যাপার! জেলার এসপি খুবই বিচক্ষণ অফিসার।

সেরকমই একটা আন্দাজ দিয়ে এসপি বললেন, এসডিও সাহেব, খুব একটা বাজে ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। আপনাকে একবার কষ্ট করে যেতে হবে।

—কোথায়! মুখার্জি সাহেবের চোখে তখনও ঘুমের ক'-টুকরো

আঁচড়, জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে?

—পুলিশ ফায়ারিং। কেশরং থানা এরিয়ার কাঁটাগেড়িয়ায়।

—এত রাতে পুলিশ ফায়ারিং! মুখার্জি সাহেব ততক্ষণে আলো জ্বেলে ফেলেছেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাত দুটোর কাছাকাছি।

—এখনই ফায়ারিংটা হয়নি! হয়েছে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। যাত্রার প্যান্ডেলে। কিন্তু খবরটা আমাদের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে এত দেরি।

—যাত্রার প্যান্ডেলে! এসডিও-র কণ্ঠে উত্তেজনা চাপা থাকে না, জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও ক্যাজুয়ালটি?

এসপি ইতস্তত করে বললেন, দু'জন।

দু'জন! মুখার্জি সাহেব তাঁর ভিতরে উথলে ওঠা বিস্ময়সূচক অভিব্যক্তিটা এবার গিলে ফেললেন চট করে। পুলিশ সুপারকে তাঁর উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা বুঝতে না দিতেই।

—কেউ ইনজিওরড?

—এখনও পুরো খবর পৌঁছয়নি। ওখানে না-পৌঁছলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আরও কী কী ঘটেছে! তবে ওসি-র প্রেজেন্সেই ঘটেছে ঘটনাটা।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, ওসি নিজেই যাত্রা দেখতে গিয়েছিলেন। ঠিক ভাবতে পারেননি সিচুয়েশন বিয়োন্ড কন্ট্রোল হয়ে যাবে।

এই শব্দগুলি 'ফায়ারিং জাস্টিফায়েড' করতে ব্যবহৃত হয় পুলিশ প্রশাসনে।

মুখার্জি সাহেব আর তিলমাত্র বিছানায় সময় নষ্ট করার কারণ খুঁজে পেলেন না যদিও এরকম পুলিশ ফায়ারিং-এর ঘটনা তাঁর চাকরিজীবনে মাঝেমধ্যে ঘটেছে ল অ্যান্ড অর্ডার সমস্যার মোকাবিলা করতে। কিন্তু একটা ফায়ারিং-এর ঘটনা ঘটলে তার এতটাই হ্যাপা, তার জবাবদিহি করতে গিয়ে এতই নাজেহাল হতে হয় পুলিশকে যে, পারতপক্ষে ফায়ারিং করতেই চায় না পুলিশ। কিন্তু ঘটনা হল, পরিস্থিতি কখনও এমন হয়ে ওঠে যে আক্রমণে উদ্যত মবের উপর ফায়ারিং না করলে পুলিশই আক্রান্ত হবে ও অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে সেই মুহূর্তে।

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে ঘটনার ল্যাজামুড়ো কিছু শুনে নেওয়াটা জরুরি। পুলিশ সুপার মধ্যরাতে নিজেই ফোন করছেন মানে ঘটনা খুবই সিরিয়াস। জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছিল কাঁটাগেড়িয়ায়। যদি সংক্ষেপে একটু আঁচ দেন!

পুলিশ সুপার একটু হালকাই করতে চাইলেন যদিও তাঁর কণ্ঠস্বরেও চাপা থাকছে না উত্তেজনা। বললেন, খুব বিশাল ব্যাপার তা নয়। ওখানকার ফুটবল মাঠে চারদিন ধরে যাত্রার আয়োজন হয়েছে, আপনার হয়তো নলেজে আছে, খুব নামকরা পালা, তাতে প্রচুর ভিড় হয়েছিল, প্যান্ডেলে জায়গা দিতে পারেনি আয়োজকরা। কিছু লোক টিকিট না পেয়ে জোর করে ঢুকতে চেয়েছিল প্যান্ডেলে, ফলে মব সামলাতে পুলিশ—

বিষয়টা দ্রুত মগজে রোল করে নিলেন মুখার্জি সাহেব। গ্রামেগঞ্জে এরকম জোর করে যাত্রার প্যান্ডেলে ঢোকার ঘটনা আকছার ঘটে থাকে। বিশেষ করে নামী দলের যাত্রাপালা দেখার হিড়িক এ-দেশে এমনই যে, কাতারে কাতারে লোক এসে ভিড় করে প্যান্ডেলে। মুখার্জি সাহেব কখনও ট্যুর থেকে জিপে করে ফেরার সময় রাস্তায় দেখেছেন এ ধরনের যাত্রা দেখার কী প্রবল উৎসাহ ও ভিড়! গাঁয়ের পথ বেয়ে দর্শকের ঢল নামে যাত্রা প্যান্ডেল অভিমুখে।

তৎক্ষণাৎ পুলিশ সুপারকে আশ্বস্ত করে বললেন, "ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।"

—এসডিও সাহেব, আমরা কেশরং থানার সামনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব। আপনি পৌঁছলে তারপর স্পটে প্রেসিড করব। বুঝতেই পারছেন ট্রাইবাল এরিয়া। আমি যত বেশি পারা যায় ফোর্স মোবিলাইজ করছি।

—ঠিক আছে, এসপি সাহেব। আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছনোর।

—ওপাশে পুলিশ সুপারের রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ।

কাঁটাগেড়িয়ার নাম শুনেই মুখার্জি সাহেব অনুমান করে নিয়েছেন সমস্যাটা। কাঁটাগেড়িয়া গ্রাম ও তার চারপাশের অনেকগুলি গ্রামে শুধু আদিবাসীদের বাস। এতক্ষণে মনে পড়ছে মাসখানেক আগে সেখানে যাত্রা-উৎসবের অনুমতি দিয়েছিলেন তিনিই। যাঁরা উদ্যোক্তা সবাই আদিবাসী-সম্প্রদায়ের। চারদিনব্যাপী যাত্রা-উৎসবের মধ্যে তিনটি সাঁওতালি যাত্রা, শুধু একটি কলকাতার দল। অনুমতি নেওয়ার সময় উদ্যোক্তারা তাঁকে খুব করে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি তাঁদের এলাকায় যান যাত্রা দেখতে। মুখার্জি সাহেব আবার সাঁওতাল-অনুরাগী সেই বার্তা রটে গিয়েছে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে গ্রামে। তাই যেখানেই সাঁওতালদের কোনও উৎসব হয়, মুখার্জি সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয় উদ্যোক্তাদের তরফে। মুখার্জি সাহেব কখনও যাওয়ার সময় পান, কখনও পান না। এই যাত্রা-উৎসবেও যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে যেতে পারেননি। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই গ্রামে আজ যেতেই হচ্ছে রাত্রির এই তৃতীয় প্রহরে।

কিন্তু মধ্যরাতে কোথাও যাব বললেই সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয়। এত রাতে ঘুম ভেঙে উঠে প্রথমেই বাংলোর একতলায় নেমে আউট হাউসে ঘুমিয়ে থাকা হোমগার্ড দু'টিকে ডেকে তুললেন অনেক কষ্টে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠতে হওয়ায় দু'জনেরই চোখ লাল সিগন্যালের মতো। তাদের একজনকে বললেন, শিশুরঞ্জন, শিগগির সাইকেল নিয়ে চলে যাও ড্রাইভারের বাড়ি। সন্তোষবাবুকে ডেকে তুলে বল, এক্ষুণি যেন গাড়ি নিয়ে চলে আসেন এখানে। জরুরি ল অ্যান্ড অর্ডার প্রব্লেম। আর ভূপতি, শিগগির যাও সিকিউরিটির বাড়িতে। তাকে এক্ষুণি তৈরি হয়ে আসতে বল। দশ মিনিটের মধ্যে বেরব।

দুই হোমগার্ড তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল দু'দিকে। মুখার্জি সাহেব আবার উপরে উঠে গেলেন প্রস্তুত হতে। মাথার মধ্যে বিজবিজ করছে গুচ্ছের চিন্তা। এ সব ক্ষেত্রে গ্রামবাসী তুমুল হইহল্লা করবে রাস্তা অবরোধ করে। উত্তেজিত হয়ে রাস্তায় চলমান গাড়ি পেলে তাকে থামিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে প্রতিবাদ জানাতে। তবে এখন মধ্যরাত, রাস্তায় গাড়ি থাকবে না ধরে নেওয়া যায়। যদি কোনও অভাগা ট্রাক কোনওভাবে চলে আসে, তা হলে তার কপাল খারাপ নিশ্চিত।

কিন্তু শুধু তো ট্রাকের কপাল খারাপ তা নয়, যারা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত, গ্রামবাসীদের প্রধান টার্গেট হবে তারাই। মুখার্জি সাহেব এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না সেখানে পৌঁছে কী দৃশ্য দেখবেন!

এ সব ক্ষেত্রে দু'টি লাশ ঘিরে এক বিশাল জমায়েত ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তারা রক্তচক্ষু হেনে পুড়িয়ে দিতে চায় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে থানার কনস্টেবল-হোমগার্ড পর্যন্ত। ভাঙচুর করে গাড়ি। পুলিশ সুপার বলেছেন, তিনি ফোর্স মোবিলাইজ করছেন, অর্থাৎ সেখানে এখন নিশ্চয় যথেষ্ট ফোর্স নেই। যারা আছে তারা কি মব্‌কে মোকাবিলা করতে পারছে!

নাকি ঘটনাস্থলে কোনও ফোর্সই নেই! সে ক্ষেত্রে যারা সদর থেকে যাচ্ছে ফোর্স নিয়ে, তাদেরই গিয়ে মোকাবিলা করতে হবে যাবতীয় রোষের!

সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে এলাকাটা সাঁওতাল-অধ্যুষিত বলে। সাঁওতালরা তো কেউ খালি হাতে আক্রমণে আসে না, তাদের হাতে থাকে ধারালো কাঁড়, টাঙি, শানিত তির আর ধনুক। সেই সব তিরে থাকে বিষমাখানো, কখন কোন কোণ থেকে তির ছুটে এসে ফুঁড়ে ফেলবে কার বুক—

তাঁর ভাবনার অবকাশে বাংলোর গেটের কাছে গাড়ির হর্ন, তার একটু পরেই নিচে সিকিউরিটি অর্জুনের গলা, স্যর, এসে গিয়েছি।

মুখার্জি সাহেব ততক্ষণে প্রস্তুত হয়ে নেমে এসেছেন নিচে। দেখলেন সিকিউরিটি অর্জুনের হাতে একটা পাঁচ ব্যাটারি টর্চ। টর্চটা দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন মুখার্জি সাহেব। গ্রামাঞ্চলে রাতের বেলা টর্চ খুবই কাজে লাগে। দরজা খুলে বাইরে গিয়ে পৌঁছলেন গেটের কাছে। হোমগার্ডদের বললেন, বাকি রাত দু'জনেই একসঙ্গে ঘুমিও না। কোনও টেলিফোন এলে ধরবে। যদি ডিএম সাহেব ফোন করেন, বোলো আমি কেশরঙে গিয়েছি।

তারা মস্ত করে ঘাড় নাড়তেই তিনি উঠে বসলেন গাড়িতে। এসডিও-র ড্রাইভার সন্তোষবাবু ল অ্যান্ড অর্ডার ডিউটি করছেন আজ বহুকাল হল, সঙ্গে সঙ্গে চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলেন হু-হু করে।

কেশরং এখান থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটার, রাতে জোরে চালালেও অন্তত সোয়া একঘণ্টা লাগবে গন্তব্যে পৌঁছতে। বুঝতে পারছেন না তাঁর প্রস্তুতির মধ্যে পুলিশ সুপার বেরিয়ে গেলেন কি না কেশরঙের পথে। ওঠার আগে এক মুহূর্ত ভেবেছিলেন, এসপি-কে ফোন করে জেনে নেবেন তাঁরা বেরিয়ে গেলেন কি না, কিন্তু পরক্ষণে অনুমান করলেন, পুলিশের মেশিনারি সদা প্রস্তুত থাকে, নিশ্চয় এতক্ষণে মাঝরাস্তায়।

একবার ঘড়িতে নজর ফেলে দেখলেন রাত্রি দুটো পঁচিশ। ঘুম থেকে ওঠার পর গাড়ি ও সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে এর আগে বেরনো সম্ভব হয় না একজন সিভিল অফিসারের পক্ষে। পুলিশের কন্ট্রোল রুম সারা রাত চালু থাকে, ওয়ারলেস খোলা থাকে চব্বিশ ঘণ্টা, তাদের দু'চারটে গাড়িও প্রস্তুত থাকে। রাতের আঁধারে কখন কোন প্রয়োজনে লাগে তা ভেবে তাদের প্রস্তুতি অন্যরকম। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই কঠিন।

পরক্ষণে এও ভাবলেন, বরং আগে পুলিশ ফোর্স গিয়ে পৌঁছক, তাদের আগে তিনি একা শুধু মাত্র একটা সিকিউরিটির রিভলভার ভরসা করে পৌঁছে বিপদ ডেকে আনবেন কেন!

জেলা শহর থেকে বেরিয়ে মিনিট কুড়ি পরে প্রথমে ন্যাশনাল হাইওয়ে। মধ্যরাতে রাস্তা এখন ফাঁকাই থাকে সাধারণত, কিন্তু তবুও দু-চারটে ট্রাক গোঁ গোঁ শব্দ তুলে যাচ্ছে কলকাতা অভিমুখে। যে সব ট্রাক-ড্রাইভার বহু দূর থেকে মাল বয়ে আনে, তারা রাত সাড়ে দশটা বা এগারোটার পর কাছাকাছি কোনও ধাবা পেলে সেখানেই ট্রাক গ্যারাজ করে, অতঃপর রুটি-মাংস খেয়ে উদরপূর্তি করে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে কাবার করে রাত। কিন্তু কিছু ট্রাক থাকে যারা হয়তো কোনও কারণে দেরি করে ফেলেছে, তারা সারা রাত ট্রাক চালিয়ে মেক-আপ করতে চেষ্টা করে বাকি রাস্তা।

সেই ট্রাকগুলি গাঁক গাঁক শব্দে পেরিয়ে চলেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে, কখনও তাদের ওভারটেক করতে হচ্ছে সন্তোষবাবুকে, কখনও সাইড দিতে হচ্ছে মুখোমুখি এসে যাওয়া ট্রাকের। তার মধ্যেই একবুক টেনশন নিয়ে চলেছেন মুখার্জি সাহেব। দু'পাশে কখনও ধানখেত, কখনও বহুক্ষণ আগে ল্যাম্পো বা হারিকেন নিবিয়ে বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকা লোকালয়। গাড়ির হেডলাইট তীব্র আলোয় ফুঁড়ে ফেলছে অন্ধকার পথ। থমথম করছে চারপাশের পৃথিবী। নির্জন চতুষ্পার্শ নির্জনতা হয়ে উঠছে যেহেতু মনের ভিতরে বিজবিজ করছে নানা উত্তেজক ভাবনা।

ঠিক কী পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশকে ফায়ারিং করতে হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি এখনও। কত রাউন্ড ফায়ারিং হয়েছে তাও জানা যায়নি! যে কোনও পুলিশ ফায়ারিং হলে তাকে জাস্টিফায়েড বলে প্রমাণ করতে হবে পুলিশকে। আর সেই কারণেই এসডিও-কে প্রয়োজন পুলিশ সুপারের। কারণ এর পরেই একটা এনকোয়ারি হবে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে। সেই ম্যাজিস্ট্রেট কে হবেন তাও নির্ধারণ করতে হবে এসডিওকে। তাই এসডিও স্পটে গেলে তাঁর পক্ষে ঘটনার অনিবার্যতা সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হওয়া সম্ভব।

কিন্তু পরবর্তী সমস্যা কী হতে পারে তা ভেবে উৎকণ্ঠিত মুখার্জি সাহেব। সত্যিই যদি আদিবাসীরা তির আর কাঁড় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের উপর! তাতে আরও ক্যাজুয়ালটি হওয়া সম্ভব। আর আদিবাসী ইস্যু এমনই স্পর্শকাতর যে, কোনও বিশাল কিছু ঘটে গেলে তার জবাবদিহি করতে হবে খোদ গভর্নমেন্টকেই।

গাড়ি ততক্ষণে ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়েছে স্টেট হাইওয়েতে। এই পথ আরও নির্জন, রাস্তা অনেকটাই অপ্রশস্ত। কোথাও কোথাও দু'পাশের ঝাঁকড়া গাছগুলি এমন ঝুঁকে পড়েছে রাস্তার উপর যেন অন্ধকার গুহার মধ্য দিয়ে চলছে গাড়িটা। তার কিছুটা পরে আবার ফাঁকা রাস্তা। হঠাৎ সামনে দেখলেন তীব্র আলোয় পথ আলোকিত করে একটা বড়ো পুলিশ ভ্যান দ্রুতবেগে চলেছে সামনের দিকে। দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল এটি জেলা সদর থেকে আসা রিজার্ভড ফোর্সের গাড়ি। ভিতরে জনা পনেরো-কুড়ি ফোর্স। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই গাড়িটাকে ওভারটেক করে ফেললেন মুখার্জি সাহেবের ড্রাইভার। তারপর আবার অন্ধকার পথ। এরকম আরও কিছুটা চলার পরে গাড়ি গিয়ে থামল কেশরং থানার সামনে।

সেখানে অপেক্ষারত লাল আলো জ্বালানো সাদা গাড়ি দেখেই বোঝা গেল পুলিশ সুপার পৌঁছে গিয়েছেন আগেই। দাঁড়িয়ে আছে আরও দু'টি জিপ, তার একটা নিশ্চয় এসডিপিও-র।

গাড়ি থেকে মুখার্জি সাহেব নামলেন দ্রুত। তিনি থানার ভিতরে পৌঁছতে না পৌঁছতে পিছনের পুলিশ ভ্যানটা এসে থামল গেটের সামনে। তার ইঞ্জিনের গর্জন বন্ধ হয়ে গেল একটু পরেই।

মুখার্জি সাহেব এগোলেন থানার বারান্দার দিকে। বারান্দার সিঁড়িতে পা রাখতেই থানার সামনে প্রহরারত এক সেন্ট্রি সজোরে পায়ের শব্দ করে অ্যাটেনশন পজিশনে দাঁড়িয়ে স্যালিউট দিল এসডিও সাহেবকে। অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, স্যর, এসপি সাহেব ভিতরে অপেক্ষা করছেন।

থানার মধ্যে তখন একটা থমথমে পরিবেশ। কনস্টেবলরা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছেন এখানে-ওখানে। কয়েকজন পুলিশ অফিসার নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ওসি-র চেম্বারের বাইরে। মুখার্জি সাহেব তাদের পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখলেন, পুলিশ সুপার বসে আছেন ওসি-র চেয়ারে। তাঁর সামনের একটি চেয়ারে উপবিষ্ট এসডিপিও সাহেব।

তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে একজন সাব-ইনস্পেক্টর বর্ণনা দিচ্ছেন কী ঘটে গেছে যাত্রা-প্যান্ডেলে।

মুখার্জি সাহেব সামনের একটা চেয়ারে বসতেই এসপি সেই অফিসারকে বললেন, ঠিক আছে মেজবাবু, আপনি দেখুন, পুলিশ লাইন থেকে বড় ভ্যানটা এসে পৌঁছল কি না।

তিনি বাইরে যেতেই পুলিশ সুপার নিচু স্বরে বললেন, এসডিও সাহেব, খুব গুরুতর ব্যাপার। ওসি নিজেই গুলি চালিয়েছেন তাঁর সার্ভিস রিভলভার থেকে।

—তাই নাকি! মুখার্জি সাহেব কিঞ্চিৎ আশ্চর্য। তারপর বললেন, কী ঘটেছিল ওখানে?

পুলিশ সুপার অতঃপর একটু একটু করে বর্ণনা করলেন যেটুকু ইতিপূর্বে শুনেছিলেন ও যেটুকু আগে শোনেননি তা মিশিয়ে পুলিশ ফায়ারিং-এর ঘটনাক্রম। একটু অভিনবও সেই গুলি চালানার ঘটনা। কাঁটাগেড়িয়ায় আজ ছিল কলকাতার এক বিখ্যাত যাত্রাদলের অভিনয়। তার প্রধান নট ও নটী বিখ্যাত জুটি যাদের অভিনয় দেখতে কলকাতার মানুষও ভিড় করেন মঞ্চ ভরিয়ে। মফস্বলে এ রকম দলের সাঙঘাতিক ক্রেজ। বিশেষ করে এই নায়িকার সেক্সি ইমেজের কারণে উন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছয় দর্শকদের চাহিদা। ফলে যে-প্যান্ডেলে সাত-আট হাজারের বেশি দর্শক ধরবে না সেখানে হাজার বারো লোক এসে গিয়েছিল সন্ধের মধ্যে। তখনও ঠিক বোঝা যায়নি এরকমটা ঘটতে পারে প্যান্ডেলের বাইরে। রাত আটটা নাগাদ প্যান্ডেল ভর্তি হয়ে যেতেই বাইরে মাইকে ঘোষণা হতে থাকে, আর সিট খালি নেই, বাইরে অপেক্ষমাণ দর্শক সাধারণকে অনুরোধ, আপনারা আজ ফিরে যান। আমাদের আগামিকালের যাত্রা আরও আকর্ষণীয়। ওড়িশা থেকে এসেছে একটি অভিনব যাত্রাপালা যেখানে মঞ্চের উপর আপনারা দেখতে পাবেন দুই ঘোড়সওয়ারের তীব্র লড়াই।

কিন্তু সেই ঘোষণাও বাইরে অপেক্ষমাণ যুবকদের প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তারা বরং দেখতে আগ্রহী কলকাতার সুন্দরী নায়িকার যৌন আবেদন। বাইরে প্রচার করা হয়েছে এরকম লাস্যময়ী নৃত্য যাত্রা জগতে এই প্রথম। আর কে না জানে ঘোড়সওয়ারের যুদ্ধের চেয়ে লাস্যময়ীর যৌন আবেদনের আকর্ষণ অনেক বেশি যুবকদের কাছে।

বাইরে বারবার ঘোষণা করার পরেও কিন্তু যুবকদের ভিড় কিছু কমেনি, বরং বাড়তে লাগল উত্তরোত্তর। তারা লাস্যময়ী অভিনেত্রীর অভিনয় দেখতে বেপরোয়া। প্যান্ডেলের ছাউনি ছিঁড়ে ফেলে ভিতরে ঢুকতে প্রয়োগ করতে লাগল সর্বশক্তি। শুরু হয়ে গেল ডিউটিরত পুলিশ ফোর্সকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভিতরে ঢোকার স্রোত। যারা ভিতরে যাত্রা দেখতে ব্যস্ত তারা বাইরের এই ঝামেলার কিছুই আঁচ করতে পারেনি তখনও পর্যন্ত।

ঘটনাচক্রে থানার ওসি আমন্ত্রিত ছিলেন যাত্রা দেখতে, যেমন এসডিওকেও বহুবার আসতে অনুরোধ করেছিলেন উদ্যোক্তারা।

ওসি সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি একা নন। তাঁর স্ত্রী কলকাতার মেয়ে। তাঁরও কলকাতার দলের যাত্রা দেখার খুবই আগ্রহ, তিনিও এসেছিলেন ওসি-র সঙ্গে।

ওসি ভাবতেই পারেননি, যাত্রা দেখার হুজুগ এরকম উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছবে একটু পরেই।

জোর করে কিছু লোক ভিতরে ঢোকার পর বাইরের চাপ ক্রমে এমন অসহনীয় হয়ে উঠল যে, বাইরে কর্তব্যরত পুলিশেরা প্রথমে অনুরোধ, পরে লাঠিচার্জ করতেও বাধ্য হয়েছিল উদ্যত জনতার উপর। কিন্তু তাতেও নিবৃত্ত করা যাচ্ছিল না যুবকদের। পুলিশ বাধ্য হয়ে ভিতরে দর্শকের আসনের প্রথম সারিতে বসে থাকা ওসিকে পৌঁছে দিল সংবাদটি।

ওসি নিজে একবার উঠে গিয়ে দেখতে গেলেন বাইরের পরিস্থিতি, কিন্তু প্যান্ডেলের ছাউনির কাছে গিয়ে উপলব্ধি করলেন, অবস্থা প্রায় আয়ত্তের বাইরে। সঙ্গে স্ত্রী থাকায় আরও অসহায় হয়ে গেলেন সেই দৃশ্যে। বুঝতে পারলেন, এই মব্ নিয়ন্ত্রণ করা খুব মুশকিল। তিনি সেই উন্মত্ত যুবকদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, আজ আপনারা ফিরে যান। আমরা চেষ্টা করছি এই শো আরও একদিনের জন্য বাড়াতে যাতে আপনারা সবাই দেখতে পারেন এই যাত্রাপালা।

কিন্তু ওসিকে দেখে সেই জনতা যেন আরও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে, চিৎকার করে বলে, 'ওই দ্যাখ, বড়বাবু নিজে বউ নিয়ে দেখছে যাত্রা, আর আমাদের কি না বলছে, কাল দেখতে। এ সব ঢপ, আমরা বুঝি!' তারপর আরও বেপরোয়া হয়ে ব্লেড দিয়ে ফালাফালা করে ফেলতে লাগল সেই প্যান্ডেলের ছাউনি। বোধহয় কয়েক হাজার দর্শক উন্মত্তের মতো ঢুকে পড়বে ও নিশ্চিতভাবে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে এরকম আশঙ্কা করে ওসি খুব ভীত হয়ে পড়লেন ও তারপর আর দেরি না করে চিৎকার করলেন, এখনই আপনারা না-থামলে আমি কিন্তু গুলি চালাতে বাধ্য হব।

সেই সাবধানবাণী আরও উত্তেজিত করে তুলল জনতাকে। ও "বড়বাবু নিজে দেখবে ওই সব আর আমাদের দেখতে দেবে না, চল সব ধরি বড়বাবুকে," এরকম শুনতেই ওসি তখনই সার্ভিস রিভলভার বার করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালাতে বাধ্য হলেন। সঙ্গে সঙ্গে, 'ওরে গুলি চলছে রে' বলে সেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ততক্ষণে যা ঘটার তা ঘটে গিয়েছে, বেশ কয়েকজন যুবক পড়ে গিয়েছে সেই ভিড়ের মধ্যে, তার মধ্যে দু'জনের শরীরে প্রাণ নেই।

ততক্ষণে যারা অভিনয় করছিল তারা মঞ্চ থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে গিয়ে গ্রিনরুমে অন্তরিন। তারা সবাই ভয়ে কাঁপছে ঠকঠক করে।

উপস্থিত পুলিশ ফোর্স ততক্ষণে চেঁচিয়ে সাবধান করে, বনবন করে লাঠি চালিয়ে ফাঁকা করে ফেলেছে সেই প্যান্ডেল। যারা যাত্রা দেখতে এসেছিল তারাও গুলির শব্দ পেয়ে যে যার আসন ছেড়ে বাড়ির দিকে পালিয়ে উধাও।

এতক্ষণ একনাগাড়ে বিবৃত করে এসপি এবার বললেন, শুনলেন তো এসডিও সাহেব, ওসি কেন গুলি চালিয়ে ফেলেছে!

পুলিশ সুপারের মুখ থেকে এই সাঙঘাতিক ঘটনার ধারাবিবরণী শুনে মুখার্জি সাহেব নিজেও খুব আতঙ্কিত। জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে বেশ কয়েকজন ইনজিওরড হয়েছে নিশ্চয়ই?

পুলিশ সুপার ইতস্তত করে বললেন, হয়তো হয়েছে, ব্লাড-স্টেইনও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তারা সব পালিয়েছে সেই অবস্থায়।

মুখার্জি সাহেব বললেন, অন্তত তাদের হ্যাপা বোধহয় নিতে হচ্ছে না এ-যাত্রায়। নাকি নিতে হতেও পারে!

—কী জানি, স্পটে না গেলে বুঝতে পারছি না এখনও।

—যে পুলিশ-ফোর্স রাতে ডিউটিতে ছিল তারা এখন কোথায়?

—তারা যাত্রাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রেসকিউ করে নিয়ে গিয়েছে পাশের থানার একটি ইস্কুলে রাখতে।

—আর ওসি?

—ওসিকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পাশের থানায়। কেন না, ওসির উপরই এখন বাসিন্দাদের মূল ক্ষোভ। তিনিই তো—

—বুঝেছি, তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি এখন? মুখার্জি সাহেব বেশ টেনশনে পড়তে শুরু করেছেন।

তাঁর কথা শেষ না হতেই থানার বাইরে একটা বড় পুলিশ ভ্যান এসে থামল, সেই গাড়িটার উপস্থিতি বিষয়ে নিশ্চিত হতেই পুলিশ সুপার বললেন, হ্যাঁ, এই ফোর্সের জন্য অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ, এসডিও সাহেব। পুলিশ লাইনে মেসেজ পাঠিয়ে আনতে দেরি হল।

ততক্ষণে ঘড়িতে প্রায় চারটে, বাইরের অন্ধকার একটু-একটু করে ফরসা হতে শুরু করেছে, তাতে মনে একটু সাহসও বাড়ছে সবার।

তবু গোটা পুলিশবাহিনী উত্তেজনার চরমে। রাতের অন্ধকারে প্যান্ডেলে কী পরিস্থিতি চলেছে কে জানে! হয়তো প্যান্ডেলটাতেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ক্ষুব্ধ জনতা!

থানা দেখভাল করার দায়িত্বে একজন অফিসার ও সামান্য কিছু ফোর্স রেখে রওনা হলেন বাকি সবাই। গাড়ির কনভয় চলল অকুস্থলের দিকে। প্রথমে চলেছে থানার একটি জিপ, তাতে এই থানার দু'জন সাব ইনস্পেক্টর, কয়েকজন এএসআই ও কনস্টেবল, তাঁরা এখানকার পথঘাট ও বাসিন্দাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তারপর পুলিশ সুপারের গাড়ি, তারপর এসডিও-র গাড়ি, তারপর এসডিপিও-র গাড়ি, সবশেষে যথাক্রমে ছোট ও বড় পুলিশ ভ্যান দু'টি।

তখন ভোরের আলো তার রেণু ছড়িয়ে ফরসা হয়ে আসছে ক্রমে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গাছগাছালি, লোকালয়। কালচে আকাশ নীল হয়ে উঠছে ক্রমে। মিনিট কুড়ি যাওয়ার পরে একটি খেলার মাঠ, সেই মাঠ জুড়ে একটা মস্ত প্যান্ডেল। না, পুড়িয়ে দেয়নি প্যান্ডেলটা। সেই প্যান্ডেলের কাছাকাছি এসে একে একে ইঞ্জিন বন্ধ করে সব ক'টা গাড়ি।

মুখার্জি সাহেবও নামলেন তাঁর গাড়ি থেকে। একে-একে নেমে এলেন এসপি, এসডিপিও, থানার অন্যান্য অফিসার। দুটি ভ্যান থেকে ধপাধপ শব্দে এলাকা সচকিত করে নামছে উদ্যত রাইফেল হাতে কনস্টেবলরা। বেশ বড় কনটিনজেন্ট নিয়ে এসেছেন পুলিশ সুপার। আসলে আদিবাসীদের রীতিমতো ভয়ই পাচ্ছেন পুলিশ অফিসাররা, তাই এ হেন বিশাল ব্যবস্থাপনা।

প্যান্ডেলের সামনে পৌঁছে তার বিধ্বস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন তাঁরা। বোঝা যাচ্ছে, প্যান্ডেলের উপর ঝড় বয়ে গিয়েছে কাল রাতে। কোথাও প্যান্ডেলের কাপড় উলিধুলি ছেঁড়া, কোথাও প্যান্ডেলের বাঁধন ছিঁড়ে উড়ছে পতপত করে। ভিতরে সামনের দিকে কিছু চেয়ার পাতা ছিল, সেই চেয়ার লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে এদিক-ওদিক।

কিন্তু এই মুহূর্তে প্যান্ডেলের আশপাশে তাকিয়ে দেখা গেল কোথাও কোনও লোকজন নেই। দৃশ্যটা কিছুটা স্বস্তিদায়ক হলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। এখান থেকে দূরে দূরে দৃশ্যমান বেশ কয়েকটি গ্রামের সিল্যুট। সেখানকার লোকেরাই কাল রাতে দেখতে এসেছিল যাত্রাপালা।

পুলিশ সুপার কিছুক্ষণ লক্ষ রাখলেন সেখানকার পরিস্থিতির দিকে, তারপর মুখার্জি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় সারা রাত তাণ্ডব চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লোকজন।

এসডিপিও বললেন, তাই হবে স্যর। কিন্তু এতগুলো সরকারি গাড়ি এসে পৌঁছেছে সে খবর নিশ্চিতভাবে ওদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে এতক্ষণে। দেখবেন, একটু পরেই পিলপিল করে লোক এসে যাবে ঝামেলা বাধাতে।

মুখার্জি সাহেব বললেন, নেতৃস্থানীয় কাউকে পেলে ভাল হত। তা হলে সমস্যাটা ট্যাকল করতে সুবিধে হয়। উদ্যোক্তারা নিশ্চয় গা ঢাকা দিয়েছে!

পুলিশ সুপার হাত নেড়ে ডাকলেন থানার একজন অফিসারকে, পৃথ্বীশবাবু, এখানকার প্রধান-উপপ্রধান কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়?

পুলিশ অফিসারটি বললেন, স্যর, এটা খুব বড় গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রধান থাকেন অনেক দূরে। উপ-প্রধান এখানে থাকেন বটে, কিন্তু কাল রাতে আমি একজন হোমগার্ড পাঠিয়ে চেষ্টা করেছিলাম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার, কিন্তু তিনি নাকি কোনও কুটুমবাড়ি গিয়েছেন।

—আর কোনও নেতা?

—পঞ্চায়েত সমিতির একজন সদস্য থাকেন কাছের গ্রামে, তিনি থানায় আসতে রাজি হননি।

রাজি হননি শুনে কিছুটা অনিশ্চয়তা। তাঁর না-আসার মধ্যেই একটা প্রতিবাদের ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া গেল। মুখার্জি সাহেব একবার পুলিশ সুপার, একবার এসডিপিও-র সঙ্গে চোখাচোখি করে অনুমান করার চেষ্টা করলেন বিপদের মাত্রা। তিনজনে আবার অনেকক্ষণ নিঃশব্দ। আশপাশে পুলিশের অন্য অফিসাররা যে যার মতো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে পরবর্তী ঘটনা কী ঘটতে পারে এই ভেবে।

ভোরের আলোয় রং ধরিয়ে ক্রমে সকাল হয়, আরও স্পষ্ট হয় পটভূমি। একটু আগের অন্ধকারে যা ছিল কালো চাদরে ঢাকা সেখানে এখন দিবালোক। বহু দূরে জনা দুই লোক গাঁয়ের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তারা নিশ্চয় লক্ষ করছে পুলিশের ভ্যান দুটো। হয়তো গাঁয়ে গিয়ে খবর দেবে পুলিশের উপস্থিতির কথা।

ঘড়িতে ক্রমে সাড়ে সাতটা বেজে যায়, হঠাৎ লক্ষ পড়ে দূর গ্রাম থেকে কিছু লোক যেন আসছে এদিকেই। এসডিপিও গলা নামিয়ে বললেন, এই দলটা বোধহয় এদিকেই আসছে।

তাঁর কথার অনুরণন নিচু গলায় ছড়িয়ে গেল সমস্ত ফোর্সের মধ্যে। ফোর্সের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া মানে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হল সামান্য ত্রস্তভাব। বুটের শব্দ দ্রুততর হতে থাকে। এতক্ষণ সেই বাহিনীর মধ্যে ছিল কিছুটা শ্লথ পদচারণা, এখন প্রস্তুতি চলতে থাকে সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করতে। অপেক্ষা করছে তাদের বড় সাহেবরা কী হুকুম দেবেন, সেই হুকুমমাফিক শুরু হবে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ।

ক্রমে চোখে পড়ল আরও বহু মানুষ দলবেঁধে আসছে নানা দিক থেকে। সেই সংখ্যাটা কত তা অনুমান করা যাচ্ছে না এখনও। দুশো, না চারশো, নাকি আরও বেশি! ক্রমে সেই সংখ্যাটা বাড়তে থাকে। চারপাশের গ্রাম থেকে পিলপিল করে আসছে বহু মানুষ। যেন অনেকগুলো মিছিল ক্রমে ঘিরে ফেলবে পুলিশ বাহিনীকে। তারা সশস্ত্র, নাকি অস্ত্রহীন তাও বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে। তবে আদিবাসীদের মিছিল সাধারণত অস্ত্রহীন হয় না। যদি সশস্ত্র হয়, তবে তারা কি আক্রমণে রত হবে এত বড় পুলিশবাহিনীর সঙ্গে! তাদের এলাকার দু-দুটো যুবক মারা গিয়েছে পুলিশের গুলিতে, আহতর সংখ্যাও কয়েকজন, সেই শোক নিশ্চিত পুঞ্জীভূত হয়েছে সারা রাত ধরে। তারই জেরে ফুঁসছে কয়েকটা গ্রামের মানুষ। সেই ক্ষোভ এখন আছড়ে পড়বে প্রশাসনের উপর।

মুখার্জি সাহেব হঠাৎ কী যেন দেখে বললেন, এসপি সাহেব, ওরা কিন্তু খালি হাতে আসছে না!

সঙ্গে সঙ্গে জোড়া জোড়া চোখ ন্যস্ত হল চারপাশ থেকে ধাবিত হওয়া সেই মিছিলগুলোর দিকে। চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ফুঁড়ে ফেলতে চাইল সেই দৃশ্যগুলি যেখানে চলমান হয়ে আসছে সারি সারি মাথা। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই নিশ্চিত হলেন, একই সঙ্গে

দুশ্চিন্তিতও হলেন যে, তা হলে হয়তো কাল রাতের গুলিচালনার মোকাবিলা করতেই আসছে আদিবাসীরা!

সেই মিছিল ক্রমে চারদিক থেকে এসে থমকে দাঁড়াল কিছুটা দূরে। একটু দূরে পুলিশ ফোর্সও টানটান অপেক্ষায়, কিন্তু পুলিশ সুপার ইঙ্গিতে তাদের খবর দিলেন কোনও প্ররোচনায় উত্তেজিত না হতে। ততক্ষণে মিছিলগুলি দাঁড়িয়ে গিয়েছে দূরে, তাদের মধ্য থেকে জনা সাত-আট মানুষ পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছেন তাঁদের দিকে।

পুলিশ সুপার ফিসফিস করে বললেন, এসডিও সাহেব, মনে হচ্ছে কিছু বলতে চান ওঁরা।

বিশাল মাঠের এককোণে পুলিশবাহিনী অপেক্ষায়, অন্যদিক থেকে কিছু আদিবাসী মানুষ এগিয়ে আসছেন ধীর পায়ে। হঠাৎ কিছুটা দূরে থমকে দাঁড়ালেন।

পুলিশ সুপার চেঁচিয়ে বললেন, আপনারা আসুন—

তাঁর কথার মধ্যে কিছুটা আশ্বাসের স্বর শুনে আদিবাসীরা আবার এগিয়ে এলেন কাছে। মুখার্জি সাহেব লক্ষ করছিলেন আদিবাসী মানুষগুলোকে। সংখ্যায় তাঁরা আটজন, পরনে ধূলিধূসরিত পোশাক, বেশিরভাগেরই মাথার চুল সাদা, চোখে পুঞ্জীভূত অভিমান। তাঁরা নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এসেছেন গতকালের দুর্ঘটনার বিষয়ে কথা বলতে।

কিছুক্ষণ দু-পক্ষই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। দু-পক্ষই মেপে নিচ্ছে অপরের চোখের ভাষা। এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য বিরাজমান দু-পক্ষের মাঝখানে। অনেকক্ষণ পর এসপি বললেন, আসুন কাছে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলব বলে আমরা এসেছি।

তাঁদের মধ্যে একজন অশীতিপর মানুষ, পরনে ছোঁড়াফাটা জামা, চোখের মণিতে হলুদ রং, এগিয়ে এসে খুব নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, বাবু, তুদের কাছে তো মেলাই গুলি-বন্দুক আছে!

ধবধবে সাদা চুলের মানুষটির চাউনিতে উপচে উঠছে এক আকাশ ক্রোধ। সেই চাউনির জবাবে ঠিক কী উত্তর দেওয়া যায় তা প্রশাসনের তিন কর্তার ভাবনায় আবর্তিত হতে থাকে কিছুক্ষণ।

পরক্ষণে অশীতিপর আবার বললেন, বাবু, তুরা এত পুলিশ, গুলি-বন্দুক নিয়্যা এস্যাছিস কেনে! মুদের গাঁয়ের বাকি মানুষগুলোকে গুলি করবি বল্যা!

পুলিশ সুপার বললেন, দেখুন—

তাঁর কথা শুরু হওয়ার আগেই অশীতিপর আবার বললেন, তা গুলি করল্যা কর। মুরা অনেক হড়হপন নিয়্যা এস্যাছি। তুদের বন্দুকে কত গুলি আছে কর। তারপর হঠাৎ হাসলেন, দ্যাখ বাবু, কত লোক ইখেনে। তুদের বন্দুকে কিন্তু এতগুলি নাই।

মুখার্জি সাহেব খুব দ্রুত চারদিকে নজর চালিয়ে দেখে নিলেন, বোধহয় কয়েক হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছে কাল রাতের ঘটে যাওয়া ঘটনার মোকাবিলায়।

পুলিশ সুপার এতক্ষণে বলতে পারলেন, দেখুন, আমরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলতেই এসেছি।

অশীতিপর মানুষটির গলা তখন ধরে এসেছে, বললেন, কী আর কথা বলবি তুরা, বাবু! মুদের ঘর তো ফাঁকা করি দিল্যা!

তাঁর একটি কথায় মুহূর্তে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের বুকগুলোও যেন ফাঁকা হয়ে গেল। একটি মৃত্যু মানে একটি ভরভরন্ত সংসারের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া চরম শূন্যতার।

—বাবু, মুর ছেল্যাটো পরীক্ষায় পাস দিয়্যাছিল ইবার। তার চাকরি হল্যা মুরা দুটো খেয়্যা পর্যা বাঁচতাম।

মুখার্জি সাহেবের ভিতরটা পুড়ে যেতে লাগল অশীতিপর মানুষটির কথার মোকাবিলা করতে।

তিনি কিছু বলতে চাইলেন, তার আগেই পুলিশ সুপার বললেন, কাল যা হয়েছে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন সেটি একটা দুর্ঘটনা।

—তুরা যাই বলিস বাবু, তারা গুলি খাওয়ার মতো কাজ করে নাই। যাত্রা দেখাবি বলে তোরা মানুষকে লোভ দেখাইলি! তারা এস্যাছিল যাত্রা দেখত্যা। তুরা যাত্রা দেখাইতি পারলি না, না পের‍্যা তাদের গুলি কর‍্যা মারলি!

মুখার্জি সাহেব বুঝতে পারছেন, তাঁদের আর কিছু বলার থাকে না। সামনে যাঁরা আছেন তাঁদের আদিবাসী বলে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু তাঁরা যে যথেষ্ট বিচক্ষণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অশীতিপর পরমুহূর্তে বললেন, বাবুরা, মুদের ছেল্যারা যাত্রা দেখতে চায়্যা খুব খারাপ কাজ কর‍্যাছে। সিটা মুরা স্বীকার করছি। তাদের হয়ে মুরা এতগুলো হড়হপন এস্যাছি ক্ষমা চাইতে। তাদের ক্ষমা কর‍্যা দে।

মুখার্জি সাহেব দেখছিলেন, পুলিশ সুপারের মুখটা কালো হয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু বাবুরা, তুরা যে খারাপ কাজ কর‍্যাছিস, তার লেগ্যে তুরা ক্ষমা চা। এতগুলান মানুষের কাছে ক্ষমা চা।

তার কথাগুলো একরাশ বিষ-মাখানো তিরের মতো তীব্রবেগে ছুটে এল গুলি-বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করা মানুষগুলোর দিকে।

অলঙ্করণ : শান্তনু দে



অলীক স্বপ্নের মায়াজাল

স্বপন সেন

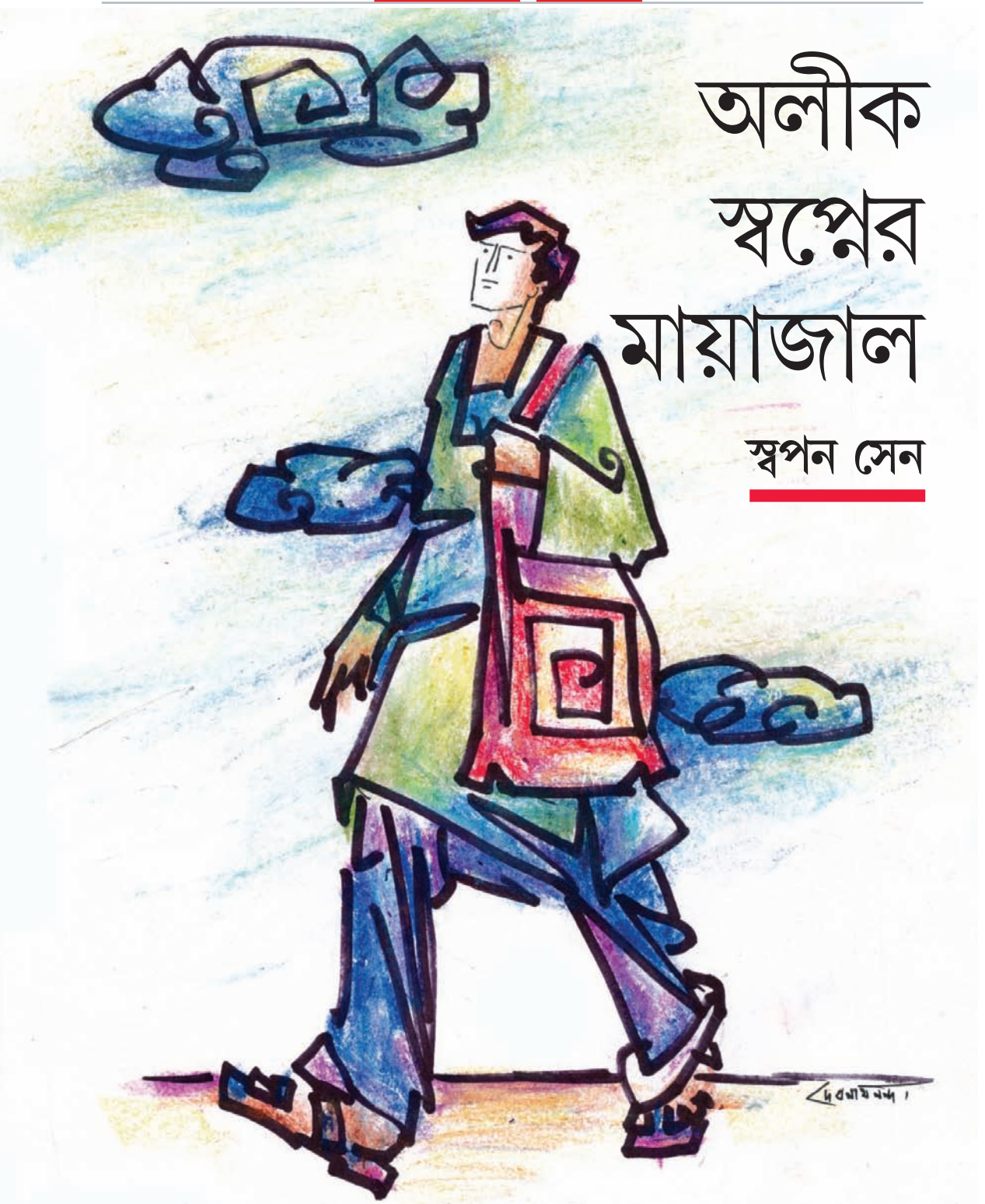

সকালে উঠেই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিল স্বাতী। জামা-কাপড় বদল করে সুন্দর করে চুল বেঁধে মুখে একটু ক্রিম মেখে নিল। শীতের সময় শরীরে কেমন টান ধরে, তাই। না হলে সে কোনওরকম প্রসাধন ব্যবহার করে না।

এত শীতেও সকালে স্নান সেরে নিল কেননা, দীপ্তেনের বাড়ি গেলে হয়তো বলবে এবেলা আর যেও না। আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে চলো দুপুরে সিনেমায় যাই। একেবারে বিকেলে বাড়ি ফিরবে। আজকাল অবশ্য এ ধরনের কথা শোনে না দীপ্তেনের কাছ থেকে। অন্তত বছর খানেক আগের সেই ঘটনার পর থেকে। তারপর থেকে দীপ্তেন আর তাদের বাড়িতে আসে না। আসলে ঘটনাটা দীপ্তেনকে না বললেই হত। কেননা, তার দাদা বা মা যে কথা তাকে বলেছে, যে ইঙ্গিত দীপ্তেন সম্পর্কে করেছে তা তো আর দীপ্তেন জানত না সে না বললে। তবু বলেছে। কেননা, সে যাকে ভালবাসে তাকে যদি-না সমস্ত কথা বলতে পারে, তার কাছেই যদি গোপন থাকে অন্তত বাড়ির লোকের কী দৃষ্টিভঙ্গি তার সম্পর্কে, তবে সে তো অন্যায় করবে। ভালবাসার কাছে কোনও গোপনীয়তাকে সে ছলনা মনে করে। মনে হয় এভাবে গোপন করার অর্থ নিজস্ব মানুষটার সঙ্গেই সে প্রতারণা করছে। আর যাকে সে ভালবাসে তাকে কখনও নিজের থেকে আলাদা করে দেখতে পারে না। বাড়ির মানুষের কথায় সে নিজেই তো কষ্ট পেয়েছে। প্রতিবাদ করেছে। অথচ দীপ্তেন হয়তো তাকেও ভুল বুঝেছে। এই বছর খানেক ধরে তার বাড়িতে যে সমস্ত কথা হয় দীপ্তেনের বিরুদ্ধে তার সব কিছুই তো সে দীপ্তেনকে বলেছে। সে দীপ্তেনকে ভালবাসে। বিশ্বাস করে, দীপ্তেন তাকে ভুল বুঝবে না। তবু ইদানিং দীপ্তেনের ব্যবহার দেখে মনে হয় দীপ্তেন বোধহয় তাকে ভুল বুঝছে। হয়তো সে ভাবছে নিজের কথাগুলোই বাড়ির লোকের কথা বলে বলছে। হয়তো ভাবছে বাড়ি থেকে তার বিয়ের জন্য যে চাপ দিচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত কথা বলে সে দীপ্তেনকে তার ভুল বোঝাতে চাইছে। আসলে সে তো জানে দীপ্তেন কোনও ভুল করছে না। অন্তত তার দৃষ্টিভঙ্গিতে। দীপ্তেনের এ অবস্থার জন্যে তার নিজের ত্রুটি কতটা? এ প্রশ্ন সে বারবার করেছে নিজেকে। দীপ্তেনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ খাড়া করতে পারেনি। এ কি তার দুর্বলতা? এ কি তার ভালবাসার মোহচ্ছন্নতা?

দীপু আর আগের মতো জোর দিয়ে কিছু বলে না। কোনও কিছুতেই জোর করে না। আজকাল সব ব্যাপারেই সে স্বাতীর কাছে প্রশ্ন রাখে। হয়তো বলবে 'সিনেমায় যাবে?' আগে দীপ্তেন এরকম প্রশ্ন রাখত না তার সামনে। সমস্ত ব্যাপারে ভীষণ জোর করত। দীপু যেন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল। অথচ তার সেই জোর যেন কমে গেছে। আজকাল তার নিজস্ব অধিকার যেন হারিয়ে ফেলছে। অথচ কেন এমন বদলে গেল দীপু?

এত সকালে তাড়াহুড়ো করছে দেখে মা এসে তাকে প্রশ্ন করলেন 'কোথায় যাচ্ছিস এত সকালে?'

সে বলতে পারত। কিন্তু কথাটা তার মুখে আটকে গেল। আগে হলে সহজেই বলতো 'দীপুর বাড়ি যাচ্ছি'। এখন বললে হয়তো কিছুই বলবে না। তবু বলতে গিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। সে বুঝতে পারে তার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের সম্পর্ক বাড়ির সবাই জানে। এবং বাড়ির লোকজন আপত্তি করলেও তার ক্ষেত্রে টিকবে না যে তা মা অন্তত জানেন। তবু মা আপত্তি করবেন, এখন না হলেও অন্য সময়। তাকে হয়তো নানাভাবে বোঝাবেন, যেন সে কিছুই বোঝে না। এবং তাদের মতে সবটা তারই ভবিষ্যৎ ভেবে। অথচ সেই নাকি বুঝতে চায় না। 'তুই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছিস, এখন বুঝবি না, পরে বুঝবি।' মা একদিন বলেছিলেন। আর এই নিজের পায়ে কুড়ুল মারা থেকে তারা বার বার সাবধান করে দিচ্ছেন, অথচ সেই সাবধান বাণী সে কানেও তুলছে না। হয়তো কখনও রাগ করে অনেক কটু কথাও বলেছেন। কিন্তু সে তো নেহাত ছেলেমানুষ নয়, বয়সটা প্রায় চব্বিশ পঁচিশ হলো।

'কী রে কিছু বলছিস না যে?'

এ ধরনের কৈফিয়ত তার ভাল লাগে না। জেরার মুখে তার মিথ্যে বলতেও অস্বস্তি হয়। আর এই অবস্থাকে অতিক্রম করতে গিয়ে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'তুমি আজকাল বড় বেশি কৈফিয়ত করো। আমার কি কাজ থাকতে পারে না?' ইদানিং সে দেখেছে সামান্য কথাতেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। বিশেষত বাড়ির লোকজনের কাছে। এ হয়তো তাদেরই ব্যবহারের ফলে। স্বাভাবিক ব্যাপারকে তারা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না। তাই তার ব্যবহারেও দেখা দিচ্ছে অস্বাভাবিকতা। অথচ এরকম অস্বাভাবিক ব্যবহারের, উত্তেজনার কোনও অর্থই হয় না।

'তুই আজকাল বড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিস। তোর ব্যবহারে এরকম অস্বাভাবিক রূঢ়তা কেন?'

'অস্বাভাবিকতার মধ্যে বাস করলে সব কিছুই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে'।

'আমি তো সে কথাই তোকে বার বার বোঝাতে চাইছি মা।'

মায়ের স্বরের কোমলতা তাকে স্পর্শ করলেও তা যেন তার কাছে মনে হয় যে- কোনওপ্রকারেই মায়ের অভিসন্ধি সফল করার চেষ্টা। সে স্পষ্টতই বুঝতে পারে মা এবার কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাইছেন। এবং তার এই সকাল আটটায় কী কাজ তাও মা জানেন। 'তোমরা কী চাও বলো তো? সব কিছুকেই এত নিজেদের মতো করতে চাও কেন? আমার কি নিজস্ব জগৎ, চিন্তাভাবনা থাকা অপরাধ?'

'অপরাধ কেন হতে যাবে? তোকে ভালবাসি, স্নেহ করি, তুই আমার সন্তান, তাই কোনও কিছু ভুল করার থেকে সাবধান করে দিই। হয়তো আমারই ভুল, আমি সেকেলে মানুষ। ঠিক আছে তুই যা ভাল বুঝিস কর। আমি আর তোকে কিছু বলব না।'

সে স্পষ্টতই মায়ের অভিমান বুঝতে পারে। মা হয়তো এই প্রসঙ্গে আবারও কোনও সময় কিছু বলবেন, সে তাও জানে, তবু এই মুহূর্তে তার সমস্ত ক্ষুব্ধতা স্তিমিত হয়ে যায়। 'মা তুমি রাগ করলে? তোমরা কেন আমাকে বুঝতে চাইছ না?'

মা কোনও উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যে অবস্থান তাকে ক্রমশ বন্দি করে ফেলছে, তা অতিক্রমের চেষ্টার অসফলতা তাকে অসহায় অস্থির করে তুলছে। এই অবস্থান তার চোখের কোণ দুটো চিকচিক করে ওঠার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। 'কেউ আমাকে বুঝতে চাইছে না' এরকম একটা ভাবনা তোলপাড় করার ফলে সে

আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। খুব দ্রুত সে এই ভাবনাকে অতিক্রম করতে চায়। সে আজকাল বাড়ির লোককে এড়িয়ে যেতে চাইছে, গোপন করতে চাইছে। কেন না, প্রতিদিন প্রায় একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতে তার মধ্যে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ইদানিং আর প্রতিদিন বিকেলে দেখা করতে পারে না দীপুর সঙ্গে আগের মতো, লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে। কেন না দেরি হলেই ইদানিং মা প্রশ্ন করে 'এত দেরি হল?' অথচ আগের মতো সে স্বাভাবিকভাবে বলতে পারে না 'দীপুর সঙ্গে বেড়াতে গেছিলাম।' বললেও বলবে 'রোজ এভাবে ঘুরতে ভাল লাগে?' মায়ের মনের কথাটা যেন সম্পূর্ণ হয় না। সে-ই এর পর ... বেহায়ার মতো বা অসভ্যের মতো ... বসিয়ে বাক্যটাকে সম্পূর্ণ করে। আর এই শাব্দিক ভাবনা সমস্ত সম্পর্ককেই অশ্লীল করে দেয়। কিংবা 'রোজই তোদের বেড়াতে হবে? বাড়ির কথাও তো মাঝে মাঝে ভাবতে হয়।' অথচ আগে এভাবে রোজ ঘুরলে তাকে এসব কথার সম্মুখীন হতে হত না।

এমনকী দীপু এসে বাড়ি থেকে নিয়ে যেত মাঝে মাঝে, তবুও। তারও ইদানিং রোজ ঘুরতে ভাল লাগে না। প্রথমত দীপু আজকাল ভীষণ চুপচাপ থাকে। এভাবে নির্বাকের মতো দিনের পর দিন ঘুরতে অসহ্য লাগে। দীপু নিজের থেকে ইদানিং কোনও কথা বলে না। অন্যমনস্ক থাকে। জিজ্ঞেস করলেও সে প্রায়ই এড়িয়ে যায়। তারপর বাড়ি ফিরলেই কৈফিয়ত। অথচ এভাবে জেরা করলে আজকাল কেমন যেন তার ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে। বয়সটাই এক্ষেত্রে তার প্রধান অন্তরায়। একটা বয়সের পর এসব কৈফিয়ত, বিশেষত সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও, মনে হয় তার স্বাধীনতাকে বন্দিত্বের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাই সে এড়িয়ে যায়। গোপন করে। অথচ রোজ রোজ এভাবে এড়িয়ে যেতে, গোপন করতেও তার সচেতন মন স্বীকৃতি দেয় না। কেননা গোপন করার পর মুহূর্তেই তার মনে হয় সে যেন তার এই বন্দিত্বকেই মেনে নিচ্ছে গোপন করার মধ্যে দিয়ে। তাছাড়া দু'জনে দু'জনের কাছে আসার জন্যে একটু নিরিবিলি খোঁজা, কেমন অস্বস্তিকর লাগে। মনে হয় অসংখ্য চোখ তাদের দিকে তাকিয়ে। আর এসব ভাবলেই কেমন অসহ্য লাগে সমস্ত পরিস্থিতি, পরিবেশকে। এই নিরিবিলি খুঁজতে খুঁজতে মাঝে মাঝে নিজেদের অশ্লীল মনে হয়। মনে হয় রাস্তার কুকুরের মতো অশ্লীল তারা, তাদের শরীরী আবেদন। কেননা মানুষের স্বাভাবিক মানবিক আবেদনকে, যৌনতাকে, সংস্কারের গণ্ডিতে বেঁধে, অশ্লীল, নোংরা করে দেখানো হয়। তাই তারা ইদানিং কোথাও, কোনও নিরিবিলি জায়গায় বসে না। আড়াল-আবডাল খোঁজে না। এই খোঁজটাই যেন অশ্লীল। তারা আজকাল রাস্তায় হাঁটে, গল্প করে, কিংবা দীপুর বাড়িতে বসে। আগে দীপ্তেনও তার বাড়িতে আসত, এখন আর আসে না। তাই আগে এতটা খারাপ লাগত না। কেন না তখন তার বাড়িতে বসে গল্প করতে পারত। দীপুর বাড়িতে ঘরের অসুবিধার ফলে তা সব সময় হয়ে ওঠে না। যদিও দীপুর নিজস্ব ঘর আছে। তবুও, তাদের বাড়ির মতো অসংখ্য ঘর নয় দীপুর বাড়িতে। মাত্র তিনটে ঘর। তাই মনে হয় তাদের কোনও সামাজিক স্বীকৃতি নেই। একটা বয়সের পর যা মানুষের প্রয়োজন। এখন মনে হয় দীপুর পাশে যদি একটু দীর্ঘ সময় থাকতে পারে তবে হয়তো দীপুর এ নির্লিপ্তি, একাকীত্ব কাটতে পারে। সঙ্গে তারও। অথচ তা যেন কিছুতেই হচ্ছে না। বিপরীতে রোজ দেখা করলে তাদের শরীর এবং মনের অসংখ্য আবেদন তাদের অভাব নিয়ে সামনে দাঁড়ায়। এতে আরও পরস্পরের ক্লান্তি বাড়ে। অথচ কম দেখা করলে, অল্প সময়ের জন্যে দেখা করলে বা একেবারে দেখা না করলে তাদের মধ্যে মানসিক সংযোগ নষ্ট হচ্ছে। দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। যেভাবে ইদানিং তার বাড়ির সঙ্গে দীপুর এক বিরাট দূরত্ব তৈরি হয়েছে। দীপুকে সে অনেকবার বলেও এটা বোঝাতে পারেনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতা গড়ে ওঠে তার শরীরী উপস্থিতির ফলেই। মানসিকভাবে একজনের সঙ্গে যতই মিল থাক না কেন, শরীরী উপস্থিতি না থাকলে তা দূরত্বের সৃষ্টি করবেই। সে এসব বোঝে। তবু সে যেন ক্রমশ বন্দি হয়ে যাচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থানে। কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছে না। তাছাড়া ইদানিং দীপু সন্ধের দিকে দুটো টিউশন করে চারদিন। ফলে তাদের দেখা করার সময়ও কমে গেছে। দিনের অন্য সময়, যেমন আজ, এরকম মাঝে মধ্যে দেখা হলেও রোজ তা সম্ভব নয়। কেননা, দু'জনেরই বিভিন্ন কাজ থাকে সারাদিন। তারও টিউশন থাকে। দীপুর লেখার জন্যেও মূলত সময় দেওয়া উচিত। যদিও ইদানিং অন্তত মাস ছয়েক দীপু কিছুই লেখেনি প্রায়। এভাবে ও শুধু নিজেকেই অবহেলা করছে, ধ্বংস করছে। তাদের এই অবস্থান নিয়ে দীপুর সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা হয়েছে, সেদিন একটু রাগারাগিও করেছে। বিতর্ক করেছে। তারপর দু'দিন সে দীপুর বাড়িতে গেছে অথচ দেখা হয়নি। দীপুও কি তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে? কেননা আগে যেদিনই সে এরকম রাগ করেছে, অভিমান করেছে দীপু পরের দিন দেখা করার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অথচ এবার সে দু'দিন দেখা করল না, হয়তো সময় পায়নি। কিন্তু তার মনে হয় একমাত্র সময়ই কি অন্তরায়? শুধুমাত্র সময়ের অভাবেই কি দীপু দেখা করতে পারেনি? আগে অবশ্য এমনও দিন গেছে বেশ কয়েকদিন দীপুর সঙ্গে দেখা হয়নি, কিন্তু তার মধ্যে এমন কোনও প্রশ্নেরও জন্ম হয়নি। তবে সেও কি নিজের অপরাধ-বোধে ভুগছে? তার এই অবস্থানই কি এইসব প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে? তার প্রিয় মানুষটার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে?

সেদিন দীপুর হাঁটুর উপর থুতনি রেখে ঘাসের দিকে তাকিয়ে এক মনে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। আর অন্য হাতের আঙুলগুলো তার আঙুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চাপ দিচ্ছিল। সেও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বলে ওঠে 'এভাবে আর ভাল লাগে না।' দীপু কী বুঝেছিল সে বলতে পারে না। হঠাৎ তার ধরে থাকা আঙুলগুলো হুট করে ছেড়ে হাত গুটিয়ে হাঁটুর উপর আড়াআড়ি রাখে। কিন্তু তার কথার কোনও উত্তর দেয় না।

'কী হলো?'

'কিছু না—'

'এভাবে আর কতদিন আমরা ভেসে ভেসে ঘুরে ঘুরে বেড়াব বুঝতে পারি না।'

হঠাৎ দীপু বলে, 'চলো যাই।'

দীপু কি এ কথাগুলো তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ভেবেছে? অথচ সে তো তাদের যৌথ অবস্থান সম্পর্কে বলেছে। সে জিজ্ঞেস করে 'এত তাড়াতাড়ি?'

'ভাল লাগছে না।'

'চলো। পরশু?'

'তোমার ভাল লাগলে এসো।'

দীপুর এই কথায় তার ক্ষোভ, অভিমান, রাগ মুহূর্তে জেগে ওঠে। তার সেই মুহূর্তে মনে হয় চারপাশের মানুষজনের মতো দীপুও তাকে বুঝতে চাইছে না। শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবছে। সে কিছুটা ক্ষুব্ধতার স্বরেই বলে 'এভাবে বলছ কেন? তোমার আমার উপর অধিকার নেই?'

'না, যে কোনও মানুষের উপর অধিকার থাকার জন্যে একটা ভিত্তি থাকে।'

'সে তো ভালবাসার ভিত্তি।'

'তাও নির্ভর করে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুর ওপর। চারপাশ

থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের ভালবাসা টিকিয়ে রাখতে চাইলেও এই পরিবেশের ক্ষত আমাদের সুস্থ মানসিকতাকেও ক্লান্ত করে। ফলে আমাদের এই ক্লান্তির বীজ বহন করতেই হবে।'

'তা হলেও থাকে। আমার আছে।'

'তা হলে এসো, তোমার ভাল লাগলে। তবে তুমি এলে আমার ভাল লাগে।'

সেদিন দীপু তাকে কী বলতে চেয়েছে সে বুঝতে পারেনি। এর আগে বহুবার ওর সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে। বিতর্ক হয়েছে কিন্তু কোনওদিন তো দীপু এমন 'না' বলেনি। তবে কি ওর ভালবাসার অধিকার শিথিল হয়ে আসছে? বেশ কিছুদিন দীপুর চুপচাপ হয়ে যাওয়া থেকেই তার মনে এই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। অথচ দীপুর এই শিথিলতার জন্যে কি সে নিজেই অপরাধী? আজ মনে হয় তার বাড়ির আত্মীয়স্বজন যে কথা বলেছে দীপু সম্পর্কে তা দীপুকে না বললেই ভাল হতো। অথচ এভাবে কি গোপন করা যায় প্রিয় মানুষটার কাছে? তাছাড়া দীপু তো তার আত্মীয়বন্ধুর কাছে একই অভিযোগে অভিযুক্ত। এসব নিয়ে সে বেশ কয়েক রাত ভেবেছে। বিশেষত শেষ দু'দিন দীপুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় এই দুশ্চিন্তা তার আরও বেড়েছে। কয়েক রাত ঘুমোতে পারেনি। অবশ্য শেষ দু'দিন সে দীপুর বাড়িতে গিয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেনি। প্রথমদিন দীপুর বাড়িতে আসার আগে দিদি তাকে ফোন করে 'স্বাতী একবারটি আসতে পারবি; তুতুন খুব অসুস্থ। তোর শ্যামলদাও বাড়িতে নেই। একবার ডাক্তারখানায় নিয়ে যাব।' সে 'আসছি' বলে ফোন রেখে দীপুর বাড়িতে যায়। ভেবেছিল দীপুকে বাড়ির থেকে নিয়ে দিদির বাড়িতে যাবে। কিন্তু দীপুকে বললেই সে যেতে রাজি হবে কি না সে-কথাও ভেবেছিল। কেননা, মূলত এই শ্যামলদার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েই তো দীপু আর তাদের বাড়ি যায় না। অবশ্য দীপু তার দিদি আর তুতুনকে খুবই ভালবাসে। তাই তুতুন অসুস্থ আর শ্যামলদা বাড়ি নেই জানলে হয়তো সে যেতে রাজি হবে। এসব ভাবতে ভাবতেই সেদিন রাস্তা হাঁটছিল সে। কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেখে দীপু নেই। কিছু জানিয়েও যায়নি। দীপুর মা বললেন, 'ও তো বাড়ি নেই মা। কিছু বলেও যায়নি। আর ও কোনওদিনই বেরনোর আগে জানিয়ে যায় না, কোথায় যাচ্ছে বা কখন ফিরবে। তোমার আসার কথা দীপু জানতো?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে একটু অপেক্ষা করো না। এখনই হয়তো এসে পড়বে।'

তারপর সে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করেছে। দীপু ফেরেনি। সে ভেতরে ভেতরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কেন দীপুর অপেক্ষা করল না? তার আসার সময় তো দীপু উদগ্রীব হয়ে থাকে। ওই সময় বাড়ি থেকে কোথাও যায় না। তবে কেন গেল? কিছু না জানিয়েই। তার সঙ্গ কি দীপুর ভাল লাগছে না? সে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু না জানিয়েই শুধু দীপুর মাকে বলে, 'মাসিমা, আজ আর অপেক্ষা করতে পারছি না। দীপু এলে বলবেন, আমি শুক্রবার আসব।'

দীপুর জন্যে অপেক্ষা না করে, চলে যাওয়ার কারণ না জানিয়ে রাস্তায় পা রেখেই বিপরীত চিন্তায় আক্রান্ত হল সে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই হত। দীপু হয়তো কোনও কাজে আটকে গেছে। হয়তো আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। তারপরই সে ভাবল দীপুর কাছে কি আজকাল তার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে? নাকি দীপুর সঙ্গে কিছুক্ষণ দেখা করার জন্যে দু-তিনদিন অপেক্ষা করতে হয় বলেই তার মধ্যে যে অতৃপ্তি, আগ্রহ, তাই তাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন করছে? তা না হলে তো এমন হতেই পারে। মানুষ এক-আধদিন কোনও কাজে বা কোনওভাবে আটতে যেতেই পারে। কিংবা আগের দিন দীপুর সঙ্গে রাগারাগিই কি তার মধ্যে এই প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে? সেও তো তার চলে আসার কারণ জানিয়ে আসতে পারত। অথচ সে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে এল। এভাবে না এলেই হত। এসব ভাবনার মধ্যেই সে দিদির বাড়ি পৌঁছল। অথচ তুতুনের কথা এতক্ষণ তার খেয়ালই ছিল না। ঘরে ঢুকে দেখে ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন লিখছেন। দিদি ফোন করে ডাক্তার ডাকিয়েছেন। সে দিদির উপর ক্ষুব্ধ হল। এভাবে তাকে ডাকার অর্থ কী? অথচ দিদিকে এ কথা বলাও যায় না। দিদি বলবে, 'একদিন যদি দেখা নাই হয় তাতে এমন কী ক্ষতি হবে?' অথচ দিদি বুঝবে না এক এক সময় মানুষের কাছে কয়েক মুহূর্তই খুব জরুরি হয়ে ওঠে। 'তুতুনের অসুখটা কি জরুরি নয়? তোর কাছে একদিন দীপুর দেখা না হওয়াটা এতটাই গুরুত্বের?' এ কথা ভাবতেই নিজেকে খুব ছোট, অশ্লীল মনে হল। সে শুধু নিজের কথাই ভাবছে। অথচ তুতুনকেও তো সে ভীষণ ভালবাসে। শুধুমাত্র কর্তব্যের তাগিদেই সে আসেনি। অথচ তার ভাবনার প্রক্রিয়ায় মনে হচ্ছে সে কর্তব্য করতেই এসেছে। ডাক্তার চলে যেতে সে তুতুনের গায়ে হাত দিয়ে অনুভবে বুঝল ১০১-এর ওপর জ্বর। সে নিজের উপরেই ক্ষুব্ধ হল, দিদির উপরে সাময়িক রাগ হওয়ার জন্যে। বুঝতে পারল ইদানিং সে অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। দিদি বলল, 'তোর এত দেরি হচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে ডাক্তার ডাকলাম ফোনে। তুই এসে পড়লে দু'জনে তুতুনকে চেম্বারে নিয়ে যেতে পারতাম। কাছেই চেম্বার। অথচ একা নিয়ে যেতে সাহস হল না। এটুকু সময়ের জন্যে তিনশো টাকা ফিজ দিতে হলো।'

দিদিকে থামিয়ে দেওয়ার জন্যে সে বলল, 'কি বললেন ডাক্তারবাবু?'

'এমন কিছু না। ঠান্ডা লেগে সর্দি-জ্বর হয়েছে। চা খাবি?'

'খাব—প্রেসক্রিপশনটা কোথায়?'

'রামুকে দিয়েছি ওষুধ আনতে। ওই এক বাঁদর। এক বললে আর এক বুঝবে।'

'শ্যামলদা কোথায়?'

'এখনও ফেরেনি। তুই একটু তুতুনের কাছে বোস, আমি চা করে আনছি। তুতুন অনেকক্ষণ ধরে তোকে খুঁজছে, মাসিমণি, মাসিমণি করে।'

তুতুন চোখ খুলে দেখে স্বাতী দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো বেশ লাল। স্বাতী কাছে গিয়ে বসতেই তুতুন দু-হাতে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে। তার নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। সেদিন রাতে সে আর বাড়ি ফেরেনি। ফোনে মাকে জানিয়ে দিয়েছিল পরদিন সকালে ফিরবে।

এত সকালে বেরতেও তার অস্বস্তি হয়। কেননা যখনই ভেবেছে এই শীতের সকাল আটটায় সে দীপুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তখনই কেমন যেন অস্বাভাবিকতা, শ্লীলতাহীন মনে হয়েছে। কিন্তু এটা তো স্বাভাবিক এক সম্পর্ক। যেখানে পরস্পরের মেলাটা স্বাভাবিক। অথচ সময়ের জন্যেই যে এই মেলাটা স্বাভাবিক নয়, অশ্লীল। বিশেষত মা যখন এসে প্রশ্ন করলেন 'এত সকলে কোথায় যাচ্ছিস?' এবং ব্যাপারটা গোপন করার মধ্যেই যেন আরও অশ্লীল হয়ে পড়ল। সে অবশ্য কোনওদিন সকালে যায় না। দীপুও বলে না। বললেও সে বলবে 'এত সকালে সম্ভব নয়।' আসলে সম্ভব নয় না ইচ্ছে করেই আসবে না। সেদিন যদি দেখা হত সে এ কথাই বলত। অথচ দেখা হয়নি। তাই তাকে হাজার অসুবিধা হলেও আজ যেতে হবে। কেননা আজকে দীপুর সঙ্গে দেখা করাটা জরুরি। যেহেতু আগে দু'দিন দেখা হয়নি। দীপুরও হয়তো আজ টিউশন নেই। না হলে সে তো এত সকালে আসতে বলত না।

শুক্রবারও সে দীপ্তেনের বাড়ি গিয়েছিল। দীপ্তেনের দেখা



পায়নি। অবশ্য সেদিন একটা ছোট চিঠি রেখে গিয়েছিল দীপু। 'স্বাতী, আগের দিন আমার ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। কিন্তু বাড়ি এসে শুনলাম তুমি মিনিট পাঁচেক আগে চলে গেছো। এত তাড়াতাড়ি কেন চলে গেলে বুঝতে পারলাম না। সমস্ত সন্ধেটা একা, ভীষণ হতাশার মধ্যে কেটেছে। তুমি তো জান আজকাল আমি বন্ধু-বান্ধবদের ওখানে সান্ধ্য আড্ডায় খুব কম যাই। গেলেও খুব ভাল লাগে না। তোমার সঙ্গে দেখা হলে বলতে পারতাম সেদিন, আজ ঘণ্টা খানেক দেরিতে আসার জন্য। কেননা আজ একটা টিউশনের সময় বদল করেছি, কাল ছাত্রের পরীক্ষা বলে। কালই শেষ। ডিসেম্বর মাসটা প্রচুর সময় পাব। অবশ্য সকালের টিউশনটা থাকছে। আজ যদি সম্ভব হয় অপেক্ষা করো। যদি না পার সোমবার সকালে সাড়ে আটটা নাগাদ এসো।'

এক ঘণ্টা তার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব ছিল না। কেননা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দীপুর সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। বেরবার সময় মা বলেছিলেন, 'আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিস। রোজ রোজ দেরি করে বাড়ি ফেরা ভাল নয়। তোর বাবা রাগ করেন।'

'বাবা না তুমি?'

'হ্যাঁ, তা তো বলবি। উনি তো তোদের কিছু বলবেন না। তোদের কাছে সাধু সেজে থাকবেন। আর আমার কাছে যত কৈফিয়ত করবেন। আমি যত অপরাধী। আমি কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি?'

'বাবাকে বলো আমি ছেলেমানুষ নই।'

'তোর এত বাড়াবাড়িও ভাল নয়।'

'বাড়াবাড়ি আমি করছি না তোমরা? তার থেকে আমাকে একটা শেকল পরিয়ে রেখে দাও না।'

'তোকে কিছু বললেই একই কথা বলবি। লেখাপড়া শিখে তোদের নম্রতা, সভ্যতা একেবারে চলে গেছে।'

এরপর আর কোনও বিতর্ক চলে না। রাগারাগি একটা পর্যায় অতিক্রম করলে চুপ করে যেতেই হয়। সে 'ঠিক আছে, তাড়াতাড়িই ফিরব, আর কোনও কথা নেই তো,' এ বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। চিঠিটা পেয়ে অসম্ভব ক্লান্ত লেগেছিল সেদিন। বাড়ি ফেরার পথে সে ভাবছিল, আমাদের এই ক্লান্তি, বন্দিত্ব, ধ্বংস কি আমাদের নিজেদের? নাকি এই সময়ের, সমাজের, এই যুগের?'

একই চিন্তার মধ্যে সে আজও দীপ্তেনের বাড়ির উদ্দেশে রাস্তা পা রাখল।

২

'কত দেরি হবে কিছু বলে যায়নি—না?'

'না, দাদা কোনওদিনই কিছু বলে বেরোয় না।' অদিতি চায়ের কাপটা স্বাতীর হাতে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ দীপ্তেনের ঘরে বসে অপেক্ষা করতে

করতে অধৈর্য হয়ে ওঠে স্বাতী। কেমন যেন এক অস্বস্তি উদ্বেগ কাজ করে ভেতরে ভেতরে। অথচ ওপর থেকে সে উদ্বেগ বিশেষ বোঝা যায় না। দীপ্তেনের টেবিলে রাখা Aesthatics & Politics-এর পাতা উল্টে যায় এক মনে। অথচ এই পাতা ওল্টানোর কোনও নির্দিষ্টতা থাকছিল না, কখনও খুব দ্রুত হাতে, কখনও ধীরে ধীরে, সময়ের নির্দিষ্ট ব্যবধান ছাড়াই। কখনও বাঁ-হাতে ধরে থাকা পাতাগুলি ফরফর করে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পাতা পেছনে চোখ রাখছিল। দীপ্তেন জানত আমি আজ আসব। তবু এত দেরি করছে কেন?

সে বইতে অগোছালো নজর রেখে নিজের ভাবনার জগতে ডুবে তলের সন্ধানে ক্রমশ অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল। দীপ্তেনের ফিরে আসার সময় পার হয়ে গেছে। অন্য অনেক সময় গেছে যখন স্বাতী এর থেকেও বেশি সময় দীপ্তেনের জন্যে অপেক্ষা করেছে, অথচ এখন কেমন যেন মনে হচ্ছে কত দীর্ঘ সময়। বেশ কিছুদিন থেকে সে লক্ষ করছে দীপ্তেন কেমন সমস্ত ব্যাপারেই অন্যমনষ্ক হয়ে উঠছে। নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আমাদের সম্পর্ককে কি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না? এগুলো কি ঘটছে আমার কোনও অন্যমনস্কতা থেকে? এই ভাবনা স্বাতীকে ক্রমশ অপরাধী করে তুলছে। আর তার থেকেই ক্রমশ উদ্বেগ। কেন দীপ্তেন এমন গুটিয়ে যাচ্ছে নিজের মধ্যে? সে কি জীবনের কাছে, বিশেষত আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও মৌলিকতা খুঁজে পাচ্ছে না? উত্তাপ খুঁজে পাচ্ছে না সম্পর্কের কাছে, বেঁচে থাকার মতো? আজকাল দেখা হলে বিশেষ কোনও কথা হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দীর্ঘ সময় পাশাপাশি হেঁটে যায়, বসে থাকে। কিংবা হয়তো অন্য প্রসঙ্গে এলোমেলো কথা বলে। প্রশ্ন করলেও কেমন এড়িয়ে যায়। সে নিজে তখন জোর করে কিছু জিজ্ঞেস করে না। কেন এমন নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে (?) সে-সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করে না। উত্তরের দাবি করে না। আর সে তো কোনওদিনই কোনও কিছুই জোর করেনি, দাবি করেনি। বারবারই মনে হয়েছে দীপ্তেন যদি আমাকে ভালবাসে তবে সে নিজের উপলব্ধিতে বুঝতে পারবে আমার কথা। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও গোপনীয়তা রাখবে না। তার সমস্ত কথাই আমাকে বলবে। জোর না করলেও, জিজ্ঞাসা বা দাবি না করলেও। আমার এ ভাবনা কি ভুল? আমি কী চাই? দাবি ছাড়া ভালবাসার মূল্য কতটা? যাকে ভালবাসা যায় তার কাছে দাবিও করা যায়। আমি কোনওদিনই কোনও দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চাইনি বা করতে পারিনি। তার অর্থ কি আমার ভালবাসায় কোনও গভীরতা নেই? তবে কি দাবিতেই ভালবাসার গভীরতা জন্মায়? আর পরস্পরের ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে, দাবিতে তা অন্যের চোখে খারাপ হয়ে যাবে কেন? কোনও কিছু জানতে না চেয়ে তার সম্পর্কে আমি কি ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধাকেই প্রকারান্তরে অশ্রদ্ধা জানাচ্ছি? একজন পুরুষকে জানতে না চেয়ে, বুঝতে না চেয়ে শুধু নিজের জীবনের অনিশ্চয়তাকে নিশ্চয়তা দান করার প্রয়োজনে 'অ্যাডজাস্ট' করে চলেছি? যাকে ভালবাসা বলে জেনেছি? আমি কী চাই, কেন চাই এসব, এসব-কিছু, আমার প্রতিটি অভিব্যক্তি, অন্যে বুঝতে বা জানতে পারে আমার প্রকাশ ভঙ্গির ওপর। আমি প্রকাশ না করলে অন্যে এগুলো কোনও সময়ই উপলব্ধি করতে পারবে না। আমার প্রতিটি প্রকাশ ভঙ্গি, প্রতিটি কাজই আমার সমস্ত অভিব্যক্তি, আমারই চরিত্রের সমগ্রতা প্রকাশ করে। আর নিজের প্রিয় মানুষের কাছেই তো সবচেয়ে জোরালো দাবি করা যায়। তবে কি আমিও দিন দিন উত্তাপহীন হয়ে যাচ্ছি? সম্পর্কের মৌলিকতা খুঁজে পাচ্ছি না? দীপ্তেনকে বেঁচে থাকায় উদ্দীপ্ত করতে পারছি না? অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তো একে অন্যের পরিপূরক হওয়া। অন্যের বেঁচে থাকাকে নিজের বেঁচে থাকা দিয়ে আলোড়িত করা। আর তা যদি না হয় তবে তা জন্তুর মতো বেঁচে থাকা। এতদিন সম্পর্কের মধ্যে যে উত্তাপ ছিল, মৌলিকতা ছিল, আজ কি তা ফুরিয়েছে? তবে শুধু কর্তব্য পালনের জন্যে একে অন্যকে আঁকড়ে থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সম্পর্ককে টেনে নিয়ে যাওয়ার কি যুক্তি আছে? তাছাড়া আমার জন্যেই দীপ্তেন আজ চাকরির চেষ্টায় এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। দায়িত্ব মনে করছে। আর এখান থেকেই কি দায়িত্বের বোঝা মনে করে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত হয়ে উঠছে? তবে কি ও শিল্পকে জীবনের থেকে গভীরভাবে ভালবাসে? আর তাই যদি হয় তবে এ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এ তো শুধু পরস্পরকে আঁকড়ে টিকে থাকা।

অদিতি ঘরে ঢোকে এক কাপ চা নিয়ে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে স্বাতীর কাছাকাছি বসে। স্বাতীর অমনোযোগ, অস্থিরতা লক্ষ করে প্রশ্ন করে, 'কী স্বাতীদি, কী ব্যাপার?' তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়।

'কিছু না' বলে স্বাতী এড়িয়ে যায় প্রশ্নকে।

অদিতিকে কি এসব কথা বলা যায়? আগে নিজের অনেক কথাই স্বচ্ছন্দে বলেছে অদিতিকে। কিন্তু আজ কেমন যেন মনে হচ্ছে অদিতি তার সব কথা ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। হয়তো প্রশ্নগুলোকে সঙ্কীর্ণতা মনে করবে। আগে কোনও কথা বলতে গেলে এত চিন্তা করত না বা অন্যে কীভাবে গ্রহণ করবে সেসব ভাবত না। অথচ আজ ভাবছে। অদিতিকে কি আজ বন্ধুর মতো গ্রহণ করতে পারছে না? এ কি অদিতির কোনও ব্যবহারের প্রতিফলন? আগে কি অদিতি তার কথা হালকাভাবে নিয়েছে? গুরুত্ব দেয়নি? কিংবা কোনও কথার ক্ষেত্র বিবেচনা না করে, ভুল বুঝে, তাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে? যেন তাকে ভুল বুঝলেই তার অস্তিত্ব ধসে পড়বে। এ কি তার অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা? অপরাধ চেতনা থেকে জন্ম নেওয়া দুর্বলতা? নিজেকে সে কখনও গোপন করেনি। অথচ এখন মনে হচ্ছে অন্তরের সমস্ত সম্পদ সে বিলিয়ে দিতে পারবে না। তাতে তার নিজস্বতা হারাবে। ব্যক্তিত্ব হারাবে। সে কি তার কষ্ট, অসহায়তা একা বইতে পারবে না? অথচ অদিতিকে পড়াতে আসার সময় প্রথম দিককার কথা মনে পড়ে। তখন কি সে কথাগুলো ঠিক বলেছিল নাকি এখন যা ভাবছে তাই ঠিক? প্রতিটি কথা বলার উপযুক্ত আধারের প্রয়োজন হয়। যে তার কোনও প্রশ্ন নিয়ে একইভাবে আলোড়িত হবে। কেউ কোনও কথায় আঘাত পায় তখনই, যখন তা তার অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, যাতে তার এতদিনের বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ভেঙে পড়ে। সে কি আজ বিতর্ক এড়িয়ে যেতে চাইছে? নিজের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, ভাল লাগা, চিন্তা-ভাবনা, ভুল হলেও, তাকেই কি আঁকড়ে থাকতে চাইছে? না, না, এ চিন্তা তার ভুল। এসব ভাবতে ভাবতেই সে বইটা বন্ধ করে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলল, 'দীপ্তেন আজকাল আমার সঙ্গে দেখা করার আর তেমন প্রয়োজনবোধ করছে না।'

'তুমিও আজকাল দাদার মতো Subjective হয়ে উঠছ স্বাতীদি। সহজ ব্যাপারকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছ না।'

'স্বাভাবিক নয় অদিতি। আজকাল সমস্ত ব্যাপারেই ও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠছে। দেখা হলে অধিকাংশ সময়ই ভীষণ চুপচাপ, বিষণ্ণ থাকে। আগের সেই স্বতঃস্ফূর্ততা, স্বাভাবিকতা ওর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত সম্পর্কটাই যেন মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে, মনে হয়। আর এতে আমিও ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি আজকাল।"

ইদানিং বেশ কিছুদিন হল অদিতিও লক্ষ করছে সমস্ত বিষয়েই স্বাতীদি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো কোনও বিষয়েই গভীর আলোচনা বা বিতর্ক করে না। অথচ বছর তিনেক আগে যখন স্বাতীদি তাকে পড়াতে এল কী ভীষণ জীবন ছিল, অন্তরঙ্গতা ছিল।

সে তখন বারো ক্লাসের ছাত্রী। স্বাতীদি তার থেকে বছর তিনেকের বেশি বড় নয়। প্রায় দাদার বয়সি। প্রথম প্রথম সে স্বাতীদিকে তথাকথিত ছাত্রীর চোখ দিয়েই দেখেছে। তার সমস্ত কথাবার্তায় ব্যবহারে কেমন আড়ষ্টতা জড়িয়ে থাকত। এই আড়ষ্টতার জন্যেই তো সে বয়সের তুলনায় সব বিষয়েই বেশ কিছুটা পিছিয়ে ছিল। এই কারণেই ছেলেবেলায় পড়াশোনা শুরু করেছে একটু বয়সে। সে চারপাশের জগৎ সম্পর্কে কী রকম ভয় পেত। অথচ খুব একটা কম বুঝত বা জানত তাও নয়। কিন্তু যারা খুব দাপটের সঙ্গে গভীর আত্মবিশ্বাসে অহম সর্বস্বভাব নিয়ে কোনও বিষয়ে ভুল বলে যেত, সে তাদের সঙ্গে কোনও বিতর্কে যেত না, ভুল বলছে জেনেও। কেমন ভয় পেত, আড়ষ্ট হয়ে থাকত এই সমস্ত ফাঁপা ব্যক্তিত্বের সামনে, বিশেষত বয়স্কদের সম্পর্কে, তাদের কোনও কথায়। সে সম্মান করতে গিয়ে বা সমীহ দেখাতে গিয়ে যা করত তা তার ভয়, আড়ষ্ট হয়ে থাকা। আসলে তার আত্মবিশ্বাসের ভীষণ অভাব ছিল, সে তা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারে। আর এখন তার আড়ষ্টতা কাটাবার মূলে, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার মূলে তো স্বাতীদি। প্রথম দিন থেকেই স্বাতীদি দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলায়, সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে গড়ে তোলার দিকে আগ্রহী ছিল। তার আড়ষ্ট ভাব দেখে, পড়াতে এসে প্রথম দিনই স্বাতীদি বলছিল 'জানো তো অদিতি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে তখনই, যখন তুমি বা আমি আমাদের সমস্ত কথা, কোনও গোপনীয়তা না রেখে, একে অপরকে বলতে পারব। সে-রকম সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে আমরা একে অপরকে ভালবাসতে পারব। আর যত ভালবাসতে পারব, ততই আমরা নিজেদের উন্মুক্ত করতে পারব একে অন্যের কাছে। তাই আমাদের মধ্যে গড়ে তোলা বন্ধুত্বের সম্পর্কই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক।' তাও তার আড়ষ্টতা কাটাতে সময় লাগছে দেখে কোনওদিন স্বাতীদি বলেছে, 'জান তো আমরা সম্মান দেখাতে গিয়ে বা নিতে চেয়ে, প্রয়োজনে জোর করে যা করি, যে ভাবে সম্পর্কের মধ্যে Discipline রক্ষা করতে চাই, তাতে সম্মান দেখিয়ে বা নিয়ে একে অপরকে গোপন করতে চাই। আসলে এগুলো সম্মান নয়, গোপনীয়তা। আর এই সম্মান অধীনস্থ করা বা হওয়ার মনোভাব থেকেই জন্মায়। সম্মান, শ্রদ্ধা এগুলো নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু তার জন্যে নিজেকে উন্মুক্ত না করা ভুল'। এই সমস্ত দিনগুলোয় সে কোনও প্রশ্ন বা বিতর্ক করত না। তা কি তার সেই আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্যেই? কিংবা বিতর্ক করে যদি নিজের এতদিনের বিশ্বাস ধ্যানধারণা ভুল প্রমাণিত হয় সেই ভয়ে? তা হলে কি নিজের আত্মবিশ্বাস আরও ভেঙে যাবে? এসব ভাবত আর নিবিষ্ট মনে শুনে যেত স্বাতীদির কথা।

স্বাতীদিকে ভীষণ কাছের মানুষ মনে হয়েছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে স্বাতীদি বলেছিলেন, 'আমরা মানুষের থেকে বস্তুকে বেশি সম্মান জানাই, বিশ্বাস করি।' সেদিন স্বাতীদির কথা ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু আজ বোঝে সে-কথার অর্থ। এভাবেই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর হয়ে উঠল। সে ক্রমশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল নিজের প্রতি। হাসি ইয়ার্কি গল্প সিনেমা পড়াশোনা—সবই চলত দু'জনের মধ্যে। কলেজের নির্দিষ্ট পড়ার বাইরে বিভিন্ন বইয়ের ওপর, বিশেষত শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি-দর্শন বিষয়ে আলোচনা চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মানুষে-মানুষে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করতে চেয়ে, আরও বেশি ভালবাসতে চেয়ে দীপ্তেনের সঙ্গে আলোচনায় ডুবে যেত দু'জনে। দাদা, স্বাতীদিকেই—তার আদর্শ হিসাবে জেনেছে সে।

'দাদা হয়তো কোনও কাজে আটকে গেছে—'

'এ তো যুক্তির কথা অদিতি—'

'তুমি কি ভাবছ দাদা তোমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে?'

'না, ঠিক বিপরীত। ও সম্পর্কগুলোকে যেভাবে পেতে চাইছে, যে মাত্রায় আবিষ্কার করতে চাইছে, যেভাবে বেঁচে থাকতে চাইছে, সেভাবে পাচ্ছে না। আর তাই ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ছে।'

অদিতি কোনও কথা বলে না। কী বলবে সে ভেবে পায় না। দাদা কি সত্যই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে? এমন মনে হয় না তার। আসলে জীবন সম্পর্কে, বাঁচা সম্পর্কে একরকম উদাসীনতা কাজ করছে। যেখানে আশা বা হতাশা কোনও কিছুই নেই। হতাশাও আশাবাদের আর এক রূপ। যে হতাশাগ্রস্ত সে কোনও না কোনওভাবে আশাবাদী।

'তোমার দাদার একটা চাকরির প্রয়োজন'—

'তুমি কি বলতে চাইছ চাকরি করলেই দাদার জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা কাটবে?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। কেননা মানুষ কাজ করে শুধুমাত্র অন্নের সংস্থান বা পেটের খোঁদল ভরাবার জন্যে নয়। যদিও এখন পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ পেটের প্রয়োজনেই কাজ করে কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে তো যাদের কাজ না করলেও খাওয়ার অসুবিধা হয় না। তবে তারা কাজ করে কেন? জীবনের যে একঘেয়েমি, একাকীত্ব ওগুলো কাটাবার জন্যেই করে। কাজ করে তার নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে।'

'কিন্তু যেখান প্রকাশের মাধ্যম আর কাজের ক্ষেত্র মেলে না?'

'সেখান দ্বন্দ্ব একটা থাকবেই। কিন্তু এই আর্থিক সমাজে অর্থকে বাদ দিয়ে কোনও কিছু ভাবতে গেলেই তা মানুষকে আরও হতাশাগ্রস্ত করে তুলবে।'

'কিন্তু জীবনের জন্যে জীবিকা না জীবিকার জন্যে জীবন?'

'দেখো অদিতি, এ কথাগুলো শুনতে ভাল কিন্তু বাস্তবত এর কোনও প্রতিফলন নেই। কোনও ফিলজফিক্যাল বেস নেই। যেমন জীবনের প্রয়োজনেই জীবিকা তেমনই জীবিকা ছাড়া জীবনের কোনও প্রতিফলন ঘটে না।' এ পর্যন্ত বলেই সে চুপ করে যায়। কী বলবে সে? সেও তো একদিন এরকমই ভাবত, অথচ আজ তার চিন্তাভাবনা অনেকটাই বদলে গেছে। যে অনিশ্চয়তার জন্যে একদিন মানুষ মানুষকে আঁকড়ে ধরে সমাজ সৃষ্টি করেছিল, আজ মানুষকে ছেড়ে অর্থই মানুষের কাছে বেশি নিশ্চয়তা দান করে ভেবে তাকেই আঁকড়ে ধরে। ফলে সেখানে মানুষকে বঞ্চিত করতেও তার বাধে না। মানবিক মূল্যবোধের বিপরীতে টাকার গুরুত্ব মানুষের কাছে বেশি। এসব ভাবতে ভাবতেই স্বাতী বুঝতে পারে সে ক্রমশ নিজের ভাবনার জগতে ডুবে যাচ্ছে। এবং প্রত্যেকটা যুক্তিই তৈরি করছে নিজেরই প্রয়োজনে। সে তো কই দীপ্তেনের কথা ভাবছে না। দীপ্তেনের শিল্পভাবনা, বেঁচে থাকা এসব নিয়ে। দীপ্তেন যদি এখনই সেটল্ করতে না চায় তবে সে নিজে কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে? তার অর্থ সে কি পারিপার্শ্বিকতার চাপ মেনে নিচ্ছে? সবাই চারপাশ থেকে তার বিয়ে নিয়ে যে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে তার কাছেই নতিস্বীকার করছে? 'বয়স হয়ে যাচ্ছে তোর এবার ভাবা উচিত।' দীপ্তেনের সঙ্গে থাকলে তার জীবন আরও অনিশ্চিত হবে সেই ভয়ে সেও কি গুটিয়ে যাচ্ছে? আর দীপ্তেনের সঙ্গে নিজের জীবনটা এমনভাবে জড়িয়ে গেছে, শেকড় এমন গভীরভাবে প্রথিত হয়ে গেছে যে একে শুধু 'গভীর ভালবাসা' এইরকম শব্দবন্ধের মধ্যে সীমিত করে ফেলা যায় না। তাই কি নিজেকে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়তে না পেরে নিজেরই স্বার্থে, নিজের প্রয়োজনে দীপ্তেনকে অন্য মানুষের চোখে কেজো মানুষ বানানোর চেষ্টায় চাপ দিচ্ছে! ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠেছে! সেও কি তাই একই কথার প্রতিধ্বনি করছে? আর এভাবে নিজেদের ভালবাসাকে খাটো করে, মানবিক মূল্যবোধকেই ধ্বংস করছে না? এভাবে কি জীবনকে নিশ্ছিদ্র করা যায়?

'তোমার একটা চাকরির প্রয়োজন' বা 'আর কতদিন আমরা

এভাবে....' এ তো শুধু সিকিউরিটি কনসাস হওয়া। হয়তো সে কোনও সময় নিজের অজান্তেই এমন চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, দীপ্তেন কোনও আর্থিক সংস্থান করতে পারলেই মানুষকে বলবে, 'দেখো দীপ্তেনকে তোমরা যা ভেবেছ, সে তা নয়, দীপ্তেন কেজো মানুষ' সে কি নিজের অজান্তেই তাদের মতবাদকে জয়ী করে দিচ্ছে না। 'অর্থই মানুষকে নিশ্চয়তা দান করে' এই মতবাদকেই প্রকারন্তরে মেনে নিচ্ছে? এতে তার সচেতন মনের প্রতিফলন কোথায়? সেও কি মেনে নিচ্ছে আর পাঁচজনের মতো দীপ্তেন অকেজো, ভ্যাগাবন্ড। আর্থিক মূল্য ছাড়া মানুষের কোনও মূল্য দেওয়া হয় না—এই প্রতিপাদ্যকে? আর এরই চাপে পড়ে সে কি দীপ্তেনকে ফাঁকি দিয়ে সরে যাবে আর নয়তো দীপ্তেনকেই চাপ দিয়ে বাধ্য করবে তাদের জীবন গতানুগতিক, নিশ্চিত, নিশ্ছিদ্র করে গড়ে তুলতে?

'বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়, তখন কে আর তোকে পছন্দ করবে? দীপ্তেন যদি না কিছু করে তবে তোর উপায় কী হবে?' এ ভাবনা কি তাকেও পেয়ে বসছে? সেও কি বাজারের আলু হয়ে যেতে চাইছে? নাকি এই চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সে চাইছে দীপ্তেন তাড়াতাড়ি সেটল্ করুক। পারিবারিক মানুষরা যেমন চাইছে দীপ্তেন তাদের মতো কেজো হয়ে উঠুক, সেও তাই চাইছে! দীপ্তেন যদি আরও কিছুদিন কিংবা সারাজীবন আর্থিক সংস্থান করতে না পারে, সে কি তা মেনে নিতে পারবে না? এ ভাবনা কি আইডিয়ালিজম? নাকি মধ্যবিত্ত অনিশ্চয়তা বোধ? সে তো যথেষ্ট পড়াশোনা করছে, তবে সে নিজে কেন মোমের পুতুল হয়ে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত? সে নিজে কেন কোনও চাকরির চেষ্টা করছে না? কোনও কলেজ বা নিদেনপক্ষে কোনও স্কুলে? তার অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট যা তাতে তো এমন একটা চাকরি পাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। এতে তো দীপ্তেনকে সাহায্য করা যাবে। সাহায্য? সাহায্য কথাটা আবার নিজের কানেই লাগে। শব্দটা এই মুহূর্তে দীপ্তেনকে কেমন ছোট করে দিল। এটা তো আমারও দায়িত্ব। নাকি আমি দায়িত্ব মনে করে দীপ্তেনের জীবন সম্পর্কে অমনোযোগিতাকে মেনে নিচ্ছি? তার অর্থ আমি কি দীপ্তেনের জীবন সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিষ্ঠিত করছি, ভালবাসাকে মহৎ প্রমাণ করার চেষ্টায়? এর মধ্যে দিয়ে আমি কি কোনও মহত্বে পৌঁছতে চাইছি? সাধারণত্বের উপরে উঠতে চাইছি? শুধু ভালবাসার প্রয়োজনেই কি দীপ্তেনের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিচ্ছি? একি ভালবাসা নাকি প্রকারান্তরে দীপ্তেনের সঙ্গে adjust করে চলা? বাধ্য হওয়া? না না এ ভাবনা ভুল। ভালবাসা না থাকলে শুধু বাধ্যই বা হব কেন? কীসের প্রয়োজনে, কী কারণে আমি দায়িত্ব মনে করছি? কর্তব্য করার মধ্যে কিছুটা বাধ্যতা আছে। কিন্তু দায়িত্বে? সে তো নিজের থেকেই নেওয়া। যার প্রতি আমার ভালবাসা নেই তেমন কারও জন্যে তো আমি ভাবছি না, বা দায়িত্ব বোধ করছি না। সে দীপ্তেন সম্পর্কে এত ভাবছে, অথচ দীপ্তেন তার প্রতিও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠছে। এসব চিন্তার মধ্যেই সে ভাবনার সাযুজ্যহীনতা লক্ষ করে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। দীপ্তেনের টেবিল থেকে এক টুকরো কাগজ আর পেনটা নিয়ে অদিতিকে বলে, 'আমি একটা চিঠি লিখে যাচ্ছি, তুমি দীপ্তেনকে দিয়ে দিও'। খুব দ্রুত চিঠি লিখে, তার হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অদিতি স্বাতীদিকে লক্ষ করে।

স্বাতীদির প্রতিটি ব্যবহার তার কাছে অস্বাভাবিক লাগে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নিজের ভাবনায় ডুবে থেকে দ্রুত চিঠি লিখে চলে গেল। 'কবে দেখা হবে?' তার এ প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত না দিয়ে। হয়তো শুনতে পায়নি নিজের ভাবনায় ডুবে থেকে। কিন্তু দাদার দায়িত্বহীনতা কি আজ স্বাতীদিকে চঞ্চল করে তুলেছে? স্বাতীদি কি আজ দাদাকে দায়িত্বহীন মনে করছে? কিন্তু স্বাতীদি নিজেই তো একদিন এ সমস্ত আদর্শকে, নিজের প্রতি দায়িত্ববান হওয়াকে মেনে এসেছে। তবে আজ কেন আর পাঁচজন মানুষ যে দৃষ্টিতে দাদাকে দেখে সেই দৃষ্টিতেই স্বাতীদিও দেখতে চাইছে? স্বাতীদিও কি মনে করছে দাদা নিজের প্রতি দায়িত্ববান নয়? একমাত্র অর্থেই এই মূল্য নির্ধারণ হয়? স্বাতীদি কি তার পারিপার্শ্বিকতাকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে? তবু স্বাতীদির চঞ্চলতা তাকে কেমন ছুঁয়ে যায়। আর তার মনে হয় দাদা শুধু কল্পনার জগতে বাস করে। বাস্তবতার মাটিতে তার শেকড় খুব আলগা। দাদার আরও বাস্তবমুখী হওয়া উচিত। অন্তত এই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে। দাদাই কি স্বাতীদিকে তিল তিল করে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলছে? এ কি সে ঠিক ভাবছে? নাকি সেও স্বাতীদির মতো, আর পাঁচজনের মতো দাদাকে দায়িত্বহীন ভাবছে?

৩

বেশ কিছুটা বেলায় বাড়ি ফেরে দীপ্তেন। গিয়েছিল সুবীরের বাড়িতে। লেকের ওদিকেই থাকে। লেক প্লেসে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই তার কথা মনে হল। কলেজের সহপাঠী। আজ থেকে বছর দশেক আগে বন্ধুত্ব ছিল। কলেজের সেই বছরগুলোয় ঘনিষ্ঠতাও ছিল হয়তো। আজকের সুবীর আর তার মাঝে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে, অন্তত চিন্তায়-চেতনায়, অবয়বে, আর্থিক সফলতায়, তা আর মনে হবে না। এই দশ বছরে দু'জনের ব্যবধান বিস্তর। কলেজ ছাড়ার পরের ন'বছর তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি কোনওরকম। অথচ গত এক বছরে অন্তত বার তিনেক দেখা হয়েছে। বিশেষত তার আগ্রহেই। সেই একদিন সুবীরকে আবিষ্কার করেছিল তাদের সেই নির্দিষ্ট কাফেতে, যেখানে বসে সে আড্ডা দেয়। যে কাফেতে সে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। খুঁজে পায় নিজের অস্তিত্বের সজীবতা। এই কাফের আড্ডাতেই বন্ধুবান্ধবরা তার কাজের গুরুত্ব, অস্তিত্বের গুরুত্ব স্বীকার করে। আর তার এই আড্ডায় বারবারই মনে হয়েছে, তারা ক'জন আলাদা জগতের বাসিন্দা। এক একটা দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন। তাদের শেকড় খুব আলগা, অন্তত বিষয়বোধসম্পন্ন মানুষের চোখে। তবু চারদিকে কেজো মানুষের পৃথিবীতে যেখানে সে নিজেকে শনাক্ত করতে পারে না, তার বাইরে এই জগতে সে সহজেই নিজের Identity খুঁজে পায়। বন্ধুরা মনে করে সে লেখক। আর এই সত্তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে তার চারপাশের জগত। মাঝে মাঝে মনে হয় এই অস্তিত্ব কত ঠুনকো, হালকা, কাচের পুতুলের মতো, হাত থেকে পড়লেই ভেঙে যাবে। তাই কি সে এই জগতের বাইরে বেরোতে চায় না? আত্মীয়স্বজন, যারা আর্থিক মূল্যে অস্তিত্বের গুরুত্ব নির্ধারণ করে, তাদের এড়িয়ে চলতে চায়? তাদের মূল্যকে, দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করতে ভয় পায়? তাদের মূল্যকে প্রাধান্য দিলে তার নিজের অস্তিত্ব সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। এ কি সত্যই তার অক্ষমতা? কিন্তু এতো সম্পূর্ণ তার ইচ্ছার প্রতিফলন। সে চায়নি কোনওদিন পুঁজি সংগ্রহ করে, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বাঁচতে। চেয়েছে তার চারপাশে গড়ে ওঠা পরিমণ্ডলকে, বৃত্তকে ঘিরে বাঁচতে। আজ কি সে তাই ভয় পায় তার এই পরিমণ্ডলকে, বৃত্তকে ভাঙতে? আসলে সে কি চেয়েছে তার চারপাশে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক? এই কথাগুলোর মধ্যেই মোহ থেকে গেছে? তাতেই খুঁজে পায় তার Identity? যেমন একদিন সুবীরদের ধারণায় 'ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট' বলার মধ্যে খুঁজে পেত নিজেকে। এভাবেই স্কুল-কলেজ জীবনে গড়ে উঠেছিল তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানকে সে নিজেই ভেঙেছে।

সেই কারণেই কি এক বছর আগে যেদিন এই কাফেতেই সুবীরকে আবিষ্কার করেছিল সেদিন তাকে চিনতে সুবীরের বেশ কিছুটা সময়

লেগেছিল। আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎই লক্ষ পড়ে কোণার দিকে টেবিলে। এক বান্ধবীর সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে।

'আরে সুবীর! কী খবর?' উঠে গেছিল সুবীরের টেবিলে।

সুবীর তার ভ্রু-জোড়া কুঁচকে কিছুটা সময় নিয়ে ধাতস্থ হয়ে বলেছিল, 'চেনা চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না তো?'

বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল সে। কী বলবে, কীভাবে নিজের পরিচয় দেবে দশ বছর আগের এক বন্ধুর কাছে? ভেবে পাচ্ছিল না। যে একেবারেই চিনতে পারছে না তাকে শুধু নাম বললেই চিনতে পারবে? তবু কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে বলেছিল, 'কী রে বেমালুম ভুলে গেছিস!'

সে আর কিছু বলতে পারেনি। আর সুবীরও হয়তো তার পরিচিত প্রিয়জনদের পৃথিবীর কক্ষপথে একবার ঘুরে দেখে নিচ্ছিল স্মৃতির ভাঁড়ার। সুবীর কি সত্যিই তাকে চিনতে পারেনি? এ প্রশ্ন উঁকি দেয় তার মনে। মাত্র দশ বছর। এক বিশাল দূরত্ব। মনে হয় কয়েক হিমযুগ দূরে। কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জীবাশ্ম ভেসে আসে চেতনায়।

'আমি দীপ্তেন। দীপ্তেন সেন। সুরেন্দ্রনাথের বছরগুলো মনে পড়ে?'

'আরে দীপু! তুই! কী চেহারা করেছিস! আমি চিনতেই পারি নি। কিছু মনে করিস না।'

তার শরীরে আগের সেই চাকচিক্য নেই। রোগাও হয়ে গেছে হয়তো কিছুটা। তেমনই সুবীরের শরীর মেদবহুল বিশালতা পেলেও দীপুর চিনতে অসুবিধা হয়নি।

'কি করছিস বল?' সুবীর প্রশ্ন করে।

'কিছু না।'

'কিছু না মানে?'

মানে, হ্যাঁ, সত্যিই তো, এমন কথায় মানুষ বিস্মিত হবেই। তাছাড়া সে কিছু করছে না এমন তো নয়। কিছু নিশ্চয়ই করছে। কিন্তু কী বলবে? অন্তত সুবীর যা জানতে চাইছে। উপার্জনক্ষম কোনও বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত না থাকলে তাকে বেকার বলা যায়। যে অর্থে সে তো বেকারই। যদি কাজের ভিত্তিতে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় তবে তা হবে নিষ্কর্মা, ভ্যাগাবন্ড। কিন্তু সে কি কাজ করছে, না করছে না? এসব ভাবতে ভাবতে সে বলে 'পড়াশোনা'। নিজেকে গোপন করার জন্যে সে কি একথা বলল?

'এখনও চালিয়ে যাচ্ছিস? বাঃ! আমরা তো কবেই শেষ করেছি।'

'হ্যাঁ, তোরা যত তাড়াতাড়ি পৃথিবীটাকে আর জীবনের ঘাতঘোত বুঝে ফেলেছিস, আমি তত তাড়াতাড়ি পারিনি। এখনও চেষ্টা করছি।'

সুবীর ঠিক বুঝতে পারে না। কিংবা হয়তো না বোঝার ভান করে। 'কী পড়ছিস?'

নিজেকে গোপন করার ইচ্ছা তার কোনওদিনই নেই। অনেকদিন পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়া এবং তার না চেনার এক দুরূহ চেষ্টা দীপ্তেনকে কেমন তির্যক করে তোলে। কিংবা জীবনে যারা সফল বলে নিজেদের ভাবতে শিখেছে তাদের সঙ্গে এক দুর্বোধ্য খেলায় মেতে সে তৃপ্তি অনুভব করে। হয়তো জীবনে আর্থিক সফল



মানুষদের চোখে তার অসফলতা তাকে অতৃপ্ত করে তোলে। জীবনকে অন্যরকম করে গড়ে তুলতে চেয়ে আজ জীবনের বিরুপতা তাকে যে ব্যঙ্গ করে, সে তাকেই বিদ্রুপ করে বোঝাতে চায়, যারা সফল ভেবেছে নিজেদের তারাও হয়তো তারই মতো জীবনের অনেক দিকে অসফল।

'বিভিন্ন Subject-এর ওপর।'

'মানে? এমএ পড়ছিস?'

সুবীর কলেজ জীবনে বাম ছাত্র রাজনীতি করত তারই সঙ্গে। আর কলেজ জীবনেই সে দেখেছে সুবীর কী ভীষণ সফলতার সঙ্গে বাম রাজনীতিকে কেরিয়ার গড়ার হাতিয়ার হিসাবে দুমড়ে মুচড়ে নিজের মতো ব্যবহার করতে শিখেছে। দূরত্ব তখন থেকেই বাড়তে শুরু করে। আর এখন তো কয়েক হিমযুগ .... অপরিচিত দীপ্তেন ... সে ভাবছিল। বলল, 'আচ্ছা সুবীর মানুষ যা কিছু করে কেরিয়ারের জন্যে,—না?'

'কেরিয়ার ছাড়া এ পৃথিবীতে বাঁচা মুশকিল।'

'তাই বলে যে কোনও মূল্যে?'

'হ্যাঁ, নয়তো তুই বাঁচতে পারিস না। কিন্তু তুই প্রশ্নটা করলি

কেন?'

'মানুষ পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কেন? জানার প্রয়োজনে নাকি ডিগ্রি/কেরিয়ারের জন্যে?'

'কারও কারও ক্ষেত্রে জানা, কারও কেরিয়ার।' সুবীর বলে।

'না, ডিগ্রির প্রয়োজন হয় এই শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শুধুমাত্র স্ট্যাটাস্ সিম্বল বাড়াবার জন্যে। আর আমার এ সবের প্রয়োজন নেই। আমি যে পড়াশোনা করছি তাতে পৃথিবী, তার মানুষ, সময়কে জানার চেষ্টা করছি।'

সুবীর আর বিতর্কে গেল না। প্রসঙ্গ বদল করে জিজ্ঞেস করে—'লেখালিখি চালাচ্ছিস?'

'চেষ্টা করছি—'

'কই কোথাও তো দেখি না'—

তার বলতে ইচ্ছা করছিল, খবরের কাগজ ছাড়া আর কোনও ছাপার অক্ষরে কি তুই সারাদিনের মধ্যে চোখ রাখার সময় পাস? কিন্তু বলল না। সুবীরই নিজেকে সংশোধন করল। 'অবশ্য আমার আর ওই পৃথিবীর সঙ্গে একেবারেই যোগাযোগ নেই। জানিস দীপু, কলেজ জীবনের সেই ছেলেমানুষিগুলোর কথা ভাবলে এখন কেমন হাসি পায়।'

'হ্যাঁ, তোর সেই কলেজের দিনগুলো মনে পড়ে?' দীপ্তেন আগ্রহী হয়।

'মানে সেই লিটল ম্যাগ্....বাম রাজনীতি? হাস্যকর। তুই এখনও একইরকম ছেলেমানুষ রয়ে গেলি।'

দীপ্তেন তির্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মতো বলে, 'তোরা খুব তাড়াতাড়ি পরিণত হয়ে গেছিস।' অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করছিল তার। কিন্তু সে সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে গেল না।

জিজ্ঞেস করল, 'তোর কী খবর বল।'

'আমার আর কী খবর বলব। তোদের মতো আমার জীবনে বৈচিত্র্য নেই। খুবই সাদামাটা। মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জির ম্যানেজার। বড় গতানুগতিক, জানিস দীপ্তেন।'

'যাক গে, এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—আমার বান্ধবী অনিতা, অনিতা মুখার্জি—বিখ্যাত মুখার্জি অ্যান্ড মুখার্জির ডিরেক্টরের একমাত্র মেয়ে। তোর তো আবার এ জগতের সঙ্গে ঠিক পরিচয় নেই, দীপু?'

'নেই বললে ভুল বলা হবে। তবে তোদের মতো সরাসরি যোগাযোগ নেই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝেমধ্যে মিঃ এ মুখার্জির সম্পর্কে রিপোর্ট পড়েছি। ভারতের ইকনমিক স্ট্যাটিকটিক্স-এ মিঃ মুখার্জিকে গণ্য করা হয়। সেই সব হিসাবেই দেখেছি। একবার কী একটা রফতানি বাণিজ্যের কেসেও মিঃ মুখার্জির নাম জড়িয়েছিল, না?'

'তুই তো অনেক খবর রাখিস—'

অনিতার ফর্সা মুখ কেমন ফ্যাকাসে রক্তহীন হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রতিবাদের সুরে বলে, 'ওগুলো ইডিয়োটিক রিপোর্ট।'

'হ্যাঁ, জানি, আমাদের রিপোর্টাররা আজকাল রিপোর্টের তুলনায় ফিচার লিখতেই ব্যস্ত বেশি। তাই না?'

'বড্ড কাহিনি ফাঁদে।' সুবীর বলে।

দীপ্তেন প্রসঙ্গ বদল করে 'বাইরের লিমুজিনটা আপনার?'

'বাবার।'

'এখন আপনার এক্তিয়ারে'—

'সুবীর ড্রাইভ করছিল।'

'হ্যাঁ, সুবীর ভাল ড্রাইভার। সবাই ও রকম ড্রাইভ করতে পারে না। কিন্তু আপনারা এই কাফেতে?'

'সো হোয়াট?'

'না, তা কিছু নয়। হঠাৎ মনে হল তাই প্রশ্নটা করে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।

'না, না। সুবীরের চা খেতে ইচ্ছে করছিল, নেমে পড়লাম।'

সুবীর হাতঘড়ির দিকে তাকায়। 'অনেক রাত হল। আজ উঠি দীপু। তুই কি এখনও আড্ডা দিবি?'

'হ্যাঁ, থাকব কিছুক্ষণ।'

'একদিন চলে আয় না বাড়িতে।'

'যাব। ঠিকানাটা দে।'

ঠিকানা লেখা একটা কার্ড মানি-ব্যাগ থেকে বের করে তার হাতে দিয়ে সুবীররা বেরিয়ে যায়। সে ভাবে, সুবীরকে এভাবে না বললেই হত। কেরিয়ার প্রসঙ্গে সে যা বলেছে তা তো অনেকটাই সুবীরের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে। অথচ সে দেখেছে, মানুষ যেভাবে পৃথিবীকে বুঝেছে, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছে সেভাবেই সে তার কেরিয়ার গড়ে তোলে। সেও তো এতদিন ধরে লেখালিখি নিয়ে বুঁদ হয়ে থেকেছে। নিজের স্বপক্ষে যা কিছু গড়ে তুলেছে তা তার কেরিয়ার হয়েই উঠেছে। তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। হয়তো তফাত আছে। কিন্তু মানুষ যা কিছু করে তা তো তার স্বপক্ষেই। আর তাই তার কেরিয়ার হয়ে ওঠে। সুবীর হয়তো নিজের অস্তিত্বকে সহজেই বিকিয়ে দিয়ে কেরিয়ার গড়েছে। অথচ সেই সুবীরের কাছেই তো তাকে আজ যেতে হয়েছিল তার একটা চাকরির জন্যে। এর আগেও গিয়েছিল একদিন। সন্ধের সময়। সুবীর খুব ব্যস্ত ছিল। কী একটা পার্টিতে না কোথায় বেরোচ্ছিল অনীতাকে নিয়ে। বলল 'অন্য একদিন সকালের দিকে আয় না। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। আমি সকালে বারোটা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকি।' তিন-চারদিন পরে যাবার জন্যে সময় বলেছিল। সেদিন অবশ্য চাকরির কথা বলেনি। সময় বা সুযোগ হয়নি। অথচ ফেরার পথে ভেবেছিল, কেন যাবে এইসব মানুষের কাছে তার চাকরির উমেদারির জন্যে? তার শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এই প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এর জন্যে জীবনের যদি কিছু সুখ বিসর্জন দিতে হয় তবে তাতে সে ভয় পাচ্ছে কেন? কেন এই সমস্ত অসার ফাঁপা ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে ক্লীব করে দিতে চাইছে? লেখার মাধ্যমে সে যে মানবিক মূল্যবোধের কথা, অস্তিত্বের কথা বলেছে, তাকেই ধ্বংস করে দিতে চাইছে তার জীবনে? আর এভাবে সে কি তার শিল্পকেই ক্ষুণ্ণ করছে না? তাই তিন-চারদিন পরে আর যায়নি। অথচ গত কয়েক মাসে তার ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। আজ কেমন যেন মনে হল...

প্রায় ছ'মাস পরে আজ হঠাৎই চলে গেছিল সুবীরের বাড়ি। ডোর-বেলটা বাজাতে চাকর এসে দরজা খোলে। 'কাকে চাই?'

আগে যেদিন এসেছিল সেদিন একে দেখেনি। বলল, 'সুবীর আছে?'

'হ্যাঁ, কী বলব?' ভ্রু-জোড়া কুঁচকে বেশ বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল সে।

'বলবে দীপ্তেন এসেছে।' এ কথায় বলায় সে একটু ইতস্তত করছে দেখে বলল, 'হ্যাঁ, বললেই বুঝতে পারবে।'

দীপ্তেনকে দাঁড় করিয়ে সে ভেতরে চলে যায়। দীপ্তেন বুঝতে পারে সুবীরের কাছে অনেক মানুষই দেখা করতে আসে। তাই শুধু নাম বললে বুঝতে পারবে কি না এ ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়েছিল, যে দরজা খুলে দিল তার মনে।

মিনিট দুই পরে সে ফিরে এস বলল, 'বাবু বাথরুমে। আপনাকে বসতে বললেন।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে সে দীপ্তেনকে দোতলায় একটা ঘরে

বসায়। আগে যেদিন এসেছিল সেদিন হয়তো এই ঘরেই বসেছিল। ঠিক মনে করতে পারছে না। অবশ্য সেদিন দু'মিনিটের বেশি বসেওনি। তাই খুঁটিয়ে, সব কিছু দেখার সুযোগ হয়নি। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

সে বলল, 'মন্টু।'

'আচ্ছা মন্টু, তোমার বাবুর কত দেরি হবে?'

'তা তো বলতে পারি না।'

মন্টু বেরিয়ে যেতে সে ঘরের চারদিকে লক্ষ করে। এটা সম্ভবত সুবীরের বৈঠকখানা। দেওয়ালে দামী ডিস্টেম্পার। মেঝেতে মোজাইক। কিন্তু ঘরের মধ্যে তারই উপর দামী লোমশ কার্পেট বিছানো। সে লক্ষ করে চটি-সহ পায়ের পাতা পর্যন্ত কার্পেটের গভীরে ডুবে গেছে। ঢোকার আগে তাই সে একটু ইতস্তত করেছিল। চটি পরে ঢুকবে কি না ভেবে। তারপর ঢুকে পড়ে। সে যে সোফার ওপর বসে আছে শরীরের অর্ধেকটা ডুবিয়ে, তার সামনের দেওয়ালের মাঝামাঝি অর্ধেকটা জুড়ে একটা রঙিন মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম। দেওয়ালে লাগানো। শুধু সামনের কাচ দিয়ে রঙিন মাছেদের নড়াচড়া লক্ষ করা যায়। সুবীর হয়তো অবসর সময়ে এইসব মাছদের খেলা দেখে। সুখী মাছেরা কেমন খেলে বেড়ায় বন্দি জলাশয়ের মধ্যে। এসব ভাবতে ভাবতে তার হঠাৎই মনে হয়, যদি অ্যাকোয়ারিয়ামটা ভেঙে মাছগুলো মেঝের কার্পেটের উপর নেমে আসে কোনওদিন? মাছেরা চলে বেড়াবে মখমল কার্পেটের উপর এলোমেলো। সুবীরের কার্পেট নিপুণতা নষ্ট হয়ে যাবে। রঙিন মাছেদের খেলা দেখে অবসরযাপনে বিঘ্ন হবে। সে একটা সিগারেট ধরায়। কাচ লাগানো সেন্টার টেবিলের ডানদিকে কতগুলো ম্যাগাজিন। সবগুলোই ব্যবসা-সংক্রান্ত। একটু উল্টে-পাল্টে দেখে আবার রেখে দেয়। অন্য সময় হলে হয়তো এগুলোতেই মনোযোগী হত কিন্তু এই মুহূর্তে ভাল লাগল না। বাইরে ঠান্ডাটা এখনও বেশ জাঁকিয়ে রয়েছে। আজ হয়তো তাপমাত্রা আট বা ছয় হবে। অথচ ঘরের মধ্যে বেশ উষ্ণতা। সে হিমশীতলতা অনুভব করে না। আলোর উত্তাপে রঙিন মাছেরা উষ্ণতায় খেলে বেড়ায় অ্যাকোয়ারিয়ামে। সেন্টার টেবিলকে ঘিরে আরও তিনটে সোফা। তার বাঁ-দিকের দেওয়ালে দুটো বড় কোণারকের মৈথুন-শিল্পের প্রতিচ্ছবি। ঠিক তার পিছন দিকে ডানদিকের দেওয়াল চেপে একটা বইয়ের আলমারি। তাতে রবীন্দ্র-শরৎ ইত্যাদি রচনাবলী সাজানো। খণ্ডগুলো ঠিক পরপর সাজানো। সে প্রতিটি খণ্ড সংখ্যা মিলিয়ে দেখে। ঘরটা নিখুঁত সাজানো। কোনও দেওয়ালে বা মেঝের কার্পেটে এক ফোঁটা দাগ নেই। সুবীর চিরদিনই খুব সাজানো গোছানো। ফিটফাট। সব কিছুর নিয়মশৃঙ্খলাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চায় নিজের প্রয়োজনে। খুব সিস্টেমেটিক। আর সে কোনও কিছুর নিয়মশৃঙ্খলাকে তোয়াক্কা করেনি কোনওদিন। রাস্তার চটি পরেই ঘরে ঢুকে পড়েছে। কার্পেটের ওপর খুঁটিয়ে লক্ষ করার চেষ্টা করে কোথাও দাগ লেগেছে কি না? চটিটা কি সে বাইরে খুলে রেখে আসবে? এসব ভাবতে ভাবতেই নিজেকে খুব বোকা মনে হল। এ ঘরে তাকে বেমানান ঠেকছে। মাথায় এলোমেলো না-কাটা চুল। গালে সপ্তাখানেকের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অজান্তেই হাতটা গালে উঠে যায়। এভাবে বসে থাকার অর্থ কী? স্বাতীর বাড়িতে আসার সময় হয়ে গেছে। না এলেই হত। স্বাতীর কথা মনে হতেই সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে প্রায় মিনিট পঁচিশ হল এসেছে। চলে যাবে কি না ভাবল। কিন্তু আশপাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এমনিই নেমে গেলে হয়। কিন্তু গেল না। একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে এলোমেলো পাতা ওল্টাতে থাকে। আরও মিনিট পনেরো পরে সুবীর এলো। শীতের স্যুট পরে। সুন্দর একটা টাই। তাকে দেখে দীপ্তেন বিস্মিত হল। বেশ বিরক্তও হল সে। বলল, 'আমি অনেকক্ষণ এসেছি।'

'হ্যাঁ, জানি। দেখ না এখনই বেরতে হবে। রেডি হতে হল সকালেই। তাই দেরি হয়ে গেল।'

ডানহিলের প্যাকেটা টেবিলের উপর রাখল।

সুবীর কি তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে? তাই বা হবে কেমন করে। সুবীর তো জানত না সে আজ আসবে। 'তুই যে বলেছিলি বারোটা পর্যন্ত বাড়িতে থাকিস।'

'হ্যাঁ, সাধারণত তাই থাকি। কিন্তু আজ একটা জরুরি কাজে বেরতে হচ্ছে।'

এতক্ষণ তাকে বসিয়ে রেখে এ কথা জানানোর অর্থ সে বুঝতে পারল না। বলল, 'চল, তা হলে ওঠা যাক।'

'না, না, বোস না। পাঁচ মিনিট দেরি হলে অসুবিধা হবে না।'

কোনও কথা খুঁজে পেল না সে। যে কথা বলবে বলে এসেছিল তা এমন দুম করে পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে কি বলা যায়! তাই কী বলবে একথা ভেবে বেশ অস্বস্তি বোধ করল। আবার একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাল।

'তোকে চা দিয়েছে?'

'না, তোর পরিচিত বলে Identify করতে পারেনি।'

'তুই একইরকম রয়ে গেলি দীপ্তেন।' বেশ আহত স্বরে বলে, মন্টুকে ডেকে দু-কাপ কফি আনতে বলল।

তার কোনও পরিবর্তন হয়নি ভেবে দীপ্তেন আশ্চর্য হয়।

বলে, 'আমি খাব না।'

'কেন?'

'এখনই উঠতে হবে।'

'আরে উঠবি। বোস। মন্টু দাঁড়িয়ে আছে দেখে বলল, 'তাড়াতাড়ি কফি নিয়ে এসো। এখনই বেরব।' তারপর দীপ্তেনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কতদিন পরে দেখা বলত। সেদিন আসব বলে এলি না কেন?'

সে কোনও উত্তর দিতে পারে না। কী বলবে, নিজের অস্তিত্বকে এভাবে যে কোনও জায়গায় যে কোনও মূল্যে বিকিয়ে দিতে পারবে না ভেবে সেদিন আসেনি? তবে আজ এসেছে কেন? এ প্রশ্নে নিজের সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখে। সে আবার অস্বস্তি বোধ করে।

কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা তোর শৈবালকে মনে আছে?'

'কোন শৈবাল। কলেজে আমাদের সঙ্গে রাজনীতি করত?'

'হ্যাঁ'।

'একদিন রাস্তায় দেখলাম, সম্পূর্ণ ড্রাঙ্কড অবস্থায় রাস্তা পার হচ্ছে। তোর সঙ্গে দেখা হয়?'

'হ্যাঁ, প্রায়ই দেখা হয়।'

'তুই, শৈবাল সব একই রকম রয়ে গেলি। আসলে তোরা স্মৃতিকে ভুলতে পারিসনি বলেই এই অবস্থা।'

'হয়তো!'

'তুই এখনও রাজনীতি করছিস? সুবীর জিজ্ঞেস করে।

'না।'

'কেন?'

যেখানে পার্টির মধ্যে কোনও রাজনৈতিক বিতর্ক নেই, মতাদর্শগত বিতর্ক নেই, পার্টি বলতে ব্যুরোক্র্যাসি, উপর থেকে নীতি নির্ধারণ করে নিচেরতলার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে পার্টি রুটলেস।'

'তুই অনেক দেরিতে বুঝেছিস।'

এ কথায় সে বেশ ক্ষুব্ধ হয়। বলে, 'দেখ সুবীর, এভাবে আমার

কথাকে মিসগাইড করিস না। যারা পার্টিকে নিজের কেরিয়ারের স্বার্থে ব্যবহার করে সরে গিয়ে ভাবে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এ সমস্ত পার্টির অসারত্ব বুঝতে পেরেছি, আমি তাদের দলে নই। উপরন্তু বলতে পারিস তাদের আদর্শহীনতাই আজ পার্টির আদর্শ হওয়ায় আমি সরে গেছি।' একটু সময় নিয়ে সে আবার বলে, 'তাছাড়া পার্টির মধ্যে আজ অহরহ Split হচ্ছে। এটা কতটা মতাদর্শগত আর কতটা ব্যক্তিস্বার্থে তা ভাবা উচিত।'

'যারা উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী তাদের মধ্যে আরও বেশি। ওভাবে হুট করে বিপ্লব হয় না।'

'এটাও তোর ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। এভাবে হয় না ওভাবে হয় এসব দূর থেকে না বলাই ভাল। আমরা পারিনি, আমরা কিছু করছি না, এটাই সবচেয়ে সহজ স্বীকারোক্তি। তারা তো অন্তত যেভাবে হোক চেষ্টা করছে।'

'কিন্তু তুই তো একদিন ওদের সমর্থন করতিস। চেষ্টা করলে নেতৃত্ব দিতে পারতিস। সে সুযোগ এবং সম্ভাবনা তোর ছিল। তবে সরে এলি কেন?'

'সে কথা তো আমি আগেই বললাম। এ সমস্ত পার্টিতে কোথাও আত্মজিজ্ঞাসার স্থান নেই। নেতৃত্ব দিলে বড়জোর একটা সুযোগসন্ধানী খেলোয়াড় হতাম। আর এ সিস্টেম কী চায় জানিস, প্রত্যেকেই এমন এক-একজন খেলোয়াড় হয়ে উঠুক।'

'তা হলে তো সব পার্টির একই অবস্থা।'

'কিন্তু তার মানে তো আমি বলিনি পার্টির সবাই বাজে। নিজের স্বার্থেই পার্টি করছে। আমি পারিনি এটাই সহজ স্বীকারোক্তি। যে কোনও কারণেই হোক। নিজের সমালোচনা আগে প্রয়োজন।'

'কিন্তু তুই বল না, দেশের মানুষ কিছু জানে না আর তোরা বিপ্লব শুরু করে দিলি। এটা কি সম্ভব?'

'দেশের মানুষ কী জানবে? ক্যাপিট্যাল মুখস্থ করে বিপ্লবে নামবে? রাশিয়া, চিন বা কিউবায় তাই হয়েছিল?'

কফি আসে। সে বিতর্ক থামিয়ে কফির দিকে মনোযোগী হয়। কেননা, সুবীরের সঙ্গে এসব আলোচনা করতে তার ভাল লাগছিল না। তাছাড়া যে কথা বলবে ভেবে এসেছিল, সে কথা আর বলা হবে না বুঝতে পারে। এবং সে মনে মনে নিজের উপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এসব বিতর্কে কেন যেতে গেল। এড়িয়ে গেলেই হত। এখন কি বলবে?

না, এভাবে সে নিজেকে ছোট করতে পারবে না।

'একদিন চলে আয়। তোর সঙ্গে বিতর্ক করে বেশ মজা আছে।' কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। দীপ্তেন শেষ দু-এক চুমুক দিতে দিতে ভাবে, কিছু কিছু মানুষ আছে যারা বিতর্ক করে মজা পাওয়ার জন্যে। এর বাইরে তার বিতর্কে কোনও উদ্দেশ্য থাকে না। শুধু বিতর্কের জন্যে বিতর্ক।

যে বিতর্কে অন্তত নিজের অভিজ্ঞতায় কিছু সংযোজিত হয় না সে বিতর্কের অর্থ কী? বলে, 'হ্যাঁ, আমাকে আসতেই হবে। তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

যে কথা বলার জন্যে এতক্ষণ ভেতরে ভেতরে ছটফট করেছে, সে কথা বলতে পেরে অনেকটা হালকা মনে হল নিজেকে। কফি শেষ করে সেও উঠে পড়ে।

'কী দরকার?' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুবীর জিজ্ঞেস করে।

'বলব।'

'বল না, এত সঙ্কোচ কেন?'

'আমাকে একটা চাকরি দে না'—

'মানে? তুই .... চাকরি করবি?' সুবীর বিস্মিত হয়।

'কেন, আমার কি চাকরি করতে নেই, না প্রয়োজন নেই?'

'না, আমি তা বলছি না।' সুবীর তখনও বিস্ময় কাটাতে পারেনি।

'আসলে তুই লেখক মানুষ। এসব অফিসের Discipline মেনে চলতে পারবি না।'

'তুই কি মনে করিস লেখালিখিতে কোনও Discipline-এর প্রয়োজন হয় না?'

'সে Discipline রক্ষায় মন থেকে সায় পাস। তাছাড়া তুই কোনওদিনই এসমস্ত নিয়মনীতি রক্ষা করে চলিস না। তুই যাকে বলিস বুরোক্রাটিক Discipline.

'মানে তুই যোগ্যতার কথা বলছিস?'

'দেখ দীপ্তেন, তোকে এ ব্যাপরে আমি কলেজ লাইফ থেকেই শ্রদ্ধা করি। যদিও শেষের বছর তোর সঙ্গে আমার বেশ দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। অবশ্য সেটা যে যার প্রয়োজনেই। তবু আমি তখনও প্রতিটি ছেলেকে তোর আদর্শের কথা, তোর মেরিট, ব্রিলিয়েন্সি সম্পর্কে বলেছি। এখনও শ্রদ্ধা করি। আর তোর যোগ্যতায় আমার আস্থা নেই এ কথা ভাবলি কী করে? দূর থেকে বার বারই ভেবেছি, তোর মতো যদি জীবনটাকে তৈরি করতে পারতাম, যদি তোর মতো আদর্শবান হতে পারতাম—' সুবীর তার কথা শেষ করে না।

'দেখ সুবীর, ওই দূর থেকে দেখতেই ভাল লাগে।'

'আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কী?'

'যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাকে আমার সাবর্ডিনেট হিসাবে কাজ করাব কীভাবে?'

ফুটপাথের ধারে একটা অ্যাম্বাসাডর এসে দাঁড়ায়। সুবীর বলে, 'ওঠ গাড়িতে।'

'না, আমি একটা কাজ সেরে যাব। একটু দেরি হবে। তুই চলে যা।'

সুবীর গাড়িতে ওঠে। 'ঠিক আছে আবার সময় পেলে চলে আসবি কিন্তু।'

সে রাস্তায় হাঁটতে থাকে। ইচ্ছা করেই সুবীরের গাড়িতে গেল না। সুবীরকে তার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে। যোগ্যতা কথাটাকে কী অসাধারণ দক্ষতায় অন্যভাবে ব্যবহার করল। তাছাড়া ব্যক্তির প্রয়োজনের সঙ্গে সমষ্টির প্রয়োজনকে মিলিয়ে দিল। অথচ সে কিছুই বলতে পারল না।

হতাশা, ক্লান্তি তার প্রতিটি পদক্ষেপে। নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হল।

সে ভাবে, মানুষকে বিচার করা হয় তার অতীত কাজের ক্ষেত্র থেকে। তার বর্তমান চিন্তার জায়গা থেকে নয়। অথচ সে তার বর্তমান চিন্তার প্রতিফলন কীভাবেই বা কাজের মাধ্যমে একজনের সামনে উপস্থিত করতে পারবে? যদি না সে সুযোগ পায়? যদি তার Identity হয় একমাত্র তার অতীত কাজ? তার ইমেজ? সে দেখতে পায়, সে ক্রমশ নিজের ইমেজে বন্দি হয়ে যাচ্ছে।

৪

দীপ্তেনের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি। আজও হল না। দীপ্তেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে স্বাতী ভাবছিল, হয়তো অদিতির কথাই ঠিক। কোনও কাজে আটকে গেছে। কিন্তু কী এমন জরুরি কাজ দীপ্তেনের? সেদিন তো চিঠি লিখে দীপুই তাকে আসতে বলেছিল, অথচ থাকল না। শেষ যেদিন দেখা হয়েছিল দীপু বলেছিল, 'তুমি এলে ভাল লাগে।' এভাবে দীপ্তেন কি তাকে গোপন



করতে চাইছে? এড়িয়ে যেতে চাইছে? এমন কী কাজ—যে তাকে বলা সম্ভব নয়? অদিতি হয়তো জানে। তাই কি বলল, কোনও কাজে আটকে গেছে? কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব? অদিতিও তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে? না, তা নয়। এমনিই বলেছে। দীপ্তেন হয়তো ভুলে গেছে, তার সঙ্গে দেখা করার কথা। কিন্তু সে এসব ভাবছে কেন? দীপ্তেনের অমনোযোগিতা, জীবনের প্রতি নির্লিপ্ততাই কি তার এ সমস্ত ভাবনার জন্ম দিচ্ছে? না হলে এত ছোট ব্যাপার নিয়ে সে ভাবছে কেন? আগে তো এসব ভাবত না। আগেও অনেক সময় দেখা হয়নি। আসলে দীপ্তেনের মনের গতিই তাকে ইদানিং উদ্বিগ্ন করে তুলছে। আজকাল দীপ্তেন আর কোনও আগ্রহ বোধ করে না। তাকে আসার জন্যে আর আগের মতো জোর করে না। আসতে পারব না বললে রাগ করে না। খুব ক্যাজুয়ালি বলে, 'দেখো, যদি পার এসো।' আর বারবারই বলে, 'তুমি এলে ভাল লাগে।' এলে অথচ বিশেষ কোনও কথা বলে না। এ কি তার মৌখিক কথা? না, না, এসব ভেবে সে দীপ্তেনের ভালবাসাকে ছোট করছে। ভালবাসার প্রতি সে নিজেই আস্থা হারাচ্ছে। নিজের অপরাধ চেতনা দিয়ে দীপ্তেনকে ব্যাখ্যা করে অসম্মান, অশ্রদ্ধা জানাচ্ছে। এভাবে সে তার নিজের ভালবাসাকেই কি অশ্রদ্ধা করছে? দীপ্তেন তো শুধু তার ক্ষেত্রে নয়, নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে, সাহিত্যেও একইরকম অমনোযোগী হয়ে উঠছে। আগে দেখা হলে প্রায়দিনই কোনও না কোনও লেখা পড়াত। না পড়তে চাইলে জোর করে শোনাত। বলতো 'তুমি আমার প্রথম পাঠক। তুমি না শুনলে বা মন্তব্য না করলে আমার সমস্ত সৃষ্টিকর্ম ব্যর্থ বলে মনে হয়।' অথচ বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছে দীপ্তেনের লেখা নিয়ে সেই উন্মাদনা নেই। কেমন যেন নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কোনওদিন লিখলে হয়তো বলে 'আজ একটা গল্প লিখেছি।'

'আনলে না?'

'না, কিছু হয়নি।' কিংবা 'পরে শুনো।' কিংবা 'লেখালিখিই তো জীবন নয়।' তারপর ইদানিং তো লেখালিখিই করছে না। প্রথম প্রথম জিজ্ঞেস করলে বলত 'কী হবে লিখে? মানুষের কাছে এর মূল্য কতটা?' কিংবা হয়তো 'আমার নিজের কাছেই লেখালিখি খুব মূল্যহীন হয়ে পড়ছে?'

'তুমি কি আর্থিক মূল্যে বিচার করতে চাইছ?'

'না, মানবিক মূল্যে। এ লেখার মানবিক অর্থই আমার কাছে হারিয়ে যাচ্ছে।'

সে আর কোনও বিতর্কে যেত না। কেননা সে সাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে যে কথা বলবে তা তো দীপ্তেনের অজানা নয়। তবু কেন বলছে এ কথাই ভাবত। যে মানবিক সম্পর্কগুলোকে সে গভীরভাবে ভালবাসতে চেয়ে, যে মাত্রায় আবিষ্কার করতে চাইছে, অথচ প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর বিপরীত প্রতিফলন দেখে, তার নিজের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কেই সে অনাগ্রহী হয়ে উঠছে। আর সম্পর্কগুলো থেকে সে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তার নিজের আর্থিক অনটনের কারণেই। এভাবে সে তার নিজের সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এমনকী, নিজের থেকেও। আর ওই বিচ্ছিন্নতার কারণ কি স্বাতী নিজেই? কেননা, দীপ্তেন ভাবছে হয়তো, সোজাসুজি না হলেও প্রকারান্তরে দীপ্তেনকে চাপ দিচ্ছে তার প্রতি দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে। চাকরির কথা বলে। দীপ্তেন নিশ্চয় সচেতন তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে। তবে সে এভাবে বলতে গেছে কেন? অবশ্য দীপ্তেনের চাকরির প্রয়োজন। শুধু তাদের সম্পর্কের প্রয়োজনেই নয়। তার নিজের আর্থিক অনটন মেটাবার প্রয়োজনেই। আর এভাবে আর্থিক অনটন থাকলে কোনও ভাল সাহিত্যকর্ম হয় না। আদৌ সম্ভব নয়। এখান থেকেই দীপ্তেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। একথা সে অদিতিকেও ঠিক বোঝাতে পারেনি। আজকাল বন্ধুদের সঙ্গেও বোধহয় খুব একটা দেখা করে না। কিংবা দেখা করলেও তার সঙ্গে যেমন চুপচাপ থাকে তেমনই হয়তো থাকে। কোনও সাহিত্য বিতর্ক

হয়তো করে না। কিংবা রাজনীতি বা মানবিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ নিয়ে। দীপ্তেন লিখছে না কেন এ কথা সে ইদানিং আর জিজ্ঞেস করে না। এই একটা ব্যাপারে সে দীপ্তেনের উপর জোর করত। আজকাল তাও করে না। কেননা, দীপ্তেন হয়তো মনে করতে পারে শুধুমাত্র সে তার সাহিত্যকেই ভালবাসে। অন্যান্য মানবিক মূল্যবোধগুলোকে গুরুত্ব দেয় না। তার ইমেজকে ভালবাসে। তাছাড়া দীপ্তেনের কথাই ঠিক, লেখালিখিই তো জীবন নয়। দীপ্তেন যখন লিখতে পারছে না, তখন দিনের পর দিন তাকে এভাবে বলা উচিত নয়। এতে সে আবারও নিজেকে অক্ষম বলে মনে করতে পারে। অথচ তার এখন লিখতে ভাল লাগছে না। তাই লিখছে না। আবার নিজের ইচ্ছাতেই, নিজেকে প্রকাশের প্রয়োজনেই লিখবে। এ বিশ্বাস তার আছে। এক্ষেত্রে তার আর্থিক অনটন মিটলেই তা সম্ভব। তবে সে প্রতিদিন একই কথা খোঁচাতে যাবে কেন? তাছাড়া সে মানুষ দীপ্তেনকে ভালবাসে, সাহিত্যিক দীপ্তেনের চেয়ে। যদিও এক্ষেত্রে দীপ্তেনের সত্তাকে এভাবে খণ্ডিত করা যায় না। আর এভাবে খণ্ডিত দীপ্তেনকে দেখলে, দীপ্তেনের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে তা হলে স্বাতীর কাছে তার সাহিত্য মূল্য কতটা? আর এভাবে তো সে দীপ্তেনের প্রতিপাদ্যকে প্রমাণ করে দিচ্ছে 'অন্য মানুষের চোখে এর মূল্য কতটা?' না, না, সে এভাবে ভাবতে চায় না। সে মানুষ আর সাহিত্যিক দীপ্তেনকে ভাগ করে ভালবাসতে পারবে না। সে টোটাল দীপ্তেনকে ভালবাসে। তার সৃষ্টিকর্ম, তা যতই অন্য মানুষের চোখে মূল্যহীন হোক, তার অবয়ব, তার ভুলত্রুটি, প্রতিটি কাজ, সব কিছু নিয়েই সে ভালবাসে দীপ্তেনকে।

এসব ভাবনার মধ্যেই সে বাড়ি ফেরে। আজকাল স্বাতীর সমস্যা নিয়ে বাড়িতে ক্রমশ এক অশান্তি দানা বেঁধে উঠছে। বাড়িতে থাকতে তার এখন বেশ অস্বস্তি হয়, নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। স্বাভাবিক ব্যবহারও কারও সঙ্গে করতে পারে না। সাধারণ কথাতেই আজকাল কেমন রুক্ষ হয়ে ওঠে। এ কি তার নিজের অপরাধ চেতনা? নয়তো মা ছাড়া এ ব্যাপারে বাড়িতে বিশেষ কেউ কিছু বলে না। অথচ মায়ের কথা থেকেই সে বুঝতে পারে এ বাড়ির সবাই তার ওপর ক্ষুব্ধ। কেউই স্বাভাবিকভাবে তাদের সম্পর্ককে মেনে নিতে পারছে না। মায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে তর্কবিতর্ক হলেও মায়ের কাছে তার এমন অস্বস্তিবোধ হয় না। মা বিতর্ক করলেও, তাকে ভালবাসার জায়গা থেকে বোঝাবার চেষ্টা করে, অন্তত মা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। তার অর্থ মায়ের কোনও জায়গায় সমর্থন আছে? অথচ অন্যান্যদের এই নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা, না ঠিক নির্লিপ্ততা নয়, তার আড়ালে কথা বলে কিন্তু তাকে কিছু বলে না। এই ব্যাপারটা তার কাছে অস্বাভাবিক লাগে। বছর খানেক হল দীপ্তেনও আর এ বাড়িতে আসে না। কিন্তু মা ছাড়া কেউ কোনওদিন তাকে জিজ্ঞেস করেনি কেন দীপ্তেন আসে না? পারিবারিক লোকের এতটা নির্লিপ্ততা তার ভাল লাগে না। আর তাই নিজেকে বাড়ির আর সকলের চোখে কেমন ছোট মনে হয়। অথচ সে তো জানে সে কোনও অপরাধ করেনি। তবে সে নিজে কেন এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার করে অন্যান্যদের সঙ্গে? কী প্রতিষ্ঠা করতে চায় এমন ব্যবহার করে? তাদের সম্পর্ককে সবাই মেনে নিক? যদি নাই মানে তাতেই বা কী আসে যায়? কিন্তু মানুষ তো চায় তার কাজের সমর্থন খুঁজে পেতে। আর যদি অন্যান্যদের সমর্থনের প্রত্যাশা না করে শুধুই নিজের তৈরি দুর্গে নিজেকে মহান ভেবে বসে থাকে, তবে পাঁচজন মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অর্থ কী? কোনও সম্পর্ক মানে তো শুধুমাত্র দু'জনের সম্পর্ক নয়, এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে আরও অনেক হৃদয়ের যোগ হওয়া। কিন্তু যে সমর্থন সে পাবে না তাকে জোর করে পেতে চেষ্টা করাও অস্বাভাবিক। তাছাড়া সবাই সমর্থন করবে এমনই বা সে আশা করছে কেন? সবাই তো আর সে যেভাবে দীপ্তেনকে জেনেছে বা বুঝেছে, সেভাবে জানে না। একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেও না। দীপ্তেনকে তারা মেনে নিতে চায় না। দিদিরবেলায় তো সেরকম কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি। দিদিও তো একইভাবে প্রেম করে বিয়ে করেছে। আর ছেলে হিসাবে শ্যামলদার বেশ কদরও আছে তাদের বাড়িতে। প্রায় মিথ-এ পরিণত হয়েছে। কথার মাঝে প্রায়ই উদাহরণ হিসাবে তার নাম আসে। কিংবা তার দাদা, এ বাড়িতে উচ্চসিংহাসনে বসে। অথচ সে তো জানে এরা কত মিডিওকার। দীপ্তেনের নাম এদের পাশাপাশি মনে পড়লেই নিজেকে বেশ সুখী মনে হয়। কিন্তু সে কথা কাউকে বলতে পারে না। বললেই, তার কথার বিপরীতে যে যুক্তি তৈরি করা হয় তা যেন দীপ্তেন কোনও স্বপ্নলোকের বাসিন্দা। আর তাদের দৃষ্টিতে বাস্তব জীবন সম্পর্কে যাদের বোধ কম, তারাই আসল অযোগ্য। কেন না, বাস্তব জীবনে তারা পারে না বলেই স্বপ্নলোকে বিচরণ করে। তাদের মতে এ বিচরণটাও একটা ভান। জীবনে কিছু করতে না পারলেই একটা ইন্টেল (কয়েনেজটা অবশ্য দীপ্তেনেরই) ইমেজ বানিয়ে তার ঘেরাটোপে বাস করে। তারা নাকি ভাবে পৃথিবীর কোনও মানুষই তাদের বোঝে না। 'এগুলো আসলে কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা। জীবন সম্পর্কে আইডিয়ালিস্ট অ্যাপ্রোচ'। দাদা বলেছিল একদিন দীপ্তেন সম্পর্কে। যারা জীবনের প্রতিযোগিতায় পারে না বা বুঝতে পারে পারব না তারাই সরে গিয়ে এমন এক বুদ্ধিজীবীসুলভ আচরণ করে। নিজেদের তৈরি দুর্গে বাস করে। 'কই দীপ্তেন যদি সত্যিই বুদ্ধিজীবী হবে তবে তা দিয়ে জীবিকা উপার্জন করছে কোথায়? তা হলে কীভাবে তাকে ইন্টেলেক্টুয়াল শ্রেণীতে ফেলব। শুধু একটা ইমেজ তৈরি করে তার মধ্যে বাস করলেই তাকে বুদ্ধিমান ধরে নেওয়া যায় না।' আসলে এরা যে খুব একটা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে কথা বলছে তাও তার মনে হয় না। আমাদের এ সামাজিক পরিবেশে সমস্ত জিনিসকেই ব্যবসায়িক কমোডিটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এমনকী, বুদ্ধিকেও, শুধু উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে যারা ব্যবহার করে তারাই যোগ্যতম বলে প্রতিভাত হয়। আর যারা বুদ্ধিকে ফেলে ছড়িয়ে নিজের ইচ্ছেমতো বেহিসেবি খরচ করে, পুঁজি হিসাবে সঞ্চয় করে রাখে না, তারা তো বুদ্ধিহীনেরই দলে। তারা এ পৃথিবীর অযোগ্য।

দীপ্তেন কোনওদিন এসব প্রতিযোগিতায় নিজেকে মূল্যবান হিসাবে দাঁড় করিয়ে অন্যের চোখে বাঁচতে চায়নি। অথচ এ বাড়িতে যাদের কদর বেশি, তার দাদা অসীম বা শ্যামলদাকে তো সে অনেক ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অঙ্ক করে পা ফেলে, প্রতিটি নিয়মনীতিকে জীবনের ক্ষেত্রে মানিয়ে নেয়। এমনকী, প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধ মতকেও। এদের মতে Adjust-ই জীবন। নয়তো মানুষ মানুষের সঙ্গে বাস করে কেন? অথচ তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই adjust কোথায়? এরা মিডিওকার বলে নিজের পরিধির ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানে, তাই প্রতিটি মুহূর্তে হিসেবি খরচ করে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে স্ত্রীর শাড়ি, গয়না, পারফিউমে নিজেকে মূল্যবান, প্রতিভাবান হিসাবে এ সমাজের চোখে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। অথচ দিদি এতে সুখী হয়নি। মাঝে মাঝেই তার কাছে কাঁদে। 'আমি ভুল করেছি রে। নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছি। তুই একই ভুল করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিস না।' এসব বলার অর্থ কী? সে শ্যামলদাকে দেখে সব পুরুষকেই একই নিরিখে ফেলতে চায়? দিদি কি ভাবে, নিজে পছন্দ করেছে বলেই তার এই বন্দিত্ব? সব সময় শ্যামলদার কথা শুনে চলতে হয়। অন্যথা হলেই অশান্তি।

শ্যামলদা আর দিদির সম্পর্কের মধ্যে বন্ধুত্ব কোথায়? সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা কোথায়? পরস্পরের পরিপূরক হওয়ার ইচ্ছা বা প্রবণতার চেয়ে একে অপরকে Dominate করার চেষ্টাই বেশি।

বছর খানেক আগের একদিনের ঘটনা তার মনে পড়ে। দীপ্তেন এসেছিল বাড়িতে। দিদিও ছিল। বিকেল থেকেই আড্ডা দিচ্ছিল তারা তিনজনে। হাসি গল্প হুল্লোড়ে সময়ের কথা কারওই খেয়াল ছিল না। কখন সন্ধে হয়ে গেছে। দীপ্তেন বেশ মজার কথা বলতে পারে। এমন কী নিজেকে নিয়েও। তিনজনের উচ্চ হাসির শব্দ পাশের ঘরে যাচ্ছিল। দিদি হাসতে শুরু করলে সহজে থামে না। শ্যামলদা পাশের ঘরে ছিল। কথায় কথায় দিদি বলেছিল 'আচ্ছা দীপ্তেন তুমি যে এত Sacrifice করছ, কৃচ্ছসাধন করছ, এর মূল্য কে দেবে?'

দীপ্তেন বলেছিল, 'না, না দিদি আমি কোনও Sacrifice করিনি। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তাই হইনি। লিখতে ভাল লাগে, লিখছি। যেদিন ভাল লাগবে না লিখব না। এতে করে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করছি এমন না ভাবাই ভাল। তবে এ কথাটা জোর দিয়েই বলতে পারি আমি ইঞ্জিনিয়ার হলে যে ব্রিজ তৈরি করতাম তা ধসে পড়ত। কিংবা ডাক্তার হলে অপারেশন টেবিলে রোগী মারা যেত। যেহেতু আমার ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা ছিল না। একটা গল্প বলি শুনুন, কয়েকদিন আগে আমার এক বয়স্ক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল কলেজ স্ট্রিটে, সে নিজেকে বিপ্লবী লেখক বলে মনে করে। অথচ বিপ্লবীরা জানে না সে বিপ্লবী। তো কথায় কথায় আমাকে Sacrifice-এর একটা তালিকা দিল। সে দীর্ঘ তালিকা। শুনে ভাবলাম, অহোঃ Sacrifice, দেখ ভাই সব আমাকে, আমি এমএ পড়িনি, সারাজীবনে ছাত্র পড়াইনি, দাড়ি কামাইনি, সারাজীবন প্যান্টের নিচে জাঙ্গিয়া পরিনি কিংবা প্যান্ট ছাড়াই জাঙ্গিয়া পরেছি। তবু রবীন্দ্রনাথ হওয়া গেল না। দীপ্তেন বেশ চেঁচিয়ে বক্তৃতার ঢঙে কথাগুলো বলছিল। শুনে দিদি আর সে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়েছিল। শ্যামলদা পাশের ঘর থেকে তার আট বছরের ছেলে তুতুনকে দিয়ে মাকে ডাকতে পাঠায়।

দিদি বলে, 'যাও, বলো যাচ্ছি।'

তুতুন পাশের ঘরে গিয়ে শ্যামলদাকে বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলদা এ ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, 'ডাকছি না?'

'যাচ্ছি বললাম তো।'

'ডাকছি, আগে শুনে যাও' শ্যামলদার স্বর বেশ রুক্ষ।

'যান না দিদি শুনে আসুন না।' দীপ্তেন বলল।

দিদি উঠে দরজার কাছে যেতে শ্যামলদা বলল, 'পাশের ঘরে চলো।'

'কেন? কী হয়েছে?' দিদি স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত।

'কী হয়েছে মানে? যেতে বলছি যাবে। পাশের ঘরে আমি, অসীম, মা, বাবা আছি। এদের মানুষ বলে মনে হয় না?' শ্যামলদা বেশ ঝাঁঝালো স্বরে বলে। প্রায় চিৎকারের মতো। 'এসব আড্ডা? অশ্লীল হাসি আর valgure কথাবার্তা। আমরা ও ঘরে আড্ডা দিচ্ছি না? ম্যানার জান।'

'তুমি এভাবে চ্যাঁচাচ্ছ কেন?' দিদি শ্যামলদার ব্যবহারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বাড়ির আর সকলের কাছে এই ব্যবহার গোপন করার চেষ্টায় বেশ নিচু স্বরে কথা বলে, 'তুমি ম্যানার জান?'

'তোমার কাছে শিখতে হবে? চল আগে।'

'যাচ্ছি, যাও।'

'আগে'। শ্যামলদার কড়া আদেশের স্বরে বলে।

'তোমার কথামতো চলতে হবে নাকি? আমি তোমার হাতের পুতুল?'

দিদির গলায় স্পষ্ট বিরক্তি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কথা শুনতে হবে।' শ্যামলদা ক্ষিপ্ত হয়ে এবার রীতিমতো চিৎকার করে।

দিদি হয়তো এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার তাগিদে পাশের ঘরে না গিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। এর পরও যদি দিদি এ ঘরে আসে তবে হয়তো দীপ্তেনের সামনেই তাকে অপমান করতে শ্যামলদার বাধবে না। এসব ভেবেই দিদি চলে যায়।

দীপ্তেন বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ গুম হয়ে বসে থাকে। স্বাতীও কোনও কথা বলতে পারে না। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যে তারা তৈরি ছিল না। দীপ্তেন একটা সিগারেট ধরিয়ে দূরে কোথাও দৃষ্টি মেলে দেয়। তাকে দেখে মনে হয় কাছাকাছি সে কোথাও নেই। স্বাতী একটা পেন দিয়ে কাগজে এলোমেলো আঁকিবুকি কাটতে থাকে মাথা নিচু করে। নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়। সিগারেট শেষ করে দীপ্তেন স্বাতীকে পরের দিন তাদের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে যায়। স্বাতী সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। কোনও কথা বলে না। অন্য যে দিনই দীপ্তেন তাদের বাড়িতে আসত, যাওয়ার সময় মাকে বলে যেত, সেদিন কোনও কথা বলল না। তারপর থেকে দীপ্তেন আর এ বাড়িতে ঢোকেনি। আর তার থেকেই এ বাড়ির সঙ্গে তার দূরত্ব আরও বেশি বেড়ে গেছে। মানুষের প্রত্যক্ষ শরীরী উপস্থিতি কোথাও না থাকলে সেখানে তার সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। দীপ্তেনের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে।

কয়েকদিন পরে কথায় কথায় সেদিনের প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল। দীপ্তেন বলেছিল, 'তোমার শ্যামলদা আসলে মেয়েদের শুধু ভোগের বস্তু হিসাবে মনে করে। তার কোথাও ভালবাসা নেই।'

'তা হলে দিদি এতদিন তার সঙ্গে ঘর করল কীভাবে?'

'তোমার দিদির হয়তো একদিন শ্যামলদার প্রতি ভালবাসা ছিল, আজ নেই। একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।'

'তা হলে এখনও এক সঙ্গে আছে কী করে?'

আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েই যাকে একবার স্বামী হিসাবে মেনে নেয়, সে কদাকার, কুৎসিত হলেও অক্ষয় সতীত্ব বজায় রাখার জন্যে তার সঙ্গেই বাস করে। তাদের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার আগে সতীত্ব। এই পুরুষ শাসিত সমাজে, আমরা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে এভাবেই একটা শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছি। আর মেয়েরা সতী হয়ে মরতে পারলেই যেন অক্ষয় স্বর্গ লাভ করবে। এই জন্যেই তোমার দিদি শ্যামলদার সঙ্গে বাস করছে। এদের মাথায় পরজন্মের ভূত আছে। এ জন্মে সতী হয়ে মরতে পারলে পরজন্মে সব কিছুই সুন্দর হবে।'

'তুমি কি জন্মান্তরবাদকে উড়িয়ে দিচ্ছ?'

'জন্মান্তরে বিশ্বাস করি না। তাও তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই জন্মান্তর আছে, তবু বলব—এ জীবনে যে মেয়েটার মাত্র তিরিশটা বছর কেটেছে, আরও তিরিশ কিংবা চল্লিশ বছর কাটাবে, যেমন করে হোক। পাঁক-কাদা ঘেঁটে, শুধু পরজন্মের কথা ভেবে! এ জন্মের তিরিশ-চল্লিশটা বছর কুৎসিত হয় হোক! এ ভারী আশ্চর্য। কেন তার থেকে বরং আমি যে জীবন জানি, যে জীবন উপভোগ করছি তাকে কুৎসিত না হতে দেওয়া কি সুষ্ঠু চিন্তা নয়? যে জীবন জানি না তার পেছনে ধাওয়া না করে?'

'কিন্তু শ্যামলদা তো প্রেম করেছে। দিদিকে ভালবেসে বিয়ে করেছে।'

'ওটা শ্যামলদার ভালবাসা ছিল না। ভালবাসার মোহ ছিল।'

'কীসের মোহ?'

'তোমার দিদিকে উপভোগ করার মোহ। তোমার দিদির রূপ-

সৌন্দর্য.... উপভোগ করার মোহ।'

'যা অসভ্য।'

'হ্যাঁ, সত্যি তাই।'

'ভালবাসা ছিল না?'

'না। আর ওরা কোনওদিন প্রেমকে জানেইনি। এই মোহকেই প্রেম বলে জেনেছে।'

'কিন্তু শ্যামলদার মোহ কেটে যাবার পর?'

'এখনও কাটেনি। কাটলে ওইভাবে নিজের অধিকারের বস্তু হিসাবে দেখত না। আমাকেও দেখাবার প্রয়োজন বোধ করত না যে তোমার দিদি তার অধিকারে। ওখানে কোনও হস্তক্ষেপ চলবে না। পুরনো জিনিস দেখো না, বাচ্চারা নাড়াঘাঁটা করে ভেঙে ফেললেও, যার জিনিস সে কিছু বলে না। কিন্তু যতক্ষণ বস্তু-স্বামীর সেই বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে, কী সাবধানে, যত্ন করে রাখে। ধুলো-বালি-কাদা না লাগে। আর এই মোহ কেটে যাওয়ার পর তোমার শ্যামলদার আর যৌবন থাকবে না। তখন শুধু কর্তব্যবোধে কর্তব্য পালন করে যাবে। আর সুযোগ থাকলে এ ডাল, ও ডাল ঘুরে দেখবে হয়তো। কিংবা বৈরাগ্যও জন্মাতে পারে।'

'তুমি কারও উপর রেগে গেলে, তার সমস্ত কিছু নস্যাৎ করে দাও। এমনকী তার অস্তিত্বকেও স্বীকার কর না।'

'কেন করব না?'

'তবে আমাদের বাড়ি যাও না কেন?'

'প্রভু হিসাবে আমি তোমাদের শ্যামলদাকে সম্মান জানাতে পারি না বলে যাই না।'

'কিন্তু এতে আরও ভুল বুঝবে তোমাকে।'

'তাতে আমার কিছু করার নেই।'

'তুমিও তো তোমার কথাই শেষ কথা মনে কর।'

'তুমি ভুল বুঝছ স্বাতী। পরিস্থিতির ব্যাখ্যা না করে আমার কথার ব্যাখ্যা করছ। শ্যামলদার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলছ।'

স্বাতীর এভাবে বলার ইচ্ছা ছিল না। সে জানত পরিস্থিতি ছাড়াই সে দীপ্তেনকে ব্যাখ্যা করছে। তবু তার ইচ্ছা ছিল দীপ্তেন তাদের বাড়িতে যাক। আর তাতে বাড়ির লোকের দীপ্তেন সম্পর্কে ভুল ধারণার সম্ভাবনা কমবে। কিন্তু পারেনি।

সেদিন রাতেও খাবার টেবিলে দিদিকে নিয়ে ঝড় বয়েছিল।

মা বলল, 'তুই শ্যামলের মুখে মুখে তর্ক করলি কেন?'

'আমি কি তার হাতের পুতুল?' দিদি বলেছিল।

'কী যা তা বকছিস? পুতুল হতে যাবি কেন? যে তোকে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে তাকে তুই সম্মান করবি না?'

'বশ্যতা আর সম্মান বা ভালবাসা এক জিনিস নয় মা'। সে কিছু বলবে না ভাবতে ভাবতে হঠাৎই বলে ফেলে, 'শ্যামলদার সঙ্গে বিয়ে হয়ে দিদি কি সুখী হয়েছে?'

'শ্যামলের সঙ্গে কারও তুলনা করিস না। তোর দিদিকে কী অসুখে রেখেছে? যখন যা চাইছে তাই পাচ্ছে। গাড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কী সুখ চাই?'

'তা হলে দিদি কাঁদছে কেন?'

'তোরা দুই বোনই আসলে মানসিক রোগী। দু'জনে দু'রকম।'

'না, মা, তুমি বস্তুর প্রতি মানুষের ভালবাসার কথা বলছ। মানুষ-মানুষকে ভালবাসে। মানুষের ভালবাসা চায়।'

'বস্তুর মধ্যে দিয়েই মানুষের ভালবাসার গভীরতা টের পাওয়া যায়।'



'অ্যাকোয়ারিয়ামে রঙিন মাছদের সুখ দেখেছ মা? বাইরে থেকে দেখতে তাদের ভাল লাগে, অ্যাকোয়ারিয়ামে থাকে বলেই।'

'কী যা তা বকছিস? তোর মতো একটা উড়োনচণ্ডীকে ভালবাসলেই সে ভালবাসা গভীর? তোর দিদি বিয়ের পর কাঁদছে আর তুই তো আগে থেকেই কাঁদছিস।'

'পারফিউম আর গয়নার সুখের চেয়ে কাঁদা ভাল।'

সে আর কোনও কথা বলেনি। এভাবে তর্ক করলে শুধু তর্কই বাড়ে। এর বেশি কিছু নয়। দিদি বা মাও আর কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করেছিল।



সে স্নানঘরে গিয়ে গরম জলের সাওয়ার খুলে দেয় এসব ভাবনার মধ্যে। দিনের আলোতেও এ স্নানঘরে স্বাভাবিক আলো ঢোকে না। কৃত্রিম আলোর নিচে সে নিজেকে মেলে দেয়। উষ্ণ জলের ধারার নিচে সে শরীরটাকে দেখে। সাবানের ফেনা নিয়ে সে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বসায়। ফেনা সমস্ত শরীর বেয়ে নেমে যায়। ছেলেবেলায় ফেনা নিয়ে খেলতে ভালবাসত। রঙিন বুদবুদগুলো হাওয়ায় ভাসিয়ে দিত। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নানা রঙে উড়ে যেত সেগুলো। তারপর এক সময় ঝরে পড়ত অনেক আলোর কণা হয়ে। এখন সে বড় হয়ে গেছে। আর পারে না আলোর পৃথিবীতে রঙিন বুদবুদ ওড়াতে। সে অন্ধকার স্নানঘরে সাবানের বুদবুদ ওড়ায়। কৃত্রিম আলোয় রঙের সে উজ্জ্বলতা নেই। তার প্রিয় আলোর পৃথিবী সে ভুলে যাচ্ছে। এখন সে অন্ধকার স্নানঘরে। অথচ আ-শৈশবে ছিল না এমন কোনও অন্ধকার স্নানঘর। সাবান আর উষ্ণ ধারা স্নানে বেশ আরাম বোধ হয়। এই অন্ধকার স্নানঘরকেও তার পবিত্র মনে হয়। সমস্ত শরীরকে সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। শরীরে দীপ্তেনের উষ্ণ হাতের স্পর্শ অনুভব করে। সে যে মাকে বলেছিল 'পারফিউম আর গয়নার সুখের চেয়ে কাঁদা ভাল' তা কতদূর সত্য? এই স্নানঘর, তার উষ্ণতা, গরম জলের প্রস্রবণ, এসব সুখ সত্যিই কি সে মন থেকে ত্যাগ করতে পারে? সুখের মধ্যে থেকেই কি সে বলতে পারে এসব সুখ কিছু নয়? কষ্টে থাকলে এভাবে ভাবতে পারত? এখন এই শীতের সময় হিমশীতল জলে স্নানের কথা কখনও ভাবতে পারে? এসব সুখ কি তার প্রয়োজন নেই? নাকি এই সুখের মধ্যে আছে বলেই এভাবে বলতে পারে? শুধু মৌখিকভাবেই? না কি সত্যই মেনে নিতে পারে? কষ্ট সে অনুভব করেনি কোনওদিন। নিজের উপলব্ধি দিয়ে শুধু বুঝেছে কষ্টে থাকা কাকে বলে। দেখেছে। অথচ এই অনুভব আর বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধির মধ্যে বিস্তর তফাত। কিন্তু কত সহজেই সেদিন মাকে খারিজ করে দিয়েছিল। আর আজ সেই দামি সাবান, উষ্ণ জলের প্রস্রবণ, এসব বাদ দিয়ে স্নানের কথা ভাবতেই পারছে না। সাবানের বুদবুদ নিয়ে এই খেলা বাদ দিলে যেন স্নানের সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যায়। অথচ কত মানুষ হিমশীতল জলে স্নান করে এই শীতে। দীপ্তেন যখন বাড়িতে আসত এমনই শীতের এক দুপুরে তাদের বাড়িতে স্নান করেছিল। তারপর প্রায়ই বলত 'তোদের বাড়ির স্নানের ঘর আর গরম জলের সাওয়ারে স্নান করার সুখের মতো তৃপ্তিদায়ক আর কিছু নেই। এর লোভ আমি কখনও ভুলতে পারব না।' দীপ্তেন হয়তো হালকা ইয়ার্কির ছলে কথাটা বলত। 'ইস্, মাইরি তোমার মতো যদি স্নানের সুখটা পেতাম!' এও তো এক অনুভূতি। এক অনুভব। সে কৃত্রিম রাগ করেছে কিন্তু কখনও তো এ সুখ ত্যাগ করেনি। ভাবেনি কোনওদিন নিজের ভেতর থেকে। শুধুই তর্কের সময় নিজের অসহায়তা, অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি কি একেবারেই ফাঁকা? না, এ যুক্তির পেছনে তার নিজস্ব বিশ্বাস আছে। 'এগুলো না থাকলে মানুষের জীবন একেবারে কদর্য হয়ে যাবে বা পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যাবে এমন তো নয়।' একদিন মাকে বলেছিল। হ্যাঁ, সেদিন সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থেকেই বলেছিল কথাগুলো। শুধুমাত্র ফাঁকা বুলি কপচায়নি। সেদিন কথায় কথায় কেমন প্রসঙ্গ বদলে গিয়েছিল। দীপ্তেন অনেকদিন আসেনি দেখে মা জিজ্ঞেস করেছিল 'দীপ্তেন আসে না কেন রে?'

এই প্রশ্নের সামনে সে নিজেকে অসহায় বোধ করেছিল। কী বলবে সে? দীপ্তেনের ভাল লাগে না তাই আসে না। এতে তো দীপ্তেনকে আরও ভুল বুঝবে। এসব ভেবে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার

জন্যে বলেছিল 'জানি না।'

'তোকে কিছু বলেনি?'

না বলতে পারত, কিন্তু এভাবে সে মিথ্যা বলেনি কোনওদিন। সে চেয়েছিল এ ব্যাপারে সবাই নীরব থাক। না বললে মা আরও নানা প্রশ্ন করবে। তবে কি মা-ও চায় দীপ্তেন তাদের বাড়িতে আসুক? অথচ মা-তো সেরকমভাবে দীপ্তেনকে কোনওদিন গ্রহণ করতে পারেনি। তা হলে এ কি মায়ের ইগোর জায়গা? দীপ্তেন না এসে তাদের পারিবারিক অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে বলে মনে করেছে? তাই এই প্রশ্ন? এভাবে তার ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগছে? নাকি এ সম্পূর্ণ তার ভালবাসা?

'কী রে কিছু বলছিস না যে?'

'কী বলব? তার ভাল লাগলে সে আসবে।' দীপ্তেনের কথাটাই সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে।

'তুই কিছু বলিসনি?'

কী বলবে সে? যেখানে এসে সে অপদস্থ, অপমানিত হয়, প্রতিটি কথায় আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তুমি নিষ্কর্মা, তুমি যে কাজ করো তার কোনও মূল্য নেই, নিজে অক্ষম বলে তুমি একটা ইমেজ বানিয়ে তার ঘেরাটোপে বাস কর, সেখানে সে আসতে বলবে কেন? এতে করে সে নিজেও অপমানিত বোধ করে। এ বাড়ির প্রতিটি আসবাব একই সঙ্গে তার দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করে, 'তুমি যোগ্য নও।' দীপ্তেন এ বাড়িতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না তাই আসে না। সেও কিছু বলে না দীপ্তেনকে। মাকেও কিছু বলতে পারে না, অথচ এই সমস্ত প্রশ্নে সে অস্বস্তি বোধ করে ভেতরে ভেতরে রুক্ষ হয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ নীরব আছে দেখে মা বলেন, 'আমি জানি, দীপ্তেন নিজেকে বিরাট মনে করে। মনে করে এ বাড়ির কেউ তার যোগ্য নয়।'

'না, ঠিক উল্টোটা, তোমরাই এমন ভাব।' সে বেশ দৃঢ় গলায় বলে।

'হ্যাঁ, ঠিকই তো, তার কী যোগ্যতা আছে এমন ভাবার?'

'তোমরা যেগুলো যোগ্যতার মাপকাঠি বলে ধরো এগুলো মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠি হতে পারে না।' সে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে।

'এগুলো বাদ দিয়েও যোগ্যতার মাপকাঠি নেই।' মা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

'এগুলো না থাকলে মানুষের জীবন একেবারে কদর্য হয়ে যাবে বা পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যাবে এমন নয়।'

সে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সেদিন আরও অনেক কথা বলছিল মা। সে কোনও উত্তর দেয়নি। ভেতরে ভেতরে ক্রমশ এক অসহায়তাবোধে, অনিশ্চয়তাবোধে আক্রান্ত হয়েছিল। মা বলেছিল, 'যায়, যায়, এখন বুঝছিস না, পরে বুঝবি, অর্থ ছাড়া মানুষের জীবন কদর্য হয়ে যায়।'

'মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় অর্থ আর Standard of living-এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলছ মা।'

'তুই যার কথা বলছিস তার বেঁচে থাকাই নেই তো আবার Standard!'

সে কোনও কথা বলতে পারে না। ভাবে, একটা মানুষের অস্তিত্বকে কত সহজেই মানুষ নস্যাৎ করে দিতে পারে। Standard of living-এর সামান্য তফতেই এরা মানুষকে খারিজ করে দেয়। আর দীপ্তেনের কথা এদের কাছে বলা মূর্খতা। যেহেতু এরা standard of living-কে মানদণ্ড বলে ভাবে তাই শ্যামলদা সামান্য বেশি আর্থিক সফলতায় নিজেকে যোগ্যতম মনে করে। এবং দিদিকে আর তাদের বাড়িকে কিছুটা সহানুভূতির চোখে দেখে। তাই দিদিকে শাসন করে প্রতি মুহূর্তে। আর এরাও এ সমস্ত কারণে শাসিত হওয়াকে সহজে মেনে নেয়। সে পোশাক বদল করে। চুলগুলো জড়িয়ে নিয়ে খাবার টেবিলে যায়। স্নানের পর সামান্য ক্রিম মুখে মেখে নেয়। এছাড়া কোনওরকম প্রসাধন সে কখনও ব্যবহার করেনি। মাঝেমধ্যে দু'একদিন ছাড়া। গয়নাও পরেনি কোনওদিন। এসব তার ভাল লাগে না। তাই কি ঠিক ওই জিনিসগুলোই সে খারিজ করে দিতে পারে বাহুল্য মনে করে, অথচ বাকিগুলোকে তার প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়?

বেশ বেলা হয়েছে। প্রায় দেড়টা বাজে। অথচ শীতের সূর্যের উত্তাপহীনতায় চারদিক থেকে জড়ত্ব কাটে না। সে গায়ে একটা ভুটানি চাদর জড়িয়ে নেয়।

তাকে খাবার দিয়ে মা-ও খেতে বসেন। বাবা বা দাদা খাওয়াদাওয়া সেরে সকলেই অফিসে বেরিয়ে যান। আজ একটু বেশি বেলা হয়ে গেছে। অন্যান্য দিন একটার মধ্যে তাদের খাওয়া হয়ে যায়। ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর থেকে সে আর মা একসঙ্গেই খায়। ইদানিং তার বিশেষ কোনও কাজ থাকে না। দুপুরে ন্যাশনালে গিয়ে কিছু বইপত্তর পড়া বা দু-একটা ছাত্র পড়ানো ছাড়া। এত কর্মহীনতা, অবসর যাপন তার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে অবসাদ কাজ করে। যদি সে কোনও চাকরি করে তবে একই সঙ্গে তার এ অবসাদও কাটবে।

'সকালে কোথায় গেছিলি?' মা খেতে খেতে প্রশ্ন করেন।

'দীপ্তেনের বাড়ি।'

'তুই প্রায়ই তার বাড়ি যাস, সে একবার আসতে পারে না?'

'আমি এত সামান্য জিনিস নিয়ে ভাবি না। সম্পর্ক কোনও রেষারেষির জায়গা নয়।'

'জীবনটাকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলিস না—মা।'

সে কী বলবে বুঝতে পারে না। এ কথার উত্তর সে অনেকবারই দিয়েছে। তবু সেই একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বলছে। তাই সে বিরক্ত হয়। বলে, 'জীবনটা সাজিয়ে গুছিয়ে আলমারিতে তুলে রাখার মতো ঠুনকো জিনিসও নয়।'

মা কীভাবে তাকে বোঝাবে সেই নিয়ে বেশ চিন্তিত, উদ্বিগ্ন হন। 'তোর বাবা তোর সঙ্গে এ ব্যাপারে বিশেষ কথা বলেন না। তিনি বেশ ক্ষুব্ধ। একজনের ভালবাসা পাওয়ার জন্যে আর একজনের ভালবাসা নষ্ট করা কি ঠিক?'

'আমি তো নষ্ট করতে চাইছি না। তোমরা ব্যাপারটাকে শুধু নিজেদের জায়গা থেকেই দেখছ। আমার কথা ভাবছ না।'

'তোর কথা ভাবছি বলেই বলছি।'

'কি বলছ? তোমাদের পছন্দমতো একজনকে বিয়ে করতে, এই তো?'

'তাকে তোর পছন্দ হবে না এমন কথাই বা বলছিস কী করে?'

'না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা তোমরা দেখবে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আর আমার সঙ্গে তোমাদেরই দৃষ্টিভঙ্গির তফাত আছে।'

'আমি অতশত বুঝি না। সোজা কথা তোর সঙ্গে দীপ্তেনের সম্পর্ক গড়ে উঠলে তুই সুখী হবি না।'

'এ তো তোমাদের কথা।'

'তুই যদি সুখীই হবি, তবে দিনরাত এত কী চিন্তা করিস? তোর সেই আনন্দ ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন?'



‘জীবনের লক্ষ্য শুধু সুখী হওয়া নয় মা। তাছাড়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কোনও কিছু নেই। নিজেকে সুখী মনে করলেই সুখী। মানুষের জীবনের লক্ষ্য অনেক বড়। শুধু সংসার জীবনে একটা সুখী সুখী ভাব করলেই তা পাওয়া যায় না।’

‘কিন্তু তুই দীপ্তেনের মধ্যে কী এমন পেয়েছিস?’

‘কিছু পাওয়ার জন্যে মানুষ মানুষকে ভালবাসে না, মা।’

‘তা হলে কী জন্যে?’

‘মানুষ একজন মানুষকে ভালবাসে তখন, যখন সে তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে। তার মধ্যে দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পায়। অনেক সময় তা বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়েও। তাছাড়া মানুষ মানুষকে ভালবাসে তার মানবিক গুণগুলোর জন্যে। আমি তাই পেয়েছি দীপ্তেনের মধ্যে।’

‘এসব বাজে কথা বলছিস কেন? দীপ্তেনের Statas-এর সঙ্গে আমাদের মেলে না।’

‘এখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার বিরোধ। তোমরা যে ছেলেকে পছন্দ করবে সে Statas-কে ভালবাসে। মানুষকে নয়। আর তোমরাও তাই কর। তোমরা মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখ। তার ইমেজ দেখ, Statas দেখ, Qualification দেখ। এগুলো মানুষের বাইরের আবরণ।’

‘এগুলো বাদ দিয়েও তো মানুষ নয়।’

‘আমি সে কথা বলিনি। মুখ্য হচ্ছে মানুষ, তার জীবনবোধ। মানবিকতা। তারপর তার বাইরের আবরণ।’

‘দীপ্তেন তোকে ভালবাসে?’

‘মানে?’

‘তোকে ভালবাসলে তোর কথা ভাবত।’

‘তুমি জান সে ভাবছে কি না?’

‘তার প্রতিফলন কোথায়?’

‘মানুষকে কি সব কিছু দেখাতে হয়? তোমাকে রোজ এসে জানিয়ে যাবে আমি এই করছি, ওই করছি। যারা এরকম নিজেকে জাহির করে আমার তাদেরকে খুব দীন মনে হয়।’

‘তুই জোর দিয়ে কিছু বলেছিস?’

‘কী বলব?’

‘তার দায়িত্বে কথা—’

‘দায়িত্ব কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। ওটা নিজের থেকেই গ্রহণ করে। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না।’

‘এসব কথার আড়ালে আসলে তোরা নিজেদেরই ফাঁকি দিস্। এসব গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘোরার ফিকির।’

‘দায়িত্ব তার একার নয়, আমারও।’

‘মানে?’

‘সম্পর্ক কারও একার দায়িত্বে গড়ে ওঠে না। এটা যৌথ দায়িত্ব।’

অলঙ্করণ : দেবনাথ নন্দী



করবী গাছ

রবিশংকর বল

জীবনে এই প্রথম, মনে হল, এ তো মৃত্যু নয়, যেন ছাদের আলসেয় পাখিটি এসে বসেছিল, আর কিছু বোঝার আগেই সে উড়ে চলে গেল।

খবরটা পাওয়ার পর এমনই মনে হয়েছিল অতীনের। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, মেনে নিতে পারা যায় না, তেমন কিছুই মনে হয়নি, যেন এমনটাই স্বাভাবিক। তার অনুভূতি তবে এত দূর ভোঁতা হয়ে গেছে? নাকি পৃথিবীর চালচলনের ভিতরে এই স্বাভাবিকতাই এখন অন্যতম ধর্ম?

৯/১১-এর মতোই ইতিহাসে উঠে গেছে তারিখটা। ৭/৭। নন্দিতার মৃত্যুদিন এখন ইতিহাসে লেখা থাকবে, এমন একটা তারিখ। ঘটনা খুব সাদামাটা, অতীন ভেবে দেখেছে। লন্ডনের টিউব রেলে বিস্ফোরণ আর সেই বিস্ফোরণে যারা মারা গেছে, নন্দিতা তাদের একজন। পৃথিবীর ইতিহাস মৃত্যুকে কত স্বাভাবিক করে তুলেছে। মৃত্যুর সঙ্গে মোলাকাতের নাটকীয়তাটুকুও মুছে ফেলা হয়েছে; এই তুমি তাকিয়ে সব কিছু দেখছ, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই ব্ল্যাক হোল ছাড়া আর কিছু নেই। তবে কি গ্লোবালাইজড মৃত্যু বলা যায়? যার কোনও ছায়া আগে থেকে দেখতে পায় না মানুষ।

৭/৭-এর দু'দিন পরে ঋতেনের ফোন পেয়েছিল সে।

ঋতেনের কণ্ঠস্বরেও একই রকম স্বাভাবিকতা ছিল।

'নন্দিতা চলে গেল অতীন।'

'মানে?'

ঋতেনের সামান্য নীরবতায় অবসরে অতীন ভেবেছিল, তা হলে কি শেষপর্যন্ত ছাড়াছাড়িই হয়ে গেল ওদের? আগে তো কত বার হয়েছে, তবু ভাঙতে ভাঙতেও চিড় ধরা অবস্থায় টিকে গেছে। হয়তো দিওতিমার জন্যই। দিওতিমাকে ছেড়ে ওদের দু'জনের কারও পক্ষেই বেঁচে থাকা অসম্ভব। সত্যিই কি তাই? মানুষ শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে, সব প্রিয় সম্পর্ক নষ্ট ফলের মতো ঝরে যাওয়ার পরেও।

'নন্দিতা আর বেঁচে নেই অতীন।'

তার ঠিক ঠিক মনে আছে, ঋতেন একবারও বলেনি, নন্দিতা মারা গেছে। সে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। তার নীরবতার ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল ঋতেনের টুকরো টুকরো কথা। সে সব আর মনে নেই।

ঋতেনের কথা থেমে যাওয়ার পরেও অতীনের হাতে মৃত রিসিভার ধরা ছিল। অনেকক্ষণ বসে থেকে সে কিছুই ভাবেনি, জীবন্ত নন্দিতার কথা নয়, মৃত নন্দিতার কথা নয়, একবারও সে কল্পনায় দেখতে পায়নি, নন্দিতার ছিন্নভিন্ন শরীর। অনেক পরে বইয়ের র‍্যাক থেকে খুঁজে খুঁজে বের করেছিল ইসমাইল কাদারের উপন্যাস 'দ্য জেনারেল অফ দ্য ডেড আর্মি'। বছর চারেক আগে কলকাতায় এসে নন্দিতা তাকে বইটি উপহার দিয়েছিল। বইয়ের টাইটেল পেজে একটি আশ্চর্য লাইন খোদাই করা আছে নন্দিতার হাতের লেখায় : On horseback, death and a peacock। নন্দিতাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, লাইনটা কার। এখন, কয়েকদিন ধরে, লাইনটা যখন ঘুরে ফিরে আসছে, অতীনের মনে হয়, জানতে না চেয়ে ভালই করেছিল সে; এখন থেকে সে জানবে লাইনটা নন্দিতার লেখা। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে মৃত্যু ও ময়ূর। সারাজীবনে কেউ কাউকে এর চেয়ে বেশি উপহার আর দিতে পারে?

নন্দিতার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরদিন সে ঋতেনকে ফোন করেছিল।

'বল।'

'সব কাজ শেষ?'

'হুঁ।'

'দিওতিমা কোথায়?'

'পিয়ানো বাজাচ্ছে। এ ক'দিন পিয়ানার সামনেই বসে আছে।'

'কী বাজাচ্ছে এখন?'

'মুনলাইট সোনাটা।'

'নন্দিতা খুব ভালবাসত।'

'আর তোর বিঠোফেনের নাইনথ্ সিম্ফনি।'

'দিওতিমা কি খুব চুপ করে গেছে ঋতেন?'

'না। আজ সকলেও টেররিজম নিয়ে অনেক কথা বলছিল।'

'কী বলছিল?'

'ও টেররিস্টদের সমর্থন করে। তুই কথা বলবি ওর সঙ্গে?'

'না, থাক।'

'আমি তোকে ফোন করতাম। দিওতিমা কলকাতায় যাবে।'

'কবে?'

'দিন সাতেকের মধ্যে। ডেটটা আমি তোকে জানিয়ে দেব।'

'তুই আসবি না?'

'না।'

'কবে আসবি?'

'আমি?' ঋতেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।—'প্রোবাবলি আমি আর কলকাতায় ফিরব না অতীন।'

'কেন?'

'আর কোনও টান অনুভব করি না।'

'কেন?'

ঋতেন এই প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। শুধু বলেছি, 'দিওতিমা যাচ্ছে। তুই ওকে একটু কম্পানি দিস। নন্দিতা কলকাতাকে খুব ভালবাসত। মনে হয়, দিওতিমা কলকাতাতেই সেটল্ করতে চায়।'

'আর তুই?'

'আমি এখানেই থাকব।'

'কেন?'



কিছুক্ষণ নীরবতার পর ঋতেন বলেছিল, 'রাখি। পরে ফোন করব।'

দিওতিমা এক সপ্তাহের মধ্যে আসবে। কবে, ঋতেন এখনও জানায়নি। অতীন এই অবসরে ইসমাইল কাদারের উপন্যাসটা ফের পড়ছে। আজকাল পড়াশোনার প্রতি আগ্রা কমে এসেছে। নতুন কোনও বই পড়তেই ইচ্ছে করে না। বরং রাজশেখর বসুর 'মহাভারতের'-এর সারানুবাদ ফিরে ফিরে পড়ে সে। বেঁচে থাকার এক সহজ ছন্দের ভিতরে ঢুকে পড়তে পেরেছে সে। পাশের বাড়ির হীরেনের আট বছরের ছেলে তথাগতকে নিয়ে সপ্তাহে তিন দিন— বৃহস্পতিবার, শনি আর রবি—সে ঢাকুরিয়া লেকে যায়। তথাগত একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিস করে। সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে সে তথাগতকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কাজটা সে যেচেই নিয়েছিল। হীরেন খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে, বেশিরভাগ দিনই নাইট ডিউটি, মাঝরাতে বাড়ি ফিরে ভোর ভোর ঘুম থেকে ওঠা খুব কষ্টকর। তাই সে হীরেনকে বলেছিল, 'আমি তথাকে প্র্যাকটিস করাতে নিয়ে যাব।'

'তা কী করে হয় অতীনদা।'

'কেন? সকালে তো আমার কোনও কাজ নেই।'

'তবু রোজ রোজ—'

'আমারও একটু বেড়ানো হবে। এমনিতে তো বেলা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোই। ঘুম আমাকে ছাড়তেই চায় না হীরেন। তথাকে নিয়ে বেরলে আমারই উপকার হবে।'

সপ্তাহের তিন দিন যেন এক আশ্চর্য ভ্রমণ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটা উপন্যাসের নাম। আজও সেই উপন্যাস পড়ার মুগ্ধতা তাকে ছেড়ে যায়নি। ঢাকুরিয়া লেকে সপ্তাহে তিন দিন সত্যিই তার আশ্চর্য ভ্রমণ। তথাগতকে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচের হাতে তুলে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। হ্রদটিকে প্রদক্ষিণ করে হাঁটতে থাকে। কখনও পায়ের চটি খুলে হাতে নেয়, সজল ঘাসে পা ডুবিয়ে হাঁটার বিলাস অনুভব করে। লেক ক্লাবের বিপরীতের ফুটপাতে সাদা ছাতা টাঙিয়ে বসে নিখিল। টেবিলের উপর সারি সারি স্টিলের পাত্রে রাখা আছে চিরতার জল, কালমেঘ, নিম, করলা, থোড়, তুলসীর রস, বাটিতে ভেজানো ছোলা, বাদাম। নিখিলই বলে, 'কাল তো করলার রস খেলেন আজ আর নয়, আজ থোড়ের রস খান।' তারপর সে অ্যাকাডেমির মাঠে এসে বসে। সাদা জামা-প্যান্ট পরা নানা বয়সি ছেলেরা দৌড়চ্ছে, বল করছে, ব্যাট করছে—দেখতে দেখতে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। খেলাধুলা থেকে কত দূরে সে—দাবা ছাড়া অন্য কোনও খেলার নিয়মই জানে না—কিন্তু তথাগতর সঙ্গে মাসের পর মাস এই খেলার মাঠে এসে সে অনুভব করেছে, তার জীবনে অনেক অসম্পূর্ণতার মতো এই ঘাটতিটুকুও রয়ে গেছে; শরীরের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন হয়নি। কিন্তু এখন, এই দেখা, এই বা কম কী, তথাগতর হাত ধরে সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে এখানে আসা, ফিরে যাওয়া। একদিন নিজের মনেই অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করছিল তথাগত, 'হাঁটতে হাঁটতে তোমার হাত ধরে ফেলি কেন জেঠু?'

অতীন জানে, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মানুষকে অর্ধেক শতাব্দী পেরিয়ে আসতে হয়।

আরও একটা লাভ হয়েছে তার। সপ্তাহে তিন দিন তথাগতকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে নতুন নতুন জলখাবারের স্বাদ। কোনওদিন লুচি-তরকারি, কোনওদিন পরোটা-বেগুনভাজা, কখনও চাউমিন বা ফ্রেঞ্চ টোস্ট, এক-একদিন আলুর পরোটা, সঙ্গে সঙ্গে তৈরি টম্যাটোর ঝাল ঝাল সস্। এ ছাড়া মাঝেমধ্যে ভাল খাবারদাবার হলেই হীরেনের স্ত্রী অনুভা তাকে নেমন্তন্ন করে। অতীন একদিন বলেছিল, 'তথাকে কিন্তু ক্রিকেট থেকে কখনও ছাড়িও না।'

'কেন?'

'আমার এই ভাল ভাল খাওয়াটুকু বন্ধ হয়ে যায়।'

'এ কী কথা—'

'সত্যিই। আমার তো দুপুরে আর রাতে শুধু ভাতে সেদ্ধ ভাত। সকাল-বিকেলে মনোহরের দোকানের টোস্ট আর চা।'

'বোনের বাড়িতে যখন খেতে ইচ্ছে করবে—।' হীরেন বলে উঠেছিল।

'প্লিজ, হীরেন, বোন-টোন এ সব ছেঁদো কথা বোলো না। বউয়ের বাইরে সব মেয়েই বোন নাকি?'

'না, মানে—'

'বোন কেন? কেন? সম্পর্কের ভিতরে একটু আলোছায়া থাকলে অসুবিধা কোথায়?'

'কীরকম?'

'সে তোমাকে বুঝতে হবে না। আমি আর অনুভা বুঝলেই চলবে।'

শিশুর হাতে ধরা শ্লেট। অক্ষর লিখছে, জল ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিচ্ছে। আবার লিখছে, মুছে দিচ্ছে। জীবনটাকে এভাবেই এখন পেতে চায় অতীন। গভীর কোনও দাগ যেন আর না থাকে। একটি দাগ, যাকে ক্ষতের মতো বহন করতে করতে এখন শুধু ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে তার। তথাগতের ক্রিকেট মাঠ তাকে সপ্তাহে তিন দিন জাগিয়ে দেয়; সে ঘাসে পা ডুবিয়ে হাঁটে, সাদা ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে করলা বা থোড়ের রস খায়; অ্যাকাডেমির মাঠে বসে মনে মনে দুই পায়ে প্যাড বেঁধে নেয়, হাতে গ্লাভস পরে। বুড়ো কোচের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে, 'অফের বল অফে মারবি, লেগের বল লেগে। কত বার বলেছি। এখনও ভুল হচ্ছে কেন?'

কিন্তু বুড়ো কোচ কি জানে, ভুল ছাড়া পৃথিবীতে কোনও কাহিনি তৈরি হয় না? যেমন তার ও মালিনীর কাহিনি। ইসমাইল কাদারের রেখা উপন্যাসের কাহিনি। জীবনে এক একটি ভুল থেকে কাহিনির জন্ম। কাহিনি যেন সেই ভুলের ইতিহাসকে বুঝে নিতে চায়। সেই কাহিনি পড়বার পরেও জীবনে অন্য এক ভুল ঘটে যায়। শুধু এক মহাকাহিনির ভিতরে ঠিক, ভুল বলে কিছুই আর বোঝা যায় না। সেখানে সৌতির কথাটুকুই জেগে থাকে : কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন।

নন্দিতার মৃত্যু ও দিওতিমার কলকাতায় আসার মাঝখানে ইসমাইল কাদারের উপন্যাসটি কেন তার বেঁচে থাকার ভিতরে ঢুকে পড়ল, অতীন এই রহস্যের মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে উপন্যাসটি ফের পড়ে যেতে থাকে। মৃত মানুষ—মৃতদের হাড়গোড়—তাদের স্মৃতি —বৃষ্টি আর তুষারপাত নিয়ে যেন এক অচেনা দ্বীপ এই উপন্যাস। তবু তা ইতিহাসের অন্তর্গত। আর ইতিহাসের ভিতরেই অন্তর্ঘাত ঘটাতে চায় এই কাহিনি। মনে হয় অতীনের।

একই অন্তর্ঘাত মালিনীরও, তার জীবনে। অতীন সে সব কথা আর মনে করতে চায় না। তবু মালিনীর সঙ্গে দুটি বছর—তার ইতিহাসের ভার—তা কি সহজে সরিয়ে দেওয়া যায়? দুটি বছরের স্মৃতির চেয়েও বেশি ভারী মালিনীর মৃত্যু। কেন তাকে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়তে হল, আজও বুঝতে পারে না অতীন। তাকেও কি একদিন কাদারের উপন্যাসের জেনারেলের

মতো বেরিয়ে পড়তে হবে? কিন্তু মালিনীর তো আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ছাই হয়ে উড়ে গেছে মালিনী।

অবিরাম বৃষ্টি আর তুষারপাত। আচ্ছন্ন রানওয়ে, এয়ারপোর্ট বিল্ডিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কুড়ি বছর পর ইতালির জেনারেল এসে পৌঁছলেন আলবানিয়ায়। পাহাড় ঘেরা দেশ। বৃষ্টি আর তুষারের দেশ। ১৯৩৯-এর ৭ এপ্রিল মুসোলিনীর বাহিনী ঢুকে পড়েছিল আলবানিয়ায়। জেনারেল তখন আফ্রিকায়; ওয়ারলেসে খবর এসেছিল, ফ্যাসিস্ট সৈন্যদল আলবানিয়ায় ঢুকে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুড়ি বছর পর জেনারেল আলবানিয়ায় এসে পৌঁছলেন মৃত সৈনিকদের খোঁজে। আলবানিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যে সব সৈনিকরা মারা গেছে, কবর থেকে তাদের হাড়গোড় তুলে নিয়ে যেতে হবে ইতালিতে; প্রিয়জনদের হাতে তুলে দিতে হবে সেই সব হাড়গোড়। মাসের পর মাস কবর খুঁড়ে খুঁড়ে বের করা হয় মৃত সৈনিকদের হাড়গোড়—জেনারেলের কাছে এ যেন এক যুদ্ধ জয়—নিজের দেশের সৈনিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন—আর আলবানিয়ার গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ মাঝে মাঝেই ভেস্তে দেয় জেনারেলের পরিকল্পনা—কবর থেকে উধাও হয়ে যায় মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ—আলবানিয়ার মানুষ মৃত সৈনিকদের কবরে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালায় প্রতিশোধ নিতে; যে যুদ্ধ তাদের দীর্ণ করে দিয়েছে, কুড়ি বছর পর সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধেই এই প্রতিরোধ তাদের।

মৃত সৈনিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন দেশে—এমন এক যুদ্ধজয়ের নেশা নিয়েই তো আলবানিয়ায় এসেছিলেন জেনারেল। যখন তিনি ফিরছেন, তখন অবসন্ন, পরাজিত। কাউকে আর পুরনো জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। একজন জীবন্ত সৈনিক আর কবরে তার হাড়গোড় তো এক নয়। শুধু তিনি—তার চিন্তাভাবনা, স্বপ্ন— ধীরে ধীরে ঢুক গেছে মৃতদের জগতে। জেনারেল ভাবেন, যখনই জীবন্ত কাউকে দেখি, আমি তার চুল উপড়ে নিতে চাই, গালের চামড়া ছিঁড়ে ফেলি, চোখ খুবলে নিই—মনে মনে—যেন ওগুলো প্রয়োজনীয়, ওগুলো যেন আমাকে লোকটার ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না; লোকটির মাথা আমার কাছে শুধু করোটি আর দাঁত হয়ে ওঠে। আমি যেন হাড়গোড়ের রাজ্যের ঢুকে পড়েছি, সেখানে শুধু আছে ক্যালসিয়াম আর ক্যালসিয়াম। স্ত্রীকে যে চিঠি লেখেন, তাতে ফুটে ওঠে মৃত কোনও সৈনিকের দিনলিপির অংশ, কারও চিঠির কোনও লাইন।

কাদারের উপন্যাস পড়তে পড়তে এক সময় টেলিফোনে লন্ডনের নম্বরে ডায়াল করে অতীন, রিং শুনতে পেয়েই কেটে দেয়। কার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে? ঋতেনের সঙ্গে? না, দিওতিমার সঙ্গেও নয়। নন্দিতা—। নন্দিতা তো ছাই হয়ে গেছে। কোথাও তার এক টুকরো অস্থিও পড়ে নেই।

টেলিফোনে দিওতিমা বলেছিল, 'তোমাকে এয়ারপোর্ট আসতে হবে না অন্তকাকু। আমি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব।'

'একা একা চিনবি কী করে?'

'অ্যাড্রেস তো আছে।'

'পনেরো বছরে কলকাতা অনেক বদলে গেছে তমা।'

'আমি ঠিক চিনতে পারব।'

'কিন্তু—'

'আরে খুঁজে নিতেই দাও না। ইউলিসিস কীভাবে ইথাকায় পৌঁছেছিল, মনে নেই?'

'তুই ইউলিসিস?'

'মেয়ে ইউলিসিস হয় না?' সাগরপার থেকে ছুটে আসে দিওতিমার হাসি।

'হলে তো ভালই। আমি তা হলে হোমার হয়ে আর একটা মহাকাব্য লিখব।'

'তোমার বাড়ির গেটের সামনে হলুদ করবীফুলের গাছটা আছে?'

'তোর মনে আছে?'

'থাকবে না কেন?'

তার মনে পড়ল, নন্দিতাও চিঠিতে ওই করবীগাছটার কথা লিখত। প্রত্যেক চিঠিতেই। কেন লিখত? কী সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল গাছটার সঙ্গে নন্দিতার? আর মালিনী বলেছিল, মৃত্যু ওর কাছে একটা হলুদ করবীফুল।

এই বর্ষায় ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে গাছটা। পাতার সবুজ আর ফুলের হলুদ মিলেমিশে অলৌকিক আলো চারদিকে। মালিনীই তাকে প্রথম ওই অলৌকিক আলো দেখিয়েছিল। আর তাই মালিনী চলে যাওয়ার পরেও সে আর পুরনো জীবনে ফিরে যেতে পারেনি। সেই জীবনে ফিরে গেলে এ বাড়িতে মালিনী যে লক্ষ্মীশ্রী এঁকে দিয়ে গেছে, তাকে মুছে ফেলতে হবে। মুছে ফেলা যায় না। মালিনীর জন্য নয়, রাত্রির দেবীর স্মৃতিকে সম্মান জানানোর জন্য নয়, তার নিজেরই জন্য। এই দু'বছরে মালিনীর সঙ্গে বেঁচে থাকার দিনগুলিতে সে একটি সুড়ঙ্গ-লালিত কথা বুঝে নিতে পেরেছিল, জীবনের কয়েকটি মধুময় দিনই সারা জীবন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সে তাই প্রতিদিন সকালে নিজের হাতে ঘরের জিনিসপত্র ঝাড়পোঁছ করে, বইগুলির শরীর থেকে ধুলো মুছিয়ে দেয়, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে থেকে সারা বাড়ি নিখুঁত করে মোছায়, সপ্তাহে একদিন দরজা-জানলার পর্দা কাচতে দেয়। মালিনী নিজে হাতে এই সব করত। কল্পনাকে কাছেও ঘেঁষতে দিত না। অতীন কত বার বলেছে, 'তুমি ঘর মুছবে, এটা কীরকম?'

'কেন?'

'কল্পনা তো আছে।'

'আমার ভাল লাগে।'

মালিনী একদিন তার হাতে পানের বাক্স, চুন, সুপুরি, জর্দার কৌটা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'দেখি, ভাল করে একটা পান সাজো তো।'

চন্দনকাঠের বাক্সে সাদা ভেজা কাপড়ে মোড়া থাকত মালিনীর পান।

মালিনী তাকে পান সাজাতে শিখিয়েছিল। তার পর থেকে সে-ই সব সময় মালিনীর পান সেজে দিয়েছে। মালিনী একদিন বলেছিল, 'কী সুন্দর পান সাজতে পার তুমি। কেমন আদর করে চুন লাগাও পানের গায়ে, সুপুরি সাজিয়ে জর্দা ঢাল। এই রকমই আদর করে সব কিছু করতে হয় অন্ত। এই বাড়িটার দিকে তুমি কখনও মন দিয়ে তাকিয়ে দেখেছ? দেখলে বুঝবে, এ শাড়ির ইট-কাঠ-পলেস্তারা-মেঝে, সবাই আদর চায়। আমি ওদের আদর দিই। হয়তো শুয়ে আছি, আলমারিটার উপর চোখ পড়ল, মনে হল, ও যেন বলছে, আমাকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দাও। আমি উঠে পড়ি। আলমারিটার শরীর মুছে দিই। মনে হয়, সারা ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল।'

মাঝে মাঝে মনে হয়, মালিনী তার শেষ চিঠিতে যে প্রশ্ন রেখে গেছে, তা আসলে একটি আলোর টুকরো, যার মুখোমুখি সে বাকি জীবন দাঁড়িয়ে থাকবে।

যেমন ব্যালকনিতে এসে তাকে মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হবে,

করবীগাছের অলৌকিক আলো দেখার জন্য।

অতীন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখছিল, করবীগাছকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিওতিমা। লাগেজ মাটিতে পড়ে আছে। ধীরে ধীরে দিওতিমার মাথা নিচু হয়ে আসে। অতীন দেখতে পায়, বাইশ বছরের মেয়েটি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তবু সে নিচে নেমে গেল না।

সে দেখতে পাচ্ছিল, দশ বছর ঘাট-আঘাটায় ঘুরে, পেনিলোপের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে ইথাকায় ফিরে আসছে ইউলিসিস। ফিসিয়ান নাবিকেরা ঘুমন্ত ইউলিসিসকে নামিয়ে দিয়ে গেল ইথাকার বেলাভূমিতে, অলিভগাছের কাছে। পরিশ্রান্ত ইউলিসিসের ঘুম ভাঙতেই চায় না। যখন চোখ মেললেন, বুঝতে পারলেন না, কোথায় এসে পৌঁছেছেন। তার পর দেবী আথেনা তাঁর চোখ থেকে কুয়াশা মুছে দিলেন। ইউলিসিস দেখতে পেলেন, শৈশবের চেনা বন্দর, দূরের পর্বত শ্রেণি। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলেন, জড়িয়ে ধরলেন পুরনো অলিভগাছটিকে। যেন জেনে নিতে চাইছেন, কুড়ি বছর আগের সেই একই অলিভগাছ তো?

আর দিওতিমা করবীগাছটিকে ছুঁয়ে মাথা নিচু করে কান্নায় দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। দিওতিমা—। অতীন ডাকতে গিয়েও থেমে গেল।

থাক, ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাক।

অলিভ আর করবী এক বার মিলেমিশে যাক।

সে চেয়েছিল, দিওতিমা একা একাই লাগেজ নিয়ে ওপরে উঠে আসুক। মায়ের মৃত্যুর পর সন্তানকে একা একাই সব সিঁড়ি ভাঙতে হয়।

দিওতিমা ওপরে এসে প্রথমেই বলল, 'করবীগাছটা একই রকম আছে অন্তকাকু।'

'তোর মনে আছে?'

'আমি অনেকক্ষণ ধরে তো দেখলাম।'

'সেই অলিভগাছটার মতো?'

'অলিভগাছ?'

'ইউলিসিসকে যে গাছের কাছে নাবিকেরা নামিয়ে রেখে গিয়েছিল।'

সে দেখল, দিওতিমার দুই চোখে সিঁদুরে মেঘ ছড়িয়ে আছে।

'করবীগাছটার সামনে দাঁড়িয়ে মাম্-মাম্-এর কথা খুব মনে পড়ে গেল।'

'তাই খুব কাঁদলি?'

'তুমি দেখেছ?'

'দেখলাম তো।'

'তা হলে ডাকলে না কেন?'

সে কী বলবে, তার ভয় করছিল? কুড়ি বছর পর দেশে ফিরে শৈশবের সেই অলিভ গাছকে জড়িয়ে ধরে ইউলিসিস কাঁদছেন। কে তাকে ডাকবে? কোনও কণ্ঠ আছে তাকে ডাকবার মতো?

'মাম্-মাম্ চলে যাওয়ার পর একবারও কান্না পায়নি। শুধু এই করবীগাছটার সামনে দাঁড়িয়ে—'

'কী মনে হল?'

'মাম্-মাম্ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

অতীন কোনও কথা বলতে গেল না আর।



অনেক পরে দিওতিমা বলল, 'মাম্-মাম্ সব সময় এই করবী গাছটার কথা কেন বলত অন্তকাকু?'

'খুব বলত নাকি? কই আমাকে তো কখনও বলেনি। চিঠিতে অবশ্য জানতে চাইত গাছটার কথা।'

'আমাকে বলত। কত দিন ভোর রাতে স্বপ্ন দেখত, গাছটার নিচে ফুল কুড়োবার।'

'তাই?'

'করবীগাছটা নিয়ে মাম্-মাম্-এর কোনও স্মৃতি ছিল।'

'কী?'

'তুমি জান না অন্তকাকু?'

'না।'

'তাহলে কেন বারবার করবীগাছটার কথা বলত?'

মেঘ বা নক্ষত্রের দিকে যেমন, সেভাবেই দিওতিমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল অতীন। এক বার মনে হল, বাইরে করবীগাছটা দাঁড়িয়ে আছে।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



সাপবাজি ও দীপ্যমান

প্রদীপ আচার্য

“সাপবাজি দেখেছিস? পোড়ানোর পর দেখেছিস? কেমন ফণা তুলে থাকে। একটা আস্ত সাপের আদল পেয়ে যায়। অথচ আঙুল ছোঁয়ালেই ঝুরঝুর, চুরচুর। কার্বন। এক টিপ নস্যির মতো কালো ছাই।

ভিতরে বাইরে পুড়ে খাক, এমন অনেক মানুষও আছে। সেখানে তোর তো মাত্র দু’একটা ছোটখাটো ফোসকা রে। সেজন্যে তুই এই প্রতিশোধ নিবি?” কথা শেষ করে হাতের সিগারেট জ্বেলে নেয় সঞ্জয়। এতক্ষণ দু’আঙুলের ফাঁকে চক রাখার মতো না-জ্বালা সিগারেট চেপে রেখেছিল। অভিজ্ঞ শিক্ষকের ভঙ্গিতে উপমা টানছিল। দীপ্যমানকে জলবৎ বোঝানোর চেষ্টা আর কী।

দীপ্যমান অপলক তাকিয়ে আছে সঞ্জয়ের দিকে। একটা বিজ্ঞাপন সংস্থার হ্যান্ডসাম এক্সিকিউটিভ দীপ্যমান বসু। চৌকস, সুদর্শন, ঋজু কণ্ঠস্বর। মেয়েদের চিৎ-কাত করার পক্ষে পাঁচে পাঁচ। অথচ বউ নিয়ে নাটাঝামটা খাচ্ছে। ল্যাজে গোবরে। তেড়ে যায় বউয়ের দিকে। বউ তেড়ে আসে। দীপ্যমানের জুলিয়েট বউ এখন ইডিয়েট। প্রেম ফ্রেম সব গিয়েছে। কর্পূরের মতো।

সঞ্জয় ভাবে, কী অবাক কাণ্ড! কত কাঠখড় পুড়িয়ে পাওয়া ধন অনিন্দিতা দীপ্যমানের। কত প্রেম, কত অভিমান, কত

মানভঞ্জন, কত কান্নাকাটি। ওদের প্রেমপর্বের পল-অনুপলের সাক্ষী সঞ্জয়। টানা আট বছরের মেগা সিরিয়ালের পার্শ্বচরিত্রে বেশ বড়সড় ভূমিকা নিয়েই ছিল সঞ্জয়। দীপ্যমান ওর স্কুলের বন্ধু। স্কুলের কত অন্তরঙ্গ বন্ধুই আজ শুধুই পরিচিত সঞ্জয়ের কাছে। দেখাও হয় কালেভদ্রে। হাই-হ্যালোর তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে এক সময়ের প্রাণের বন্ধুত্ব। তার কারণ যে শুধুই 'আউট অফ সাইট', তা নয়। আসলে কিশোর বয়সের অনেক প্রিয় মুখই যৌবনে এসে নির্মম বাস্তবতার ধাক্কা খেয়ে বৃষ্টিতে ভেজা ফাউন্টেন পেনে লেখা খাতার পাতা হয়ে আছে। আবছা, ঝাপসা অস্পষ্ট বর্ণমালা। সেই ছোট্টবেলার ধ্যানধারণা, ভাব-ভাবনার বদল ঘটেছে বিস্তর। স্কুলের প্রিয় বন্ধু ছোটন যেমন আচমকাই একদিন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু হয়ে গেল। এখন সে স্বামী ঋতানন্দজি মহারাজ। স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এসেছিল। ওর ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছে সঞ্জয়। গর্ব হয়েছে। তবু ব্যথায় ককিয়ে উঠেছে বুকের ভিতরটা। ঋতানন্দর অবয়বের আড়ালে বন্ধু ছোটনের মৃত্যু হয়েছে বলে। ছোটন বলে ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে পারেনি সঞ্জয়। তেমনি আবার স্কুলের আর এক প্রিয় বন্ধু বাপি, সে এখন এমন একটা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সমর্থক, যে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথা বলারও প্রবৃত্তি হয় না। এভাবেই প্রিয় বন্ধুরা শুধু পরিচিত হয়েই রয়ে গিয়েছে। স্কুলের হরিহর আত্মা সুমিত বিয়েই করল না। বিবাগী মন নিয়ে আয় করে মোটা মাইনের চাকরি করে আর কেদারবদ্রী, প্রয়াগ করে ঘুরে বেড়ায়। স্কুলের সুমিত যেন ওর বড়বেলার একটা অবয়বই শুধু বয়ে বেড়াচ্ছে। অপূর্বটা রক্তদান আন্দোলন নিয়ে দিনরাত মেতে আছে। রক্ত ছাড়া ওর মগজে কিছুই নেই যেন। সুশান্ত ওর সঙ্গী। ওদের সঙ্গে আঠারো মাসে, একদিন ক'মুহূর্ত দেখা হয়। ওদের কথায় অবশ্য ছেলেবেলার গন্ধ আছে। বইয়ের পাতার ভাঁজে বহুদিনের রেখে দেওয়া বিবর্ণ বেলপাতা। তবু তো আছে প্রিয় বইয়ের পাতার পরতে। স্কুলে সরস্বতী পুজোর অঞ্জলির আঘ্রাণ যেমন ধরা আছে বইয়ের পাতায়। স্কুলের কয়েকটা বইও সঞ্জয়ের বুক সেলফ-এ সযত্নে সাজানো। মনের মুকুরেও পরপর সাজানো আছে কয়েকটা বন্ধুর ছবি। পুরনো বইয়ের মতোই। দীপ্যমান তাদের দলে পড়ে না।

স্কুলে দীপ্যমান পড়াশোনায় ছিল মিডিওকার। কিন্তু স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা লিখে, বার্ষিক অনুষ্ঠানে নাটকে অভিনয় করে নাম করেছিল বেশ। ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের নামডাক শুধু ক্লাসেই। পারফর্মিং আর্টে সবাইকে রীতিমতো চমকে দিয়ে দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল যেন গোটা স্কুলেরই ফার্স্ট বয়। ছোটবেলা থেকেই বেশ মজার মজার কথা বলে। সবার থেকে আলাদা সে কথা। গভীরতা আছে। ওর কথা সঞ্জয়কে ভাবায়। দু'জনের অফিসও এক পাড়ায়। ফলে বন্ধুত্বের লাগাম শিথিল হওয়ার অবকাশ নেই।

বেথুনের অনিন্দিতার প্রেমে পড়ল দীপ্যমান। কী ছটফটানি, কত চঞ্চলতা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনিন্দিতাকে প্রোপোজ করার কত মহড়া। সঞ্জয় সিগারেটে টান দিয়ে বিষম খেয়েছে। হেসে গড়িয়ে পড়েছে। বলেছে, "ব্যাটা রাসকেল। অনিন্দিতার সামনে গেলে তুমি কি ফুচকা হয়ে যাও শালা।"

"কেন ফুচকা কেন?"

"নিটোল ফুচকাটাকে ফুচকাওয়ালা কেমন বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ফাঁসিয়ে দিয়ে তেঁতুল জলে চুবিয়ে দেয় দেখনি? শালা ব্যাকবোনলেস। আমাকে দেখে কী শিখলি?"

তোর ভাই বুকের পাটা আছে।"

"আর তোর কী আছে? পাঁঠা কলজে।"

"আমার হয়ে তুই প্রোপোজ কর না।"

"ও শালা প্রেম করবে তুমি, আর প্রোপোজ করব আমি? শালা অ্যাডমিশন টেস্টেই ডাহা ফেল করবি। মেয়েরা অমন কাওয়ার্ডকে পছন্দ করে না।"

সেদিন কথার ছলে দীপ্যমানকে কাওয়ার্ড বললেও আজ যেন মনে হচ্ছে ব্যাটা সত্যিই কাওয়ার্ড। অশান্তির ছুতো করে পালাতে চাইছে।

ভবেশ চা দিয়ে গেছে। টেবিলের কাচের উপর রাখা সুদৃশ্য ছাইদানি। তর্জনী ঠুকে ছাই ঝাড়ে সঞ্জয়। ফের উপমার ভূত চাপে তার কাঁধে। দীপ্যমান হাজার হলেও বন্ধু। শিক্ষকের মতো জ্ঞান না দিয়ে পরিবেশটা একটু হাল্কা করতে চায় সে। বলে, "বউ মানেই তপ্ত তাওয়া। ছ্যাঁকাছোঁকা খাবে। ফোসকা পড়বে। ফোসকা ফেটে এক আধটা পোড়া ঘা হবে। দিনে নিরানব্বই বার জামার ঘষা লেগে জ্বালাপোড়া হবে। কিন্তু ও কিছু না। বিবাহিত সব পুরুষেরই এক আধটা অমন পোড়া ঘা আছে। থাকে। দ্যাট ইজ ম্যারেড লাইফ। তুই যদি ডিভোর্স নেওয়ার কথাও বলতিস তাও বুঝতাম।"

দীপ্যমান ফিকিরবাজের মতো হাসে। বলে, "দেখি না কিছুদিন।" শুনে চোখ চিবুক শক্ত হয় সঞ্জয়ের। ফের সিগারেট জ্বালায়। বাঁ হাতের কবজি ঘোরায়। তাতে নজর চেলে দেয়। প্রায় পাঁচটা। চেয়ারে ঝোলানো ঝোলা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ায়। দীপ্যমানের চোখে দৃষ্টির বারুদ ঝেঁকে দিয়ে বলে, "তাহলে আমার সঙ্গে অন্তত সম্পর্ক রাখিস না।" ঝড়ের বেগে অফিস থেকে বেরিয়ে আয় সঞ্জয়।

অফিস ছুটির এ সময় দক্ষ সাঁতারুরা ঝাঁপিয়ে পড়ে জনসমুদ্রে। ডালহৌসি এসপ্ল্যানেড চত্বরে এ সময় সাঁতারে কম যায় না সঞ্জয়ও। পিছনে খাবি খেতে খেতে এগোয় দীপ্যমান। সে জানত, কথাটা সঞ্জয়ের পছন্দ হবে না। পথে ডেকে হেঁকে ওকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এ সময় সঞ্জয়ের গন্তব্য ওর জানা। নীরবে তাই সে অনুসরণ করে চলে সঞ্জয়কে। গড়পড়তার মাথা ছাড়ানো উচ্চতা সঞ্জয়ের। তাই ওকে নজরের নাগালে রেখে পিছু নিতে বেগ পেতে হয় না দীপ্যমানকে।

দীপ্যমান যে পিছু ছাড়বে না জানে সঞ্জয়। নাছোড় ন্যাওটা শালা। ভেবে আরও দ্রুত পা চালায় সে। ঘামের চোরাস্রোত বইছে সঞ্জয়ের অন্তর্বাসের নিচে। বাঁ হাতের মুঠিতে উঠে আসে রুমাল। মুখের, ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে পাতালে প্রবেশ করে সঞ্জয়। এ সময় অফিসযাত্রীদের পাতালপ্রবেশের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভিড় ভেঙে ভেঙে ধাপে ধাপে নিচে নেমে যায় দীপ্যমান।

লাল আলোয় ফুটে আছে টাইম টেবিল। মিনিট দুয়েক দেরি টালিগঞ্জের। বেশ সরগরম প্ল্যাটফর্ম। কলকাতার পিঠেজুড়ে দেওয়া ডানা এখন পাতালেও উড়িয়ে নিচ্ছে মানুষকে। কলকাতার গতি রসাতলে গেছে। কথাটা এখন বেশ গর্বের সঙ্গেই বলা যায়। ভেবে মনে মনে হাসে সঞ্জয়। এভাবে কত কিছুর মানে আমুল বদলে যাচ্ছে। জীবনের মানেওটা যে যার নিজের মতো করে বদলে নিতে চাইছে এখন। দীপ্যমানও তাই চাইছে। ডোরস আর ক্লোজিং, প্ল্যাটফর্ম ইজ অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড। শুনতে শুনতেই রবীন্দ্রসদন।

পাতাল ফুঁড়ে মর্তে উঠে আসে সঞ্জয়। ফ্লাইওভার এখানকার আকাশ অনেকটা ঢেকে দিয়েছে। আকাশ ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে কলকাতার। মানুষের মনটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। ত্যাগ নেই। তিতিক্ষা নেই। আছে ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ, প্রতিহিংসা আর

প্রতিশোধ স্পৃহা। দীপ্যমান যেভাবে ওর বউ অনিন্দিতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছে, ভাবতে পারে না সঞ্জয়। দীপ্যমানের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে ঢুকে পড়ে সে।

প্রেমের নন্দনকানন। যত্রতত্র জোড়ায় জোড়ায় এভাবে ঘনীভূত হওয়া নাকি যুগের হাওয়া। লোকলজ্জা, চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। থমকে দাঁড়ায় সঞ্জয়। ঘাড় ফেরায়। দীপ্যমান পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দীপ্যমানকে সরাসরি বিদ্ধ করতে চায় সে। বলে, "এখানে এসে এসব দেখে বুঝি মাথা ঘুরে যায় তোর। বউকে আর ভাল্লাগে না।" খোঁচা খেয়ে সামান্য রূঢ় হয় দীপ্যমান। বলে, "শোন সঞ্জয়, তুই আমার বন্ধু। বন্ধুর মতো ফিল করার চেষ্টা কর আমায়। প্রেম ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।" সঞ্জয় কথা বাড়ায় না। ওর অবাক লাগে। বউকে আজকাল আর কেউ প্রেমিকা ভাবছে না। সঞ্জয় বোঝে দীপ্যমান নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে। বন্ধুর সায় পেলে মনের জোর বাড়ে। দীপ্যমানের উপর সে কি একটু বেশি গার্জেনি ফলাচ্ছে? ভাবে সঞ্জয়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখাই যাক না। সে অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

মুক্তমঞ্চে মুক্তকণ্ঠে একদল গাইছে নতুন বাংলা গান। সাবেক সম্মেলক গানই এখন ব্যান্ডের গান। তবে রকমফেরে। হোক না একটু ভাঙচুর। চিরকেলে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসুক গান। হোক না হয় যদি গানের মুক্তি। প্রেমও কি এই সাইবার যুগে গানের মতোই চিরকেলে বৃত্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে?

একটা চা নিয়ে মুক্তমঞ্চের কাছে গাছ তলায় গুম মেরে বসেছিল দীপ্যমান। সঞ্জয় এসে ওর কাঁধে হাত রাখে। বলে, "কবে দেখাচ্ছিস তোর চন্দ্রিকাকে।" দীপ্যমান বন্ধুর এই আচমকা রূপান্তরে হতচকিত হয়। বলে, "কালই, কাল দুপুর দেড়টার পর টোটাল ফ্রি। মুক্ত বিহঙ্গ। ওকে দুটোয় আসতে বলেছি।"

"এই মে মাসের গরমে দুপুর দুটোয় বলিস কী রে? তুই পাগল নাকি?"

"আরে কোনও এসি রেস্তোরাঁয় সেঁধিয়ে যাব। ব্যস। ফুল ডিসেম্বর। কাল দেখিস চন্দ্রিকাকে। দেখলে তোরও মাথা ঘুরে যাবে।"

সত্যিই মাথা ঘুরে যাওয়ার মতোই চন্দ্রিকা। পাতলা মেদহীন কামনা সর্বস্ব দেহ। স্কিন টাইট জিনসের চাপে ছাপ পড়েছে। তাতে নারীর শরীরী ঐশ্বর্য চিত্রিত হয়েছে স্পষ্ট। স্লিভলেস খাটো টপ। কপালে এসে পড়া বেয়াড়া চুলকে শাসন করতে হাত তুললে টান পড়ছে টপে। এই অনটনের টপ বে-আব্রু করে দিচ্ছে ওর পেলব নাভিমূলকে। সঞ্জয় বলল, "তুই বিবাহিত সে কথা বলেছিস চন্দ্রিকাকে? নাকি চেপে গেছিস।'' দীপ্যমান সঞ্জয়ের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, "আমি প্রেমিক। প্রতারক নই। প্রথম আলাপেই বলেছি আমি ম্যারেড।" সঞ্জয় বলল, "শুনে চন্দ্রিকার কী রি-অ্যাকশন হল?" দীপ্যমান বলল, "আরে শুনে চমকে যাবি ও যা বলল। বলল, বিয়েটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

খুব কাছে থেকেই চন্দ্রিকাকে লুকিয়ে দেখছে দীপ্যমান আর সঞ্জয়। বাসস্টপে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দ্রিকা। কাছে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছে দীপ্যমান। টেনে ধরে রেখেছে সঞ্জয়। বলেছে, "ধীরে, ধীরে বন্ধু ধীরে। চুপচাপ দাঁড়া এখানে। এত কাছ থেকে লুকিয়ে একাকিনী প্রেমিকার স্বরূপ চাক্ষুস করার সৌভাগ্য আর হবে না।"

দীপ্যমান এবার জোর খাটানোর চেষ্টা করে। বলে, ছাড় সঞ্জয় যেতে দে। বাড়াবাড়ি হচ্ছে। পনেরো মিনিট হয়ে গেল। চন্দ্রিকার মুখ দেখ, ও বেশ বিরক্ত।

"প্রেমিকা বলেই বিরক্ত হচ্ছে। বউ হলে তোর আসার দেরি দেখে ব্যাকুল হত। শোন দীপু, তুই প্রথম যাস না। আমি গিয়ে একটু নাটক করি। বলি তুই আসবি না। খবরটা দিতে এলাম। দেখি কী বলে ও। তুই লুকিয়ে থাক। আমি ইশারা করলেই ঢুকে পড়বি সিনে।"

পায়ে পায়ে চন্দ্রিকার দিকে এগিয়ে যায় সঞ্জয়। দীপ্যমান এখন বেশ মজা অনুভব করে। সে ভাবে সঞ্জয় চিত্রনাট্যর বাইরে ডায়লগ ঝাড়লে তাকেই যেতে হবে উদ্ধারকারীর ভূমিকায়। কিন্তু এ কী। সঞ্জয়ের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে গেল চন্দ্রিকা। দীপ্যমান ছুটে আসার আগেই ট্যাক্সি ছুটে যায়। ট্যাক্সিকে তাক করে পিস্তলের ট্রিগার টেপার ভঙ্গিতেই সেল ফোনের দশঘরার নম্বর টিপে দেয় সে। নম্বর ছুটে যায় ট্যাক্সির ভিতরে। ঝংকার তোলে চন্দ্রিকার সেটে। সেট অফ করে দেয় চন্দ্রিকা। বারবার লাইন ডিসকানেক্ট করে দেয় সঞ্জয়ও। রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকে দীপ্যমান। স্থবিরের মতো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

হঠাৎ দীপ্যমানের বুক পকেট কাঁপিয়ে বেজে ওঠে ভাইব্রেটরি কল। মুঠিতে মোবাইল নেয় সে। কানে তোলে। সঞ্জয়ের কণ্ঠস্বর। "দীপু তুই এখন কোথায়?"

"কার্জন পার্কেই।"

"ওখানেই থাক। আমি ফিরছি।" মোবাইলের যোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই ট্যাক্সি ফিরে আসে। সঞ্জয় নামে। দীপ্যমান সঞ্জয়ের জামার কলার ঝাঁকিয়ে দেয়। "চন্দ্রিকা কোথায়?" "জানি না। আমি জরুরি কাজ আছে বলে পার্ক স্ট্রিটে নেমে অন্য ট্যাক্সি নিলাম।" দীপ্যমান ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "ওকে ট্যাক্সিতে নিয়ে ভাগলি কেন?"

"ভাগলাম কোথায় রে? তোকে দেখালাম রিয়াল লাভ স্টোরি। তুই আসিসনি শুনে কোনও ভাববিকার নেই। আমি বললাম আজ বিকেলটা আমার সঙ্গে কাটাতে আপত্তি নেই তো। শুনেই ও ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। কালও আসছে। কাল ধর ওকে। জিজ্ঞেস কর এসবের মানে কী?"

"কাল কখন আসছে।"

"পাকা দুটো। সেম প্লেস। সেম টাইম। ও জানে তুই থাকবি না। তোকে দেখে থমকে যাবে। জমবে খেল।"

অপমানে গ্লানিতে তখনও ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠছিল দীপ্যমান। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে সে। সঞ্জয় যাওয়ার সময় কাল আগে ওর অফিসে যেতে বলে গেছে। সারাটা রাত ছটফট করে কাটল দীপ্যমানের। পরদিন একটা নাগাদ সঞ্জয়ের অফিসে এসে হাজির। সঞ্জয় ফোনে ব্যস্ত ছিল। দীপ্যমানকে হাতের ইশারায় বসতে বলল। ফোন রেখে এসে বলল, "কি রে অফিস যাসনি। তোর কি আজ অফ ডে?" "না আজ আমার ডুব ডে। স্রেফ ডুব মেরেছি। অফিসে গেলে ফেঁসে যাব। দুটোয় বেরোতে পারব না।" দীপ্যমান এলিয়ে বসে চেয়ারে। এক রাউন্ড চা হোক।" দীপ্যমান হ্যাঁ না কিছুই বলে না। ভবেশ চা দিয়ে যায়। সময় হাতে নিয়েই ওরা বেরিয়ে পড়ে।

ফুটপাত ধরে ওরা হাঁটতে থাকে। সঞ্জয় বলে, "আজও আমরা সেই একই জায়গায় লুকাব। কাল চন্দ্রিকা তোর কাছে এসেছিল। দেখা দিয়েছি আমি। আর আজ আমার কাছে আসছে। দেখা দিবি তুই। আমি থাকব লুকিয়ে।" সময় হয়েছে। বাসস্টপে শ্যেন দৃষ্টি ফেলে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে দীপ্যমান। সঞ্জয় কিন্তু আজ বেশ চিন্তিত। সে যে চাল দিয়েছে, তাতে মাত হবে না কাত হবে

বুঝতে পারছে না। তাই যথেষ্ট উদ্বেগ নিয়ে সেও তাকিয়ে আছে বাসস্টপে।

কিন্তু সহসাই সঞ্জয়ের সংশয়কে অমূলক প্রতিপন্ন করে দিয়ে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। দীপ্যমান লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু সহসাই দমে যায়। না এ চন্দ্রিকা নয়। পর মুহূর্তেই চমকে ওঠে দীপ্যমান। এ কি অনিন্দিতা এখানে এল কী করে। "সঞ্জয় অনিন্দিতা এখানে এল কী করে?" সঞ্জয় কিন্তু এখন বেশ নির্লিপ্ত। সে ছোট্ট উত্তর করে, "ওকে আমি আসতে বলেছি।"

"তার মানে তুই ওকে চন্দ্রিকার কথাও বলেছিস।"

"চন্দ্রিকা চ্যাপ্টর ক্লোজড। আজ চন্দ্রিকার আসার কোনও কথাই ছিল না। অনিন্দিতার আসার কথা আজ। রোজ তোর বউকে চার দেওয়ালের মধ্যে দেখিস তো। আজ এই ঠাঠা দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে দেখ তো ওকে তোর প্রেমিকা মনে হয় কি না।"

দীপ্যমান অবাক হয়। ঈষৎ রোমাঞ্চিতও। বাসস্টপে একা দাঁড়িয়ে আছে অনিন্দিতা। মোহিনী শাড়িতে যেন এক অপরূপা অনিন্দিতা। দীপ্যমান বহুদিন পর এত গভীর দৃষ্টি ফেলে দেখল তার বউকে।

বাসস্টপের দিকে এগোতে চায় দীপ্যমান। সঞ্জয় চেপে ধরে ওকে। বলে "তোকে জ্বালিয়েছে। তুই প্রতিশোধ নে। করুক অপেক্ষা। বুঝুক মজা।" থমকে থেমে যায় দীপ্যমান। আড়াল থেকে কর্নিয়ার ক্যামেরায় ধরে রাখে অনিন্দিতাকে।

সঞ্জয় বলে, খানিক লুকোচুরি খেল। খেলা তো ভুলেই গেছিস। নিজের বউকে কলকাতার রাস্তায় নির্জনে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার মজা নে। নতুন করে চিনে নে নিজের বউকে। দেখ ওর দু'চোখে কত উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা নিয়ে তোকে খুঁজছে। দীপ্যমান স্থির দৃষ্টি মেলে রাখে। এভাবে কেটে যায় কতক্ষণ। অনিন্দিতা নড়েনি। কড়া রোদে সে এক চিলতে ছায়া খুঁজতেও যায়নি। ওর ফরসা মুখ লাল হয়ে গেছে। অনিন্দিতা এখনও একইরকম সুন্দর। কতদিন দীপ্যমান দেখেনি যেন অনিন্দিতাকে। শুধু দেখেছে ওর বউকে। খুব কাছ থেকে দেখেছে। তবু তারই মধ্যে এমন রূপের আগুন ছড়িয়ে এই অনিন্দিতাই তো ছিল। ঠিক সেই প্রথম প্রেমের পর্বের অনিন্দিতা যেন। আশ্চর্য। দীপ্যমান ওর ছ'শো স্কোয়ার ফুটের কার্পেট এরিয়ায় এতদিন এই মেয়েকেই উপেক্ষা করে এসেছে।



অনিন্দিতা সামান্য অনুরাগ করলেই খেপে উঠেছে। যা মুখে এসেছে, তাই বলেছে। দীপ্যমান ওর টনটনে জ্ঞান দিয়ে বোঝে, মানেও যে, প্রতিদিনের ঝগড়ার মূলে ওরই গোয়ার্তুমি। ফলস ইগো। দীপ্যমান বলল, "অনিন্দিতাকে তুই কী বলে এখানে আনলি?" সঞ্জয় বলল, "ও তুই বুঝবি না। বোঝার দরকার নেই। শুধু মাঝে মাঝে চার দেওয়ালের বাইরে বউকে ডেকে এনে এভাবে উন্মুক্ত আকাশের নিচে দেখে নিস। বউকে প্রেমিকা হয়ে ওঠার সুযোগ দিস।"

ব্যথায় ককিয়ে ওঠে দীপ্যমানের বুক। অসহায়ভাবে একবার তাকায় সঞ্জয়ের চোখে। সঞ্জয় নীরব সম্মতি জানায়, "এবার যা।" এক ছুটে অনিন্দিতার কাছে চলে যায় দীপ্যমান।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



ক্ষতিপূরণ

অরিন্দম বসু

বিচার-মীমাংসা বসেছিল পবন সাহার বাড়িতে। সে বড়ডাঙা গ্রামের বড় মাথা। শিউলিকে নিয়ে গিয়েছিল শিবানী। না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সেখানে কী বিচার হল!

কান্না উঠে আসছিল শিবানীর গলা বেয়ে। কাঁদতে পারেনি তবু। বড় মেয়ের হাত ধরে বাড়ির পথ ধরেছিল সে। গোটা রাস্তা কোনও কথা বলতে পারল না দু'জনে।

খড়ের নিচু চাল। দু'ধাপ মাটির সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাথা নামিয়ে ঢুকতে হয়। একটাই ঘরের তিনদিকে দাওয়া। সেই ঘরের ভেতরে ছোট মেয়ে মিতু শুয়েছিল। শিবানী তার কাছে যেতেই সে জানতে চাইল, কী হল মা? বিচারে কী হল? শিবানী জবাব দিতে পারল না।

বাদল মণ্ডলের মেয়ে মিতু আর সুভাষ সামন্তের মেয়ে ঝুমা সাইকেলে স্কুলে যাচ্ছিল সাদিকপুরে। বেশি দূরের পথ নয়। চালাচ্ছিল ঝুমা, মিতু বসেছিল পিছনে। দু'জনেই পড়ে ক্লাস সিক্সে। খুব ভাব তাদের। রোজই তাদের গ্রাম বড়ডাঙা থেকে সাইকেলেই স্কুলে যায় তারা। সেদিন পনেরোই আগস্ট। পতাকা তোলা হবে স্কুলে। জনগণমন গাওয়া হবে। মিষ্টি দেবে। উল্টো দিক থেকে আসা একটা বাইক সাইকেলে ধাক্কা মারল বড়

রাস্তায়। খুবই জোরে আসছিল। ঝুমা ভয় পেয়ে যায়। হ্যান্ডেল ঘুরে গিয়ে বাইকের দিকেই চলে যায়। বাইক যে চালাচ্ছিল সেও সামলাতে পারেনি। ভাদ্র মাস হলে কী হবে, কয়েক দিন ধরে তেড়ে বর্ষা। মাঠ-পুকুর সব এক হয়ে গিয়েছে। সাইকেলে ধাক্কা মেরে বাইক রাস্তার নাবালে জলের মধ্যে আছড়ে পড়েছিল।

গ্রামের কাছাকাছি ঘটনা ঘটায় সঙ্গে সঙ্গে খবর হয় যায়। মিতু আর ঝুমা রাস্তায় পড়ে কাঁদছিল। তাদের স্কুলের ব্যাগ ছিটকে পড়েছে কোথায়। ঝুমার হাত-পা কেটে-ছড়ে গেলেও বড় চোট পায়নি। কিন্তু মিতুর মাথা ফেটে গিয়েছে। রক্ত এসে তার জামা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। খানিক পরে সে হুঁশ হারিয়ে ফেলে। ততক্ষণে হইহই শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকজন ভিড় করতে শুরু করেছে। খবর পেয়ে বড়ডাঙা থেকে মিতুর মা শিবানী হাঁক পেড়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে শুরু করেছিল। পাড়ায় রিকশাভ্যান চালায় মন্টু, সে তাকে ভ্যানে তুলে নেয়। সঙ্গে যে যেমন পারে উঠে পড়েছিল। সুভাষ সামন্ত তখন বাড়িতেই ছিল। সেও বউ আর বড়ছেলেকে নিয়ে দৌড়তে থাকে। ঝুমা তার ছোট মেয়ে।

নামে বড়ডাঙা হলেও আসলে গ্রামটা ছোট। থাকার মধ্যে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে। হাটবাজার, দোকানপাট, ভ্যানরিকশার ঠেক, পার্টি অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে ভরতগড়ে। কলকাতায় যাওয়া-আসার বাস দাঁড়ায় সেখানেই। সেই ভরতগড়েই নিয়ে যাওয়া হল মিতু আর ঝুমাকে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বলা হল ঝুমার যা হয়েছে তাতে ওষুধপত্তর দিয়ে হয়ে যাবে কিন্তু মিতুকে তারা কিছু করতে পারবে না। তাকে তমলুক বা কাঁথির কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার এখনই।

শিবানী দিশাহারা হয়ে গেল। মিতুর বাবা কাজে গিয়েছে দিন কুড়ি হয়ে গেল। ছেলে তপনও নেই। সে ভেড়িতে কাজ করে। গেল বছর গ্রামের কাছেই একটা ভেড়িতে ছিল। মাসখানেক ধরে দূরে গিয়ে থাকে। আর এক মেয়ে শিউলি শুধু ঘরে। কোথায় কী করে শিবানী নিয়ে যাবে মিতুকে?

সাদিকপুরের স্কুলেও খবর পৌঁছে গিয়েছিল ততক্ষণে। সেখান থেকে বাংলার মাস্টারমশাই প্রভাত মাইতি আর দুই দিদিমণি ছুটে এসেছিলেন। প্রভাত মাইতি বললেন, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে এখান থেকে? টাকা যা লাগে আমি দিচ্ছি এখন। আগে তমলুক নিয়ে চলো মেয়েটাকে।

ট্যাক্সি মানে প্রাইভেট গাড়ি। ভরতগড়ে বেশ কয়েকটা আছে। হাসপাতালে, বিয়েবাড়িতে, ভোটের সময় কাজে লাগে। সেইরকম একটা গাড়িতে মিতুকে তোলা হল। মাস্টারমশাই সঙ্গে গেলেন। বাদল মণ্ডলের এক জ্ঞাতিভাই ও পাড়ার আরও দু'জনও চাপাচাপি করে উঠে পড়ল ভেতরে।

এই গাড়ি যখন তমলুক রওনা দিল তখন সুভাষ সামন্ত তার মেয়ে ঝুমাকে নিয়ে অন্য গাড়িতে বেরিয়ে পড়ল কাঁথির দিকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যা-ই বলুক না কেন, মেয়েকে বড় হাসপাতালে দেখিয়ে নিতে চায় সে। ছেলে বাদে তাদের সঙ্গেও জুটে গেল পড়শিদের কয়েকজন।

তমলুক হাসপাতালের ডাক্তার বললেন মিতুকে রাখতে হবে কয়েক দিন। মাথার ছবি তোলা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে খুলির ডান দিকে চিড় ধরেছে। মাস্টারমশাই শিবানীকে বললেন, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। এখানে যা খরচ হবে তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু মেয়ের পাশে থাকতে হবে। শাড়িটাড়ি এনেছেন কিছু?

শিবানী মাথা নাড়ল। সময় পেল কোথায়। সে তো এক কাপড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। না, ঠিক তা নয়। বেরনোর সময় বড়মেয়ে মোবাইলটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

ঘর থেকে কাউকে আসতে বলুন তা হলে। টাকা পয়সা সঙ্গে আছে?

এবার শিবানী হ্যাঁ বলল। বাদল মণ্ডল কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল। সেই তিনটে একশো টাকার নোট আঁচলে বেঁধে নিয়েছিল সে। কিন্তু হাসপাতালে কাকে আসতে বলবে শিবানী? গ্রামের আশপাশে যে জ্ঞাতিরা আছে কিংবা পাড়ার কেউ —তারা ভিড় জমাতে পরে তবে পয়সা খরচ করে কেউ আসবে না। বড় ননদ থাকে চাঁদবালিতে। তাদের খবর দিয়ে লাভ নেই। মেজ ননদের বরটা আলাভোলা। বললেও এসে পৌঁছতে পারবে না। মাস্টারমশাইকে বলতে তিনি ফোন থেকে সেজ ননদের নম্বর বের করে দিলেন। মিতু ঝিম ধরে পড়ে আছ হাসপাতালের বিছানায়। তার মাথায় ব্যথা করছিল। ইঞ্জেকশন দিয়েছে। মোবাইল ঘেঁটে কারও নম্বর খুঁজে পাওয়া শিবানির ক্ষমতায় কুলোবে না। সে শুধু ফোন ধরতে আর ছাড়তে জানে।

সেজ ননদের বর দুলাল এল পরের দিন। মাথায় চুল কমে যাচ্ছে বলে বাইরে বেরলে একটা টুপি চাপায় সে ইদানীং। বউয়ের দেওয়া একটা শাড়ি এনেছে আর মেয়ের একটা ফ্রক। জানতে চাইল বাদল কোথায় কাজে গিয়েছে।

শিবানী জায়গার নাম মনে রাখতে পারে না। একটা আনাজের নামের সঙ্গে মিল আছে বলে এটা মনে রয়েছে। বলল, ওই করলা না মরলা কোথায় গেছে।

ননদাই হেসে উঠল হো হো করে। করলা নয়, ও আমি জানি। কেরালা।

সেটা কোথায়? কত দূরে?

ননদাই টুপিটা খুলে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, বেশি দূরে নয়। ওই তো বোম্বের কাছে।

দুলাল দুপুর অবধি থাকল। হোটেলে ভাত খেল। সে পয়সা শিবানীকেই দিতে হল। তারপর সে বাসে চড়ে চলে গেল।

তিনদিন ধরে শিবানী মেয়ের বিছানার নিচে, মেঝেতে শুয়ে ছিল। ওষুধ চলছে, ইঞ্জেকশনও। এ ক'দিনে চেনা কেউ মুখ দেখায়নি। বাদল মণ্ডল ফোন করেছিল। তখন তাকে মেয়ের খবরটা দেওয়া গিয়েছে। সে কাঁদছিল কিন্তু অত দূর থেকে আসার উপায় তার নেই। চাষের জমি যেটুকু আছে তাতে সকলের বছরভর খোরাকিও হয় না। আগে গ্রামের কাছাকাছি একটা ইটভাটায় কাজ করত। রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ জোটানোর পর থেকে মাঝে মাঝেই বাইরে চলে যেতে হয়। একটা দল রয়েছে তাদের। কলকাতাতেও গিয়েছে কয়েক বার। তবে বাদল তার মেয়ের খবর পেলেও মিতুর দাদা অনুপ বোনের খবর জানতে পারেনি। এবার সে যে ভেড়িতে গিয়েছে সেখান থেকে ফোনও করেনি।

জ্ঞাতি সম্পর্কের যে দেওর প্রথম দিন এসেছিল তাদেরও মোবাইল ফোন আছে। বড় মেয়ে শিউলি সেখানে গিয়ে কথা বলেছে শিবানীর সঙ্গে। দু'মাস হয়ে গেল বাপের বাড়িতে এসে রয়েছে সে। শ্বশুরবাড়ি থেকে রেখে গিয়েছে। বিয়ে হয়েছে আট মাসের বেশি। তখনই কানের দুল দেওয়ার কথা ছিল। বাদল মণ্ডল বরপণ দিয়েছিল দশ হাজার টাকা, বরের আংটি দিয়েছিল, মেয়ের কানেরটা জোগাড় করতে পারেনি। ধার করে আর কত হয়? কিন্তু শাশুড়ি জানিয়ে দিয়েছে দুল না পরে গেলে শ্বশুরঘরে আর ঢোকা যাবে না। জামাই এসে দেখা করে যায় মেয়ের সঙ্গে কখনওসখনও। তারও কিছু করার নেই।

মাঝে একদিন মিতু নিজেই তার ছোটপিসির নম্বর বের করে ফোন করেছিল। শিবানীর ছোট ননদ সুপর্ণা লোকের বাড়ি খাওয়াপরায় কাজ করে কলকাতায়। মিতু কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকল—পিসি তুই আয়, আমার কষ্ট হচ্ছে পিসি, তুই আয়।

চার দিনের দিন সকালে ডাক্তার এসে বললেন, ১২ নম্বর বেডের ছুটি। একে নিয়ে চলে যাও। শিবানী বোবা হয়ে তাকিয়ে রইল। মেয়ের মুখ ফুলে রয়েছে এখনও, বাঁ চোখের নিচে রক্ত জমে কালচে, মাথা দপদপাচ্ছে, হাতে-পায়ে জোর পাচ্ছে না। এভাবেই নিয়ে চলে যেতে বলছে!

ডাক্তারের কাছে তবু সে গেল একবার। তিনি তার দিকে না তাকিয়ে বললেন, একজনের জন্যে কত দিন বেড আটকে রাখা যায়? অন্যদের লাগবে না? ওষুধ সব লেখা আছে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়াও। সেরে যাবে। আমাদের আর কিছু করার নেই।

শিবানী কেমন আলুথালু হয়ে গেল। মেয়ে তো এখনও ভাল করে পা ফেলতে পারছে না মাটিতে। মাথায় লাগছে বলে কাঁদছে। কী করে নিয়ে যাবে সে একে? বাসে চাপিয়ে? তা যদি না হয়, ট্যাক্সিভাড়া কোথায় পাবে?

তখন সুপর্ণা ফোন করল কলকাতা থেকে। তুমি হাসপাতালে গাড়ি দ্যাখো বউদি। অ্যাম্বুল্যান্স। ভাড়া পাওয়া যায়। ওরা পৌঁছে দেবে। আমি কিছু টাকা পাঠাচ্ছি। কিন্তু টাকা যেতে তো দু'দিন সময় লাগবে। কাকাদের বা অন্য কাউকে বলে দ্যাখো, যদি এখন দিয়ে দেয়।

কেউ দিতে পারল না। শিবানি শিউলিকে বলল, তুই জামাইকে বল। হাসপাতাল থেকে বলেছে বিকেলের আগেই নিয়ে চলে যেতে হবে। জামাই যদি টাকা দিয়ে দেয়, বলবি পিসির টাকা এলেই তুই শোধ করে দিবি। পায়ে পড়ে বল জামাইকে।

মিতুকে বাড়ি নিয়ে আসার দু'দিন পরে জানা গেল বিচার-মীমাংসা বসবে। বাইক নিয়ে যে ধাক্কা মেরেছিল সে পাশের গ্রাম শ্যামনগরে থাকে। তাকে বলা হয়েছে দুই মেয়ের বাড়িতেই টাকা দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ।

পবন সাহার উঠানে ভিড় জমেছিল। এরকম কিছু হলে লোকে শুনতে আসে। কথা কাটাকাটি হয়। ঝগড়া হয়। তেমন তেমন হলে হাতাহাতিও দেখা যেতে পারে। সবার মাঝে পঞ্চায়েতের মেম্বার পঞ্চানন দাস এসে বলল, শ্যামনগরের লোক আমার কাছ এসেছিল। এখানে সে আসতে চায় না। আমার হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেছে। সেই টাকা এই আমি বিচারসভায় জমা করে দিলাম। আমার কাজ শেষ। এবার তোমরা বোঝো।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠল, এত সব হয়ে গেল, এ জন্যে মাত্র পাঁচ হাজার! তাও দুই ঘরে ভাগ হলে পেয়ে হবে কী!

পঞ্চানন গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, না, সে লোক দিয়েছে সাত হাজার টাকা। কিন্তু এ তো পুলিশ কেস হয়েছে। সে কেস তুলতে গেলে তারা মাগনায় করবে! তাছাড়া শুধু তো বাইকের দোষ নয়। ঝুমার হাত কাঁপছিল, সেও গাড়ির দিকে চলে গেছিল। পুলিশ যদি এখন সে কথা তোলে, তখন? তাদের বুঝিয়ে ঠান্ডা রাখবে কে? কে গিয়ে দাঁড়াবে পুলিশের সামনে? যাও না যাও। আমি তো বারণ করিনি। সবার মুরোদ জানা আছে। কেউ তো যাবে না। আমাকেই ঝামেলায় জড়াতে হবে। ও দু'হাজার টাকা তাই আমি আগে থাকতেই কেটে রেখেছি।

পঞ্চায়েতের পঞ্চানন একবার পবন সাহার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। পবন সাহা সত্তর ছুঁইছুঁই। এরকম বয়সের লোক বড়ডাঙায় আরও আছে। কিন্তু বয়েস বাড়লেই যে বুদ্ধি পাকবে তা তো নয়। পবন পঞ্চায়েতের মেম্বার না হতে পারে তবে এ গ্রামের সালিশি বসলে তার মগজের শলা না নিয়ে কারও উপায় নেই। আর পরামর্শ নিলে তো গ্রামের বড় মাথা বলে যাকে মেনেছ, তার কথাও মানতে হবে।

পবন সাহা বলল, দুই ঘরেই আড়াই আড়াই করে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, নিয়ে নাও।

টাকা ভাগাভাগির আগেই সুভাষ সামন্ত উঠে দাঁড়াল। বলল, বাদলের মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইস্কুলের মাস্টার টাকা দিয়েছে। আমার তো নিজের টাকায় কাঁথিতে নিয়ে যেতে হয়েছে ঝুমাকে। হ্যাঁ, হাসপাতাল তাকে রাখেনি কিন্তু ট্যাক্সি ভাড়ার হাজার টাকা যে খরচ হল তা কে দেবে? বাদলদের কাছ থেকে সে টাকা কেটে আমাদের দিতে হবে।

কথাটা শুনে শিউলি শিবানীকে ঠেলা দিয়ে বলল, কী বলছে গো মা। তুমি বলো কিছু।

শিবানী ভয়ে ভয়ে ছিল। কানের দুল দিতে পারেনি তারা এখনও। ছেলের বাড়ি থেকে বিচার-মীমাংসা যদি চেয়ে বসে কোনওদিন তা হলেই এখানেই মাথা কাটা যাবে তাদের। সে ভেবেছিল যতটুকু যা পাওয়া যায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। মেয়েটা একা পড়ে রয়েছে। এখানে মুখ খুললে বিপদ বাড়তে পারে। তার বর বা ছেলে থাকলেও হত। তাকে আসতেই হত না। তবু সে কোনওমতে বলল, মাস্টারের টাকা তো আমাদের ফেরাতে হবে। হাসপাতাল থেকে মেয়েকে আনতেও ধার করেছি। এই টাকা থেকে কেটে নিলে থাকবে কী?

সুভাষ চেঁচিয়ে উঠল, সে কার টাকা কোথা থেকে দেবে আমরা বুঝতে যাব কেন? গাড়ি করতে তোমাদের হাজার টাকা লাগেনি। আমার লেগেছে। আমার পাওনা হয়, ব্যাস।

পবন সাহা শিবানীকে বলল, শুনলাম তোমার কথা। কিন্তু সুভাষ যা বলছে তাও তা বুঝতে হবে। ওর তো ওই টাকা খরচ হয়েছে।

শিউলি আর পারছিল না। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল। মা তো বলছে মাস্টারমশাইয়ের টাকা আমরা দিয়ে দেব। আগে পরে যাই হোক, আমাদের টাকা খরচ হবে না?

বড় মাথা ধমকে উঠল। অ্যাই, তোকে কে কথা বলতে ডেকেছে? তুই তো এখানকার মেয়েই নোস। বিয়ে হয়েছে, পরের ঘরে থাকিস, তুই কথা বলিস কোন সাহসে! বয়েস কত হল তোর?

চোখ নামিয়ে নিতে হল শিউলিকে। ষোলো।

তুই তো নাবালিকা রে এখনও। আঠারোই হয়নি।

গুটিয়ে যাচ্ছিল শিউলি। মিনমিন করে বলল, আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

বিয়ে হয়েছে বলে মাথা কিনে নিয়েছিস একেবারে! দেশে ঘরে এমন বিয়ে হামেশাই হচ্ছে। আমার দুই নাতনির তো একটার চোদ্দো, একটার পনেরোতে বিয়ে হল। তাতে কী অ্যাঁ? বোস চুপ করে ওখানে।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এবার পবন সাহা বলল, বাদলের থেকে হাজার টাকা আমি কেটে নিলাম। এখন আমার কাছে রইল। সুভাষ পরে এসে নিয়ে যাবে। কী সুভাষ, কিছু বলবি?

জিভ কাটল সুভাষ সামন্ত। না না জ্যাঠা, কী যে বলো। তোমার কাছে থাকলে তো চিন্তাই নেই কোনও। ও সে পরে দেখা যাবে। ওরা পায়নি, ব্যাস।

শিবানী আর শিউলি দেড় হাজার টাকা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল পবন সাহার উঠোন থেকে। ভিড়ের লোকজন কেউ চলে



যাচ্ছে, কেউ বা গল্প জুড়েছে। মীমাংসা জমল না আজ তেমন। বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। শিবানী ভাবছিল মাস্টারকে টাকা দিতে হবে, জামাইকে তো দিতেই হবে। সে নিজের বাড়ি থেকে লুকিয়ে দিয়েছিল টাকা। মেয়ের ওষুধ কিনতে হবে। এ টাকা দিয়ে কত কিছু করবে?

এতক্ষণ কাঁদতে পারেনি। ঘরের ভেতরে ছোট মেয়ের কাছে বসে কাঁদছিল সে তাই। মিতু আর কথা বলছে না। মাথায় হয়তো ব্যথা উঠেছে আবার। বাইরে এসে শিবানী দেখল দাওয়ায় মেয়েদের আসর বসেছে। অন্য ঘরের মেয়ে-বউরা এসেছে। পিসি-খুড়ি-দিদিমা-ঠাকুমারাও পড়ে নেই। তারা বিচারের সময় থাকতে পারেনি। এখন মেপে মেপে পুরোটা শুনতে চায়। এত চেঁচামেচিতে মেয়েটার মাথায় আরও কষ্ট হবে। তবু কাউকে চলে যেতে বলা যাবে না। নিন্দে হবে তা হলে।

ভাবতে ভাবতেই শিবানী দেখল উঠোনে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। সে নেমে এল দাওয়া থেকে। লোকটা বলল, সুভাষদার মেয়েকে আমার গাড়িতে কাঁথিতে নিয়ে গেছিলাম। যাওয়া-আসার হাজার টাকা ভাড়া বাকি। তাদের ঘরে গেলাম, বলল টাকা তোমাদের কাছ থেকে নিতে।

শিবানী অবাক হয়ে যেতে যেতে বলল, বিচারে তো মাথা সে টাকা আমাদের ভাগ থেকে কেটে রাখল। আবার আমরা টাকা দেব কেন?

সে আমি জানি না। আমার টাকা বাকি, তোমরা দেবে।

শিউলিও উঠোনে নেমে এসেছিল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, না দেব না। তুমি তাদের কাছে যাও। তারা দেবে।

কথা ফুরোতে না ফুরোতেই দু'জনেই দেখতে পেল সুভাষ সামন্ত তার বউ-ছেলে, আরও কয়েকজনকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটার পিছনে। সুভাষ ঝাঁঝিয়ে উঠল—বর বাইরে কাজ করে কামাচ্ছে, টাকা পাঠাচ্ছে, ছেলে টাকা পাঠাচ্ছে, ননদ কলকাতায় রোজগার করে টাকা পাঠাচ্ছে, তোদের আরও কত চাই? ধাক্কা লেগে আমার সাইকেলের যে ক্ষতি হল, সারাতে হবে না? তারা টাকা কি আমি দেব? সেই সাইকেলেই তো তোদের মেয়ে রোজ ইস্কুলে যায়, আমার মেয়েই চালিয়ে নিয়ে যায়। এখন আর সে কথা মনে থাকবে কেন? গাড়ির টাকা তোদেরই দিতে হবে। দে ওকে হাজার টাকা। না দিলে আমি আবার মাথার কাছে নালিশ দেব।

দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। শিবানীর মনে পড়ল, বর বা ছেলের টাকা আসার কোনও ঠিক নেই কিন্তু ননদ যে টাকা পাঠাবে সে কথা মেয়েদের কয়েকজনকে বলেছিল। তা পৌঁছে গিয়েছে সুভাষ সামন্তর বউয়ের কানে। সে শিউলির দিকে তাকাল। টাকাটা এনে দিয়ে দে মা। আমরা বাঁচি।

ওরা চলে যেতে শিউলি মায়ের কাছে গিয়ে বসল। শিবানী ছোট মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। ঘরের একটা মাত্র জানলা। সেখান দিয়ে যা আলো আসে তাতে অন্ধকার বাড়ে। ভাল করে কারও মুখচোখ দেখা যায় না। কোথায় চালের তাড়া, কোথায় ধানের মাচা, কোথায় কেরোসিনের বোতল, কোথায় লক্ষ্মী-গণেশের আসন—এসব ওরা জানে বলে জানে। শিউলি বলল, সবাই আমাদের সঙ্গে এমন কেন করছে মা? আমরা গরিব বলে?

শিবানী বলল, গরিব কী শুধু আমরাই রে। ওরাও তো তাই।

সন্ধে নেমে আসছে। অন্ধকারে ওরা তিনজন আরও জমে যাওয়া অন্ধকার হয়ে বসে রইল। কেউ আর কোনও কথা বলল না।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

উপন্যাস

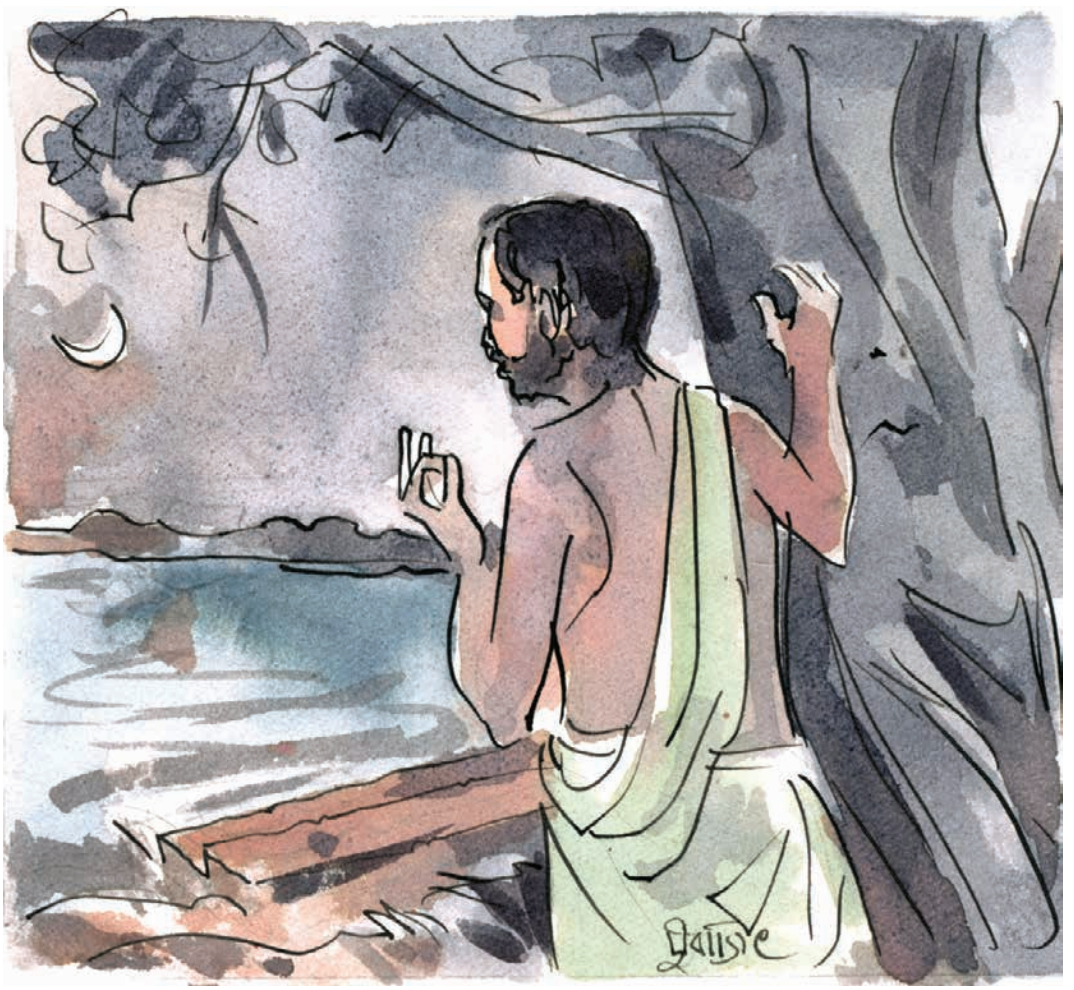

স্বর্গের কাছাকাছি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের মন ভার হয়ে উঠেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন ডান হাত বুকল গাছের গায়ে রেখে। সামনেই গঙ্গা কুলকুল করে বয়ে চলেছে। মা গঙ্গার কুলকুল ধ্বনি ছাপিয়ে যাচ্ছে কোলা ব্যাঙের ডাক। একটু আগে যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

আকাশ ভরা শীতের কালো মেঘ। যে কোনও মুহূর্তে ঝরে পড়বে। পাশ ফিরে তাকালেন নহবতের দিকে। অন্ধকার। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ফিরে চললেন তাঁর ঘরের দিকে।

তাঁকে দেখে ছুটে এল হৃদয়রাম, ছোটমামা কাল কিন্তু আমি বাড়ি যাবো। তুমি অনুমতি দাও। খাজাঞ্চিমশাই ছুটি মঞ্জুর করেছেন।

তোর যাওয়া হবে না।

আমি যাবোই, ব্যাস। আমার গোছ-গাছ হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। গঙ্গার দিক দিয়ে ক'ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ঢুকলেন নিজের ঘরে। পিছনে হৃদয়। নিজের চৌকিতে বসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। হৃদয় পুঁটলি বাঁধতে বাঁধতে জিজ্ঞেস করল, তুমি খাবে না ছোটমামা? অনেক রাত হয়ে গেছে, খেয়ে নাও।

ইচ্ছে করছে না। হৃদয় লক্ষও করল না শ্রীরামকৃষ্ণের মুখটা খুব গম্ভীর। বলল, আমি গ্যাটরি বেঁধে ফেললাম ভোর ভোর বেরুব।

তোর যাওয়া হবে না।

ঠাকুর দেবদেবীর ছবিতে প্রণাম করলেন। আধ শোওয়া হয়ে বললেন, শুয়ে পড় হৃদে, আমায় বিরক্ত করিসনে।

বিরক্ত মুখে ছোটমামার দিকে তাকাল হৃদয়। বলল, আমি যাবই, অনুমতি তোমায় দিতেই হবে। আমি কত কী জোগাড় করেছি, নষ্ট হয়ে যাবে না?

কোনও উত্তর দিলেন না। হাততালি দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে উঠে মন্দিরে মা ভবতারিণীর ঘরের দিকে চললেন। হৃদয় কটমট করে একবার তার মামার দিকে তাকাল। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। রাগ রাগ মুখ করে চোখ বুজল। ভাবল, ছোটমামি এখানে থাকলে ভাল হত। মামিকে বললেই অনুমতি পেয়ে যেত। ছোটমামী একবার বললে মামি আর আপত্তি করতে পারত না। কিন্তু মামীর এমন আমাশা হল যে ছোটমামা বাধ্য হল জয়রামবাটীতে পাঠাতে। খাজাঞ্চিমশাই ঠিকই বলেছিলেন, ছোটমামা অনুমতি না দিলে ভোরবেলায় উঠে পালাবে। খাজাঞ্চিমশাই জানেন না, ছোটমামার চোখে ঘুম নেই। সারা রাত জেগে থাকে। শুধু কি তাই, ছোটমামা না চাইলে (গেটের বাইরে) সে পা পর্যন্ত দিতে পারবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতিগতির হদিশ আজ সকাল থেকেই পাচ্ছে না হৃদয়। সকাল থেকে বারবার দিদিমার ঘরে নহবতে যাচ্ছে। গল্প করছে, খাইয়ে দিচ্ছে। দিদিমা একবার হাসতে হাসতে বলল, আজ তোর কী হল রে গদাই, আজ তো বৈকুণ্ঠের বাঁশি শুনেছি। দক্ষিণে ঘরের পাশেই আলমবাজারে সাহেবদের চটকল। বারোটার সময় চটকলে ভোঁ বাজে শ্রীরামকৃষ্ণের মা চন্দ্রমণিদেবীর আশির ওপর বয়েস। তিনি, চটকলের ভোঁকেভাবেন বৈকুণ্ঠের বাঁশি। বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার ভোগ হয়ে গেল। এবার তিনি খেতে পারেন। রবিবারে মুশকিল হয়, চটকল ছুটি, ভোঁও বাজে না। উনিও সেদিন খাবেন না। সত্যিই তো বৈকুণ্ঠে ভোগ না হলে তিনি কী করে অন্নগ্রহণ করেন। খবর যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তিনি সাধ্যসাধনা করে মাকে খাওয়ান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, মা তুমি খেয়ে নাও। বৈকুণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের ভোগ হয়ে গেছে।

গদাই তুই বলছিস যখন তখন রাধা-কৃষ্ণের খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ মা, তুমি খাও, আমি তোমার পাশে বসছি।

সেদিন সন্ধেবেলায় মার কাছে নহবতে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়ে-পোয়ে কথা শেষ হয় না। গল্প-হাসাহাসি। হৃদয় বারবার এসে উঁকি মেরে দেখে যায়। সামনে আসে না। তাকে দেখলেই দিদিমা ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে। দিদিমার ধারণা, সে নাকি অক্ষয়কে (শ্রীরামকৃষ্ণের মেজদার ছেলে) মেরে ফেলেছে। হৃদয়কে দেখলেই হাতে লাঠি উঁচিয়ে ছুটে যান। তাঁর বিশ্বাস, গদাইকেও হৃদয় মেরে ফেলবে।

ওদিকে সন্ধে গড়িয়ে গেল। মন্দিরে মা ভবতারিণীর সন্ধ্যারতি কখন হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মার কাছ থেকে সরছেন না। রাত বড়ছে। নিস্তব্ধ মন্দিরচত্বর। দক্ষিণেশ্বরের জঙ্গল থেকে শিয়ালের প্রথম প্রহরের ডাক ভেসে এসেছে একটু আগে। এখন শুধু সেদিকে ঝিঁঝির ডাক আর জোনাকিদের মিষ্টি আলোর হাতছানি। হৃদয় এসে দরজার পাশ থেকে বলল, ছোটমামা তুমি খাবে না? তোমার খাওয়া না হলে আমরা খাই কী করে?

তুই খেয়ে নে হৃদে, রামলেলোকেও (রামলাল-ঠাকুরের ভাইপো) খেয়ে নিতে বল। আমার খাবারটা ঢেকে রেখে দে। আমি পরে খাব। আমায় বিরক্ত করিস নে। মার কাছে থাকতে দে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গদাই তুই আমার কাছে থাক।

তাই হবে মা। তোমায় খাইয়ে দিই, খাওয়ার পর তুমি শোবে, আমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাব।

ওদিকে রামলালকে ডেকে হৃদয় বলল, তুই খেয়ে নে, আমিও বসছি।

ছোটকা খাবে না?

হুকুম হয়েছে ওঁর খাবার ঢেকে রাখার। ছোটমামার আজ কী হয়েছে কে জানে, দিদিমার কাছ ছেড়ে উঠছে না। খাইয়ে দিচ্ছে। গল্প করছে, গায় হাত বুলোচ্ছে। ওঁর কখন কী মতি-কে জানে। আমি আবার কাল ভোরে বাড়ি যাব। ওই দেখ, সব বেঁধে-ছেঁদে রেখেছি। আকাশেও মেঘ। জানি না কী হবে!

ছুটি নিয়েছ?

তা নিয়েছি, কিন্তু ছোটমামার অনুমতি এখনও পাইনি। যতবার বলছি, এক কথা বলছে, তোর যাওয়া হবে না।

সে কি, ছোটকা তো কাউকে বাধা দেয় না। নিশ্চয় কোনও কারণ আছে।

নিকুচি করেছে তোর কারণের, কাল ভোরবেলায় আমি বাড়ি যাবই।

ওদিকে নহবতে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, মার ঘুম এসে গিয়েছে। বললেন, মা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো।

রাত গভীর। পঞ্চবটীর দিকে নিকশ কালো আঁধার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন বকুলতলার ঘাটে। মা গঙ্গার দিকে তিনি

একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। একটা হাত বকুল গাছে। তাঁর ঘর থেকে এক চিলতে আলো এসে লম্বালম্বিভাবে পড়েছে তাঁর সামনে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে। মুখটা থমথম করছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। সামনেই হৃদয় দাঁড়িয়ে।

রামলাল ঘুমিয়ে পড়েছে। চৌকিতে শুয়ে হৃদয়। একটু পরে ঠাকুর এসে শুয়ে পড়লেন হৃদয়ের পাশে। একটু পরেই হৃদয়ের মনে হল, গাঁটারিটা ঠিক মতো বেঁধেছে কিনা একবার দেখি নিই। বিছানা থেকে উঠতে পারছে না সে। কে যেন তাকে দড়ি দিয়ে ঘাটের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। কিছুতেই সে বাঁধন খুলতে পারছে না সে। সত্যি সত্যিই সে বাঁধা কিনা দেখার জন্য একবার হাত ছুঁড়লো, তারপরেই পা। তাহলে সে বাঁধা নেই, তবু কেন সে উঠতে পারছে না? সে সব নিশ্চয়ই ছোটমামার কাজ।

কি হল রে হৃদে, অমন করছিস কেন?

তোমার জন্যেই তো, কী করেছ তুমি।

ঘুমিয়ে পড় হৃদু।

হ্যাঁ, ঘুমিয়ে নিই, কাল ভেরে আবার বেরুতে হবে তো? আমি যাব কিন্তু ছোটমামা। তোমার কথা শুনব না। বাড়িতে খুব দরকার আছে। আদালতে কেস উঠবে।

তোর যাওয়া হবে না।

রেগে উঠল হৃদয়, কেন যাওয়া হবে না শুনি। খালি বলছ— যাওয়া হবে না, যাওয়া হবে না। কারণটা বলবে তো?

কাল সকালেই জানতে পারবি।

হৃদয় খেয়ালও করল না, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখটা গম্ভীর। শেষ শীতের রাত, বৃষ্টি হওয়ায় ঠান্ডা পড়েছে খুব। শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ে পরনের কাপড়ের খুঁট। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দরজার শিক ধরে দাঁড়ালেন। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন কে জানে। হৃদয় ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পাশে শুয়ে পড়লেন। পঞ্চবটীর জঙ্গল থেকে ভেসে এল শিয়ালের শেষ প্রহরের ডাক।

একটু পরেই কানে এল গান গেয়ে পাখিদের দিনের প্রথম সূর্যকে স্বাগত জানানোর গান। শ্রীরামকৃষ্ণ উঠে পড়লেন। তাকালেন নহবতের দিকে। তখনও অন্ধকারের ঘোমটা দেওয়া চারদিক। রামলাল আর হৃদয়রাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাশে হৃদয়ের গাঁটরি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাতঃকৃত্য, গঙ্গায় স্নান— সব হয়ে গিয়েছে। গেলেন মায়ের মন্দিরে। মায়ের মুখটাও তাঁর সন্তানের মতো গম্ভীর। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের জানা।

দেখতে দেখতে ফর্সা হচ্ছে। পুব আকাশে রং ধরেছে। গাছে গাছে ফুল। শীতের হিমভরা হাওয়া বইছে। পুব আকাশে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। একটু পরেই প্রভাতী সানাই বেজে উঠবে। মা খুব সকাল সকাল উঠে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন সূর্যের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মা ভবতারিণীর মন্দির। অন্যদিন হলে রামলাল আর হৃদয়কে ডেকে দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ ডাকলেন না। রাতের সেই মেঘের ঘনঘটা কোন নিরুদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে কে জানে। মন্দিরের চুড়ো ছুঁয়ে সকালের প্রথম রোদ এখন মা গঙ্গাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

রামলাল উঠে পড়েছে খানিক আগে। এখন সে গঙ্গাস্নান করছে। জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে এখন ভাটার টান। মন্দিরে মার পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। রোদ ঝলমলে সকাল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল হৃদয়রামের। ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়া সে। এত বেলা অবধি ঘুমোয় না সে। ভেবেছিল, ভোর ভোর বেরিয়ে পড়বে। পথ তো কম নয়। কামারপুকুর হয়ে শিহরে যেতে হবে। সামনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমায় ডেকে দাওনি কেন? বাড়ি যেতে হবে আমায়, এতটা পথ...

বলেছি না তোর যাওয়া হবে না। গম্ভীর গলায় বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কেন যাওয়া হবে না শুনি?

উত্তর দিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তখন মন্দিরে।

চন্দ্রমণিদেবী উঠে পড়েন শেষ রাত্তিতে। এ তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। কামারপুকুরেও তাই করতেন। আগে উঠোন ঝাঁট দিতেন। তারপর সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে গোবর জলের ছড়া দিতেন। চান করে রঘুবীরের কাছে যেতেন। এখানেও উঠে পড়তেন শেষ রাতে। ঘুম থেকে উঠে কালীর মাকে ডেকে দিতেন। কালীর মা নহবতের সব কাজকর্ম করে। আজ কালীর মা আগে উঠেছে। এমনটি তো কোনও দিন হয়নি। কী হল মার?

ব্যস্ত হয়ে ডাকতে লাগল তাঁকে, দরজায় ঘা দিতে লাগল। কিন্তু কোনও সাড়া নেই। বন্ধ দরজায় কান পাতলে কানে এল মৃদু ঘরঘর শব্দ। চমকে উঠল কালীর মা। এ আওয়াজ তার চেনা। এক মুহূর্তও দেরি না করে ছুটল হৃদে ঠাকুরকে ডাকতে।

হৃদয়রাম তখন রাগরাগ মুখ করে তার গাঁটরির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালীর মা ঝড়ের বেগে ছুটে এসে ঢুকল শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, শিগগির চল, মা দরজা খুলছে না। দরজায় কান দিয়ে আমি ঘর ঘর শব্দ শুনেছি। আমার ভাল ঠেকছে না।

হৃদয় ছুটে গেল নহবতে। কী এক কায়দা আর অনেক কসরত করে সে খুলে ফেলল দরজা। দিদিমার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি দিদিমার জন্য কবিরাজমশাইয়ের ওষুধ ফোঁটা ফোঁটা করে দিতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছেন মায়ের পায়ের কাছে। বললেন, বেলপাতা করে ফোঁটা ফোঁটা করে গঙ্গা জলও মুখে দে।

ততক্ষণে খবর পেয়ে গিয়েছে সকলে। সকলেই ছুটে এসেছেন। রামলালকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, মন্দিরে যা, মায়ের চরণামৃত নিয়ে আয়।

রামলাল ছুটে গিয়ে নিয়ে এল, হৃদে মায়ের চরণামৃতও বেলপাতা করে ফোঁটা ফোঁটা দে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন মায়ের মুখের দিকে। বাহ্যজ্ঞান আছে বলে তাঁর মনে হল না। হৃদয় প্রাণ দিয়ে দিদিমার সেবা করছে। দিদিমাকে বাঁচাতে কোনও কিছুর ত্রুটি করছে না সে। দেখতে দেখতে তিনদিন কাটল। চন্দ্রমণিদেবীর উন্নতি হওয়া দূরের কথা, বরং বেশ খানিকটা অবনতি হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে একা পেয়ে হৃদয় জিগ্যেস করল, এই জন্য তুমি আমায় যেতে দাওনি। তুমি সব জানতে?

উত্তর দিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। আস্তে আস্তে বললেন, তিনদিন তো যমের সঙ্গে লড়লি। এবার অন্তর্জলির ব্যবস্থা কর।

বকুলতলার ঘাটের চাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হল। ওদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব চাইছেন, তাঁর মার অন্তর্জলি। গাঁয়ের লোকরা এসে ভিড় করেছে। চন্দ্রমণিদেবীর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। ঠাকুর বললেন, আর দেরি করিস না,ঘাটে নিয়ে যা মাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ফুল, চন্দন আর তুলসীপাতা দিয়ে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিলেন। চন্দ্রমণিকে ধরাধরি করে এনে বকুলতলার ঘাটের চাতালে শুইয়ে দেওয়া হল। ঠাকুর মায়ের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, তুমি কে মা, আমায় গর্ভে ধরেছিলে?

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা শেষ করার সময় হয়ে গিয়েছে। তিনি ঠিক করলেন বৈকুণ্ঠে ফিরে যাওয়ার আগে সব শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করবেন।

সবাইকে ডেকে বললেন, যার যা ইচ্ছে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারো। ইন্দ্রপ্রস্থে এসে সবাইকে একই কথা বললেন। পাণ্ডবরা যার যা ইচ্ছে চেয়ে নিলেন। সব শেষে তিনি গেলেন কুন্তির কাছে। বললেন, বুয়া তোমার মনের যা ইচ্ছে আমি দ্বারকা যাবার আগে তা মঞ্জুর করব।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে তাঁর বুঝতে অসুবিধে হল না। কৃষ্ণ এবার লীলা সম্বরণ করবে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কৃষ্ণহীন জীবন দুর্বিষহ। কিছু যখন চেয়ে নিতেই হবে তোমার কাছে তখন তুমি আমায় এমন বর দাও, আমি যেন সারা জীবন ধরে এবারের মতো দুঃখ পাই।

একি বুয়া, দুঃখের বর কেউ চায়। কেন চাইছো এমন বর?

তুমি তো অন্তর্যামী, তুমি সবই জানো। তবু বলছি, এমন দুঃখ, এমন কষ্ট পেলে তবেই না আমি সব সময় তোমায় ডাকব।

হাসলেন শ্রীকৃষ্ণ। বললেন, তথাস্তু।

তারপর রথে উঠে ফিরে গেলেন দ্বারকায়।

চন্দ্রমণিদেবীর জীবন দুঃখ, কষ্টে ভরা। ছোট্ট বয়সে বিয়ে। তারপরই জমিদারের রোষে ভিটে-বাড়ি, অঢেল জমিজমা ছেড়ে এক কাপড়ে কামারপুকুরে চলে আসা, লাহাবাবুর দাক্ষিণ্যে কিছু জমি পাওয়া, তারপর থেকে শুধু লড়াই আর লড়াই। সেই সঙ্গে মৃত্যুশোক— একটির পর একটি। এই তো সেদিন নাতি অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরেই মারা গেল। সহ্য করতে করতে শেষ পর্যন্ত অক্ষয়ের মৃত্যুর ধাক্কা তিনি সামলাতে পারেননি। বড় কষ্ট পেয়েছিলেন।

ঠিক কুন্তির মতোই। কুমারী-মা হওয়ার পর থেকে দুঃখ তাঁর চিরসঙ্গী। তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। আর চন্দ্রমণিদেবীর সহায় ছিলেন অন্য আদলে শ্রীরামকৃষ্ণ। মহাসমাধির আগে নিজের মুখে তাঁর প্রাণপ্রিয় দ্বাদশ সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রধান ঋষি নরেনকে, তিনি বলেছিলেন, এখনও তোর মনে অবিশ্বাস! তবে শোন... যিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ—ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ।

একমাত্র রানি রাসমণিকেই তিনি দেখিয়ে ছিলেন তাঁর স্বরূপ। রানি অবাক হয়ে দেখেছিলেন, মা কালীর পাশ দিয়ে উঁকি মারছেন ছোট্ট ঠাকুর নয় — একবার রামচন্দ্র, একবার শ্রীকৃষ্ণ। সেইজন্যই বোধহয় তাঁর মা চন্দ্রমণিদেবীর মৃত্যুর ঠিক আগে শ্রীরামকৃষ্ণ জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি কে মা, আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলে?

চন্দ্রমণিদেবী ৮৫ বছর বয়সে ভগবৎপদে মিলিত হলেন ১৬ ফাল্গুন ১২৮২ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ সালে।

এঁড়েদার শ্মশানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে মুখাগ্নি করল চন্দ্রমণিদেবীর নাতি রামলাল। ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। মায়ের ইচ্ছায় তিনি গেরুয়া পরেননি। শ্রাদ্ধও রামলালই করবে। কামারপুকুরের চ্যাটুজ্যে পরিবারে পরে একটি খাতা পাওয়া গিয়েছিল, সেই খাতায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর নাম লেখা ছিল। হাতের লেখা কিন্তু ঠাকুরের নয়। তাতে লেখা আছে, বৃষোৎসর্গপূর্বক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল একাদশদিনে। শ্রাদ্ধক্রিয়া, ভোজনাদি, অগ্রদানী বিদায় ইত্যাদি নিয়ে খরচ হয়েছিল ৩৬ টাকা ২ আনা ২ পয়সা। জানবাজারের দ্বারিকানাথ বিশ্বাস দিয়েছিলেন ২৫ টাকা। আর ১ টাকা গাড়িভাড়া আর একজন রামকৃষ্ণানুরাগী দিয়েছিলেন ১০ টাকা। তবে স্বামী গম্ভীরানন্দজির বইতে আছে, চন্দ্রমণিদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য খরচ হয়েছিল ৩ টাকা ১২ আনা ৩ পয়সা। এর মধ্যে খাটের দাম হিসাবে ধরা আছে ৮ আনা। মথুরানাথ বিশ্বাস বেঁচে থাকলে তাঁর দিদিমার কাজে এলাহি ব্যাপার ঘটত (ঠাকুরের মাকে মথুরবাবু দিদিমা বলে ডাকতেন।)।

দক্ষিণেশ্বরে যখন এত কাণ্ড ঘটছে মা সারদা তখন অসুস্থ হয়ে জয়রামবাটিতে। সেখানের বিস্তর গোলমাল। মায়ের বাবা মারা গিয়েছেন। অসহায় হয়ে পড়েছেন মা শ্যামাসুন্দরীদেবী। বাড়িতে অসহনীয় দারিদ্র। মা সারদার আমাশা সেরেছে সিংহবাহিনী মায়ের কল্যাণে। কিন্তু ভয়ঙ্কর দুর্বল তিনি। তার ওপর পেটে প্লিহা দাগানোর ক্ষত, পুরোপুরি শুকোয়নি। এতটা পথ হেঁটে যাওয়া কি সম্ভব।

ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে তখন চলছে আর এক পালা। চন্দ্রমণিদেবীর শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গিয়েছে। দক্ষিণেশ্বর ফিরেছে নিজের ছন্দে। কিন্তু হৃদয়রাম একটা ব্যাপার কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তখনই সে দেখল মন্দির থেকে বেরিয়ে তার ছোটমামা এদিকেই আসছেন। সে সোজা গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পথ আটকে দাঁড়াল। শ্রীরামকৃষ্ণ





অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে রে হৃদু?

একটা কথা সত্যি করে বলো তো ছোটমামা— তুমি মানুষ না অন্য কিছু?

একথা জিগ্যেস করছিস কেন?

জিগ্যেস করব না? বলি দিদিমা তোমার মা ছিল না ছিল না?

একথা জিগ্যেস করার মানে? তোর দিদিমা আমার মা-ই তো...

তাহলে কি তোমার হাতের জলটুকুও পাবে না? দিদিমার কোনও কাজই তো করলে না, সব রামলালকে দিয়ে করালে। এবার বলো, দিদিমা কী দোষটা করল যে ছেলের হাতের এক ফোঁটা জলও পাবে না?

পাওয়া উচিত কি বল হৃদু, চল তাহলে।

কোথায়?

কেন বকুলতলার ঘাটে। শ্রীরামকৃষ্ণ হন হন করে হাঁটতে লাগলেন। বকুলগাছ পর্যন্ত গেলেন আবার ফিরে এলেন। হৃদয় জিগ্যেস করল, কোথায় যাচ্ছিলে?

ঘাটে তর্পণ করতে। তুই যে বললি মাকে জল দিতে হবে।

তাই বলে এক্ষুণি, এইভাবে?

তাতে কী?

হৃদয়ের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল, দক্ষিণেশ্বর গ্রামের আশপাশের সব গ্রামে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মার জন্য তর্পণ করবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কানে কথাটা যেতেই তাঁরা ছুটে এলেন। সাধারণ মানুষ ভাবছেন, অবতার তর্পণ করবেন, দেখতেই হবে, সে তর্পণ কেমন হয়। পণ্ডিতরা ভাবছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, বড় জ্ঞানী পণ্ডিতরা তাঁকে অবতার বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি কী করে তর্পণ করবেন? এ তো সম্ভব নয়। তাই তাঁরাও দল বেঁধে এসেছেন তর্পণ দেখবেন বলে।

বেলা এগারোটার সময় ঘর থেকে বেরোলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সঙ্গে হৃদয়।

এত লোক কেন রে হৃদে?

এরা তোমার তর্পণ দেখতে এসেছে। একটু দাঁড়াও না, আরও লোক আসবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, কেন হৃদয় এ কথা বলছে। যদি কিছু দক্ষিণা মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ হন হন করে চললেন বকুলতলার ঘাটে। সোজা গিয়ে জলে নামলেন। অঞ্জলি করে জল তুললেন। কিন্তু যেই অঞ্জলি উপরে তুললেন, আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেল। সব জল হাত বেয়ে পড়ল জলে। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। কেঁদে ফেললেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, মা গো তোকে এক ফোঁটা জলও দিতে পারলেম না। কেন এমন হল হৃদু?

এগিয়ে এলেন একজন পণ্ডিত। বললেন, এমনই তো হবার কথা বাবা। তুমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তুমি কখনও তর্পণ করতে পারো? তুমি যে সাধনার সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছ। তোমার কাছেও সব তর্পন-টর্পন অর্থহীন। কেন জানো?

কেন?

কারণ তুমিই 'শ্রদ্ধয়াগ্নি সমিধ্যতে, তুমি শ্রদ্ধয়া-হৃয়তে হবি।'

আর কোনওদিকে তাকালেন না শ্রীরামকৃষ্ণ, তখনও বকুলতলা ঘাটের জল তাঁর পা ছুঁয়ে আছে।

জল থেকে উঠে সোজা হাঁটতে লাগলেন পঞ্চবটীর দিকে। হৃদয় দাঁড়িয়েছিল। সে চেঁচাতে চেঁচাতে পা বাড়াল, ছোটমামা ও ছোটমামা— কোথায় যাচ্ছো?

পিছন থেকে ওর হাত টেনে ধরলেন একজন পণ্ডিত। বললেন, ওকে যেতে দাও, ডেকো না শুধু শুধু। ও এখন আর নিজের মধ্যে নেই। ওকে বিরক্ত কোরো না।

আজ খাবে না নাকি ছোটমামা। খেতে দেব ভাবছিলাম।

ও এখন খাবে কী করে। ও কি খাবার মতো অবস্থায় আছে। ও এখন যেখানে আছে সেখানকার হদিশ দিতে পারে একমাত্র ওই। গৌরী পণ্ডিতের কথাটা মনে নেই, যাঁর থেকে যুগে যুগে অবতাররা আসেন, উনিই স্বয়ং তিনি।

বকুলতলার ঘাট তখন ফাঁক হয়ে গিয়েছে। পন্ডিতরা পা বাড়ালেন নিজেদের বাড়ির দিকে। হৃদয় তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার বড় আক্ষেপ, মাকে একফোঁটা জল দিতে পারল না ছোটমামা। দিদিমাকে বড় ভালবাসত ছোটমামা। হৃদয়ের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন বারবার উঁকি মারে, ছোটমামা বোধহয় আগেই জানত, দিদিমা চলে

যাবেন। তাই তাকে বারবার একই কথা বলেছিলেন, তোর কাল যাওয়া হবে না।

একথা সে ভালভাবেই জানে, ছোটমামার অজানা কিছুই নেই, কিছুই থাকে না।

মনোক্ষুণ্ণ হৃদয় ফিরে চলল ঘরে। পঞ্চবটীতে গিয়ে যখন ধ্যানে লীন হয়ে গিয়েছেন, তখন আর চট করে ফিরবে না। তার পাটোয়া বুদ্ধি কাজে লাগল না। দক্ষিণা প্রায় পড়েইনি। ভেবেছিল, দক্ষিণার টাকা সে একাই পকেটে পুরবে। তা আর হল না।

রামকৃষ্ণদেব পরমহংসের মর্ত্যলীলা তখন মধ্য গগনে। তাঁর লীলা সহচরদের ডাক দিয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের দুঁদে নেতা কেশবচন্দ্র সেন এসে গিয়েছেন। বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে চলে গিয়েছেন গয়ায়। সর্বধর্ম সমন্বয়ের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো বলেই দিয়েছেন মোক্ষম কথা। সবধর্মের লক্ষ্য তো সেই একই। যেমন একটা পুকুর, তার চারটে ঘাট— একটা ঘাটে জল নিচ্ছে, বলে জল, অন্য ঘাটে মুসলমানরা জল নিচ্ছে বলে, পানি। অন্যঘাটে সাহেবরা জল নিয়ে বলছে, ওয়াটার। নিচ্ছে কিন্তু সকলে একই জিনিস— জল।

নহবতে কষ্ট হত বলে শম্ভুবাবু মা সারদার জন্য ঘর বানিয়ে দিয়েছেন। শম্ভুচরণ মল্লিক ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার। চন্দ্রমণিদেবীকে মথুরবাবু কাছারিবাড়ির একটি ঘরে থাকতে দিয়েছেন। অক্ষয়কে নিয়ে তিনি থাকেন কাছারিবাড়ির ঘরে। ঠাকুর রোজ বিকেলে একবার করে যেতেন মা সারদার ঘরে। দাওয়ায় বসে দু'জনে গল্প করতেন। সেদিন ঠাকুর যাবার পর নামল বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। থামার নাম নেই। রাতে ঠাকুর ফিরতে পারলেন না। মা মাছের ঝোল-ভাত রেঁধে ঠাকুরকে খাওয়ালেন।

দু'জনে বসে গল্প করছেন। মার কিন্তু মুখ ঢাকা ঘোমটা। মা বললেন, শম্ভু ঘরটা ভালই বানিয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, নহবতে তোমার বড় কষ্ট হত। তাই তো শম্ভু ঘরটা তুলল। মা ওকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই তো দ্বিতীয় রসদদার? কিন্তু...

কিন্তু কী...?

শম্ভুর তেল ফুরিয়েছে।

সে কী!

হ্যাঁ, শুধু শম্ভু নয়— এবার আরও অনেক কিছু ঘটবে।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে আমাশা বড় বাজে রোগ। ঠাকুরের হয়েছে। এমনি বড় পেট রোগা তিনি। বারবার পায়খানা করে করে মলদ্বার হেজে গিয়ে ঘা মতো হয়েছে। ঠাকুর বড় কষ্ট পাচ্ছেন। হৃদয়ের বউ সন্তানসম্ভবা। এসে এসে মার সঙ্গে আছে। তাকে ছেড়ে মা আসতে পারেন না ঠাকুরের সেবা করতে। সেই সময় এক সন্ধ্যায় একটি মেয়ে এসে হাজির হল। নিজের পরিচয় দিল কাশীর মেয়ে বলে। সে ঠাকুরের সেবা করতে লাগল। তার সেবায় ঘা তখন শুকোবার দিকে।

তখনই একদিন রাত্তিরে মা সারদাকে ধরে আনল সে। ঘোমটায় মুখ ঢাকা মায়ের। একটানে ঘোমটা খুলে দিল কাশীর মেয়ে। বলল, এঁর এমন অসুখ আর ওখানে বসে আছো। ওঁর সেবা করবে কে?

আমি ভাগ্নেবউকে একা রেখে আসি কী করে?

ওদের লোক রাখতে বলো।

ঠাকুর তখনও তাকিয়ে ছিলেন মায়ের মুখের দিকে। তারপর দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলেন।

সেদিন সারারাত চলছিল ধর্মকথা। বক্তা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রোতা দু'জন। মা সারদা আর কাশীর মেয়ে। মা সারারাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন সেই অমৃত কথা। কাশীর মেয়েকে এরপর আর কেউ কোনওদিন দেখেনি। কোথা থেকে এল, কোথায় গেল— কেউ জানে না।

ঠাকুর শুধু মিটি মিটি হাসেন। কিছু বললেন না। ঠাকুর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হতে না হতে মাকে ধরল আমাশা। ঠাকুর বললেন, জয়রামবাটীতে যাও। সুস্থ হয়ে বর্ষার পর এসো।

মাকে ছেড়ে, তোমায় ছেড়ে যাই কী করে?

অসুখটা সারিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো। আমাশা বড় বাজে রোগ। তাছাড়া জয়রামবাটীতে তোমাকে দরকার আছে। সত্যিই ছিল। মা সারদার বাবা রামচন্দ্রর মৃত্যু হয়েছে। বড় কষ্টে আছে মুখুজ্যে পরিবার। এর ওর বাড়িতে ধান ভেনে অন্নসংস্থান করতে হচ্ছে। বাড়ুজ্যে বাড়িতে বেশি ধান ভানেন। মাকে সাহায্য করেন মা সারদা।

এরই মধ্যে হয়ে গেল দুর্গাপুজো। এরপর কালীপুজো। কালীপুজোর জন্য শ্যামাসুন্দরীদেবী চাল তৈরি করে রেখেছেন। গ্রামে নব মুখার্জিদের বাড়িতে কালীপুজো হয়। শ্যামাসুন্দরীদেবী মায়ের জন্য পরম যত্নে সে চাল শুকিয়ে ঠিকঠাক করে রেখেছেন। কিন্তু নব মুখুজ্যে সে চাল নিলেন না। শ্যামাসুন্দরীদেবী অনেক করে বললেন কিন্তু কোনও কথাই শুনলেন না নব মুখার্জি। খবরটা মা সারদাও শুনলেন। কিছু বললেন না। মা'র দুঃখে তিনিও দুঃখিত হলেন।

শ্যামাসুন্দরীদেবীর বড় কষ্ট। এত যত্ন করে, এত কষ্ট করে মা কালীর চাল তৈরি করলেন কিন্তু নব মুখুজ্যেরা সে চাল নিল না। ফিরিয়ে দিল। মায়ের জন্য তৈরি চাল। এ চাল তো কাউকে খেতে দিতে পারবেন না। কী হবে ওই চাল?

সেদিন রাত্তিরে শ্যামাসুন্দরীদেবী স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর দরজা আলো করে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বলছেন, দুঃখ কোরো না ওই চাল আমি খাব।

তুমি কে মা? তোমায় আমি চিনতে পারছিনে।

কেন, ওই যে এই সময় যে আসে। তারপর সেই দেবী পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন। মুখটা লাল।

আর ঘুমোতে পারলেন না শ্যামাসুন্দরী। মেয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। ও সারু সারু, ওঠ মা। আমার কথাটার উত্তর দে, পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। মুখটা লাল। কোন দেবী রে?

জগদ্ধাত্রী।

আমি জগদ্ধাত্রী পুজো করব, জগদ্ধাত্রী পুজো করব। এক কথা বারবার বলতে লাগলেন শ্যামাসুন্দরী। পুজোর জন্য বিশ্বাসদের বাড়ি থেকে দু' আড়া চাল নিয়ে এলেন শ্যামসুন্দরীদেবী।

চাল তো আনলেন, কিন্তু শুকোবে কী করে। বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। থামার নাম নেই। মেয়ের কাছে ছুটে এলেন, সারু, ও সারু। শুনছি মা...।

কী মা?

এই বৃষ্টি, পুজো করতে পারব তো মা?

কেন পারবে না, পুজো ঠিক হবে।

সকাল হল কি হল না। কুঞ্জ মিস্ত্রি এসে হাজির। ঠাকুর গড়ে সে। তাকে দেখে আকাশ থেকে পড়লেন শ্যামাসুন্দরী। বললেন, এ কী তুমি? তোমায় আবার কে খবর দিলে?

কেন, তোমরাই তো আমার বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে এলে। বললে, এ বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো হবে। মূর্তি তৈরি করতে হবে। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। তাই তো এলাম।

কুঞ্জ মিস্ত্রি খুব তাড়াতাড়ি ঠাকুর গড়তে শুরু করে দিল। কিন্তু এত বৃষ্টি হচ্ছে সে প্রতিমা শুকোচ্ছে না। শ্যামাসুন্দরীদেবীর চালই বা শুকোবে কী করে? শ্যামাসুন্দরীদেবী চাটাই করে চাল শুকোতে দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সব জায়গায়

বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তাঁর উঠোনে চাটাই করে চাল শুকোচ্ছে। সব জায়গায় বৃষ্টি শুধু শ্যামাসুন্দরীদেবীর চাটাই-এর ওপর কড়া রোদ। মা জগদ্ধাত্রীর পুজোর চাল শুকোচ্ছে যে।

বৃষ্টি থামার নাম নেই। মা জগদ্ধাত্রীর মূর্তি শুকোনো হল আগুন জ্বেলে।

বাড়িতে পুজো হবে। মেয়ে বাড়িতে আছে, জামাই এলে বড় ভাল হয়। প্রসন্ন চলল দক্ষিণেশ্বরে জামাইকে খবর দিতে। জামাই-এর এখন খুব নামডাক। ইচ্ছে, জামাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। প্রসন্ন যখন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পৌঁছল জামাই তখন নিজের ঘরে। খাটের ওপর বসে আছেন। মাটিতে বসে ক'জন ভক্ত। প্রসন্ন ঘরে ঢুকে বলল, বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে। তোমায় বলতে এলাম। মার ইচ্ছে, পুজোর সময় ক'টা দিন তুমি জয়রামবাটীতে থাকো। যাবে তো, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

খুব ভাল, খুব ভাল। পুজো হোক, তোমাদের ভাল হবে।

তুমি যাবে তো?

সারদা তো আছে, ও যখন পুজোয় থাকছে তখন আমারও যাওয়া হল। তুমি ফিরে যাও। পুজো ভাল ভাবেই হবে। কোনও অসুবিধে হবে না।

মা কিন্তু আশা করেছিলেন, তুমি যাবে।

সারদা থাকলে আমারও থাকা হল।

জয়রামবাটীতে মা দুর্গার পুজো ধুমধাম করে হল।

ভিড় ভেঙে পড়ল মুখুজ্যে বাড়িতে। গ্রামের মানুষ জানে, পুজোবাড়িতে যাওয়া মানে পুজো দেখার সঙ্গে সঙ্গে পেটপুরে খাওয়াও হবে। তাই কিন্তু হল। বিশ্বাস বাড়ির ওইটুকু চালে দিব্যি সব কুলিয়ে গেল। আনন্দে ভরে উঠল শ্যামাসুন্দরীদেবীর মন। কালীপুজোয় চাল দিতে না পারার দুঃখ আর রইল না। বিজয়ার দিন ঠাকুর চলে যাবার আগে শ্যামাসুন্দরীদেবী মা জগদ্ধাত্রীর কানে কানে বললেন, মা জগাই সামনের বছর আবার এসো।

জয়রামবাটী থেকে একটা দল কলকাতায় যাচ্ছে। তারা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে গ্রামের জামাইবাবাজির সঙ্গে দেখা করে আসবে। তাই শুনে সারদা তাঁর মা শ্যামাসুন্দরীকে বললেন, চলো মা আমারও দক্ষিণেশ্বরে যাই।

তাই চল মা। অনেকদিন জামাইকে দেখিনি। কামারপুকুরে লক্ষ্মীর কাছে খবর পাঠানো হল। সেও দক্ষিণেশ্বরে যাবে বলে চলে এল। গ্রামের ক'জন সঙ্গে চললেন। প্রসন্নদাদা নিয়ে যাচ্ছেন সকলকে। ওঁরা হেঁটে এলে তারকেশ্বরে সেখানে পুজো দেওয়া হল। মানতের চুল-নখও দেওয়া হল। সেখানে নৌকো ভাড়া করলেন প্রসন্নদাদা। তিনি বললেন, দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছতে সন্ধে গড়িয়ে যাবে। আজ রাতটা আমার বাসায় থাকবে তোমরা, কাল যাব দক্ষিণেশ্বরে। প্রসন্নদাদার কথা শুনে সকলে খুশি হলেন। এতটা পথ আসতে আসতে তারা সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

পরদিন সকালে সকলে দক্ষিণেশ্বরে। সারদা তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করছেন, হৃদয়রাম ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল সে। তারপর নিজের অহঙ্কার দেখাতে গিয়ে সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, এ কী তোমরা? কে আসতে বলেছে তোমাদের? যাও চলে যাও এখান থেকে। এখনই যাও।

মা সারদা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন হৃদয়ের দিকে। তিনি অবাক হয়েছেন হৃদয়ের কথা শুনে। কিন্তু দুঃখ পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে চুপ করে থাকতে দেখে। তখনই শ্যামাসুন্দরীদেবী বলে উঠলেন, চল সারু আমরা জয়রামবাটীতে ফিরে যাই। এখানে কার ভরসায় মেয়ে রেখে যাব। এক গ্লাস জলও খাওয়া হল না কারও— সকলে ফিরে চললেন জয়রামবাটীতে। হৃদয়রামের পাপের ঘট পূর্ণ হচ্ছে। এবার আর কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। মা মুখে কিছু না বললেও কষ্ট পেলেন। ঠাকুরের প্রতি অভিমানে, মন টনটন করে উঠল। হৃদয়ের ওপর রাগ নয়, অভিমান শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর।

হৃদয়রাম বুঝল না, তার পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে এসেছে। আগেই তিনি তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। হৃদে ওকে যেন চটাসনে। আমায় যা তা বলে তুই পার পেয়ে যেতেও পারিস, কিন্তু ওর মধ্যে যে আছে সে যদি ফোঁস করে ওঠে তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তোকে রক্ষে করতে পারবে না। হলও ঠিক তাই। অচিরেই দক্ষিণেশ্বর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল সে। এ ঘটনা জ্যৈষ্ঠ মাস ১২৮৮ সালে ঘটেছিল।

দক্ষিণেশ্বরে থাকা হল না। সেদিনই তাঁরা জয়রামবাটীতে ফিরে যাবেন বলে পা বাড়ালেন। রামলাল নৌকো ডেকে আনল। নৌকা চলল তারকেশ্বরের দিকে। সারদা মা ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, তুমি না ডাকলে আমি আর দক্ষিণেশ্বরে আসব না।

শ্যামাসুন্দরীদেবীর অভাবের সংসার। সেখানে থাকতে হচ্ছে বলে বড় ক্লেশ অনুভব করেন তিনি। তিনি খবর পেয়েছেন হৃদয় মন্দির থেকে বিতাড়িত হয়েছে। ওদিকে জয়রামবাটী থেকে একটি দল কালীঘাটে গিয়েছিল। ফেরার পথে তারা গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে। ফিরে তারা এসেছিল শ্যামাসুন্দরীদেবীকে খবর দিতে। তাদের গলা শুনে সারদা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলেন, তোমরা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলে তা ওঁর সঙ্গে দেখা হল?

জামাইকে দেখতেই তো গিয়েছিলাম।

উনি ভাল আছেন তো?

তাঁর বড় কষ্ট।

কষ্ট! কিসের কষ্ট? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন সারদা।

নিজের মুখে কষ্টর কথা বললেন যে।

কী বললেন?

বললেন, তোমরা তো ওদিক পানে যাবে, সারদাকে বোল, এখানে আমাকে দেখার কেউ নেই।

কেন রামলাল নেই?

সে কথা বলেছিলাম, উনি বললেন, রামলাল এখন পূজারিদের দলে ভিড়েছে। সে আর আমায় দেখার সময় পায় না। তোমরা একটু সারদাকে বোল, সে যেন চলে আসে। কষ্ট হচ্ছে। অসুবিধে হচ্ছে আমার।

শুধু এরাই নয়, দক্ষিণেশ্বর থেকে যে আসছে তাকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সরাদ উতলা হয়ে উঠলেন দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য।

ওদিকে ভানুপিসির শরীর খুব খারাপ। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সকলে ধরে নিয়েছে, ভানুপিসির আয়ু শেষ। সারদা বড় ভালবাসেন ভানুপিসিকে। রোজ তাঁর কাছে তাঁর যাওয়া চাই-ই। সেদিন ভানুপিসির অবস্থা বেশ খারাপ। সারদা এসে ঢুকলেন ঘরে। তাকে দেখে বললেন, সারু আমি জানি তুমি কে। তুমি যদি যাও মা তাহলে এ যাত্রায় আমি বেঁচে যেতে পারি। জড়ানো গলায় কষ্ট করে বললেন ভানুপিসি।

সারদা গিয়ে বসলেন ভানুপিসির পাশে। তাঁর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, তুমি ভাল হয়ে যাবে ভানুপিসি।

আমি জানি, তুমি কে মা। তুমি যদি চাও আমি ভাল হয়ে যেতে পারি।

আমি বলছি, তুমি ভাল হয়ে যাবে।

তোমার এত দয়া। তুমি যখন বলেছ, আমি ভাল হয়ে যাব। পাণ্ডুর মুখে জড়ানো গলায় কথাগুলো বললেন ভানুপিসি।

সারদা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, আমি বলছি, তুমি ভাল হয়ে যাবে।

পরদিন থেকেই ভানুপিসি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, ও যদি নিজেকে না চেনায় তাহলে কার সাধ্য ওকে চেনে। ভানুপিসি কিন্তু তাঁর আদরের সারুর ছোটবেলা থেকে তাকে চিনেছিলেন। তার স্বরূপ জানতেন। তাই ভানুপিসি বারবার তাঁর সারুর কৃপা পেয়েছেন। এবার প্রাণে বাঁচলেন আর-আর একবার? সেই অলৌকিক ঘটনার কথা বলি।

সেবার পুজোর সময় সারদা জয়রামবাটীতে আছেন। শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের দল ডানা মেলে উড়ছে। মাঠে মাঠে কাশ ফুল বাতাসে মাথা দুলোচ্ছে। শিউলি ফুলের গন্ধে মনে করছে গোটা জয়রামবাটী। পুজো বাড়ি থেকে ভেসে আসছে ঢাকের শব্দ। সেখানে মণ্ডপ আলো করে বসে আছে সপরিবার মা দুর্গা।

ভানুপিসি ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। পুজোবাড়ি পর্যন্ত যাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। পুজোবাড়ি না গেলে মায়ের মুখ তো দেখতে পাবেন না। ভক্তিমতি ভানুপিসি এ দুঃখ কোথায় রাখবেন। তাই শুয়ে শুয়ে মনের দুঃখে কাঁদছেন। জীবনে এই প্রথম মায়ের মুখ দেখা হবে না। ভানুপিসির বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরল। তারপর আবার সেই আক্ষেপ, সেই হা-হুতাশ।

হঠাৎ সারদা এসে ঘরে ঢুকলেন। ভানুপিসি শুয়ে শুয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছেন। ভানুপিসিকে কাঁদতে দেখে সারদা জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে ভানুপিসি, কাঁদছ কেন?

কাঁদব না। বছরে একবার মা দশভুজা সপরিবার আসেন। আমি এমন অভাগা মায়ের মুখটা একবার দেখতে পারব না?

কেন দেখতে পারবে না। পুজো বাড়ি তো কাছেই। যাও না, মাকে দর্শন করে এসো।

আমার কি সে ক্ষমতা আছে রে সারু, মায়ের মুখ দর্শন করে আসব। এই দুঃখ কোথায় রাখব যে সারু। মায়ের মুখটা একবারও দেখতে পাব না।

অত আক্ষেপ করছ কেন ভানুপিসি। একবারই না হয় দেখতে পেলে না। তাতে কি! প্রত্যেকবারই তো দেখো।

তুই আমার দুঃখ বুঝবি না রে সারু। ঢাকের শব্দ কানে আসছে আর আমার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে, মায়ের মুখ দেখতে পাব না— তাহলে আমি বেঁচে আছি কেন? বুঝতে পারছি, এবার পুজোটা আমার কেঁদে কেঁদেই কেটে যাবে।

না না, তা কেন হবে। মায়ের মুখ তুমি ঠিকই দেখতে পাবে।

আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছিস সারু?

আমি কি তাই পারি? উঠে দাঁড়ালেন সারদা। দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। ভানুপিসি অবাক হয়ে দেখলেন, দশভুজা, সালঙ্কারা মা দুর্গা সিংহর পিঠে বসে মহিষাসুর-সহ বসে আছেন।

তারপরই দেখলেন দরজার দিকে সারদা এগিয়ে যাচ্ছে। আরও একবার ভানুপিসির দিকে ফিরে দাঁড়াতেই ভানুপিসি দেখলেন দশভুজা মা দুর্গাকে। পরমুহূর্তে ভানুপিসি দেখলেন, সারু ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভানুপিসির মন তৃপ্ত। আর দুঃখ নেই তাঁর। ঘরে শুয়ে তিনি দর্শন পেলেন মা দুর্গার। তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল, সারুই মা দুর্গা, সারুই মা জগদ্ধাত্রী, সারুই মা কালী। যদিও কালীরূপে ভানুপিসি সারুর সাক্ষাৎ এখনও পাননি। উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠেছে ভানুপিসির। মুখ খুশিতে ভরা মন। তাঁর আর কোনও দুঃখ নেই। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় জ্যান্ত দুর্গাকে দর্শন করা তাঁর হয়ে গেছে। আর কী চাই। শুয়ে শুয়ে হাসছেন ভানুপিসি, আর দু'হাত জোড় করে প্রণাম করছেন। এ প্রণাম কাকে? মা দুর্গাকে না তাঁর আদরের সারুকে?

দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডেকে পাঠিয়েছেন। বারবার ডাকছেন। হৃদয় নেই, রামলাল দেখাশোনা করে না। ভাবের ঘোরে থাকেন। কখন কী ঘটিয়ে বসবেন কে জানে। সেবার আপমান হয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে আসার সময় সারদা মা ভবতারিণীকে বলে এসেছিলেন, যদি ডেকে নিয়ে যাও তবে যাব। না হলে আর আসব না। সারদা অনুভব করেন, সে ডাক এসে গিয়েছে। সারু গিয়ে মাকে বললেন, মা দক্ষিণেশ্বর থেকে উনি বারবার ডেকে পাঠাচ্ছেন, আমি যাব।





শ্যামাসুন্দরীদেবী বললেন, নিশ্চয়ই যাবি। তবে আমি যাব না। সেবার হৃদয় যে ব্যবহার করল, আমার বড় লজ্জা করে জামাই একটা কথাও বলল না।

বলবেন কেন মা, উনি তো জানেন কী হতে যাচ্ছে।

বুঝি না বাবা তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার। তা লক্ষ্মীকে নিয়ে যাবি তো?

নিশ্চয়ই। কামারপুকুর থেকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

জয়রামবাটীতে সকলে জেনে গেছেন সারদা দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর কাছে যাচ্ছে। যাবার জন্য তিনি যে বারবার ডেকে পাঠাচ্ছেন। সারদার সঙ্গে যাবার জন্য ক'জন তৈরি হলেন। কামারপুকুর থেকে লক্ষ্মীদিদি এসে গেলেন। তবে একা নন, আরও ক'জন এসেছেন। তাঁরাও যাবেন দক্ষিণেশ্বরে, মা ভবতারিণীর দর্শন হবে। গদাইকে দেখতে পাবেন। ভাগ্যে থাকলে কালীঘাটেও যাওয়া যাবে।

ভানুপিসিও খবর পেয়ে গেলেন, তাঁর সারু স্বামীর কাছে দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছে। তিনি দু'জনেরই স্বরূপ জানেন। তাঁর বড় ইচ্ছে, হর-গৌরীকে এক সঙ্গে দেখার। কিন্তু তা কী আর হবে, অতটা পথ হেঁটে যাওয়া! ভানুপিসির দিকে তাকিয়ে সারদা বললেন, আমি তাহলে আসছি।

তুই যাচ্ছিস বলে একদিকে আমার আনন্দ হচ্ছে। অন্যদিকে তুই এখানে না থাকলে আমি বড় অসহায় বোধ করি। আমার কিছু হলে কাকে ডাকব?

হাসলেন সারদা। বললেন, তুমি ডেকে দেখো।

ভানুপিসি তাকালেন সারদার দিকে। বললেন, তাই তো আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তুই তো মা জগজ্জননী। সবার ডাক তুই শুনতে পাস। আমি ডাকলে একটু শুনিস। আসিস আমার কাছে। যা করার করে দিস মা।

তাই হবে।

আমার আর চিন্তা নেই। জামাইকে বলিস, একবার যদি পারে জয়রামবাটী যেন ঘুরে যায়। ওকে কতদিন দেখিনি। দেখতে বড় ইচ্ছে করে। ক্ষমতা থাকলে একবার দক্ষিণেশ্বরে যেতাম।

তুমি ওঁকে মন-প্রাণ ঢেলে ডেকো, দেখবে দক্ষিণেশ্বরটাই এসে গেছে তোমার কাছে।

সে কথা কি আর আমি জানি না! তোকে যখন-তখন ডাকতে পারি। জামাইকে কি আর পারি? না ডাকা উচিত?

তোমার ইচ্ছে হলে তুমি ডেকো ভানুপিসি। আমি তোমায় বলছি।

হ্যাঁ, তুই সে কথা বলতে পারিস বটে। তুই আর জামাই একে অন্যের পরিপূরক। কথা বলতে বলতে ভানুপিসি আনমনা হয়ে গেলেন। সেই ফাঁকে সারদাও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ভানুপিসি পুণ্য-প্রাণ মানুষ। তাইতো ভানুপিসিকে বারবার স্বরূপে দেখা দিয়েছেন।

দক্ষিণেশ্বর যাবার তোড়জোড় চলছে। শ্যামাসুন্দরীদেবী ভাল দিন খুঁজছেন। এই সময় হঠাৎ কামারপুকুর থেকে লক্ষ্মণ পাইক এসে হাজির। সারদাকে বললেন, তোমার যে এখনই যাবার দরকার মা। গদাই খবর পাঠিয়েছে। তার বড় অসুবিধে হচ্ছে। হৃদয় নেই, রামলাল ওর দেখাশুনো করে না। বড় অসুবিধে, বড় কষ্ট তার। তাই আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে মা। তুমি আর দেরি কোর না। এখনই যাত্রা করো।

সারদা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শ্যামাসুন্দরীদেবীর ভাল দিন-টিন দেখা শিকেয় উঠল। সারদা জানেন, ঠাকুর এসব খুব মানেন। সারদা বললেন, ওসব দিনটিন দেখার দরকার নেই। কালই যাব।

শ্যামাসুন্দরী আর কিছু বললেন না। সারদাকে তিনি চেনেন। ও কারও কথা শুনবে না। একবার যখন বলেছে তখন কাল দক্ষিণেশ্বরে যাবেই। ওর মুখের কথা নড়চড় হওয়ার জো নেই। সবাই বলে, বিশেষ করে ভানু, জগৎ-সংসার যার ইশারায় চলে, তার কথা কি আর অন্যথা হতে পারে? সে যখন বলেছে কাল দক্ষিণেশ্বরে যাব— তখন যাবেই। হৃদয়কে সাবধান করে দিয়েছিল জামাই, সে শোনেনি; তার ফল হাতে হাতে পেয়েছে। মথুরবাবুর ছেলে তাকে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

লক্ষ্মী এসে জিগ্যেস করলেন, ছোটকাকি, কাল মন্দিরে যাচ্ছো তো? দু' একদিন পরে গেলে হয় না?

—না রে লক্ষ্মী, তোমার ছোটকাকা বার বার খবর পাঠাচ্ছেন, ওঁর বড় কষ্ট হচ্ছে, বড় অসুবিধে হচ্ছে। কাল কামারপুকুর থেকে

পাইকবাবু এসে বলে গিয়েছে, তেনার ছোট কাকা ওঁকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন, এখনই দক্ষিণেশ্বরে যেতে। ওঁর বড় কষ্ট। হৃদয় নেই।

রামলাল তো আছে?

রামলাল! সে পুরুতদের দলে ভিড়েছে। তাই তাঁর বড় কষ্ট। সেই জন্য তো আমাদের কালই দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে।

ঠিক বলেছ ছোটকাকি, আমাদের কালই দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে।

সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে আর এক কাণ্ড। হৃদয় চলে যাবার পর সব সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর চোখ রাখার কেউ নেই। ছেলেরা এক এক করে আসছে ঠিকই, তাদের পক্ষে ঠাকুরের ওপর সবসময় নজর রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু ঠাকুর বেশির ভাগ সময় থাকেন ভাবের ঘোরে। ফলে কখন কী বিপত্তি ঘটে যায় কে জানে।

মা সারদারা জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসছেন যেদিন তার আগের দিনই ঘটে গেল বিপত্তি। ভাবের ঘোরে চলতে চলতে পড়ে গেলেন রেলিং-এর ওপর। বাঁ হাতে ভীষণ লাগল। কবিরাজমশাই দেখে বললেন, দেখে মনে হচ্ছে হাতটা ভেঙেছে।

ডাঃ সরকার মন্দিরের লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঁর একটু খেয়াল রাখতে পারো না? জানো না, প্রায় সব সময়ই উনি ভাবের ঘোরে থাকেন। তোমরা তো সব পুরনো লোক, মথুরবাবু বেঁচে থাকলে আজ আর কারও রক্ষে থাকত? সব চাকরি যেত।

খাজাঞ্চিমশাই একবার এসে দেখে গিয়ে দায় সেরেছেন। পিছন থেকে একজন বলে উঠল, ঠাকুরের ভাইপো তো আছেন, তিনি একটু নজর রাখতে পারেন না?

সবই জানেন ডাক্তারবাবু। চুপ করে গেলেন। শুধু রামলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাকিকে খবর দাও, উনি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে যান। আমি ওষুধ দিচ্ছি, ভাঙা হাড় জুড়ে যাবে। তবে ব্যথা যন্ত্রণা একটু ভোগ করতে হবে। তবে উনি যদি একবার চান, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা জায়গা জুড়ে যাবে, ব্যথা-যন্ত্রণা আর থাকবে না। কিন্তু উনি কি আর তা করবেন? আমি জানি, কেউ ওঁর মুখ দিয়ে ও কথা বলাতে পারবে না।

পরিদন জয়রামবাটী থেকে যাত্রা করলেন মা সারদা, সঙ্গে লক্ষ্মী আর গ্রামের কয়েকজন। সেদিন যে বৃহস্পতিবার তার ওপর বারবেলা। একথাটা একবারও মনে এল না মা সরদার। অথচ তিনি ভাল করেই জানেন, ঠাকুর এসব খুব মানেন। বাছবিচারও যথেষ্ট। মা কিন্তু ঠিক উল্টো। কোনও বাছবিচার তাঁর নেই। কিন্তু ঠাকুরের কথা তাঁর কাছে বেদ-বাক্য। নিজের স্বরূপ লুকিয়ে রাখতে রাখতে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আসলে এ যুগে বিশ্বাসী মানুষ খুব কম। ঠাকুর তাই বলেছেন, ও রূপ লুকিয়ে রেখে এসেছে। পাছে কেউ কু-নজর দিয়ে ঘোরতর অমঙ্গলের কবলে পড়ে।

এতটা পথ অতিক্রম করে সকলে দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চৌকির ওপর বসে আছেন। হাতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। ওকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। সারদা গিয়ে প্রণাম করলেন। সামনে মাটিতে বসে গুটি কয়েক ভক্ত। ঠাকুর বললেন, ও তুমি! এসে গেছো। ভাল হয়েছে। কথা বলতে বলতে থমকে গেলেন, বললেন, আজ বৃহস্পতিবার। তা কখন বেরিয়েছ?

মা সারদা সময় বললেন, কেন দুপুরবেলায়।

চমকে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন, সে কী, বারবেলায় বেরিয়েছ। সেইজন্যই আমার এমন হল। যাও বারবেলা কাটিয়ে এসো।

এক্ষুণি যাব?

না, না তা কী করে হবে? নহবতে যাও। একটু জিরোও, জল-টল খাও। কাল সকালে যেও। দুপুরে না যাওয়াই ভাল। হিম পড়ছে তো।

ওঁরা নহবতে গেলেন। লক্ষ্মীদিদি বললেন, একা যেতে হবে না আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জয়রামবাটীতে বারবেলা কাটাতে গেলেন ছোটকাকিকে নিয়ে লক্ষ্মী। কিন্তু ফিরে আসা হল না। কামারপুকুর থেকে খবর এসেছে রামলালের বিয়ে। সেদিন দুপুর দুপুর পৌঁছে গেলেন।

ওঁদের দেখে শ্যামসুন্দরীদেবী আকাশ থেকে পড়লেন, এ কী তোরা?

কাল দুপুরে বেরিয়েছিলাম, খেয়ালও হয়নি একে বৃহস্পতিবার তার ওপর বেরিয়েছি দুপুরবেলায়। তখন তো বারবেলা। তাই বারবেলা কাটাতে এলাম। ভাবছি আজই ফিরে যাব।

না না, রাত হয়ে যাবে পৌঁছতে। এতটা পথ। কাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়িস। তা জামাই কেমন আছে রে সারু।

ওঁকে দেখে তো কিছু বোঝা যায় না। তবে কাল হাত ভেঙেছেন। ওঁর ধারণা, আমরা বারবেলায় বেরিয়েছি বলে ওঁর হাত ভেঙেছে।

সে কী কথা রে সারু?

আমাদেরই ভুল। এ সব মানতে হয়।

তখনই কামারপুকুর থেকে খবর নিয়ে এল একজন। সারদাকে দেখে বলল, ও ছোটকাকি তোমাকে আর লক্ষ্মীদিদিকে কামারপুকুর যেতে হবে।

চমকে উঠলেন সারদা। বললেন, কেন রে?

রামলালদাদার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। এবার আমার আবার দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে।

উনি কি আসতে পারবেন?

এ কথা বলছ কেন?

একে তো বিয়ে-টিয়েতে উনি থাকেন না। তার ওপর আজ আবার ওঁর হাত ভেঙে গিয়েছে।

সে কী! তা তুমি এরমধ্যে জানলে কী করে?

আমরা যে আজ গিয়েছিলাম। দেখে এলাম হাত ভেঙে বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। করিরাজমশাই দেখে ওষুধ দিয়ে গিয়েছেন।

কার সঙ্গে কথা বলছ? লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, এ কী তুই কখন এলি?

এই তো একটু আগে। হঠাৎ এলি যে।

রামলালদাদার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। তোমাদের দু'জনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কামারপুকুরে যেতে বলল।

কাকি কি বলো, কামারপুকুর তো যেতেই হবে।

তাই তো ভাবছি। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে যাবার কী হবে?

দেখে তো এলি ওঁর কত কষ্ট। ওদিকে কামারপুকুরে রামলালের বিয়ে। কী যে করি।

কী আবার করবে, বিয়েতে তো যেতেই হবে।

তা তো হবে। কিন্তু রামলালও দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে আসবে।

অত ভেবো না তো। মন্দিরে অত লোক আছে। ভক্তরা আছে। ছেলেরা আসছে। ছোটকার কোনও অসুবিধে হবে না। রামলালের বিয়ের পরই তো আমরা দক্ষিণেশ্বরে যাব। রামলালও ফিরে যাবে। একটা দিন যা হোক করে চলে যাবে।

হাতটাও এখনই ভাঙতে হল! চিন্তিত দেখায় মা সারদাকে।

নাও মুখ হাত ধোও। তুইও আয়। দাওয়ায় বোস। আজ রাত্তির থাক। কাল আমাদের সঙ্গে কামারপুকুরে ফিরিস।

না গো, সেটি হচ্ছে না। তোমরা দু'জনে কামারপুকুরে যেও। আমি দক্ষিণেশ্বর যাব। ছোটকাকে খবর দিতে।

সেই ভাল। তোর তিনজনেই তেতে-পুড়ে এসেছিস। আজ রাত্তিরটা থাক। কাল সকাল সকাল তোরা রওনা দিস। আমি যাই, যা হোক কিছু রান্না করি, ভাত বসাই।

কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসতে একদিন-দু'দিন নয়— সারদা মায়ের লেগে গেল পাকা চার মাস। সঙ্গে যথারীতি লক্ষ্মী। মা গিয়ে প্রণাম করলেন। যথারীতি ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢাকা। বাঃ বাঃ, তোমরা এসে গেছে। যাও ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো। মার জন্য শম্ভুবাবু যে ঘরটা তৈরি করে গিয়েছিলেন, সেই ঘরে নয়, লক্ষ্মীকে নিয়ে মা সারদা গিয়ে উঠলেন নহবতে। ছোট্ট ঘুপচি ঘর। হাবিজাবি, নানা কিছুতে ভরা। ঠাকুরের জন্য জিওনো মাছ, রান্নার জিনিসপত্র, বাসন-কোসন, চাল-ডাল আরও কত কী। কোমরে আঁচল বেঁধে দু'জনে মিলে অল্প সময়ের মধ্যে ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেললেন তাঁরা। শ্রীরামকৃষ্ণ জল তুলিয়ে রেখেছিলেন। মুখ-হাত-পা ধুয়ে মাদুর পেতে দু'জনে বসলেন। কাছেই বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। জলের কুলকুল শব্দ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে গঙ্গার দিক থেকে আসছে ঠান্ডা হাওয়া।

ঠাকুরের জন্য ফল মিষ্ট প্রসাদ নিয়ে এল রামলাল। ঠাকুর দেখেই বললেন, এনেছিস—ভাল হয়েছে। যা যা নহবতে দিয়ে আয়। ওখানে শুকসারি আছে।

শুকসারি?

চিনতে পারলি না? গিয়ে দেখ তোর কাকি আর লক্ষ্মী এসেছে।

ওরা এসেছে! হন হন করে নহবতের দিকে হাঁটল রামলাল। কিন্তু লক্ষ্মীকে বিধবার বেশে দেখে থমকে দাঁড়াল। মুখ নামিয়ে নিল। যতবার লক্ষ্মীদিদিকে এই পোশাকে দেখে রামলালের মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা। মাঝে মাঝে রাগ হয়ে যায়। আজকাল তাও করতে পারে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই দৃশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের মেজদাদা রামেশ্বরের অস্থি নিয়ে এসেছে রামলাল। গঙ্গায় বিসর্জন দেবে। তাকে দেখে ঠাকুর সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন। জিগ্যেস করলেন, কামারপুকুরের সব খবর ভাল তো রে?

শোকের বাড়ি যতটা ভাল থাকা যায়, ততটাই ভাল।

তা লক্ষ্মীর খবর কী?

লক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেছে।

কী বলছিস তুই, লক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেছে!

উঃ, বারণ করেছিলাম না?

ভাল ছেলে পাওয়া গেল। বিয়েও হয়ে গেল।

ও তো বিধবা হবে।

কী বলছ ছোটকা? দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরে রামলাল।

যার তার সঙ্গে ওর বিয়ে দিলেই হল!

যার তার বলছ কেন ছোটকা, ভাল ছেলে দেখেই তো দেওয়া হয়েছে।

ও কি সবার ভোগে লাগতে পারে? ও কে জানিস?

ও কে?

মা শীতলার অংশে ওর জন্ম। ওর বিয়ে ওইভাবে দেয় নাকি?

রামলাল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তার ছোটকার দিকে। ওর মনের মধ্যে তোলপাড় চলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিগ্যেস করলেন, তোর ছোট খুড়িমা কে জানিস?

কে আবার, তুমি আমার ছোটকাকা আর উনি ছোটখুড়িমা।

ছাই জানিস, জানবিই বা কী করে— তুই হৃদের পথে চলেছিস।

সেখানে আর দাঁড়ালেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁটতে শুরু করলেন পঞ্চবটীর দিকে। ঘন জঙ্গল সেদিকে। প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডাকে। বিষাক্ত সাপের আনাগোনা সব সময়। বড় বড় হনুমানের জগৎ ওই জঙ্গল। রামলাল যেতে চায় না ওদিকে। কিন্তু ছোটকা গিয়ে বসে থাকেন হয় পঞ্চবটী নয়তো বেলতলায়।

লক্ষ্মীদিদিকে ওই বেশে দেখলে রামলালের মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা। তার বুকটা টনটন করে ওঠে। বিয়ের পরই কাজের খোঁজে যাচ্ছি বলে লক্ষ্মীদিদির স্বামী ধনকৃষ্ণ সেই যে বেরল আর ফিরল না। বারো বছর পরে কুশপুত্তলিকা দহন ও শ্রাদ্ধ করে লক্ষ্মীদিদি বিধবার সাজে যখন বেরিয়ে এলেন, বাড়িতে তখন আর এক প্রস্থ কান্নার রোল উঠেছিল। অনেকদিন পরে রামলালের আজ আবার পুরনো কথাগুলি মনে পড়ল। ছোটকাকা বলেছেন, লক্ষ্মীর মা শীতলার অংশে জন্ম।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভরা সংসার। এক-একদিন নহবতে দরমার ফাঁক দিয়ে মা সারদা উল্টোদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে তাকান। যদি একটু দেখা যায়। যেদিন মা ঠাকুরকে দেখতে পান সেদিন আর তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের গান প্রায়ই শুনতে পান মা সারদা। তাই আনন্দে দিনগুলো কাটতে লাগল মা সারদার। ঠাকুরের সন্তানরা একে একে এসে গিয়েছে। মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে পাঠান, আজ ওমুক খাবে। নরেন এলে মা আগে ভাগে ছোলার ডাল বসিয়ে ময়দা ঠেসতে বসেন। মোটা মোট রুটি বানাতে হবে তার জন্য। নরেন পালোয়ান, তাই তার জন্য চাই মোটা রুটি আর ছোলার ডাল।

বলরামবাবুর বাড়ির চাকর লাটু। ছোট ছেলে, খুব কাজের। রামবাবুর সঙ্গে বা গিন্নিমার ঘোড়ার গাড়িতে প্রায়ই আসে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর দেখছেন ছেলেটিকে। তার পছন্দ হয়। ঠাকুর জানেন, ওর মনটা একটু গড়েপিঠে নিতে হবে। তাই একদিন রামবাবুকে বললেন, রাম ছেলেটাকে আমায় দাও।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিন না। খুব কাজের ছেলে।

ঠাকুর জানেন, কার মধ্যে কী আছে। লাটুর মধ্যে যিনি আছেন তাকে একটু উসকে দিলেই হবে। লাটুও ঠাকুরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাঁর সেবা করে। সঙ্গে সঙ্গে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে লাটুর মধ্যে সুপ্ত হয়ে যিনি আছেন তাকে জাগিয়ে তোলেন। লাটু এখন ধ্যান করে, তাল দিয়ে দিয়ে গান গায়।

এইভাবে কেটে যায় দিনের পর দিন। রামবাবুর বাড়ির চাকর লাটু আর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সহচর। রাখাল, নরেন, কালীদের মতো লাটুকে তৈরি নিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেদিন সন্ধেবেলায় ঠাকুর বসে আছেন চৌকিতে। মাটিতে বসে আছেন ভক্তরা। লাটু এক কোণে বসে ধ্যান করছে। অন্যদিকে ঠাকুরের কথাগুলো লাটু গিলে নেয়। সেদিন ধ্যানে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে লাটু। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁক পাড়লেন, এই ব্যাটা লেটো... এই লেটো...

ঠাকুরের দিকে তাকিয়েই দু'হাত জোড় করে। ঠাকুর বলেন, বেটা বসে বসে যার ধ্যান করছিস সে যে নহবতে বসে রুটি বেলছে। যা নহবতে, ওঁকে সাহায্য করবি এবার থেকে।

লাটু গিয়ে দেখল, শ্রীশ্রীমা আটা ঠেসছেন। নরেন এসেছে, মোটামোটা রুটি আর ছোলার ডাল যে তার চাই-ই। এরপর থেকে লাটু সব সময় মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। মায়ের কৃপাও পেয়েছিল সে। লাটু ভবিষ্যতে হয়েছিলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টি। একটি ওড়িয়া চাকরকে বানিয়ে দিলেন সাধু। স্বামী বিবেকানন্দও ঠাকুরের মতো তাঁকে লেটো বলে ডাকতেন। ভক্তদের কাছে তিনি ছিলেন লাটু মহারাজ। লেখাপড়া এক বিন্দুও জানতেন না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় তিনি ছিলেন অনেকের চেয়ে এগিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। সেদিন গোপালের মা ভাত রেঁধেছে। পেট রোগা মানুষ, মন্দিরের ভোগ তাঁর সহ্য হবে না। খান তো অতি সামান্য। সেদিন খেতে বসেছেন। গোপালের মা ভাত বেড়ে খেতে দিয়েছেন। মা সারদা পাশে বসে হাওয়া করছেন। একটু ভাত মুখে দিয়েই থালাটা ঠেলে দিলেন। বললেন, এ কী ভাত হয়েছে? যাও আর কোনওদিন তোমার হাতের ভাত খাব না। কাঁদতে

লাগল গোপালের মা। মা কিছু বলতে গেলেন, হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

গলার ব্যথায় আগে থেকে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এবার ধরা পড়ল গলায় ঘা। ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের। মা সারদা গোপালের মাকে বললেন, তুমি আমায় বললে না কেন। আমি সব ঠিক করে দিতাম।

কী বলব মা, রোজই যেমন করি আজও সেইভাবে করেছি।

শ্রীশ্রীমা আর কিছু বললেন না। তিনি বুঝে গিয়েছেন। এ আর কিছুই নয়, ভাত খাওয়া বন্ধ হওয়ার উপলক্ষ মাত্র।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার দেখছেন তাঁকে। ঠাকুরের কিছু হলে, উনিই আসেন। মথুরবাবুর সময় থেকে চলছে এই রেওয়াজ। ডাক্তার সরকার ওধুধ দিয়ে বললেন, কমা উচিত ছিল। যাইহোক, আর দু'চার দিন যাক তারপর বলব কী হয়েছে। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধান। ভাত না খাওয়াই ভাল।

সেদিন সন্ধেবেলায় নরেন এসেছে। নরেনকে দেখে ঠাকুর খুব খুশি। বললেন, একটা গান গা তো শুনি। তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে একেবারে ঢলে পড়েছে। গঙ্গায় ভরা জোয়ার। অন্ধকার খাপটি মেরে বসে আছে পঞ্চবটীর দিকে জঙ্গলে। এবার সে ধীরে ধীরে আঁধারের চাদর বিছিয়ে ফেলে ঢেকে ফেলবে বিশ্ব চরাচরকে। শেষ হবে একটি দিন, শুরু হবে অন্ধকারের রাজত্ব।

ঠাকুর খাটের ওপর বাবু হয়ে বসেছেন। দিব্যি হাসিখুশি মানুষ। নরেন এলে আরও খুশি হন। নহবতে খবর চলে গিয়েছে, নরেন এসেছে। মা সারদা বসে গিয়েছেন মোটা রুটি আর ছোলার ডাল বানাতে। তখনই ভেসে এল নরেনের গলা,

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী
তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী
তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী
অসুপ্ত ভুজগাকার আধার-পদ্মবাসিনী।

গান শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ। নরেন জানেন, নামগানে উনি আবার প্রকৃতিস্থ হবেন। মানুষটি কে তিনি আজও পুরো চিনতে পারলেন না। অথচ প্রথম দেখা হওয়ার দিন তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলেছিলেন, এস এস সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রধান ঋষি। মনে রেখ তুমি আমি অভিন্ন। শুধু কি তাই, একদিন তাঁর মস্তক ওঁর স্পর্শের ফলে তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে কোথায় যে চলে যাচ্ছিলেন তা তিনি বুঝতেও পারেননি। তাঁর আর্তনাদে, আবার তাঁকে প্রকৃতিস্থ করে বাস্তবে নামিয়ে এনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, ভবিষ্যতে নরেন হবে তাঁর সঙ্ঘের প্রধান সেনাপতি। তাকে এখন তৈরি করতে হবে। তা না হলে তিনি শরীর ছাড়বেন কী করে। তাঁর সন্তানদের নরেন ছাড়া আর কে দেখবে।

নাম গান শুনিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বাস্তবে নামিয়ে আনলেন নরেন। বাস্তবে ফিরেই বললেন, তুই এত দেরি করে আসিস কেন রে নরেন? তোকে দেখতে যে বড় ইচ্ছে করে। একটু ঘন ঘন আয়।

আসতে তো চাই। হয়ে ওঠে না।

তুই না এলে আমাকেই যে যেতে হবে তোর কাছে। মনে রাখিস, আমি সব সময় তোর দিকে নজর রাখি। তোর যে এখন অনেক কাজ।

ডাঃ সরকার এসেছিলেন?

উনি তো প্রায়ই আসেন।

গলা দেখে কী বললেন?

ঠাকুর হাসছেন। বললেন, কী আবার বলবে! আমি জানি দু' চারদিন পরে ও কী বলবে।

আপনি জানেন?

নিশ্চয়ই জানি। ছাড় ও সব কথা। রাতটা থাকবি তো?

ইচ্ছে তো আছে।

খুব ভাল, খুব ভাল। এই তো চাই। মায়ের মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে এসেছিস তো?

সে তো যেতেই হবে। না গেলে আর রক্ষে আছে?

সে ঠিক সে ঠিক। জানবি মা-ই সব। আর একজন আছেন—ওই নহবতে। দেখবি কালে কেমন মেয়েদের জাগরণ ঘটবে ওকে সামনে রেখে। পরে যখন তোর জ্ঞান খুলবে, তখন বুঝবি ও কে?

নরেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার আবার শ্রীরামকৃষ্ণের গলা দেখলেন। তাঁর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, শেষকালে গলায় ঘা বসিয়ে বসলে। তারপর নিজের মনে বললেন, হবে নাই বা কেন? এর ওর পাপ টেনে নিচ্ছে শরীরে। তা আমার কথা কি শুনবে?

কী কথা?

গান গাইবে না। বেশি কথা বলবে না।

ওটি হবে না গো। ধর্মকথা, মা কালীর গান ছাড়া আমি কি বাঁচতে পারি?

ঠিক আছে সব কোরো। শুধু আমার একটা কথা শোন।

কী কথা?

তুমি একবার শুধু বলো, আমার গলার ঘা সেরে যাক। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। তা হলে তুমি আবার গান গাইতে পারবে। সকাল থেকে রাত অবধি ভগবৎ কথা কইতে পারবে। শক্ত জিনিস খেতে পারবে।

জোরে হেসে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি ও কথা কইতে পারি?

আমি জানি, তুমি কিছুতেই বলবে না। তাহলে যে আমার কাজটা সহজ হয়ে যেত। সব কাজ ফেলে বারবার ছুটে ছুটে আসতে হত না। আমি ওধুধ দিয়ে যাচ্ছি, সেটা অন্তত খেও।

তা খাব, ডাক্তারের কথা শুনতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে হেসে উঠলেন ডাঃ সরকার। তারপর চিন্তিত মুখে ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ডাঃ সরকার।

ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীরামকৃষ্ণের। নহবতে বসে সারদা যত্ন করে ঠাকুরের জন্য পুষ্টিকর পথ্য তৈরি করেন। তাঁর মুখে চিন্তার রেখা।

মা'র মনে পড়ে ঠাকুরের কথা। খেতে বসে সেদিন বলেছিলেন, যখন দেখবে কলকাতায় গিয়ে রাত কাটাচ্ছি। খেতে বসে খাদ্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়ে খাচ্ছি তখন বুঝবে এই শরীর আর বেশিদিন থাকবে না।

শ্রীশ্রীমা বুঝতে পারেন, পরিস্থিতি সেইদিকেই গড়াচ্ছে।

আমার কী হবে?

তোমার আবার কী?

তোমার আবার কী হবে— তোমার এত সন্তান। তারা তোমার মাথায় করে রাখবে। না হলে কামারপুকুরে চলে যাবে। শাক বুনবে, মোটা ভাত আর শাক খাবে।

শ্রীশ্রীমা চুপ করে গিয়েছিলেন। এই নিয়ে আর কোনওদিন একটা কথাও বলেননি। বলবেন কেন, তিনি কি কম! স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালীপুজোর দিন যে তাঁকে ষোড়শী পুজো করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যার পুজো করেন তিনি কে তা কি বলার দরকার আছে?

শ্রীশ্রীমা জানেন, এইবার ওঁকে কলকাতায় নিয়ে যাবার দরকার। তাতে চিকিৎসার সুবিধে হবে। তার আশঙ্কাই সত্যি হল। ডাঃ সরকার

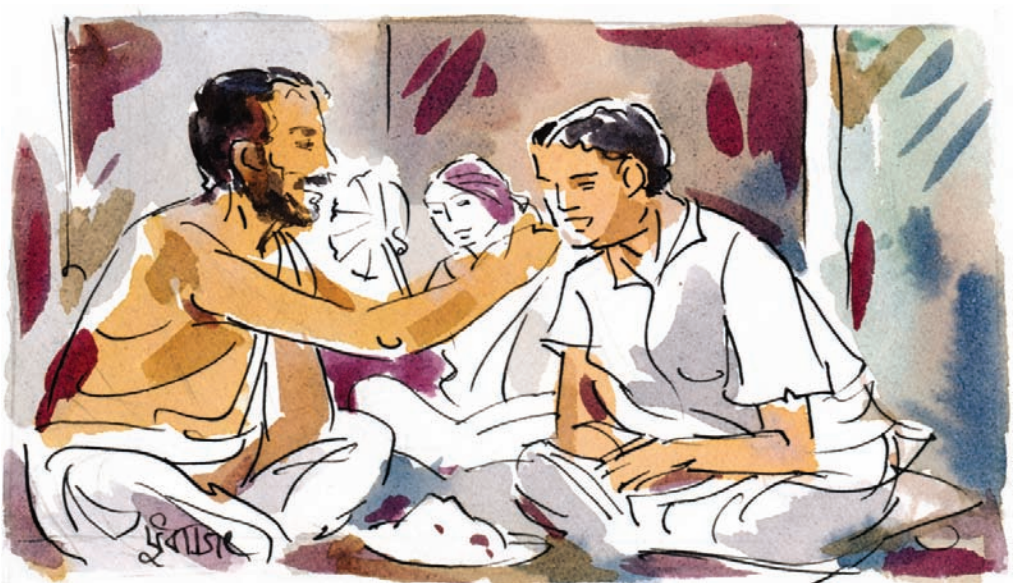

সেদিন দেখে বললেন, তোমার ঘা তো কমছে না। তোমায় এবার কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। কলকাতায় থাকলে তোমার চিকিৎসার সুবিধে হবে।

ভক্তদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমরা কলকাতায় একটা বাড়ি দেখো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। ভক্তরা বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি খুঁজতে।

সেদিন নরেন এসেছেন। তিনি সবই শুনেছেন। ঠাকুর খেতে বসছেন। খাবার সাজিয়ে দিয়ে ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে মা বসেছেন হাত পাখা নিয়ে। নরেন গিয়ে বসলেন। ঠাকুর তাঁর খাবারের অগ্রভাগ নরেনকে দিলেন। শ্রীশ্রীমা সবই দেখলেন। তাঁর বুক কেঁপে উঠল। ঠাকুরের সেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। খাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়ে খাওয়া হয়ে গেল। বাকি শুধু কলকাতায় গিয়ে রাত কাটানো। তাও হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি।

নহবতে ফিরে গিয়ে চোখের জলে ভাসেন শ্রীমা সারদা। তবে কি উনি দেহরক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প। নরলীলা শেষ হয়ে আসছে। কলকাতায় শুরু হবে অন্তিম পর্বের লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর পর্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে। তাঁকে কেন্দ্র করেই তো দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের এত বোলবোলাও। মা ভবতারিণীও ছেলেকে কাছে রাখার চেষ্টা করবেন না?

কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই শ্রীরামকৃষ্ণের। হাসি মুখে তিনি ভক্তদের সঙ্গে ধর্মকথা কইছেন। গান গাইতে পারছেন না। নরেন এলেই তাঁকে দিয়ে গান গাওয়াচ্ছেন। মাস্টার (শ্রীম— কথামৃতর সংকলক) বসে থাকেন ঠাকুরের কাছে। তিনি ভালভাবেই জানেন,ঠাকুরের এই রোগভোগ, সাধারণ মানুষের মতো যন্ত্রণা— সবই লোকশিক্ষার অঙ্গ। লোকশিক্ষা দিতে, হিন্দুধর্মকে রক্ষে করতেই সে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর আদর্শের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখার জন্য থাকবেন শ্রীশ্রীমা সারদা, থাকবেন তাঁর সন্তানরা। আর থাকবেন নরেন্দ্রনাথ।

ভক্তরা এসে খবর দিল বাগবাজারে একটা বাড়ি পাওয়া গেছে। ঠিক হল ঠাকুরকে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে। এবার যাবার দিনটা ঠিক করতে হবে। ঠাকুর তো বলেই দিয়েছেন, ভক্তরা যা বলবে তাই হবে। ডাঃ সরকারের নির্দেশ দেরি করা চলবে না। ১৮৮৫ সালের জুন মাসে ধরা পড়ল ঠাকুরের গলার রোগ। আর অক্টোবর মাসের গোড়ায় দক্ষিণেশ্বরের লীলা শেষ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চললেন কলকাতায়। মা সারদা, লক্ষ্মীদিদি আর মন্দিরের পূজারি রামলাল রইলেন দক্ষিণেশ্বরে। যাত্রা করার আগে মায়ের মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির আর শিব মন্দিরগুলি ঘুরে এলেন নহবতে। বললেন, সময় হয়ে গিয়েছে। মা ভরতারিণী তোমায় দেখবেন। সারদা প্রণাম করলেন। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু বাগবাজারের বাড়ি দেখে বেঁকে বসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অত ছোট বাড়িতে তিনি থাকতে পারবেন না। তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন বলরামবাবুর বাড়িতে। ভক্তরা বেরিয়ে পড়লেন ভাল বাড়ি খুঁজতে। সত্যিই তো, রানি রাসমণির মন্দিরের ওই রকম বড় বড় ঘরে থেকে অভ্যস্ত ঠাকুর কখনও থাকতে পারেন বাগবাজারের বাড়ির ঘুপচি ঘরে।

আবার শুরু হল বাড়ি খোঁজা। তখনকার দিনে কলকাতায় ভাড়া বাড়ির অভাব ছিল না। কিন্তু পছন্দসই পাওয়া মুশকিল। শেষকালে কাশীপুরের বাড়িটির খবর পাওয়া গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বড় একটা ঘর। পাশে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট। বড় ঘরে ঠাকুর থাকবেন। সে ঘরে ভক্তদের থাকার যথেষ্ট জায়গা আছে। পাশের ঘরে ঠাকুরের সন্তানরা থাকতে পারেন। পছন্দ হল সকলের। কাছাকাছির মধ্যে এইটাই সব থেকে ভাল বাড়ি।

ঠাকুর চলে এলেন কাশীপুরের বাড়িতে। একতলায় চান করার চৌবাচ্চা। রান্নাঘরও নিচে। মা সারদা প্রতি মুহূর্তে ঠাকুরের কথা ভাবছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ছাড়ার আগে মাকে বলেছিলেন, আমি শুরু করে দিয়ে গেলাম, তোমায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোমার সামনে অনেক কাজ। ঠাকুর জানেন, তাঁর কথা সারদা মায়ের কাছে আদেশ। এ কথা বলে না গেলে তাঁর অনুপস্থিতিতে মা শরীর ছেড়ে দিয়ে ফিরে যেতে পারেন আপন ধামে।

সেবার জয়রামবাটীতে ভয়ঙ্কর আমাশার সময় মা তো শরীর ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের হাত ধরে তাঁকে দোতলার ঘরে তুলে দেওয়ায় বললেন, এই তো বড় ঘর। ভক্তদের বসার জায়গাও প্রচুর। কিন্তু সমস্যা দেখা গেল ঠাকুরের পথ্য নিয়ে। ঠাকুরের জন্য যা আসছে

ঠাকুর তা মুখে দিতে পারছেন না। কী করে এই সমস্যার সমাধান হবে— সেইটাই চিন্তার। শেষ পর্যন্ত সমস্যার মুখে সমাধানের পথ বলে দিলেন ঠাকুরই। বললেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে সারদাকে নিয়ে এস।

মাকে আনা তো হবে। কিন্তু থাকবেন কোথায়? মা বড় লজ্জাশীলা। ঘোমটার আড়ালে নিজেকে আড়াল করে রাখেন। এ বাড়িতে কোনও অন্দরমহল নেই। আলাদা কলঘর-টলঘর কিচ্ছু নেই। মার পক্ষে তো আর সবার সামনে দিয়ে নিচে যাওয়া সম্ভব না। যাবেন না। অথচ না এনেও তো উপায় নেই। ঠাকুরের খাওয়া হচ্ছে না। একজন ভক্ত বললেন, যা হওয়ার হবে মাকে তো আগে আনা হোক। সেই মতো দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মাকে বলতেই মা অগ্র-পশ্চাৎ ভাবলেন না। ঠাকুরের পথ্য ঠিকমতো হচ্ছে না শুনে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন।

শ্যামপুকুরের বাড়িতে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে। দেখো তো আমার খাওয়া হচ্ছে না।

মা কোথায় থাকবেন, কোথায় ঠাকুরের পথ্য তৈরি করবেন— কিছুই জানেন না।

ছাদে গিয়ে উঠলেন। সিঁড়ির পাশে ছোট্ট একটা ঘুপচি মতো জায়গা আছে। ওখানেই থাকবেন, রান্না করবেন বলে ঠিক করলেন। লাটু এসে সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিল। কী কী লাগবে তাও ওকে বলে দিলেন।

একটু পরেই সব এসে গেল। মা চটপট ঠাকুরের পথ্য বানিয়ে ফেললেন। লাটু আগে নেমে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে বলত, মা আসছে ঠাকুরকে পথ্য খাওয়াতে।

কথাটা শুনে সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেন। মা এসে ঢুকতেন ঠাকুরের ঘরে। তাঁকে পথ্য খাইয়ে, মুখ মুছিয়ে দিয়ে আবার ওপরে চলে যেতেন।

পুজোর আগে তখন প্রচণ্ড গরম। ছাদ তেতে উঠত। বৃষ্টি পড়লে ছাট লাগত। পুজোর পর ঠান্ডা বাতাস বইত, কিন্তু তাঁর মুখে কেউ কোনওদিন একটি কথাও শোনেনি। তিনি কী খান, সারাদিন একা একা কী করেন কেউ জানে না। রাত তিনটের সময় শৌচে যেতেন, চৌবাচ্চার জলে চান করে ওই যে ওপরে উঠে যেতেন, তাঁকে কেউ কোনওদিন দেখতেও পেত না। নামতেন শুধু দু'বার— ঠাকুরকে পথ্য খাওয়াতেন। একমাত্র লাটুর অনুমতি ছিল ওপরে যাওয়ার। কাশীপুরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মাকে ওইভাবে প্রচণ্ড কষ্টর মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল।

ওদিকে শ্যামপুকুরে ঠাকুরকে কেন্দ্র করে তখন বসে গিয়েছে চাঁদের হাট। নরেনের গান, ধর্মচর্চা, অযাচিত দয়া— কোনও কিছুতেই কার্পণ্য নেই ঠাকুরের। কে বলবে তাঁর গলায় অমন অসুখ। ডাঃ সরকার রোজ আসছেন। গলা দেখছেন, ওষুধ দিচ্ছেন। এক-একদিন ঠাকুরের কথামৃত শুনে জীবন সার্থক করছেন। পুজো এসে গেল। শ্যামপুকুরের সেই বাড়িতেই যেন পুজো হচ্ছে। তার মধ্যেই তিনি নরেনকে গড়ে-পিটে নিচ্ছেন, সন্তানদের নির্দেশ দিচ্ছেন— কোনও কিছুতেই বিরাম নেই। এরা সব কলমির দল— ঈশ্বর কোটি।

কালীপুজোর দিন রাতে তাঁকে পুজো করলেন ভক্তরা। সেদিন শ্যামপুকুরের বাড়ির ওই ঘরটা যেন পুজো মণ্ডপের রূপ নিয়েছিল। সেদিন সকলে ঠাকুরের কৃপা পেয়েছিলেন, অসুস্থ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু ডাঃ সরকারের মুখে চিন্তার রেখা। বড় আশা করে তিনি ঠাকুরকে টেনে এনেছিলেন শ্যামপুকুরে। কিন্তু গলার ঘা বাড়া ছাড়া কমেনি একটুও। প্রচণ্ড যন্ত্রণা, কিন্তু ঠাকুরকে দেখে কে বলবেন, ওঁর গলায় ঘা। এ যে মারণ রোগ। ঠাকুর সবাইকে নিয়ে আনন্দে আছেন, শুধু কথা বলা একটু কমেছে। গান তো আগেই বন্ধ হয়েছিল। দলে দলে ভক্ত এসে হাজির হচ্ছে শ্যামপুকুরে। তাঁদের চাহিদার শেষ নেই।

সেদিন ভক্তদের ডেকে ডাঃ সরকার বললেন, এখানে ওঁকে আর রাখা যাবে না। খোলা-মেলা পরিবেশ, আলো বাতাস যেখানে বেশি, তেমনই কোথাও ওঁকে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো কিছুটা উন্নতি হবে। খোঁজ তোমরা ওইরকম একটা বাড়ি, যেখানে গাছ-গাছালিও থাকবে। কলকাতায় ওইরকম বাড়ি পাওয়া মুশকিল। শহরতলিতে দেখ।

আবার শুরু হল বাড়ি খোঁজা। শেষ পর্যন্ত কাশীপুর উদ্যানবাটীর খোঁজ পাওয়া গেল। ডাঃ যেমন বাড়ি, যেমন পরিবেশের কথা বলেছেন— ঠিক সেইরকমই কাশীপুরের বাড়িটি। পর্যাপ্ত আলো-হাওয়া, রোদ, অজস্র গাছ, দু'টি পুকুরও আছে। সবার পছন্দ হল বাড়িটি। ঠিক হল কাশীপুরেই ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হবে। ঠাকুর নির্বিকার। মা জানলেন, লাটুর কাছে। তাঁদের মতামত তো চাওয়া হয়নি। মা জানেন, ঠাকুরকে যেখানে নিয়ে যেতে চায় নিয়ে যাক। কলকাতায় রাত্রিবাস তো হচ্ছেই, অন্নের অগ্রভাগ অন্যকে খাইয়ে নিজের খাওয়াও হয়ে গিয়েছে। কথাটা বারবার মনে হয় মা সারদার। তিনি জানেন, কী হতে চলেছে।

এক-একদিন গোলাপ মা আসেন। সারদামার কাছে উঠে যান ওপরে। একদিন জিগ্যেস করলেন, তোমার সময় কাটে কী করে। কষ্ট হচ্ছে না এইভাবে থাকতে?

না তো। দক্ষিণেশ্বরের নহবতে যেভাবে ছিলাম এখানেও সেইভাবে আছি। একদিন দু'জনের কথা হচ্ছিল ঠাকুরকে নিয়ে। কথায় কথায় মা বললেন, আর কী বাকি রইল। সবই তো হয়ে গেছে।

কী হয়েছে?

কেন কলকাতায় রাত্রিবাস, যার তার হাতে খাওয়া, অন্নের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়ে খাওয়া।

তাতে কী?

উনি যে আমায় আগেই বলেছিলেন, যেদিন দেখবে কলকাতায় রাত্রিবাস করছি। এর ওর হাতে খাচ্ছি, অন্নের অগ্রভাগ কাউকে খাইয়ে খাচ্ছি তখন বুঝবে— এ শরীর আর থাকবে না। দেহত্যাগের সময় হয়ে গিয়েছে।

এ কথা তোমায় আগেই বলেছিল?

হ্যাঁ।

গোলাপ মা চিন্তিত মুখে উঠে গেলেন।

ঠাকুরের কাছে একটি লোক রোজই এসে বসে থাকে সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে। কোনও কথা বলে না সে। ভক্তদের অনেকেই জানতেন, লোকটির কুষ্ঠ হয়েছে। ছোঁয়াচে রোগ, সারে না। সকলেই অস্বস্তি বোধ করেন। মনে মনে চান, তাঁকে বের করে দিতে। কিন্তু ঠাকুরের জন্য পারেন না। ঠাকুরের কৃপা যে সবার ওপরেই সমান— তা সকলে জানেন।

ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন কথাটা কানে যেতেই লোকটি অস্থির হয়ে ওঠেন। ঠাকুর একজন ভক্তকে বললেন, দেখো তো ও বুঝি আমায় কিছু বলতে চায়।

কুষ্ঠ রোগীর কাছে যেতে চান না মানুষটি। তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কুষ্ঠ বড় ছোঁয়াচে রোগ। হলে আর রক্ষে নেই। সারে না। ঠাকুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকালেন। তুমি কি আমায় কিছু বলতে চাও।

হ্যাঁ।

ঠিক আছে আমায় বলো। কোনও ইতস্তত করার দরকার নেই। বলো কী বলতে চাও।

আপনি যদি একবার আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেন তাহলে আমি ভাল হয়ে যাব।

ও এই কথা। ঠাকুর লোকটার কাছে গিয়ে বসলেন। ভক্তরা শিউরে উঠলেন। তাঁরা চান না অসুস্থ শরীরে কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করেন। লোকটির বায়না, তাঁর সারা গায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কার বুকে কত পাটা যে ঠাকুরকে বারণ করবে।

লোকটি ততক্ষণে গায়ের চাদরটি খুলে ফেলেন। ঠাকুর পরম মমতায় লোকটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে নিজের জায়গায় বসলেন। শুরু করলেন ভগবত কথা। ভক্তরা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাঁর গলায় কাল রোগ। এই রোগে কেউ বাঁচে না। ডাক্তাররা চিন্তিত। ডাঃ সরকারের মুখ গম্ভীর।

কাশীপুরের বাড়িটি ভারি সুন্দর। ডাঃ সরকার তো বলেছেন, কলকাতার ঘিঞ্জি জায়গায় নয়, ওকে রাখতে হবে খোলামেলা পরিবেশে। অনেকটা দক্ষিণেশ্বরের মতো। আলো হাওয়া রোদের কোনও অভাব নেই। ওখানে গেলে ঠাকুর নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন।

সেদিন শুক্রবার, ২৭ অগ্রহায়ণ, ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫ সাল। কাশীপুর লীলা শেষ কবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাবেন কাশীপুরের উদ্যান বাড়িতে। ওদিকে খবর এসেছে, সেই কুষ্ঠ রোগীটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে লক্ষ্মীদিদি এসেছেন, এসেছেন গোলাপমা। দু'জনেই শ্রীশ্রী মাতা ঠাকুরানির সঙ্গে কাশীপুরে যাবেন। লক্ষ্মীদিদি আগেও এসেছেন। তিনি এলে মার খুব ভাল লাগে। দীর্ঘদিনটি দু'জনে গল্প করে কেটে যায়। তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিলে মা নহবতে একদিন কাজ করতে করতে স্বরূপ দেখিয়েছিলেন। ঠাকুর আর মা চলে আসার পর লক্ষ্মীদিদি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা অর্থাৎ তাঁর ছোট খুড়ির জন্য শম্ভুবাবু যে বাড়িটা তৈরি করেছিলেন সেখানে থাকতেন। তাঁর ভাই রামলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের মেজদা রামেশ্বরের ছেলেমেয়ে তাঁরা) দক্ষিণেশ্বরে পূজারি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ততক্ষণে এসে গিয়েছে দু'টি ঘোড়ার গাড়ি। প্রথম গাড়িতে ঠাকুর উঠলেন তাঁর ভক্তদের নিয়ে। অন্য গাড়িতে মা, লক্ষ্মীদিদি আর গোলাপ মা। গাড়িটির কপাট বন্ধ। শ্যামপুকুর থেকে ঠাকুর চলেছেন কাশীপুরে। এবার শুরু হবে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম লীলা।

শ্যামবাজার, বাগবাজার পার হয়ে গাড়ি চলেছে কাশীপুরে। মাস্টারমশাই—শ্রীমা আছেন গাড়ির ভিতরে। গিরিশ ঘোষ কোচোয়ানের পাশে বসে চলেছেন। পারলে তিনিই গাড়িটি টেনে নিয়ে যান। ঠাকুরের অসুখ নিয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত। তাঁর মুখ গম্ভীর। ঠাকুর মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে পথঘাট দেখছেন। এ পথ ঠাকুরের পরিচিত। কতবার যাওয়া-আসা করেছেন। ঠাকুর জানেন, এই শেষবার। ঠাকুর ভালভাবে জানেন, তাঁর মর্ত্যলীলা শেষ হতে চলেছে।

শীতের দুপুর। আঁধার ঘনিয়ে আসে বড় তাড়াতাড়ি। ছোট বিকেল তাও শেষ হয়ে যেতে বসেছে। ঘোড়ার গাড়ি দুটো গেট পেরিয়ে এসে ঢুকল উদ্যানবাটীতে। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। দিনের শেষ রোদ এসে পড়েছে গাছ-গাছালির মাথায়। একটু এগিয়ে গাড়িটি এসে থামল। দোতলা বাড়িটির সামনে। ছোট্ট বাড়ি। ঠাকুর থাকবেন দোতলার পশ্চিম দিকের ঘরটিতে। তার জানালায় রোদের ছোঁয়া। ঠাকুর গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। সামনেই— পাঁচিলের ওপাশে রাস্তা। ওই পথ চলে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাকালেন সেদিকে। বড় বড় গাছ। ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে ঢুকলেন বাড়িতে। ঢুকেই কাঠের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন সামনের ঘরটিতে। এই ঘরে তিনি থাকবেন। সামনেই সান বাঁধানো পুকুর। বেশি বড় নয়। কামারপুকুরের ডোবাগুলোর চেয়ে একটু বড়।

সিঁড়ির তলা দিয়ে গেলেই ছোট্ট একটা ঘর। লক্ষ্মীদিদি আর গোলাপমাকে নিয়ে ওই ঘরে ঢুকলেন মা। এই ঘরে থাকবেন। পুবের দিকে দরজা খুলে দিলেন। ওই তো উত্তর দিকে রান্নাঘর। একটু পরেই ওখানে গিয়ে ঠাকুরের পথ্য বানাতে হবে। ডাঃ সরকার ঠিক এই রকম একটা বাড়িতে ঠাকুরকে রাখার কথা বলেছিলেন। এখন দেখতে হবে, এই রকম পরিবেশে ঠাকুর কতটা ভাল থাকেন। বাড়ি দেখে লক্ষ্মীদিদি খুব খুশি। তিনি জানেন, ছোটকার মন মতো পরিবেশ। এবার কি একটু সুস্থ হয়ে উঠবেন ঠাকুর? মা তাকিয়েছিলেন লক্ষ্মীদিদির দিকে। তাই দেখে বললেন, কী তাকিয়ে আছ কেন?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মা বললেন, না কিছু না।

প্রায় তখন দক্ষিণেশ্বর থেকে খবর এল, ফল-মিষ্টি, ফুল-মালা নিয়ে তারা ঠাকুরকে পুজো করতে চেয়েছিল। ঠাকুর নেই শুনে তারা ঠাকুরের ছবিতে পুজো করে মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছে।

কথাটা কানে যেতেই আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন মান। তাঁর মনে পড়ল ঠাকুরের কথা। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, আমার ছবিতে যখন পুজো হবে, কলকাতায় রাত্রিবাস করব, যার তার হাতে খাব, খাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়ে খাব। তখন বুঝবে— এ শরীর আর থাকবে না।

বাকি সব আগেই হয়েছিল। বাকি ছিল শুধু ছবিতে পুজো করা। তাও আজ হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। ঠাকুরের পথ্য তৈরি করার কাজ করতে হবে। কারণ ঠাকুরকে একটু কিছু খাওয়াতে হবে। কিন্তু গলায় ঘা, তাই ব্যথাও খুব। ফলে চিবিয়ে কিছু খেতে পাচ্ছেন না। মা অনন্ত প্রতীক্ষার প্রতীক। একটু একটু করে দীর্ঘক্ষণ ধরে খাওয়াতেন তিনি।

বাড়ির একতলায় দক্ষিণ দিককার ঘরটায় আছে ঠাকুরের সন্তানরা। নরেন তাঁদের নেতা। ঠাকুর একটু একটু করে তৈরি করছেন তাঁকে। দিনগুলি কেটে যাচ্ছে দ্রুত। তাঁকে অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যথারীতি বসে গিয়েছে চাঁদের হাট। মাঝে মাঝে ঠাকুরের ঘর থেকে ভেসে আসছে কথা, গান। এরই মধ্যে কবিরাজ, হোমিওপ্যাথি, সব চিকিৎসাই হচ্ছে। কিন্তু তেমন কোনও উন্নতি হচ্ছে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে কিন্তু আছেন মহানন্দে।

সেদিন ১ জানুয়ারি। তখন সূর্য পশ্চিমকাশে ঢলে পড়েছে। পাখিরা আলয়ে ফিরে আসছে। ঠাকুর হঠাৎ উঠলেন। ফুলবাবুটি সেজে নিচে নেমে এলেন। নিচে তখন ভক্তদের গুলতানি, ঠাকুরের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলছেন। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন, ঠাকুর আসছেন। পরিপাটি করে কাপড় পরেছেন, গায়ে পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, পায়ে জুতো। ঠাকুরকে আসতে দেখে সকলে থমকে গেলেন, ওঁকে দেখে কে বলবে, মারণ রোগে ভুগছেন উনি। ঠাকুর এসে গিরিশের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, তুমি তো আমার সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে বেড়াও। তা তুমি আমায় কী বুঝেছ?

গিরিশ হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত জোড় করে বললেন, বাল্মীকি, বেদব্যাস যাঁর তল পাননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে কী বলব। তুমি আমায় কৃপা করো।

ঠাকুর তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, তোমার কল্যাণ হোক।

ততক্ষণে সেখানে ছুটে এসেছেন সকলে। ঠাকুর সেদিন কল্পতরু।



যে যা প্রার্থনা করছে তাই পাচ্ছে। কাউকে বলছেন, তোমার চৈতন্য হোক। উপেন মুখুজ্যের বড় অর্থকষ্ট। মনে মনে তিনি অর্থলাভের প্রার্থনা করলেন। তিনিও ঠাকুরের কৃপা লাভ করলেন। পরে তিনি বিপুল অর্থের মালিক হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির এবং বসুমতী দৈনিক পত্রিকা।

যিনি যা পেলেন তাই নিয়ে এসে ঠাকুরের পদবন্দনা করলেন। ভাবের ঘোরে ঠাকুর আশীর্বাদ করছেন, তোমাদের চৈতন্য হোক।

গিরিশ ঘোষ চেঁচাচ্ছেন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস— আয় আয়, যা চাস চেয়ে নে। ঠাকুর আজ কল্পতরু হয়েছেন।

সকলে ছুটে এসেছিলেন সেই আমগাছতলায়। আসেননি শুধু ঠাকুরের সন্তানরা। তাঁরা তখন সুযোগ পেয়ে ঠাকুরের বিছানা ঝাড়ছিলেন, ঘরের লাগোয়া ছোট্ট ছাদে তখনও রোদ ছিল। সেই রোদ খাওয়াচ্ছিলেন তোষক-টোষকে।

দিন কেটে যায়। ঠাকুরের স্বাস্থ্যের অবনতি দ্রুত হচ্ছে। সেদিন দুপুরে মা ছিলেন নিজের ঘরে। ঠাকুরের কাছে ছিলেন লক্ষ্মীদিদি আরও ক'জন। নির্মল পরিষ্কার আকাশ। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। প্রচণ্ড শব্দ। ঠাকুরের মুখে হাসি। দুরদার করে সিঁড়ি ভেঙে মা এসে ঢুকলেন।

এ কী অলক্ষণ, কী হল? শ্রী মায়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। তিনি বুঝে গিয়েছেন বিনা মেঘে বাজ পড়ার শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ। তাঁর বুক কেঁপে উঠেছে।

কী হল, ছোটকা?

সমন এল রে, ফিরে যাবার বার্তা। কালপুরুষের ডাক। কালপুরুষ নিজে এসে জানিয়ে গেলেন, সময় হয়ে গেছে।

এই তো শেষ?

না রে লক্ষ্মী। আবার আসতে হবে।

তুমি আসবে এস, আমি কিন্তু আর আসছি না।

হাসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন, তোরা হলি কলমির দল। আমার সঙ্গে সকলকে আবার আসতে হবে।

ঠাকুরের শরীর আরও ভেঙে গেছে। কঙ্কালসার দেহ। ধরে ধরে উঠে বসাতে হয়, এপাশ-ওপাশ করিয়ে দিতে হয়।

অথচ ওই অবস্থাতেও হঠাৎ সেদিন রাত্তিরে ঠাকুর বিছানা ছেড়ে উঠে একরকম ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়।

মা সারদা ছিলেন সেই ঘরে। জিগ্যেস করলেন, হঠাৎ কী হল?

নরেনরা রস খেতে গাছে উঠবে ঠিক করছে। কিন্তু খেজুর গাছের গোড়ায় বসে আছে কালনাগ। গেলেই কামড়াবে। তাই তাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম। (সেই খেজুর গাছটি আর বেঁচে নেই। কিন্তু গাছটিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষিত করে রাখা আছে কাশীপুরের আশ্রমে। গেলেই দেখা যাবে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নরলীলার তখন অন্তিম পর্ব। সেদিন রাতে ঘরে কেউ নেই। শুধু পাশে বসে সেবা করছেন নরেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে জল। স্পর্শ করলেন নরেনকে। নরেন অনুভব করলেন, কী এক শক্তি ঠাকুরের শরীর থেকে এসে তাঁর দেহে ঢুকল।

ঠাকুর কাঁদছেন।

আপনি কাঁদছেন কেন?

আমার যা ছিল সব তোকে দিয়ে আমি ফতুর হলাম। আমি আজ নিঃস্ব।

ঠাকুরের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মাকে যা বলার তা আগেই বলেছেন। বলেছেন, তোমাকে সামনে রেখে হবে নবজাগরণ। ছেলেদের ভার দিয়েছেন নরেনকে।

অন্তিম সমাধির ক্ষণ এগিয়ে আসছে। সেদিন রাত্তিরে ঠাকুরের পাশে বসে নরেন গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ নরেনের মনে হল, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে উনি যদি একবার নিজের মুখে বলেন তাহলে বিশ্বাস করি।

কথাটা ভাবতে না ভাবতেই চোখে মেলে তাকালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনও অবিশ্বাস! তবে শোন, ত্রেতায় যিনি শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ, ইদানীং এই দেহে (নিজেকে দেখিয়ে) রামকৃষ্ণ।

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত



ফিরবে না তা জানি

তবু তাঁর পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি। চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষের সৃষ্টির পথেই বাঙালির প্রেক্ষাগৃহে ফেরা, নতুন করে। তিনি নেই। রয়ে গেল তাঁর স্বতন্ত্র ঘরানা। লিখছেন **বিদিশা চট্টোপাধ্যায়**

একটা মানুষ থাকা আর না-থাকায় বোধহয় অনেকটা তফাত হয়ে যায়। চারমাস হতে চলল আমাদের 'রোববার' ম্যাগাজিনের ফার্স্ট পার্সন নেই। ঋতুপর্ণ ঘোষ। আমাদের ঋতুদা। ঋতুপর্ণ চলে যাওয়ার পর তাঁর ছবি, ব্যক্তিগত জীবন সবকিছু নিয়েই কাটাছেঁড়া হল ট্রিবিউটের নামে! যা তিনি থাকলে হয়তো সম্ভব ছিল না। 'সত্যান্বেষী'র প্রিমিয়ার হল অনাড়ম্বরভাবে। তাঁর শেষ ছবি 'সত্যান্বেষী'তে অনেকেই ধরে ফেলেন হাজারো খুঁত। তাঁর ছবিতে কাজ করেছেন, এমন শিল্পী পাবলিক ফোরামে লিখে দেন এমন কথা যা ঋতুপর্ণ বেঁচে থাকলে কোনওদিন লিখতেন কি না জানি না। নানা মানুষের নানা মত। শেষের দিকে ঋতুপর্ণর ছবি তেমন গুণমানের

হত না। ঋতুপর্ণর ব্যক্তিগত জীবন এই অবনতির জন্য দায়ী। খোদার ওপর খোদকারি করতে গিয়ে নানা ধরনের জেন্ডার রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি করে নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন—এমন কত কথা বাতাসে উড়ে বেড়াতে লাগল।

ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রয়াণের পরও নিষ্কৃতি পেলেন না। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি নেই এবার তা হলে তাঁর যৌন জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনযাপন নিয়ে লোকের গসিপের জায়গাটাও বুঝি নেই। কিন্তু কই! তেমন হল না। বরং যাঁরা তাঁর কাজকে এতদিন সাধু-সাধু বলেছিলেন তাঁরাও কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন ঋতুপর্ণ তেমন ছবি-করিয়ে ছিলেন না এটা প্রমাণ করতে। উনিশটা ছবি করে বারো-তেরোটা জাতীয় পুরস্কার ক'জন পরিচালকই বা পায়? যে মানুষটা বাংলাকে এতগুলো জাতীয় পুরস্কার এনে দিলেন, নতুন প্রজন্মের উৎসাহীদের ছবি করার সাহস দিলেন, বাঙালি দর্শককে আবার সিনেমা হলে ছবি দেখতে ফেরত পাঠাল তাঁর সৃষ্টি, তাঁর প্রতি বোধ হয় আরও একটু বেশি শালীন ব্যবহার কাম্য ছিল। কাউকে বড় দেখাতে গিয়ে অন্যকে ছোট করার সহজ অভ্যাস বাঙালি ছাড়তে পারেনি। ছাড়তে পারেনি নিয়মভাঙার বদহজমের অভ্যাসও!

১৯৯২ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষের প্রথম ছবি 'হীরের আংটি', যা মুক্তি পায়নি। তবে দূরদর্শনে অনেকবার দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞাপন জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে ঋতুপর্ণর এটা প্রথম ছবি। তাঁর সহকারী বন্ধু সঞ্জয় নাগ বলেছিলেন, "হীরের আংটি যাতে মুক্তি পায় তার কত চেষ্টাই না ঋতু আর আমি করেছিলাম! তেমন কারও খোঁজ পেলেই ছুটে-ছুটে যেতাম ছবিটা দেখাতে। যদি পছন্দ হয় তা হলে ডিসট্রিবিউট করবে! সেটা আর হয়ে ওঠেনি। কারও ছবিটা পছন্দ হল না। প্রথম ছবি মুক্তি না পাওয়ার যে কী যন্ত্রণা!..." কিন্তু ঋতুপর্ণ থেমে থাকেননি। ১৯৯৪ সালে তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'উনিশে এপ্রিল'। প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী মা এবং তাঁর নিঃসঙ্গ মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হওয়া এই ছবি এনে দিল দু-দুটো জাতীয় পুরস্কার। অপর্ণা সেন এবং দেবশ্রী রায়-এর অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। দেবশ্রী বলেছিলেন, "এই ছবিতে আমি ঋতুকে জোর করে বলি বুম্বাকে কাস্ট করতে... এই ছবিই আমায় জাতীয় পুরস্কার এনে দেয়।" 'উনিশে এপ্রিল' বাঙালি দর্শককে হলমুখী করেছিল। বাংলা ছবিতে এসেছিল একটা নতুন ধারা। যেখানে আমাদের রোজকার সম্পর্কগুলোকে পরিচালক ঋতুপর্ণ সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধলেন। আমাদের চেনা আবেগের রং। চেনা অভিমান। চেনা সুখ দুঃখ সব। কী অবলীলায় মা-মেয়ের সম্পর্কে তা সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ঋতুপর্ণ। সেই 'উনিশে এপ্রিল'-এর উনিশ বছর পার হতে চলেছে। আরও উনিশ বছর পার হলেও 'উনিশে এপ্রিল' পুরনো হওয়ার নয়। এরপর ১৯৯৭-এ মুক্তি পেল 'দহন'। এই ছবিতে ঋতুপর্ণ সেরা চিত্রনাট্যের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেলেন। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত পেলেন সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার। টালিগঞ্জ স্টেশনে এক বিবাহিত মহিলাকে শ্লীলতাহানি এবং অন্য এক নারীর এগিয়ে এসে তার প্রাণ বাঁচানো—এই সত্যি ঘটনাকে নিয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্য-র উপন্যাস নিয়ে তৈরি হওয়া ছবির হলেও, প্রতিটি পরতে-পরতে রয়েছে ঋতুপর্ণর সৎ-আবেগপ্রবণ হৃদয়ের ছোঁয়া। শুধু রাস্তায় কেন, নারীকে তাঁর স্বামীর কাছেও ধর্ষিত হতে হয়। ম্যারিট্যাল রেপ নিয়ে



'চিত্রাঙ্গদা' ছবিতে অনসূয়া ও ঋতুপর্ণ।



'চিত্রাঙ্গদা' ছবির একটি দৃশ্যে সঞ্জয় নাগ ও ঋতুপর্ণ।

এই সাহসী স্বাক্ষর ঋতুপর্ণ ছাড়া আর কেই বা রেখে যেতে পারতেন!

এরপর তিন বছরের ব্যবধান। ১৯৯৯ সালে মুক্তি পায় 'অসুখ'। এই ছবি যেন 'উনিশে এপ্রিল'-এর আর এক পিঠ। সেখানে ছিল মা-মেয়ের সম্পর্ক। আর এখানে বাবা-মেয়ের। ৩৫ বছর বয়সি নায়িকা রোহিণীর টানাপোড়েনের গল্প। একদিকে সে ব্যস্ত অভিনেত্রী, অন্যদিকে বাবার কাছে সে অসহায় ছোট্ট মেয়েটি। ঋতুপর্ণ বলেছিলেন, "আমার এই ছবির অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ছোট্টো আমার মেয়ে' থেকে নেওয়া।" মেয়ে যতই বড় হোক, বাবার কাছে সে তো ছোট্টটি থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা লিখেছিলেন তাঁর এক কোনও এক মেয়েকে নিয়ে। এই ছবিতেও রয়েছে বাবা মেয়ের সংঘাত। সেই সময় যখন 'এড্‌স' নিয়ে তেমন আলোচনা বা মিডিয়ার প্রচার ছিল না, এই ছবিতে ঋতুপর্ণ নিয়ে এসেছিলেন সেই প্রসঙ্গও। মায়ের টেস্ট করাতে হবে বলে বাবাকে সন্দেহ, নতুন অভিনেত্রীকে নিয়ে তাঁর প্রেমিককে সন্দেহ—সব কিছু নিয়েই রোহিণী মনে-মনে গভীর অসুখী। এমন বিষাদঘন সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা বিরল। সন্দেহ, হারানোর ভয়, কেরিয়ারের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে রোজকার জীবনযাপন রোহিণীর। এই সবই যেন অসুখের পূর্ব লক্ষণ, যা ছিল রোহিণীর মনের গভীরে। এই চরিত্রে দেবশ্রী রায় সম্ভবত তাঁর জীবনের সেরা অভিনয়টা করেছিলেন। এই সেরাটা বের করে এনেছিলেন পরিচালক।

একটি ইংরেজি পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "একদিক থেকে দেখতে গেলে আমার অভিনেতাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তারাই তো আমায় অভিনয় করাটা শিখিয়েছে। ওদের অভিনয় শক্তি, ওদের অক্ষমতা, ওদের যে সব ভুলভ্রান্তি, আমার ওপর যে নির্ভরশীলতা—এই সব আমায় দিয়ে অভিনয় করা শিখিয়ে নিয়েছে। কাউকে কাউকে আমায় ধরে ধরে, দৃশ্যগুলো অভিনয় করেও দেখাতে হত।" 'অসুখ' ছবিতে তিনি অর্পিতা পালকে ইনট্রোডিউস করেছিলেন। এক্কেবারে আনকোরা শিউলি ফুলের মতো একটি মেয়ে! দেবশ্রীর সঙ্গে সামান্যই দৃশ্য আছে, কিন্তু যেটা আছে সেটা কোনওদিন ভোলার নয়। রোহিণীর প্রেমিকের নতুন বন্ধু অর্পিতা। এক সঙ্গে সবাই বসে। একটা রবীন্দ্রসংগীত রোহিণীর মনে পড়ল না, গেয়ে উঠল অর্পিতা। এক নারীর পেরে যাওয়া এবং অন্য নারীর না পারার অভিঘাত কেমন দুমড়ে মুচড়ে দেয় সেই মুহূর্তে গান ভুলে যাওয়া মেয়েটিকে। আরও কিছু বাকি ছিল। এর পরে একটা দৃশ্য চানঘরে কলের তলায় বসে কাঁদতে কাঁদতে ভুলে যাওয়া গানের শেষ দুটো লাইন রোহিণী গেয়ে ওঠে, "ভয় পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আঁখিপাতে, ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে..." নিজেকেই যেন বলে ওঠে—আমিও পারি, পারতাম। কী অবলীলায় প্রতিটি নারীর অন্তরমহলে নির্দ্বিধায় প্রবেশ করতে পারতেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ! মেয়েদের মন বোঝা নাকি সহজ নয়। কিন্তু ঋতুপর্ণ তাঁর ছবিতে প্রতিটি নারীর হৃদয়কথা, কাজলচোখের ভাষা পেরিয়ে তাদের মনকেমনের গতি-প্রকৃতি বুঝে নিতে পারতেন। ওপর-ওপর নয় মোটেই, নারীমনের যাত্রাপথে তিনি হাঁটতেন সেইসব অন্ধ গলি, আর খাদের কিনার দিয়ে। 'অসুখ' জাতীয় পুরস্কার-এ সেরা ছবি হিসেবে মনোনীত হয়।

২০০০ সালে মুক্তি পায় 'বাড়িওয়ালি'। এক নিঃসঙ্গ নারীর জীবনে ধূমকেতুর মতো প্রেমের স্পর্শ আর তার নিভে যাওয়ার গল্প। এখানে 'দহন' ছবির মতো এই নারী বিবাহিতা নন। বিগতযৌবনা এক বিধবা। তাঁর হৃদয়ের নাড়াচাড়া, প্রেমের একটু আভাসে ভেসে যাওয়া আর তাঁর জীবনের অনিবার্য, অবশিষ্ট বিষাদটুকু বুঝেছিলেন ঋতুপর্ণ। কিরণ খের এই ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার পান। এরপর 'উৎসব' মুক্তি পায় ২০০০ সালে। দুর্গাপুজোর আনন্দের মধ্যেই এক পরিবারের ডুবে গিয়ে ভেসে ওঠার কাহিনি। খুব আনন্দের মধ্যে থাকে মনখারাপ। সেই পরিবার তেমনই আনন্দঅশ্রু পেরিয়েছে ঋতুপর্ণ-র হাত ধরে। সেরা পরিচালক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পান ঋতুপর্ণ 'উৎসব' ছবির জন্য। ২০০৩ সালে 'তিতলি'। ২০০৩ সালে 'শুভ মহরৎ'। আগাথা ক্রিস্টির গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হলেও 'শুভ মহরৎ'-এর প্রতিটি দৃশ্যে ছিল ঋতুপর্ণর নিজস্ব স্বাক্ষর। এই ছবিতে রাখি গুলজার এবং শর্মিলা ঠাকুর একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। খুনের রহস্য নিয়ে ছবি হলেও একটা চোরা-আবেগের প্রলেপ ছিল ছবিটায়। শোনা যায় শর্মিলাকে কোনও দৃশ্য বোঝানোর সময় একেবারে ঠিক ঠিক এক্সপ্রেশন বের করে আনতে তাঁর অভিনীত অন্যান্য হিন্দির ছবির রেফারেন্স দিতে হত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষকে। এই ছবিতেও রয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। ঋতুপর্ণ

রবীন্দ্রসংগীতের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। 'শুভ মহরৎ'-এ রাখি গুলজার সেরা সহ-অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার পেলেন। আর সেরা বাংলা ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার পেলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ।

এই বছরই 'চোখের বালি' মুক্তি পায়। আবার রবীন্দ্রনাথ। ঐশ্বর্য রাই-এর কাস্টিং হইচই ফেলে দিয়েছিল বাংলায়। এই নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। ঋতুপর্ণ ডিফেন্ড করেছিলেন, "সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, গৌতম ঘোষ এঁরাই পাইওনিয়ার। ওয়াহিদা রহমান যখন 'অভিযান'-এ অভিনয় করেছিলেন তখন তিনি রীতিমতো স্টার। 'গাইড' রিলিজ হয়ে গিয়েছে। তা হলে ঐশ্বর্য যদি 'চোখের বালি' করে দোষটা কোথায়! অভিনয়ে কেন আমরা প্রাদেশিকতা নিয়ে আটকে থাকব?" এরপরেই ২০০৪-এ ঋতুপর্ণ ঐশ্বর্য এবং অজয় দেবগণকে নিয়ে 'রেনকোট' তৈরি করলেন। 'চোখের বালি' সেরা বাংলা ছবির পুরস্কার জিতে নিয়েছিল আর 'রেনকোট' সেরা হিন্দি ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার পেল। যাঁরা বলতেন ঐশ্বর্য রাই অভিনয় করতে পারেন না, 'রেনকোট' তাঁদের মুখ বন্ধ করেছিল। গ্ল্যামারহীন ঐশ্বর্যের বিষণ্ণতা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়েছিল প্রতিটি ফ্রেমে অশ্রুধারার মতো। ছবির ব্যাকড্রপেও বর্ষা। 'তিতলি'-র 'মেঘপিওন' তাঁর ঝোলা থেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন অশ্রুসিক্ত প্রেমের স্মৃতি। 'দ্য গিফট অফ ম্যাজাই' থেকে নেওয়া এই ছবির গল্প। তা হোক, ঋতুপর্ণ তাঁর নিজের মতো করে এই অপূর্ণ প্রেমের অপূর্ব জলছবি এঁকেছিলেন। বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে এতদিন পর সেই একই গল্প থেকে তৈরি করেছেন 'লুটেরা'। 'লুটেরা' যতটুকু লুঠতরাজ চালিয়েছে, 'রেনকোট' ফিরিয়ে দিয়েছে ততটাই। বৃষ্টিভেজা 'রেনকোট'-এর পকেটে হাত ঢোকালেই টের পাওয়া যায়।



২০০৫-এর ছবি 'অন্তরমহল'-এর জন্য ঋতুপর্ণ ঘোষকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। বিবাহ পরবর্তী যৌনতাকে যেখানে বেশিরভাগ ছবিতেই গ্লোরিফাই করা হয়, সেখানে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবির কেন্দ্রে জমিদারবাড়ির 'অন্তরমহল'-এ তিনি দেখিয়েছেন যৌন নীপিড়ন, নিষ্ঠুরতা। বাঙালি দর্শক শক্‌ড হয়েছিল! জ্যাকি শ্রফ ও সোহা আলি খানের শয্যাদৃশ্য বাঙালি দর্শকের অমার্জিত মনে হয়েছিল। আসলে বিবাহিত জীবনে যৌনতা কখনও শুধুই অভ্যেস বা কখনও যৌন অত্যাচারেও পরিণত হতে পারে, যেখানে প্রেম ভালবাসা থাকে না। ঋতুপর্ণ সেটাই দেখাতে চেয়েছিলেন। অনুরাগ কাশ্যপের 'গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর'-এ মনোজ বাজপেয়ী এবং রিমা সেন-এর সঙ্গম দৃশ্য-র সঙ্গে মিল আছে 'অন্তরমহল'-এর অন্তর্বার্তার। ২০০৬ সালে তৈরি হওয়া 'দোসর'-এ তিনি হাঁটলেন একেবারে অন্য পথে, অন্য স্টাইলে। সাদা-কালোয় তৈরি এই ছবিতে মনে রাখার মতো প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং কঙ্কণা সেনশর্মার অভিনয়। স্বামীর অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর স্ত্রী কি তা মেনে নেবে, যদি অসুস্থ স্বামী স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যদি সে মেনেও নেয় তা হলে সেটা কি মানবিকতার খাতিরে নাকি গভীরে থাকলেও থেকে যেতে পারে ভালবাসা। নারী যদি মেনে নেয় তা হলে তার এই পদক্ষেপকে কী বলবে সমাজ? ক্ষমা নাকি আপস? এসব প্রশ্ন তুলেছিলেন ঋতুপর্ণ তাঁর 'দোসর' ছবিতে। জাতীয় পুরস্কারে স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড পায় এই ছবি। এরপর আসে ২০০৭ সালে অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে 'দ্য লাস্ট লিয়ার' (সেরা ইংরেজি ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার), ২০০৮ সালে মনীষা কৈরালাকে নিয়ে 'খেলা', ২০০৯-এ বিপাশা বসু অভিনীত 'সব চরিত্র কাল্পনিক' (সেরা বাংলা ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার)। 'দোসর', 'খেলা', 'সব চরিত্র কাল্পনিক'—পরপর এই তিনটে ছবিতেই তিনি কাস্ট করেছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। ঋতুপর্ণর হাত ধরেই টলিউড মেগাস্টার প্রসেনজিৎ, অভিনেতা প্রসেনজিৎ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। 'আমার অ্যাক্টর হওয়ার শুরুটা ঋতুর হাত ধরে' এটা প্রসেনজিৎ নিজেই বলেছেন বহু সাক্ষাৎকারে। 'সব চরিত্র কাল্পনিক' দর্শকের পছন্দ না হলেও এই ছবিতে ঋতুপর্ণ একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। সিনেমার নতুন ভাষা তৈরি করতে করেছিলেন। কবিতা, কবিতার ইন্সপিরেশন, চেতন-অবচেতনের হৃদ্‌মাঝারে ছবির নির্যাসকে ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন। দর্শকের এই ছবির মেকিং বড্ড জটিল মনে হয়েছিল। তারা ফিরিয়ে দেয় এই ছবিকে।

তবে ঋতুপর্ণ আবার স্বমহিমায় ফেরেন। বাঙালি দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নেয় 'আবহমান', ২০১০ সালে। অনেকেই বলেন এটা তাঁর 'কামব্যাক ফিল্ম'। এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচালকের সম্পর্কের জেরে পরিবারে স্ত্রী-পুত্র-র সঙ্গে টানাপোড়েন এই ছবির বিষয়। সম্পর্কের এতগুলো স্তর ঋতুপর্ণ সযত্নে বুনেছিলেন নকশিকাঁথার মতো। দীপঙ্কর দে, মমতা শঙ্কর, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত-র অভিনয় মুগ্ধ করেছিল আমাদের। একটা নয়, দু'টো নয়, তিনটে জাতীয় পুরস্কার পায় এই ছবি। সেরা পরিচালক, সেরা বাংলা ছবি এবং সেরা অভিনেত্রী-র (অনন্যা চট্টোপাধ্যায়) পুরস্কার। মুক্তি পায় 'নৌকাডুবি'। আবার রবীন্দ্রনাথ। সাক্ষাৎকারে জানান, এই ছবিতে ঋতুপর্ণ চেয়েছিলেন 'বালিকা বধূ', 'দাদার কীর্তি'-র সরলতা, আটপৌরে প্রেম। যা মনে করিয়ে দেয় তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ এবং অজয় করের ছবিগুলি।

ঋতুপর্ণ এমন একজন মানুষ যিনি নিজের যৌন-প্রবণতা নিয়ে কোনওদিন দ্বিচারিতা করেননি। নিজের ইচ্ছেমতো জীবনটাকে চালানোর সাহস রাখতেন তিনি। হোমোফোবিক সোসাইটিতে তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বা যৌন-পছন্দ। খুব সুন্দর করে সাজতেন ঋতুদা। যেভাবে তাঁর প্রতিটি নায়িকাকে সাজিয়ে তুলতেন, যেভাবে তাঁর প্রতিটি ফ্রেম সুন্দর, ঠিক সেইভাবে। ঋতুপর্ণ ফিল্মমেকার হিসেবে বিখ্যাত হলেও তাঁর রুচিবোধ, সুন্দরের প্রতি অমোঘ টান মুগ্ধ করেছিল তাঁর কাছের মানুষদের আর আমাদেরও, যারা তাঁর নায়িকার সুন্দর শাড়ি, বড়বড় কাজল টানা চোখ আর কপালের বড় টিপ দেখে, এভাবেই সেজে উঠতে চাইতাম। ঋতুপর্ণ নিজেও ঠিক এমনভাবেই সাজতে ভালবাসতেন। পোশাকের রং, কানের দুল, হ্যান্ডব্যাগ, পায়ের চটি সব কিছুই ওয়েল কো-অর্ডিনেটেড এবং সেইভাবেই তিনি টিভি শো, অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি সর্বত্র দেখা দিতেন। ঋতুপর্ণ কখনও 'এলজিবিটি' কমিউনিটি-র হয়ে পথে নামেননি। নিজের জীবনকে তিনি সেলিব্রেট করেছেন। তাঁর জীবনচর্চাই ছিল অ্যাক্টিভিজম-এর আরেক পথ।



‘সত্যান্বেষী’ ছবির শুটিংয়ে অর্পিতাকে শট বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঋতুপর্ণ।

২০১০-এ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ‘আরেকটি প্রেমের গল্প’ ছবিতে তিনি একদিকে সমকামী পরিচালক এবং চপল ভাদুড়ী-র চরিত্রে অভিনয় করলেন। এই বছরেই সঞ্জয় নাগের ছবি ‘মেমোরিজ ইন মার্চ’-এ সমকামী অ্যাড ফিল্মমেকারের চরিত্রে তাঁকে দেখতে পাই আমরা। ঋতুপর্ণ ছিলেন একজন প্রকৃত শিল্পী। এবং শিল্পকেই তাঁর মাধ্যম বানিয়েছিলেন নিজের বক্তব্যটুকু বলার জন্য।

২০১২ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রাঙ্গদা’-কে নিজের ইচ্ছের উড়ানে ভাসিয়ে দিলেন। তৈরি হল ‘চিত্রাঙ্গদা : দ্য ক্রাউনিং উইশ’। ঋতুপর্ণ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন “চিত্রাঙ্গদা সমকামিতার ছবি নয়, এটা একটা ইচ্ছের গল্প”। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে ‘চিত্রাঙ্গদা’ একটা মাইলফলক। জেন্ডার এবং সেক্স নিয়ে এমন সাহসী উচ্চারণ কল্পনাতীত। খাবার টেবিলে বাবা-মাকে ছেলে জানাচ্ছে সে অপারেশন করিয়ে মেয়ে হতে চায়! কিন্তু এই সাহস দেখানোই ‘চিত্রাঙ্গদা’-র মূল লক্ষ্য নয়। নিজের ভিতরের আসল মানুষটার খোঁজ বা জার্নিই-এর মূল বার্তা। এই ছবি বলে জেন্ডার ফ্লুইডিটি-র কথা। একটা মানুষের মধ্যে কাজ করবে কোন সত্তা নারী না পুরুষের সেটা ঠিক করবে নির্দিষ্ট ব্যক্তিটিই বা বলা ভাল ব্যক্তির মন। ছবিতে একটা ডায়লগ আছে, “নো ট্রান্সফর্মেশন ইজ এভার কমপ্লিট, ইট্‌স অ্যান অনগোয়িং প্রসেস’।

এই ‘অনগোয়িং’ প্রসেসের মধ্যে দিয়েই চলেছিল ঋতুপর্ণর জীবন। এই সময়টায় তাই পরপর তিনি জেন্ডার এবং সেক্সুয়ালিটির বিভিন্ন দিক নিয়ে তৈরি হওয়ার ছবির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। ‘চিত্রাঙ্গদা’ ছবিতে একই সঙ্গে তিনি পরিচালক এবং অভিনেতা। তাঁর নিজের জীবনবোধ, অন্তরের সৎ প্রকাশ দেখা যায় ‘চিত্রাঙ্গদা’-য়। এ যেন সকলকে সাক্ষী রেখে নিজের মুখোমুখি হওয়া। সবাই পারে না, ঋতুপর্ণ পেরেছিলেন।

ঠিক এক বছর পর শুরু করেন তাঁর নতুন ছবি ‘সত্যান্বেষী’। এই ছবি মুক্তি পায় ৫ সেপ্টেম্বর। শরদিন্দু-র ব্যোমকেশ নিয়ে তথাকথিত ডিটেকটিভ ছবি কখনওই বানাতে চাননি তিনি। ‘চোরাবালি’ অবলম্বনে তৈরি হওয়া ‘সত্যান্বেষী’ ছবিতে আসলে মানুষের মনের চোরাবালির খোঁজ করতে চেয়েছিলেন ঋতুপর্ণ। একেবারে অন্য মুডের ছবি। ঋতুপর্ণ একটা নতুন শুরু চেয়েছিলেন। ছবির শুটিং শেষ হওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি প্রয়াত হন। শেষ হয়ে যায় বাংলা ছবির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

দর্শককে আবার নতুন করে হল-এ ফেরানোর ‘ফার্স্ট পার্সন’ আজ নেই। আমাদের ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’ ম্যাগাজিনের প্রথম পুরুষও ছিলেন তিনি। রোববার-এ প্রকাশিত হওয়া তাঁর লেখাগুলো বই হয়ে বেরবে। পড়ার টেবিলে, বিছানায় বালিশের পাশে থাকবে ‘ফার্স্ট পার্সন’। ঋতুদা নেই বলে ‘রোববার’ দফতরে কি কোনও বদল হয়েছে? হয়েছে। ৩১ অগাস্ট তাঁর জন্মদিনে আমাদের ঘরে টাঙানো হয়েছে ওঁর একটা ছবি। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেই দেখা যায় ফ্রেমে বাঁধানো তাঁর মুখ। সাদা-কালো ছবিতে বড্ড সুন্দর দেখাচ্ছে ঋতুদাকে! চোখের দৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত মায়াময় নম্রতা, প্রশান্তি। মনে পড়ে যায় ঋতুদার শেষ এডিট-এর লাইন “মাদুরের কাছে আমার একটা জিনিস শিখতে বড় ইচ্ছে হয়। নম্রতা। দেখি এ জীবনে হয় কি না!”



মা দশভুজার কাছে প্রার্থনা ওঁকে আরও শক্তি দাও

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

"এসেছে শরৎ হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার 'পরে
সকালবেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে!"

বিশ্বের উষ্ণায়নের সঙ্গে সঙ্গে শরৎকালের চরিত্র বদলে গেছে, আজ আর শরৎকালে হিমেল হাওয়ার দেখা মেলে না; শহরের ঘরে ঘরে আশ্বিন মাসেও পুরোদস্তুর পাখা চলে।

বাঙালির কাছে শরৎকালের একমাত্র বৈশিষ্ট্য মা দুর্গার আগমন-এ যাকে আমরা শারদোৎসব বলে জানি।

আর পাঁচজন সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে আমাদের মতো রাজনীতির মানুষজনের দুর্গাপুজোর দিনগুলি কাটানোর রুটিন এক নয়। এখন থেকেই সারা রাজ্যজুড়ে পুজোর বিশাল তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। কেনাকাটা, বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা, বিভিন্ন মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার কর্মসূচি ইত্যাদি।



আর আমাদের অবস্থা ভাবুন—বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। যেমন ভোটার লিস্ট সংশোধন, বিভিন্ন পুরসভার নির্বাচন, কর্মী শিক্ষণ শিবির, সর্বোপরি লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি।

আসলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে আমাদের নেত্রীকে এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রম করতে হচ্ছে।

গত আঠাশ মাসে ওঁর দম ফেলার সময় হয়নি। ৩৪ বছরের বাম শাসনে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়া এই রাজ্যকে তার হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে দিবারাত্র তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

রাজ্যের সব থেকে খারাপ অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া জঙ্গলমহল এবং দার্জিলিংকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনাটা আমাদের নেত্রীর সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এবং তাঁর মনের জেদ ও মানুষের জন্য কাজ করার অদম্য মনোভাব তাঁকে এই কাজে সাফল্য এনে দিয়েছে। আজ যদিও আবার পাহাড়কে অশান্ত করার চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছে কিন্তু মা-মাটি-মানুষের নেত্রী তাকে কোনওভাবেই সফল হতে দেবেন না।

এই পুজোয় তাঁকে কতদিক ভাবতে হচ্ছে একবার ভেবে দেখুন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বোনাস, এক্সগ্রাসিয়া সব দিতে হবে কিন্তু রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই করুণ।

শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যের কান্ডারি বলেই আজও সমস্তরকম চক্রান্ত, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই রাজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে।

সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণের সাগর পর্যন্ত চরকির মতো ঘুরে ঘুরে এই রাজ্যকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করাই তাঁর একমাত্র ব্রত এবং রাজ্যবাসীর কাছে একমাত্র অঙ্গীকার।

মা দশভুজার কাছে প্রার্থনা জানাই ওঁকে আরও শক্তি দাও, প্রাণভরে আশীর্বাদ করো যেন এই পশ্চিমবঙ্গকে ভারতসেরা রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার যে স্বপ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন তা যেন সফল হয়।

এবারের পুজো আমাদের কাছে এক নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মা-মাটি-মানুষ জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা জ্ঞাপন করে বিপুল সমর্থন দিয়ে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র মা-মাটি-মানুষের পঞ্চায়েত গঠন করেছেন। এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে ততদিনে সমস্ত পুরসভার ফলও প্রকাশিত হয়ে যাবে।

অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষের স্বপ্নপূরণ করতে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

মা দুর্গতিনাশিনীর কাছে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা, মহিষাসুরমর্দিনীর রূপে তুমি সমস্ত চক্রান্তকারী অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে এই পশ্চিমবঙ্গকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করো।

আপনাদের সকলের পুজো ভাল কাটুক। জয় হোক মা-মাটি-মানুষের।



দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ

সকলকে জানায়
শুভ শারদীয়া, ঈদুজ্জোহা ও দীপাবলীর
প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



কল্যাণ কুণ্ডু
সহ সভাধিপতি

ললিতা টিগ্গা
সভাধিপতি

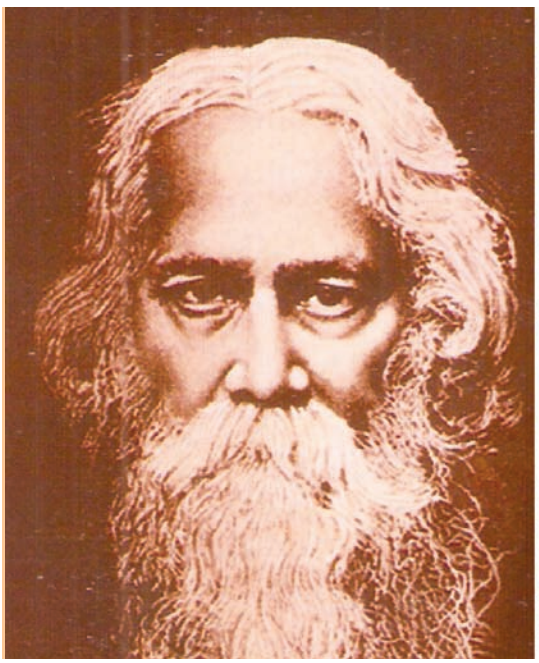

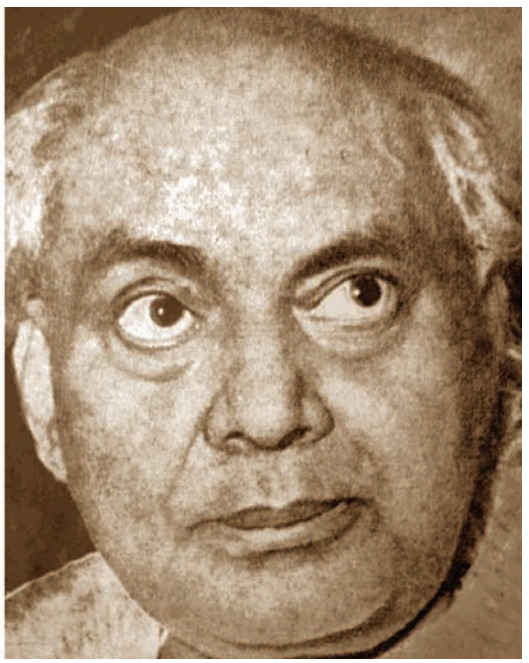

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতির আলোকে সমাজ-রাষ্ট্রভাবনা

মানিক ভট্টাচার্য

‘রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতির আলোকে সমাজ ভাবনা’ শিরোনামটির বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সংস্কৃতি কী এবং রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতি বলতে কী বুঝব দু-চার কথা বলা দরকার।



‘Culture’ বা সংস্কৃতি প্রসঙ্গ প্রথম বিস্তারিত আলোচনা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড টাইলরের উদ্যোগে। ‘Culture’ বা ‘সংস্কৃতি’ শব্দটির মূলে আছে ল্যাটিন ‘cultur’ বা জার্মান শব্দ ‘kultur’ বাংলা ভাষায় culture- এর প্রতিশব্দরূপে ‘কৃষ্টি’ বা ‘সংস্কৃতি’র গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীহাররঞ্জন রায়, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখর মধ্যে বহু বিতর্কের অন্তে ‘সংস্কৃতি’ই ‘Culture’ শব্দের সমার্থক রূপে মান্যতা পেয়েছে। ‘সংস্কৃতি’ কী এই প্রশ্নে আপাতদৃষ্টিতে নৃত্য-গীত-নাটক-অভিনয়াদি শিল্পকলাকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হলেও এগুলি সংস্কৃতির বাইরেকার প্রধান অঙ্গ মাত্র। বরং সংস্কৃতি হল যে কোনও সমাজের বা রাষ্ট্রের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি (Base) বা সৌধের উপর নির্মিত উপ-সৌধ। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেভাবে বলেছেন “সভ্যতাতরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি”।

এখন প্রশ্ন হল, ‘রবীন্দ্র-নজরুল’ সংস্কৃতি বলতে আমরা কী বুঝি? এভাবে ব্যক্তিনামের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতি কীরকম স্ফুরিত হতে পারে! সংস্কৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য আলোচক এডওয়ার্ড টাইলরের অনুসরণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃতির প্রকৃতি বিচারে তিনটি রূপের উল্লেখ করেছেন—

(১) বস্তু সংস্কৃতি (Material culture)

(২) অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি (Functional culture)

(৩) মানস সংস্কৃতি (Spiritual culture)

সংস্কৃতি জীবনসম্পৃক্ত, বস্তুসংলগ্ন এবং মানস উদ্ভূত বলেই তার এই তিনটি রূপের প্রকাশ। বর্তমান নিবন্ধে ‘রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতি’ বলতে আমরা ‘রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মানস সংস্কৃতিকেই বুঝব এবং সমাজ গঠনে বিষয়টি গুরুত্বে আলোকপাত করব।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে দু’টি সর্বাধিক উচ্চরিত নাম। বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মহলে রবীন্দ্রনাথ একাধিপত্য গ্রহণ করলেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের নামেরও প্রতিধ্বনি শোনা যেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ‘রবীন্দ্র-নজরুল’ একটি শব্দবন্ধে বিশেষ সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বহন করেছে, বাঙালি চেতনায় জাগ্রত হয়েছে একটি নতুন ধারা—তার একহাতে ‘গীতাঞ্জলি’ তো অন্যহাতে ‘অগ্নিবীণা’; একদিকে ‘সঞ্চয়িতা’ তো অপরদিকে ‘সঞ্চিতা’। আধুনিক সমাজ গঠনে এই দুই মনীষা পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে একটি আদর্শ, অসাম্প্রদায়িক মানবরাজ্য নির্মাণের পথ দেখিয়েছেন তা বলা বাহুল্য। এই অসাম্প্রদায়িক, অহিংস মানবিক সমাজ কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মানসচিন্তা সমগোত্রের—কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলেই তা স্পষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার বাড়ির সন্তান আবার নিজেও জমিদার অথচ তাঁর কাছে ধর্ম ও শ্রেণির বেড়াজালই মানুষ বিচারের

একমাত্র মানদণ্ড হয়ে থাকেনি। তিনি মানুষকে চেনেন 'মানবতার আদি পরিচয়ে-সে 'মানুষ'। একারণেই শিলাইদহে জমিদারি দেখতে গিয়ে দরিদ্র মুসলিম প্রজাদেরকে তিনি মানুষের 'আইডেনটিটি'তেই দেখেছেন ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে। জমিদারির পুণ্যাহের দিন হিন্দু প্রজারা চাদর ঢাকা সতরঞ্চিতে বসবেন আর মুসলিম প্রজা চাদর ছাড়া সতরঞ্চিতে এই ধর্মীয় বৈষম্য তিনি মানতে পারেননি। বলেছিলেন—"শুভ অনুষ্ঠানে এই জিনিস চলবে না, সব আসন তুলে দিয়ে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবাইকে এক আসনে বসতে হবে"। মানুষকে 'মানুষ' হিসাবে মূল্যায়নের দৃষ্টিটি জীবনব্যাপী রবীন্দ্রভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 'বাঙালি'-ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একটিই জাতি এই সম্মিলনের সম্প্রীতির সম্মান তাঁর কণ্ঠে আমরা শুনেছি। আর নজরুল, ধর্ম বলতে যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে বোঝায় তা তো তিনি ছোট থেকেই বর্জন করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, মানবিক ধর্মই তাঁর কাছে শেষ কথা, শ্রেষ্ঠ চিন্তা। তৎকালীন সমাজে ধর্মের নামে যে জাতিভেদ প্রথা চালু ছিল তার বিরুদ্ধে নজরুল জেহাদ ঘোষণা করলেন। "জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া, ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়কো মোয়া"। বোঝাই যায়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে বহুযোজন দূরে একক মানবিক সত্তা নিয়েই তাঁর উপস্থিতি। কালগত অর্থে এই মানবিক সত্তাই জয়ী হয়। একারণে উন্নততর সমাজগঠনে দার্শনিক চিন্তাভাবনায় নজরুলের সমর্থন চিরকাল মানবিক, অসাম্প্রদায়িক।

রবীন্দ্র-নজরুল মানস সংস্কৃতির অন্য একটি ধারা শিশু শিক্ষা চিন্তা। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষা মহলে শিক্ষাবিদ (Educationist) ও দার্শনিক রূপে স্বীকৃতি পেলেও নজরুল বরং একটু এইসবের বাইরে অবস্থান করেছেন। শিক্ষা-সংস্কৃতির ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ যে উন্মুক্ত, খোলা আকাশের নিচে শিক্ষার পরিবেশকে ব্যাপ্ত করেছিলেন নজরুল ও মানসিকভাবে তাই চেয়েছিলেন। শিশু চিন্তার অন্যতম কারিগর হিসাবে দেখতে পাই নজরুলকে যখন আমরা তাঁর সরস শিশুপাঠ্য ছড়া ও গানগুলি পড়ি। শিশুদেরকে নিয়ে কতখানি চিন্তাশীল, সংবেদনশীল ও আন্তরিক হলে তবেই ছড়ায় কবিতায় উঠে আসে শিশু মনগ্রাহী উপাদানগুলি—নজরুলের এই চিন্তাভাবনাগুলিকে নিয়ে গবেষণার সময় এসেছে আজকে। এক্ষেত্রে 'বিদ্রোহীকবি' 'লড়াইয়ের কবি'—এই সমস্ত অবিধার ঊর্ধ্বে একটি সাংস্কৃতিক-দার্শনিক মননের পরিচয় আমরা পাই নজরুলে। এক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ছোট নদী' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি—"আমাদের ছোট নদী চলে আঁকেবাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে, পার হয়ে যায় গরু-পার হয় গাড়ি, দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি"। একই প্রসঙ্গে আমরা নজরুলের শিশু মানসিকতা এবং শিশুধর্মিতার পরিচয় পাই—'লিচু চোর' কবিতায়। "বাবুদের তালপুকুরে/হাবুদের ডালকুকুরে/সেকি বাস করলো তাড়া/বলি থাম একটু দাঁড়া/পুকুরের ওই কাছে না/লিচুর এক গাছ আছে না..."।

এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, আজকের একুশ শতকের ভোগ্যপণ্যবাদী জীবন যাপনে, সন্ত্রাস, হিংসার মতো আদিমতা যেভবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, সেখানে কী হতে পারে আদর্শ রাষ্ট্র বা সমাজ গঠনের পথ? আমরা বলতে চাইছি দিকে দিকে যখন ধর্ম, জাতি নিয়ে বিভাজন, প্রাদেশিক ক্ষমতা কায়েমের স্বার্থে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনার আগ্রাসন সেখানে বাঁচার আশ্রয়স্থল আছে কি বাঙালির? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর—'আছে'। রবীন্দ্র-নজরুলভাবনাই সেই আশ্রয়স্থল। যেখানে হিন্দু না, মুসলিম না, গোর্খা—এই জিজ্ঞাসাই থাকবে না। থাকবে শুধু একটিমাত্র পরিচয়, একটিমাত্র আইডেনটিটি— 'মোরা বাংলা মার সন্তান'।

সুতরাং বঙ্গসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, রবীন্দ্র-নজরুল ভাবনা আমাদের জীবনে যে দ্যোতনা নিয়ে আসে তার চর্চা নিত্য নৈমিত্তিক কাজের অঙ্গ হয়ে এলে শিশুমন পরিশীলনের অবিকল্প পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। সেইসূত্রে আশা করি, বিজ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতার সঙ্গে এই চর্চার সংযোগ আমাদের অভাবনীয় সাফল্য এনে দেবে। যেহেতু, আজকের শিশু আগামী বাংলার নাগরিক তাই আমরা প্রত্যাশা করি হ্যারি পটার, শার্লক হোমস্ প্রমুখর পাশাপাশি 'বীরপুরুষ' 'লিচুচোর' 'প্রভাত' 'খুকি ও কাঠবেড়ালি' 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতা, 'তালগাছ' প্রভৃতি চর্চার প্রসার হোক। নাগরিক বৃত্তিজীবী মানসিকতায় কেবলমাত্র উপযোগবাদী শিক্ষা (Utilitarian Education) নয়, শিশুমনের চাহিদা মাফিক ফিরে ফিরে আসুক রবীন্দ্র-নজরুল মানসে নির্মিত—বিশ্বপট, প্রকৃতি, আলো; সংযুক্ত হোক পরিপূর্ণতার গতি। বিদ্যালয় শিক্ষা এ ব্যাপারে শিশুমনের বিকাশ ঘটাতে আরও বেশি করে এগিয়ে আসুক। উদ্ভাসিত হোক পরিপূর্ণতার আলো।

রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতির আলোকে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার ও তার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া 'মা, মাটি, মানুষের' স্লোগান। বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্র-নজরুলের সংস্কৃতির যে ধারার কথা উপরে আলোচিত হল, তা থেকেই নিঃসৃত মা, মাটি, মানুষের এই সরকার এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি। আজীবন রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতির প্রেমিক ও পূজারিণী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অতি নিশ্চিতভাবেই তাঁর 'মা, মাটি, মানুষের' স্লোগানে যে 'মা' এর কথা বলেছেন, তা অখণ্ড ভারতমাতা তথা বাংলা 'মা', সমগ্র দেশবাসী তাঁর সন্তান। নজরুলও একই ভাবনায় জাত-পাতের ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে ভাবতে শিখিয়েছেন সেই অখণ্ডিত 'মা' এর কথা, যা আজকের দিনেও সমাজ প্রাসঙ্গিক বলেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তা বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ ও ধারণ করেছেন।

মানবিক নজরুল যেমন বলেছেন, "কান্ডারি, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র", এবং বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষের চেয়ে জাত-পাত বড় নয়, ধর্ম বড় নয়, তেমনই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষের থেকে কাউকে বড় ভাবে না; মানুষের উন্নয়নের চেয়ে বড় কোনও কর্মসূচি হতে পারে না—এই ভাবনায় তাড়িত।

অপরদিকে, "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা"—এই পংক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমকেই মহিমান্বিত করেছেন এবং দেশমাতৃকাকেই গৌরবান্বিত করেছেন। তেমনই, 'মাটি' কথাটির মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকার দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, অখণ্ডতা ও সমৃদ্ধিকেই বুঝিয়েছে, যা রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতির প্রাণ।



মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি নজরদারি

উপকৃত হাজার হাজার সংখ্যালঘু মানুষ

আবু আয়েশ মণ্ডল

স্বাধীনতার প্রায় সাড়ে ৫৮ বছর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক চালু করা হল।

প্রেক্ষাপট কী?

এক বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী ২০০৫ সালের ৯ মার্চ সাচার কমিটি নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেন। সাত সদস্যের কমিটির সভাপতি হলেন বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার। কমিটি ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখার জন্য গঠিত হয়েছিল। তারা ভারতে মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতার ওপর আলোকপাত করেন। তাই এই বৈষম্য দূর করার মধ্যে কমিটির সুপারিশসমূহ রূপায়িত হওয়া দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার, ২০০১ সালের আদমসুমার অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১১ লক্ষ রাজ্যে। ২০১১ সালের আদমসুমারের তথ্য এখনও জানি না।

মোট জনসংখ্যার ২৬-২৭ শতাংশ সংখ্যালঘু তন্মধ্যে মুসলিম ২৫.২৫, খ্রিস্টান ০.৬৪%, বৌদ্ধ ০.৩০%, শিখ ০.০৮% এবং জৈন ০.০৭% শতাংশ। পার্সিদের সংখ্যা নগণ্য। সংখ্যালঘুদের ৯৬%-ই মুসলিম, সম্প্রতি রাজ্য সরকার জৈনদের পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৫-এ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করেছে। এই রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যা উত্তরপ্রদেশের পরই সর্বোচ্চ। শতাংশের বিচারেও এই রাজ্যের স্থান জম্মু ও কাশ্মীরের পরেই। দেশের ৯০টি সর্বোচ্চ সংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত জেলার ১২টিই এই রাজ্যে অবস্থিত।

রাজ্যে রাজ্যেও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলিতে সংখ্যালঘু দফতরগুলি জাতীয় সরকারের কর্মসূচিগুলি রূপায়িত করে থাকে। এ রাজ্যে রাজ্য সরকার তার সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর কতকগুলি কর্মসূচি সরাসরি রূপায়িত করে থাকে। প্রধানত বিভিন্ন প্রকারের ঋণপ্রকল্প ও স্কলারশিপ এবং স্কিল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ রূপায়িত করে থাকে।

সাচার কমিটির রিপোর্টটি এর কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল। রিপোর্টটি প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠানো হয় ১৭ নভেম্বর ২০০৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪০৪ পৃষ্ঠার ওই রিপোর্টটি লোকসভায় ও রাজ্যসভায় পেশ করেন ৩০ নভেম্বর ২০০৬। আমি তখন লোকসভার সদস্য ছিলাম। রিপোর্টের কিছু অংশ নিম্নরূপ :—

1. Functioning at the state in an impartial manner is an acid test of its being a just state.

2. While the perception of deprivation is wide spread among Muslims, there has been no systematic effort since independence to analyze the condition of religious minorities in the country.

3. Since of inequity may be perceptual or a default of discrimination that the minority may face due to difference in ''identity''.

4. Muslims carry a double burden of being Labeled as ''anti-national and as being appeared''' at the sometime.

5. While setting up of educational institutions under Article 30 of the constitution is a right of minorities it was not meant to become the dominant option available for them.

6. For large number of Muslim women in India, the 'State Space' is within the boundaries of home and community.

7. Concern was expressed over police high handedness in dealing with Muslims ''where ever any incident occurs Muslim boys are picked up by the police.''

8. Muslims like with an inferiority complex as ''every bearded man is considered an ISI agent.''

9. Social boycott of Muslims in certain parts of the country has forced them to migrate from places where they lived for centuries.

10. Schools beyond the primary level are few in Muslim Localities.

11. The ''communal'' content of school text books, as well as, the school ethos has been a major cause for concern for Muslims.

12. Many a time Madrasas are the only educational option available to Muslim children, especially those belonging to the poor.

13. Modernizing Madrasas by the government has been a very contentious issue with may differing view points amongst the community.

14. The desistance to recognize minority educational institutions by State Govts. has been a matter at serious concern with the community.

15. ..... Identification of urdu as a language of Muslims and its politicisation has ensured that its development is relegated to the background.

16. Perceptions of public security– partly associated with increasing incidents of communal violence–prevent parents from sending daughters to schools.

17. The recommendations at the 15- Point programme which made it mandatory for selection committeees to have representation from the minority community have not been followed.

18. Private sector needs to be sensitized to include Muslims in their recruitment.....

19. The health of Muslims, especially women is directly linked to poverty and the absence at basic services like clean drinking water and sanitation.

20. It is common to final names of Muslims missing in the voter lists of a number of states.

21. A number of Muslim concentrate assembly constituencies have been declared as 'reserved' by the Delimitation Commission.

22. – of the 593 districts of India have a Muslim population of over 75%.

23. Infant and childhood mortality among Muslims is slightly lower than the average.

24. Why Muslims should have advantage in child survival despite their lower levels of female schooling economic status is a question that needs further explo-



ration.

25. The life expectancy for Muslims is higher than average by about one year.

26. There has been a large decline in fertility in all the religious groups including the Muslims.

27. Fertility varies among Muslims accordding to socio-economic characteristics.

28. There has been a large decline in fertility in all the religious groups including the Muslims.

29. Muslims children are at a slightly greater risk of child malnutrition than ''other Hindu children.''

30. Muslim population growth has slowed down, as fertility has declined substansially showing that Muslims are well into demographic transition.

31. ''The state shall porvide free and compulsory education to all children at the age six to fourteen years...'' Art. ZIA

–The availability of census data on educational attainments by religion for the first time since independence has enabled the committee to examine the temporal trends in educational attainments.

–The literacy rate among Muslims in 2001 was far below the natural average. The literacy rate among Muslims in 2001 census was 59.1%. This is far below the national average 65.1%.

–Only 3% of Muslim children among the school going age go to Madrasahs.

–Karnataka and Maharashtra are examples of better provisioning of urdu Medium schools at the elementary level. They also offer opportunities to study in the English stream concurrently.

–In view of a large number of children with urdu as their mother tongue urdu should be taught as an elective subject uptill graduation.

–Participation of Muslims in security related activities (e.g. police) is considerably lowerthan their share in population.

–Bidi workers, tailors and mechanics need to be provided with social satety nets and social security.

–In no state does the representation of Muslims in the Government departments match thier population share.

–In West Bengal government Departments Muslims are 4.7% in Higher positions and are 1.8% in lower positions. The average in almost 2.1%.

–Share of Muslims in recent recruitments by state public service commissions is about 2.1%.

এখন ভারতের সংবিধানের কিছু Article বা ধারার কথা তুলে ধরে এই পর্যায়ের লেখা শেষ করব।

The constitutions of India : equal opportunity and

rights for all citizens–

–Major Provisions.

Article 14 : Ensures equality before the law and equal protection by the law.

Article 15 : Prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth.

Article 25 : Ensures freedom conscience and the right to freely profess practice and propagate religion.

Article 29 : Protects minorities right to conserve their language, script or culture.

Article 30 : Provides for the protection of the interests of minorities by giving them a right to establish and administer educational institutions of their choice. The state is directed not to discriminate against minorities' institutions in granting aid.

Article 350A : Directs the state to provide facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education.

উল্লিখিত সংবিধানের ধারাগুলির নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির কার্যাবলির নিরিখেই বিবেচিত হবে অগ্রগতি বা সাফল্য।

১৯৯৫ সালের ১০ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপালের সম্মতি পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্ত নিগম আইন, ১৯৯৫ তৈরি হয়। পরবর্তীকালে এই আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম গঠিত হয়। ইহা রাজ্য সরকারের একটি সঙ্ঘ বিধিবদ্ধ সংস্থা। অপরপক্ষে জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম জাতীয় সরকারের একটি সঙ্ঘ বিধিবদ্ধ সংস্থা। জাতীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক রাজ্য সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের নির্দিষ্ট কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করা, সেগুলি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব কয়েকটি কর্মসূচি আছে যা নিগমকে রূপায়িত করতে হয় ও করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, হাজি মহম্মদ মহসিন মেধাবৃত্তি, কোনও বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যারা গড়ে একাদশ শ্রেণি থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষায় শতকরা ৫০%-এর নিচে নম্বর পেয়ে থাকে তাদের দেয় বৃত্তি যা ছিল না এ রাজ্যে, ১২-১৩ আর্থিক বছর থেকে প্রবর্তন করা হয়েছে ও ঋণের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মহিলা ক্ষমতায়ন প্রকল্পও আছে।

এবার আসব বিগত বিধানসভা নির্বাচনে জনগণের বিপুল রায়ে জগদ্দল পাথরের মতো ৩৪ বছর ধরে মানুষের বুকে চেপে থাকা সরকারের অপসারণ ও মা, মাটি ও মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিত্ত নিগমের কাজের খতিয়ান বা হিসাব প্রায় ২৮ মাস সময়ের। অবশ্য তাই আগে উল্লেখ করা সরকার বিগত সরকারের ১০-১১ আথিক বছরের সময়ে বিত্ত নিগমের কাজের কথা। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জনগণের ঐতিহাসিক রায়ে জনবিরোধী বাম সরকারের বিদায় ও মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা হয় ২০ মে রাজভবনে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম পুনর্গঠিত হওয়ার পর ৭ জুন থেকে যাত্রা শুরু হয়। বাম সরকার বা বিগত



সরকারের কাজের শেষ আর্থিক বছর ছিল ১০-১১ পর্যন্ত। বিভিন্ন রকমের ঋণ, বৃত্তি এবং পেশা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও চাকরি-প্রাপ্তি সহায়ক পরীক্ষার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। সমস্ত খাতাপত্র খতিয়ে দেখা হয়। অসংখ্য নানা অভিযোগ আসতে থাকে। বিতরিত সংখ্যা ৪৮৪২২৭টি চেক। মোট বিতরিত হয় ১৬১ কোটি ৯১ লক্ষ ০৮ হাজার টাকা। প্রাপকসংখ্যা ৪৮৪২২৭ জন। তারমধ্যে প্রায় ৭০ হাজার জনের চেক মেয়াদ হারানোর জন্য তারা টাকা পায় না। ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সালের প্রাপকের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৪৫,৪২৯ জন এবং ৩৭,৯৬,২১৯ জন।

১১-১২ সালে ওই সমস্ত মেয়াদ হারানো চেকের মেয়াদবৃদ্ধি করে তা প্রাপকদের বিতরণ করে পুনর্গঠিত পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের যাত্রা শুরু হয় জনদরদি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ও পরামর্শ নিয়ে। ৭ জুন ২০১১ থেকে কাজ শুরু করার এক মাসের মধ্যেই দেখা যায় পরিকাঠামোর উন্নয়ন দরকার। জেলায় জেলায় কর্মীসংখ্যা বাড়ানো খুবই জরুরি। তাই ২০১১-এর ৭ জুনের পর ৭ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৭০ জন কর্মী নিয়োগ করা হয় চুক্তির ভিত্তিতে। বিগত ১১-১২ সালে মোট আগের বছরের আগের সরকারের আর্থিক বছরেই প্রদত্ত ঋণ, বৃত্তি ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপকের সংখ্যা ৪৮৪২২৭ জনের বদলে ১৭ লক্ষ এসে পৌঁছয়। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩৯৬ কোটি টাকা। এই আর্থিক বছরের অগ্রগতি বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ৪ গুণের কাছাকাছি প্রাপকের সংখ্যার নিরিখে এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রায় আড়াই গুণের সমান। এর প্রধান কারণ রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রচারের আলোকে আসার ফলেই। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (পঃ বঃ সরকারের একটি সঙ্ঘ বিধিবদ্ধ সংস্থা)।



সংখ্যালঘু পিছিয়ে থাকা মানুষের আর্থিক অগ্রগতির পথে সহায়ক তা খুবই নগণ্য অংশের মানুষের কাছে জানা ছিল অর্থাৎ প্রচারক্ষেত্রে সীমাহীন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য ১১-১২ আর্থিক বছরে প্রচারের এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা হয়েছে এবং আর্থিক বছরের এই ঘাটতি আরও বেশি মাত্রায় পূরণ করা গিয়েছে এই দাবি করা যায়। একটি বিশেষ বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য, রাজ্যের জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী ১৯টি জেলার যখন যেখানে গিয়েছেন প্রকাশ্য বিশাল বিশাল জনসংখ্যাগুলিতে সাধারণের উন্নয়নের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের কথা বারে বারে উল্লেখ করেছেন। এতে সচেতনতা আরও বেড়ে গিয়েছে। তাই এই সাফল্য। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই দফতরের মন্ত্রী। তাই বেশি করে তিনি এই দফতরের কাজে খোঁজখবর রাখেন যা আমাদের কাজে প্রেরণা জোগায়।

বিগত ১১-১২ আর্থিক বছরের তুলনায় ১২-১৩-র সাফল্য অনেক বেশি। আরও বেশি হতে পারত, কিন্তু হয়নি তার প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এ বছরে প্রি-ম্যাট্রিক-এর ৬,২২,২৯৮ জন এবং পোস্ট-ম্যাট্রিকের ১৭ হাজারের কিছু বেশি ছাত্রছাত্রীকে আমাদের পাঠানো আবেদনের সাড়া দেয়নি। উপরন্তু পয়সা নেই বলে তাদের দেয় অংশের অর্থ দেয়নি। দ্বিতীয় কারণ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য দেয়নি। রাজ্যে কোড অফ কনডাক্ট-এর জন্য বণ্টনের কাজকর্ম কিছু সময় ধরে বন্ধ ছিল । এবার তা শুরু করা হয়েছে ১৩-১৪ আর্থিক বছরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ১২-১৩ আর্থিক বছরের অবশিষ্ট কাজও দ্রুত গতিতে চলছে। সম্পন্ন হলে তা ২১ লক্ষ অতিক্রম করে যাবে। এখন তা প্রায় ২১ লক্ষের কাছাকাছি এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪৫৭ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। ১৩-১৪ আর্থিক বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২৫ লক্ষ ধার্য করা হয়েছে, কেন্দ্র সরকার বিগত বছরের মতো বাধা সৃষ্টি না করলে তা ২৬ লক্ষ অতিক্রম করে যাবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, ৭৫ জন কর্মপ্রার্থীকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে।

এবার আসা যাক এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা তথা সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনায় জাতীয় স্তরের ব্যাঙ্ক শাখাগুলি, যা বা সেগুলি এ রাজ্যে অবস্থিত। ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত বৃত্তির চেকগুলি ভাঙিয়ে দিতে অ্যাকাউন্ট খোলার কাজে যথেষ্ট হয়রানি করে থাকে। যদিও এক্ষেত্রে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ (RBI) থেকে সারা দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক শাখার চেয়ারম্যানদের বিগত ২০১০ সালের ১৩ অক্টোবর সার্কুলার দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক-এর পক্ষ থেকেও তা করা হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের, বিদ্যালয়ের একাংশ বৃত্তির চেকগুলি পাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চেকগুলি বিতরণ করতে যথেষ্ট বিলম্ব করে থাকে। নাম-না করে বলছি একটি মহাবিদ্যালয় তো বলেছে সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের বৃত্তি বিতরণ তারা করতে পারবে না, এ বিষয়ে নিগমের সভায় আলোচনা করে ওই মহাবিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

নিগমের যে সমস্ত RA (Recovery Agent) FS (Field Supervisor) ES (Education Supervisor) জেলায় জেলায় কাজে নিযুক্ত আছে তাদের কেউ কেউ চেক বিতরণের ক্ষেত্রে সীমাহীন অবহেলা করে থাকে, এমনকী চেকগুলি বিলি না করে মেয়াদ অতিক্রম করে অন্তর্ঘাত করে থাকে ও থাকছে।

উল্লিখিত সমস্যাগুলি নিগমের পক্ষ থেকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ থেকে নামানোর জন্য সচেষ্ট আছে। কখনও কখনও জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকের কাছে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ও হয়ে থাকে।

উপসংহারে পঃ বঃ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের রেকর্ড সৃষ্টি করা উন্নয়নের সঙ্গে পঃ বঃ মাদ্রাসা বোর্ড, ওয়ার্কস বোর্ড, উর্দু অ্যাকাডেমি ও সংখ্যালঘু কমিশনের কাজের খতিয়ান যোগ করলে বলা যায় রাজ্য সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর সুযোগ্য পরিচালনায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে এটা খুবই আশা ও ভরসা নিয়ে বলা যায় রাজ্যের পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ রাজ্যের পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘু মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিচারের নিরিখে জাতীয় মূলস্রোতে শামিল হতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে ও করবে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুষ্প্রাপ্য ছবি ও পাণ্ডুলিপি



লন্ডনে নজরুল

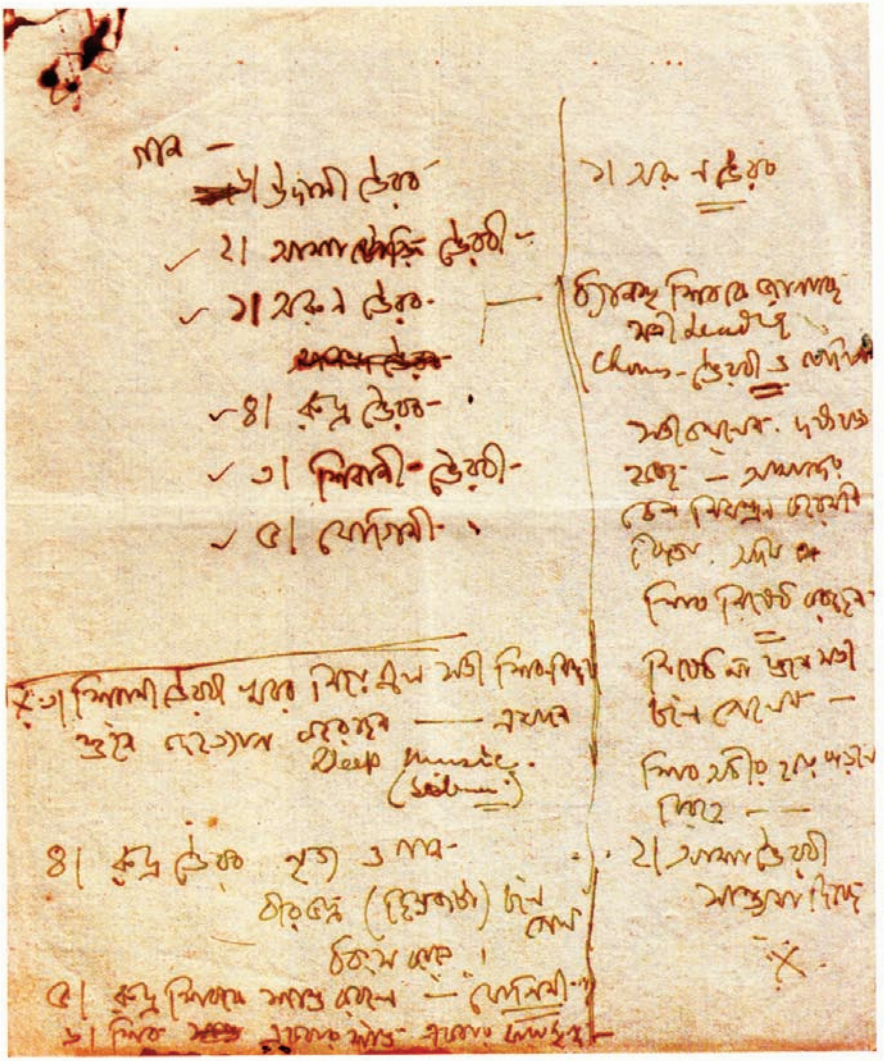

কবি নজরুলের কবিতার খাতার পাতা

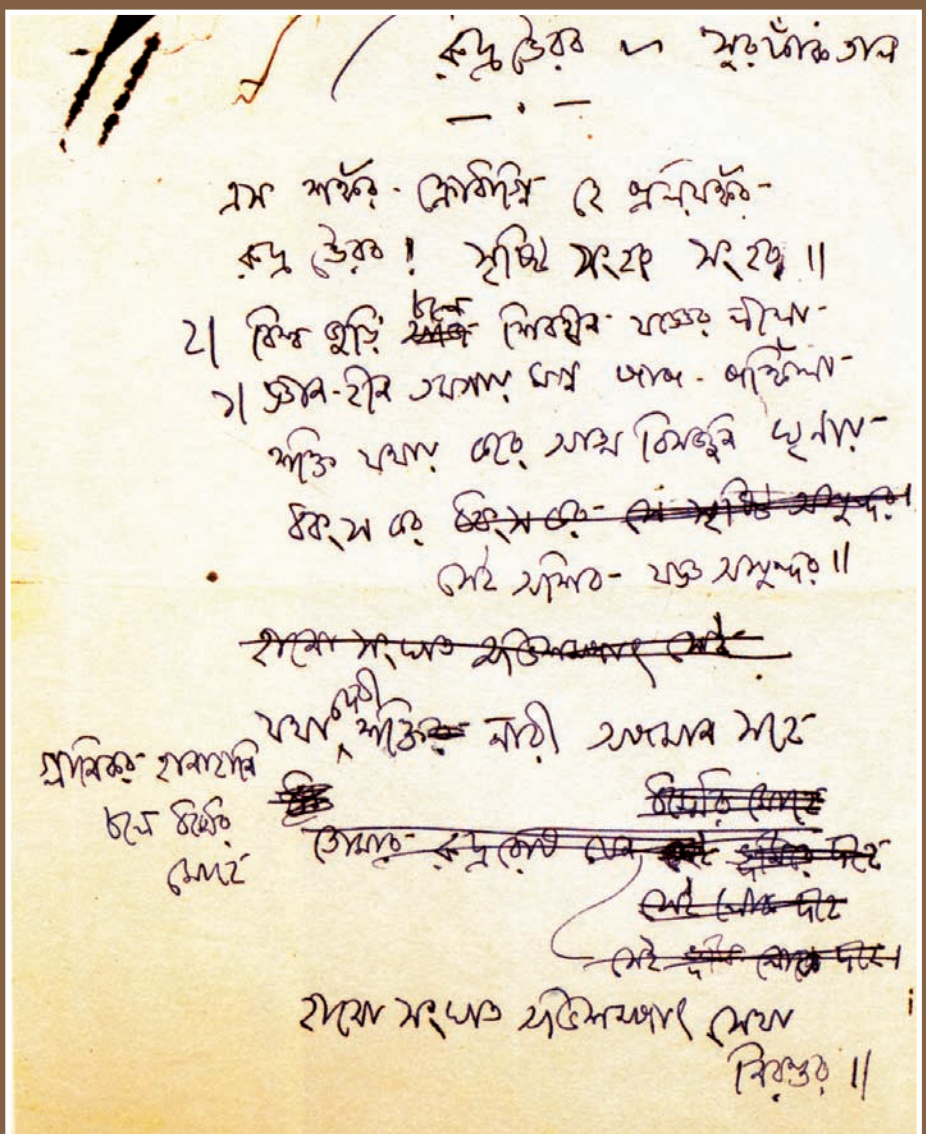

‘উদাসী ভৈরব’ পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা।



খ্রিস্টানদের সভায় নজরুল



নজরুলের জন্মদিনে আশীর্বাদ নিচ্ছেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী

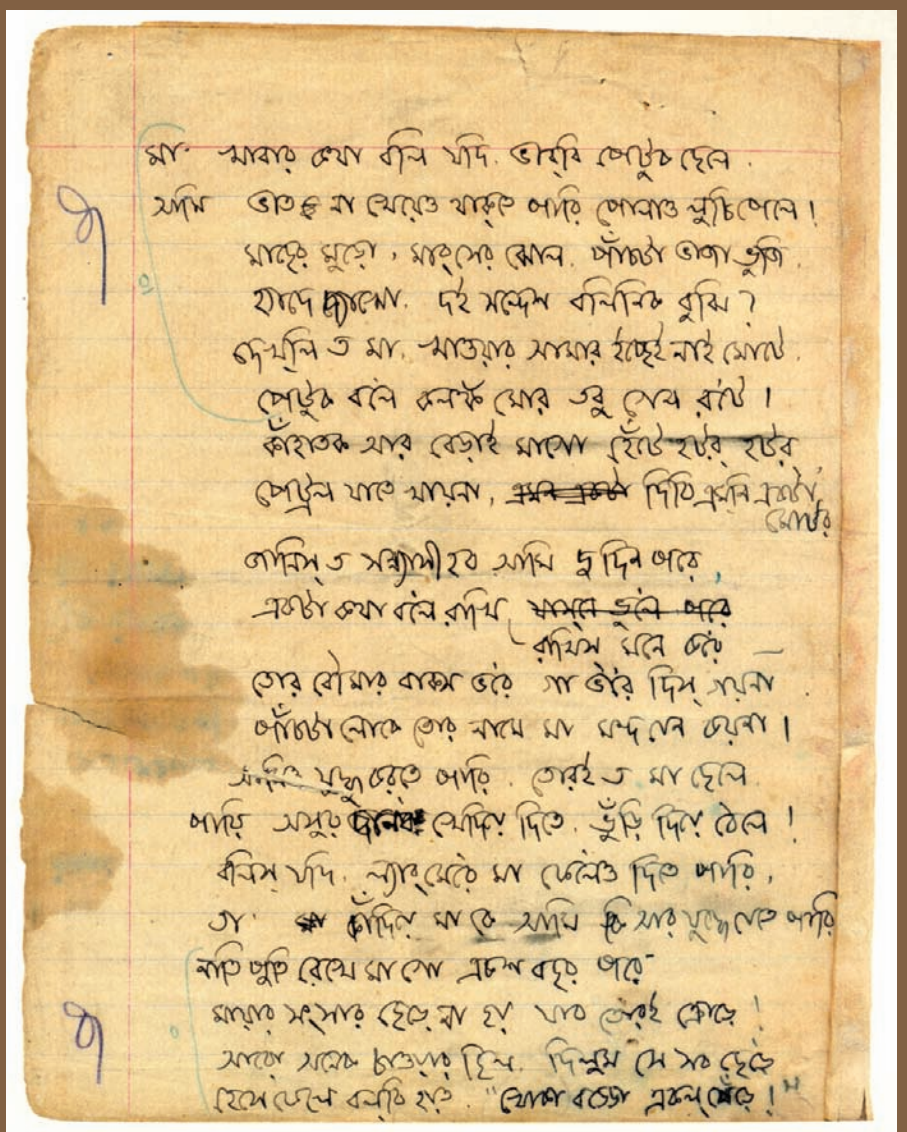

নজরুলের গানের খাতার পাতা

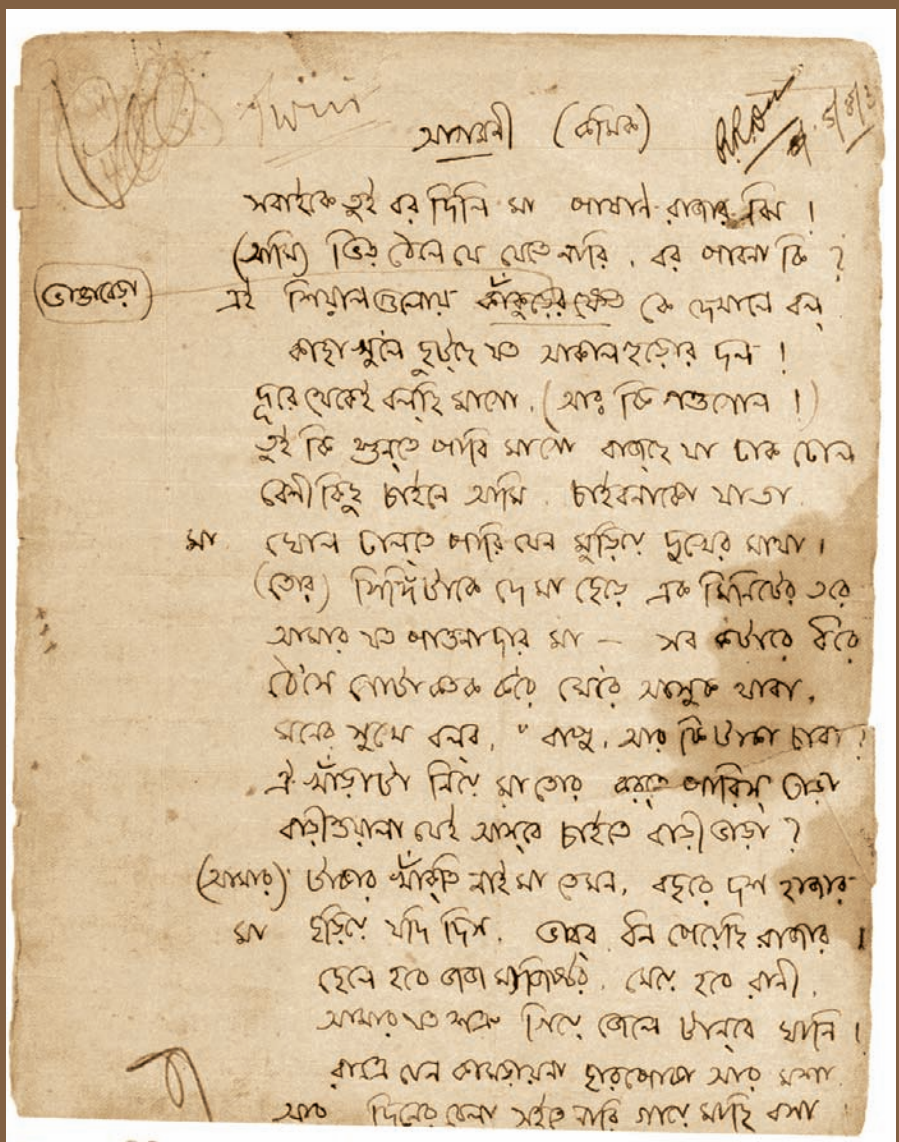

নজরুলের গানের খাতার পাতা



কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ এবং পুত্রবধূ কল্যাণীর মাঝে নজরুল



শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নজরুল

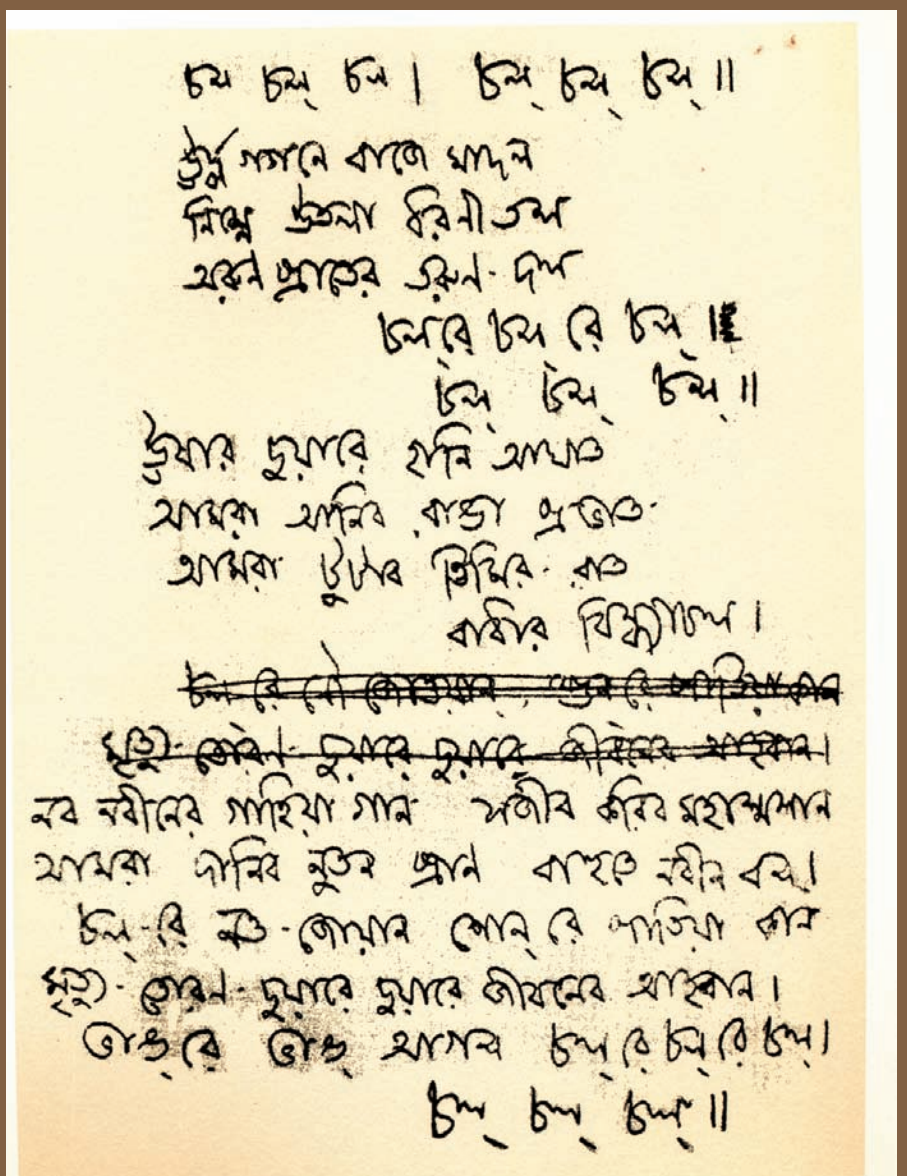

চল চল্ চল। চল্ চল্ চল্॥
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্॥
চল্ চল্ চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির-রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
~~চল্‌রে নৌ জোয়ান, শুন্‌রে পাতিয়া কান~~
~~মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।~~
নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।
চল্‌রে নও-জোয়ান শোন্‌রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ্ আগল চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্ চল্ চল্॥

নজরুলের লেখা বিখ্যাত একটি গানের পাণ্ডুলিপি



যোগ সাধনায় রত নজরুল



নজরুলকে গান শোনাচ্ছেন ফিরোজা বেগম



রাজশাহীতে মুসলিমদের সভার মধ্যমণি কাজী নজরুল ইসলাম



ঢাকার ধানমুন্ডির বাড়ির সামনে মাঠে কবি নজরুল





ধানমুন্ডির বাড়িতে অনুরাগীদের সমানে কনিষ্ঠ পুত্রবধুর হাত ধরে কবি নজরুল



শেষবারের মতো কলকাতা ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশে বিমানে উঠছেন কবি নজরুল

এক অ্যাচিভার ও তাঁর অবিরাম উড়ান

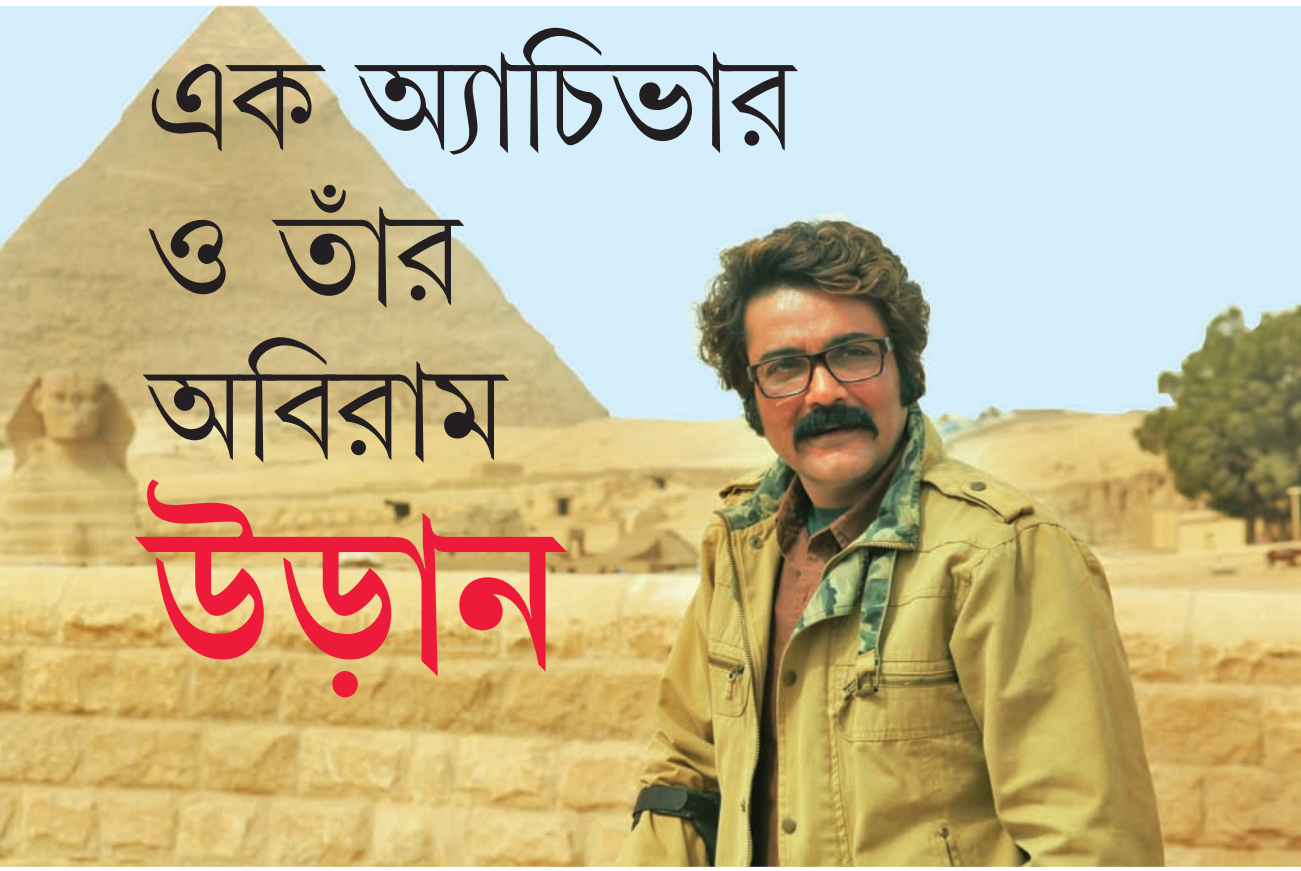

সাড়ে তিনশোর উপর ছবি করেও তিনি চ্যালেঞ্জ-সন্ধানী। কখনও ‘কাকাবাবু’, কখনও ‘অ্যান্টনি কবিয়াল’ কিংবা ‘অঞ্জনিপুত্র’। তিনিই ইন্ডাস্ট্রির অপরাজিত ‘নায়ক’। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি **শম্পালী মৌলিক**

সুদীর্ঘ ৩০ বছরের কেরিয়ার। ২০১৩-র শেষ ভাগে এসে হ্যাটট্রিকের মুখে দাঁড়িয়ে। এটাকে কীভাবে দেখবেন? ওস্তাদের মার শেষ রাতে?

হ্যাটট্রিক হবেই এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। অত ক্যালিবার নেই আমার।

এ তো বিনয়ের কথা!

নাহ্। বিনয় করছি না। কোন ছবি ক্লিক করবে বলা যায় না। আমি যেটা পারি, দু’শো শতাংশ দিতে, ব্যস।

তিন-তিনটে হেভিওয়েট ছবি মুক্তির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি। সপ্তমীতে ‘মিশর রহস্য’ (পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়)। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ‘হনুমান ডটকম’ (পরিচালক : গৌরব পাণ্ডে), শেষদিকে ‘জাতিস্মর’ (পরিচালক: সৃজিত মুখোপাধ্যায়)।

আমি কিন্তু আগে গড়ে যে ক’টা ছবি করতাম এখন আর তা করি না। ছবির সংখ্যা কমিয়েছি স্বেচ্ছায়। ঘটনাচক্রে এই তিনটে ছবি পরপর পাইপলাইনে দাঁড়িয়ে। ‘কাকাবাবু’র মতো চরিত্র কে না করতে চায়? আর ‘হনুমান ডটকম’-এর কনসেপ্ট - আইডিয়া এক্কেবারে ইউনিক। এটার জন্যই



বাংলা ছবি প্রথমবার আইসল্যান্ড গেল, রিকিয়াভিক ছুঁয়ে এল। আর 'জাতিস্মর' নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'র রিমেক, সেই উত্তমজেঠু করে গিয়েছিলেন। আমি জানি সকলে তাকিয়ে থাকবে এই ছবিটার দিকে। ওস্তাদের মার নয়, এই নিজেকে ভেঙে চুরে বারবার এক্সপেরিমেন্ট করার ইচ্ছে, এটাই আমাকে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ নিতে বাধ্য করছে।

বয়স তো আর বহুদিন সঙ্গ দেবে না। তাই কি তাড়া?

বয়সের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা ভাবতে নেই। ভাবিও না। যুদ্ধটা স্রেফ নিজের সঙ্গে। নিজেকে তাড়িয়ে বেড়াই, নতুন চ্যালেঞ্জের খোঁজে। এখন সময়টা বদলে গিয়েছে। শুধুই নায়কের কনসেপ্টে আর ছবি চলে না। এটা এখন আমাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ। কনটেন্ট ড্রিভেন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার ঝুঁকিটা নিতে পারছি সব মিলিয়ে। কিউ-এর মতো, দিবাকরের মতো পরিচালকদের সঙ্গে কাজের কথা ভাবতে পারছি। আর চাই সংযম এবং শৃঙ্খলা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালেই লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাব। যেটা হতে দিতে পারি না। তা হলে যাঁরা আমাকে 'পোসেনজিৎ' থেকে প্রসেনজিৎ হিসাবে মেনে নিয়েছেন, ভালবেসেছেন তাঁদের অশ্রদ্ধা করা হয়। আমার এই হয়ে ওঠার নেপথ্যে দু'ধরনের দর্শকেরই অবদান রয়েছে। কাউকে নিরাশ করব না। আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া অর্থহীন।

এই দৌড়ে তো অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে...

হ্যাঁ, আমি ভাল বাবা বা ভাল স্বামী হতে পারিনি। অকপটে মেনে নিচ্ছি, মিশুক (ছেলে তৃষাণজিৎ) বা অর্পিতাকে যতটা সময় দেওয়া দরকার, পারিনি দিতে। মিশুক এখন অ্যাম্বিভ্যালিতে স্কুলে পড়ে, ওর জন্যই আরও মুম্বইয়ে নিজের একটা বাড়ি নিলাম। যাতে যাওয়া-আসা-থাকাটা সহজ হয়।

স্পোর্টসে, মানে টেনিসে লিয়েন্ডার, ক্রিকেটে শচীনের বয়সের কথা বলছেন আজ সকলে। এঁরা ক্রীড়াক্ষেত্রে চল্লিশের চালশে মিথ্যে প্রমাণ করেছেন। আপনিও ম্যারাথন সাফল্যে বিশ্বাসী...

অ্যাচিভার হতে গেলে তোমাকে কিছু আত্মত্যাগ করতেই হবে। সেটা আমি করেছি। আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন তো সোলো হিরোর দিন ছিল। লারেলাপ্পা ছবি করেই কাটিয়ে দিলাম কেরিয়ারের বাইশ বছর অন্তত। শেষ আট-ন'বছর মিনিংফুল সিনেমা করছি। এই ধরনের ছবিতে ঋতুই (ঋতুপর্ণ ঘোষ) প্রথম নিয়ে আসে আমাকে। আজকে এতদিনে আমি স্টার থেকে অ্যাক্টর প্রসেনজিৎ। বাংলার মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছি। বাংলাকে ভালবেসে। কত মধ্যমানের কাজ করেছি টিকে থাকতে, পালিয়ে যাইনি। বম্বে গিয়ে সেই সময় লাক ট্রাই করতে পারতাম, ডাক পেয়েও যাইনি। আরে, পাঁচটা ছবি করলে, একটা তো ক্লিক করত, নাকি? আজকে যখন 'সাংহাই' করলাম, কি 'ট্র্যাফিক' করছি বা 'খুবসুরত' করব, সেটা কিন্তু বাংলার প্রসেনজিৎ হিসাবেই। এটাই আমার তৃপ্তি।

অথচ অন্যদিকে, আজও বিদেশে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা ছবির মুখ বলতে সেই সত্যজিৎ রায়।

ঠিকই বলেছেন। প্রথম আমি কান ফিল্মোৎসবে গিয়েছিলাম 'দোসর'-এর জন্য। 'আমি, ইয়াসিন আর আমার মধুবালা'ও প্রদর্শিত হয়েছিল টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। এবার 'কান'-এ গিয়ে দেখলাম জ্বলজ্বল করছে মাধবী আন্টি আর সৌমিত্রজেঠুর মুখ—'চারুলতা'। অথচ আমাদের একশো বছরের সিনেমার ঐতিহ্য আমরা মেনটেন করিনি তা কিন্তু নয়। একতা দরকার, বিশ্ববাজারে বাংলা ফিল্মের ইন্ডাস্ট্রিকে তুলে ধরতে। দশটা বড় আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালেও যদি আমরা বাংলার একটা প্যাভিলিয়ন রাখতে পারি তাহলেও কিছুটা হয়।

বলিউড পুরোটা গ্রাস করছে বলছেন?

শুধু বলিউড ভারতীয় সিনেমার মুখ নয়। অসম্পূর্ণ সেটা। প্রাদেশিক ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে হবে। মার্কেটিং অ্যাভিনিউজ বার করতে হবে। আমরা চাইলে কি রিজিওনাল ফিল্মফেস্ট করতে পারি না? পাশের প্রদেশের ছবি সম্পর্কে জানি অন্তত, নাকি? এই যে, বাংলাদেশে টলিউডের ছবি রিলিজের জন্য আর ওপার বাংলার ছবি এখানে মুক্তির জন্য দৌড়ঝাঁপ করলাম আমরা সকলে মিলে (ফিকি ফ্রেমস-এর উদ্যোগে), সেটা ওই বাংলা ছবির বিপণনের ক্ষেত্রটা প্রসারের জন্য। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে গেলাম। ওখানে বাংলার বড় মার্কেট হতে পারে।

বিগত ৩০ বছরের দিকে ফিরে তাকালে কী মনে হয়?

আগে তো আমি আর তাপস (পাল) ছিলাম, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো! ম্যাগাজিন-পত্রপত্রিকায় শেষের দিকের পাতায় ছোট্ট খবর হত। এখন নিঃসন্দেহে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির গুরুত্ব ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মুম্বইয়ে ইংলিশ ম্যাগাজিন বাংলার ছবির খবর জানতে চায়। সাক্ষাৎকার চায়। ইংরেজি দৈনিকে বাংলা ফিল্মের খবর শিরোনাম পায়। তবু বলব বক্স অফিস কালেকশন বাড়াতেই হবে। চাই নতুন প্রযোজক। একটা 'রিলায়েন্স', 'ভেঙ্কটেশ' বা 'ভায়াকম' হলেই হবে না। চাই আরও প্রযোজক সংস্থা। যারা প্রফেশনালি ফিল্ম বিজনেস করবে। এই যে বলিউড শুটিং লোকেশন হিসাবে কলকাতাকে বেছে নিচ্ছে এতে করে আমরা ফিল্ম-পর্যটন জোট বাঁধতে পারি। একটু পরিকল্পনামাফিক উদ্যোগ দরকার, যাতে আরও বেশি শুটিং হয় এখানে।

আগের থেকে কি পরিস্থিতি বদলেছে, নতুন সরকারের আমলে?

নিশ্চয়ই বদলেছে। আগের থেকে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বেড়েছে। টেকনিশিয়ান স্টুডিও ফ্লোর-এর নতুন কাজ শুরু হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রির ভল্যুম বেড়েছে। ফিল্ম সিটির পরিকল্পনা রূপায়িত হলে ভাল হয়। যদি ছবির সংখ্যা কমেও, কোয়ালিটি ওয়ার্ক চাই।



এত সুর আর এত গান

অনরণ্য আচার্য

বম্বের সিনেমা জগৎ তখন দাপটে শাসন করছেন রাজ কাপুর। সেই সময় রাজ কাপুর একবার কলকাতা এলেন। অবশ্যই বেড়াতে নয়। এসেছিলেন তাঁর 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়' ছবির প্রচারে।

কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে হল মিট দ্য প্রেস। রাজ কাপুর এলেন কলকাতার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে। তাঁর ছবির প্রচারে। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে গেলেন রাজ কাপুরের কাণ্ড দেখে। তিনি এক বাঙালি যুবকের হাত জড়িয়ে ধরে এলেন সাংবাদিকদের সামনে। বললেন, "ইনকো পহচানতে হ্যায় আপলোগ? ইয়ে হ্যায় বঙ্গাল কা লড়কা, আপ লোক কভি লিখতে হ্যায় ইনকে বারে মে? কিউ নেহি লিখতে হ্যায়? ইনকো পহচানিয়ে। ইনকা নাম হ্যায় সুবীর সেন।" সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত সাংবাদিকরা সকলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। রাজ কাপুর বললেন, "ছোড়িয়ে ইন বাতোঁকো। সুবীর সেন হীরা হ্যায়। ও তো অ্যায়সে হি চমকে গা।"

সত্যিই তো সুবীর সেনের জন্য কোনও সাংবাদিক উচ্ছ্বসিত হয়ে কলম ধরেননি। কারণ, সুবীর সেন নিজের গানের মার্কেটিং করেননি কখনও। গানের পাশাপাশি নিজের মার্কেটিংটাও চালিয়ে যেতে হয়। সেকালেও এবং একালেও। সুবীর সেন তা করেননি। সাংবাদিকদের তিনি কখনও তোয়াজও করেননি, তোয়াক্কাও করেননি। পণ্ডিতিয়া রোডের সাবেক বাড়িতে বসে সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় তিনি আবারও বললেন, "সাংবাদিকদের খুশি করে শিল্পী হতে চাইনি আমি। তাই সাংবাদিকরাও আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না।" তবে, সেই সময়ে সিনে অ্যাডভান্সের প্রখ্যাত সাংবাদিক সরোজ সেনগুপ্ত কিন্তু খুবই ভালবাসতেন সুবীর সেনকে। সেই ভালবাসাই জায়গা মতো পৌঁছে দিল সুবীর সেনকে।

সাংবাদিক সরোজ সেনগুপ্ত একদিন বললেন, "চল সুবীর একবার বোম্বাইটা ঘুরে আসবি চল।" নিছক বেড়ানোর মেজাজেই তখনকার ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবা সুবীর 'রইল ঝোলা চলল ভোলা' বলে বেরিয়ে পড়লেন। যে বাড়িতে গিয়ে উঠলেন,তার ঠিক উপরতলায় থাকেন প্রখ্যাত সুরকার শংকর জয়কিষান জুটির শংকর। শংকরের ফ্লাটে অবাধ যাওয়া-আসা ছিল সাংবাদিক সরোজের। তিনি সুবীরকে বললেন, "চ তোকে পরিচয় করিয়ে দি।" গোটা ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মতো ঘটে যেতে লাগল। ধীরপায়ে সরোজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুরকার শংকরের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকলেন সুবীর। শংকর চোখের ইশারায় দু'জনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন। কারণ তিনি তখন 'বসন্ত বাহার' ছবির গানের সুর ভাঁজছেন। সুবীর মন্ত্রমুগ্ধের মতো চোখ বুজে শুনছেন গানটির বন্দিশ ও তার চলন। গানটি শেষ করে শংকর কথা বলা শুরু করতেই সুবীর বললেন, "এটা হাম্বীর রাগ। তাই না?" শংকর বিস্মিত হলেন। বললেন, "তুমি রাগ চেনো?" চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে তালিম পাওয়া সুবীর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই বললেন, "হ্যাঁ, চিনি।"

"গানা আতা হ্যায়?"

"গান জানি।"

"শুনাও।" প্রখ্যাত সুরকার শংকর তাঁর গান শুনতে চাইছেন? সুবীর ভাবলেন, তিনি স্বপ্ন দেখছেন না তো? গোটা ব্যাপারটা যা যা ঘটে যাচ্ছে সত্যিই তা স্বপ্নের মতোই। কোনওরকম দ্বিধায়, সঙ্কোচে ও লজ্জায় কম্পিত না হয়ে পর দু'টো রবীন্দ্রসংগীত শোনালেন। শোনালেন, 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' এবং 'ডেকো না আমারে ডেকো না'। শংকর মোহিত হয়ে শুনলেন। বললেন, "হিন্দি গানা আতা হ্যায়?"

সুবীর তখন সুধীন দাশগুপ্তের তৈরি একটা হিন্দি গান শিখেছিলেন। 'হোঁটো কে জাম লে লে'। সেটাই শোনালেন। শংকরের মুগ্ধতা যেন আর শেষই হয় না। তিনি সুবীরের প্রতি এত আগ্রহ দেখালেন যে তা আর বলার নয়। তিনি তখনই জয়কিষানকে ফোন করে বললেন, "আভি আও।" পরপর ফোন চলল। দু'একজন সাংবাদিককেও ফোনে ডাকলেন শংকর। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘর ভরে গেল। সুবীর সেনকে এবং তাঁর সঙ্গী সাংবাদিক সরোজ সেনগুপ্তকে ভাগ করে দিয়ে শংকর সুবীরকে ইন্ট্রোডিউস করানোর ভঙ্গিতে বললেন, "ইনসে মিলিয়ে। ইয়ে হ্যায় বঙ্গাল কা লড়কা। নাম হ্যায় সুবীর সেন। হমারা আগলা ফিল্মমে গায়েঙ্গে ইয়ে।"

সুবীর যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। বিস্ময়ের ঘোর তাঁর আর কাটতেই চায় না। তার মধ্যেই ঘরের সকলে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছেন অভিনন্দন জানাচ্ছেন। শংকর একে একে সবাইকে বিদায় জানিয়েও সুবীর এবং সরোজকে বসতে বললেন। সুবীরের হাতে নগদ দু'হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, "ইয়ে হ্যায় আপনা অ্যাডভান্স। কিসি দুসরে সংগীতকার কে সাথ বাত মত করনা। সিধা কলকাত্তা লোটিয়ে। হাম আপকো খত লিখকে বুলায়েঙ্গে।" শংকরজি কিন্তু সুবীরকে উর্দুটা ভাল করে রপ্ত করারও পরামর্শ দিলেন।

হাতে নগদ দু'হাজার টাকা পেয়ে তখনকার দিনে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেলেন সুবীর। কিন্তু তাঁর দু'হাজারের আধাআধি বকরা হল। ভাগ বসালেন সরোজদা। বললেন, "চল রাজার মতো মদ্যপান করি।"

কথা মতোই কাজ। শংকরজি চিঠি লিখলেন। সুবীরকে বম্বে ডেকে পাঠালেন। ১৯৫৮ সাল। 'কাঠপুতলি' ছবি তৈরি হচ্ছে। ছবির হিরো বলরাজ সাহনি। দুরন্ত দাপট বলরাজজির। নতুন গায়কের গানে লিপ দিতে হবে শুনে বেঁকে বসলেন। শংকরজি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'পহলে ইনকা গানা তো শুনিয়ে।' বলরাজজি গান শুনে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "বঙ্গাল কা এক ছোটা লড়কা সবকো হারা দিয়া।" গানটি ছিল, "মঞ্জিল ওহি হ্যায় প্যার কা।" সত্যি সত্যিই বাংলার সেই ছাব্বিশ বছর বয়সি যুবা সুবীরের প্রথম গানই সুপার হিট। মহম্মদ রফি, কিশোরকুমার, তালাত মামুদ, হেমন্তকুমার, মুকেশ প্রত্যেকেরই তৃতীয় বা চতুর্থ গান হিট হয়েছে। কিন্তু, সুবীরের প্রথম গানই সাড়া ফেলে দিয়েছে। তারপর পর পর গানের পর গান। মদনমোহনের সুরে, কল্যাণজি আনন্দজির সুরে পর পর গান। 'অর্ধাঙ্গিনী' ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে ডুয়েট, 'আসকা পঞ্ছি' ছবিতে সুমন কল্যাণপুরের সঙ্গে ডুয়েট। গানটি ছিল, "এ পুকার কিসকে লিয়ে গীত বনকে আয়ি।" তখন দেবানন্দের লিপে 'রূপকি রানি চোরো কা রাজা' ছবিতে গাইলেন। সুবীরের গানে লিপ দিলেন দিলীপকুমারও। শংকরজি রাজ কাপুরের লিপে গাওয়ানোর জন্য একটা গান তৈরি করলেন। 'আ ভি যা রাত ঢলনে লাগি'। কিন্তু, শংকর বা সুবীরের সেই ইচ্ছাপূরণ হল না। মুকেশ বরাবরই রাজসাহেবের জন্য গেয়ে থাকেন। মুকেশ শংকরজিকে বললেন, 'অ্যায়সা মত কিজিয়ে ম্যায় বরবাদ হো জাউঙ্গা'। শংকরজি গানটিকে শেষপর্যন্ত লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গাওয়ালেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, ১৯৫৯ সালে সুবীর মেহমুদের লিপের জন্য একটা গান গেয়েছিলেন। সেই গানটি দুরন্ত হিট করল। অসাধারণ আলোড়ন পড়ল। গানটি হল, "ম্যায় রঙ্গিলা প্যার কা রাহি তু মেরি মঞ্জিল"। একটানা নয় বছর বম্বে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন সুবীর সেন। তবু বাংলার সাংবাদিকরা তাঁকে নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। যাক সে কথা।

সবচেয়ে চমকে যাওয়ার মতো ঘটনা তখন ঘটিয়েছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। তিনি সুবীর সেনকে ভীষণই ভালবাসতেন। তাঁর ভালবাসার আতিশয্যে তিনি নিজের জায়গা একবার ছেড়ে দিলেন সুবীরের জন্য। 'মোমের আলো' নামে একটি ছবি তৈরি হবে। উত্তমকুমার নায়ক হবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, বাস্তবে তা ঘটল না। উত্তমকুমার সুবীরকে বললেন, "তুমি নায়ক হবে এই ছবির।" সুবীর তীব্র আপত্তি জানালেন। তিনি অভিনয় করবেন না। আর নায়কের ভূমিকায় তো নয়-ই। কিন্তু, উত্তমকুমার নাছোড়বান্দা। তিনি শেষ পর্যন্ত সুবীর সেনকেই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করালেন। নায়িকা সন্ধ্যা রায়। বলাই বাহুল্য সুবীর সেনের চেহারা ছিল নায়কোচিতই। খুবই ভালবাসতেন উত্তমকুমার। তাঁর



ড্রাইভারকে পাঠিয়ে বলতেন, "যাও সুবীরমকে ধরে নিয়ে এসো।" উত্তম সুবীর সেনকে সুবীরম বলে ডাকতেন। তাই প্রায়ই উত্তমের ডাকে যেতে হত সুবীরকে।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় সুবীর সেনকে তাঁর 'অভিমান' ছবির নায়ক ভেবেছিলেন। পীড়াপীড়িও কম করেননি। কিন্তু মায়ের আপত্তিতে সুবীর আর সিনেমায় অভিনয় করেননি। তাঁর মা বলেছেন, "তুমি গায়ক। গান গাইবে। তোমায় নায়ক হতে হবে না।" মাতৃ আজ্ঞা পালন করেছিলেন সুবীর। প্রায় পাঁচ-ছ'বছর পর হৃষিকেশ ছবিটা করলেন। নায়ক অমিতাভ বচ্চন। কিন্তু সিনেমায় নায়ক চরিত্রের নাম কিন্তু হৃষিকেশ সুবীরই রেখে দিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সুবীরকে নিজের বাসভবনে ডেকে পাঠিয়ে দু'ঘণ্টা ধরে গান শুনেছেন। আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই ঘোষণা করেছিলেন, "থ্রি জেমস অফ ইন্ডিয়া। একজন লতা মঙ্গেশকর, দ্বিতীয়জন মহম্মদ রফি এবং তৃতীয়জন অবধারিতভাবেই সুবীর সেন।" বাংলার কাছে বাঙালির কাছে এর চেয়ে গর্বের বিষয় আর কী আছে।

যাক সেসব কথা, বম্বে থেকে এখন আসা যাক কলকাতায়। বাংলা গানের স্বর্ণযুগের শিল্পীদের নামের সঙ্গে বেশ গৌরবের সঙ্গেই উচ্চারিত হয় সুবীর সেনের নামটি। তাঁর গাওয়া বাংলা গান, "এত সুর আর এত গান যদি কোনওদিন থেমে যায়...', 'ওই উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন রঙিন...' 'সারাদিন তোমায় ভেবে ভেবে হল না আমার কোনও কাজ...', কিংবা 'নয় থাকলে আরও কিছুক্ষণ, নয় রাখলে হাতে দু'টি হাত, দেখ জ্যোৎস্না ভেজা এই রাত...' বাঙালি শ্রোতা কোনও দিনও ভুলতে পারবেন না। এখন তো সুবীরের গান সেই অর্থে থেমে গিয়েছে। কিন্তু, তাঁকে বাঙালি শ্রোতা কি ভুলতে পেরেছেন? না ভুলতে পারবেন কোনওদিনও? অনুপম ঘটকের কাছে বাংলা আধুনিক গানের তালিম নিয়েছেন। এখানেও একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। অনুপম ঘটকের বাড়িতে গিয়ে সুবীর সেই চেয়ারটাতে বসেছিলেন যে চেয়ারটাতেই প্রথম দিন এসে বসেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং কে এল সায়গল। অনুপম ঘটক তখন মজা করেই বলেছিলেন, "দেখো দেখো সুবীরও প্রথম দিন এসে ওই চেয়ারে বসেছে। তার মানে ও বিখ্যাত হবে।" অনুপম ঘটকের সেই মজা কিন্তু সত্যি হয়েছে।

মরা গাঙের প্রায় শুকিয়ে যাওয়া জলে বাতাসের কম্পন লেগে যেমন মৃদু কম্পন হয়, তেমনই কম্পিত অভিমান ঝরে পড়ে সুবীর সেনের কণ্ঠে। তিনি বলেন, চল্লিশ বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা গানের শিল্পী বলে গর্ব করেছে সব সরকারই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া তাঁকে কোনও সরকার আর্থিক সহায়তা দেয়নি। তিনি কীরকমভাবে বেঁচে আছেন খোঁজ নেয়নি। সুবীর আর্দ্রকণ্ঠে বলেন, "মমতা আমাকে বছরে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পেনশন দিচ্ছেন। তা ছাড়াও একবার পুরস্কার দিয়েছেন দু'লক্ষ টাকা এবং একবার এক লক্ষ টাকা। মমতা সত্যিই মমতাময়ী। আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রী শিল্পীকে সম্মানও যেমন জানাতে কুণ্ঠা করেন না, তেমনই শিল্পীর পাশে দাঁড়াতেও ভোলেন না। আমি ওঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। জয়তু মমতা।"

ছবি : রজত বিশ্বাস

আমার বাবা

সৈকত মিত্র

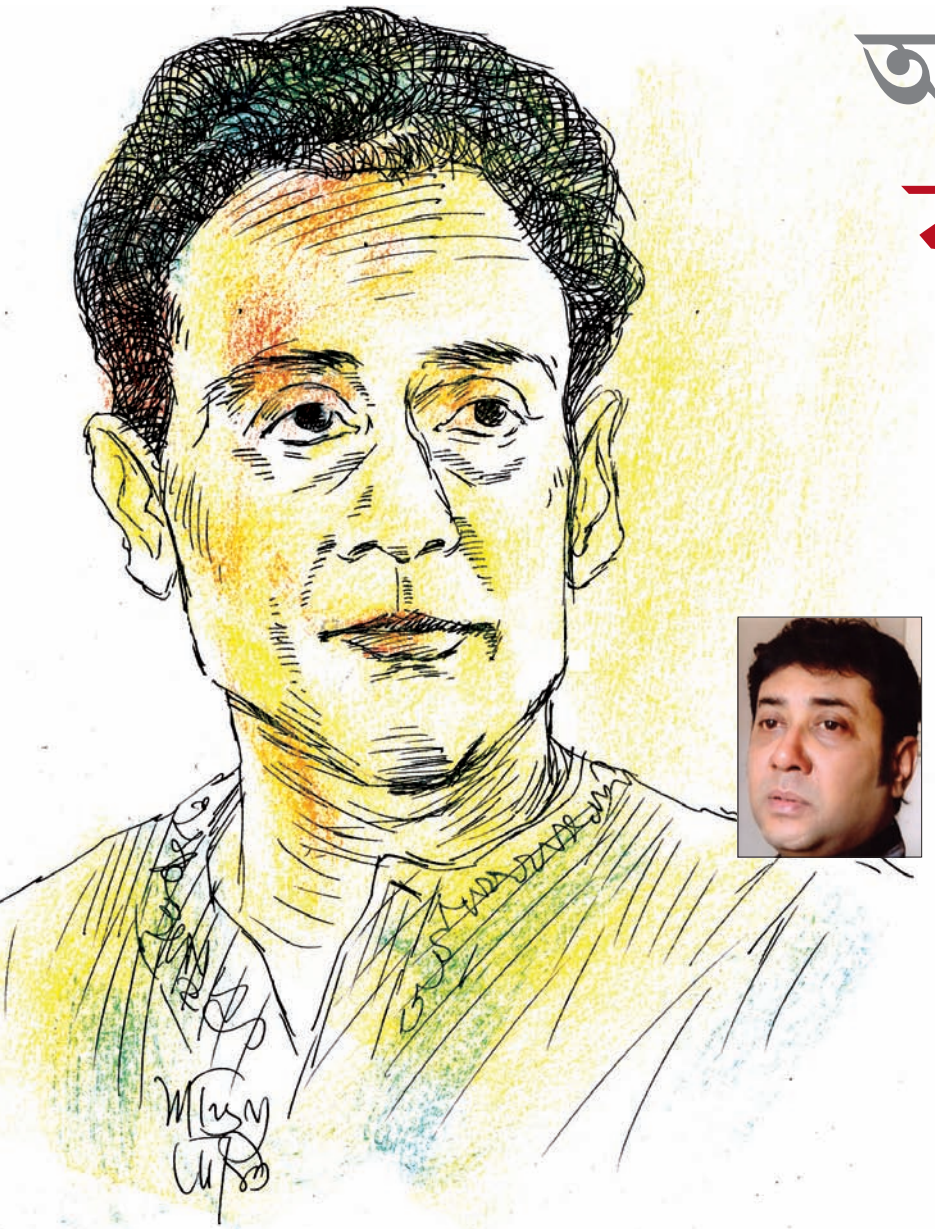

বাবন ভীষণ ভাল গাড়ি চালাত। আমি দেখতাম কীরকমভাবে গিয়ার চেঞ্জ করত আর রাস্তার খানাখন্দ এড়িয়ে খুব সাবধানে গাড়িকে এগিয়ে নিয়ে যেত।

হঠাৎ, একদিন শুনলাম! বাবনের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে —বাবন হাসপাতালে ভর্তি—বাড়িতে অনেক লোকজনের যাতায়াত—ফিসফিসানি—কিছুই সেরকম বুঝতে পারতাম না—তখন নেহাতই শিশু আমি। কয়েকদিন পরে —নতুনদাদু (বাবনের মামা)—আমাকে নিয়ে গেল শিশুমঙ্গল হাসপাতালে—দেখলাম বাবনের সারা শরীর ব্যান্ডেজ বাঁধা—বাঁ পাটা উঁচুতে স্লিংয়ের থেকে ঝোলানো। আমাকে দেখে ডেকে আদর করল—বুকে একটু হাত বুলিয়ে দিতে বলল। খুবই অসুস্থ-ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বাবনকে। আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেছিল। কোনওদিন এরকম অবস্থায় কাউকে দেখব বা সেরকম পরিস্থিতির কখনও সম্মুখীন হইনি বলে হয়তো খুব কান্না পাচ্ছিল। বাবন মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে আমাকে নিয়ে চলে যেতে বলল। বেশ কিছুদিন পরে বাবন বাড়ি এল। পায়ে প্লাস্টার-লাঠি নিয়ে চলতে হত। আসলে বাবন ছোটদের খুবই ভালবাসত—স্নেহ করত। সেই সময়ে—আমার

বন্ধুরা সবাই বাবনকে খুবই কাছে পেয়েছি। বিকেলে হলেই আমাদের ওয়েডার বার্ন রোডের বাড়ির সামনে সিঁড়িতে বসে বাবন আমাদের সবাইকে কত গল্প বলত। বাবন অনেক গল্প বলতে পারত আর আমরা, মানে, আমি আর আমার পাড়ার বন্ধুরা বাবনকে ঘিরে বসতাম আর বাবন আমাদের মনপসন্দ গল্প বলত আর আমাদের মতো করে মিশে যেত আমাদের মনের মধ্যে। পরে বুঝেছি—ছোটদের সঙ্গে মেশার সময়ে মনটাকে ঠিক ছোটদের মতোই নির্মল-সরল করে নিতে পারত বাবন। আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগল বাবন। আমাদের পাড়ায় তখন খুব টেনিস বলে ক্রিকেট খেলা হত। রোববার দিনে খেলা হত বেশি। কারণ, গাড়ি কম চলত। আমাদের আশপাশে বিখ্যাত ক্রিকেটাররা থাকত—গোপাল বসু, সুব্রত গুহ, রাজা মুখার্জি, দেবু মিত্র—এরা প্রায়ই খেলত—আমি ছোট হলেও খেলতাম—বাবন মাঝে মাঝে নেমে পড়ত খেলতে—খুব মজা হত—এদের দেখতে লোক ভিড় করত। আমাদের বাড়িতে খুব ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হত—তাতে সবাই আসত বাবনের গায়ক বন্ধুরা—তবে পাড়ার লোকেরা বোধহয় একজনের জন্যে অপেক্ষা করত—উত্তমকাকু—উত্তমকুমার—তিনি নিচের থেকে 'বউরানি'—বলে ডাক দিতেন আমার মাকে—ব্যস—সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার লোক-এ সারা বাড়ি সরগরম।

আমার অনেকদিনের শখ—রেকর্ডিং দেখতে যাব স্টুডিওতে—অনেক বায়না সহ্য করে একদিন বাবন আমাকে নিয়ে গেল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। আমি তো স্টুডিও দেখে মুগ্ধ—ওই বিশাল হল—এতজন মিউজিশিয়ান বাজাচ্ছে—বাবনের একটু দেরিই হল—কারণ, আরতিদি (আরতি মুখোপাধ্যায়) গান গাইছিল। বাবন আমাকে নিয়ে উত্তমকাকুর ড্রেসিং রুম-এ গেল—ওখানে ওরা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল—আমাকে জোর করে টোস্ট আর ওমলেট খাওয়াল উত্তমকাকু। ওরা কী বলছিল কিছুই বুঝছিলাম না। শুধু, উত্তমকাকু মাঝে মাঝে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করছিল—আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। খানিকক্ষণ পরে একজন এসে বাবনকে ডেকে নিয়ে গেল ফ্লোর-এ। বাবন গিয়ে একবার রিহার্সাল করল—একবার মনিটর করল সব মিউজিশিয়ানের সঙ্গে তারপর একবার গাইল, ব্যস হয়ে গেল রেকর্ডিং—আমি তো তাজ্জব! বাবন এরকমই ছিল—ওকে দেখল মনে হত গান গাওয়াটা বোধহয় পৃথিবীর সবথেকে সহজতম কাজ। বাবন বেরিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল—আসলে—তাড়াও ছিল —বাড়িতে গৌরীকাকু বসে ছিল —তার পরেরদিন পুজোয় গানের রেকর্ডিং। গাড়িতে আসার সময়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—উত্তমকাকু কেন ওরকম মুখভঙ্গি করছিল? বাবন বলেছিল—মেক-আপ করার পর যাতে মুখ-এর মাসলগুলো নমনীয় থাকে—ওটা তারই জন্য এক্সারসাইজ। কারণ, অভিনয় করতে গেলে মুখের মাসলগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি। তখন থেকেই ডেডিকেশন কথাটার অর্থ বুঝতে শুরু করেছিলাম।

বাড়িতে ফিরেই আর এক প্রস্থ নাটক। গৌরীকাকু নাকি অনেকক্ষণ বসে আছে—তাকে শান্ত করে বাবন আর গৌরীকাকু বসল দেড়তলার ঘরটায়—ঠিক ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে দু'টো গান লেখা এবং সুর করা কমপ্লিট। দু'জনেরই তাড়া—ওরা এরকমভাবেই গান তৈরি করত। সেই দুটো গান (১) ঝিরি ঝিরি বাতাস কাঁদে (২) তোমার ওই ধূপছায়া রং শাড়ির পাড়ে। পরের দিন রেকর্ডিং এইচএমভি স্টুডিওতে—সন্ধে ৬টাতে। শুরু হল—৮.৩০ মিঃ। দুটো গান রেকর্ডিং শেষ। এভাবেই গান তৈরি হওয়া আর শেষ হওয়া দেখতে দেখতে বড় হতে লাগলাম। বাবনের শৌখিনতা ছিল ভাল সুগন্ধি—Brut-Charlie আর Intimate —ভাল সিগারেট এবং দামি পানীয়—এগুলো সত্যিই প্রিয় ছিল তার। আর, জামাকাপড়ও পরত বেশ ভাল ভাল। পাঞ্জাবিগুলো ভবতোষ কাকু (Stylo) তৈরি করে দিত—বেশ সুন্দর দেখতে লাগত বাবনকে। ছোটখাট চেহারার মানুষ হলেও অসম্ভব ব্যক্তিত্ব ছিল। কম কথা বলত। যা পছন্দ করত না—সেটা এড়িয়ে চলতেই ভালবাসত—অকারণ কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত না। তবে, সবথেকে অপছন্দ করত কারও সম্বন্ধে সমালোচনা—বলত "সবার মধ্যেই কিছু ভাল গুণ আছে—খারাপটা আলোচনার কী প্রয়োজন?" —তবে, ভীষণই একরোখা ছিল—যেটা কথা সেটাই কাজ—মনে আছে—H.M.V তে recording হবে—Africa-র খরা নিয়ে একটা Album—অনেকেই গান তৈরি করেছে—বাবনও তৈরি করেছে-বাবন বলেছিল—প্রথম recording টা সেই করবে—Duet গান ছিল—হৈমন্তি শুক্লার সঙ্গে—কথা লিখেছিলেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সকালে যখন ঢুকল H.M.V. floor এ—তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনেকজনকে নিয়ে (chorus group) rehersal করছেন। বাবন তো কিছুতেই wait করবে না—চলে আসবেই। শেষে হেমন্ত জ্যেঠুকে সে কথা জানাতে—তিনি বললেন, "শ্যামল যখন চলে যাবে বলছে—ও সত্যিই চলে যাবে, ওকে floor ছেড়ে দাও"—বাবন তখন floor-এ ঢুকে এক chance এ recording করে আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে এল।

Bombay (অধুনা Mumbai) যখন regular যাতায়াত শুরু হল ১৯৭২ থেকে। তখন আমার নেশা ছিল plane দেখার। সপ্তাহে ১/২ বার তো যেতই Kolkata-Bombay-তখন VIP রোড-এর দু'পাশ একদম ফাঁকা। Airport- ভিতরে দোতলার Gallery থেকে plane ওড়া দেখে তারপর ফিরতাম। Shakti Samanta এসে উঠতেন Ritz Continental Hotel (যার নাম এখন — Peerless Hotel)-এ। সেখানে বসেই—'অমানুষ'-এর প্রথম দুটো গান final হয়— (১) জানি না আজ যে আপন (২) কী আশায় বাঁধি খেলাঘর। তারপর বাকি গানগুলো বম্বেতে বসে সুর তৈরি হয়। তখন বাবন bombay গিয়ে Linking Rd. এর উপর একটা Hotel-এ উঠত। 'অমানুষ' হিট হওয়ার পরে Bandra তে 14th Rd.-এ "Hemkund" building-এ আমাদের flat কেনা হয়। তখন Bombay-Kolkata যাতায়াত করতে করতে বাবনের খুব tight Schedule. এখানেও কাজ-Bombay তেও কাজ পরপর—Safed Jhooth (Basu Chatterjee), Mamta, বাংলা-হিন্দি ডবল-ভার্সান-বন্দি-আনন্দ আশ্রম, তার উপর আবার নিজে প্রোডাকশন শুরু করল (সঙ্গে মানিক দত্ত ছিলেন) 'অসমাপ্ত-কবিতা'। শর্মিলা ঠাকুর ছিলেন মেন লিড রোল-এ, ডিরেক্টর-বাসু ভট্টাচার্য —শর্মিলা ঠাকুর প্রেগন্যান্ট হয়ে যাওয়ায় শুটিং বন্ধ হয়ে গেল—মাঝে নানা ঝামেলা ইত্যাদিতে জর্জর-বাবন Bombay-র পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলে—আবার পুরোপুরি কলকাতায়।

বাবনের খুব প্রিয় আড্ডা মারার জায়গা ছিল — 'বসুশ্রী' সিনেমা হল-এ মন্টু কাকুর ঘর। তাসের নেশা ছিল প্রচণ্ড। একা একা তাস খেলত— মাঝে মাঝে ভবতোষ কাকুও আসত।

শেষের দিকে শরীরটা খুব খারাপ হতে লাগল। এরকম সময়ে হঠাৎই একদিন আমাকে একটা অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। আমি গাইলাম—বাবনের -সিনিয়াররা বললেন—'তোর ছেলে গান করে জানতাম না তো?' —বাবন হেসে বলল—'আমিও জানতাম না'। সেই আমার শুরু—তারপর কত বছর তো চলেছি—কিন্তু বাবন আর সশরীরে নেই— কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে—ওর সেই পারফিউম আর সিগারেট মেশানো অদ্ভুত গন্ধটা মাঝে মাঝে পাই—আর বুঝি বাবন এখনও আছে—চিরকাল থাকবে!



তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব

ইন্দ্রনীল সেন

এতদিন যা শিখেছি, যা দেখেছি, যা জেনেছি, যা শুনেছি তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। সব হিসাব-নিকাশ, সব ফর্মুলার বাইরে, সব কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি। কোনও তত্ত্ব-তথ্য বা আইনকানুনের উদাহরণ তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়।



আপাত দৃষ্টিতে রাশভারী প্রশাসক মনে হলেও আসলে তিনি শিশুর সারল্যে সবকিছুকে আপন করে নেন। আমি কোনও রাজনীতি বুঝি না, কৌটিল্যের কোনও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর জীবন-বেদকে ব্যাখ্যাও করি না। চোখে যা দেখছি, অন্তর দিয়ে যা উপলব্ধি করছি তারই মূল্যায়ন করে নিজের অসংখ্য পুরনো ধারণাকে বদলাতে বাধ্য হয়েছি। কারণ ব্যবহারিক জীবনে নানা কর্মসূচি এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বারে বারে তিনি প্রমাণ করে চলেছেন, সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠেই আজ জননেত্রী। তাই নির্দ্বিধায় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে গান গাওয়ার মতোই প্রাণের কথা বলছি, আমার দেখা সেরা মানবিক মানুষ— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আম জনতার দিদি। অনেকের চেয়ে অনেক পরে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ, পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার বৃত্তে প্রবেশ। কিন্তু এই অল্প সময়ে, পাহাড় থেকে সাগর, নানা সফরে বিভিন্ন মুহূর্তে অজস্র ঘটনার সাক্ষী থেকেছি আমি। কোনওটায় আবার ঘটনার ঘনত্বে নিজেই অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছি। চোখের সামনে দেখেছি, লালগড়ে ধানখেতের আদিবাসী শ্রমিকের সঙ্গে কীভাবে মুহূর্তে নিবিড় সম্পর্কের বাঁধনে বেধেছেন। একপলকে তাদের পরিবারের অভিভাবকের ভূমিকায় পৌঁছে গিয়েছেন। আবার সুন্দরবনের কুলপির গৃহহীন বিধবাকে জনতার ভিড় থেকে কাছে টেনে নিয়ে আশ্রয়ের ঠিকানা করে দিয়েছেন তিনি। কাছে আসতে যারা বাধা দিয়েছে তাদের কপালে জুটেছে বকুনি। বীরভূমের রাঙামাটির পথ ধরে চলতে চলতে তাঁর কাছে শুনেছি ছেলেবেলার দস্যিপনার নানা কথা। আচমকাই গাড়ি ঘুরিয়ে আমাদের নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন কুসুম্বায় মামা বাড়ির মাটির ঘরে। যেখানে আজও বন্দি হয়ে আছে তাঁর ছেলেবেলার অসংখ্য স্মৃতি-হাসি-কান্না ঘেরা মুহূর্ত। চোখের সামনে দেখেছি সেই পুরনো বাড়ির মাটির আনাচে-কানাচে কীভাবে খুঁজে ফিরেছেন নিজের ছেলেবেলাকে, গ্রামবাংলাকে। বলতে দ্বিধা নেই, এই কারণে বাংলার অনেকের চেয়ে মা-মাটি-মানুষের কথা-ব্যথা অনেক বেশি তিনি উপলব্ধি করেন।

অনেকে নানা রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং বিপ্লবী শব্দ বলে নিজেকে সাহসী ও শক্তিমান বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু খাতাকলমে, ব্যক্তিগত জীবনে তত্ত্বকথাকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে রূপ দিতে পারে না। চ্যালেঞ্জ ঠুকে বলছি, অগ্নিগর্ভ পাহাড়ে বাংলা দূরের কথা, দেশের কোনও রাজনৈতিক নেতা যাওয়ার সাহস দেখাতে পারতেন? দায়িত্ব নিয়ে বলছি, পারতেন না। কিন্তু উপমহাদেশের রাজনীতিতে একমেবাদ্বিতীয়ম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমাণ করে দিয়েছেন, একমাত্র তিনি পারেন। ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ কালিম্পংয়ের সভায় দাঁড়িয়ে শুধু নয়, এর আগে দার্জিলিংয়ের ম্যালেতে জিটিএর সভাতেও মোর্চা সমর্থকদের ধমকেও একমাত্র তিনিই বলতে পেরেছেন, গোর্খাল্যান্ড মানা হবে না। বাংলা অবিচ্ছেদ্য থাকবেই। বাঙালি হিসাবে তার এই সাহসিকতাকে সেলাম না জানিয়ে পারা যায়?

নিজে সুর-ছন্দ নিয়ে কাজ করি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে অবাক হয়ে দেখছি, উপলব্ধি করছি, রাজনীতি না করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী হতে পারতেন। হতে পারতেন, দেশের অন্যতম চিত্রশিল্পী। গানের কথা পরে বলছি। আগে বলি, মাত্র পাঁচ মিনিটে একটা তুলি আর দুটো রঙের মিশেলে কী অপূর্ব সমস্ত ছবি এঁকে ফেলেন। সরকারি প্রশাসনের সিরিয়াস-মিটিংয়ের বিষয়ে কথা বলতে বলতেই কখন যে কলমের কয়েকটি টানেই সাদা কাগজে মনকাড়া নানা স্কেচ করে ফেলেন তার ইয়ত্তা নেই। অনেক সিনিয়র আইএএস অফিসারও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এমন অনেক দৃশ্যের এবং ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন। সকলকেই বলতে শুনেছি, দেশের অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাজ করলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মতো বহুমুখী প্রতিভা দেখেননি।

আমরা যারা গান গেয়ে বেড়াই, তাদের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যি ঈর্ষার। রীতিমতো কয়েকশো গান শুধু মুখস্ত নয়, অন্তরা-সুর-লয় মিলিয়ে উপস্থাপনাতেও তিনি অদ্বিতীয়া। রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে আধুনিক, অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রগীতি সবেতেই সে সমান সাবলীল। অনেকে দেখেছি নানা গানের প্রথম দু'লাইন অথবা পঙ্‌ক্তি গেয়েই থেমে যান। বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রী শুধু গান ধরেননি, পুরোটা শেষ করেছেন। অনেকে বিশ্বাস করবেন না, জীবন যখন শুকায়ে যায়... রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু করেছিলাম, দ্বিতীয় অন্তরায় গিয়ে আমি আটকে গিয়েছি, কিন্তু সঠিক সুরে গান শেষ করেছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। একই অভিজ্ঞতা হয়েছে, বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু বা ধনধান্য পুষ্পে ভরা... গানের ক্ষেত্রেও। আবার 'বাজলো তোমার আলোর বেণু' অথবা 'জাগো তুমি জাগো দুর্গা', জাগো দশপ্রহরণধারিণী' গানের পুরোটা এত সঠিক সুরে যে কেউ রেওয়াজ ছাড়াই গাইতে পারে তা না শুনলে বিশ্বাস করতাম না। আসলে একদিকে বাংলার প্রত্যেকটা গ্রামের জন্য অজস্র প্রকল্প ও পরিষেবা চালু, অন্যদিকে অবহেলিত, উপেক্ষিত রাজ্যের কৃষ্টিকে নতুন করে দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসের মধ্যে তিনি প্রমাণ করছেন, সত্যিই তিনি দশভুজা দুর্গা। এই দুর্গার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হল সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পূরণ।

আমি রাজনীতি বুঝি না। রাজনৈতিক মূল্যায়নও করার ক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা কোনওটাই আমার নেই। চোখের সামনে আমাদের প্রজন্মের একজন বিরলতম মানবিক মানুষকে দেখছি। তাঁকে নিয়ে একটাই গান গাইতে পারি—তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না।

ভ্রমণ

পর্যটকদের স্বর্গ বাংলা



কৃষ্ণকুমার দাস

ভারতভ্রমণে প্রতি দশজনের মধ্যে ছয়জন বাঙালি। আবার হিমালয়, বঙ্গোপসাগর, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ জঙ্গল ছাড়াও নয়ানাভিরাম মালভূমি এবং সুবে-বাংলার অজস্র ইতিহাস ছড়িয়ে আছে বাংলার জেলায় জেলায়।

কিন্তু বাংলায় পর্যটনের এত মণি-মাণিক্য-কোহিনুর থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর সরকারের পৃষ্টপোষকতার অভাবে পর্যটকদের চোখের আড়ালে থেকে গিয়েছে সবকিছু। অথচ স্রেফ কিছু দুর্গকে সম্বল করে রাজস্থান বা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কেরল পর্যটন-ব্যবসার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু পাহাড়-সাগর-জঙ্গল ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য থাকা সত্ত্বেও ভিনরাজ্য দূরের কথা, বাংলার ভ্রমণবিলাসীরা পৌঁছতে পারেননি পর্যটনক্ষেত্রে। কিন্তু পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই বাংলার পর্যটনের এই অবহেলিত-উপেক্ষিত দশা কাটছে। শুধু পুরনো পর্যটনক্ষেত্র নয়, তাজপুর, গাজলডোবা, তাকদহ, লামাহাটা ছাড়াও সুন্দরবনের বেশ কয়েকটি নতুন স্পট পর্যটকদের কাছে উপহার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জলপথে কলকাতা থেকে বেলুড়, আকাশপথে মহানগর দেখার নতুন পরিষেবা চালু হয়েছে পরিবর্তনের সরকারের উদ্যোগে। কোচবিহার, দুর্গাপুর, শান্তিনিকেতন, দিঘা থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনক্ষেত্রেই পৌঁছনোর জন্য হেলিকপ্টার পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি তথ্য উল্লেখ করে স্পষ্ট হয়ে যাবে, গত দু'বছরের মা-মাটি-মানুষের সরকারের পর্যটনক্ষেত্রের সাফল্য। তথ্য হল, ২০১২-১৩ সালে দেশের মধ্যে সর্বাধিক বিদেশি পর্যটক এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে। শুধুমাত্র দার্জিলিংয়েই এপ্রিল-মে মাসে হাজির ছিলেন চার লাখ বিদেশি পর্যটক, এর মধ্যে একটা বড় সংখ্যায় বাংলাদেশ তথা সার্কগোষ্ঠীভুক্ত দেশ থেকে এসেছিলেন।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭১৬০ ফুট উচুতে পশ্চিমবাংলার শিরে কোহিনুর হয়ে বছরের পর বছর শোভা পাচ্ছে দার্জিলিং। মেঘেরা এখানে কানে কানে কথা বলে। জানলা দিয়ে মেঘ ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতরে। চিরহরিৎ অরণ্যে মোড়া বিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘা সারাবছরই বরফে মোড়া থাকে। আর সেই কারণে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা অপরূপা-অনন্যা শৈলরাণীর টানে ছুটে আসেন বারে বারে। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর 'আবিষ্কার' করা লামাহাটা ও তাকদহ। বৃষ্টির সময়ে প্রকৃতি আরও মোহময়ী হয়ে ধরা দিয়েছে এই দুই নয়া পর্যটনকেন্দ্রে। রডোডেনড্রন ও ম্যাগনেলিয়া ফুলেরা মধুময় করে তুলেছিল চারপাশ। বস্তুত এই কারণে মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের দুই পর্যটনক্ষেত্রে হাজার হাজার পর্যটক এসেছেন। কালিম্পং-কার্শিয়াং-মিরিককে যে আগামী দিনে ওই দুই পর্যটন ক্ষেত্রের কাছে জনপ্রিয়তায় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে তা বলাই বাহুল্য। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাকদহ-লামাহাটায় পর্যটকদের



ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বর্ধমানের পাঞ্চেতবাঁধের কাছে সংরক্ষিত বন গড়পঞ্চকোট।

থাকা ও খাওয়ার জন্য নানা পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। পরিবহন-পরিকাঠামোও ঢেলে সাজানো হয়েছে।

জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের গাজলডোবার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। সেখানেও পরিবর্তনের সরকার শুধুমাত্র ভ্রমণ-বিলাসীদের জন্য নতুন ঠিকানা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, পর্যটকাবাস ও পরিবহন পরিকাঠামো সাজিয়ে দিয়েছে। বস্তুত এই কারণে ডুয়ার্সের গরুমারা, চাপড়ামারির পাশাপাশি এখন পর্যটকদের মুখে মুখে ফিরছে মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের গাজলডোবা। গাজলডোবায় ঘন সবুজ গহীন অরণ্যের মধ্যে আপন মনে ঘুড়ে বেরায় বন্য হাতি, বাইসন, হরিণের দল। পর্যটক বাংলোয়ে শুয়ে ভোরের ঘুম ভাঙে বনটিয়া, ময়না, তিতির, বনমোরগের ডাকে। চেনা-অচেনা পাখি এবং নানা বন্যপ্রাণীর চলাফেরায় গাজলডোবায় এক নতুন গা-ছমছম অস্তিত্বে জানান দেয়। চা-বাগানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে সবুজ অরণ্যের হাতছানিতে ঘেরা মংপং-ও পর্যটকদের কাছে রীতিমতো স্বর্গ। কারণ মংপংয়ের পশ্চিমে সিভোক পাহাড়, উত্তর ও পূর্বে মালভূমিজুড়ে গহন অরণ্য। দক্ষিণে অন্তহীন নীল আকাশ। করোনেশন ব্রিজ দিয়ে তিস্তা পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই পড়বে মংপং। চলার পথে দেখে নিতে হবে গরুমারা অভয়ারণ্য। পরিবর্তনের সরকার দায়িত্বে আসার পরেই জাতীয় উদ্যান হিসেবেই স্বীকৃতি পাওয়া গরুমারা ২০১২ সালে দেশের সেরা অভয়ারণ্যের শিরোপা পেয়েছে। প্রায় ৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই অভয়ারণ্যে আপাতত একশৃঙ্গ গণ্ডার, বন্য হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ ছাড়াও সম্বর উপজাতি অসংখ্য হরিণের লীলাভূমি। পাশের মূর্তি নদী এবং রায়ডাকের পাড় ধরে এগিয়ে গেলে দেখা মিলবে অসংখ্য বিরল প্রজাতির ময়ূর এবং পক্ষিকুলের। ময়ূরের কথা যখন উঠলই তখন পাশের চাপড়ামারি ফরেস্টের কথা বলতেই হবে। মূর্তি নদীর ধারে বন দফতরের চারটি কাঠের বাংলো আছে। আধুনিক নগর জীবনের পরিষেবা যেমন আছে তেমনই বন্য পরিবেশের আদিমতা ঘিরে রেখেছে গোটা এলাকাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, চাঁদনিরাতে এই বাংলোয় বসেই সামনের দিকে তাকিয়ে কুঁয়াশাহীন আকাশের গায়ে দেখতে পাওয়া যায় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে, রাতে মূর্তি নদীতে জল খেতে আসা নীল গাই এবং হাতির দলের দেখা পেতে পারেন পর্যটকরা। হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলতেই হবে, এই ডুয়ার্সের জঙ্গলের ভাঁজেভাঁজে বাস করেন ওরাও, মুণ্ডা ও রাজবংশীরা। পাশেই রয়েছে নয়নাভিরাম সামসিং, লাটাগুড়ির মতো পর্যটকপ্রিয় স্থান। নদী আর নির্জনতা মিলেমিশে এখানে গড়ে তুলেছে প্রকৃতির আরেক কাব্য কাহিনি।

উত্তরবঙ্গ থেকে নিচের দিকে নেমে এলে প্রথমেই থমকে যেতে হবে গৌড়বঙ্গের রাজধানী মালদহে। ইতিহাসের গৌড় ও পাণ্ডুয়া আজও নানা ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোঘল হারেমের অতি প্রিয় রেশমের বস্ত্র তৈরির প্রধান ক্ষেত্র মালদহ একসময় বণিক ইংরেজদেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আর সেই কারণেই সুবে-বাংলার মসনদে থাকা শাসকদের নানা স্থাপত্য আজও দেশ-



জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে গণ্ডারদের অবাধ বিচরণ।



দিঘার সমুদ্র আরও বেশি নীল।

বিদেশে পর্যটকদের কাছে সমান আকর্ষণীয়। কিন্তু বাম জমানায় সরকারি উদাসীনতায় আদিনা মসজিদ থেকে শুরু করে বারোদুয়ারি, দাখিল দরওয়াজা, কদমরসুল মসজিদ, ফিরোজ মিনার, লুকোচুরি গেট, একগম্বুজওয়ালা, চিকা মসজিদ উপেক্ষার জঙ্গলে ঢাকা পড়েছিল। অথচ স্থাপত্য কীর্তি, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং পর্যটক চাহিদায় কোনও অংশেই আগ্রা বা দিল্লির মোঘল স্থাপত্যের চেয়ে কম নয়। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির চেয়ে মালদহের সুলতানি আমলের স্থাপত্য কীর্তিগুলি বিশ্ব পর্যটনের মানচিত্রে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর সেই কারণে বর্তমানে রাজ্য সরকার তথা পর্যটনমন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু চৌধুরির আন্তরিক উদ্যোগে নতুনভাবে এই স্থাপত্যগুলি সংস্কার এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। আলো দিয়ে ঐতিহাসিক সৌধগুলি সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য একগুচ্ছ পরিষেবাও চালু করেছে সরকার। প্রত্যেকটি ইমারত ও স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সামনে বিশেষভাবে তুলে ধরার কাজ শুরু হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে কাজটি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করেছে পরিবর্তনের সরকার তা হল, মোটরগাড়ি নিয়ে অনায়াসে একটা সৌধ থেকে অন্য সৌধে পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে। এতদিন প্রত্যেকটি পর্যটন ক্ষেত্রে পৌঁছনোর জন্য রাস্তা এবং অন্যান্য পরিষেবা যথেষ্ট বেহাল ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিটি পর্যটন ক্ষেত্রে পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য 'ট্যুরিস্ট পুলিশ' নিয়োগ করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। একই ব্যবস্থা চালু হয়েছে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যে কোনও বাঙালি ইতিহাস সন্ধিচ্ছু পর্যটকের কাছে দু'-তিন দিন ঘোরার জন্য মালদহের মেহেদিপুর বা হাজারদুয়ারি অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্যাকেজ হয়ে উঠতে পারে। অথচ এতদিন ধরে শাসন ক্ষমতায় থেকেও বাম সরকার রাজ্যের এই সমস্ত ঐতিহাসিক ক্ষেত্রগুলিকে পর্যটকদের কাছে কোনওভাবে পৌঁছনোর উদ্যোগ নেয়নি। উল্টে, সুলতানি যুগের নানা স্থাপত্যের চারপাশে ওয়াকফ সম্পত্তি পার্টির কমরেডরা দখল করে নিয়েছে। বস্তুত, এই কারণে তৃণমূল সরকার দায়িত্বে আসার পরই একদিকে যেমন পর্যটকদের কাছে প্যাকেজ পৌঁছে দিচ্ছে, অন্যদিকে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বেদখল হয়ে যাওয়া স্থাপত্য-কীর্তির সম্পদগুলি উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে।

মালদহের রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন ঘিরে ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে গোটা এলাকা আবেগমথিত হয়েছিল। হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী সাকার মল্লিক আর দবির খান মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে এসে তমালবৃক্ষের নিচে বসে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সাকার ও দবির দীক্ষা গ্রহণের পর রূপ ও সনাতন নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই রামকেলি চত্বরে আজও রূপ-সনাতনের তৈরি করা মদনমোহন জিউয়ের মন্দির থেকে শুরু করে শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন অটুট। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ক'দিন আগেই সেখানে রামকেলির উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। লক্ষাধিক পর্যটক তথা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী এসেছিলেন সাতদিন ধরে চলা রামকেলি মেলায়। এই প্রথম শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিচিহ্নকে সামনে রেখে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল রাজ্য সরকার। একইভাবে নদিয়ার নবদ্বীপ, শান্তিপুর এবং মায়াপুরকে কেন্দ্র করেও বিদেশি পর্যটকদের কাছে বিশেষ প্যাকেজ

ট্যুর চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে মায়াপুরে ইতিমধ্যে ইস্কন মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিদেশিদের মধ্যে যে আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, তাকে বাংলার পর্যটনকেন্দ্রিক কর্মসংস্থানে কাজে লাগাতে চেয়েছে সরকার।

বাংলার এমন একটি ব্যতিক্রমী জেলা রয়েছে যেখানে শাক্ত এবং শৈব ধর্মের পাশাপাশি বৈষ্ণব ধর্মেরও তীর্থক্ষেত্র রয়েছে, আছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মভূমি। জেলাটির নাম রাঙামাটির দেশ বীরভূম। এমনিতেই শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে বাংলার গুরুত্ব অনেকখানি। কিন্তু সেই শান্তিনিকেতনের সার্বিক উন্নয়নে গত তিন দশক তো দূরের কথা, স্বাধীনতার পরেও তেমনভাবে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু হোটেল এবং গেস্ট হাউস তৈরি হলেও সার্বিকভাবে সরকার বা বিশ্বভারতীর তরফে পর্যটকদের জন্য বাড়তি কোনও উদ্যোন নেওয়া হয়নি। কিন্তু পরিবর্তনের সরকার দায়িত্বে আসার পর যুবকল্যাণ এবং পর্যটন দফতরের উদ্যোগে আলাদা করে দু'-দুটি বড়মাপের থাকার ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। ট্যুরিস্ট লজটির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শুরু হয়েছে। কিন্তু যে বিষয়টি প্রথমে বলতে শুরু করেছিলাম তা হল, শাক্ত-শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের তীর্থক্ষেত্রগুলির কথা। কঙ্কালিতলা, তারাপীঠ, অজয় নদের তীরে কেঁদুলি গ্রাম থেকে শুরু করে জয়দেবের মেলা সবই এই জেলায়। যে কোনও পর্যটক যদি সাতদিনের ট্যুরে বেরিয়ে পড়েন, তাহলে শুধুমাত্র বীরভূম জেলা ঘুরে শেষ করতে পারবেন না। বিশেষ করে গীতগোবিন্দের রচয়িতা কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেঁদুলি গ্রামের মেলাকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের বাউলদের যে জমায়েত এবং উৎসব চলে তা গোটা বিশ্বে বিরল। আর সেই কারণেই পরিবর্তনের সরকার দায়িত্বে আসার পরই কলকাতার গড়িয়া এবং বারাসত থেকে দু'টি বিশেষ বাসরুট চালু করেছে। যে বাসগুলি প্রত্যেকদিন সরাসরি শান্তিনিকেতন ও তারাপীঠ পৌঁছে যাচ্ছে। বিশেষ প্যাকেজ ট্যুরের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

দু'বছর আগে মালভূমি ঘেরা জঙ্গলমহলে যেখানে মাও-তাণ্ডবে আতঙ্ক ঘিরে থাকত, সেখানে এখন পর্যটকদের লীলাক্ষেত্র। বারুদের গন্ধ উধাও হয়েছে অযোধ্যা পাহাড়ের শাল-পিয়ালের জঙ্গলে। শিশু, বাঁশ, মিনজিরি, তুঁত, অর্জুন, শিমুল, শিরিষ গাছে ভর্তি প্রায় সাড়ে ছ'শো হেক্টর বিভূতিভূষণ বনপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে তিনশোর বেশি 'স্পটেড ডিয়ার' বাস করে। পড়ন্ত বিকেলে পাহাড়ের গায়ে গাছে ঠেস দিয়ে তৈরি কাঠের বাংলোয় বসে দেখা যায়, সোনা ঝরা মিঠে রোদে খেলে বেড়াচ্ছে হরিণের দল। গাছে গাছে বাঁদর, ডালে ডালে কাঠঠোকরা, নীলকণ্ঠ ছাড়াও অচেনা হাজারো পাখির কলকাকলি। পূর্ণিমা রাতে পারমাদান ফরেস্ট বাংলোর ছাদে বসে দেখতে পাওয়া যায় আরণ্যক শোভা। শুশুনিয়া পাহাড়ে ঝরনা এবং ঝিলিমিলির অপূর্ব সৌন্দর্য আজও টেনে নিয়ে যায় হাজারো পর্যটককে। মাও-তাণ্ডবে বাম জমানায় যেখানে পর্যটক তো দূরের কথা, স্থানীয় আদিবাসীদের বসবাস দুরুহ হয়ে উঠেছিল, সেখানে এখন ভ্রমণবিলাসীদের উৎসব। দীর্ঘদিন পর তাই জঙ্গলমহলের সমস্ত পর্যটন ক্ষেত্রেই একদিকে যেমন পর্যটকদের ভিড়, অন্যদিকে ফের হাজার হাজার স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্মসংস্থান শুরু হয়েছে। আসলে এটাই তো নিয়ম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্মৃতিসৌধকে ঘিরে যত বেশি পর্যটক আসবেন, ততই তো লাভবান হবেন স্থানীয় পরিবহন ও হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হাজারো স্থানীয় মানুষ।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে নেমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলতেন, দিঘা কেন গোয়া হবে না? নির্বাচনী ইস্তেহারেও একই কথা বলেছিলেন জননেত্রী। তাঁর এই ঘোষণা যে বাস্তবায়িত করা সম্ভব তা এখন শুধু নিজের রাজ্য বা দেশ নয়, বিদেশিদের কাছেও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। আসলে রেলমন্ত্রী হিসাবে হাওড়া ও শালিমার থেকে দিঘা যাওয়ার দু'টি ট্রেন চালু করে দিয়ে ইতিহাস তৈরি করে গিয়েছেন তিনি।



মন্দারমণির সাগরের বেলাভূমি।



সান্দাকফু-র স্বর্ণশিখর।

প্রতিদিন এই ট্রেনে চেপেই ৪০-৫০ টাকার মধ্যে দিঘায় পৌঁছে যাচ্ছেন সমুদ্রপ্রিয় পর্যটকরা। থাকার হোটেলে ভাড়াও অনেক কম। খুঁজে নিলে ৩৫০-৪০০ টাকায় দিঘায় খুব ভাল হোটেল পাওয়া যায়। তবে মুখ্যমন্ত্রী দিঘা-শঙ্করপুর ছাড়াও তাজপুর নামে আর একটি পর্যটকপ্রিয় সমুদ্রতট খুঁজে পেয়েছেন। দিঘা থেকে শঙ্করপুর-তাজপুর হয়ে মন্দারমণি যাওয়ার জন্য যে মেরিন ড্রাইভ তৈরির কাজে সরকার হাত দিয়েছে তা আগামিদিনে বিশ্ব পর্যটনে ল্যান্ডমার্ক হয়ে থাকবে। এর কারণ, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সরেজমিনে পর্যটনক্ষেত্রগুলি ঘুরে দেখেছেন, ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে সমস্যার গভীরে গিয়ে পর্যটকদের চাহিদা উপলব্ধি করেছেন ও তার সমাধান করেছেন।

আর বলতে দ্বিধা নেই, তাজপুরে ঝাউ ও কেয়ায় ছাওয়া সবুজের বনানী ঘেরা রুপোলি বালিয়াড়ি ভ্রমণবিলাসীদের কাছে আজ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাশের মন্দারমণির অপূর্ব সমুদ্রতটে বিদায়ী সূর্যের সোনালি দীপ্তি পর্যটকদের কাছে অতি লোভনীয়। বর্ণময় আলো-আঁধারিতে রুপোলি বালিয়াড়িতে বসে কাঁকড়া-চচ্চড়ি বা চিংড়ি মাছের চপ খেতে খেতে মনে গান আসবেই—কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা...।

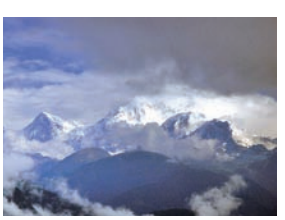

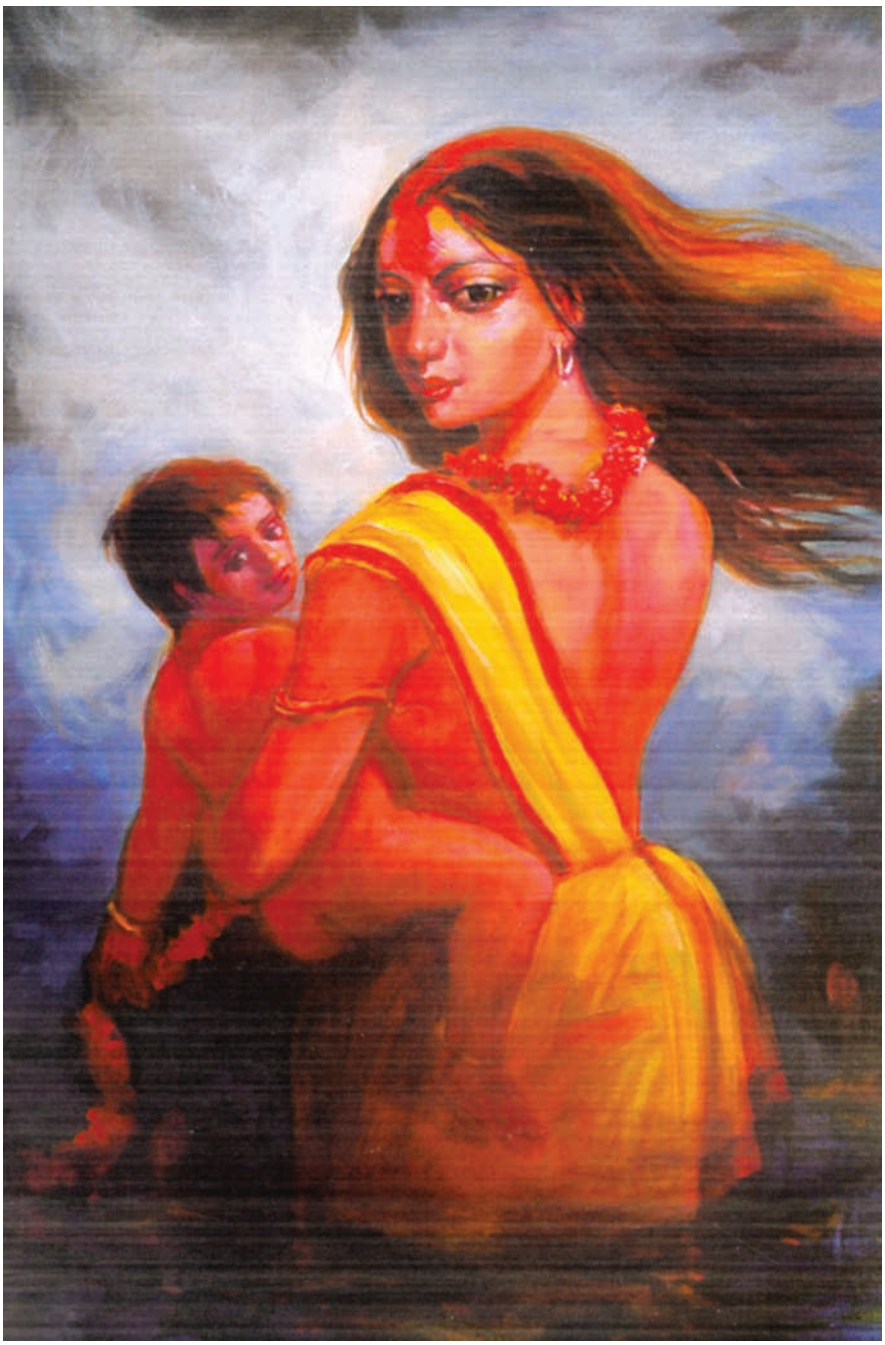

শিল্পী : সুশান্ত সরকার

সকাল-সন্ধ্যার বন্ধুরা

জয় গোস্বামী

সকাল

মোহর সামনের মাঠে খেলতে যায় ছুটির সকালে
চার বছরের ছেলে। মা-ও সঙ্গে যান।
অন্য কত ছেলেমেয়ে আসে।

আজ কেউ আসেনি।
কী হয়েছে তাতে? বলছে ঝুঁকে পড়া আমগাছের ডাল
মোহরের সঙ্গে খেলবে বলে
ঝকঝকে রোদ্দুর নিয়ে নিজেই তো এসেছে সকাল!



বন্ধুরা

ওই নামগুলো। ওই ওই
নামগুলো

গঙ্গার রাস্তাটা

ওই দুটো গাছ

আমাদের তিনজনের একসঙ্গে হাঁটা

এটুকুই। এর বেশি মনে নেই আর

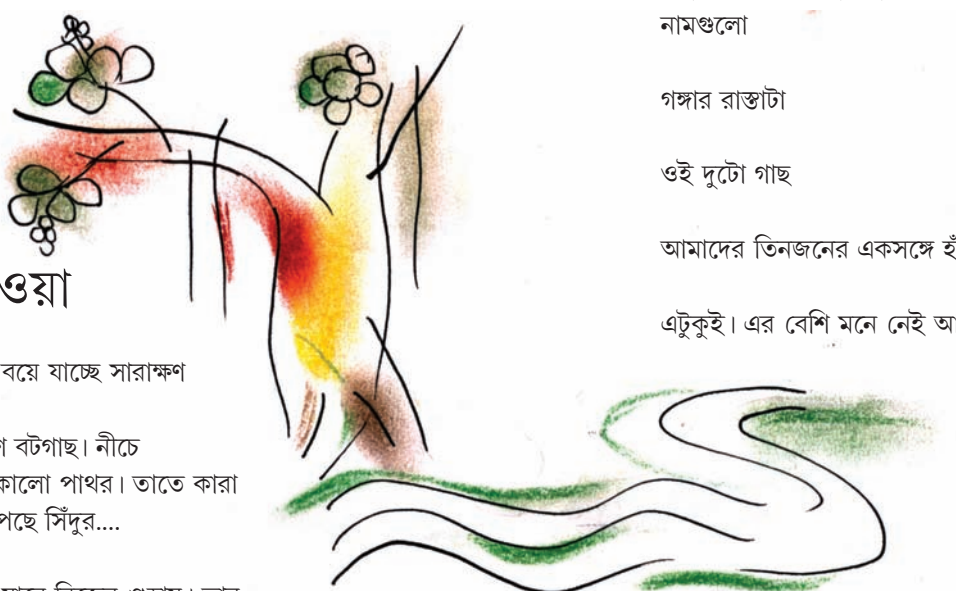

যাওয়া

জল বয়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ

পাশে বটগাছ। নীচে
মিশকালো পাথর। তাতে কারা
লেপেছে সিঁদুর....

জল যাবে নিজের গুহায়। তার
গুহা কতদূর?

গান



বন্ধু হে, গানের বন্ধু,
শ্রী রাগের গান ...

অল্পই আসেন—এলে

অবিরল জলের মতন

শান্তি দিয়ে যান



বই

আরো কী বলার আছে? ছায়াদের দেশ?

চোখে যা পড়ার ছিল তা কি সব পড়া হয়ে গেছে?

বই থেকে সুর আসে। সুরের কী স্বাদ?

আমি কি তোমাকে শুনতে পাবো, মিষ্ট ফল?

তবে বুঝি গানই সম্বল?

চন্দ্র অভিযান

ছাদে সে মাদুর পাতল। বড়ো হল চাঁদ

জলের ট্যাঙ্কের পাশে ফুটে আছে
ঝাপসা ঝাপসা তারা

মানুষ সমস্ত পারে। তাই
পেঁপে পাড়বার আঁকশি নিয়ে
উঁচু করে চাঁদে সে ঠেকায়

লাঠি ধরে সরাসরি উঠে যেতে থাকে

চাঁদে পৌঁছবার আগে রাত খুলে ভোর এসে যায়।



সম্মতি

আমার আর অভিযোগ নেই কারো প্রতি

গাছের বাঁকানো ডালে শান্তিতে বসেছে একটা কাক

আমি ওই শান্তিটুকু দেখে যাই : ওই বুঝি তোমার সম্মতি



আশীর্বাদ

প্রান্তরপুস্তক, তুমি আমার চোখের সামনে
এ মুহূর্তে প্রকাশিত হলে
তুমি তো রচিত হয়ে আছ
আমি মাত্র আজ দেখলাম।
আমার মাথায়, পাঞ্জাবিতে
উড়ে পড়ল দু'টো তিনটে পাতা
আমি জানি পাতা নয় এরা।
সেই লেখকের আশীর্বাদ—যার হাতে,
হে প্রান্তর, তোমারই মতন
বিশাল বিশাল এই গাছেরা রচিত!





অনুলেখক

বাতাস ঘরের পর্দা উড়িয়ে ঢুকতেই
বললাম নিজের হাতে কিছু লিখতে পারছি না এখন
আমি মুখে মুখে বলছি, তুমি লিখে দাও

বাতাস এক কথায় রাজি। লিখে দিল।
দিয়ে, সে বেরিয়ে গেছে ছাদে মেলা কাপড় উড়িয়ে

কিন্তু লেখা? লেখা কই? খাতায় তো একটা অক্ষরও
পড়ে নেই

খাতায় কী করে থাকবে? যা কিছু লেখার
বাতাস তো লিখে দিয়ে গেছে বাতাসেই....



বন্ধু

আমার ছোটোবেলার চন্দন বন্ধুটি
যে অকালে, মারা যায়
গ্লোব নার্সারিতে গিয়ে আজ দেখলাম
একটি চারাগাছ রূপে সে এখন জন্মেছে আবার
টবে একা দাঁড়িয়েছিল সে
হয়তো আমারই অপেক্ষায়

বাড়ি আনলাম
টব থেকে মাটিতে লাগাব

ওই তো সে আমার খাতায়

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ওরা কারা

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

ওরা কারা?
সন্ধের আগেই হাজির
সার বেঁধে চেয়ারে বসে পড়ে একে একে। ওরা কারা?
জ্ঞানের স্রোতে ভাসমান সমাজ
কেউ বা সাহিত্যিক কেউ আইন ব্যবসায়ী
আছে রাজনীতিক, শিল্পীও বাদ নেই, ওরা কারা?
বস্তিতে কান্নার রোল উঠলে বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে
জানলা
রক্তদানের মহত্ত্ব বোঝালেও
এক ফোঁটা রক্ত দেয়নি কোনোদিন।
অভুক্ত মানুষ দেখে, মনে মনে সমাজটা কেন এমন
সেই তত্ত্ব আওড়ায়
মৃত দরিদ্রকে শ্মশানে পৌঁছে দিতে প্রবল অনীহা
তবু এরাই নাকি সমাজপতি,
স্পষ্ট করে যদি বলি, এরাই নাকি সুশীল সমাজ



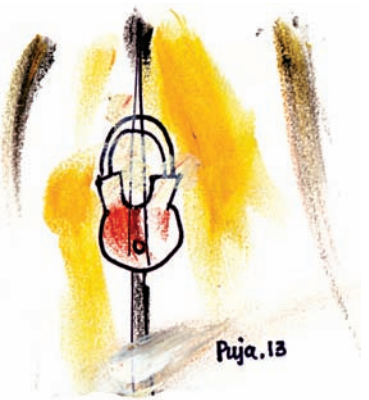

বন্‌ধ হোক বন্ধ

তপনদেব চট্টোপাধ্যায়

আর কতদিন
থাকবে হয়ে অন্ধ
বন্‌ধ করা খেলাটা
করো এবার বন্ধ
যে কারণে বন্‌ধ করা
কাজের কিছু হয় কি?
এতে দেশের ক্ষতি করা
সত্যি কথা নয় কি?
চাকুরেরা এই দিনটায়
কাটায় স্ফূর্তি করে
দিন আনে দিন খায় যারা
তারাই ভুখে মরে
প্রতিবাদের অনেক ধরন
সে সব তবু চলে
সকল কিছু স্তব্ধ করা
সইবো কি তাই বলে
আসুন সবাই বন্‌ধ করা
মানবো নাকো আর
সকল কিছু সচল রাখার
করি অঙ্গীকার
দেশের ক্ষতি গরিবের ক্ষতি
অশুভ এই আন্দোলন
বন্‌ধ বাবুরা বন্ধ করুন
জানাই আবেদন।

ফল

শ্যামলকান্তি দাশ

মাকে বললাম, মা, গাছে ফল পেকেছে!
খাও।

মা একদিন সময় করে সেই
সুমিষ্ট ফল খেলেন, আর
বীজগুলো ছুঁড়ে দিলেন
শূন্যে, আকাশে।
সেই স্বপ্নবীজ থেকে এখন
অনেক অনেক চারা জন্মেছে।
শাখাপ্রশাখার বেষ্টনী টের পাচ্ছি।
শক্ত হচ্ছে, জমাট বাঁধছে
বাংলার নরম মাটি।

আমরা চারাগুলো
জায়গামতো পুঁতে দিয়েছি।
গায়ে অপরূপের মিহি হাওয়া লাগছে।
আমরা প্রতিদিন টাটকা হচ্ছি,
গায়ে পায়ে নতুন ঢেউ লাগছে।

মা আনন্দিত মুখে একদিন দেখলেন,
আমাদের বসতি ক্রমশ নিবিড় হচ্ছে,
আলো হচ্ছে।





দু'টি কবিতা

অমিতাভ চক্রবর্তী

মেরা ভারত

মোচকে আছে অনেকদিন
অনেক পরীক্ষা, অনেক ওষুধ
মানত, কবচ, ঝাড়ফুঁক
কিছুতেই সুফল হল না
এবার কাটাছেঁড়া দরকার।

দর্শক

তুমি প্রতিবাদ চাও
মঞ্চ চাও, ভিড় চাও
নিচ্ছ মহড়া, নিপুণ পরিচালক
সফল উপস্থাপনা খোঁজো
তুমি নাটক চাও
আত্ম ভূমিকা বর্জিত।

সিংহকথা

মৃণালকান্তি দাশ

ঝকঝকে যত অস্তর নিয়ে
দশ-দশখানি হাতে
মণ্ডপে এসে দুগ্গাঠাকুর
দাঁড়ালেন মাঝরাতে।

অসুর ছিলেন ভয়ে-ভয়ে খুব,
ঘুম নেই তাঁর চোখে—
এমন সময় পাজি সিংহটা
লাফ দিয়ে যদি ঢোকে!

এলেন দু'বোন বই-টাকা নিয়ে,
দু'ভাই মানিকজোড়ে।
ময়ূর, ইঁদুর, হাঁস আর প্যাঁচা
চারপাশে এসে ঘোরে।

এইবার তবে সিংহ আসবে,
কেশর নাড়িয়ে তার—
দু'পা তুলে দেবে অসুরের বুকে,
আর সেই হুঙ্কার!

অবশেষে ভিতু বোকাসোকা মুখে
শিল্পী হরেন পাল,
বলেন, 'বাবুরা দিন যতখুশি
বিচ্ছিরি গালাগাল।

গড়তে পারিনি সিংহ এবার,
বয়সেও থুত্থুরে—
ভুলে গেছি মুখ, কোনকালে সেই
দেখেছি যে আলিপুরে!'





আমার কবিতা

দীপ মুখোপাধ্যায়

ঘরে বসে শুধু কবিতা লিখেছি
পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা
বই ছাপ হলে নিদেনপক্ষে
কম করে হতো বিশটা।
হাঁড়ি-কলসিতে নাক ঘষে ঘষে
খুঁজেছি মাটির গন্ধ
নিজেকে ভেবেছি রবীন্দ্রনাথ
অথবা জীবনানন্দ।
চিনল না কেউ এই প্রতিভাকে
নিন্দকে ভরা দেশটা
পাড়াপড়শীরা বলেছে থামাও
বৃথা এই অপচেষ্টা।
কবিতাকে আমি ভালবাসি বসে
ভাবনা রয়েছে অন্য
গর্তের নীচে পুঁতে রেখে দেব
ভবিষ্যতের জন্য।
আশাকরি আমি একদিন সব
পাঠকের হাতে ঘুরবে
কবিতা খুঁজতে সম্পাদকেরা
মন দিয়ে মাটি খুঁড়বে।

বদল

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পেরিয়ে এসেছি অনেকটা পথ
লড়াই, শুধুই লড়াই বুকে নিয়ে,
শানিত ছুরিতে গুলিতে লাঠিতে
কতো নির্দোষ প্রাণ চলে গেছে বয়ে।

তবু থামেনি বদল,
থমকে থাকেনি পরিবর্তন হাওয়া,
চোখে সবুজের স্বপ্ন সাজিয়ে
বাধা ভেঙে ছুটে যাওয়া,
কিছুই থমকে থাকেনি।
প্রায় তিন যুগ
শোষণে পিড়ল দুঃস্বপ্নের মতো,
আমজনতার হাড় পাঁজরায়
আজও সেই পোড়া ক্ষত,
তবু পেরিয়ে এসেছি।
হায়নার মতো হার্মাদ
আর আগুন ধোঁয়ার পথ,
পেছনে ফেলেই এগিয়ে, চলেছে
পরিবর্তন রথ,
অনেক এগিয়ে এসেছি।
সেই রথে শুধু শান্তির ধ্বজা
সারথি মানুষ ভাই,
সবার লক্ষ্য একটাই
শুধু 'পরিবর্তন চাই'
আজ সেটাই হয়েছে।
এখনও সেসব রক্তের দাগ
ধুলোয় কাদায় ঘাসে,

বাঁশের খুঁটিতে মাটির দাওয়ায়
লেগে আছে ধানক্ষেতে,
চলো সামনে তাকাই।
বদলে গিয়েছে দিন
অসহায় যত মানুষের বুকে
আজ খুশি রিনরিন,
সব বদলে গিয়েছে।
বিজয়া দশমী খ্রিসমাস
আর শিউলি ফোটার গান,
মিলেমিশে সব এক হয়ে গেছে
পবিত্র রমজান।
শুধু পরিবর্তনে।

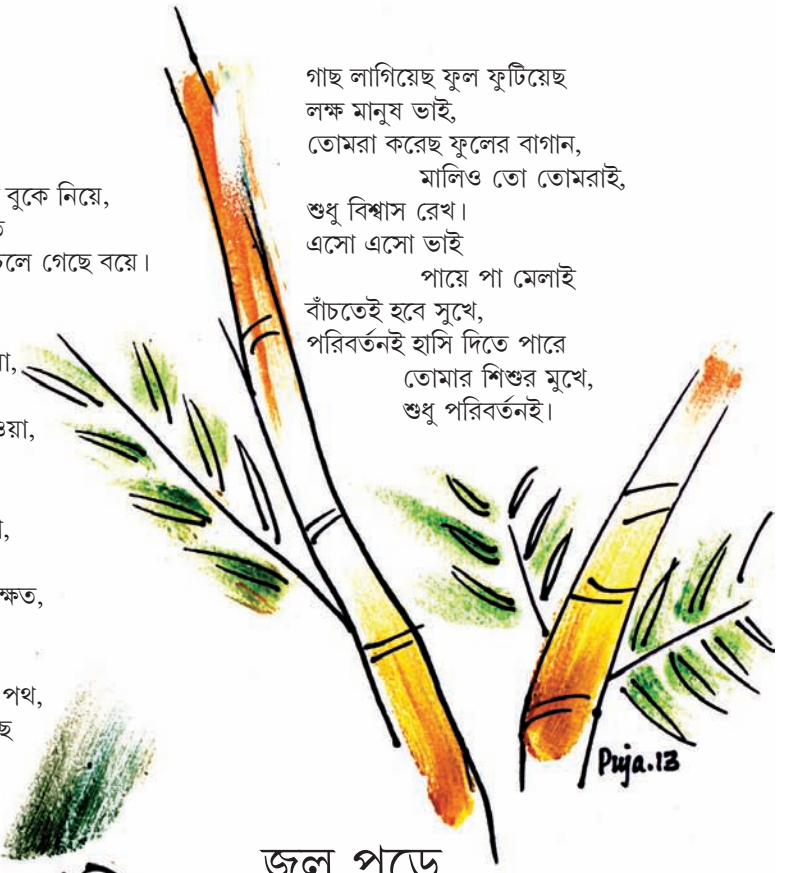

গাছ লাগিয়েছ ফুল ফুটিয়েছ
লক্ষ মানুষ ভাই,
তোমরা করেছ ফুলের বাগান,
মালিও তো তোমরাই,
শুধু বিশ্বাস রেখ।
এসো এসো ভাই
পায়ে পা মেলাই
বাঁচতেই হবে সুখে,
পরিবর্তনই হাসি দিতে পারে
তোমার শিশুর মুখে,
শুধু পরিবর্তনই।



জল পড়ে

শংকর চক্রবর্তী

উবু হয়ে সম্পর্কের ছায়া দেখি পুকুরের জলে
পছন্দ না হলে জল নড়ে যায় তা-ও দেখি রোজ
টলটল করে হাসছিল
রোদের ঝিলিক কিংবা চাঁদ বিলাসীর দুঃখী গানে—
এখন অনেকদিন পর
আকাশে ডাকছে মেঘ বাদলধারায়
সব খালিজুলি উপচে ভাসছে
কারো রেলিঙের শাড়ি ভেজা কলাবতী ফুলে
লেপ্টে আছে দুপুর-সন্ধ্যায়
পুকুরের জল বুঝি আর স্থির থাকে না তেমন
আজীবন ছায়া পড়ে থাকে মেঘ যায় উড়ে উড়ে
তবুও বৃষ্টির জল টুপটাপ ঝরে অবিরাম
সুরু বাঁশপাতা দিয়ে পুকুরের জলে
শুধু জল পড়ে পাতা নড়ে না কখনও।



বাউল মন

চন্দন রায়

আমার বাউল মন
কোথায় কখন
হারিয়ে যে যায়
বড়ো সঙ্গোপন

তোমার রোজকার হিসেবে আমায় বেঁধো না
আমার জন্য ভেবে ভেবে আর কেঁদো না
কী করে বোঝাই তোমায়
বাস্তবে আর কল্পনায়
মিলেমিশে আজ সব একাকার
নিশি ডেকে যায় চেতনায়
সারাক্ষণ ....

অর্থ, রাজপাট, রং-মলাট আমি বুঝি না
জালনা খোলা মন, তাই তো বন্ধন খুঁজি না
তোমারও কি মন হারায়
আলোকিত স্বপ্নের পাড়ায়
এসো তবে আনন্দে আজ
হারিয়ে যাই মিলে দু'জনায়
হোক না এমন...

আমন্ত্রণ নদীকে

অনীশ ঘোষ

বৃষ্টিদিনে মেঘের গায়ে
লেগে থাকা ঘোর
তুই কি তাতে মজে থাকিস
মন খারাপ হয় তোর?

তবে চলে আসতে পারিস
হৃদয়পুরের মাঠে
ওইখানেতেই বর্ষামুখর
অবাধ বিকেল কাটে।

একটিবার জলের সাথে
বন্ধু বাতাস যদি
দেখবি কত মনের মানুষ
গোটা একটা নদী—

নদীর জীবন যাযাবরের
নানান দেশে বাস
কেমন হবে তুই যদি
নদীই হয়ে যাস!

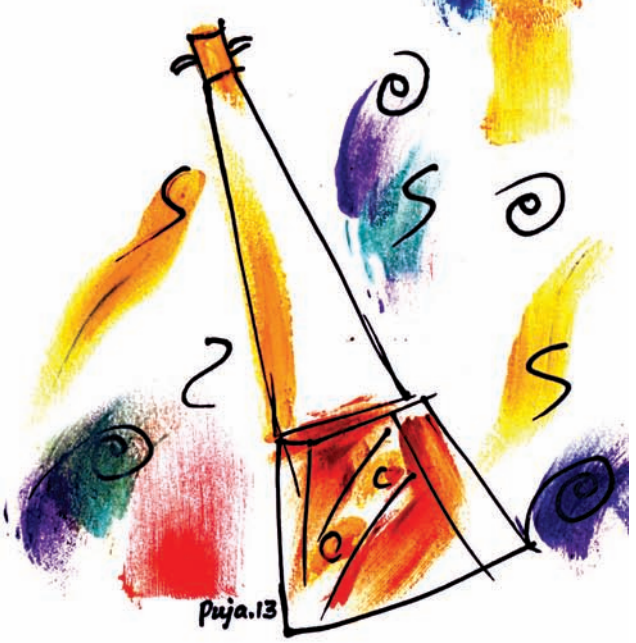

বেঁচে থাকাটাই বিদ্রোহ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

নিঃস্বের নেই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কোনো মোহ,
বেঁচে থাকাটাই তার কাছে এক বিদ্রোহ;
প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের সাথে লড়াই
করে পা, এগনো; সংসার জুড়ে দিনান্তে
পান্তা ফুরোয় যাদের, তারা কি
অসময়ে ঋতু বসন্তের
অপেক্ষা করে ফুলের নেশায়?
শীত বা গ্রীষ্মে বর্ষা তার
ঘরে বসে কাটে? কেউই রাখে না প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার।
সব সাধনাই নিরর্থক।
পথের ডাকেই সাড়া দেয়, ভাবে—যা হয় হোক।
খুদেদের মুখ, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তারা চেয়ে আছে তার দিকে।
নেই নেই, শুধু হাহাকার শুনে শুনে আছি আজো
ঠিক টিকে।

ঈশ্বর নেই, থাকলেও তিনি বোবা কালা, আর অন্ধজন
হয়তো তিনিও; অসহায় ভাবে নিরীক্ষণ
করেন, কিছুই নেই করার।
জন্মের পরে রোগ শোক নিয়ে ব্যস্ত জীবন,
শেষে জরার
হাত ধরে করা মৃত্যুর দেশে যাত্রা; কেউ
এর বেশি
পেতেও পারেন, না পেলে ভিখারি, নিঃসম্বল সন্ন্যেসী।

এর বেশি যদি যেতে চাও, হও জীবনভর
প্রতিদ্বন্দ্বী, যোদ্ধা, যুদ্ধ নিরন্তর
নিজের সঙ্গে নিজের, কখনো বন্ধুর বেশে শত্রুকে
চিনে নাও, খুঁজে পাবেও কখনো
কোথাও পরম বন্ধুকে।
চিনে নাও পথ, কোন পথে রথ চলেছে
চলবে, সেই মতো
জীবনটা হোক ততদিন ধরে চলমান রথ অন্তত।





খিদে

বীথি চট্টোপাধ্যায়

ক্ষুধার্ত নদী পাগলের মতো এসে
যদি ঢুকে পড়ে আমার গরিব দেশে,
ভাঙাচোরা মুখে চোখ মোছে এক বুড়ো
তার ছোট ধাবা স্রোতে ডুবে গেছে পুরো।
বাচ্চাটা একা ঘুরছে জানেনা তার
মা-বাবার কোনো চিহ্ন নেই আর।
কাউকে নিজের মায়ের মতোন ভেবে
আঁচল টানছে ভাবছে খাবার দেবে।
খাবার কে দেবে? প্রত্যেকে মৃত্যুকে
দেখতে পাচ্ছে যে যার নিজের বুকে।
ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে নিজের মনিব কে সে
কোথায় খুঁজবে, এমন জটিল দেশে?
বিভেদ উঠিয়ে মন্দির-মসজিদে
নদীর স্রোতের মতোই ফুঁসছে খিদে...

মৃত্যু-আততায়ী

সমরেন্দ্র দাস

ভোর থেকে রাত—এ বড় অদ্ভুত মহাভয়
বুকের ভিতর বসে থাকে জগদ্দল পাথরের মতো
তবুও লাইনের পর লাইন মাথায় উঁকি মারে
এতকালের পুরনো অভ্যেস পিছু ছাড়ে না
বকুলবাগানের পোড়োঘরে ওই চাঁদের আলো
জ্যোৎস্না-ছায়ায় মৃত্যুদূত ভয়ে দেখায়
পাশ দিয়ে চলে যায় আপন খেয়ালে মানুষজন
রাস্তাজুড়ে যানবাহনের শব্দ, ভাষা স্তব্ধ—
মাথাভর্তি ভয়, ভয়, মহাভয় ঠেলা দেয়
হঠাৎ বন্ধ দরজা খুলে যায়, দরজার ওপাশে নয়াপথ!

আমার পৃথিবীর ভাঙাচোরা মনকে জাগায়
ভয়কে জয় করার মন্ত্র উচ্চারণ করি আপনমনে!

সময়ের আগে

অনিতা বসু

বুকের মধ্যে ছিল যার
খোলামেলা আকাশ
তার কথা মনে পড়ে তোমাদের?
যে সকলকে আপন করতে
পারত মুহূর্তে।
সে নিজে পায়নি কিছু।
তাকে তোমরা দাওনি কিছু।
যার বুকে ছিল এক আকাশ ভালবাসা
ছল চাতুরি হিংসা সেখানে
কোনোদিন দাগ বসায়নি।

পৃথিবী তাকে বাধ্য করেছিল
চলে যেতে
সময়ের আগে।
যে ছিল সত্যিকারের ভালোমানুষ
একবার ভাববে তার কথা?
যে চলে গেছে।
যার মৃত্যুতে তার কিশোর ছেলে
বাধ্য হয়েছিল অকালে যুবক হতে
একবার ভাববে তার কথা।

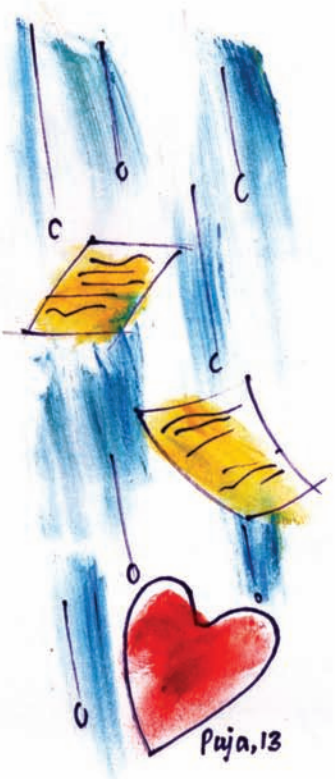



দু'টি কবিতা

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

জলে ভেজা প্রেমপত্রগুলো

জলে ভেজা
তোমার সেইসব প্রেমপত্রগুলো
বহুদিন পরে
আজ আবার খুলেছি

দেখছি
সবটাই আজ
কেমন যেন দুর্বোধ্য
অস্পষ্ট
লেখাগুলো সব

ধুয়ে মুছে সাদা হয়ে গেছে
ভালবাসার চিঠিতে
এখন শুধু বৃষ্টি বৃষ্টি গন্ধ।

সরে যায়

এক ঘেয়ে যাপনের কোণায়

রাগমালা ঝরে পড়ার
ফাঁক দিয়ে
অনুরাগের নতুন বাতাস
নিশ্চুপে কাছে এসে
জড়িয়ে ধরায়
মাঝে মাঝে নতুনত্ব
পুরানো মেঘলান্ধকার সরায়
চাঁদ সিঁথির
মধ্যিখান দিয়ে
ললিত রেখার ঘ্রাণে
ঘ্রাত হওয়ায়

জড়ো হওয়া অবসাদ
যে সরে যায়।



কনসাস থেকো

ঐশানী কর

মিষ্টি কথার বৃষ্টি যেখানে
সেখানে একটু সাবধানি হয়ে মিশো,
শুধু মিষ্টি কথার।

কষ্ট পাবেই,
আর কিছু নয়
সইতে পারলে ভাল।
তুলোর মতো হৃদি তুলতুলে
এক আঁচড়েই
ক্ষতবিক্ষত লাল,

হোক না মিষ্টি
অনাসৃষ্টি সেইসব কথা
মানুষ ধরার জাল,

তুমি সাবধানে থেকো।
ঝাল নুন টক সব মাখামাখি
কষাটে কিংবা বিস্বাদও যদি হয়,

মিলে মিশে যাও
বেহিসেবি হও,
সেই আলাপন থাকবেই চিরকাল।
একটু Concious থেকে।



চন্দনকাঠের দিন

অদিতি বসু রায়

অজস্র মৃত্যু আমাকে ছোঁয় রোজ।
রাজপথে পাথরের গল্প দেখি—
গল্প লেখে শহরের অলিগলি।

আমার কোন ছায়া নেই আর।
নিমতলা ঘাটের পথ খড় ছড়ায়
কারা—?

আলোর কথা বলা না কেউ
কেউ পিঁড়ির আলপনায় মুগ্ধতা
নাম দেয় না।

আমাকে মৃত্যু জড়ায়—রোজ।



ফুল ফুটেছে

তুহিন সরকার

ফুল ফুটেছে গাছের ডালে
ফুল ফুটেছে পাতায়।
ফুল ফুটেছে সবার মনে
ফুল ফুটেছে ধরায়।

ফুল ফুটেছে আঁধার রাতে
ফুল ফুটেছে বেলায়।
বোল, ফুটেছে সবার মুখে
তাই, ফুল ফুটেছে এবার।



হৃদয়গাথা

রানা দাস



হৃদয়টাকে ছুঁতে চাই, মনের কথা পরে,
দেহের কোথায় হৃদয়পুর, জানতে ইচ্ছে করে।

হৃদয় কি চুরির জিনিস, (কিংবা) কাউকে দেবার মতো?
হৃদয় নিয়ে গল্প-কথা, শুনছি শত শত।

হৃদয় দিয়ে এত কিছু, হৃদয় দিয়েই কবিতা।
হৃদয় যখন যায় ভেঙে, মিথ্যে হয় সবই তা।

হৃদয় তবে বালির বাঁধ, হৃদয় তাসের ঘর।
আপন বলে যাকে জানি, তাকেই করে পর।



আলিঙ্গন

দেবব্রত দত্ত

গতকাল নদী বড় স্তিমিত ছিল, আজ
বড় বড় ঢেউয়ে উত্তাল। সারাটা কপাল-
চারদিক এত নিশ্চুপ যে ভেঙে পরা ঢেউয়ে
আলিঙ্গন শুধু বাকি থেকে যায়, হে তুচ্ছ আয়ু

তুমি তাকেই কুড়িয়ে নিয়ে যেও।

অঙ্কন : পূজা সরকার

দুই ছররা

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

বিড়াল

ভাতঘুম ভেঙে বলে মার্জার
লাইফটা হতে হবে লার্জার
স্পিড চাই তাই ফুলফোর্সে
ন্যাজ তুলে দৌড়ল জোরসে
চাঁদনিতে গিয়ে কেনে চার্জার





শিয়াল

বড় ছোট মেজ সব শিয়ালের এক রা
কোনটা যে বদ্যি, নাপিত বা স্যাকরা
আলাদা করা যে খুব মুশকিল
মাথাটাথা চুলকিয়ে খুশকি
কমারশিয়াল হলে চুকে যেত ফ্যাকরা

অঙ্কন : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

সুন্দরের মনখারাপ



শিল্পী : গুস্তাভ দোরে, ইলাস্ট্রেশন গারগান্টুয়া অ্যান্ড প্যান্টাগ্রুয়েল, ১৮৭৩

সুন্দরের ভক্ত সবাই। অসুন্দর বা কুশ্রী কোনও কিছুই আমাদের টানে না। বরং বিকর্ষিত করে। আমাদের চোখে সুন্দর মানেই যেন নিখুঁত। কিন্তু এর ব্যতিক্রম কি নেই? কুরূপের মধ্যেও তো পাতালছায়ার মতো নিহিত থাকতে পারে এমন এক সৌন্দর্য, যা স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত! লিখছেন

ভাস্কর লেট

সুন্দর মুখের জয় নাকি সর্বত্র।

লোকসমাজে, আমজনতার মাঝে এই 'ধারণা' যতই বদ্ধমূল হোক না কেন, কোথাও-না-কোথাও সংশয়ের একটা ছিপছিপে চারাগাছ নিশ্চয় ছিল, ছিল অন্যতর সৌন্দর্যের সংজ্ঞা, নইলে 'অন আগ্‌লিনেস' নামের একটা বই কদাচ লিখিত হত না।

'আগ্‌লি' শব্দটার কী বাংলা হতে পারে?

অ-সুন্দর? কুৎসিত, কদাকার, কদর্য? না কি আরও মন্থিত অর্থে—ভীতিপ্রদ, অরুচিকর, জঘন্য, এমনকী ঘৃণ্য?

প্রসঙ্গ ভেদে সব ক'টি শব্দই প্রয়োগযোগ্য।

তবে এই লেখায় 'আগ্‌লি' বলতে আমরা মূলত বেছে নেব 'কুরূপ' শব্দটাকে। কারণ, খুব সহজ। ওই যে শেষ অংশে 'রূপ' জড়িয়ে আছে! একমাত্র 'রূপ' দিয়েই তো কুরূপের 'নিউক্লিয়াস'-কে স্পর্শ করা সম্ভব। তা ছাড়া, উমবের্তো একো যেভাবে 'আগ্‌লিনেস'-এর স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন—সেখানে সুরূপ ও কুরূপের একটা তুল্যমূল্য বিশ্লেষণ এসেই যায়।

বলে রাখি, এই উমবের্তো একো ভদ্রলোক-ই 'অন আগ্‌লিনেস' বইটির রচয়িতা। প্রাজ্ঞ পণ্ডিত দরবারে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ধৃষ্টতার নামান্তর। কিন্তু এ অকিঞ্চিৎকর নিবন্ধটি তাঁদের চোখে পড়বে সে-নিশ্চয়তা কোথায়? তাই 'এখনও-নাম-শোনেননি' পাঠকদের কাছে এঁর সম্বন্ধে দু'-চার ছত্র মুখবন্ধ দিলে হয়তো সেটা নিপাতনে সিদ্ধ বলেই গণ্য হবে।

উমবের্তো একো মূলত একজন ইতালীয় ঔপন্যাসিক। 'দ্য নেম অফ দ্য রোজ' (১৯৮১ সালে প্রকাশিত), "ফুকো'স পেন্ডুলাম" (১৯৮৮), 'দ্য আইল্যান্ড অফ দ্য ডে বিফোর' (১৯৮৮), 'দ্য মিস্টিরিয়াস ফ্লেম অফ কুইন লোনা' (২০০৪), 'দ্য প্রাগ সেমেটরি' ওঁর প্রত্যেকটা উপন্যাস যেমন বিখ্যাত তেমনই বিপুল-পঠিত। কিন্তু শুধু ঔপন্যাসিক বলে দেগে দিলে একো-র বহুমুখী প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি একজন স্বনামধন্য

চিহ্নার্থ-তত্ত্ববিদ (সেমিওটিশিয়ান), বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও দর্শনবেত্তা। তাঁর লেখার পরতে-পরতে এসব মেধা-ঘরানার করছাপ মুদ্রিত হয়ে আছে।

আরও মজার কথা : ২০০৪ নাগাদ একো-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'অন বিউটি' বলে আরেকটি বৃহদায়তন বই, যার প্রতিপাদ্য ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সুন্দরের অধিষ্ঠান ও অভিব্যক্তি-কে ধাপে-ধাপে উন্মোচিত করা। এর তিন বছর পর, ২০০৭-এ ছাপা হয় আমাদের বর্তমান আলোচ্য 'অন আগ্‌লিনেস' বইটি, যার অনুসন্ধিৎসা ধাবিত হয়েছে প্রথম বইটির ঠিক উল্টো বাগে, অর্থাৎ : 'কুরূপ'-এর সন্দর্শন ও সন্দর্ভ রচনায়। আলো-অন্ধকার, সাদা-কালো'র মতো সুরূপ-কুরূপ'ও কার্যত একটি বিপরীতগামী ধারণা। একটিকে ঠিকঠাক না-চিনলে, না-বুঝলে অন্যটির মমার্থ অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং সেদিক থেকে থেকে ভাবলে 'অন আগ্‌লিনেস'-কে আমরা 'অন বিউটি'-র পরিবর্ধিত ও অপরিহার্য দ্বিতীয় খণ্ড বলতেই পারি।

দুই

যদি এমন হয়, জুপিটার-নেপচুন বা আরও বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনও গ্রহ-নক্ষত্র থেকে একটি সমঝদার প্রাণী ('এলিয়েন'-ও বলা যেতে পারে) আমাদের পৃথিবীতে আসে, এবং দ্যাখে যে, পাবলো পিকাসো-র চিত্রকলায় কিউবিক রীতিতে আঁকা যেসব ভাঙাচোরা নারী-মুখ রয়েছে, তাদের মর্তমানুষরা 'সুন্দর' বলছে, তা হলে সেই দূরাগত প্রাণীটির 'সৌন্দর্য' সম্বন্ধে কী মনোভাব তৈরি হবে? 'কুরূপ' বলতেই-বা সে কী বুঝবে? এবার, ধরা যাক, সেই প্রাণীটি লন্ডন বা প্যারিসের কোনও ফ্যাশন শো দেখতে গেল—সেখানে যেসব 'সুন্দরী'কে র‍্যাম্পে হাঁটতে দেখবে—তাদের দেখে, সে কি বেশ ধন্দে পড়ে যাবে না? সে কি ভাববে না : আরে, ভাঙাচোরা রেখার নারীমুখ-ও সুন্দর, আবার এরাও সুন্দর—দু'টো কী করে হয়? র‍্যাম্পের এই মহিলারা সুন্দর হলে পেন্টিংয়ের ওই সব নারীমুখ কীভাবে একই সঙ্গে 'সুরূপা' তকমা পেতে পারে?

তার পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া অত্যন্ত সংগত; যদি না তাকে 'দুই যোগ দুই চার' সমীকরণের ধাঁচায় এটা ধরিয়ে যায়, যে, দেশ-কাল ও ইতিহাসের জনজীবন অনুসারে 'সুরূপ' এবং 'কুরূপ'-এর 'কনসেপ্ট' বারবার বদলেছে। শুধু তাই নয়, সেই 'কনসেপ্ট'-এর কুঁড়িতে আরোপিত হয়েছে ভাল-মন্দের মূল্যমান।

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রেড্‌রিক নিৎসে-র মন্তব্য এ প্রসঙ্গে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, যাকে বলা যেতে পারে মনে রাখার মতো। তিনি বলেছিলেন : 'সুরূপ' শব্দটার মধ্যে মানুষ একপ্রকার উৎকর্ষের সন্ধান করে। সে অবচেতনেই ধরে নেয়, যা কিছু সুন্দর তা-ই নিখুঁত এবং সুন্দরের উপাসনা করার মাধ্যমে সে উত্তরোত্তর নিজেকেই যেন-বা ত্রুটিহীন ('পারফেক্ট') ভেবে নেয়। যে কোনও সুন্দর ও সুরূপের বৃত্তে নিজের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে লক্ষ করে। অন্য দিকে, 'আগ্‌লি' শব্দটা যেন ক্ষয় ও ধ্বংসের বিমূর্ত প্রতীক। যা কিছু 'কুরূপ', তা-ই কি অসহ্য, ক্লান্তিকর, এবং দীর্ণ-জীর্ণ নয়? তদুপরি 'আগ্‌লিনেস'-এর মধ্যে এক ধরনের ছন্নছাড়া ভীমরতি বোধও রয়েছে। আছে কুঁকড়ে যাওয়া মানসিকতা, ল্যাক অফ ফ্রিড্‌ম।

এবার প্রশ্ন : কেন কোনটা 'সুরূপ' এবং কী-কী কীজন্য 'কুরূপ' সেটা নির্ধারণ করবে কে? কীভাবে করবে? বলা বাহুল্য নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র একেক সময় একেকটা বিষয় ও বস্তুকে 'সুরূপ' বা 'কুরূপ' বলে ভেবে নিয়েছে। হাতেগরম উদাহরণ চাইলে আলোকিত ইউরোপের কথা বলা যেতে পারে, যার চোখে পুরো আফ্রিকা মহাদেশটাই 'আগলি'। অসুন্দর। কুশ্রী। কুরূপ।

এটা একটা বিচ্ছিন্ন উদাহরণ হল। সহজেবোধ্যও হল বটে। কিন্তু এর বাইরে তো আরও মানদণ্ড থাকতে পারে। থাকতে পারে অভিনিবেশ করার মতো বিবিধ 'অবজেক্ট' ও 'সাবজেক্ট', তাদের স্তরান্তর, সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের নাকগলানি, এমনকী, সাংস্কৃতিক ভেদ-বিভেদ। উমবের্তো একো জানিয়েছেন, এসব চিন্তা করে কুরূপের সর্বব্যাপী নন্দনতত্ত্ব রচনার উদ্যোগ প্রথম নিয়েছিলেন জার্মান দার্শনিক কার্ল রোজেনকার্ন্ট। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা 'এসথেটিক্‌স অফ আগ্‌লিনেস' বইটি। রোজেনকার্ন্ট দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সাধারণের চোখে 'কুরূপ' ও 'পাপ' দু'টি সমার্থক ধারণা।

কিন্তু আদতে তা না-হতেও পারে। একো-র মতে, কুরূপের মধ্যেও নিহিত থাকতে পারে এমন এক সৌন্দর্য, যা রূপহীনতার চিরায়ত ভাবনাকে স্বর্গীয় সুষমায় উত্তীর্ণ করতে সক্ষম। এবং সেটাকে প্রথাগত সৌন্দর্য-চেতনার আলোয় বিশ্লেষণ করতে গেলে হয়তো আখেরে ঠকতে হবে।

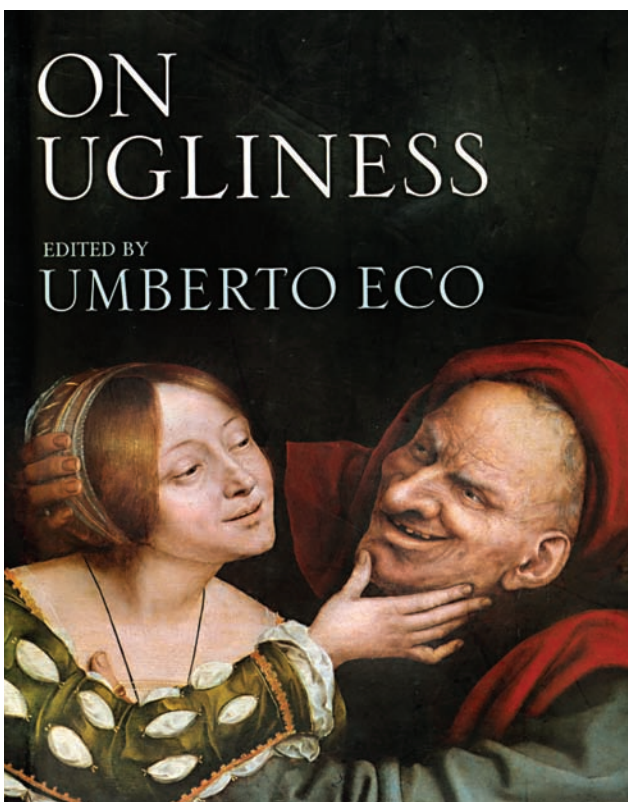

'অন আগলিনেস' বইয়ের প্রচ্ছদ

একো তাই বলেছেন : 'কুরূপ' বলতে যদি আমরা এক জাতীয় অসামঞ্জস্য, অসংগতি, খাপছাড়া বিকৃতি বুঝি; যদি ধরে নিই 'কুরূপ' মানেই দানবিক, নৃশংস, নিষ্ঠুর গোছের কিছু—তবু বলতে হবে, সেটারও একটা নন্দনতাত্ত্বিক ভিত্তি আছে, ব্যাকরণ আছে,



রাব্‌লে-র সমসাময়িক ডাচ চিত্রশিল্পী পিটার ব্রুয়েগেল-এর (দ্য এল্ডার) ছবিতেও সুন্দরের তির্যক ও ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনা আছে। পরম মমতায় তিনিও এঁকেছেন 'আগ্‌লিনেস'-কে।

আছে এমন কোনও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংকেত—যা তার উদ্ভব-বিকাশের কারণ।

তিন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে ঐতিহ্য ও লোকায়তিক আবেগের পরোয়া না-করে রাক্ষসরাজ রাবণকে গরিমান্বিত করেছিলেন। রাবণ-পুত্র মেঘনাথ-কে চিত্রিত করেছিলেন আত্মার আত্মীয় হিসেবে। আর 'ধীরোদাত্ত' রাম সেভাবে তাঁর মনের মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি।

যে-ফর্ম ও শৈলীতে 'মেঘনাদ বধ' লিখিত হয়েছে, তা অবিস্মরণীয়। ভাবনাটাও কি নয়? 'নায়ক' ও 'প্রতিনায়ক'-এর অবস্থান সম্পূর্ণ ঘুলিয়ে দিয়ে, 'প্রতিনায়ক'-কেই 'নায়ক' রূপে প্রতিপন্ন করা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরকম আকাশচুম্বী দুঃসাহস দেখানোর রসদ মধু-কবি সর্জন করেছিলেন গ্রিক ও রোমক সাহিত্যের পরাগরেণু থেকে। সেই সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁ-র জাগৃতি-মন্ত্রও তাঁকে ভীষণ উদ্দীপ্ত করেছিল প্রবহমান নিয়ম-নীতি, পরম্পরার নাগপাশ থেকে মানবসত্তাকে মুক্ত করে, তাকে রক্তমাংসের ধুকপুকুনি দিতে।

মধুসূদনের কথা এজন্য উল্লেখ করলাম, কারণ, কতকটা একইভাবে আরও একজন সাহিত্যিক দৈত্য-কে 'হিরো'-র মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর নাম ফ্রাঁসোয়া রাব্‌লে। ষোড়শ শতকের এই ফরাসি ঔপন্যাসিক-কে 'আধুনিক' উপন্যাসের অন্যতম 'ঋত্বিক' বলে ধরে নেওয়া হয়।

দুই দৈত্য বাপ-ছেলে, গারগান্টুয়া এবং প্যান্টাগ্রুয়েল, এঁদের জীবন ও কাহিনি নিয়ে রাব্‌লে লিখেছিলেন পাঁচ খণ্ডের মহাগ্রন্থ 'দ্য লাইফ অফ গারগান্টুয়া অ্যান্ড অফ প্যান্টাগ্রুয়েল'। ধরে নেওয়া হয়, ১৫৩২ নাগাদ প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম খণ্ড : 'দ্য হরিব্‌ল অ্যান্ড টেরিফায়িং ডিড্‌স অ্যান্ড ওয়ার্ড্‌স অফ দ্য ভেরি রিনাউন্ড প্যান্টাগ্রুয়েল কিং অফ দ্য ডিস্‌পোডেস, সন অফ দ্য গ্রেট জায়ান্ট গারগান্টুয়া'। এবং অন্তিম খণ্ড বেরিয়েছিল ১৫৬৪-তে : 'দ্য ফিফ্‌থ অ্যান্ড লাস্ট বুক অফ দ্য হিরোইক ডিড্‌স অ্যান্ড সেয়িংস অফ গুড প্যান্টাগ্রুয়েল'। মাঝের ২২ বছরে বেরিয়েছে আরও তিনটি খণ্ড। কিন্তু যেটা খেয়াল করার, প্রথম ও শেষ দু'টো নামের মধ্যেই এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, গারগান্টুয়া ও প্যান্টাগ্রুয়েল দু'জনেই দত্যিদানব, পাঁচজনের কাছে রীতিমতো বিভীষিকা, কিন্তু তবু তারা গ্রেট, মহান; সর্বোপরি তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ঝলসে ওঠে 'হিরোইক ডিড্‌স'। সেজন্যই এই বাপ-ব্যাটার থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা যায় না। মধুসূদনও তো কার্যত এমন প্রয়াসই নিয়েছিলেন। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ-কে তিনি স্মরণ করেছেন তাঁদের অমিত শক্তিমত্তার জন্য, নিদারুণ শৌর্য ও বীর্যের জন্য, ধ্বংস অনিবার্য জেনেও প্রতিকূল পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার দুর্নিবারণীয় ইচ্ছাশক্তির জন্য।

দুর্ভাগ্য, উমবের্তো একো আমাদের মধুসূদন দত্তের কথা হয়তো অবহিত নন। কিন্তু রাব্‌লে-র নাম জানেন। গারগান্টুয়া-প্যান্টাগ্রুয়েলের নামও। তাই 'অন আগ্‌লিনেস' বইয়ের ষোলোটি অধ্যায়ের একটি উপ-অধ্যায়েকে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন রেনেসাঁ পর্বের আলোচনায়। দেখাতে চেয়েছেন : নবজাগরণের আগ্নেয় প্রভাব কীভাবে শিল্পী ও কথাসাহিত্যিকদের প্রাণিত করেছিল ধরাবাঁধা সৌন্দর্যচেতনার বাইরে গিয়ে নতুন ভাব ও ভঙ্গিতে সুরূপ ও কুরূপের প্রতি আলোকপাত করতে। দৈত্যর চরিত্রকে মানবিক গুণ-দোষের ছটায় 'পারসোনিফাই' করা : এই তো নবজাগরণ।

পুনশ্চ :

আমাদের মুখমণ্ডলের মধ্যে ঠোঁট এবং নাক 'গ্রোটেস্ক ইমেজ' (মানে, বিদঘুটে ও কিম্ভূতকিমাকার অভিব্যক্তি) তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনিতে সবাই ভাবে, চোখ পাকালেই বুঝি খুব ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গি করা গেল—কিন্তু তা আসলে নয়। চোখ আমাদের অর্ন্তলোকের প্রতিভাস। ভেতরটা যদি ফোঁপড়া, শূন্যগর্ভও হয়, তাও প্রতিবিম্বিত হবে চোখে। ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকলে একটু অদ্ভুতদর্শন লাগে বটে, তবে ওই অবধিই। 'গ্রোটেস্ক ইমেজ' প্রতিপাদনে আসল ভূমিকা মুখবিবর ও নাকের।

এমনই মূল্যায়ন রুশ নন্দনতাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিনের। তিনি রাব্‌লে-র 'গারগান্টুয়া-প্যান্টাগ্রুয়েল সিরিজ' পড়ে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে 'দ্য ওয়ার্ক অফ রাব্‌লে অ্যান্ড পপুলার কালচার' নামে একটা গোটা বই-ই লিখে ফ্যালেন। রাব্‌লে-র লেখায় তিনি 'গ্রোটেস্ক রিয়ালিজ্‌ম'-এর চরম নমুনা খুঁজে পেয়েছিলেন, যা নিঃসন্দেহে এক ধরনের অভিনব 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'। একো লিখেছেন : 'In a society that had come to advocate the prevalence of the human and of the earthly over the devine, obscenity became the proud assertion of the rights of the body---and as such Rabelais was splendidly analysed by Bachtin.'

বাস্তবে আশেপাশের মানুষের যে-ধরনের চেহারা-ছবি দেখতে আমরা অভ্যস্ত, তার সঙ্গে খাপে-খাপ না মিললেই শরীরের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হল, তা কদর্য বলে বিজ্ঞাপিত হল—এ আবার কেমন কথা? গারগান্টুয়া-প্যান্টাগ্রুয়েলের খাপছাড়া বিপুল শরীর, যেমনই হোক, তারও একটা নিজস্বতা আছে, গর্ব ও দর্প আছে, এটাই স্বীকৃতি পেয়েছে রাব্‌লে-র লেখায়, মিখাইল বাখতিন এবং উমবের্তো একো-র শিল্পদৃষ্টিতে।

দূরালাপ

তারকাদের পুজো

ছোটপর্দার তারকারা এবার পুজো কে কীভাবে কাটাবেন তা নিয়েই অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন **ঐন্দ্রিলা বসু সিংহ**-র

অপরাজিতা আঢ্য



আমার পুজোটা এবার একটু অন্যরকম। এবছর আমি নিজের জন্য কোনও নতুন শাড়ি কিনিনি। আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, কিনব না। প্রত্যেক বছর পুজোর আগে একটা বড়সড় অঙ্কের টাকা খরচ করি সাজগোজ আর শাড়ির জন্য। এবার সেই টাকাটাই নিজের জন্য খরচ না করে পাঠাচ্ছি উত্তরাখণ্ডে ত্রাণের জন্য। ওখানে এখনও বহু মানুষ কষ্টে রয়েছেন। তাঁদের সাহায্য করছে একটা এনজিও। আর তারাই আমার সাহায্য পৌঁছে দেবে উত্তরাখণ্ডের দুর্গতদের কাছে। তা বলে নতুন শাড়ি পরা হবে না, এমন নয়। আমার আত্মীয়-বন্ধুরা অনেকেই আমাকে পুজোর সময় শাড়ি উপহার দেন। এবার আমি শুধু সেগুলোই পরব।

ওই চার দিন— চারটে দিন নানা পুজোর বিচারক হয়েই সময় কেটে যাবে। পুজো পরিক্রমা, বিচারের কাজ ছাড়া নানারকম শ্যুটিংও থাকবে হয়তো। সপ্তমীর মধ্যেই সে সব শেষ করে ফেলব। তারপর অষ্টমী-নবমী দশমী আনন্দ করব। তবে পুজোর সময় যা-ই করি পুজোর আগে টানা ২১ দিন চণ্ডীপাঠ মাস্ট। এটা আমি নিজেই করি। রোজ স্নান করে আমার গুরুদেবের ছবিতে প্রণাম করে চণ্ডীপাঠ শুরু করি। সকালের অনেকটা সময় ধরেই চলে এই পাঠ পর্ব, তারপর বাকি কাজ।

খাওয়াদাওয়া— খেতে তো দারুণ ভালবাসি। আর পুজোর সময়টা অন্যান্যবার যা খুশি খাই। বাড়িতে দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো দেদার খাই-দাই। কিন্তু এবার খুব দুঃখ। ডায়েট করতে হবে। না না, রোগা হওয়ার কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু, হাঁটুর ব্যথাটা এত জ্বালাচ্ছে যে আমার ডাক্তারই বলেছেন ডায়েট মেনটেন করতে। ওজন একটু না কমালে হাঁটুর ব্যথা আরও বাড়বে বলে ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন। অগত্যা এবার মেপে-জুপে..

সাহেব চট্টোপাধ্যায়



পুজোয় আমি নিজের পাড়াতেই থাকব। বালিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন আমার নিজের ক্লাব। ছোট্ট থেকেই ওই ক্লাবের সঙ্গে আমি যুক্ত। পুজোর সময় বাড়িতে কম আর পাড়ার মণ্ডপে বেশি থাকি। ওই চারটে দিন কোনও শ্যুটিং নয়, বাইরের অনুষ্ঠানও নয়— কিচ্ছু নিই না। শুধু পুজোর বিচারের কয়েকটা অনুষ্ঠান থাকে। সেগুলো সামলে বাকি সময়টা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, ঢাকের আওয়াজ আর পেটপুরে খাওয়াদাওয়া করেই কাটাব।

সাজগোজ— ষষ্ঠী থেকেই আমার পুজো শুরু। তবে নতুন জামা পরতেই হবে এমন কোনও ব্যাপার নেই। যেকোনও দিন আমার পাড়ার পুজোয় আসুন, আমাকে জিন্স আর পাঞ্জাবিতেই দেখতে পাবেন। সাধারণ ডেনিমের সঙ্গে কালো লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি আমার ফেভারিট। তবে সাদা শার্টও বেশ ভাল লাগে। পুজোর জন্য আলাদা শপিং কিছু করি না। তবে সবাই যা দেয় তাতে অনেকগুলোই হয়ে যায়। জমকালো কিছু সাজি না। অষ্টমী বা নবমীর দিন একবার ম্যাডক্স স্কোয়্যারে যাব। প্রত্যেকবারই যাই। বাড়ির সবাইকে নিয়ে। সেদিন হয়তো একটু ভাল পোশাক পরব। অন্যান্য দিন আমার প্রিয় পোশাকেই।

খাওয়াদাওয়া— পুজোর সময় খাওয়ার ব্যাপারে কোনও নিয়ম মানা বারণ। বিরিয়ানি খেতে আমি দারুণ ভালবাসি। পুজোর ক'দিন নানারকম বিরিয়ানি খাব। তাছাড়া স্ন্যাকস জাতীয় খাওয়াদাওয়াও চলতে থাকে। এর কোনও হিসাব থাকে না। আসলে আমাদের পুজোর মণ্ডপের চারপাশে প্রচুর খাওয়ার স্টল বসানো হয়। সেখানে নানারকম স্ন্যাকস তো থাকেই তার সঙ্গে বিরিয়ানি, চাইনিজ আর নানারকম মিষ্টিও থাকে। পেটপুরে খাওয়াদাওয়া করব ওইসব স্টলে।

বিশ্বনাথ বসু



বসিরহাট মহকুমায় আড়বালিয়া গ্রামে আমার আদিবাড়ি। সেখানেই হয় আমাদের দুর্গাপুজো। কম করে ৩০০ বছরের প্রাচীন এই পুজো। পুরনো বাড়ির পুজো বলতে যে যে ছবিগুলো আমাদের চোখের সামনে ভাসে তার সবক'টাই দেখা যায় আমাদের এই গ্রামের বাড়ির পুজোয়। বিশাল দালান, দুর্গাবেদি, মূর্তিগড়া, আত্মীয়স্বজনের ভিড়, পাত পেড়ে খাওয়া, বাড়ির সবাই মিলে কলাবউ স্নান করানো, সবই হয় আমাদের এই বাড়ির পুজোয়। তাই বছরভর আমরা যে যেখানেই থাকি পুজোর ক'টা দিন সব কিছু ফেলে ছুটে আসি এই গ্রামের বাড়িতে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে এই ক'টা দিনের জন্য আমি কী কী ছাড়তে পারি? তাহলে বলব অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, বিদেশে অনুষ্ঠান, বলিউডের ডিরেক্টরের দেওয়া শ্যুটিং ডেট—সব ছাড়তে পারি।

ওই চার দিন— আমাদের বাড়ির চারপাশে এক বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ১৭টি বাড়ির পুজো হয়। তাই ওই চারদিন গ্রামে থাকলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আমরা দুই ভাই মিলে পুজোটা করার চেষ্টা করি। ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনদের জড়ো করি। পুজো শেষে দশমীর দিন প্রতিমাকে কাঁধে করে নিয়ে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ইছামতী নদীতে বিসর্জন দিতে যাই।

সাজগোজ— আমার পুজোর সকালের সাজ একটাই। সিল্কের ধুতি আর জোড়। এই বিশেষ ধুতি আর জোড়টা দক্ষিণ ভারত থেকে আমায় এনে দিয়েছিলেন আমার শ্বশুরমশাই। আর বিকেলের সাজ বলতে আমি নিজে নিজের জন্য কিচ্ছু কেনাকাটা করি না। আমার স্ত্রী যা কিনে আনেন আমি পরে নিই।

খাওয়াদাওয়া— ওই ক'দিন দালানে বসে এক পংক্তিতে খাওয়া-দাওয়া হয় আমাদের। আমিষ-নিরামিষ সবরকম থাকে। সকালের জলখাবারে রোজ লুচি চাই-ই। তার সঙ্গে কোনও দিন কুমড়ো আলুর তরকারি, কোনওদিন ছোলার ডাল, সঙ্গে মিষ্টি। আর দুপুরে ভাত-ডাল-শুক্তোর সঙ্গে ভাজা, পুঁইশাক, আর এক-এক দিন এক-এক রকম মাছ। দশমীর দিনের স্পেশাল মেনু হল মাংস আর পায়েস।

শ্রীলেখা মিত্র

পুজোটা আসছে—এটা ভাবলেই বেশি ভাল লাগে। এসে গেলে আবার চলেও যায়। আমার কাছে পুজো মানে শপিং, একসঙ্গে আনন্দ করা, সাজগোজ, ভাল খাওয়া-দাওয়া সবকিছু। শরৎকালটা এলেই তাই মন ভাল হয়ে যায়।



ওই চার দিন— সপ্তমী পর্যন্ত নানারকম ইভেন্ট থাকে। অষ্টমীর সকাল থেকে দশমী পর্যন্ত আমি নিজের মতো পুজো কাটাই। আমাদের আবাসনের পুজোয় বাড়ির সবাই মিলে থাকি। একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটাই। অঞ্জলি দিই। সন্ধিপুজো দেখি। নবমীর দিন একটু বাইরে বেরোই। আর দশমীর দিন সিঁদুর খেলা বেশ ভাল লাগে। এবার অবশ্য দশমীর দিন কলকাতায় থাকব না। বাংলাদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা আছে।

সাজগোজ—পুজোর সময় সাজগোজ করব তো বটেই। তবে এখন থেকেই পরিকল্পনা করিনি। ওটা হয়তো যেদিন যে শাড়িটা পরব তখনই করব। শপিং অবশ্য নিজের মতো করে শুরু করে দিয়েছি অনেকটাই। এই তো সেদিনই একটা প্রদর্শনীর ওপেনিংয়ে গিয়েছিলাম। দু'টো শাড়ি খুব ভাল লেগে গেল। কিনে নিলাম। পুজোতেই পরব ওগুলো।

খাওয়াদাওয়া— খেতে তো ভাল লাগেই কিন্তু, ডায়েটের কথাটাও মাথায় রাখতে হয়। পুজোর সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যা খুশি তাই খেলে পরে খাটতেও হবে আমাকেই। তবে পুজোর সময় রেস্তোরাঁগুলোয় না যাওয়ারই চেষ্টা করি। বাড়িতেই নানারকম বানাই। আনিয়েও নিই।

বিদীপ্তা চক্রবর্তী



আমার পুজো শুরু হবে সপ্তমী থেকে। ষষ্ঠী পর্যন্ত শ্যুটিং চলবে। সপ্তমী-অষ্টমীর সকালে কয়েকটা পুজোর কমপিটিশনের বিচারের অনুষ্ঠান রয়েছে। সন্ধেগুলো ফাঁকা থাকব। আমার পাড়ার পুজোতে তো থাকবই। খুব ধুমধাম করে পুজো হয় আমাদের পাড়ায়। অষ্টমী-নবমীতে বেরবও একটু।

ওই চার দিন— পুজোর সময় বাড়িতে বসে থাকার কোনও প্ল্যান নেই। নয় পাড়ার মণ্ডপে। না হলে কলকাতার অন্যান্য মণ্ডপে। প্রচুর ঘুরব। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেব। আর পরিবারের সঙ্গেও খুব মজা করব।

সাজগোজ— আমার সাজগোজ বলতে হ্যান্ডলুম কটন আর সিল্কের নানারকম শাড়ি। সালোয়ারও পরি। তবে পুজোর সময়

শাড়ি পরতেই বেশি ভালবাসি। বেশ কয়েকটা হ্যান্ডলুম কটন শাড়ি কিনেছি। র-সিল্কের স্মার্ট শাড়িও কিনেছি ক'টা। গর্জাস ব্লাউজের সঙ্গে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে পরব ওগুলো। আর গয়নাগাটি বলতে আমি সিলভারের গয়না পরতে খুব ভালবাসি। যা আছে সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তো পরবই। নতুন কিছু কেনার ইচ্ছে আছে।

খাওয়াদাওয়া— পুজোর ক'দিন বাড়ির খাওয়া হয়ই না প্রায়। দু'একদিন সকালে হয়তো হবে। বাকিদিন বাইরেই হবে খাওয়া-দাওয়া। রেস্তোরাঁর খাওয়ার সঙ্গে একদিন দুপুরে ভোগ খাবই। ডায়েটের কথা মনে করলে চলবে না। পুজোর সময় অত ভেবেচিন্তে খাওয়া যায় না।

পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়



এবারের পুজোয় আমার প্ল্যানিং একটাই। বয়সটাকে কমিয়ে সুন্দরীদের প্রেমে পড়া। আগে পুজোর সময় এই প্রেম-প্রেম ব্যাপারটাকে খুব এনজয় করতাম। ইচ্ছে আছে সেই নস্টালজিয়াকে ফিরে পাওয়ার। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন পুজো আমার কাছে কী? তাহলে এতদিন ধরে বলে যাওয়া কথাগুলো আবার বলতে হয়। পুজো মানে আনন্দ, দেখা-সাক্ষাৎ, পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা। তবে এসব কিছুর বাইরে আমার একটা কথা মনে হয় জানেন। আমাদের বাঙালির এই দুর্গাপুজো কিন্তু অনেকের রুজি রোজগারও। অনেকেরই অন্নসংস্থানের উপায়। পুজোর এক একটা ভাগ নিয়ে বিশাল শিল্প তৈরি হয়েছে, প্রতিমা তৈরি থেকে শুরু করে, তার জরির সাজ, গয়নাগাটি, প্যান্ডেল, নানা থিমের প্ল্যানিং—সবকিছু মিলিয়ে দারুণ একটা ইন্ডাস্ট্রি। ভাবতে পারেন, পাকিস্তান থেকে মানুষ আসছে বাংলার দুর্গাপুজোর মণ্ডপ সাজাতে!

ওই চার দিন— পুজোর ক'দিন আমি ঠাকুর দেখতে বের হই ঠিকই তবে একটু অদ্ভুত সময়ে। রাতে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। ভোর তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় অ্যালার্ম দিয়ে উঠি আমরা। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর দেখতে। ভাবতে পারবেন না তখন একদম ফাঁকা থাকে রাস্তাঘাট। ট্রাফিকও খুব কম। ভালভাবে দেখাও যায় মণ্ডপ সজ্জা-ঠাকুর সবকিছু।

সাজগোজ— সারা বছর জিন্স-টিন্স পরি। কিন্তু পুজোর ক'দিন আমি পাক্কা বাঙালি। অষ্টমীর সকালে আমি ধুতি পরবই। ধুতি পাঞ্জাবি আর পাজামা পাঞ্জাবি—এই আমার পুজোর ফ্যাশন। প্রচুর ধুতি আছে আমার। পাঞ্জাবিও। এবারও কিনব অনেক। তবে আমার জামা-কাপড় বেশিরভাগ সময়ই কেনেন আমার স্ত্রী। এবার অবশ্য বোন এই দায়িত্বটা নিয়েছে।

খাওয়াদাওয়া— দেখুন, পুজোর সময় নো ডায়েটিং। স-ব খাই। যা ইচ্ছে হয় তা-ই। তবে রেস্তোরাঁর বাইরে লাইন দিয়ে খাওয়া আমার পোষায় না। নামী-দামি রেস্তোরাঁয় গুচ্ছের টাকাও দেব আবার লাইনও দেব—ওটি হচ্ছে না। তাই পুজোর সময় বাড়িতেই হয় খাওয়া দাওয়া। সকালে লুচি-তরকারি আর নবমীর দিন পাঁঠার মাংস মাস্ট। অষ্টমীর দিন ভোগ খাওয়া হয়। আমার বাড়িতেই মা দুর্গার ছবির সামনে ভোগ দিই আমরা। চারদিনই দেওয়া হয় ভোগ। তাঁরই প্রসাদে পেট ভরে আমাদের।

অর্জুন চক্রবর্তী



আগে প্রত্যেকবার পুজোর সময় আমি আর দাদা বেড়াতে যেতাম বাবা-মায়ের সঙ্গে। ছোট ছিলাম। পুজোর আবেগটা ততটা বুঝতে পারতাম না। পরে একটু বড় হলাম যখন, নতুন পাড়ায় এলাম। গলফ গার্ডেনে। এই পাড়ায় বাড়ির কাছেই পুজো হত। একটা পার্ক আছে, সেখানেই। ফলে পুজোর সময়ের আনন্দটা একটু একটু করে পেতে শুরু করলাম। পুজোর সময়ে বেড়াতে যাওয়াটা কমে এল। আর এখন পুজোর সময় কলকাতা ছেড়ে বেরনোর কথা ভাবতেও পারি না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পুজোর ক'টা দিন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে না ঘুরলে, আড্ডা না দিলে মনে হয় অনেক কিছু বাকি থেকে গেল।

ওই চার দিন— এবার আমাদের পাড়ার পুজোর সিলভার জুবিলি, রজতজয়ন্তী বর্ষ। তাই অন্যান্যবারের থেকে এবারের মজাটা আর একটু বেশি। এবার পুজোটা অনেক বড় করে হচ্ছে। আমি নিজেও এবারে ভীষণ ভাবে রয়েছি পুজোর সব কাজে। তাই পাড়াতেই থাকব চারটে দিন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে।

সাজগোজ— পুজোর সাজগোজ বলে আলাদা কিছু না। এমনিতেও সারাবছর জিন্স, টি-শার্ট, ক্যাজুয়াল শার্ট পরি। পুজোতেও তা-ই পরব। তবে পুজোর সময় ওই যে একসঙ্গে সাত-আটটা ভাল জামা কেনা—এটাই বেশ আনন্দের। শপিং শুরু করে দিয়েছি। তবে কবে কোনটা পরব, সেটা ঠিক করিনি।

খাওয়াদাওয়া— পুজো মানেই বাইরে খাওয়া। এই সময় বাড়িতে খাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া বাড়িতে রান্নাবান্নার পাট বন্ধই থাকে। যখন ইচ্ছে হয়, যা ইচ্ছে হয় খাই। হয়তো সপ্তমী বা অষ্টমীর দুপুরে চারজন একসঙ্গে খেতে গেলাম কোথাও। বাবা-মা-আমি-দাদা। এবার অবশ্য পুজোর শুরুতে দাদা থাকছে না। তবে পুজোর মধ্যে ফিরবে। তাই এবার একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়াটা হবে কি না জানি না। আর বন্ধু-বান্ধবরা তো আছেই। ওদের সঙ্গে সবরকম প্রিয় খাবার টেস্ট করি। তাই পুজোর পর ওজনটাও বাড়ে। খাটতেও বেশি হয়।

রণিতা দাস



পুজোর আগে কোনও প্ল্যানিং করি না। আগে থেকে ঠিক করে রাখলেও দেখেছি, শেষপর্যন্ত সেগুলো হয়ে ওঠে না। এখন শ্যুটিংয়ের প্রচণ্ড চাপ। তাই শপিং আলাদা করে কিছু করে উঠতে পারিনি। টুক-টাক কেনাকাটা হয়ই, এবার সেটাও কম। তাছাড়া আমার কলেজে প্র্যাকটিকাল সাবমিশনের তারিখও চলে এসেছে। সেগুলো জমা দিতে হবে। পুজোর আগে প্রত্যেকবারই পড়াশোনার এই চাপটা চলে আসে। শ্যুটিং সামলে সে সব ঠিকভাবে মেটাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাই। এবারও অবস্থা একইরকম!

ওই চার দিন— ষষ্ঠী পর্যন্ত কাজ করব। সপ্তমী থেকে দশমী কোনও কাজ নয়। কোনওবারই করি না। এই সময়টা পুরোপুরি বাড়িতে থাকি। একদিন বন্ধুদের সঙ্গে বেরোই। একদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে। গতবারও তাই করেছিলাম। কিন্তু, গতবার এত ভিড় ছিল যে বাবা বলেছে এবার ঠাকুর দেখতে নিয়ে বেরোবে না। আমাদের যে প্রোডাকশন হাউস—ম্যাজিক মোমেন্টস, তাদেরও পুজো হয়। প্রত্যেকবার সেখানে একদিন থাকি এবার একটু বেশি থাকার ইচ্ছে আছে ওখানে। আমার সঙ্গে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরাও থাকবেন। ওঁদের সঙ্গে আড্ডা দেব। আর বাকি সময়টা বাড়িতেই।

সাজগোজ— পুজোতে আমি শাড়িই পরি। সালোয়ার বা ওয়েস্টার্ন পোশাক অন্যসময় পড়লেও, পুজোতে শাড়িই চাই। পর্দায় আমি নানারকম শাড়ি পড়ি ঠিকই কিন্তু, নিজে ট্র্যাডিশনাল শাড়ি যেমন তাঁত, জামদানি, ঢাকাই—এসবই পড়তে বেশি ভালবাসি। এক-এক দিন এক-এক রকম পরব। তবে প্ল্যানিং হয়নি এখনও। শপিংও না। তবে অন্যদিন যা-ই পড়ি, আর আমার যত শাড়িই হোক, অষ্টমীর সকালে মায়ের শাড়ি পড়ে অঞ্জলি দিই। ছোট থেকে তাই পরে এসেছি। আর এখনও অভ্যেসটা বদলাতে ইচ্ছে করে না।

খাওয়াদাওয়া— পুজোয় বেশিরভাগ সময়ে বাড়িতেই খাই। তবে বন্ধুদের সঙ্গে একদিন বা দু'দিন বাইরে, রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া হয়। মাঝে মাঝে বন্ধুরা মিলে সিনেমাও দেখতে যাই। তখন খাওয়াদাওয়া হয়। খাবারের ব্যপারে আমার বাছবিচার নেই। সবরকম খেতে ভালবাসি। তবে বিরিয়ানি, কাবাব একটু বেশি পছন্দ করি। পুজোর ক'দিন বন্ধুরা মিলে ধাবাতেও খেতে যাই। আর অষ্টমীর দিন দুপুরে বাড়িতে মায়ের হাতে তৈরি লুচি, ছোলার ডাল, ধোকা, সিমাই পায়েস মাস্ট। নবমীর দিন বাড়িতে খাসির মাংস হয়। পুজোর সময় ডায়েটিংকে মোটেই পাত্তা দিই না। চুটিয়ে খাওয়া দাওয়া করি।

ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়



আমার বাড়িতে পুজো হয়। বাড়িতে মানে আমার আদি বাড়ি। বাঁকুড়া শহরে। তবে বাড়ির পুজো মানে ঠাকুর দালানে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে পুজো নয়। আমাদের বাড়ির নিজস্ব অষ্টধাতুর বড় দুর্গাপ্রতিমা আছে। সেই প্রতিমার সামনে ঘট রেখে ঘটা করে পুজো হয়। এবছর আমাদের বাড়ির পুজো ৭০ বছরে পড়বে। আমি ছোট থেকে কলকাতার পুজো কখনও দেখিনি। বরাবর পুজোর সময় চলে যেতাম আদি বাড়িতে। আগে পুজোর ছুটি পড়লেই চলে যেতাম। মহালয়ার পরের দিন। এখন সেটা কমে সপ্তমীতে এসে ঠেকেছে। তবে সপ্তমী থেকে দশমী আমি অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না। ওখানেই থাকি।

ওই চার দিন— ষষ্ঠীর দিন কয়েকটা পুজো কম্পিটিশনের বিচারের কাজ আছে। গত কয়েক বছর ধরে এই ইভেন্টগুলোর কল্যাণে একটা জিনিস ভাল হয়েছে। আমার কলকাতার বেশ কিছু ভাল ভাল প্রতিমা-মণ্ডপ দেখা হয়ে যাচ্ছে। সপ্তমীর দিন বাড়ি চলে যাব। আমার পরিবার আগেই সেখানে চলে যাবে। আমি যাব পরে। ওখানে আমাদের প্রচুর আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। তাঁরা থাকবেন। যাঁরা বাইরে কর্মসূত্রে আছেন, তাঁরাও আসবেন। ভাই-বোনেদের সঙ্গে চারটে দিন গল্পে আড্ডায় দারুণ কাটবে। শেষ দিন ঘট বিসর্জন দিতে যাব একসঙ্গে। সেটা দুঃখের ঠিকই। আবার পরের বছরের পুজোর জন্য দিনগোনাও শুরু হবে তখন থেকেই।

সাজগোজ— পুজোর সকালগুলো আমাদের বাড়ির সব ছেলেরাই সিল্কের জোর-ধুতি আর মেয়েরা লালপাড় সিল্কের শাড়ি পরে। আমিও তা-ই পরব। রাতে তেমন কোনও ব্যাপার নেই। যার যা খুশি পরি। একদিন হয়তো ধুতি-পাঞ্জাবি পরব। পাজামা-পাঞ্জাবিও। শপিং শেষ। শার্ট-প্যান্টও কিনেছি। দেখি কবে সেগুলো পরা যায়।

খাওয়াদাওয়া— পুজোয় আমাদের বাড়িতে নবমী পর্যন্ত নিরামিষ খাওয়া হয়। আসলে আমাদের পুজোয় বলির নিয়ম নেই, তাই। সপ্তমীর দিন ভাত-ডাল-শুক্তো, সাতরকম ভাজা, তরকারি, চাটনি, দই বা পায়েস থাকে। অষ্টমীর দিন তো খিচুড়ি ভোগই খাওয়া হয়। আর নবমীর দিন থাকে পোলাও ভোগ। সঙ্গে নানারকম মুখরোচক পদ আর পায়েস। দশমীর দিন ঘট ভাসানের পর পুকুর থেকে মাছ তুলে এনে রান্না হয়। সেদিনই হয় আমিষ খাওয়া।



স্বর্ণযুগের তিন স্টপার

ফুটবল নিয়ে বাঙালির উন্মাদনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু যে ফুটবল নিয়ে এত মাতামাতি সেই ফুটবলের রক্ষণভাগে যাঁরা আকাশছোঁয়া খ্যাতি পেয়েছেন তেমনই তিন স্টপারের কথা নিয়ে লিখছেন

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

১

'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল'। ফুটবলের সঙ্গে বাঙালির নাড়ির যোগ। ফুটবল ছাড়া বাঙালির জীবন যেন নিতান্তই ম্যাড়ম্যাড়ে। টেলিভিশনের দৌলতে আজ আমরা যত বড় মাপের ফুটবলারদের খেলা দেখি না কেন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের নামে আজও মেতে ওঠে বাঙালি। তেতে ওঠে পাড়ার রক। জমে ওঠে তর্ক, আড্ডা। তবে শুধু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নয়, কলকাতার ফুটবল বলতে এই দুই দলের সঙ্গে মহামেডান স্পোর্টিং দলের নামও একই সারিতে উচ্চারিত হয়। শতায়ু প্রাচীন এই তিন দল শুধু বাংলা বা বাঙালির গর্ব নয়, সমগ্র দেশ তথা জাতির রক্তে মিশে রয়েছে এই তিন দলের অস্তিত্ব।

শতাধিক বছর ধরে বহু খেলোয়াড়কে তুলে এনেছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান। বঙ্গ জীবনের বহু ঝড়-ঝাপটা, সুখ-দুঃখের সঙ্গী এই তিন ক্লাব। তেমনই এই তিন ক্লাবের

নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের সাথি হলেন বহু ফুটবলার। কিন্তু এঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মইদুল ইসলাম ও প্রদীপ চৌধুরি-র আলাদা একটা জায়গা রয়েছে তিন দলের সমর্থকদের কাছে।

এই তিন ফুটবলারই ডিফেন্সে দাঁড়িয়ে বছরের পর বছর তিন ক্লাবের সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে গিয়েছেন। তিন ডিফেন্ডারই আর্থিক প্রলোভনকে জয় করে ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করে গিয়েছেন। এঁরা সকলেই ক্লাবকেই নিজেদের জীবনের স্বপ্ন, নিজেদের মনের মন্দির মনে করে পুজো করে গিয়েছেন। কী কারণে তাঁরা আজও ক্লাবের সমর্থকদের চোখের মণি সেটা অনেকের কাছেই আজও একটা বড় আলোচনার বিষয়।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য



মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

লাল-হলুদ জনতার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের মানুষটির নাম যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সে কথা তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৮০ সালে যখন ক্লাবের নামজাদা সব খেলোয়াড়ই মহামেডান শিবিরে নাম লিখিয়েছিলেন, সেই দুর্দিনেও ডিফেন্সে অটল-অনড় ছিলেন মনোরঞ্জন। তৎকালীন সময়ে বড় অঙ্কের টাকার টোপ থাকলেও টলানো যায়নি তাঁকে। এমন একটা সিদ্ধান্তের কারণ কী? মনোরঞ্জনের ভাষায়, ক্লাবপ্রীতি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁর কাছে মন্দিরের মতো। ক্লাবের উগ্র সমর্থক তিনি। ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তি, মাঠের সবক'টি ঘাস, দলের-সহ খেলোয়াড় সবাই তাঁর কাছে আত্মীয়ের মতো। শুধুমাত্র টাকার বদলে এই নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করা তাঁর কাছে আজও অকল্পনীয়। আবার এই মনোরঞ্জনই খেলোয়াড় জীবনের সায়াহ্নে দল পাল্টে চলে গিয়েছিলেন চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের ঘরে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সকলের কাছেই এই সিদ্ধান্ত ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। কিন্তু কোন অভিমানে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি? এক্ষেত্রেও কোনওরকম রাখঢাক না করে মনোরঞ্জনের উত্তর, তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল 'কমিউনিকেশন গ্যাপ'। দলবদলের শেষ লগ্নে এসেও ক্লাবের কোনও কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। তাই তাঁর মনে হয়েছিল, হয়তো বা ইস্টবেঙ্গল তাঁকে এবার দলে রাখতে চায় না। সে কারণেই তিনি জীবনে প্রথম ও শেষবারের জন্য বড় ক্লাবের জার্সি বদল করেছিলেন। কোনওরকম আর্থিক সুবিধা বা নিজের কোনও প্রাপ্তির জন্য নয়। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একটানা প্রায় ১৭ বছর ফুটবল খেলেছেন মনোরঞ্জন। যার মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই তিনি মজিদ বাসকর বা চিমার মতো ফুটবলারকে নিজের দলে পেয়েছেন। তাই অন্যান্য দলের ডিফেন্ডারদের তুলনায় তাঁর কাজ কি কিছুটা সহজ হয়েছিল? মনোরঞ্জন অবশ্য তেমনটা মনে করেন না। কারণ চিমা বা মজিদ তাঁর বিপক্ষেও বহু ম্যাচ খেলেছেন। তা ছাড়া চিমা, মজিদ ছাড়াও কলকাতা মাঠে আরও অনেক স্ট্রাইকারও দাপিয়ে খেলেছেন। সুভাষ ভৌমিক, শ্যাম থাপা, বিদেশ বসু, মিহির ভট্টাচার্য, হাবিব, আকবর, জেভিয়ার পায়াস এমনকী শেষ দিকের ইন্দার সিংকেও সামলাতে হয়েছে তাঁকে। এঁরা কেউই কম ভয়ঙ্কর ছিলেন না। পায়াস, হাবিব যেমন অসম্ভব ছটফটে ছিলেন তেমনই সুভাষ ভৌমিক ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই আলাদাভাবে কোনও স্ট্রাইকারকে তিনি টাফ বলতে রাজি নন। আপাদমস্তক ভদ্রলোক এবং শিক্ষিত মানুষ হিসাবে পরিচিত মনোরঞ্জনের প্রতিটি কথাতেই সহ-খেলোয়াড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছিল। যা শুধু একজন বড় খেলোয়াড় নয়, বড় মাপের মানুষেরও পরিচয়।

২

ক্লাব ও দেশের হয়ে বহু আন্তর্জাতিক খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের সুব্রত ভট্টাচার্যর থেকেও বেশ কয়েক কদম এগিয়ে। কী কারণে আন্তর্জাতিক স্তরেও তিনি এত সফল? লাজুক হেসে নিজের এই এগিয়ে থাকাকেও যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন লাল-হলুদের শীত-গ্রীষ্ম-বরষার ভরসা। জানালেন, এগিয়ে-পিছিয়ে থাকার বিষয়টি তিনি কখনওই ভাবেননি। পাড়ায় খেলে খেলোয়াড় জীবনের শুরু। তারপর জেলা, সেখান থেকে কলকাতা মাঠ, তারপর বড় ক্লাব। সেখান থেকে রাজ্য, পরে আন্তর্জাতিক আঙিনায় পা রাখা। এ সবই খেলোয়াড় জীবনের স্বাভাবিক বিষয়। সেভাবেই একজন খেলোয়াড় নিজেকে তৈরি করেন। তাই আন্তর্জাতিক ফুটবল মঞ্চে নিজের এই এগিয়ে থাকার বিষয়টি নিয়ে তিনি ভাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। যেমন তিনি পি কে বন্দোপাধ্যায়, অমল দত্ত বা নইমুদ্দিনের কোচিংয়ের বিষয়েও কাউকে এগিয়ে-পিছিয়ে দেখতে রাজি নন। মনোরঞ্জনের মতে, এঁরা সকলেই অত্যন্ত দক্ষ কোচ। তবে জুনিয়র খেলোয়াড় তুলে আনতে অমল দত্ত যেমন বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তেমনই অরুণ ঘোষকেও ভাল কোচের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা করেননি। খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সেরা খেলাটা বের করে আনতে এঁরা সকলেই ছিলেন সমান পারদর্শী।

১৯৭৬ সালে বিজ্ঞানে স্নাতক হন মনোরঞ্জন। শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন মনোরঞ্জন। পারিবারিক পরিবেশই তাঁর এই মানসিকতা গড়ে তুলেছে বলে সাফ জানিয়েছেন। মাঠে কড়া মেজাজের এই ডিফেন্ডার কিন্তু বাবার শাসনকে কখনও উপেক্ষা করেননি। ছোটবেলায় বাবার পরামর্শেই নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি মাঠেও দাপিয়েছেন। খেলাধুলা করলেও পড়াশোনাকে কোনওভাবেই উপেক্ষা করার সাহস ছিল না। অঙ্ক ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ফুটবল মাঠে এই অঙ্ক মেলানোর বিষয়টিতেই তিনি সব

সময় জোর দিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বিভিন্ন সময়ে পাশে পেয়েছেন বিভিন্ন ডিফেন্ডারকে। এঁদের মধ্যে তরুণ দে-র সঙ্গেই তাঁর বোঝাপড়া ছিল সবথেকে বেশি। দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলাই ছিল এই বোঝাপড়ার কারণ এমনটাই জানিয়েছেন দেশের এই প্রাক্তন ডিফেন্ডার তথা পোর্টট্রাস্টের বর্তমান কোচ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। যদিও খেলার তুলনায় কোচিং করাকে তিনি অনেক বেশি কঠিন বলে মনে করেছেন। একসময় মাঠ দাপিয়ে বেড়ানো এই ফুটবলার মনে করেন কোচিং করার তুলনায় মাঠে নেমে খেলাটা অনেক সহজ। কারণ খেলোয়াড় হিসাবে তিনি জানেন তাঁকে ঠিক কী করতে হবে বা তিনি কী করতে পারেন। কিন্তু কোচিংয়ের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। হাতের ১০টা আঙুল যেমন সমান হয় না তেমনই মাঠের ১১ জন খেলোয়াড়ের দক্ষতাও সমান নয়। সর্বোপরি এদের সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলাটাও একটা কঠিন বিষয়। তাই খোলায়াড় জীবনের তুলনায় কোচিং জীবন তাঁর কাছে অনেক বেশি কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং।

বেলঘরিয়ার ভট্টাচার্য পরিবারে ফুটবলের একটা আবহ থাকলেও নিজের ছেলেকে কিন্তু ফুটবলে আনেননি সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ফুটবলার। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু খেলোয়াড় মনোরঞ্জনকে ছাপিয়ে গিয়েছেন 'বাবা মনোরঞ্জন'। ছেলেকে খেলায় না আনার কারণ জানতে চাওয়া হলে দেশবিখ্যাত এই ডিফেন্ডার কিন্তু আরও বেশি ডিফেন্সিভ হয়ে পড়লেন। বরং আর পাঁচজন বাবার মতোই উত্তর দিলেন, আমাদের দেশের পরিকাঠামোয় ছেলেদের পুরোপুরি খেলায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়। কারণ, খেললে যে সকলেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। চাকরির বিষয়টি অনিশ্চিত। ফুটবল খেললেই যে বড় ক্লাবে সুযোগ পাবে তাও নয়। এমনকী খেলোয়াড় হিসাবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দিনও ফুরিয়েছে। ফুটবল 'বডি কনট্যাক্ট গেম'। তাই যে কোনও সময় চোট-আঘাত লাগতেই পারে। সেক্ষেত্রে কে দায়িত্ব নেবে? তা ছাড়া একটা সময়ের পর যখন দেখা গেল যে ছেলে খেলোয়াড় হিসাবে সেভাবে দাগ কাটতে পারবে না তখন কী হবে? সব বাবাই তাঁর সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সবার আগে আমি একজন বাবা। সে কারণেই ছেলেকে খেলায় নয়, পড়াশোনার জগতেই আবদ্ধ রেখেছেন এক সময়ের এই দুর্ধর্ষ ডিফেন্ডার। ছেলের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে যেন মাত্রাতিরিক্ত ডিফেন্সে ঢুকে পড়েছেন লাল-হলুদ জনতার এই প্রিয় ফুটবলারটি।

৩

কলকাতা মাঠ নিয়ে স্বল্পবাক মনোরঞ্জনের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি রয়েছে। ১৯৮০ সালে দলের প্রায় সব খেলোয়াড় বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সারা বছর ইস্টবেঙ্গল দেশের কোনও ক্লাবের কাছেই হার মানেনি। ওই বছর দক্ষিণ কোরিয়ার একটি দলের কাছেই একটি মাত্র ম্যাচ হারে ইস্টবেঙ্গল। এটা তাঁর কাছে একটা সুখের স্মৃতি। দীর্ঘ ১৭টা বছর একটানা ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন। দলের বহু সাফল্যের নায়ক তিনি। এই সাফল্যের রসায়ন কী? এ প্রশ্নের উত্তরে মনোরঞ্জনের সাফ জবাব, যে কোনও দলের সাফল্যের পিছনে থাকে 'রিলেশনস'। সকলে মিলে এই রিলেশনস বা সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই সাফল্য আসে। তাই ১৯৭৯ সালে শক্তিশালী দল গঠন করেও ইস্টবেঙ্গল কোনও ট্রফি পায়নি। তবে নিজের দুঃখের কথাটা কোনওভাবেই বলতে চাইছিলেন না লাল-হলুদের আদরের 'মনা'। অনেক চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত বলব না বলব না করে বলেই ফেললেন তিনি। এখনও পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে কোনও সরকারি পুরস্কার জোটেনি। এটাই তাঁর এক ও একমাত্র দুঃখ। তবে গোটা দেশের আমজনতার কাছে যে ভালবাসা তিনি পেয়েছেন, ইস্টবেঙ্গল জনতা তাঁকে যে সম্মান দিয়েছে তাতে তিনি সব দুঃখই ভুলে গিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে তাঁর খেলোয়াড় হিসাবে যোগাযোগ নয়, এই ক্লাব তাঁর কাছে আবেগ ও বিশ্বাসের একটা প্রতীক।

মইদুল ইসলাম

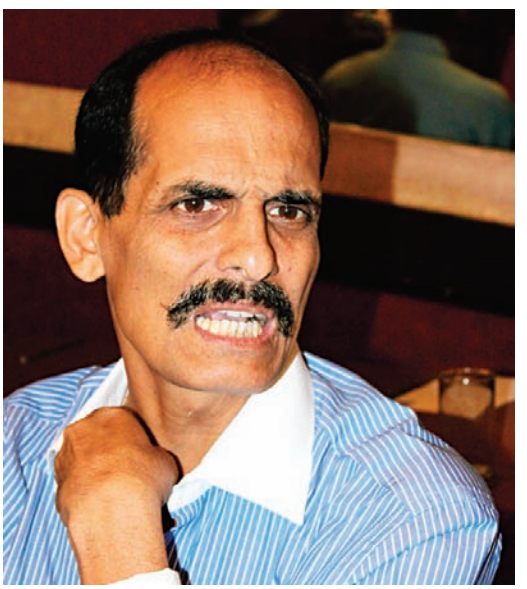

মইদুল ইসলাম

প্রায় সারা জীবন নিজের বুক দিয়ে মহামেডানের দুর্গ রক্ষা করে গিয়েছেন মইদুল ইসলাম। বিভিন্ন সময় ছোট-বড় একাধিক খেলোয়াড় যখন দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তখন একা কুম্ভ হয়ে মহামেডানের গড় রক্ষা করে গিয়েছেন মইদুল। এভাবে দলকে একা রক্ষা করার ক্ষেত্রে মইদুলের ক্লাবপ্রীতিই ছিল একমাত্র অনুপ্রেরণা। মহামেডান ক্লাবের তাঁবু থেকে শুরু করে মাঠের ঘাস মইদুলের কাছে এসবই ছিল আত্মার আত্মীয়। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণে ক্লাবের কর্মকর্তাদের কাছেও ছিল বিশেষ মর্যাদা। এই সম্পর্কের নিরিখেই মইদুল এক সময় 'মহামেডানের বাড়িওয়ালা' নামেও পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে অন্য বড় দলের প্রস্তাব যে তাঁর কাছে ছিল না তা নয়। দল না ছাড়ার পিছনে ক্লাবপ্রীতি একটা বড় কারণ হলেও মইদুলের দুর্ভাগ্যও তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। কারণ মইদুল যে সময় চূড়ান্ত ফর্মে ফুটবল খেলছেন সে সময়ই তাঁর হার্টের অসুখ ধরা পড়ে। এ রাজ্যের চিকিৎসকরা তো একেবারে নিদান হেঁকেও দিয়েছিলেন। যা শুনে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেলোরে চিকিৎসা করিয়ে পুনর্জন্ম পান তিনি। তবে ওই ঘটনার পর থেকে ফুটবল খেললেও তাঁকে বেশ কিছুটা সতর্ক হয়েই খেলতে হত। ১৯৮৯ সালে এই

বাড়িওয়ালাই কিন্তু মনের দুঃখে দল ছেড়েছিলেন। ক্লাবের পরিবেশ এতটাই দূষিত হয়ে পড়েছিল যে দল ছাড়ার মতো একটা বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। মনোরঞ্জন-সুব্রতর সঙ্গে একই সারিতে ঠাঁই মিললেও মিডিয়ার সার্চলাইট মইদুলের উপর সেভাবে কখনওই পড়েনি। মইদুল মনে করেন, মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়াররা স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়ায় বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। মহামেডানে থাকার কারণেই তাঁর উপর সেভাবে প্রচারের আলো পড়েনি। তিনি নিজে একটানা মহামেডানে খেলে গেলেও প্রায় প্রতি বছরই পাল্টে গিয়েছে তাঁর পাশের খেলোয়াড়টি। সে কারণে চিমা, মজিদ, পায়াস, কৃশানু বা এমেকার মতো প্লেয়ারকে আটকানোর বাড়তি দায়িত্বটা তাঁকেই নিতে হত। গতি বা কড়া ট্যাকলিংয়ের পরিবর্তে বুদ্ধি করেই তিনি এঁদের মোকাবিলা করতেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে ছিলেন কিছুটা স্লথ, হেডিংও তেমন ভাল ছিল না। শুধু বুদ্ধি এবং অনুমান ক্ষমতার জেরেই তিনি এইসব ধুরন্ধর স্টাইকারের মোকাবিলা করেছেন। নিজে এতবড় মাপের ফুটবলার হলেও কোচিংয়ে আসবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন। তবে সত্যি কথাটা নম্রভাবে বলতেই ভলবাসেন এই ডিফেন্ডার। তাঁর মতে, কোচিং করতে গেলে ক্লাবকর্তাদের মর্জিমতো চলতে হয়। তা ছাড়া প্রত্যেক ফুটবলারের কাছ থেকে সেরা খেলাটা বের করে আনা খুব কঠিন। তাই কোচিংয়ে তিনি আসতে চান না। মৃদু হেসে মইদুল জানিয়েছেন, "বড়দের কোচিং করার মতো যোগ্যতাও আমার নেই। নেই কোচিংয়ের উপযুক্ত ডিগ্রি, শেখানোর মতো ধৈর্য।" তবে বাচ্চাদের শেখাতে তিনি বিশেষ আগ্রহী। নিয়মিত বাচ্চাদের শিখিয়েও থাকেন বলে জানিয়েছেন। নিজে কোচিং করতে না চাইলেও পি কে, অমল, সাত্তার বা নইমুদ্দিনের কোচিং নিয়ে তিনি বেশ উচ্ছ্বসিত। তবে এঁদের মধ্যে কোচ হিসাবে তিনি অমল দত্তকে কিছুটা এগিয়ে রেখেছেন। খেলোয়াড় তুলে আনতে অমল দত্ত বিশেষ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন বলে জানালেন মইদুল। ক্লাবের হয়ে বহু ম্যাচ খেললেও তুলনায় আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনেক কম খেলেছেন। এ প্রসঙ্গে মইদুল জানিয়েছেন, মূলত শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি সেভাবে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে পারেননি। তবে ক্যামেরুন বা কোরিয়ার বিরুদ্ধে তিনি খেলে তৃপ্ত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা মহামেডানের ডিফেন্স সামলেছেন তাঁদের মধ্যে রমেন ভট্টাচার্য, জয়দেব চক্রবর্তী, অমিত ভদ্র, সমর ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন।

মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে এসে ভারতীয় ফুটবলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হলেও নিজের ছেলেকে কিন্তু মাঠে নিয়ে আসনেনি মইদুল। শিক্ষার উপরেই তিনি বেশি জোর দিয়েছেন। ছেলে-মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করে তুলেছেন। কিন্তু মইদুলের ছেলে মাঠে নয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতিকেই বড় করে দেখিয়েছেন। স্পষ্ট জানিয়েছেন, ফুটবল খেললেই যে বড় দলে খেলার যোগ্য হতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়। তাছাড়া ফুটবল যথেষ্ট টাফ খেলা। চোট-আঘাত নিত্যসঙ্গী। খেলতে গিয়ে চোট পেলে কে দেখবে? মইদুলের ছেলে বলেই যে সে বড় ফুটবলার হবে তার গ্যারান্টি কী? কিন্তু পড়াশোনা করলে বিশাল পণ্ডিত না হলেও নিজের জীবনটা চালিয়ে নিতে পারবে। সে কারণেই ছেলেকে এমবিএ করিয়েছেন। মেয়েও ইংরেজিতে এমএ। চাকরি শেষে ছোটদের কোচিং করানোর ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। ফুটবলার মইদুল ইসলামের সল্টলেকের ফ্ল্যাটটির সাজসজ্জা কিন্তু অসাধারণ। ঘর সাজানোর সব কৃতিত্ব অবশ্য স্ত্রীকে দিয়েছেন। ভোজনবিলাসী এই ডিফেন্ডার রসনা তৃপ্তির জন্যও স্ত্রীর উপরেই নির্ভরশীল বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন।

১৯৮১-তে লিগ জয় এবং ডিসিএম ট্রফিতে কোরিয়াকে হারানো তাঁর জীবনের সুখস্মৃতি। অন্যদিকে তিনি যখন চূড়ান্ত ফর্মে ফুটবল খেলছেন সে সময় তাঁর হার্টের অসুখ ধরা পড়ে। এটা তাঁর কাছে অবশ্যই করুণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত এই ডিফেন্ডার মনে করেন, তিনি বা আর সকলে যা পেয়েছেন তা সবই ঈশ্বর আগে থেকে ঠিক করে রাখা। তাই পাওয়া না পাওয়া নিয়ে চিন্তা করার কোনও অর্থ হয় না। কোনও একজন মানুষ জীবনে যতটুকু পেয়েছেন তা নিয়েই তাঁর আনন্দে থাকা উচিত বলে জানিয়েছেন।

দেশের ফুটবলে কি ভাটার টান? কেন সেভাবে ফুটবলার তৈরি হচ্ছে না? এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য মইদুল বড় ক্লাবগুলর পাশাপাশি সরকারকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর মতে ফুটবলের উন্নতিতে কারও কোনও পরিকল্পনা নেই। সরকার ক্রিকেট নিয়েই ব্যস্ত। বড় ক্লাবগুলি ঢাকঢোল পেটালেও আজও সেভাবে একটা ফুটবল অ্যাকাডেমি গড়ে তুলতে পারেনি। ফুটবল নিয়ে আমরা সেভাবে 'মার্কেটিং' করতে পারিনি। ছোটদের শেখানোর জন্য ভাল কোচ ও পরিবেশের ব্যবস্থা করা যায়নি। আজ আর জেলা থেকে সেভাবে ফুটবলার তুলে আনার চেষ্টা করা হয় না বলে আক্ষেপ জানালেন। ফুটবলের প্রতি অনিহা বাড়ায় আমাদের চলতি সমাজ ব্যবস্থাকেও দায়ী করেছেন সাদা-কালো জার্সিধারী এই ডিফেন্ডার। তাই অদূর ভবিষ্যতেও ভারতের বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা কার্যত অসম্ভব বলে জানিয়েছেন। বিশ্বকাপ বা ওই পর্যায়ে খেলতে না পারার কারণ হিসাবে তিনি এসবের সঙ্গে আমাদের অপেশাদারিত্বকেই দায়ী করেছেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, আমাদের পক্ষে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি অবশ্য দেশের পরিকাঠামোর পাশাপাশি আবহাওয়া এবং জিনগত সমস্যাকে দায়ী করেছেন।

নিজের দেখা সেরা ডিফেন্স লাইন থেকে অবশ্য নির্দ্বিধায় নিজেকে বাইরে রেখেছেন মইদুল। মইদুলের সেরা ডিফেন্স লাইনে রয়েছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুব্রত ভট্টাচার্য, অলোক মুখোপাধ্যায় এবং সুধীর কর্মকার। গোলে রেখেছেন ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়কে। সেরা ডিফেন্সে তাঁর নিজের নামটা নেই কেন। এক্ষেত্রে হাসতে হাসতে মইদুল জানালেন, এঁদের যোগ্যতার তুলনায় তিনি কিছুই নন। তাই কোনওভাবেই তিনি এই তালিকায় ঠাঁই পেতে পারেন না। এখানেই মইদুল ইসলামের স্বতন্ত্রতা। এখানেই তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। তবে নিজের সেরা ডিফেন্স লাইনে ফুটবলারের তুলনায় মানুষ হিসাবে মনোরঞ্জনকে অনেকটা উপরে ঠাঁই দিয়েছেন মইদুল। একই সঙ্গে মনে রেখেছেন পরোপকারী বাবলুর কথাও।

প্রদীপ চৌধুরি

মোহনবাগানের ঘরের ছেলে বলতে আমরা যাঁদের বুঝি প্রদীপ চৌধুরি তাঁদের অন্যতম। দীর্ঘদিন সুব্রত ভট্টাচার্যর পাশে খেলেছেন। তবে কখনওই সুব্রতর ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাননি। ক্রীড়ানৈপুণ্যে তিনি ছিলেন রীতিমতো ভাস্বর। সুব্রতকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল বাবলু সম্পর্কে। দক্ষতার নিরিখে সুব্রতকে অন্যান্যদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রেখেছেন ভারতের প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ক। তাঁর মতে, সুব্রতর অনুমান ক্ষমতা এবং বল কন্ট্রোল ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। হেডিংও ছিল খুব ভাল। প্রথম দিকে শারীরিক সক্ষমতা এবং গতির কিছু ঘাটতি থাকলেও পরে সুব্রত

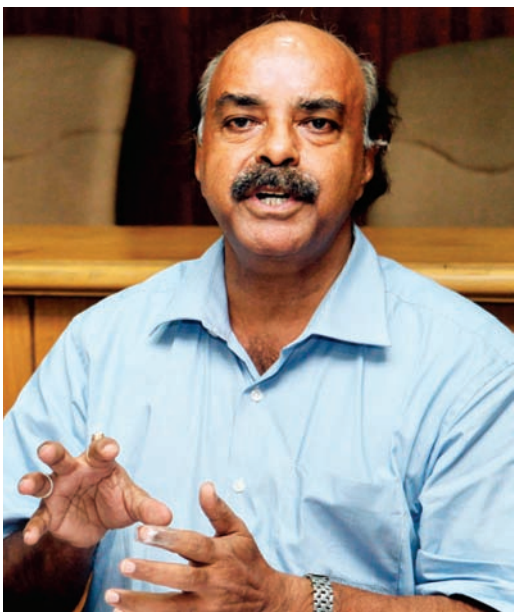

প্রদীপ চৌধুরি

সেগুলি কাটিয়ে উঠেছিলেন। দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা সম্পর্কে প্রদীপ চৌধুরি জানালেন, সুব্রত ছিলেন আদ্যোপান্ত 'টিমম্যান'। দলের ভালমন্দের সঙ্গে নিজেকে একেবারে জড়িয়ে ফেলতেন। দল জিতলে যেমন আত্মহারা হতেন, তেমনই দল হারলে একেবারে ভেঙে পড়তেন। সুব্রত ভট্টাচার্য ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর মধ্যে অবশ্য তিনি বাবলুকেই এগিয়ে রেখেছেন। টেম্পারমেন্ট, দক্ষতা ও দলকে টানার ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করেই তিনি সুব্রতকে এগিয়ে রেখেছেন।

পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই মোহনবাগানি প্রদীপ চৌধুরি। দলের কট্টর সমর্থক ছিলেন। ক্লাবের তৎকালীন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে মালি, সকলের সঙ্গেই ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই হেলায় ফেরাতে পেরেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের তরফে পল্টু দাস ও জীবন চক্রবর্তীর দেওয়া দল বদলের প্রস্তাব। 'জিপ'কে জানিয়েছিলেন, তাঁদের টিমে সই করলে শরীরটা হয়তো ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে থাকবে কিন্তু মনটা থাকবে মোহনবাগানেই। সে কারণেই তাঁর কাছে জীবনের প্রথম ও শেষ বড় ক্লাব ছিল মোহনবাগান। ডিফেন্সে খেলায় দেশ-বিদেশের বহু স্ট্রাইকারকেই আটকাতে হয়েছে। দেশের মাঠে খেলা বিদেশি স্ট্রাইকারদের মধ্যে মজিদ বাসকরকে তিনি এগিয়ে রেখেছেন। তবে দেশের স্ট্রাইকারদের মধ্যে এক নম্বর স্থানটি দিয়েছেন ইন্দার সিংকে। আবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে মালয়েশিয়ার এক স্ট্রাইকারকেই তিনি শক্তিশালী বলে মনে করেছেন। এঁদের আটকাতে ম্যাচের আগে বিশেষ পরিকল্পনা করতেন বলেও জানিয়েছেন। সুব্রতর সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলার ফলে তাঁদের মধ্যে একটা দুরন্ত বোঝাপড়া ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে প্রদীপবাবু জানিয়েছেন। প্রদীপবাবুর মতে, তিনি এবং সুব্রত ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। সে কারণেই তাঁর সঙ্গে সুব্রতর জুটিটা দীর্ঘদিন সফলভাবে টিকে ছিল।

শক্তিশালী এই ডিফেন্ডার কলকাতা ময়দানে কোচ হিসাবে প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই এগিয়ে রেখেছেন। একই সঙ্গে মহম্মদ হুসেন নামে মুম্বইয়ের এক কোচের দক্ষতার কথাও জানিয়েছেন। মুম্বইয়ে টাটার ফুটবল দলের প্রশিক্ষক ছিলেন এই হুসেন। দক্ষ ফুটবলার হলেও কোচিংয়ে আগ্রহী নন প্রদীপবাবু। এক সময় অফিসের কাজের চাপে কোচিংয়ে আসতে পারেননি। এই মুহূর্তে ডিগ্রি ছাড়া কোচিং সম্ভব নয়। তাঁর সেই ডিগ্রি নেই। তাই কোচিং করবেন এমন কোনও সম্ভবনা নেই। আবার নিজে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র ছেলেকে সেভাবে ফুটবলে আনেননি। একমাত্র ছেলে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ফুটবলে প্রতিনিধিত্ব করলেও ক্লাব বা দেশের হয়ে খেলেনি। মূলত পড়াশোনার চাপের কারণেই ছেলের পক্ষে ফুটবলার হয়ে ওঠা হয়নি। যেমন তাঁর নিজের রেফারিং করার ইচ্ছা থাকলেও বাঁশি মুখে মাঠে নামা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে তাঁর এক বন্ধুর বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়েই তিনি রেফারি হওয়ার স্বপ্ন ত্যাগ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন।

দীর্ঘ ফুটবল জীবনে বহু ভাল-মন্দ ঘটনার সাক্ষী প্রদীপবাবু। ১৯৭৭ সালে পেলের বিরুদ্ধে খেলা তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত। ১৯৭৬ সালে দীর্ঘ সাত বছর পর কলকাতা মাঠে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছিল মোহনবাগান। ওই ম্যাচে মোহনবাগানের পক্ষে ম্যাচ শুরুর ১৭ সেকেন্ডের মধ্যে গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন আকবর। তার পর ইস্টবেঙ্গলের ১১ জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে মোহনবাগানের পাঁচ ডিফেন্ডারের তুমুল লড়াই হয়েছিল। তবে শেষ হাসি হেসেছিল সবুজ মেরুন দলটি। খেলা শেষে বহু প্রবীণ সমর্থক গ্যালারিতে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। জামা খুলে উড়িয়েছিলেন। স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, এবার তাঁরা শান্তিতে মরতে পারবেন। এই ঘটনার সাক্ষী থাকা তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় এক মুহূর্ত। আবার ১৯৭৭ সালে কলকাতা লিগের একটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজয় ছিল অন্যতম দুঃখের ঘটনা। ওই ম্যাচে হারার পর গোটা দল এতটাই ভেঙে পড়েছিল দু'টো দিন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে ঘরে বসেছিল দলের খেলোয়াড়রা। এ সময় ক্লাবের তৎকালীন কর্ণধার ধীরেন দে-র নির্দেশে তাঁর অফিসে গিয়েছিলেন প্রদীপ চৌধুরি ও মহম্মদ হাবিব। ধীরেনবাবু তখন ঠান্ডা গলায় বলেন, ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজয়ে দুঃখের কিছু নেই। কারণ ইস্টবেঙ্গলও আমাদের মতোই সমান শক্তিশালী একটা দল। সেই দলের কাছে হারলে এতটা ভেঙে পড়ার কিছু নেই। কিন্তু ছোটখাটো টিমের কাছে হারলে সেটা বড়ই বেদনাদায়ক হয়। তাই এই পরাজয়ে হতাশ না হয়ে বরং আগামিদিনের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারতের অংশ গ্রহণ অসম্ভব বলে জানিয়েছেন এই প্রাক্তন মোহনবাগানি। দেশের ফুটবল মানের অবনয়নের জন্য পরিকাঠামো, পরিকল্পনার অভাবকেই দায়ী করেছেন। সঠিক পরিকল্পনার অভাবে জেলা থেকেও আজ সেভাবে খেলোয়াড়রা উঠে আসছে না বলে জানিয়েছেন। ফুটবল নিয়ে সাধারণ মানুষের উৎসাহ হারিয়ে গিয়েছে বলে আক্ষেপ করেছেন। তবে ফুটবলের উন্নয়নে বর্তমানে সরকারের তরফে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। যদিও সরকারের এই উদ্যোগের সুফল মিলতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন। ফাইভএ সাইড ফুটবল এবং বিচ ফুটবলের উন্নতির জন্য এআইএফএফ যে কমিটি তৈরি করেছে তার অন্যতম সদস্য প্রদীপবাবু। পরিবারের ঐতিহ্য মেনে খেলাধুলোর সঙ্গে সমানভাবে লেখাপড়াও করেছেন। করেছেন উচ্চপদে চাকরি। এই মুহূর্তে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে চুটিয়ে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন।



সংকেত

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

গড়িয়া থেকে এস-২১ বাসে চেপে আমি হাডকো পর্যন্ত চলে যাই। ওখান থেকে আমার অফিস পায়ে হেঁটে মিনিট বারো-চোদ্দো। তাড়াতাড়ি পা চালালে দশ মিনিটেও পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি সেটা করি না। উল্টে একটা সিগারেট ধরিয়ে দুলকি চালে হাঁটতে থাকি তাতে কুড়ি মিনিট লাগে তো লাগুক।

গড়িয়া থেকে এস-২১ বাসে চেপে আমি হাডকো পর্যন্ত চলে যাই। ওখান থেকে আমার অফিস পায়ে হেঁটে মিনিট বারো-চোদ্দো। তাড়াতাড়ি পা চালালে দশ মিনিটেও পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি সেটা করি না। উল্টে একটা সিগারেট ধরিয়ে দুলকি চালে হাঁটতে থাকি তাতে কুড়ি মিনিট লাগে তো লাগুক। ওই সময়টা আসলে আমার সারাদিনের জন্য নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার সময়। উল্টোডাঙায় প্রবল ভিড় আর ট্রাফিক অথচ রাস্তা পেরিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়লেই আমি সল্টলেকের নিরিবিলির আওতায় পড়ে গেলাম, এই ব্যাপারটা দারুণ লাগে। যদিও সল্টলেকে এখন গাড়ির পর গাড়ি তবু এই জায়গাটার সঙ্গে কলকাতার কোনও জায়গাকে মেলানো যায় বলে মনে হয় না। তা শুধু এই কারণে নয় যে এখানে চওড়া-চওড়া রাস্তা, দু'ধারে বড়-বড় গাছ, যেদিকে তাকাই ছবির মতো দোতলা-তিনতলা বাড়ি। কারণটা হল, এত পরিকল্পনামাফিক হওয়ার পরও সল্টলেকের মধ্যে একটা রহস্য আছে। সেই রহস্যের জন্যই দু-তিনবছর নিয়মিত এখানে আসা-যাওয়া করা লোকও রাস্তা গুলিয়ে ফেলে, এক ব্লকে যেতে গিয়ে অন্য ব্লকে চলে যায়। এই রহস্যটাই বুঝতে পারে না অনেকে। বলে, সল্টলেকে সব রাস্তা, সব গলি, সব বাড়ি একরকম। আরে বাবা, ওই ইউনিফর্ম আসলে সল্টলেকের ছদ্মবেশ। যেমন স্কুলড্রেস পরা পঞ্চাশটা মেয়েকে আলাদা করা যায় না দূর থেকে, সল্টলেকও ঠিক তেমনই। সময় পেলেই তাই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি, একটু হেঁটে আসি সল্টলেকের রাস্তায়। বলা বাহুল্য, সেই সময় খুব বেশি পাই না কারণ আমার প্রাইভেট কনসার্ন। তার ওপর আবার লজিস্টিকস কোম্পানি, ইধার কা মাল উধার করতেই সকাল থেকে সন্ধে কাবার। কোথায় কী কেন পৌঁছল না, কী জন্য দেরি হচ্ছে, আর দেরি হয়ে গেলে পার্টিকে কী বলে ম্যানেজ করতে হবে তার অনেকটাই আমার কাঁধে। রক্ষে একটাই, আমার ঝামেলা শুরু হতে হতে বেলা এগারোটা বাজে। তাই সকালের দিকে আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট আমি ফাঁকা পাই যার ভিতরে কুড়ি মিনিট ওই হাঁটার জন্য তোলা থাকে।

মুশকিল হচ্ছে, পনেরো দিন যাবৎ আমি এই হাঁটার সময়টা পাচ্ছি না। হাডকোয় নেমেই ঊর্ধ্বশ্বাসে রাস্তা পেরিয়ে অটো ধরতে হচ্ছে আর যেহেতু আমার প্রচণ্ড তাড়া তাই অটোচালক প্যাসেঞ্জারের অপেক্ষায় বসে থাকলে তাকে বলতে হচ্ছে যে আমি রিজার্ভে যাব। সেও ঠিক এই মওকাটার অপেক্ষা করছিল বলে, পঞ্চাশ-ষাট দর হাঁকছে, নিরুপায় আমি সেটাকে অনেক কষ্টে চল্লিশ পর্যন্ত নামাতে পারছি আর তার বদলা নিতে অটোওয়ালা রাস্তার যেখান থেকে পারছে লোক ওঠাচ্ছে। ফলত আমি ওই গাদাগাদি ভিড়ে বসেই অফিস পৌঁছাচ্ছি আর তারপর চল্লিশ টাকা দণ্ড দিচ্ছি। একদিন-দুদিন হলে ব্যাপারটা গায়ে লাগে না, কিন্তু রোজ-রোজ ঘটতে থাকলে গা কামড়ায়। আর এতকিছুর পরেও অফিস পৌঁছতে প্রায় এগারোটা বেজে যাচ্ছে, দু'দিন তো এগারোটা দশ হয়ে গেল।

আমার বস একজন মহিলা। বিহারি তবে কলকাতায় থাকতে থাকতে বাংলা ভালই বোঝেন। হাবেভাবে প্রকাশ না করলেও আমার কাজে মোটামুটি সন্তুষ্ট, আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু সেদিন আমায় ঘরে ডেকে আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, কনস্টিপেশন-এর বাংলা কী?

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম প্রথমটা। কোনওমতে বললাম, কোষ্ঠকাঠিন্য।

—আপনার হয়েছে? ম্যাডাম ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখদুটো আটকে রেখে বলে উঠলেন। ঘরে তখন আরও তিনটে লোক। কেউ হাসল না কিন্তু প্রত্যেকের চোখ একবার করে চেটে গেল আমায়।

আমার মাথাটা আগুন হয়ে উঠল কিন্তু মাথার ভিতরে দমকলও ছিল। সে বোঝাল যে প্রাইভেট কোম্পানিতে এটাই দস্তুর। যারা চোখ দিয়ে চাটছে আমায়, তাদের চোখে বিদ্রুপের চেয়ে অনেক বেশি আছে ভয়। নিজের জন্য ভয়। সেই ভয়টা এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে এতটাই সর্বব্যাপী যে ঘুঁটে পুড়লে গোবর আর হাসে না, ম্যাক্সিমাম কৌতূহলী হয়ে ওঠে একটু। আমি সেই কৌতূহল এবং অপমান একই ফোয়ারায় নিভিয়ে দেব বলে ঠান্ডা গলায় বললাম, আই অ্যাম সরি যে আমার একটু লেট হচ্ছে, কয়েকদিন। বাট কনস্টিপেশন ইজ নট দা রিজন বিহাইন্ড ইট। আমার একজন ফ্যামিলি মেম্বার খুব অসুস্থ। আমি ভীষণ প্রবলেমে আছি। আই হোপ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড।

২

কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমি খুব প্রবলেমে আছি। আমার যে ফ্যামিলি মেম্বার খুব অসুস্থ, সে আমি। আমার প্রবলেমের কারণ একটি মেয়ে। এভাবে বললে হয়তো খুব কাঁচা শোনায়, যেহেতু আমার বয়স একুশ নয় একত্রিশ কিন্তু কথাটা সত্যি। মেয়েটা রোজ সকালে আমার মতোই এস-২১ চেপে কাজে যায় আর নামে আমার একটু আগে চিংড়িঘাটায়। দেখতে কি খুব সুন্দর? না, সেরকম নয়। বরং বলা যায়, দোহারা চেহারা, মিষ্টি মুখের একটা মেয়ে যার চোখে একটা বিদ্যুৎ খেলা করে।

—বিদ্যুৎটা কি কষ্ট দিয়ে তৈরি না মজা দিয়ে? সমীর আমাকে জিজ্ঞেস করল।

আমরা বসে ছিলাম, আমাদের ক্লাবঘরে। এই ক্লাবঘরের দক্ষিণের জানলা দিয়ে একসময় হু-হু করে হাওয়া আসত, শীত-গ্রীষ্ম, কিন্তু এখন গুমোট লাগে। হাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ বড়-বড় সব মাল্টিস্টোরিড উঠছে আমাদের অঞ্চলে। এই যে জায়গাগুলো যারা নামে গড়িয়া হলেও আসলে গড়িয়ার অভ্যন্তর, সেই শ্রীরামপুর, আতাবাগান, এমনকী আমাদের এই বোড়াল পর্যন্ত এখন প্রোমোটারের কম্পাসের মধ্যে চলে এসেছে। কলকাতায় জমি কোথায়? আর জমি নেই বলে এখানকার অনেকটা জমি নিয়ে তৈরি ছোট-ছোট বাড়িগুলোর ওপর, খেলার মাঠের ওপর হাত পড়েছে। শুধু হাতই নয়, বাধা দিলে পরে, লাঠি-সোটা-পাইপগান, রিভলভার সবকিছুই বেরোচ্ছে ঝুলি থেকে। বিল্টুর মাথায়ই তো ধরেছিল কয়েকটা লোক, দু-বছর আগে, এইরকম আড্ডা মেরে ও যখন ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছিল। তারপর থেকেই কেমন চুপচাপ হয়ে গেল বিল্টু। আগের মতো কথা বলে না আর, সেই প্রাণখোলা হাসিটা হাসে না। অনেকটা ওই মেয়েটার মতো। কিন্তু ওই মেয়েটার মাথায় নিশ্চয়ই কেউ রিভলভার ধরেনি। আর তাছাড়া বিল্টু যেরকম গুম মেরে থাকে, মেয়েটা কিন্তু একদম সেরকম নয়। ওর চোখে দুটো আলাদা-আলাদা জিনিস খেলা করে। সেইগুলোই কি কষ্ট আর মজা? আমি সমীরের দিকে তাকালাম। একসময় কবিতা লিখত সমীর। জানতাম কারণ আমাদের জোর করে শোনাত। এখন আর শোনায় না। তার মানে কি লেখেই না আর? জিজ্ঞেস

করেছিলাম একদিন।

সমীর উত্তর দিয়েছিল, ওসব কবি-টবি হতে গেলে অনেক সোর্স লাগে।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। চাকরি পেতে গেলে সোর্স, বিজনেস করতে গেলে সোর্স, কবি হতে গেলেও সোর্স চাই? কিন্তু কিছু বলিনি কারণ আমি কবিতার কীই বা জানি-বুঝি? এখনও চুপ করেই রইলাম কারণ চোখের বিদ্যুৎ কী দিয়ে তৈরি হয় মালুম নেই।

—মেয়েটার জন্য তোর ভিতরে ঠিক কী হচ্ছে? সমীর জিজ্ঞেস করল।

—কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু সকালবেলা ওকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। এবার মুশকিল হচ্ছে ও তো ন'টার বাসটায় যায় না, তাই ন'টা পঁয়ত্রিশের বাসটার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে আমাকে।

—আর আধঘণ্টা বকের মতো বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করার জন্য লেট হয়ে যাচ্ছে তোর অফিসে, তুই খিস্তি খাচ্ছিস।

—এগজ্যাক্টলি।

—তাহলে একটা ব্যাপার শিওর যে তুই মেয়েটার প্রেমে পড়েছিস। সমীর একটা সিগারেট ধরাল।

—আমাদের কি সেই বয়স কিংবা পরিস্থিতি আছে?

—নেই কেন? তিরিশ-বত্রিশ বছরে কি মানুষ প্রেমে পড়ে না?

—পড়ে হয়তো। কিন্তু এখন সময়টাই এমন যে ভিতরটা কীরকম তিতকুটে হয়ে থাকে সারাক্ষণ। এর ভিতরে ...

—এর ভিতরে প্রেম-ভালবাসা সম্ভব নয়? সমীর বড় করে ধোঁয়া ছাড়ল।

—সম্ভব নিশ্চয়ই। লেকের ধারে কিংবা যে-কোনও ফাঁকা জায়গায় অন্ধকার নামলেই এত ভিড় হয় কেন, তা নইলে?

—ফাঁকা জায়গা কমে আসছে।

—অন্ধকার বাড়ছে বলছিস? আমি সমীরের থেকে কাউন্টার নিয়ে দু'টান দিলাম।

—সে বাড়ুক কিংবা কমুক। তুই আমার প্রশ্নটার উত্তর দে। মানুষ এখন প্রেমে পড়তে পারবে না?

—অবশ্যই পারা উচিত। কিন্তু পারছে কি? ওই যে ভিড়টার কথা বললাম ওটা তো খালি জাপটাজাপটি, খিমচো-খিমচির ভিড়।

—তাতে অসুবিধে কী? বাসের মেয়েটার সঙ্গে তোর হয়ে গেলে তুই কি ওর মুখ দেখবি?

—খাব নিশ্চয়ই কিন্তু মেয়েটাকে যে ঠিক সেজন্যই আমার দরকার তা বোধহয় নয়। তোকে কীভাবে বোঝাব জানি না, মেয়েটাকে একবার দেখার জন্য আমার যে ছটাফটানি হয়, তা একদম অন্য কারণে ...

—প্রেমে পড়লে ওরকম সবারই মনে হয়।

আমি সমীরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। আমার মাথার মধ্যে তখন সেই সকাল দশটা যেদিন আমি প্রথম খেয়াল করি মেয়েটাকে। সেদিন দেরি হয়ে গেছে বলে ন'টার বাসটা মিস করেছি আমি। পঁয়ত্রিশের বাসটাকে ভিআইপি বাজারের কাছে থামিয়ে জনাপাঁচেক লোক উঠল, যার মধ্যে একজনকে চেনা-চেনা লাগল। বাসে উঠে সানগ্লাসটা খুলে হাতজোড় করে নমস্কার করতেই, আমি দেখলাম, লোক নয় একটা ছেলে। আমার থেকে দু-তিনবছর কমই হবে বয়স; বাংলা কমার্শিয়াল সিনেমার উঠতি স্টার। পেটানো চেহারা ছেলেটার, মুখটাও কেষ্টঠাকুরের মতো তবে বাংলাটা ঠিক পরিষ্কার করে বলতে পারে না। সে না পারুক, ছেলেটাকে দেখেই হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে বাসে। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠছে, তিন-চারটে মেয়ে যেন-তেন-প্রকারেণ স্টার-এর কাছে পৌঁছতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে, ছেলেটা তাদের মধ্যে একজনকে টেনে তুলল, হাসিমুখে। আমার ভীষণ বিরক্ত লাগছিল, কারণ ওই সিনেমা পার্টি ওঠার পর থেকেই বাসটা অনেক স্পিড কমিয়ে দিয়েছিল, আমি ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কখন এই সার্কাস শেষ হবে। তার মধ্যেই পিছনে চিল্লামিল্লি শুনছিলাম। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছিলেন, 'উত্তমকুমার এরকম করার কথা ভাবতেও পারতেন না' বলে আর একটা টিনেজার মেয়ে তার পাশে বসা মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলাকে, 'আপনি উঠে দাঁড়ান এক্ষুনি, আমায় যেতে দিন' বলে ধমকাচ্ছিল। ওই মেয়েটার কথা কানে যেতেই আমার মনে হল যে আমিও তো একটা মেয়ের পাশেই বসে আছি। আমি একটু গলা তুলেই বললাম, আপনি কি বেরোবেন অটোগ্রাফ নিতে?

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। দু'দিকে। তারপর আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু সত্যি অবাক হলাম যখন ওই স্টার ক্যামেরা পিছনে নিয়ে বাসের লাস্ট সিট পর্যন্ত এগিয়ে আসতে থাকল আর বাসের প্রত্যেককে 'আমার ছবিটা দেখতেই হবে কিন্তু' বলে স্মাইল দিতে শুরু করল। ওর দলের একটা লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'আজ রাতে আপনারা নিজেদের টিভিতে দেখতে পাবেন। প্রোগ্রামটার নাম মনে রাখবেন, "জনতার মাঝে সুপারস্টার"।

.... কোন চ্যানেল? রাত ক'-টায়? কত যে গলা জানতে চাইল, ইয়ত্তা নেই তার। আর তখনও জানলার ধারে বসা সেই মেয়েটা জানলা দিয়ে বাইরেই তাকিয়ে রইল। এমনকী স্টার যখন আমার সিটের পাশে এসে 'তুমি দেখছ তো'? বলে, বেঁকে দাঁড়াল, তখনও ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল না পর্যন্ত। উত্তর না পেয়ে স্টার রোবটের মতো এগিয়ে গেল পরের সিটের দিকে কিন্তু আমি আটকে গেলাম। সেই মুহূর্তে। আসলে লজিস্টিকস নিয়ে কাজ করি তো, মনে হল, এর মন এমনই যেখানে স্টারের ইশারা পৌঁছয় না কিন্তু আমার ডাক পৌঁছয়। তাই আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেরোবেন কি না তখন কথা না বললেও উত্তর দিয়েছিল।

এত কথা সমীরকে বলা যায় না। ও কবিতা লিখলেও না। তাই ভাবতে থাকলাম কীভাবে নিজেকে প্রোমোট করা যায় মেয়েটার কাছে। আমি তো ফিল্ম নই যে কোনও স্টার এসে বলে যাবে, দেখতেই হবে। অথচ নিজের কথা খুব তাড়াতাড়ি বলে না ফেললে, অফিসে যা চলছে তাতে চাকরি টিকিয়ে রাখা মুশকিল। ওদিকে একটা মেয়েকে কী করে বলা যায়, এই যে শুনছেন, আপনাকে একবার না দেখে, আমি থাকতে পারি না, কিন্তু আপনাকে দেখার চক্করে আমার চাকরিটা যেতে বসেছে, আপনি কাইন্ডলি ন'টার বাসটা ধরবেন কাল থেকে?

সমীর থট-রিডার হয়েছে কি না জানি না। কিন্তু আমার নীরবতার সুযোগ নিয়ে ও আমার মনের কথাটাই বলল—এই যে চুপ করে যাচ্ছিস কথায়-কথায় এটা তোর মনের পক্ষে ভাল হলেও, লাইফের পক্ষে খুব একটা ভাল নয়। তুই কথা বলার চেষ্টা কর, মেয়েটার সঙ্গে। ম্যাক্সিমাম, কী হবে, দু-একটা চড়-থাপ্পড় খাবি।

—গড়িয়া অঞ্চলে সেটা কি খুব একটা সম্মানের হবে? ছোট থেকে সবাই চেনে।

—যেখানে কেউ চেনে না, সেখানে কর। চিংড়িঘাটায় নেমে যা মেয়েটার সঙ্গে। তারপর পিছন-পিছন হাঁটতে হাঁটতে পাশাপাশি চলে আয়, পা চালিয়ে। 'একটা কথা ছিল' বলে শুরু করে দে।

— আর আমার অফিস? এমনিই তো দেরি হয়ে যায়, ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্য।

—একদিন কামাই হবে। প্রতিদিনের ঝঞ্ঝাটের থেকে তো ভাল। এখন মেয়েরা স্মার্ট, তোকে খামোখা ঝুলিয়ে রাখবে বলে মনে হয় না। যদি ইন্টারেস্ট না থাকে স্ট্রেট বলে দেবে যে ডিস্টার্ব করবেন না। ব্যস। তুই পরদিন থেকে সাড়ে আটটার বাস ধরে নিবি।

হামলে পড়ে কথা বলতে যায়নি বলে যাকে ভাল লাগল, কথা বলতে গিয়ে যদি কড়া কথা শুনি তার কাছ থেকে, কতটা নিতে পারব? যতটাই পারি, এটা ছাড়া অন্য রাস্তা নেই। কারণ এরমধ্যে একদিন আবার ওর পাশে বসার চান্স পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ক-টা বাজে? কোনও উত্তর না দিয়ে ঘড়ি-পরা হাতটা আমার দিকে তুলে ধরেছিল মেয়েটা। আমি ঘড়ির কাছে কাঁটা দুটো ঠিক কোথায় দেখতে পাইনি কারণ আমার মাথাটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গিয়েছিল পলকের জন্য। আর একটু ধাতস্থ হয়ে দেখেছিলাম, মেয়েটা কানের সঙ্গে মোবাইল চেপে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। কথা বলছে না, শুনছে। আমার কেন জানি মনে হল, ওটা কৌশল। মোবাইল ধরা হাত দিয়ে মুখটা আড়াল করে রেখেছে আমার থেকে।

ওই আড়ালটা ভেঙে ফেলে রাস্তায় যদি খোলাখুলি অপমান করে? করলে, করবে। যদি চিৎকার করে লোক ডাকে আর অচেনা জায়গায় অচেনা লোকজন এসে গণধোলাই দিতে শুরু করে? তাহলে মার খেতে হবে। হয় এসপায় নয় ওসপার হতেই হবে ভেবে আমি সমীরের অ্যাডভাইস মতো নেমে পড়লাম একদিন। চিংড়িঘাটা থেকে নিকোপার্কের দিকে যাচ্ছিল মেয়েটা। আমি প্রায় ওর সঙ্গেই রাস্তা পেরিয়ে একটা টিনের গুমটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম সিগারেট ধরাবার অছিলায়। মেয়েটা আমাকে ক্রস করে বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই লম্বা-লম্বা পায়ে আমি ওর কাছাকাছি পৌঁছে বলে উঠলাম, একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

কোনও কথা না বলে এগিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটা। আমি বললাম, জাস্ট এক মিনিট সময় নেব। এবার আমার দিকে তাকিয়ে বাঁহাত নাড়ল মেয়েটা। ভিখিরিকে ভাগিয়ে দেবে বলে লোকে যে ভাবে হাত নাড়ায়, ঠিক সেভাবে। আর এগিয়ে যেতে যেতে ওইভাবে হাত নাড়াতেই থাকল। আসলে মেয়েটা এগিয়ে যায়নি, আমি থেমে গিয়েছিলাম। সাঙঘাতিক একটা অপমান আমায় পেড়ে ফেলছিল। এর চাইতে চড় খাওয়াও ভাল ছিল বোধ হয়। তাতে অন্তত একটা পারসোনাল টাচ থাকে। কিন্তু এই হাত নেড়ে ভাগিয়ে দেওয়া যেন একটা নেড়ি কুকুরের সঙ্গে এক করে দিল আমায়, ঘ্যাঁক করে কামড়ে দেওয়া ছাড়া যার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের আর কোনও পথ নেই।

কিন্তু আমি তো একটা মানুষ। তাই দেরি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অফিসে গেলাম। যা হল, তার চাইতে বেশি অপমানিত হওয়া সম্ভব নয় জেনেই গেলাম। পরদিন রোববার ছিল। সোমবার ন'টার বাসটা ধরব ঠিক করেই বেরোলাম। আর বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত একটা মুক্তির স্বাদ পেলাম। যেন একটা লক-আপ-এর ভিতর থেকে আবার আমার ঘরে ফিরে আসছি আমি। বসার সিট পেলাম। জানলার ধারে নয়, কিন্তু কী আসে যায়! বাসটা ছাড়ার ঠিক আগে মানিব্যাগ থেকে ভাড়াটা বের করে হাতে রাখব বলে, উঠে দাঁড়ালাম। আর টাকাটা হাতে নিয়ে বসার সময় দরজার দিকে চোখ চলে গেল। মেয়েটা এই বাসটাতেই উঠছে।

৩

আমার চোখে কি লঙ্কাগুঁড়ো পড়ল নাকি চোখ জুড়িয়ে গেল? বোধহয় দুটোই একসঙ্গে। কষ্ট আর মজা মিলেমিশে গেলে এমনটাই হয়তো হয়। কিন্তু মেয়েটা ন'টার বাসে উঠল কেন? আমি যেমন ওকে এড়াতে চাইছি, ও'ও কি আমাকে? ভাবতেই কীরকম যেন কুঁকড়ে গেলাম। সেটা এতটাই যে ও বাসে বসার জায়গা পাচ্ছে না দেখেও ওকে ডেকে বসতে বলতে পারলাম না। যদি আজ আবার ওইরকম হাত নাড়িয়ে ভাগিয়ে দেয় তাহলে বেইজ্জত হতে হবে সবার সামনে আর সবচেয়ে বেশি করে নিজের কাছে। পারব না। তার চেয়ে এই কাঠ হয়ে বসে থাকা অনেক ভাল।

বসে রইলাম। আর যতটা পারলাম এদিক-ওদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকলাম মেয়েটা বসতে পেয়েছে না পায়নি। একসময় ও হারিয়ে গেল আমার চোখের আওতা থেকে। নিশ্চয়ই বসার জায়গা পেয়েছে, পিছনে কোথাও। আমাকে দেখতে পেরেছে কি বাসে ওঠার সময়? কে জানে। একটা সিগনালে বাস থামল। সেখানে গান বাজছে, 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, / বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া ....'। অন্যের মনের ভিতর কী চলছে জানার চেষ্টা করে নিজেকে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয়? অথচ মানুষ সেটাই করে। এই রবীন্দ্রসঙ্গীত কি সেরকম একটা কিছুই বলছে না? অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের আমি কীই বা বুঝি? না বুঝি, না বুঝলাম কিন্তু এই যে নিজেকেও বুঝতে পারি না, এটাই জ্বালায়। আচ্ছা, নিজেকে না বুঝতে পারার এই কষ্টটা কি অন্যকে বোঝার চেষ্টা করলে কমে যায়? ওই গানটা কি এরকম কিছুই বলতে চাইছে?

সিগনাল সবুজ হয়ে গিয়েছিল বলে বাস চলতে শুরু করেছিল; গানও কানে আসছিল না আর কিন্তু পিছন থেকে একটা চেঁচামেচির আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। কানে গেল একটা লোকের গলা, 'আরে কী হারিয়েছে বলবেন তো?' উত্তরে কিছু শুনতে পেলাম না, শুধু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার সেই গলাটাই বলে উঠল, 'স্পষ্ট করে বলুন, কী হারিয়েছে'? এবার আরও কয়েকটা গলা মিলে গিয়ে কোরাস তৈরি করল। তখনই আমার পাশের লোকটির স্টপেজ এসে যাচ্ছে বলে নামতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, মেয়েটা আমার কাছাকাছি চলে এসেছে, আর সবাই টিকিট কেটেছে কি না চেক করার জন্য ভিতরে ঢুকে আসা কনডাক্টরকে একটা কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। ঠিক কী হয়েছে আর হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছিলাম; কন্ডাক্টর বলে উঠল, এই ভদ্রমহিলার মোবাইলটা হারিয়ে গেছে। কেউ খুঁজে পেলে দিয়ে দেবেন।

পিছন থেকে দু-তিনটে গলা বলা উঠল, হারিয়েছে তো বলছিল না কেন?

—উনি কথা বলতে পারেন না। বোবা। কন্ডাক্টর জবাব দিল।

পাঁচ সেকেন্ড নিস্তব্ধ হয়ে রইল গোটা বাস। তারপর একটা গলা বলল, 'বোবার মোবাইল লাগে?'

বলার ধরনে কিংবা কথাটা শুনেই গোটা বাস ফেটে পড়ল হাসিতে। সেই হাসি যেন একটা বিস্ফোরণ। কেবল

রক্তপাতটুকুই যা হচ্ছিল না। আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, এবার দেখলাম, চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে একদম আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা আর নিজের সাদা ওড়নাটা আমাকে দেখিয়ে, একটা কিছু বলতে চাইছে। আমি ধরতে পারছিলাম না, ও কী বলতে চাইছে। আমার সামনের সিটের এক মহিলা বললেন, মেয়েটার মোবাইল বোধহয় সাদা রঙের। কথাটা শুনে আবার একবার ওর দিকে তাকালাম আমি। সাদা ওড়নার মতো ওর মুখটাও রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে। তখনই চিৎকার উঠল বাসে, 'সাদা, সাদা, বোবার মোবাইল সাদা....'। আর মেয়েটা এবার এক ছুটে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আমি রিফ্লেক্সে একটা হাত বাড়ালাম ওকে আটকাবার জন্য, হাতের সঙ্গে ওড়নাটার ছোঁয়া লাগল একবার। কিন্তু মেয়েটা বেরিয়ে গেল। হতভম্বের মতো কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে যখন দরজার দিকে এগোলাম ততক্ষণে বাস একটা স্টপেজ পেরিয়ে এসেছে আর মেয়েটা নেমে গিয়েছে। একবার ভাবলাম আসছে স্টপেজে নেমে গিয়ে পিছিয়ে যাই ওর কাছে। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল, এখন নামলেও ওকে পাব কি পাব না, তার চেয়ে...

৪

মোবাইলটার জন্য লাস্ট স্টপেজ অবধি চলে গেলাম আমি। সবাই নেমে যাওয়ার পরও বাসে রয়ে গেলাম আর প্রত্যেকটা সিটের নিচে উঁকি মেরে দেখতে থাকলাম। সরকারি বাস বলেই বোধহয় কেউ পাত্তাও দিল না আমায়। ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর আগেই নেমে গিয়েছিল তাই গোটা বাসটায় আমি একা প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে খুঁজলাম মোবাইলটা। পেলাম না। ততক্ষণে একজন-দু'জন উঠতে শুরু করেছে আবার বাসটায়। ওটার আবার ছাড়ার সময় এগিয়ে আসছে বুঝে, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, একটা মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে, আপনাদের কারও যদি চোখে পড়ে তাহলে কাইন্ডলি বলবেন। আমার দিকে ঘুরে তাকাল, দু-তিনজন, কিন্তু কেউ কোনও কথা বলল না। আমি খোঁজ চালিয়ে গেলাম যতক্ষণ না বাসটা আবার গড়িয়ার উদ্দেশে রওনা হল। গড়িয়ায় নেমে আবারও একটু খুঁজব ভাবলাম কিন্তু এবার ডিপোর একটা লোক আমায় বাস থেকে নেমে যেতে বলল, বাস ক্লিন হবে বলে। আমার মনে হল বাসের কন্ডাক্টরই ওকে পাঠিয়েছে।

পরদিন আমি আবার ন'টার বাসটায় উঠেও নেমে গেলাম মেয়েটাকে না পেয়ে। কিন্তু সাড়ে ন'টার বাসটাতেও মেয়েটা উঠল না। তার পরদিন ন'টার বাসটায় উঠে একটা স্টপেজ পরে নামতে যাচ্ছি, কন্ডাক্টর পিছন থেকে বলল, ওই বোবা মেয়েটা কি আপনার চেনা?

—কেন বলুন তো?

—না, সেদিন আপনি ওর মোবাইলটা খুঁজছিলেন তো...

—হ্যাঁ, ওই পরিচিত আর কী। একটা এলিবাই দিতেই হল আমায়।

—ওর সাথে দেখা হলে এটা দিয়ে দেবেন। আমাদের ক্লিনার খুঁজে পেয়েছে। কন্ডাক্টর একটা কালো রঙের সস্তার চাইনিজ সেট এগিয়ে দিল আমার দিকে।

—থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি মোবাইলটা হাতে নিয়ে বললাম।

—মেয়েটা উঠছে না দু'দিন ধরে, তাই আপনাকে দিয়ে দিলাম। এ যা সেট, ফেলে দিলেও কেউ নেবে না। কন্ডাক্টর টিকিট কাটতে ভিতরে ঢুকে গেল।

আমি কথায় কথায় দুটো স্টপেজ চলে এসেছিলাম। মোবাইলটা হাতে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে গড়িয়ায় ফিরে গেলাম। কিন্তু সাড়ে ন'টার বাসটাতেও পেলাম না মেয়েটাকে। জানলার ধারে বসে, মোবাইলটা নাড়তে-চাড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। কোনও সিম ভরা নেই মোবাইলটায়। একটা মরা সেট। মেয়েটা কেন সঙ্গে রাখত? শুধু মাঝেমাঝে বের করে কানে ঠেকানোর জন্য, যাতে কেউ বোবা না ভাবে? কিন্তু বোবারা তো এসএমএস করতে পারে, করার দরকারও হতে পারে কখনও। তাহলে? ভাবতে ভাবতে আমি সেদিনই চেনা একটা দোকান থেকে সিম ভরালাম মোবাইলটায়। আর পরদিন সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে চলে এলাম গড়িয়া টার্মিনাসে। একটার পর একটা বাস ছাড়তে লাগলাম, বেলা বারোটা পর্যন্ত। কিন্তু মেয়েটা একটা বাসেও উঠল না। পরদিনও একই কাজ করলাম। তার পরদিনও।

মেয়েটাকে মোবাইলটা ফেরত দেওয়া এত জরুরি মনে হচ্ছিল যে এটাই আমার রুটিন হয়ে গেল। এবং আমি রুটিনটা এনজয় করছিলাম, রীতিমতো। তাই চাকরিটা যখন চলে গেল, খুব কিছু খারাপ লাগল না। নতুন চাকরি খোঁজার চেষ্টাও করলাম না, কারণ আমার রুটিনের সঙ্গে মিলবে এমন চাকরি কোথায়? মাসখানেকের ভিতর কীভাবে যেন পাড়ায় রটে গেল ব্যাপারটা, বাড়িতে প্রবলেম হতে শুরু করল। শুধু বাড়ি নয়, ক্লাবে আমি গিয়ে বসলে, সবাই হাসতে শুরু করল। এমনকী ওই গুম হয়ে যাওয়া বিল্টু একদিন আমায় বলল, কী পাগলামি আরম্ভ করেছিস?

কারও জিনিস কাউকে ফিরিয়ে দিতে চাওয়াটা পাগলামি? আমি মনে মনে হাসলাম, পাগল বিল্টুর কথা শুনে। আর আমার রুটিন চালিয়ে গেলাম। আমার ব্যবহারিক জীবনে অনেকগুলো অদল-বদল ঘটছিল কিন্তু একটা বড় কাজের মধ্যে থাকলে সেগুলোকে পাত্তা দিলে চলে না, তাই আমিও দিলাম না। আমার মন বলছিল, মেয়েটাকে আজ নয় কাল মোবাইলটা ফিরিয়ে দিতে পারবই।

মাস তিনেক পর মেয়েটাকে দেখতে পেলাম গড়িয়ায়। পরপর দু'দিন। কিন্তু এস-২১ নয়, একদিন ও ৫ নম্বর বাসে উঠছিল আর একদিন এস-৭ এ। দু'দিনই আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মোবাইলটা এগিয়ে ধরতে প্রথমদিন ও বলল, এ কি এটা আমাকে দিতে চাইছেন কেন? ও কথা বলতে পারছে দেখে আমার এত আনন্দ হল যে আমি আমার অপেক্ষার কথা বলতে ভুলে গেলাম। আর সেই সুযোগে, 'যান যান, লেডিজদের বিরক্ত করবেন না' বলে কন্ডাক্টর ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিল আমায়। দ্বিতীয়দিন প্রায় একই ঘটনা ঘটল। শুধু এবার আমি নেমে যাওয়ার পর মেয়েটা বাসের জানলা দিয়ে একটা পাঁচটাকার কয়েন ছুড়ে দিল। আমার পায়ের সামনে এসে পড়ল সেটা। বাসটা বেরিয়ে যাওয়ার পর নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলাম কয়েনটা, বুকপকেটে রাখলাম।

কাল যখন টার্মিনাসে আসব তখন মেয়েটাকে ফেরত দেওয়ার জন্য আমার কাছে শুধু মোবাইল নয়, এই কয়েনটাও থাকবে।

অলঙ্করণ : মদন সরকার

ফিরে পাওয়া



শিবনাথ দাস

অনেকদিন পর আজ পুরনো পাড়ায় এল রঞ্জন। অফিস কলিগ অমলেশের বাইকে সল্টলেক থেকে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ অবধি এসে কী মনে করে রঞ্জন অমলেশকে বলল, 'আমাকে এখানেই নামিয়ে দে অমল।'

—কেন? আমি তো ঠাকুরপুকুরের দিকেই যাব। তোমাকে হরিদেবপুরে ড্রপ করতে অসুবিধা কী?

—না, আমার একটা কাজ আছে রে। ভাবছি ওটা সেরেই বাড়ি ফিরব। তুই চলে যা।

অমলেশ কথা বাড়ায় না। সিগন্যাল সবুজ হতেই বাইকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রঞ্জন রাস্তা টপকে এগোয়। গুরুদোয়ারার সামনে এসে অভ্যাসবশত বক্সিং ক্লাবের দিকে তাকায়। কয়েকটা ছেলে বক্সিং প্র্যাকটিস করছে। রাস্তা এখন চওড়া হয়েছে। ফুটপাথ হয়ে গেছে সরু। আগে ফুটপাথে সুন্দর বাগান ছিল। সেখানে ছোট ছোট খাঁচায় নানা ধরনের পশুপাখি। সে সব উধাও। ধর্মদাস রো, অনামী সঙ্ঘ পেরিয়ে টালিগঞ্জ রোডে এসে রঞ্জন একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। মনে মনে ভাবল, এতদিন বাদে ওর বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতরা কি থাকবে ভূপেনদার চায়ের দোকানে? হাবুল, জগা, মানিক, ভোলা আর ফেমাস কাল্টুদা! ওরা কি এখনও আসে এখানে? পনেরোটা বছর—বড় কম সময় নয়। শরিকি বাড়িতে ওদের ভাগে পড়েছিল মাত্র দুটো ঘর। রঞ্জন, অঞ্জন—দু'ভাই আর বোন চন্দনা। রঞ্জনের পড়াশোনার পাট শেষ হয়ে গেলেও অঞ্জন আর চন্দনা তখন উচ্চমাধ্যমিক আর নাইনের স্টুডেন্ট। ওই ছোট ছোট দুটো ঘরে খুবই অসুবিধা হত। অঞ্জনের মা ক্রমাগত ওদের বাবাকে বলতেন কিছু একটা ব্যবস্থা করতে। সরকারি চাকুরে বাবা ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি। অফিস থেকে লোন তুলে ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি করে সপরিবার উঠে এসেছিলেন হরিদেবপুরে। জমি কেনা ছিল আগেই। কালীঘাটের পৈতৃক বাড়ির ওই ঘর দুটোয় তালা মারা থাকত। রঞ্জনের এক তুতো কাকার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকত। তিনিই মাঝে মধ্যে ঘর দু'খানা খুলে পরিষ্কার করে রাখতেন। তাঁর নিজের ঘরে আত্মীয়স্বজন এলে তাদেরও তুলতেন ওই ঘরে।

সে থাক। রঞ্জন নতুন পরিবেশে গিয়ে সমবয়সি বন্ধু-বান্ধব সেরকম পায়নি। ফলে বাবার পরামর্শে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় নানা কম্পিটিটিভ পরীক্ষার অনুশীলনে। ফলও মেলে হাতে নাতে। মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যেই পেয়ে গেল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজটা। বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে অঞ্জনও পড়াশোনা শেষ করে এসএসসি দিয়ে একটা উচ্চমাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকতার পেশায় ঢুকে গেছে। সুপাত্র দেখে চন্দনার বিয়ে দিয়ে কিছুদিন আগে রিটায়ার করলেন বাবা। তার পরেই তোড়জোড় শুরু করেছেন পুত্রবধূ আনার। রঞ্জনের মাও তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করে চলেছেন।

নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিটের মোড়ে এসে দাঁড়াতেই রঞ্জন মুষড়ে পড়ে। কোথায় ভূপেনদার চায়ের দোকান। কোথায় ভূপেনদার বাড়ি? ছেলেপুলে-সংসার? দোকানের পিছনে তো ভূপেনদার নিজের বাড়ি। ওর বন্ধু-বান্ধবই বা কোথায়? বিশাল একটা অ্যাপার্টমেন্ট ওর সামনে দাঁড়িয়ে যেন ওকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে। অতীত স্মৃতি হাতড়াতে এসেছিল রঞ্জন। ব্যর্থ হল সে। না এলেই বোধহয় ভাল হত। বুকের ভেতর থেকে একটা চাপা কান্না যেন দলা পাকিয়ে উঠে এল। পৈতৃক বাড়িতে যাবে না। বাড়িই ফিরে যাবে। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে? ট্যাক্সির জন্য এদিক-ওদিক চাইতেই নজরে পড়ল একটা ফাঁকা ট্যাক্সি আসছে।

—ট্যাক্সি। হাতটা তুলে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করাতেই পিঠে একটা আলতো চড়—

—রঞ্জন না?

—আরে কাল্টুদা!

কাল্টুদা জড়িয়ে ধরে রঞ্জনকে।

—আরে তুই যে রীতিমতো সাহেব হয়ে গেছিস। তবে আমি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছি। গায়ে-গতরে একটু মাংস লেগেছে ঠিকই, কিন্তু মুখের আদলটা তোর একই আছে রঞ্জন।

—ছাড়ো তো। বলো কেমন আছো তোমরা? বাকিরা সব কোথায়? হাবুল, জগা, মানিক, ভোলা? আর কাল্টুদা, ভূপেনদার চায়ের দোকানটা গেল কোথায়? ভূপেনদা ভাল আছে তো?

—আরে বলছি, বলছি, চল ওদিকে। ঠেক এখন পাল্টে গেছে। তারপর তোর খবর কী? কী করছিস? মাসিমা-মেসোমশাই....

টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে দু'জনে এগোয় একটা দোকানের দিকে। বেশ সাজানো-গোছানো একটা চায়ের দোকান। সামনে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল হাবুল, জগা গুলতানিতেও মত্ত। কাল্টুদা ওদের নাম ধরে ডাকতেই ওরা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে রঞ্জনকে। এতদিন রঞ্জন ওদের ভুলে রয়েছে কী করে—এসব নানা অনুযোগের পর আবার ওরা রঞ্জনকে নিয়ে ডুবে যায় গভীর আড্ডায়, গল্পে-গল্পে এগিয়ে চলে ঘড়ির কাঁটা। জানা গেল ভূপেনদা ভাল প্রোমোটার পেয়ে তার জমিটা তুলে দিয়েছে তার হাতে। প্রচুর পয়সা পেয়েছে। সেই পয়সা দিয়ে আমতলায় দেশের বাড়িতে চলে গেছে। জগা, মানিক, ভোলা, হাবুল প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করছে। কাল্টুদার তো এফসিআই-এর চাকরিটা আছেই। রঞ্জন খুশিই হয়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় কিছু কিছু পরিবর্তন হলেও সার্বিক পরিবর্তন হয়নি দেখে খুশিই হল। অতীতকে হাতড়াতে এসে অতীতের ভালবাসা গায়ে মেখে ফুরফুরে মনে ট্যাক্সিতে চেপে বসল রঞ্জন। আনন্দে-আবেশে দু'চোখ বুজে এল। ড্রাইভারকে বলল, 'চলো হরিদেবপুর।'

অলঙ্করণ : দেবনাথ নন্দী



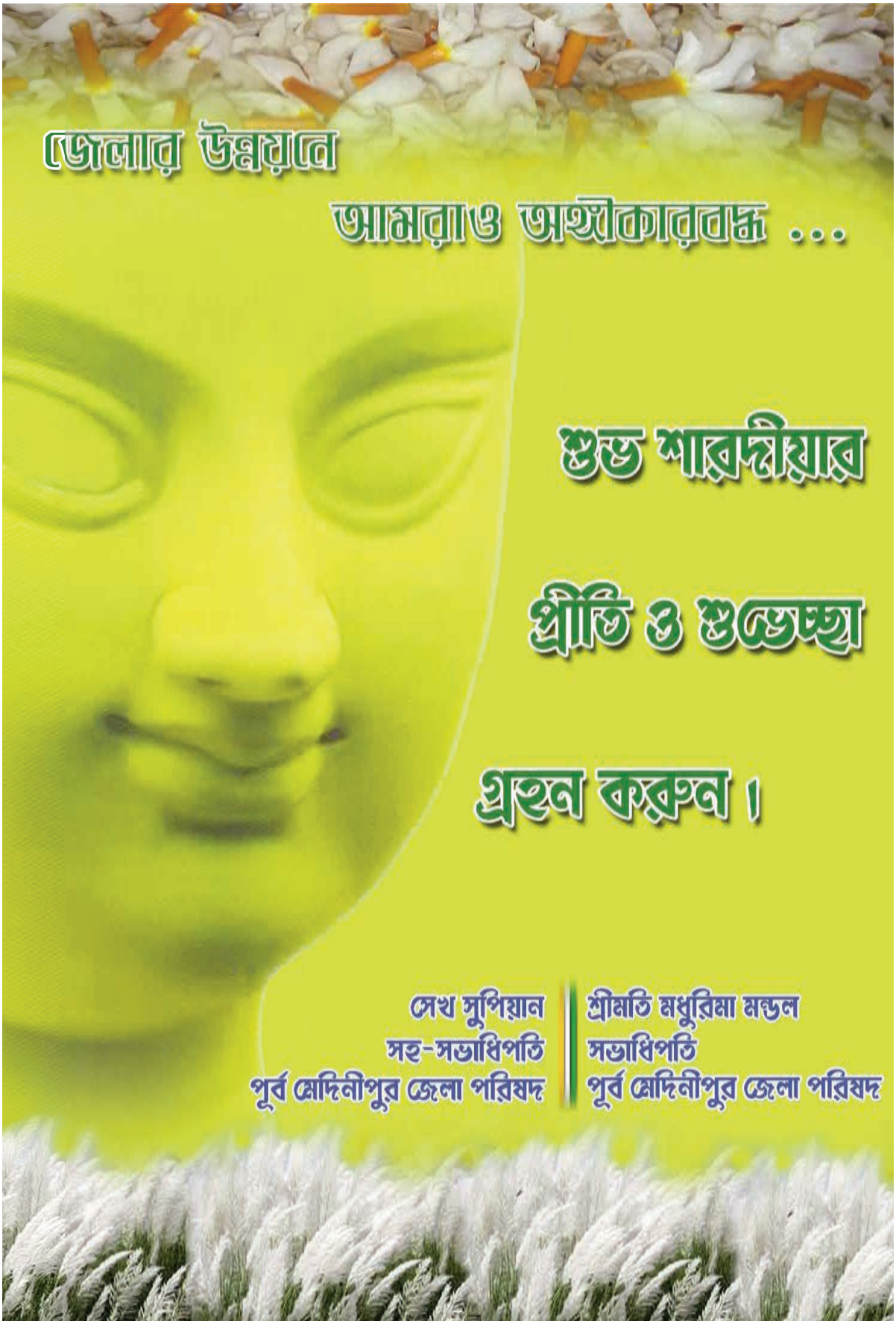
জেলার উন্নয়নে
আমরাও অঙ্গীকারবদ্ধ ...
শুভ শারদীয়ার
প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহন করুন।
সেখ সুপিয়ান
সহ-সভাধিপতি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ
শ্রীমতি মধুরিমা মন্ডল
সভাধিপতি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

কোচবিহার জিলা পরিষদ
কোচবিহার

জেগেছে গ্রাম
জেগেছে শহর
জেগেছে মানুষ জেগেছে,
পালা বদলের শুভক্ষণে
এসেছে জোয়ার উন্নয়নে,
মা, মাটি আর মানুষ নিয়ে
জেগেছে বাংলা জেগেছে ।।



বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসবে সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন

শারদোৎসব আনন্দময় হয়ে উঠুক।



পুষ্পিতা ডাকুয়া
সভাধিপতি
কোচবিহার জিলা পরিষদ
কোচবিহার



শুভ শারদীয়া
ও
শুভ দ্বীপাবলীর
প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

উৎসব প্রিয় বাংলার মানুষের পূজোর দিনগুলি আনন্দ মুখর হয়ে উঠুক । বাংলার মানুষের আশীর্বাদ হোক আমাদের জেলা পুরুলিয়ার আগামী দিনের অগ্রগতির পাথেয় ।

মীরা বাউরি
সহ সভাধিপতি
পুরুলিয়া জিলা পরিষদ

সৃষ্টিধর মাহাত
সভাধিপতি
পুরুলিয়া জিলা পরিষদ







বীরভূম জেলা পরিষদ

সবাইকে জানায়

শুভ শারদীয়া, দীপাবলী ও ইদুজ্জোহার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

শ্রীমতি রাখী লেট
সহকারী সভাধিপতি
বীরভূম জেলা পরিষদ

শ্রী প্রদীপ ভকত
সদস্য, বীরভূম জেলা পরিষদ
(দলনেতা)

শ্রী বিকাশ রায় চৌধুরী
সভাধিপতি
বীরভূম জেলা পরিষদ

সৌজন্যেঃ বীরভূম জেলা পরিষদের নির্মল ভারত অভিযান শাখা, জেলা জনস্বাস্থ্য শাখা, বীরভূম জেলা লোকশিক্ষা সমিতি, জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা।

বাঁকুড়া জেলা পরিষদ





শুভ শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই

বিভাবতী টুডু
সহকারী সভাধিপতি
বাঁকুড়া জেলা পরিষদ

অরূপ চক্রবর্ত্তী
সভাধিপতি
বাঁকুড়া জেলা পরিষদ

শারদীয়া ও ইদুজ্জোহার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বর্ধমান জেলা পরিষদ

মা - মাটি - মানুষের নেত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জীর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন-কে বাস্তবায়িত করতে বর্ধমান জেলা পরিষদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর।



ড. সৌমিত্র মোহন, আই.এ.এস.
নির্বাহী আধিকারিক
বর্ধমান জেলা পরিষদ
ও জেলা শাসক, বর্ধমান



প্রিয়া সূত্রধর
সহকারী সভাধিপতি
বর্ধমান জেলা পরিষদ



দেবু টুডু
সভাধিপতি
বর্ধমান জেলা পরিষদ

বর্ধমান জেলার সার্বিক উন্নয়নে জেলার সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করি।



পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

অনুন্নয়নের আঁধার সরিয়ে, অবহেলিতের পাশে থেকে, জঙ্গল ও নদী কিংবা ক্ষেতে ও পথে অথবা আর্তের ঘরে ঘরে শান্তি ও উন্নয়নের আলো পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য।

মা-মাটি-মানুষের শ্রদ্ধেয়া নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর আশীর্বাদ নিয়ে জনগণের সাথে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের অঙ্গীকার।

বাংলার জনগণকে জানাই শারদীয়া, দীপাবলী ও ঈদের আগাম শুভেচ্ছা।

সমায় মাণ্ডি
সহ-সভাধিপতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

উত্তরা সিংহ (হাজরা)
সভাধিপতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

শারদীয়া, ঈদ ও দীপাবলির শুভেচ্ছা



নদিয়া জেলা পরিষদ
কৃষ্ণনগর, নদিয়া



সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থার নিদর্শপত্র নিখুঁত ও উন্নতমানের মুদ্রণের জন্য নদিয়া জেলা পরিষদ প্রেস সকলকে আমন্ত্রণ জানায়।

★★★

কৃষ্ণনগরে স্বল্প ভাড়ায় রাত্রিবাসের জন্য নদিয়া জেলা পরিষদ ডাকবাংলোয় যোগাযোগ করুন।

★★★

নদিয়া জেলা পরিষদ বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

★★★

নির্মল জেলা নির্মাণের স্বার্থে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিণত করার লক্ষ্যে আমরা সচেষ্ট।

★★★

আমাদের লক্ষ্য :
স্বাস্থ্য বিধান মানবো, নির্মল নদিয়া গড়বো।

★★★

এম. জি. এন. আর. ই. জি. এ. সহ সমস্ত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি সফল রূপায়ণে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

সারথী বিশ্বাস
সহকারী সভাধিপতি
নদিয়া জেলা পরিষদ

বাণী কুমার রায়
সভাধিপতি
নদিয়া জেলা পরিষদ